

ব্যাখারী শরীফ

(বাংলা তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা)

প্রথম খণ্ড

মোঃলাল শামসুল হক ফরিদপুরী (রঃ)

প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল জামেয়া কোরআনিয়ার

কয়েক ও বরকতে

মোঃলাল আজিজুল হক সাহেব

মোহাম্মেদ জামেয়া কোরআনিয়া লালবাগ, ঢাকা

কতক অনূদিত।

হাম্বিদিয়া লাইব্রেরী লিঃ

৬৫, চক সারকুলার রোড, ঢাকা-১১

পরিচিতি

মওলানা শামছুল হক (রঃ) কর্তৃক লিখিত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ - وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَعَلَى

آلِهِ وَأَمْحَابِهِ الَّذِينَ أَثَرُوا الدِّينَ عَلَى الدُّنْيَا وَآثَرُوا دِينَهُ

সারাবিশ্বের মানুষ-জাতির কল্যাণ কামনা নয় শুধু, কল্যাণ সাধনের জন্ত সৃষ্টি হইয়াছিল মুসলিম জাতির এক জাতি এবং এক ভাষার কর্মসূচী। প্রাথমিক যুগের বীর মুসলিমগণ তাঁদের কর্তব্য পালন করিয়া কর্মসূচী অনুযায়ীই কাজ করিয়াছিলেন। সিরিয়া, ফিলিস্তিন, জর্দান, ইরাক, লেবানন, মিশর, তিউনিস, আলজেরিয়া—এমনকি স্পেন পর্যন্ত সকলের ভাষা একই ভাষা একই আরবী ভাষা হইয়া গিয়াছিল। সকলেই এক জাতি এবং এক ভাষাভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। একটু যখন দুর্বলতা ও শিথিলতা আসিল তখন পারস্য, আফগানিস্তান ও ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে ভাষা দেশীই রহিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার অশ্বর একই আরবী অক্ষরে পরিবর্তিত করিয়া লওয়া হইয়াছিল।

কিন্তু হতভাগা আমরা বাঙ্গালী মুসলমান যাহারা নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব হইতে অনেক পিছনে পড়িয়া রহিয়াছি। আরবী ভাষা ত দূরের কথা আরবী অক্ষরেও দেশী ভাষাকে লিখিয়া দেশের লোকের নিকট সমাদৃত করিতে পারি নাই। এমনকি বহু অগ্রে যে কাজ করার দরকার ছিল যে, দেশে যে ভাষা বা যে লিখন-প্রণালী প্রচলিত আছে তাতেই কোরআন হাদীছ অহুদিত করিয়া দেশের লোকদের চাহিদা মিটানো হউক এবং আলো দান করা হউক, তাহাও করা হয় নাই। পরম পরিতাপের বিষয়—আজও বাংলা ভাষায় কোরআনের বা হাদীছের এমন কোন তরজমাকারক নাই বলিলেও চলে যাহাকে সর্বদিক দিয়া বিশ্বস্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য বলা যাইতে পারে। বিশ্বস্ত বলা যায় তাকে যার আগে থেকে কোরআনের এবং হাদীছের বিরুদ্ধে মতবাদ না আছে এবং বিশ্বাসযোগ্য বলা যায় তাকে যার সব দিক দিয়া পূর্ণ জ্ঞান ও যোগ্যতা আছে—যিনি চৌদ্দশ' বছর আগের ভাষায় লিখিত মূল বিষয়টি নিজে হৃদয়ঙ্গম করিয়া বর্তমান যুগের মানুষের ভাষায় অবিকলরূপে যেমনটি তেমন বুঝাইয়া হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে পারেন।

প্রায় দশ বৎসর আগে আমি বোখারী শরীফের বাংলা অনুবাদের জন্ত একটি ভূমিকা লিখিয়া ছিলাম, কিন্তু বোখারী শরীফের তরজমার কাজে হাত দিতে সাহস করি নাই। দেশের ও জাতির চাহিদা অতি বেশী, প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক, সে জন্ত বারবার মনে ব্যথা পাইয়াছি, কিন্তু সাহস পাই নাই। কদাচিৎ যদি সুপার না পার, তবে শেষে অথাত-কুখাত খাইয়াও ক্ষমা নিবৃত্ত করে।

ভার হুনিয়াতে একদল লোক যে কুখ্যাত লইয়া বসিয়াও আছে—এই ভাবনায় মনে মনে বহুবার
ব্যথিত হইয়াছি, তাহা সবেও এত বড় বিশাল সমূহ পাড়ি দেওয়ার ভ্রায় কাজে হাত দিতে
সাহস পাই নাই।

আল্লাহ দর্জা বলন্দ করিয়া দিন আসার পরম দোস্ত মওলানা আজিজুল হক সাহেবের যে, তিনি
এত বড় বিরাট কাজে হাত দিতে সাহস করিয়াছেন। তিনি জওয়ানে ছালেহু—তিনি বাস্তবিকই
এই কাজের যোগ্যতা রাখেন। বতহুর আসার জানা আছে—বোখারী শরীফ বর্তমান যুগে বাংলাদেশে
তাহার চেয়ে অধিক বয়সহকারে এবং আন্তোপান্ত বুঝিয়া আর কেহ পড়েন নাই এবং বোখারী
শরীফের খেদমতও এতদূর কেহ করেন নাই। তিনি হযরত শায়খুল ইসলাম মওলানা শাক্বির
আহমদ ওসমানী রহমতুল্লাহে আলাইহের খাছোল-খাছ শাগের্দ। পড়ার জামানাতেই তিনি
১৮০০ পৃষ্ঠাব্যাপী শবাহ উছ' ভাষায় লিখিয়াছেন। স্বয়ং হযরত শায়খুল ইসলাম তাহার লেখা
সঙ্গে সঙ্গে আন্তোপান্ত দেখিয়াছেন, আনন্দিত হইয়াছেন এবং প্রশংসা করিয়াছেন। (বর্তমানে উহা
পাকিস্তানে ছাপা হইয়াছে।) বোখারী শরীফ পড়ার পরও প্রায় এক বৎসর হযরত শায়খুল
ইসলামের খেদমতে থাকিয়া এছ'লাহে-নফছ ও তজকিয়ায়ে-বাতেনের কাজে লিপ্ত ছিলেন এবং
বোখারী শরীফের শবাহ লিখিয়া তাঁহাকে দেখাইয়াছিলেন। কাজেই তাহার যোগ্যতায় এবং
বিশ্বস্ততায় কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

অতঃপর কয়েকবার বোখারী শরীফ এবং অফ্রাত ছেহাহু-ছেভা হাদীছের কেতাব দরছ দেওয়ার
পর যখন বাংলাদেশের অভাব মিটানোর জন্য বোখারী শরীফের বাংলা অনুবাদ করা তিনি শুরু
করিয়াছেন তখন আমার খুশীর আর সীমা রহে নাই।

আল্লাহ শোকর করিয়াছি, মক্কা শরীকে গিয়া—হাতীমে, মাতাফে, মাকামে-ইব্রাহীমে দোয়া করিয়াছি,
মদীনা শরীকে ব্রজা পাকে দাঁড়াইয়া দোয়া করিয়াছি—এই বিরাট খেদমত আল্লাহ পাক তাহার দ্বারা
নিনঃ বাংলার মুসলমানের জরুরত মিটান। মওলানা আজিজুল হক সাহেব লিখিয়া লিখিয়া
আমাকে দেখাইয়াছেন; অনেক জায়গা আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছি, অনেক জায়গা দেখিয়া
কিছু কিছু সংশোধন তাহার দ্বারাই করাইয়াছি। আল্লাহ পাক তাহার দর্জা বলন্দ করুন, কবুল
করুন, পাঠকগণকে ইহা হইতে কয়েক দান করুন, ইহ-পরকালের ভাল করুন—আমি গোনাগার
আল্লাহ পাকের মহান দরবারে করুন-স্বরে দোয়া করি। আমীন। ছোম্মা আমীন।।

10-6-57

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

গুজারশ

অনেক সময় দেখা যায়, জ্ঞান চর্চায় উপযুক্ত এবং সেই আখড়ার বীর পুরুষগণও নিজেদের অক্ষমতা ও নগণ্যতা প্রকাশ করেন। বস্তুত: কোন মহা মনীষীর পক্ষেও এইরূপ করা অতিরিক্ত গণ্য হইবে না, কারণ জ্ঞান-সমৃদ্ধ এতই সুগভীর, বিশাল ও সুপ্রশস্ত যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য যে কোন বীরের বীরত্ব ও মহানের মহত্ব এই অথই সমুদ্রে খড়-কুটার খায়ই বটে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন— **وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا** “মানবকে জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে মাত্র ষৎকিঞ্চিৎই দান করা হইয়াছে।”

কিন্তু উপযুক্ত ও মহান ব্যক্তিগণ কতক নগণ্যতা প্রকাশের রীতি বিद्यমান থাকায় প্রকৃত অমুপযুক্ত, ক্রটিপূর্ণ ও বাস্তবে নগণ্য ব্যক্তিদের বেলায় সমস্তার উদ্ভব হয় যে, তাহারা কিরূপে স্বীয় বাস্তব নগণ্যতা প্রকাশ করিবে? ভাষায় প্রকাশ করা নিষ্ফল; বারণ, মানুষ হিসাবে যতটুকু পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানী হওয়া সম্ভবপর উহার অধিকারীগণও নগণ্যতা স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সমস্তারই আমি আমার বাস্তব নগণ্যতাকে প্রকাশ করিতে ভাষার আশ্রয় বিফল বিবেচনা করিলাম।

তদুপরি পাঠকদের সম্মুখে আমার অকিঞ্চিংকর জ্ঞানের খুলি ছড়ান থাকিল। উহা যে, কি সমস্ত কানাকড়ি ও অচল বস্তুসমূহের সমবায়, তাহা আপনা-আপনিই প্রকাশ পাইতে থাকিবে।

মহাশয় বোখারী শরীফ বিশ্বাসীরা অন্তরে যে উচ্চাসন লাভ করিয়া আছে, উহা তাহার বাস্তব মর্যাদার কিয়দংশ মাত্র। কিন্তু আমি অধমের জ্ঞানবিন্দু যে, সেই কিয়দংশের মর্যাদাদুপাত্তিক পিপাসাটুকু মিটাইতে কোন সাহায্য করিতে পারে না তাহা অতি সুস্পষ্ট। এমতাবস্থায় নরখামের পক্ষে বোখারী শরীফ অগ্রবাদের কাজে হাত দেওয়া “মস্ত না জানিয়া সাশের গর্ভে হাত দেওয়া” এরই শামিল। এই সমস্ত জানিয়া-বুঝিয়াও আমি একমাত্র আল্লাহ তায়ালায় উপর ভরসা করিয়াই এই সুমহান কার্যে ত্রুতী হইয়াছি। রহমতে-ইলাহীর দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত। তদুপরি আল্লাহ পাক এমন কতিপয় মহামনীষীর অছীলা আমাকে প্রদান করিয়াছেন যাহারা এই মর্যাদানের দার্শনিক এবং অপরাজেয় বীরপুরুষ।

তন্মধ্যে একজন—শায়খুল ইসলাম মওলানা শাকীর আহমদ ওসমানী (র:)। তাঁহার নিকট বোখারী শরীফ অধ্যয়নের বাসনায় আমি বঙ্গদেশ হইতে সুহুর বোখারীর নিকটবর্তী ডাভেলস্থ ইসলামিয়া মাদ্রাসায় ছুটিয়া যাই: এক বৎসর তাঁহার খেদমতে অধ্যয়নের সৌভাগ্য লাভ হয়। তাঁহার অতুলনীয় জ্ঞান-সুর্ঘ্যের কিরণমালার প্রতি দৃষ্টিপাতের শক্তি আমাদের কোথায় ছিল?

তবে তাঁহার অধ্যাপনার সময় তাঁহার বণিত তথ্যপূর্ণ ব্যাখ্যা ও অমূল্য বর্ণনাসমূহকে আমি সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছিলাম এবং পরবর্তী বৎসর দেওবন্দস্থিত তাঁহার বাসভবনে তাঁহারই ছোহবতে থাকিয়া ঐ পাণ্ডুলিপির পুনর্লিখন কার্য সমাধা করি। এইরূপ সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বয়ং উহার সংশোধন করত: পূর্ণভাবে দেখিয়া যাইতেন। তাঁহারই প্রদত্ত নগ্ন-মুক্তা সমূহ যথারীতি সুবিস্তৃত দেখিয়া তিনি পরম আনন্দ অনুভব করিতেন এবং উহার একটি নকল নিজ হেফাজতে রাখিবার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। শায়খুল ইসলামের মহান ব্যক্তিত্বের পরিচয় দানের চেষ্টা করা বিগ্রহরে সুর্ঘ্যের পরিচয় দেওয়ার সমতুল্য। তাঁহার সন্মিলিত

মোসলেম শরীফের শরাহ, পবিত্র কোরআনের তফসীর এবং অন্যান্য অমূল্য সঙ্কলন সমূহ বাতীত তাঁহার স্বনামখ্যাত বিরাট ব্যক্তিত্বই তাঁহার পরিচয়ের জ্ঞাত যথেষ্ট।

শায়খুল ইসলাম (রঃ)-এর নিকট বোখারী শরীফের অধ্যয়ন আমার জ্ঞাত এই মহান কিতাবের দ্বিতীয়বার অধ্যয়ন ছিল। এর পূর্বের বৎসর আমি প্রখ্যাত আলেমকুল শিরোমনি মওলানা জাফর আহমদ ওসমানী (রঃ)-এর নিকট অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। তিনি যে কত বড় বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী তাহা তাঁহার এই যুগের অধিতীয় গ্রন্থ “এ’লাউন-মুনান”-এর ছায়াদীপ্তির মহান কিতাব দেখিলেই অনুমান করা যায়। এতদ্ব্যতীত শুধু পাক-ভারতেই নহে, বরং মুসলিম জাহানে তিনি এতই সুপরিচিত যে, আমি তাঁহার সম্বন্ধে যত কিছু লিখিব তাহা রেশমের জামায় চটের তালিরূপেই পরিগণিত হইবে।

তুঙ্গপরি অনুবাদ কার্যের ষাঁহার অভুলনীয় দান, সাহায্য ও সক্রিয় সহায়তা বিশেষরূপে লাভ করিয়াছি তিনি হইলেন ইসলামী চিন্তাধারার অধিতীয় চিন্তানায়ক ও স্বনামখ্যাত মোশেদ-কামেল মওলানা শামসুল হক (রঃ), যিনি আমার রুহানী পিতা এবং আমার অধিতীয় মুরশ্বী। বাল্যকাল হইতেই আমি তাঁহার স্নেহ-শীলত ছায়াতলে প্রতিপালিত হইয়াছি। তাঁহার পরিচয় বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে প্রতিটি ধর্মভীরু মানুষের অন্তরেই রহিয়াছে। তাঁহার অসাধারণ মহিমা ও ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক গ্রন্থসমূহ এবং তাঁহার শাগেরদান সারা বাংলা পরিবেষ্টিত করিয়া আছে।

বোখারী শরীফ অনুবাদের মহান কার্য একমাত্র তাঁহার কয়েজ ও বরকতের অছিলায়ই সম্ভব হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়—ঈমান ও দ্বিতীয় অধ্যায়—এলম প্রায় সম্পূর্ণই তাঁহার দৃষ্টিগোচরে আসিয়াছে। অপরাপর অধ্যায়েও তাঁহার এইরূপ দান রহিয়াছে যে, বস্তুতঃ এই অনুবাদকে কলমের ছায় আমার হাতে তাঁহারই অবদান বলা চলে। অনুবাদ কার্যে যাহা কিছু কতিপয় রহিয়াছে উহার সবটুকু তাঁহারই কয়েজ। ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সবটুকুই এই নরাধমের অজ্ঞতা ও অযোগ্যতা প্রসূত। আমার দ্বারা কোন ত্রুটিবিহীন বিষয়বস্তু প্রকাশ পাইয়া থাকিলে তাহা তাঁহারই দোয়ার ফল।

মানুষ মাত্রেই ভুল-ত্রুটি স্বাভাবিক। আমার ছায় নালায়েকের পক্ষে তাহা অবশ্যস্বাভাবিক। পাঠক-পাঠিকা বিশেষভাবে পণ্ডিতবর্গ এবং আলেমকুলের প্রতি অনুরোধ—ভুল-ভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হইলে আমাকে অবহিত করিয়া অশেষ ছওয়াবের ভাগী হইবেন; আমি উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হইব।

পাঠকবর্গের খেদমতে আমার সর্বশেষ আরজ—এই অনুবাদ কার্য চলাকালীন আমার পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। আমার পিতা শ্রদ্ধাভাজন মরহুম হাজী এরশাদ আলী আমার এই কাজের প্রতি সবিশেষ আগ্রহশীল ও অনুরাগী ছিলেন। আমাকে দীনের এলম শিক্ষাদানে তিনি অতিশয় যত্ন নিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তিম শযায় আমি এই কার্যের ছওয়াব ও সুফল লাভের বড় অংশীদার রূপে তাঁহাকে বহু আশা দিয়া থাকিতাম। আপনারা দোয়া করিবেন, আল্লাহ তায়ালা আমার আত্মাকে জাহান্নাবাসী করেন এবং দয়ার দরিয়া মাবুদ আমাকে যেই কার্যের তৌফিক দান করিয়াছেন সেই কার্যের চেষ্টাকে কবুল করিয়া আমার আত্মা ও আত্মার রুহকে ইহার ছওয়াব পৌছাইয়া দেন। হে আল্লাহ! তোমারই অপার রহমতে এই নরাধমের দ্বারা যাহা কিছু চেষ্টা-সাধ্য সম্ভবপর হইয়াছে, তুমি স্বীয় করুণাবলে উহাকে কবুল কর। আমীন।

পবিত্র হজ্জের সফরে,

চট্টগ্রাম—১৫/৩/৭৭ ইং,

আরজ-ওজার

আজিজুল হক

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বোখারী শরীফের অধিকাংশ হাদীছের এক একটি হাদীছ একাধিক—৫১১০ জায়গার বণিত আছে। কারণ, এক একটি হাদীছে বিভিন্ন অধ্যায়ের বিভিন্ন মহআলাহ থাকে; সে সূত্রে বিভিন্ন অধ্যায়ের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে একটি হাদীছই বিভিন্ন ছন্দে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ হইয়াছে। সেমতেই আড়াই হাজার মূল হাদীছ প্রায় আট হাজারে পরিণত হইয়াছে। এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইহাও যে, স্থানের বিভিন্নতায় একটি হাদীছের অংশাবলীর মধ্যে ও বিচ্ছিন্নতা আসিয়াছে। সমুদয় স্থান হইতে মূল হাদীছটির বাক্যাবলী একত্রিত করিলে উহার কলমের যাহা দাঁড়ায় সেই কলমের একত্রে বোখারী শরীফের এক স্থানে পাওয়া বিরল। কিন্তু অনুবাদের সৌন্দর্য্য এবং পাঠকের পক্ষে অধিক উপকারী ব্যবস্থা একমাত্র ইহাই যে, প্রতিটি হাদীছ উহার সমুদয় অংশ সম্বলিতরূপে একত্রিত আকারে অনূদিত হয়। কিন্তু বার শত পৃষ্ঠার সুদীর্ঘ গ্রন্থে ২, ৪, ১০, ২০ স্থানে বিকিপুঙ্কপে পুনঃ পুনঃ বণিত এক একটি হাদীছের বিভিন্ন অংশ খুঁজিয়া বাহির করা কতই না কঠিন। এই নরাধমের জন্ম ত অসম্ভব। আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত—এমন একখানা কেতাব আমার হস্তগত হয় যাহাতে ঐরূপ প্রতিটি হাদীছের প্রত্যেকটি স্থান নিরূপণ ও পৃষ্ঠার সংখ্যা নির্ণয় করা হইয়াছে; এই বিষয়েই কেতাবখানা রচিত। ঐ কেতাবখানা ব্যতিরেকে বোখারী শরীফ অনুবাদের সৌন্দর্য্য সাধন এই যুগে সম্ভব নহে। ঐ কেতাবের রচয়িতা শেখ আবদুল আজিজ (র:)। পাঠকদের নিকট বিশেষ অনুরোধ, সকলে তাঁহার জহু ফেরদাউস-বেহেশতের দোয়া করিবেন।

অত্র আলোচনা দৃষ্টে ইহা সুস্পষ্ট যে, যেই পরিচ্ছেদে যেই হাদীছ অনূদিত আছে মূল গ্রন্থের সেই পরিচ্ছেদে উল্লেখিত উক্ত হাদীছের অনুবাদে অতিরিক্ত বাক্যাবলী বা বিষয়বস্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাইবে। ঐরূপ ক্ষেত্রে বন্ধনী না থাকিলে মনে করিবেন— এই বাক্য বা অংশ মূল গ্রন্থের কোন স্থানে নিশ্চয় উল্লেখ আছে।

ছাইয়েদী ছন্দী মওলানা শামছুল হক (র:) ১৯৫৬ সনে হজ্জ করিতে যান। সেই বৎসরই রমযান মাসে বোখারী শরীফ অনুবাদের কাজ নরাধমের হাতে আরম্ভ হয়। চরম ও পরম সৌভাগ্য যে, তিনি হজ্জ উপলক্ষে পবিত্র মক্কা-মদীনায় দোয়া কবুল হওয়ার প্রত্যেক স্থানেই এ বিষয়ে নরাধমের জ্ঞা দোয়া করিয়াছিলেন এবং লিখিত অনেক কিছু আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে—তাঁহার পবিত্র মসজিদের বিশিষ্ট স্থানে বসিয়া তাহাজ্জুদের সময় তিনি যে দোয়া করিয়াছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে তাহা লিখিতরূপে পাইয়াছি। ইহা আমার নিকট নিঃসন্দেহে কএঅতুলনীয় পরম সম্পদবিশেষ। তাই বরকতের জ্ঞা নিয়ে উহারই কটো রক দেওয়া হইল।

1-8-56
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده - والعلم لله والسبح على النبي الذي بعث

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

মুখ বক্ত

হযরত রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবির্ভাবের সময় হইতেই জগদ্বাসীর এক বিরাট অংশ তাঁহার আলো ও নূর-হেদায়েত হইতে বঞ্চিত থাকিয়া তাঁহার প্রতি আস্থাহীন রহিয়াছে। তাহাদের এই অনাস্থা বিশ্বের কিছু নহে। কারণ তাহারা কাকের তাহারা ইসলামের দাবীদার নয়; অতএব তাহারা রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর তথা তাঁহার আদর্শ ও তাঁহার বাণীর প্রতি আস্থাবান হইবে কেন? কিন্তু যাহারা মুসলমান হওয়ার দাবীদার—যাহারা আল্লাহর উপর, কোরআনের উপর, আল্লাহর রসুলের উপর ঈমান রাখার দাবী করিয়া থাকে এবং “আশহাদু-আল্লা মোহাম্মাদার রসুলুল্লাহ” কলেমা পড়িয়া মোহাম্মদ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে সত্য রসুলরূপে গ্রহণ করিয়া লইয়াছে, তাহারা তাঁহার আদর্শ ও সূনাত তথা তাঁহার বাণী ও হাদীছকে অবজ্ঞা বা অস্বীকার করিতে পারে না।

হাদীছ তথা রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদর্শ ও বাণীরূপে যে জ্ঞান-ভাণ্ডার চৌদ্দশত বৎসর হইতে বিশ্বব্যাপী মোসলেম জাতির মধ্যে বিরাজ করিতেছে সেই অমূল্য রত্নকে নানা ছলে-বলে ও অপকৌশলে এনকার ও অস্বীকার করার ব্যর্থ চেষ্টা করা অযৌক্তিক বৈ নহে? মোসলেম জাতি যে যুগে উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত ছিল, যখন তাহাদের গুণ ও জ্ঞান বিশ্বজয়ী ছিল এবং যে যুগ ধর্মীয় বিষয়ে সর্বাধিক উজ্জ্বল যুগ ছিল সেই সোনালী যুগে এরূপ কোন উক্তির আভাষ কোথাও পাওয়া যায় নাই। ধর্মীয় আকর্ষণ ও জ্ঞান-মর্যাদার দুর্বলতম—বর্তমান যুগে ঐধরণের কোন উক্তি শুনা গেলে তাহা বড়ই আশ্চর্যজনক ও অসুতাপের যোগ্য হইবে এবং উহাকে মোসলেম সমাজের মধ্যে অবাস্তিত উদ্ভিদ ও সমাজ দেহে এক ব্যথিত গ্রাহর্ভাব বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কেত-খামার যখন শস্ত-শ্রামল না থাকে তখনই উহার মধ্যে অবাস্তিত আগাছাসমূহ আপনা-আপনিই মাথা চাড়া দিয়া উঠে এবং মানব দেহ যখন জীবনীশক্তি ও শোধিত রক্ত হারাইয়া ফেলে তখনই উহাতে খোস-পাঁচড়ার গ্রাহর্ভাব হইয়া থাকে।

আল্লাহ তায়ালা আ'লেমুল গায়েব—তিনি পূর্ব হইতে সব কিছু অবগত আছেন; তাঁহার পক্ষ হইতে জ্ঞাত হইয়া রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করতঃ এ সব অবাস্তিত মনোভাবের মুখোশ খুলিয়া দিয়া স্বীয় উন্নতকে সতর্ক করিয়া গিয়াছেন। যথা—

لَا يُؤْشِكُ رَجُلٌ شَيْعَانٌ عَلَىٰ أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَاحْلُوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَهَرِّمُوهُ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ أَلَّا لَا يَحِلَّ لَكُمْ الْخِمَارُ الْأَهْلِيَّ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ

مِنَ السَّبَاعِ.....

অর্থঃ—রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—হে মুসলমান! সতর্ক থাকিও; সেই যুগ দূরে নহে যেই যুগে এমন সব লোকের আবির্ভাব হইবে যাহারা গোপে তেল মাখিয়া

তোমাদের মধ্যে প্রচারণা চালাইবে যে—কোরআন শরীফের মধ্যে যতটুকু হালাল-হারাম উল্লেখ আছে, ততটুকুর উপরই আমল কর। (নবী (দঃ) বলেন—)

হুসিয়ার। আমি সতর্ক করিয়া যাইতেছি—তোমরা নিশ্চিতরূপে জানিয়া-বুঝিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখ যে—আল্লামার রসূল অর্থাৎ আমি যে বস্তুকে হারাম বলিয়া ঘোষণা করিব উহাও ঐরূপ হারামই গণ্য যাহার হারাম হওয়ার ঘোষণা কোরআন শরীফে আছে। (কোরআন আল্লামার বাণী এবং রসূল যাহা বলিবেন তাহাও স্বয়ং আল্লামার তরফ হইতেই অহী মারফৎ প্রাপ্ত। যেমন,) আমি ঘোষণা দিতেছি, গৃহ পালিত গাধা এবং হিংস্র জন্তু (খাওয়া) হারাম (আবু দাউদ শরীফ)। ঐরূপ ভবিষ্যদ্বাণী ও সতর্কবাণীর হাদীছ আরও অনেক আছে।

হুসিয়ার বিলুপ্তি বা কেয়ামত যতই নিকটবর্তী হইতেছে, আল্লাহ ও আল্লামার রসূলের ভবিষ্যদ্বাণী এক একটি করিয়া বাস্তবায়িত হইতেছে। তাই মোমেন-মোসলেম ব্যক্তি মাত্রই সর্বদা সতর্ক থাকিবে; যখনই ঐরূপ কোন ছলনাময়ী উক্তি শুনিবে যে—কোরআন শরীফে যাহা আছে তাহাই যথেষ্ট তাহাই মানিয়া চলিব; হাদীছ (নামে যেই জ্ঞান-ভাণ্ডার চৌদশত বৎসর হইতে প্রচলিত তাহা) মানিতে প্রস্তুত নহি ইত্যাদি, তখনই রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করতঃ ঐ প্ররোচনা হইতে দূরে থাকিবে।

কোরআন মানিয়া চলার ধূয়া তুলিয়া বা যুক্তির ভাওতা দিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর হাদীছ অস্বীকার করা বস্তুতঃ কোরআনের বিরোধিতা ও যুক্তির অবমাননাই বটে।

সংক্ষেপে কোরআন শরীফের কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত হইতেছে এবং সরল যুক্তির কয়েকটি ধারা বর্ণিত হইতেছে, যদ্বারা হাদীছ নামে প্রচলিত জ্ঞান-ভাণ্ডারের অপরিহার্যতা এবং নির্ভরশীলতা প্রমাণিত হইবে। সুখাগণ সূষ্ঠ পরিবেশে নির্মল মস্তিষ্কে চিন্তা করিবেন ইহাই আশা।

وما علينا الا البلاغ “আমাদের কর্তব্য—খাটা কথা পৌছাইয়া দেওয়া।”

হাদীছ কাহাকে বলে : রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যাহা বলিয়াছেন বা করিয়াছেন এবং যে বিষয়ের প্রতি তাঁহার সমর্থন পাওয়া গিয়াছে, উহাকে হাদীছ বলে।

হাদীছের মর্যাদা : হাদীছের মর্যাদা নির্ণয় করা আল্লামার রসূল বা পয়গাম্বরের মর্যাদা উপলব্ধি করার উপর নির্ভর করে। পয়গাম্বর কে হন? তাঁহার মর্তবা কত উর্দে? এসব প্রশ্ন এত জটিল যে, ইহা বুঝিতে সূষ্ঠ ও পবিত্র মস্তিষ্কের এবং গভীর ও প্রশস্ত জ্ঞানের প্রয়োজন।

রসূল বা নবীর মর্তবা : মানুষকে আল্লাহ তায়ালা এত কর্মক্ষমতা ও উন্নতির শক্তি দান করিয়াছেন যে, সেই শক্তি সৃষ্টিকর্তা আল্লামার তুলনায় সামান্য ও সীমাবদ্ধ হইলেও উহা এত ব্যাপক যে, উহাকে ব্যাপকতার দিক দিয়া পর্যাপ্ত বরং অসীম তুল্য বলিলেও অত্যাুক্তি হইবে না। সেই পর্যাপ্ত শক্তি বলে মানুষ বিরামহীন পরিশ্রমের দ্বারা উন্নতির চরম শিখরে পৌছিতে পারে, উচ্চ দরের বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক ও স্কন্দর্শী দার্শনিক হইতে পারে। এমনকি খাটা ও একনিষ্ট সাধনার সঙ্গে সঙ্গে যদি বিশ্বস্ততা—সারা জগতের আলো, জ্ঞান ও শক্তির মালিক আল্লাহ তায়ালা সহিত তাঁহার স্বেকর, তায়া’ত এবং স্মৃতি-ভক্তি ও আনুগত্যের দ্বারা দৃঢ় গোপনস্বত্ব স্থাপন করিয়া লওয়া যায় তবে মানুষ “বেলায়েতের” এবং মা’রেকাতের তথা আল্লামার ওলী হওয়ার মত বায় পৌছিতে পারে। আল্লামার ওলীর মর্তবা অনেক উর্দে। এই মা’রেকাত ও বেলায়েতের মধ্যেও আবার অনেকগুলি স্তর আছে। এক একটি স্তর অত্রটি হইতে এত উর্দে অবস্থিত যে, তাহা অমুভূতি ব্যতিরেকে শুধু ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ওলীর দর্জা হইতে বহু উর্দে শহীদ ও ছিদ্দিকের দর্জা। ওলী, শহীদ,

হিদ্দিক এসবের দর্জা বহু উর্দে হইলেও ইহা মানুষের সাধনার মাধ্যমে হাসিল হইয়া থাকে। এই সব মানুষের আয়তের বাহিরে নয়।

কিন্তু নবুওত্তেয় মর্তবা এত উর্দে যে, তাহা ওলী, শহীদ, হিদ্দিক সকলেরই নাগালের বাহিরে। কেহই সাধনার বলে নবুওত পাইতে পারে না। নবী একমাত্র আল্লার রহমতেই নবুওত পাইয়া থাকেন, সাধনার উহা অজিত হয় না; অবশ্য উহার জ্ঞা এবং উহা রক্ষণের জ্ঞা ও উহার হক আদায় করার জ্ঞা বিরামহীনরূপে সর্বাধিক কঠোর সাধনার প্রয়োজন হয়।

নবী ও রসুলের জ্ঞান সর্ব উর্দে : বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ওলী ও নবীগণের দর্জা ও মর্তবার ব্যবধান অনুযায়ী তাঁহাদের জ্ঞানের মধ্যেও ব্যবধান আছে। বৈজ্ঞানিক দার্শনিকদের জ্ঞান হইতেছে শুধু কল্পনা ও যুক্তির জ্ঞান; সেই জ্ঞানই উহাতে সত্যতা থাকিলেও সঙ্গে সঙ্গে বহু ভুল এবং অসত্যও থাকিয়া যায়। ওলীদের জ্ঞান তার চেয়ে উর্দে; কারণ তাঁহাদের জ্ঞান কল্পনা ও যুক্তির জ্ঞান নহে, বরং সমস্ত জ্ঞানের আকসের জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে আহরিত জ্ঞান। কিন্তু তাঁহাদের সেই জ্ঞান অহরণের পথ পূর্ণ পরিষ্কার পরিপক্ব ও সুরক্ষিত নয়, তাই তাঁহাদের জ্ঞানের মধ্যেও অতিক্রম ব্যতিক্রম হইতে পারে। কিন্তু নবীদের জ্ঞান আল্লার নিকট হইতে সরাসরি প্রাপ্ত অহীর জ্ঞান—উহাতে কোন দিক দিয়াই সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকে না।

হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর জ্ঞান সর্ব উর্দে : নবীদের মধ্যেও বিভিন্ন মর্তবা বিद्यমান আছে : স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—**تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ**—“আমি রসুলগণের মধ্যে একজনকে অপরজনের উপর বিশেষ মর্যাদা দান করিয়াছি।” সর্ব উর্দে হইলেন আমাদের নবী মোহাম্মদ মোস্তফা ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম। তাঁহার সমক্ষে আল্লাহ তায়ালাই এই সাক্ষ্য দিতেছেন—**وَمَا يَشْطَرُ عَنِ الْهُوَىٰ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ**—অর্থাৎ মোহাম্মদ (দঃ) একটি কথাও নিজের তরফ হইতে বা কল্পনা হইতে বলেন না; আমি যাহা বলিয়া দেই টিক অবিকল তাহাই তিনি বলেন। এই বিষয়টি মওলানা রুমী (রঃ) এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—

گفتند او گفتند الله بود گرچه از حلقوم عند الله بود

“আল্লাহ তায়ালায় বক্তব্যই ঠিক ঠিক অবিকলরূপে রসুলের কণ্ঠে প্রকাশ পাইয়া থাকে।”

সর্বশক্তিমান মহাপরাক্রমশালী জলীল ও জব্বার আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন—

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ.....

অর্থাৎ যদি সে (মোহাম্মদ(দঃ)) কোন একটি কথাও নিজের তরফ হইতে বানাইয়া বলিত তবে আমার সর্বগ্রাসী হস্তে তাহাকে ধরিয়া যখন তখন তাহার হৃদয়তন্ত্রীকে ছিঁড়িয়া দিতাম।

অহীর পরিপক্কতা : নবীদের জ্ঞান-প্রাপ্তির সূত্র ও পথ হইল অহী। অহীবাহক হইলেন জিব্রাইল ফেরেশতা, যিনি আল্লাহ তায়ালায় অসংখ্য—কোটি কোটি ফেরেশতাদের সর্বপ্রধান চারিজনদের মধ্যে প্রধানতম। সমূহ কুপ্রবৃত্তি ও অপকর্মের ইচ্ছাশক্তি হইতে পূর্ণ পবিত্ররূপে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তা ছাড়া জিব্রাইল (আঃ) “আমীন” অর্থাৎ আল্লার আমানত বাহক বলিয়া পরিচিত। ফেরেশতাদের শক্তি সামর্থ্যও কল্পনাতীত; বিশেষতঃ হযরত জিব্রাইলের শক্তি। এতদসঙ্গেও যখন জিব্রাইল ফেরেশতা আল্লার তরফ হইতে রসুলুল্লাহ প্রতি অহী বহন করিয়া আনিতেন তখন বাহ্যিক বা স্থূল সতর্কতা ও রক্ষাবেষকণের ব্যবস্থা কিরূপ হইত তাহা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বর্ণনা করিয়াছেন—

فَإِنَّكَ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ
رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا

অর্থাৎ অহী এত সুরক্ষিতরূপে এত স্বন্দোবস্তের সহিত আসে যে, আল্লাহ তায়ালা বহু সংখ্যক ফেরেশতা প্রহরীর দ্বারা আত্মোপাস্ত পাহারা নিযুক্ত করিয়া রাখেন,† (বাহ্যতে আল্লাহ প্রেরিত বিষয়বস্তুর মধ্যে শরতান বা নফসের বিন্দুমাত্র দখল আসিতে না পারে, বিন্দুমাত্র করুনা বা ভুল, মিথ্যা ও ব্যতিক্রম-অতিক্রমের লেশমাত্র তার সঙ্গে মিশ্রিত হইতে না পারে। এইরূপে সূচু রক্ষণাবেক্ষণের সহিত অহী প্রেরণের ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালা করেন) বদ্বারা জগদ্বাসীকে প্রমাণ করাইয়া দিতে পারেন যে—আল্লাহ বাণী, আল্লাহ অহী তাহারা (অহী বাহকগণ) অবিকল ঠিক ঠিকরূপে পৌছাইয়াছেন, বিন্দুমাত্র পরিবর্তন বা পরিবর্দ্ধন উহাতে হয় নাই বা উহাতে মানুষের রচনার ও করুনার লেশমাত্র নাই।

এখন চিন্তা করিয়া দেখুন অহী কত সুরক্ষিত বস্তু। ইহাই হইতেছে নবীগণের আহবিত জ্ঞানের একমাত্র পথ ও সূত্র। তাই নবীর জ্ঞান, নবীর বাণী, নবীর সমস্ত কথাবার্তা এবং কার্যকলাপ খাঁটি ও সত্যের প্রতীক। উহাতে অর্থাৎ ও অসত্যের বিন্দুমাত্র অবকাশ আসিতেই পারে না। কারণ নবী স্বয়ং নিষ্পাপ, তাহার প্রতিটি বাণী এবং প্রতিটি কার্য ও জ্ঞানের উৎস আল্লাহ তায়ালা। প্রতিটি বিষয়বস্তু আল্লাহ নিকট হইতে রসুলের নিকট পৌছিবীর একমাত্র সূত্র অহী; তাই এক্ষেত্রে খাঁটি ও অসত্যের সম্ভাবনার কোন ছিটপথই কোথাও নাই।

কোরআন ও হাদীছের মধ্যে পার্থক্য : এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, রসুলের হাদীছও যদি অহীর মারফৎ আল্লাহ তরফ হইতে হইয়া থাকে তবে কোরআন ও হাদীছের মধ্যে পার্থক্য থাকে না।

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে—প্রকৃত প্রস্তাবে কোরআন ও হাদীছে পার্থক্য নাই বলা যাইতে পারে এই অর্থে যে, উভয়ই আল্লাহ তায়ালা নিকট হইতে অহী মারফৎ নবীকে দান করা হইয়াছে। পার্থক্য শুধু এই যে—কোরআনের অর্থ ও ভাবা (Text) উভয়ই অক্ষরে অক্ষরে অহী মারফৎ আল্লাহ তরফ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং জিব্রাঈল কর্তৃক পঠিত হইয়াছে, তাই কোরআনের আয়াত ও বাক্য নামায়ে তেলাওয়াত করা হয় এবং ইহাকে “অহী মতলু” ও আল্লাহ কলাম বলা হয়। হাদীছের অর্থ ও বিষয়বস্তু আল্লাহ তরফ হইতে অহী মারফৎ প্রাপ্ত বটে, কিন্তু উহার শব্দ ও বাক্য রসুলের রচিত। কোরআন-হাদীছের আসল উৎস একই। তাই কোরআন আল্লাহ বাণী যেমন নিতুল, হাদীছও তদ্রূপ নিতুল। ইহাতে সন্দেহ নাই।

অবশ্য বাহারা রসুলের সেই বাণী বহন করিয়া আনিয়াছে তাহাদের মধ্যে পরবর্তী যুগীয় কোন বহনকারীর দ্বারা কৃত্রিম বা মিথ্যা রচনার সন্দেহ থাকিতে পারে বটে। সেই জন্যই হাদীছবিশারদ

† আল্লাহ সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ; তাহার জ্ঞান কোন কিছু ব্যবহারই আবশ্যক হয় না। কিন্তু মানুষ স্থলজগতে বাস করে; তাহাদের দৃষ্টি বাহ্যিক ও স্থল ব্যবস্থাদির প্রতিই ধাবিত ও নিযুক্ত হইয়া থাকে। এই জন্য জগদ্বাসীর ভাবধারা ও ভঙ্গিমার পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তায়ালা এসব ব্যবস্থা করিয়া থাকেন এবং উহা তাহাদেরই রুচিসম্মত বলিয়া প্রকাশও করিয়া দেন। নতুবা স্বয়ং কাদেরে মোত্লাক, আহকামুল-হাকেমীন আল্লাহ এ সবার প্রভাঙ্গী মোটেই নহেন।

মোহাম্মদছগণ কাল ও কৃত্রিম সন্দেহের হাদীছগুলি বাছিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন এবং সত্য ও শুদ্ধ হাদীছসমূহ গ্রহণ করিয়াছেন।

রসুলের পায়ের তথা হাদীছের অনুসরণ অপরিহার্য প্রমাণে পবিত্র কোরআন :

কোরআন শরীফের অসংখ্য আয়াত দ্বারা এই বিষয়টি প্রমাণিত। কতিপয় আয়াত এই—

(১) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থ :—হে মোসলমান জাতি। রসুলুল্লাহর জীবনের মধ্যে—তাঁহার প্রতিটি কথা ও কাজের মধ্যে তোমাদের জন্য সুন্দর নমুনা ও আদর্শ নিহিত রহিয়াছে ;

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তায়ালা মানবকে বহু আদেশ-নিষেধের বেঠেনীর মধ্যে তাহার উপর এই গুরুদায়িত্ব চাপাইয়া দিয়াছেন যে, সে যেন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালাকে সর্বদা সজ্জট ও রাখী রাখিয়া জীবন-যাপন করে। মানব বাহাতে এই গুরুদায়িত্ব স্ফূর্তরূপে পালন করিতে পারে সে জন্য আল্লাহ তায়ালা বহু ব্যবস্থাই করিয়াছেন। এমনকি নমুনাও পাঠাইয়াছেন যে, তোমরা এই নমুনার তৈরী ও গঠিত হও তবেই আমার সজ্জটি লাভ করিবে। ইহা শ্রব সত্য যে—করমাইশ দাতার নমুনাকে উপেক্ষা করিলে তাহাকে সজ্জট করা দূরের কথা উপেক্ষাকারী অমাজ'নীয, দোষী ও শাস্তির উপযুক্ত হইবে। শেষ যুগে আল্লাহ সেই মনোনীত নমুনা হইলেন মোহাম্মদ মোস্তফা (দ:) এবং যেরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা কোন যুগ, কাল বা দেশ ও জাতির জন্য সীমাবদ্ধ নহেন, তদ্রূপ মোহাম্মদ মোস্তফা (দ:)ও কাল, যুগ, দেশ ও জাতি নিবিশেষে কেয়ামত পর্যন্ত সকলের জন্যই আল্লাহ মনোনীত নমুনা।

মানুষ আল্লাহ তায়ালাকে সজ্জটি লাভ করিতে চাহিলে তাহাকে ব্যক্তিগত জীবনে ও সামাজিক জীবনে এবং জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে আল্লাহ-প্রদত্ত নমুনা তথা রসুলের আদর্শে স্বীয় জীবনকে গঠন ও পরিচালিত করিতে হইবে—যাহা একমাত্র হাদীছের মাধ্যমেই পাওয়া যাইতে পারে। হাদীছ-ভাণ্ডার গৃহীত না হইলে আয়াতের মর্ম বুঝা প্রতিপন্ন হইবে।

(২) أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

অর্থ—তোমরা আল্লাহর আদেশ পালন কর এবং রসুলের আদেশ পালন কর।

কোরআনের বহু আয়াতেই আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁহার আদেশাবলীর অনুসরণের তাকিদ দেওয়া হইয়াছে এবং প্রত্যেক স্থানেই ঐ সঙ্গে রসুলুল্লাহর আনুগত্য ও অনুসরণের উপর সমপরিমাণ জোর দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং মানব কল্যাণের জন্য উভয়টি একই পর্যায়ভুক্ত।

(৩) وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

অর্থ—যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের আনুগত্য ও অনুসরণ অবলম্বন করিবে সে-ই অতি মহান কামিয়াবি ও সাফল্যের অধিকারী হইবে।

اطاعت এতাবাত অর্থ অনুসরণ করা ; এই একটি শব্দই আল্লাহ ও আল্লাহর রসুল উভয়ের সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব যেমন আল্লাহ এতাবাতের অর্থ কোরআনের অনুসরণ এবং উহা কেয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেকের কর্তব্য, তেমনি রসুলের এতাবাতের অর্থ হাদীছের অনুসরণ এবং ইহাও কেয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

(৪) قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

অর্থ—হে মোহাম্মদ (দ:)। আপনি আমার পক্ষ হইতে স্পষ্ট ঘোষণা ও নাইয়া দিন যে—হে মানব! তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাসার (ও তাঁহাকে সন্তুষ্ট করার সচেতন বলিয়া) দাবী করিতে চাও, তবে তোমরা আমার অনুসরণ করিয়া চল, তাহা হইলে (তোমরা আশাতীত সাফল্য অর্জন করিতে পারিবে যে—) স্বয়ং আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন।

স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হইতেছে যে—আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টিভাজন হওয়া রসুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অনুসরণ ও অনুকরণের উপর সম্যকরূপে নির্ভর করে।

(১) وَمَا اَنَّا كُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

অর্থ—রসুল্লাহ (দ:) তোমাদিগকে বাহা আদেশরূপে দান করিয়াছেন তাহা পূর্ণরূপে মানিয়া ও গ্রহণ করিয়া লও এবং বাহা নিষেধ করিয়াছেন উহা হইতে বিরত থাক।

(৬) وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ

অর্থ—হে মোহাম্মদ (দ:)। আমি আপনাকে সমস্ত জগৎবাসীর জন্য শান্তিবাহকরূপে পাঠাইয়াছি। (আপনার অনুসরণ ও অনুকরণে জগৎবাসী প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে পারিবে।)

(৭) وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَاٰثَةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا

“আমি আপনাকে সমগ্র মানবের জন্য সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রসুলরূপে পাঠাইয়াছি।”

হাদীছের অপরিহার্যতার যুক্তি : (১) মোসলমান মাত্রই রসুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি ঈমান আনিতে হইবে, ইহা অবধারিত। এই ঈমানের তাৎপর্য কি শুধু এতটুকু বিশ্বাস ও স্বীকারোক্তি যে, তিনি একজন নবী ও রসুল ছিলেন? ইহা কখনও হইতে পারে না, কারণ এই বিশ্বাস ও হযরত আদম (আ:) হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবীর প্রতিই স্থাপন করা ইসলামের একটি মৌলিক বিষয় ও অপরিহার্য অঙ্গ; ইহা ব্যতীত কোন ব্যক্তিই মোসলমান হইতে পারে না। তবে মোহাম্মদ মোস্তফা (দ:)—এর বিশেষত্ব কি রহিল? যে কারণে الله رسول محمد ان شهد ان محمد رسول الله ওয়াহিদ الله মোস্তফা ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কালেমা ইসলামের রোকন বা স্তম্ভ পরিগণিত, অথচ الله رسول الله و عيسى رسول الله সেই যথ্যাদা দান করা হয় নাই। তাছাড়া ইসলামের মৌলিক আকিদারূপে এবং কোরআনের অকাটা আয়াতসমূহের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, মোহাম্মদ (দ:) খ্যায় যুগ হইতে কেয়ামত পর্যন্ত—স্থান, কাল ও জাতি নির্বিশেষে বিশ্বমানবের জন্য রসুল ও নবী; পূর্ববর্তী নবীগণ এরূপ নহেন; এই পার্থক্যের তাৎপর্য ও বিশ্লেষণ কি হইবে?

এই সমস্ত বিষয়ের মূলে একটিমাত্র তথ্য রহিয়াছে যে—মোহাম্মদ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পূর্ণ এতাবাত এস্তেবা—অনুকরণ ও অনুসরণ কেয়ামত পর্যন্ত আমাদের প্রত্যেক নাজাতকামীর জন্য অবশ্য কর্তব্য—বর্তমানে পূর্ববর্তী নবীগণের মোটামুটি সমর্থ যে, তাঁহারা আল্লাহর খাটী পরগাশ্বর ছিলেন, এতটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বেলায় শুধু এতটুকু যথেষ্ট নহে, বরং তাঁহার আদেশসমূহকে মানিয়া ও গ্রহণ করিয়া উহাকে জীবনের প্রতিটি স্তরে প্রতিকলিত করার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে হইবে। আর ইহা স্পষ্টতঃ, হাদীছ-ভাণ্ডার গ্রহণ ব্যতিরেকে এই অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন সম্ভব নহে।

(২) শরীয়ত বলিতে যাহা কিছু বুঝায় তাহা কোরআনের মধ্যে মূলনীতিরূপে বর্ণিত আছে বটে, কিন্তু এসব মূলনীতিসমূহকে কার্যে পরিণত করা এবং একটি আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্ত যে সব কর্মপদ্ধতি, কার্যধারা, নিয়ম-কানুন ইত্যাদি বিষয় জ্ঞাত হওয়া আবশ্যিক এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ রসুলের হাদীছের মধ্যেই পাওয়া যাইতে পারে। যেমন কোরআন শরীফে নামাযের উল্লেখ আছে **اقموا الصلوة** “নামায আদায় কর।” কিন্তু নামায কত ওয়াক্ত, কোন্ কোন্ সময় কি কি পদ্ধতিতে আদায় করিতে হইবে, উহার শুদ্ধ-অশুদ্ধতার বিধি-বিধান কি কি এবং আল্লাহ নির্দেশিত নামায কি আকারের হইবে তাহা রসুলের বর্ণনা হাদীছেই পূর্ণরূপে জানা যাইতে পারে। তজ্জপ কোরআন শরীকে আকারের হইবে তাহা রসুলের বর্ণনা হাদীছেই পূর্ণরূপে জানা যাইতে পারে। তজ্জপ কোরআন শরীকে আছে—**واتوا الزكوة** “যাকাত দান কর” কিন্তু কি পরিমাণ মালে কি পরিমাণ দিতে হইবে? কত দিন পর পর দিতে হইবে? তাহা একমাত্র রসুলের বর্ণনা হাদীছের মাধ্যমেই জানা যায়। এইরূপে হজ্জ ইত্যাদি ইসলামের হুকুম-আহকাম কোরআন শরীফে শুধুমাত্র মূলতঃ উল্লেখ হইয়াছে। এরূপ বিস্তারিত বিবরণ সেখানে দেওয়া হয় নাই যাহা কার্যক্ষেত্রে যথেষ্ট হইতে পারে। বস্তুতঃ কোরআন শরীফে বিস্তারিত ব্যাখ্যা থাকার আবশ্যকও ছিল না, কারণ নমুনা ও ব্যাখ্যাকারী রসুল সঙ্গে সঙ্গেই প্রেরিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত শাহী করমান ও মৌলিক বিষয় সংক্রিষ্টই হইয়া থাকে। এই জন্তই বলা হইয়া থাকে যে, হাদীছ-কোরআন হইতে ভিন্ন বস্তু নহে, বরং কোরআনেরই ব্যাখ্যা। যেমন কোরআন শরীফে ঈমানের বর্ণনা করা হইয়াছে, নবী ছালামাহ আলাইহে অসালাম উহার আরও বিস্তারিত বিবরণ দান করিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী হাদীছ বিশারদগণ ১০, ২০, ৫০, ১০০ পৃষ্ঠাব্যাপী এই সমস্ত হাদীছ একত্রে সংগ্রহ করিয়াছেন এবং “ঈমানের অধ্যায়” নামে নাম দিয়াছেন। এইরূপে কোরআন শরীফে অতি সংক্ষেপে নামাযের উল্লেখ হইয়াছে, রসুলুলাহ ছালামাহ আলাইহে অসালাম উহার কর্মপদ্ধতি এবং কার্যবিধির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। এসব হাদীছকে একত্রে সংগ্রহ করিয়া “নামাযের অধ্যায়” নাম দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে অজুর অধ্যায়, গোছলের অধ্যায়, যাকাতের অধ্যায়, রোযার অধ্যায়, হজ্জের অধ্যায়, বিবাহের অধ্যায়, তালাকের অধ্যায়, ব্যবসা-বাণিজ্যের অধ্যায়, জেহাদের অধ্যায় ইত্যাদি ইত্যাদি বহু অধ্যায় হাদীছের কিতাবে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্তের প্রত্যেকটিরই মূলবস্তু কোরআন শরীফে উল্লেখ আছে, উহারই কার্যপদ্ধতি ও বিস্তারিত বিবরণ হাদীছের দ্বারা দেখান হইয়াছে। বোধারী (র:) এই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিতের উদ্দেশ্যেই প্রত্যেকটি অধ্যায়ের প্রারম্ভে এই বিষয় সম্বলিত কোরআনের আয়াত উদ্ধৃত করিয়া পরে তৎসম্বন্ধীয় হাদীছসমূহ উল্লেখ করিয়াছেন।

অধিকন্তু কোরআনের মধ্যে শত শত আয়াত এরূপ আছে যে, শুধু আমাদের উপর উহাদের মর্ম গ্রহণের ভার ছাড়িয়া দিলে সঠিকভাবে উহার উদ্দেশ্য আমাদের বোধগম্য হইত না, বরং শরীয়তের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে আমরা নিশ্চয় ভুল করিতাম। যেমন—কোরআন শরীকে আছে—**لا تعزوا النساء في المحيض** “ঋতুবর্তী স্ত্রী হইতে দূরে থাকা” নিছক এই আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা ইহার অর্থ এই বুঝিতাম যে, স্ত্রীদিগকে এই সময় সর্বপ্রকার দূরে রাখ—তাহাদের সঙ্গে আহার, নিদ্রা, উঠা-বসা কিছুই করিও না। অথচ ইসলামের বিধান ও শরীয়তের নির্দেশ এইরূপ নহে, বরং ইহা ইসলাম বিরোধী ইহুদীদের রীতি। ইহার সঠিক তত্ত্ব একমাত্র রসুলের দ্বারাই পাওয়া যাইতে পারে। তিনি উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা বলিয়াছেন—**افلوكل شئى الا الحيض** “সহবাস ছাড়া আহার-নিদ্রা, উঠা-বসা ইত্যাদি সবই ঋতুবর্তী স্ত্রীর সহিত করিতে পারে।” ইহাই শরীয়তের সঠিক বিধান। কিন্তু বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের প্রতি ইঙ্গিত করতঃ উক্ত আয়াতের শব্দগুলি ব্যাপক আকারে ব্যবহৃত হইয়াছে। কোরআনের এরূপ ব্যাখ্যা একমাত্র রসুলুলাহ ছালামাহ আলাইহে অসালামের বর্ণনার সাহায্যেই পাওয়া যাইতে পারে; তাছাড়া অন্য কাহারও

এরূপ ব্যাখ্যা দিবার অধিকার নাই। আরও দেখুন, কোরআন শরীফে আছে—

ان الذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله...

“যাহারাই স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করিয়া রাখিবে, উহাকে আল্লাহ রাস্তার খরচ না করিবে তাহাদের ভীষণ আত্মাব ভোগ করিতে হইবে।” এই আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে—কেহই স্বর্ণ-রৌপ্য জমা রাখিতে পারিবে না, প্রয়োজনাবশিষ্ট দান করিবে। অথচ ইসলামের বিধান এরূপ নহে। এই আয়াতের বাস্তব উদ্দেশ্য হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ব্যাখ্যা দ্বারাই সাব্যস্ত হইতে পারে। তাহার হাদীছে প্রমাণিত আছে, “ما أدى زكوتك فليس بكنز” “যে খনের থাকাত দেওয়া হয় উহা উক্ত আয়াতের আওতাভুক্ত নহে।”

এই ব্যাখ্যা ছাড়া কোরআনের উদ্দেশ্য বুঝা সম্ভবই নহে এবং এই ব্যাখ্যা একমাত্র রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্ণনা দ্বারাই সম্ভব, অতঃকোন উপায়ে নহে। এই জ্ঞানই হাদীছকে কোরআনের ব্যাখ্যা বলা হয়; এই ব্যাখ্যার অপরিহার্যতা কেরামত পর্যন্ত থাকিবে।

আলোচ্য বিষয়ের আরও একটি সরল প্রমাণ এই যে, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা হযরত রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কয়েকটি গুণ ও করণীয় কার্য প্রকাশ করতঃ বলেন—

يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة -

“আল্লাহ তায়ালা আরববাসীদের মধ্য হইতে এমন একজন রসূল পাঠাইয়াছেন যিনি তাহাদিগকে আল্লাহ (কালামের) আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনাইবেন, তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন, তাহাদিগকে আল্লাহর কিতাব—কোরআন এবং হেকমত তথা শরীয়ত শিক্ষা দান করিবেন।” এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার একটি বিষয় এই যে, আরবী ভাষায় সুবিজ্ঞ সেকালের আরববাসীগণের নিকট আরবী ভাষায় কোরআনের আয়াত (يتلو عليهم) পাঠ করিয়া শুনাইবার পর (الكتاب) এই কোরআনের শিক্ষাদান করার তাৎপর্য কি? আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর তায় ব্যক্তিদের সম্মুখে পবিত্র কোরআনের যে শিক্ষা ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল কেরামত পর্যন্ত আমাদের তায় মোসলমগণের জ্ঞান সেই শিক্ষা ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন কোন্ বস্তুর দ্বারা মিটিয়া যাইবে।

আলোচ্য আয়াতে আরও একটি তথ্যমূলক বিষয় রহিয়াছে—উহা এই যে, এখানে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা হযরত রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কার্যক্রমরূপে চারিটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন—(১) আল্লাহর কিতাব—পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ জগৎবাসীকে পাঠ করিয়া শুনান। (২) মানব জাতিকে পবিত্র করা। (৩) তাহাদিগকে আল্লাহর কিতাব—পবিত্র কোরআনের শিক্ষা দান করা। (৪) এবং হেকমত শিক্ষা দান করা। রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই চারিটি কার্যক্রম কোরআন শরীফের বহু আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব ইহা অতিস্পষ্ট যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) মানব জাতির জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ হইতে আল্লাহর কিতাব—পবিত্র কোরআন ভিন্ন আরও একটি জিনিস বিতরণ ও শিক্ষাদান করিয়া গিয়াছেন যাহাকে ‘হেকমত’ বলা হইয়াছে।

অতঃপর বিশ্বভাণ্ডারে তল্লাশী চালাইলে দেখা যাইবে যে, মানব জাতি রসূলুল্লাহ (সঃ) হইতে আল্লাহর কিতাব ভিন্ন আরও যাহা লাভ করিয়াছে তাহা হইল একমাত্র সুন্নাহ, যাহাকে হাদীছ বলা হইয়া থাকে। প্রায় ১৩০০ বৎসর পূর্বে সঙ্কলিত এবং আজ পর্যন্ত বিশ্ব মোসলেম কতৃক গৃহীত ও সমর্থিত ইমাম মালেক মদনীর ‘মোয়াত্তা’ নামক কিতাবে হযরত রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি বাণী এইরূপে লিপিবদ্ধ আছে যে—

تركت فيكم اربعين لئلا تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله

রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়া গিয়াছেন, “আমি তোমাদের নিকট দুইটি মহান বস্তু রাখিয়া যাইতেছি, সেই বস্তুদ্বয়কে যাবৎ তোমরা আঁকড়াইয়া থাকিবে তাবৎ কখনও পথভ্রষ্ট হইবে না—(১) আল্লামার কিতাব ও (২) আল্লামার রসুলের স্মৃতি।”

হাদীছের অপরিসংখ্যতা বর্ণনার পর এখন আমরা দেখাইতে চাই যে, এই অপরিসংখ্য জ্ঞান-ভাণ্ডার—হাদীছ-রসূল (দঃ) সর্ববাদী সম্মত প্রমাণের বিধানেই নির্ভরশীলরূপে বিদ্যমান আছে।

হাদীছ প্রমাণিত হওয়ার যুক্তি-যুক্ত সূত্র : দুনিয়াতে কোন ঘটনা ঘটয়া যাওয়ার পর বা কোন কথা ব্যক্ত হওয়ার পর পরবর্তী কালে প্রয়োজন ক্ষেত্রে এই ঘটনা বা কথা প্রমাণিত হইবার জ্ঞান-কাহুন, বিধি-বিধান ও যুক্তি-জ্ঞান অনুসারে কি কি সূত্র আছে যদ্বারা উহা তর্কাতীত, নির্ভরশীল ও বিশ্বাসযোগ্যরূপে প্রমাণিত হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বের যুক্তিবাদী, জ্ঞানী ও আইনজ্ঞগণ এক বাক্যে ইহাই বলিবেন যে, এরূপ ঘটনা বা কথার প্রমাণের জ্ঞান একমাত্র সূত্র হইল সাক্ষ্য; এবং সাক্ষ্য দুই প্রকারের হইতে পারে। এক প্রকার প্রত্যক্ষদর্শী বা প্রত্যক্ষ শ্রোতার মৌখিক সাক্ষ্য, দ্বিতীয় প্রকার তাহাদের লিখিত সাক্ষ্য। ইহাতে বিমতের কোন অবকাশ নাই যে, উভয় প্রকারের সাক্ষ্যই সর্বক্ষেত্রে অবলম্বিত ও গৃহীত হইয়া থাকে। মৌখিক সাক্ষ্য লিখিত সাক্ষ্য হইতে কোন দিক দিয়াই কম নহে, বরং আইন-আদালতে মৌখিক সাক্ষ্যই অগ্রগণ্য। কোন সাক্ষী স্বীয় সাক্ষ্য লিখিয়া আদালতে পঠাইলে মৌখিক সাক্ষ্যের স্থান উহা সরাসরি গ্রহণীয় হয় না। অধিকন্তু লিখিত সাক্ষ্যও মৌখিক সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল, কারণ লেখকের মৃত্যুর পর উহা লেখকের অলিখিত হওয়া প্রমাণিত হওয়ার জ্ঞান মৌখিক সাক্ষ্যই একমাত্র পথ।

বিশ্বের বিরাট জ্ঞান-ভাণ্ডার ইতিহাস-শাস্ত্র, মৌখিক সাক্ষ্যের উপরই রচিত হইয়াছে। মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হইলে বিশ্বের সব কিছুই অচল হইয়া পড়িবে। এমনকি বংশ পরিচয়—মাতাপিতার পরিচয় ইত্যাদি মৌখিক সাক্ষ্যের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। মৌখিক সাক্ষ্যের দ্বারা মানুষের জীবন মরণ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ পর্য্যন্ত প্রমাণিত হইয়া থাকে। রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবিত কালেও তাঁহার হাদীছসমূহ মৌখিক সাক্ষ্যের দ্বারা গ্রহণ করা হইত। হযরত রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাজার হাজার ছাহাবী ছিলেন, তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে বসবাস করিতেন এবং নানা দেশ-বিশেষে বাতারাৎ করিতেন। সুতরাং তাঁহার প্রত্যেকটি হাদীছকে প্রত্যেকটি লোকের গঞ্জে প্রত্যেকভাবে গ্রহণ করার সুযোগ হওয়া সম্ভব ছিল কি? তিনি বিভিন্ন দেশে স্বীয় মোবাহলেগ (প্রচারক) পাঠাইতেন, প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতেন; তাঁহারা তাঁহার বাণী-সমূহ প্রচার করিয়া থাকিতেন এবং এরূপে সেই সকল মৌখিক সাক্ষ্যের উপরই সমস্ত জগতে ইসলাম প্রসার লাভ করিয়াছিল; সুতরাং মৌখিক সাক্ষ্যের নির্ভরশীলতা অতি সুস্পষ্ট। হযরত রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাজার হাজার বাণীর মধ্যে বড় ছোট প্রত্যেকটি বাণীই রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের পর্য্যন্ত পরস্পর এই মৌখিক সাক্ষ্যসমূহের দ্বারা প্রমাণিত আছে।

হাদীছের সনদ কি? হাদীছ প্রমাণিত করিতে সূত্র পরস্পরা মৌখিক সাক্ষ্যসমূহের তালিকাভেই ইসলামী পরিভাষায় “সনদ” বলা হয় এবং প্রত্যেক সাক্ষীকে “রাবী” বলা হয়। রাবী শুধু সাক্ষ্য দিয়াই চলিয়া যান নাই বরং রীতিমত শিক্ষা দান করিয়াছেন এবং শ্রোতাগণ শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তাই সাক্ষ্যদাতা ও শ্রোতা এবং শ্রোতা শাগেদ পরিগণিত হইয়াছেন। যে কোন মহামনীষী কর্তৃক

হাদীছ বলিয়া বর্ণিত কোনও শাক্ষকে সনদ ব্যতিরেকে রসুলুমার (দঃ) হাদীছ বলিয়া ইসলাম কাম্বিন-কালেও অনুমোদন করে নাই। একটি শব্দ সম্বন্ধেও হাদীছ বলিয়া দাবী করিলে সেখানে সনদ বা সাক্ষ্যের বিবরণ দিতে হইবেই। তাই ইহা সুস্পষ্ট যে, প্রতিটি হাদীছই সর্ববাদী সম্মত নীতি ও যুক্তি অনুযায়ী তথা সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত আছে।

হাদীছের সনদ তথা সাক্ষ্যের নির্ভরশীলতা ও পরিপক্বতা :

যে কোন সাক্ষ্যের মধ্যেই মিথ্যা প্রবন্ধনার সম্ভাবনা থাকা একটি স্বাভাবিক বিষয়। মৌখিক সাক্ষ্যের তুসনায় লিখিত সাক্ষ্যের মধ্যে এই সম্ভাবনার অবকাশ কোনও অংশে কম নহে। মৌখিক কাহারও প্রতি মিথ্যারূপে কোন বিষয়ের বা কথার সম্পর্ক আরোপ করা অপেক্ষা লিখিত ভাবে উহা করা কোনও কঠিন ব্যাপার নহে। তদুপরি অনিচ্ছাকৃত ভাবে লেখার মধ্যে ভুল হওয়া বা লিখিত বস্তু পর্যায়ক্রমে নকল হইয়া আসার মধ্যে পরিবর্তন ঘটয়া যাওয়া নিত্যকালই সহজ স্বাভাবিক। যাহা হউক লিখিত বা মৌখিক উভয় প্রকার সাক্ষ্যের মধ্যেই অসত্যের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও ছুনিয়াতে সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর নির্ভর না করিয়া গত্যন্তর নাই, অত্থায় সারা জগৎ অচল হইয়া পড়িবে। অবশ্য মিথ্যা সাক্ষ্য এড়াইবার জন্য সর্বক্ষেত্রেই সাক্ষ্যদাতার প্রতি নানা বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়।

সনদের সত্যতা : হাদীছের সাক্ষ্য অর্থাৎ “সনদ” গ্রহণীয় হওয়ার জন্য মোহাদেছ—হাদীছ-বিশারদগণ বহুমুখী শর্ত-শরায়ত ও অতি কড়াকড়ি আরোপ করিয়া যে সমস্ত নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করিয়াছেন উহা অত্যন্ত একেবারেই বিরল। এমনকি বিশেষ উহার নজীর কেহই কোথাও দেখাইতে পারিবে না। এই সমস্ত কড়াকড়ি দৃষ্টে বিশ্ববাসীকে একরূপ চ্যালেঞ্জ প্রদান করা যাইতে পারে যে, হাদীছের প্রামাণিকতার মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহেরও অবকাশ নাই।

এ সমস্ত নিয়ম-কানুন লিপিবদ্ধ করিয়া “উমুলে-হাদীছ” বা হাদীছের প্রামাণিকতা পরীক্ষা করার নিয়ম-কানুন নামে একটি বিশেষ শাস্ত্র সঙ্কলন করা হইয়াছে এবং এই শাস্ত্রে বহু কিতাব লেখা আছে। নিম্নে এই সকল নিয়ম-কানুনের কতিপয় ধারা ও উপধারা উদ্ধৃত হইল :—

হাদীছরূপে গ্রহণীয় হইবার জন্য সাধারণতঃ উহার সনদে চারিটি প্রধান বিষয়ের প্রতি সর্ধ-প্রথমে নজর দিতে হইবে। যথা—(১) শত শত বা হাজার হাজার বৎসর পরেই হউক না কেন, নবী (দঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত সূত্র-পরম্পরায় পর্য্যায়ক্রমে যতজন সাক্ষীর মাধ্যমে হাদীছখানা পৌছিয়াছে, এক এক করিয়া সমস্ত সাক্ষীর পরিচিত নামের তালিকা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করিতে হইবে, কোন একজনের নামও বাদ না পড়ে, নতুবা হাদীছ গ্রহণীয় হইবে না। (২) এই ধারাটির সহিত আবার ছইটি উপধারাও রাখা হইয়াছে।

১ মোহাদেছগণ প্রত্যেক হাদীছের সঙ্গে উহার সনদ বা সাক্ষীগণের তালিকা উল্লেখ করেন। যথা—ইমাম বোখারী (রঃ) বলেন, মোহাদেছ হোমায়দী আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি সুফিয়ান নামক মোহাদেছের মুখে শুনিয়াছেন, তিনি ইয়াহুইয়া ইবনে সায়ীদ আনছারীর মুখে শুনিয়াছেন, তিনি মোহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম তায়মীর নিকট হইতে সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন যে, তিনি আল'কামা ইবনে আবী ওকাছের মুখে নিজ কানে শুনিয়াছেন, তিনি ওমর ইবনে খাতাব (রাঃ)কে মিসরে দাঁড়াইয়া ঘোষণা দিতে শুনিয়াছেন যে, আমি রসুল্লাহ ছালাল্লাহ আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি..... (পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

(ক) উক্ত সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে প্রতিটি সাক্ষী বা রাবী তাঁহার পূর্বের সাক্ষ্যদাতার নাম উল্লেখ করার সঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করিবেন যে, আমি “অমূকের মুখে শুনিয়াছি, তিনি বর্ণনা করিয়াছেন” বা “অমূকে আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন।” কোন একজন সাক্ষীও যদি ঐরূপ স্পষ্ট শব্দ না বলিয়া কোন অস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করেন, যেমন ঐরূপ বলেন যে—“সলীম কলীম হইতে বর্ণনা করিয়াছে” একটি সাক্ষীর বেলায়ও ঐরূপ অস্পষ্ট ভাষা ব্যবহৃত হইলে ঐ সনদ গ্রহণীয় হওয়ার জন্য বহু রকম পরীক্ষার সম্মুখীন হইবে। ইমাম বোখারী (র:) ঐরূপ সনদ গ্রহণ ব্যাপারে সর্বাধিক কড়াকড়ি আরোপ করিয়াছেন।

লক্ষ্য করুন! কতদূর সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে; যে—“সলীম কলীম হইতে বর্ণনা করিয়াছে” ঐরূপ বলিলে স্পষ্ট বুঝা যায় না যে, সলীম সরাসরি কলীমের মুখে শুনিয়াছে। বরং ঐরূপও হইতে পারে যে, অন্য কোনও ব্যক্তির মাধ্যমে শুনিয়াছে, অথচ ঐ ব্যক্তির নাম এখানে উল্লেখ নাই, ইহাতে ১ নম্বর দ্বারা লঙ্ঘিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। ঐরূপ সামান্য সন্দেহের অবকাশও যেন না থাকিতে পারে, তজ্জন্ম এই উপদ্বারা রাখা হইয়াছে। এমনকি, যদি কোন রাবীর বিষয় ঐরূপ প্রমাণিত হয় যে, সে ঐরূপ অস্পষ্ট ভাষার আড়ালে প্রকৃত প্রস্তাবেই ১ নম্বর শর্ত লঙ্ঘন করিয়া হাদীছ বর্ণনা করিয়াছে তবে হাদীছের পরিভাষায় তাহাকে “মোদায়েস” বলা হইবে। ঐরূপ ব্যক্তি সর্বস্থানে সন্দেহজনক বলিয়া পরিগণিত হইবে।

(খ) প্রত্যেক সাক্ষী ও তাঁহার পূর্ববর্তী উপরের সাক্ষী উভয়ের জীবনকাল ও বাসস্থান ঐরূপ পর্যায়ের হইতে হইবে যেন উভয়ের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা অসম্ভব না হয়।

(২) সাক্ষ্যদাতাদের প্রত্যেক ব্যক্তি হাদীছ বিশাংদগণের নিকট নাম ঠিকানা, গণাবলী, স্বভাব-চরিত্র এবং কোন্ কোন্ ওস্তাদের নিকটে হাদীছ শিক্ষা করিয়াছেন ইত্যাদি সর্ববিষয়ে পরিচিত হইতে হইবে। সাক্ষ্যদাতাদের একজনও অপরিচিত হইলে ঐ হাদীছ গ্রহণীয় নহে।

(৩) আগাগোড়া প্রতিটি সাক্ষীই জ্ঞানী, খাটী সত্যবাদী, † সচ্চরিত্র, মোস্তাকী, পরহেজগার, শালীনতা ও ভদ্রতাসম্পন্ন, সং-স্বভাবের হইতে হইবে। কোন ব্যক্তি জীবনে মাত্র একবার হাদীছ সংক্রান্ত ব্যাপারে মিথ্যা উক্তির জন্য ধরা পড়িলে ঐ ব্যক্তির শুধু ঐ মিথ্যা হাদীছই নহে, বরং তাহার সারা জীবনের সমস্ত হাদীছই অগ্রাহ্য হইবে। তওবা করিলেও তাহার বণিত হাদীছ গ্রহণযোগ্য হইবে না। তাছাড়া অন্য কোন বিষয়েও মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হইলে বা শরীয়ত বিরোধী আকিদা বা কার্যকলাপে লিপ্ত প্রমাণিত হইলে বা অসৎ প্রকৃতির লম্পট ও নীচ-স্বভাবের লোক হইলে তাহার বণিত হাদীছ গ্রহণীয় হইবে না।

লক্ষ্য করুন। একটি বিষয়কে হাদীছরূপে প্রমাণ করিতে বোখারী (র:) স্বীয় ওস্তাদ হইতে রমূল্লাহ (দ:) পর্যন্ত সাক্ষ্যদাতাদের পূর্ণ তালিকা বর্ণনা করিলেন। ঐরূপেই মোহাদেহগণ সনদযুক্ত বর্ণনা করেন। বোখারী শরীফের প্রত্যেকটি হাদীছ সনদসহ বণিত আছে। সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে অনুবাদে সনদ উল্লেখ করা হয় নাই।

† মোহাদেহ—হাদীছ বর্ণনাকারী ও হাদীছ শিক্ষাদানকারী বা হাদীছের সাক্ষীগণের সত্যবাদীতার পরীক্ষা কঠোরভাবে করা হইত। উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন কতিপয় আলেম পরীক্ষার সম্মুখীন ব্যক্তির স্ব-গ্রাম ও স্ব-গোত্রে যাইয়া তাহার সত্যবাদিতা যাচাই করিতেন। ঐ ব্যক্তি জীবনে কখনও

(৪) প্রত্যেকটি সাক্ষী তাহার সরণশক্তি সম্পর্কে অভিযয় পাকাপোক্ত, সুদৃঢ় ও সুদৃঢ় সংরক্ষণ বলিয়া পরিচিত হইতে হইবে × এবং ইহাও সুপ্রমাণিত হওয়া আবশ্যক যে, প্রতিটি সাক্ষী তাহার পূর্ববর্তী সাক্ষ্যদাতা অর্থাৎ ওস্তাদের নিকট হইতে হাদীছখানা পূর্ণ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করতঃ সবিশেষ মনোযোগের সহিত মুখস্ত করিয়া বা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই বিষয়ের প্রমাণ এইরূপে

মিথ্যা বলেন নাই প্রমাণিত হইলে তাহাকে সত্যবাদী সাব্যস্ত করতঃ মোহাদেছ বা হাদীছ বর্ণনাকারী ও শিক্ষাদানকারীরূপে গ্রহণ করা হইত; নতুবা নহে।

এরূপ পরীক্ষার একটি নজীর চতুর্থ শতাব্দীর বিখ্যাত মোহাদেছ আবু হাতেম—মোহাম্মদ ইবনে হাফসান **روضة المصابين**, কিতাবের ৪০ পৃষ্ঠার সন্দর্ভরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

রিবযী ইবনে হেরাশ (র:) যিনি প্রসিদ্ধ মোহাদেছ—যখন তাঁহার পরীক্ষা হইল এবং তাঁহার বস্তি ও গোত্রের লোকগণ এক বাক্যে তাঁহার সত্যতার সাক্ষ্য দিল তখন একজন শত্রু তাঁহার মোহাদেছ গণ্য হওয়ার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করিল। সে তৎকালীন শাসনকর্তা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে বলিল, রিবযী ইবনে হেরাশ আজ মোহাদেছ শ্রেণীভুক্ত হইবেন; তাঁহার বস্তি ও গোত্রের সকলে তাঁহার সত্যবাদীতার সাক্ষ্য দিয়াছে। আপনি একটু লক্ষ্য করিলেই তিনি একটু মিথ্যার জড়িত হইয়া পড়িবেন। তাঁহার দুইটি ছেলেকে আপনি সামরিক বাহিনীতে যোগদানের আদেশ করিয়াছেন, তাহারা নিম্ন গৃহেই পলাতক আছে। তাহাদের পিতা রিবযী ইবনে হেরাশ তাহা অবগত আছেন। আপনি তাহাকে ছেলেদের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে তিনি নিশ্চয়ই মিথ্যা বলিবেন। যে ভাবিয়াছিল, হাজ্জাজ অতি ভয়ঙ্কর শাসনকর্তা, তাই রিবযী ইবনে হেরাশ নিশ্চয় সন্তানদ্বয়ের প্রাণ রক্ষার্থে বলিবেন, আমি ছেলেদ্বয়ের খবর জ্ঞাত নহি। এইভাবে তিনি মিথ্যার জড়িত হইয়া পড়িবেন।

সেমতে শাসনকর্তা হাজ্জাজ তাহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি রিবযী? তিনি বলিলেন, হাঁ। আপনার ছেলেদ্বয়ের খবর জানেন কি? তিনি ইতস্ততঃ না করিয়া বলিলেন, তাহারা গৃহের মধ্যেই পলাতক রহিয়াছে। এইভাবে তিনি সত্যবাদীতার দ্বারা হাজ্জাজের স্তায় পাষণ্ড আত্মাকেও জয় করিয়া ফেলিলেন। হাজ্জাজ তাঁহার পরিপক্ব সত্যবাদীতার মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সত্যতা ও সুনামের ঘোষণা করিয়া দিলেন।

× পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, কোন মোহাদেছ হাদীছের শিক্ষা ও সাক্ষ্যদাতা গণ্য হইবার জন্য তাঁহার সত্যবাদিতা পরীক্ষিত হইত। তজ্জপ তাঁহার সরণশক্তিও পরীক্ষা করা হইত। সরঃ বোখারী (র:)কে এরূপ পরীক্ষা করার ঘটনা বর্ণিত আছে। বোখারী (র:) প্রথম জীবনে বাগদাদে উপস্থিত হইলে স্থানীয় হাদীছবিশারদগণ তাঁহার পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহারা একশতটি হাদীছ তৈয়ার করিলেন; ঐ হাদীছ সমূহের মূল হাদীছ ও সনদের মধ্যে গড়মিল এবং আরও নানা-প্রকার উলট-পালট করিয়া সাজাইলেন। অতঃপর দশ জন আলেন নির্দিষ্ট করা হইল যাহারা ঐ ভুল হাদীছ সমূহের দশটি করিয়া পর পর ইমাম বোখারীর সম্মুখে পেশ করিবেন এবং তাঁহার মন্তব্য জিজ্ঞাসা করিবেন। একটি বিশেষ অমুর্ভানে তাহা করা হইল। প্রত্যেকটি হাদীছের সঙ্গে তিনি শুধু এতটুকু বলিয়া বাইতে লাগিলেন যে, এরূপ কোন হাদীছ আছে বলিয়া আমি মনে করি না। একশত গড়মিল হাদীছ পেশ করা শেষ হইলে পর তিনি ঐগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত মন্তব্য আরম্ভ করিলেন যে, অল্পকাল ব্যক্তি প্রথমে এই হাদীছটি পেশ করিয়াছেন, উহাতে এই এই ভুল আছে, উহার প্রকৃত রূপ এই।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

হইবে যে, উক্ত সাক্ষী যে যে হাদীছ আত্মীবন শত শত বার বর্ণনা করিয়া আসিতেছেন কোন সময়ই তাঁহার বর্ণনার মধ্যে অসামঞ্জস্য বা কোনরূপ গড়মিল পরিলক্ষিত হয় নাই। + যখন যে সাক্ষীর বর্ণনা মধ্যে এইরূপ গড়মিল দেখা যাইবে তখন হইতে আর এই সাক্ষীর বর্ণনার কোন হাদীছ সঠিক প্রমাণিত বলিয়া গণ্য হইবে না। এই ধারা অনুসারেই বহু বড় বড় গণ্যমান্য হাদীছ বর্ণনাকারী ব্যক্তিগণও বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইবার পর তাঁহাদের এই অবস্থায় বণিত হাদীছ পূর্ণ নির্ভরযোগ্য পরিগণিত হয় নাই। তাছাড়া যাহাদের সাধারণ কথাবার্তার বেশী ভুল দেখা গিয়াছে তাহাদের হাদীছও গ্রহণীয় হয় নাই।

হাদীছ পরীক্ষার এই চারিটি প্রধান শর্ত। আরও বহু খুঁটিনাটি বিষয়াদি আছে যাহা সুবিধা আলোচনা অবগত আছেন। বাহার দ্বারা হাদীছের প্রামাণিকতা আরও অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া যায়।

এইভাবে একশত হাদীছের বিষয়ে সম্ভা করিলেন; এই ভুল হাদীছগুলি তাঁহার সম্মুখে যে ধারা-বাহিকতায় পেশ করা হইয়াছিল উহাতেও কোন ব্যতিক্রম ঘটিল না।

কী স্মরণশক্তি! একশত ভুল হাদীছ একবার মাত্র শুনিয়া অবিকলরূপে এবং তরতীব সহ কঠস্থ করিয়া লইতে সক্ষম হইলেন; পরীক্ষকগণের নিকট এই বিষয়টি অতি বিস্ময়কর ছিল।

+ ইমাম বোখারী (র:) সকলিত "কিতাবুল-কুনা" ৩৩ পৃষ্ঠায় একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, তৎকালীন শাসনকর্তা মারওয়ান আবু হোরায়রা (রা:) ছাহাবীর হাদীছ কঠস্থ রাখার ক্ষমতা পরীক্ষার গোপন উদ্দেশ্যে নানারূপ ছলে-বলে তাঁহার দ্বারা হাদীছ বর্ণনা করাইলেন এবং মারওয়ানের সেক্রেটারী পদার আড়ালে থাকিয়া গোপনে এই সব হাদীছ অক্ষরে অক্ষরে লিখিয়া রাখিলেন। এক বৎসর পর মারওয়ান আবু হোরায়রা (রা:)কে পুনরায় দাওয়াত করিয়া আনিলেন এবং সেক্রেটারীকে পূর্বে লিখিত লিপি সহ আড়ালে বসাইলেন। অতঃপর আবু হোরায়রা (রা:)কে এক বৎসর পূর্বে বর্ণিত হাদীছসমূহ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন; তিনি এক একটি করিয়া বর্ণনা করিলেন। সেই সেক্রেটারীর সাক্ষ্য যে, দীর্ঘ এক বৎসর ব্যবধান সত্ত্বেও এত বেশী সংখ্যক হাদীছের বর্ণনার মধ্যে একটি অক্ষরেরও ব্যতিক্রম ছিল না।

দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছ—ইবনে শেহাব যুহরী (র:) তৎকালীন রাষ্ট্রীয় প্রেসিডেন্ট হেশাম কর্তৃক এইরূপ পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছিলেন; ইমাম জাহাবীর সকলিত "তাজকেরা" কেতাবের প্রথম খণ্ড ২০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, একদা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট মোহাদ্দেছ যুহরীকে অনুরোধ করিলেন যে, আপনি আমার ছেলের জন্ত কতগুলি হাদীছ লিখাইয়া দিন। তিনি একজন সরকারী কেরানীকে ডাকিয়া চারি শত হাদীছ লিখাইয়া দিলেন। প্রেসিডেন্ট মোহাদ্দেছ যুহরীকে এক মাস কাল পরে ডাকিয়া পূর্বে লিখিত লিপিখানা হারাইয়া যাওয়ার ভান করিয়া এই চারি শত হাদীছ পুনরায় লিখাইতে অনুরোধ করিলেন। তিনি তাহাই করিলেন, বস্তুতঃ পূর্বের লিপি হারাইয়া ছিল না। চারি শত হাদীছের নূতন পুরাতন লিপিস্বয়ে এক অক্ষরেরও পার্থক্য হইল না।

• মোহাদ্দেছগণ স্মরণশক্তির প্রতি কত সতর্ক থাকিতেন সে সম্পর্কে ইমাম তিরমিযির (র:) একটি ঘটনা আছে। তিরমিযি (র:) শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ছিলেন, তবুও হাদীছ শিক্ষা দিতেন, এমনকি ভ্রমণাবস্থায়ও তাঁহার সঙ্গে হাদীছ পিণ্ডাঙ্গণ থাকিতেন। একদা উষ্ট্রে আরোহিত ভ্রমণ করিতেছিলেন; পথিমধ্যে একস্থানে তিনি অল্প সময়ের জন্ত মাথা নত করিয়া রাখিলেন। সঙ্গীপণ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এই স্থানে মাথা নত করিলেন কেন? তিনি বলিলেন, এই স্থানে কি একটি বৃক্ষ রাস্তার উপর ঝুকিয়া পড়ে নাই যে, উষ্ট্রারোহীদের মাথা উহাতে আঘাত পাইবে? সকলেই

এইরূপ শত সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া হাদীছ বিশারদগণের মধ্য হইতেই যুগে যুগে এক শ্রেণীর মনীষীবৃন্দ এক বিরাট ইতিহাসের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। বাহার মূল্য বর্তমান যুগের আপন-ভোলা মোসলেম সমাজ উপলব্ধি করিতে না পারিলেও বিজাতীয়গণ, এমনকি অধুনা জ্ঞান-বিজ্ঞানের একচেটিয়া দাবীদার—ইউরোপবাসীরাও নতশিরে মানিয়া নিতে বাধ্য হইয়াছে যে, এই অমূল্য রত্ন—মহান ইতিহাস-ভাণ্ডার একমাত্র মোসলমানদেরই অমরকীর্তি। ইহার নকীর অত্র কোন জাতি কোন কালে দেখাইতে সক্ষম হয় নাই এবং হইবেও না। সেই অমূল্য রত্নটি হইল এক বিশেষ শাস্ত্র বাহাকে ইসলামী পরিভাষায় (اسماء الرجال) “আছমাউর-রেজাল” অর্থাৎ হাদীছের সাক্ষ্যদাতা ও রাবীগণের জীবনেতিহাস বা জীবন-চরিত বলা হইয়া থাকে। তাহাতে উল্লিখিত চারিটি খারা এবং উহা ছাড়াও হাদীছের সাক্ষ্যদাতাদের বিষয়-সংক্রান্ত খুত্বনাটি বিষয়াদি রহিয়াছে, সে সব দৃষ্টে ঐ শাস্ত্রের মধ্যে প্রতিটি রাবী তথা হাদীছের সাক্ষ্যদাতার জন্ম-মৃত্যুর তারিখ, পরিচিতি ও অপরিচিতি নাম, বংশ-পরিচয় বাসস্থান, শিক্ষাক্ষেত্র, তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্তী হাদীছ-বিশারদগণ কর্তৃক তাঁহার প্রতি মন্তব্য সমূহ এবং তাঁহার সংগৃহাবলী বা দোষ-ত্রুটির বিস্তারিত বিবরণ এবং তিনি যে সমস্ত লোকের নিকট হইতে হাদীছ শিক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট হইতে বাহারা শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের কিরিস্তি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

এই শাস্ত্রের শুধু প্রসিদ্ধ ও সচরাচর প্রচলিত কিতাব সমূহের মধ্যে উল্লিখিত আকারে ৮৫০০০ হাজার রাবী বা সাক্ষ্যদাতার জীবনেতিহাস লিপিবদ্ধকারে বিশ্ব-ভাণ্ডারে মওজুদ রহিয়াছে। বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার হাফেজ ইবনে হজর আসকানানী (র:) কর্তৃক চার খণ্ডে সঙ্কলিত “আল-এসাবাহু” নামক কিতাবে ১৯৯৩৯ জন লোকের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁহারই একাদশ খণ্ডে সঙ্কলিত “তাহুজীবুত-তাহুজীব” কিতাবে ১২৪৫৫ সংখ্যক লোকের বিস্তারিত জীবনী বর্ণিত আছে। তাঁহার পূর্বে হাফেজ ইয়াহুইয়া ইবনে মায়ীন ও হাফেজ শামছুদ্দীন জাহাবীর শ্রায় বড় বড় মনীষী এই বিষয়ে বহু কিতাব সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন।

এই শাস্ত্রে সর্বমোট ৫০০০০ পাঁচ লক্ষ রাবী বা হাদীছ বর্ণনাকারী সাক্ষীদের বিস্তারিত জীবনেতিহাস লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। (তদবীনে হাদীছ)

প্রসিদ্ধ জার্মানী ডঃ স্প্রেঙ্গার যিনি ১৮৫৪ ইং সনে বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন এবং আরবী সহ বিভিন্ন ভাষার অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন—তিনি লিখিয়াছেন, “হুনিয়ার বৃকে এমন কোন জাতি অতীতেও হয় নাই, বর্তমানেও নাই যে জাতি মোসলমানদের শ্রায় “আছমাউর-রেজাল” শাস্ত্রের আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছে। সেই শাস্ত্রের সাহায্যে পাঁচ লক্ষ মানুষের জীবনেতিহাস জ্ঞাত হওয়া যায়।” (উপরোল্লিখিত আল-এসাবাহ নামক কিতাবের ইংরেজী অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি এই কথা লিখিয়াছেন।)

বলিল, ঐ স্থানে কোন বৃক্ষই নাই। তিনি বলিলেন, বহু দিন পূর্বে চক্ষু ভাল থাকাকালীন আমি এই পথে ভ্রমণ করিয়াছিলাম, সেই সময় এই পথে একটি বৃক্ষ ছিল, আমি ঐ স্থানটিকে সেই বৃক্ষতল মনে করিয়া মাথা নত করিয়াছি। তোমরা ঐ স্থান-সংলগ্ন বস্তির লোকদের নিকট সঠিক তথ্য অবগত হও। ঐ স্থানে কোন সময় ঐরূপ বৃক্ষ ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া না গেলে আমি হাদীছ বর্ণনা করা বন্ধ করিয়া দিব : মনে করিব, আমার স্মরণশক্তি দুর্বল হইয়া গিয়াছে।

সত্য সত্যই ঐ বস্তির বয়স্কদের নিকট জানা গেল, পূর্বকালে ঠিক ঐ স্থানে ঐরূপ বৃক্ষ ছিল। তখন তিনি সীম স্মরণশক্তি রত্নাল থাকায় আল্লার শোকর আদায় করিলেন।

বোখারী শরীফ ও মোসলেম শরীফের বিশেষত্ব :

পূর্বেই বলা হইয়াছে—যে চারিটি ধারার বিষয় আলোচনা হইল, ঐ কয়টি হইল সাধারণ ধারা। অর্থাৎ কোন হাদীছকে সাধারণভাবে নির্ভরযোগ্য বলিতে হইলে ঐ সব ধারা উহার সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে অবশ্যই পাওয়া যাইতে হইবে। কিন্তু বিশিষ্ট বিশিষ্ট হাদীছ-বিশারদগণ তাঁহাদের কোন কোন গ্রন্থের জন্ত উক্ত চারিটি ধারা সম্বলিত সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যেও অত্যন্ত গুণাবলী দৃষ্টে আরও শ্রেণী বিভক্ত করিয়াছেন। তদুপরি আরও বহু বিশিষ্ট গুণাবলীর শর্ত আরোপ করিয়াছেন। আটা বা ময়দা সাধারণতঃ প্রথমে মোটা চালুনী দ্বারা চালা হয়, তারপর উহা সূক্ষ্ম চালুনীতে চালা হয়; কেহ কেহ আবার উহাকে কাপড়ে ছাকিয়া ব্যবহার করেন। এমতাবস্থায় ঐ আটা বা ময়দার মধ্যে যেমন কোন প্রকার আবর্জনা থাকিতে পারে না; তেমনি হাদীছের প্রামাণিকতার ক্ষেত্রে যাহাতে কোনরূপ সন্দেহ বা ভেজাল থাকিতে না পারে তজ্জন্ত হাদীছের রাবী বা সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যেও ঐরূপ শ্রেণী বিভাগ করা হইয়া থাকে এবং এই শ্রেণী বিভক্তির দিক দিয়া যিনি যেই গ্রন্থের জন্ত যত বেশী সূক্ষ্মদৃষ্টি ও বিচার বিশ্লেষণে অতিশয় কড়াকড়ি আরোপ করিয়াছেন, তিনি এবং তাঁহার সেই গ্রন্থ তত পরিপক্ব ও বিশ্বস্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এই দিক দিয়া সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী হইয়াছেন, ইমাম বোখারী (রঃ) ও তাঁহার শাগের্দ ইমাম মোসলেম (রঃ)। এবং উক্ত মহামনীষীর কতৃক সকলিত হুইখানা গ্রন্থ—“বোখারী শরীফ ও মোসলেম শরীফ” দুনিয়ার বুকে আজ বার শত বৎসরেরও অধিক কাল হইতে এই শ্রেণীর সমুদয় গ্রন্থের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। তাঁহারা সর্বমোট ৫০০০০ রাবী বা বর্ণনাকারী—হাদীছের সাক্ষীদের মধ্যে সচরাচর পরিচিত ৮৫০০ রাবী বা সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে শ্রেণী বিভক্ত করিয়া ২৪০৪ জন রাবীকে সূক্ষ্মদর্শীতার কণ্ঠি পাথরে যাচাই করিয়া ব্রহ্ম হইতে মাখন বাহির করার কায় বাছিয়া লইয়াছেন।

বোখারী শরীফের বিশেষত্ব :

ইমাম বোখারী (রঃ) ও ইমাম মোসলেম (রঃ) এই দুইজন ওস্তাদ শাগের্দের মধ্যে সাধারণ নিয়মকেই আল্লাহ তায়ালা বজায় রাখিয়াছেন। ওস্তাদ ইমাম বোখারী (রঃ) ও তাঁহার গ্রন্থখানাই বিশ্বের বুকে অগ্রগণ্য হইয়াছে। তিনি আরও সূক্ষ্মতমভাবে যাচাই করিয়া বোখারী শরীফ গ্রন্থের জন্ত ২৪০৪ জন হইতে ৬২০ জনকে বাদ দিয়াছেন। তাই তাঁহার এই গ্রন্থখানা সর্বাধিক উচ্চতর শীর্ষস্থানের অধিকারী হইয়াছে। সমগ্র বিশ্বে প্রবাদরূপে স্বীকৃত রহিয়াছে—

امح الكتب بعد كتاب الله و صحيح البخاري

অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব—কোরআন শরীফের পরেই বিশ্বস্ততার সর্বপ্রথম স্থানের অধিকারী ইমাম বোখারীর এই অদ্বিতীয় গ্রন্থ বোখারী শরীফ। এবং এই জন্তই ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহে আলাইহে হাদীছ-শাস্ত্রের সম্রাট উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বোখারী (রঃ) পর্যন্ত যে সকল সাক্ষ্যদাতা বা রাবীর মাধ্যমে এই গ্রন্থের মধ্যে হাদীছ গ্রহণ করা হইয়াছে তাঁহাদের মোট সংখ্যা হইল প্রায় ১৮০০। ৭ তন্মধ্যে ১৩৫৪ জন হইলেন এইরূপ যাহাদের মাধ্যমে ইমাম বোখারী ও ইমাম মোসলেম

† এই ১৮০০ শতের মধ্যে ১০১ জন হইলেন রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী। ছাহাবীগণ বিশ্বস্ততায় গ্রন্থের উর্দে; তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য ও সত্যবাদিতা পূর্বাপর মোসলেম জাহানের সর্ববাদী সম্মত বিষয়। অবশিষ্ট ১৬৯৯ সংখ্যার অধিকাংশই তাবেরীন বা তাবয়ে-তাবেরীন তথা রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটতম সোনালী যুগের লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

উভয়েই হাদীছ গ্রহণ করিয়াছেন, ইহারা সকলেই শীর্ষস্থানীয় পরিগণিত। অবশিষ্ট ৪০০ হইতে কিছু অধিক সংখ্যক রাবীর নিকট হইতে শুধু বোখারী (র:) হাদীছ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং ঐসব রাবী বা সাক্যাদাতা ইমাম বোখারীর স্মৃতিতম বাছনীর মধ্যে গ্রহণীয়রূপে বিবেচিত হইয়াছিলেন। তদুপা শুধু ইমাম মোসলেমও প্রায় ৬২০ সংখ্যক রাবী হইতে হাদীছ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইমাম বোখারী (র:) তাঁহাদেরকে স্মৃতিতম বাছনীতে তাঁহার বিশেষ গ্রন্থ বোখারী শরীফের ক্ষেত্রে বাণ দিয়াছেন।

মোট ২৪০৪ জন মানুষের জীবনেতিহাস কোনও অসাধ্য বা অপ্রকাশ্য বস্তু নহে, বরং পূর্বালোচিত “আছমাউর-রেজাল” শাস্ত্রের কিতাবসমূহে আলোখ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ হইয়া শত শত বৎসরকাল হইতে জগদ্বাসীর হাতে ও তাহাদের দৃষ্টিগোচরে বিद्यমান রহিয়াছে; তদুপরি শুধু এই ২৪০৪ জন মানুষের পূর্ণ জীবনী সফলিত ও সুরক্ষিত আছে—যাহার জন্ত *قصة العنبرين في رجال المسلمين* নামক একখানা কিতাবও পূর্বকাল হইতেই বিশ্বের বুকে প্রচলিত রহিয়াছে। উল্লিখিত দিবসাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিশ্ববাসীকে অনুরোধ করিতেছি, স্মৃষ্টরূপে প্রত্যেকটি রাবীর জীবনী অনুধাবন করতঃ তাঁহারা ই বিচার করুন এই সমস্ত লোকদের দ্বারা কোনও মিথ্যা বর্ণনা প্রদান বা কোনরূপ মিথ্যানুষ্ঠান কতদূর সম্ভব।

রসূলুল্লাহ আদর্শ সকল দেশ ও পরিবেশ এবং সকল যুগ ও কালের জন্য

অধুনা কোন কোন বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকের মুখেও এরূপ প্রশ্ন শোনা যায় যে, দীর্ঘ চৌদ্দশত বৎসরের পুরাতন আদর্শাবলী, বিশেষতঃ পর্বতমালা বেষ্টিত মরু অঞ্চল-অধিবাসী অল্পসংখ্যক যুগ ও অল্পসংখ্যক দেশের একটি লোক যে আদর্শ গড়িয়াছিলেন বর্তমান প্রগতিশীল ও উন্নতিশীল জগতে তাহা চলিবে কেন? বর্তমান জগতে বহুদূর আগে বাড়িয়া গিয়াছে, এই অসাধারণ প্রগতির যুগে—এই বিজ্ঞানের যুগে শিখনের পুরাতন আদর্শ অচল হইতে বাধ্য। এত অগ্রগামী যুগের চাহিদা এত পশ্চাত্তর আদর্শ কিরূপে মিটাইতে পারে?

ইসলামী আদর্শের সুফল এবং অনৈসলামিক রীতিনীতির কুফল যাহা বাস্তব জগতেই প্রকাশ পাইয়া যাইতেছে উহা হইতে দৃষ্টি এড়াইয়া নিয়া শুধু মাত্র মৌখিক বিতর্কের উপর উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে, হযরত মোহাম্মদ—রসূলুল্লাহ (স:) সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানের অভাবই হইল এই প্রশ্নের মূল। সুতরাং তাঁহার সম্পর্কে শুধু মাত্র দুইটি তথ্য পাঠক সমক্ষে তুলিয়া ধরিতেছি, অকণ্ট চিন্তে উহার বাস্তবতা অনুধাবন করিতে পারিলে মূল প্রশ্নের অসঙ্গততা সঙ্গে সঙ্গেই ফুটিয়া উঠিবে।

প্রথম তথ্য—হযরত মোহাম্মদ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্থল বিজ্ঞানের হিসাবে যতই অল্পসংখ্যক দেশের অল্পসংখ্যক যুগের এবং যতই পুরাতন কালের হউন না কেন, কিন্তু তিনি ছিলেন আদি-অন্ত সকল দেশ ও সকল পরিবেশের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর রসূল। এবং আল্লাহ বিশ্ব-জগতের সকল যুগ, দেশ ও পরিবেশের প্রতিটি বস্তুর অবস্থার পূর্ণ অভিজ্ঞতা রাখেন—*لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير*। “যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি কি সৃষ্টি সম্পর্কে সব কিছু জ্ঞাত থাকিবেন না? অধিকন্তু তিনি সমুদয় নিগূঢ় তত্ত্ব ও সূক্ষ্ম বিষয়ের এবং অপ্রকাশ্য সব কিছুর জ্ঞানের আকরও বটে।”

তিনি সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ, তাঁহার জ্ঞানের সম্মুখে নূতন-পুরাতন, অতীত-ভবিষ্যৎ বলিতে কিছু নাই, সব কিছুই সমান ভাবে তাঁহার জ্ঞান সমুদ্রের বিলুপ্ত। সেই মহান স্রষ্টার সঙ্গে ছিল হযরত মোহাম্মদের রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দৃঢ় যোগসূত্র এবং তাঁহার প্রতিটি বাক্য ও চিন্তাধারার উৎস ছিলেন সেই মহান স্রষ্টা; এই যোগপাই পবিত্র কোরআন স্পষ্ট ভাষায় প্রদান করিয়াছে—

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ “মোহাম্মদ মোস্তফা (দ:) নিজের মনোবৃত্তি হইতে কিছুই বলেন না, তিনি যাহা কিছু বলেন সৃষ্টিকর্তার তরফ হইতে অহী প্রাপ্ত হইয়া সেই অহীর বিকাশ সাধন করেন মাত্র।” সুতরাং তাঁহার আদর্শ বস্তু: তাঁহার রচিত বস্তু নহে, বরং বিশ্ব অষ্টা বিশ্বনিধি সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত বস্তু। উহার পাওয়ার ও শক্তিকে আমাদের নিজেদের রচিত আদর্শের পাওয়ার ও শক্তির মাগকাঠিতে পরিমাপ করা নিতান্তই ভুল হইবে; মগকে তোতার পাথরে পরিমাপ করা অপেক্ষা অধিক বোকামী হইবে।

দ্বিতীয় তথ্য :—বাণী-বচনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে জ্ঞান ও আদর্শ বিতরণ করা সম্পর্কে বিশ্বনবী ও সর্বশেষ পরগাম্বর হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছালামাহ আলাইহে অসালামকে আল্লাহ তায়ালা এমন একটি বিশেষ ক্ষমতা, শক্তি ও গুণ দান করিয়াছিলেন যাহা অন্য কোন মানুষ ত দূরের কথা পূর্ববর্তী কোন নবীকেও আল্লাহ তায়ালা উহা দান করিয়াছিলেন না।

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছালামাহ আলাইহে অসালাম সম্পর্কে এই বিষয়টির প্রতি বিশ্ববাসীকে সজাগ ও সচেতন রাখার উদ্দেশ্যে স্বয়ং হযরত (দ:) বলিয়া গিয়াছেন—

فَقُلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بَسْتُ أُعْطِيتُ جَوْاءَ مَعَ الْكَلِمِ... وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخْتَمَ بِي النَّبِيُّونَ.

হাদীছানা মোসলেম শরীফ ১০২ পৃষ্ঠার বর্ণিত হইয়াছে। হযরত রসুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে সকল নবীগণের উপর ছয়টি বস্তুর দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। (মূল হাদীছের মধ্যে পূর্ণ ছয়টির উল্লেখই রহিয়াছে আমাদের আলোচ্য বিষয় শুধু তিনটি—) (১) আমাকে আল্লাহ তায়ালা “জাওয়ামেউল-কালেম” গুণ দান করিয়াছেন; (২) আমি সারা বিশ্বমানবের রসুল-রূপে প্রেরিত হইরাছি। (৩) নবীগণের আগমন আমার উপরই শেষ, আমার পরে কোন নবী আসিবেন না। (২১৮নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

ছয়টি বস্তুর প্রথম বস্তুটি হইল আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়: অর্থাৎ “জাওয়ামেউল-কালেম।” “জাওয়ামে” শব্দটি বহুবচন, ইহার অর্থ “ব্যাপক পরিধিময় বস্তু।” “কালেম” শব্দটিও “কলেমা” শব্দের বহুবচন, যাহার অর্থ (১) শব্দ (২) চিন্তাধারা—মনন, চিন্তন বা অন্তরের আলোচনা ও গবেষণা (৩) আদর্শ বা নীতি নির্ধারক বাক্য ও বচন। যেমন “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রসুল্লাহ”কে “কলেমা তৈয়্যব” বলা হয়।

হযরত (দ:) বলিতেছেন—ব্যাপক পরিধিময় চিন্তা বলে ব্যাপক পরিধিময় আদর্শ ও নীতি ব্যাপক অর্থের শব্দাবলীতে রচিত ও প্রকাশিত করার বিশেষ শক্তি ও গুণ আল্লাহ তায়ালা খাচ ভাবে আমাকে দান করিয়াছেন, অন্য কোন নবীরও এই ক্ষমতা বা গুণ ছিল না।

রসুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসালামের এই সারগর্ভময় উক্তিটির সঠিক মর্যাদা দান করিলেই মূল প্রশ্নটির মীমাংসা হইয়া যায়। মনে হয় যেন হযরত (দ:) এই শ্রেণীর প্রশ্নের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই উক্ত তথ্যটি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। রসুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসালামকে প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা ও গুণ হইতে নিঃসৃত চিন্তাধারা, আদর্শ ও বাক্যাবলীর ব্যাপক পরিধি দেশ, কাল ও যুগ নিবিশেষে

সকলকে বেষ্টিত করিবে ইহাই হইল হযরতের উক্ত সারগর্ভময় উক্তিটির সার্থকতা এবং এই জন্যই হযরত (দঃ) এই বিষয়টিকে গুরুত্বের সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন।

বস্তুতঃ এই ধরনের গুণ অস্বাভাবিক নবীগণের জন্য আবশ্যিকও ছিল না, কারণ তাঁহাদের আবির্ভাব বিশেষ জাতি ও কালের জন্য সীমাবদ্ধ রূপের ছিল। পক্ষান্তরে (১) হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর আবির্ভাব হইল দেশ, কাল, জাতি, যুগ নির্বিশেষে বিশ্ব-মানব জাতির জন্য (২) এবং তাঁহার রেহালত, নবুয়ত ও পরগাম্বরী কায়ম থাকিবে জগৎ-জীবনের শেষ যুহুত পর্য্যন্ত। এই দুইটি বিষয়কেই হযরত (দঃ) পক্ষম ও বর্ষ বৈশিষ্ট্যরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। হযরতের আদর্শ যদি দেশ, কাল, যুগ ও জাতি নির্বিশেষের জন্য না হয় তবে এই দুইটি বৈশিষ্ট্যের সংবিধান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

হাদীছ সংরক্ষণে বিশেষ তৎপরতা

হাদীছ লিপিবদ্ধ হওয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :

হযরত রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগ হইতেই তাঁহার প্রতিটি হাদীছ বিশেষভাবে সংরক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, ইহাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। হাযাবীগণ অত্যধিক তৎপরতার সহিত হাদীছ কণ্ঠস্থ ও সংরক্ষণের প্রতি সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। অবশ্য বিশেষ কারণাধীনে উহা ব্যাপকভাবে লিপিবদ্ধ করা হইত না। কারণটি এই যে, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জমানায় কোরআন শরীফ ক্রমান্বয়ে নাখিল হইতেছিল এবং ব্যাপকভাবে কোরআনের প্রতিটি অক্ষর লিপিবদ্ধ করিয়া রাখার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হইত। এমনকি স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) সদা-সর্বদা চারজন বিশেষজ্ঞ লেখককে এ কার্যের নিয়ন্ত্রণ নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যখনই কোন আয়াত নাখেল হইত তৎক্ষণাৎ স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাদের একজনকে ডাকিয়া উহা লিপিবদ্ধ করাইতেন। এই চারজন ছাড়া আরও অনেকেই লিখিয়া রাখিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি মোসলমানই উহা কণ্ঠস্থ করিয়া লইতেন। অবশ্য সেই যুগের রীতি অস্থায়ী অস্তি, বৃক্ষ-পত্র, প্রস্তর, চামড়া ইত্যাদি বিভিন্ন বস্তুর উপরে ঐ সকল আয়াত লিখিয়া রাখা হইত। কিতাব বা পুস্তক আকারে একত্র সন্নিবেশিত-রূপে লেখা হইত না। যেহেতু কোরআন শরীফ বিভিন্ন আকারে অঙ্কিত থাকিত, একত্রিতভাবে পুস্তক আকারে সুবিন্ধ্য ছিল না, সেই জন্য কোরআনকে বিশেষভাবে সংরক্ষিত রাখার অভিপ্রায়ে রসুলুল্লাহ (দঃ) একটি বিশেষ ব্যবস্থা ও সতর্কতামূলক পন্থা হিসাবে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন যে—কোরআন শরীফের স্থায় ব্যাপকভাবে ও বিশেষ তৎপরতার সহিত হাদীছকেও লিপিবদ্ধ করা সাময়িকভাবে নিষেধ করিয়া দিলেন। কারণ সর্বসাধারণের ভাষা ও বক্তব্য ইত্যাদি এবং কোরআনের ভাষা ও বক্তব্যের মধ্যে গুণ, মর্যাদা ও বিশেষত্বের দিক দিয়া তারতম্য ও পার্থক্য করা যেসকল দিবালোকের স্থায় উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর হাদীছ ও কোরআনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় ততটা সহজ বোধগম্য ও স্পষ্ট নহে। যেমন, আরবী ভাষার গুণাগুণ ও মর্যাদা আলোচনার বিশেষ শাস্ত্র এন্সুল-বালাগাতেও এই সত্য স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, কোরআন ও হাদীছ উভয়ের আসল উৎস-মূল একই; যেমন পূর্বে বলা হইয়াছে। এবং ভাষাগুণও আল্লাহ তায়ালা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বিশেষভাবে দান করিয়াছেন—**وَأَتَمَّتْ جَوَاسِعُ الْكَلِمِ**। সুতরাং এইরূপ নিকটতম সৌসাদৃশ্যমূলক দুইটি বস্তু যদি একই সময়ে তাও আবার প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ বা কিতাবের আকারে নয়, বরং একালের রীতি অস্থায়ী বিচ্ছিন্ন ও বিকিণ্ড ধরনের চর্ম-খণ্ড, প্রস্তর-খণ্ড,

অন্তি-খণ্ড বা পত্র ইত্যাদিতে লিখিত ও সংগৃহীত হইতে থাকে, তাহা হইলে তদবস্থায় উভয়ের মধ্যে পরস্পর সংমিশ্রণ ঘটয়া যাওয়ার আশঙ্কা খুবই প্রবল। অতএব, এই সাময়িক অভ্যুত্থানের দরুণ অর্থাৎ কোরআনকে পূর্ণ সত্যকতার সহিত স্বতন্ত্র ভাবে প্রথমে ভালরূপে সকলের হৃদয়ঙ্গম ও পরিচিত করাইবার জন্য হাদীছ ব্যাপকভাবে লিপিবদ্ধ করিতে নিবেদন করা হয়। রসুলুল্লাহ হাদীছ আল্লাহই অসলামের কমানায় ব্যাপকভাবে হাদীছ লিপিবদ্ধ করা হয় নাই।

বলা বাহুল্য—এই নিষেধাজ্ঞাই রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর অনুরাগী ছাহাবীদের জন্য হাদীছ সংরক্ষণের কাজে বিশেষ যত্নবান হওয়ার প্রতি অধিক সহায়ক হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহারা রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর প্রতিটি হাদীছকে অকরে অকরে মুখস্থ ও কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে অত্যধিক সচেষ্ট হইলেন। এমনকি যেহেতু হাদীছ লিপিবদ্ধ করার প্রতি নিষেধাজ্ঞার অর্থ ছিল যে, কোরআন শরীফের জায় ব্যাপকভাবে লেখা যাইবে না, সেই জন্য কোন কোন ছাহাবী হাদীছ লিখিয়া মুখস্থ ও কণ্ঠস্থ করিয়া লইতেন এবং দরকার অনুযায়ী সুনিশ্চিত হইবার উদ্দেশ্যে রসুলুল্লাহ (দঃ)-কে পুনরায় শুনাইয়া পরিপক ও বিস্তৃতভাবে পরীক্ষা করিয়া লইতেন। আনাছ (রাঃ) ও আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তাঁহারা বলিতেন—

هَذَا حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَعَرَفْتُهَا عَلَيْهِ

“এই সমস্ত হাদীছ আমি নিজে রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর মুখে শুনিয়াছিলাম ও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম এবং তাঁহাকে শুনাইয়াছিলাম।” আবু শোরায়রা (রাঃ) বলিতেন—আমার নিকট যত বেশী হাদীছ সংরক্ষিত আছে ইহার চাইতে অধিক হাদীছ অন্য কোনও ছাহাবীর নিকট আছে বলিয়া মনে করি না। তবে হাঁ। আবুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)-এর নিকট অধিক হাদীছ থাকিতে পারে। কারণ তিনি হাদীছ লিখিয়া রাখিতেন, আমি হাদীছ লিখিতে বিশেষ তৎপর ছিলাম না।

আবু হোরায়রা (রাঃ) কতৃক বর্ণিত হাদীছসমূহ বাহা পরবর্তী মোসলেম সমাজ পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে উহার সংখ্যা ৫৩৭৪। আবু হোরায়রা (রাঃ) নিজেই বলিতেন যে, আবুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) কতৃক বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা আমার হাদীছের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হইতে পারে। এত অধিক সংখ্যক হাদীছ বর্ণনাকারী আবুল্লাহ ইবনে আমরের এই ঘটনা প্রসিদ্ধ এবং প্রমাণিত আছে যে, তিনি রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট হইতে শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গেই হাদীছ সমূহ এক একটি করিয়া লিখিয়া রাখিতেন। এমনকি তিনি নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম—ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনার মুখ হইতে স্রুত সমুদয় বার্তাই কি লিখিয়া রাখিব? ইব্রাহিম (দঃ) বলিলেন, হাঁ। আমি পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনার স্বাভাবিক অবস্থা ও ক্রোধাবস্থা উভয় অবস্থার বার্তা সবই লিখিব কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, হাঁ; এবং তিনি খীর চৌটের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, এই চৌটদ্বয়ের মধ্য হইতে কোন অবস্থাতেই না-হক কথা বাহির হয় না।

ছাহাবী আবুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর বর্তমানে তাঁহারই নির্দেশে যে, বহু সংখ্যক হাদীছ লিখিয়াছিলেন তাহা কিতাব বা পুস্তক আকারে লিখিত হইয়াছিল, সেই কিতাবের নাম ছিল—“ছাদেকাহ” সত্যের প্রতীক; যাহার হাদীছ সংখ্যা ৫৩৮৪ এবং উর্দে হইতে পারে। হুর্ভাগ্যবশতঃ যুগের প্রবাহ সেই অমূল্য রত্ন পুস্তিকাখানা হইতে আমাদেরিগকে বঞ্চিত করিয়া দিয়াছে, কিন্তু উহার সকলক আবুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) ছাহাবীর বর্ণিত বহু সংখ্যক হাদীছ পূর্ব যুগের মোহাম্মদছগণের মাধ্যমে আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার বর্ণিত প্রায় ৭০০ হাদীছ বর্তমান কিতাবসমূহে রহিয়াছে।

বিশ্বের জায়-বিচারক ও জ্ঞানীগণ চিন্তা করুন। হুনিয়ার কোন সাক্ষ্যদাতা কি তাঁহার সাক্ষ্যের বিষয়বস্তুকে এরূপ তৎপরতার সহিত সংরক্ষণ করিয়া থাকে? অথচ হুনিয়ার সব কিছুই সাক্ষ্যের উপর

নির্ভরশীল। ছাহাবী, তাবেরী ও তাবেরী-তাবেয়ীগণ বিশেষ তৎপরতার সহিত হাদীছকে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। অতএব, তাঁহাদের সাক্ষ্য দ্বারা হাদীছ প্রমাণিত হওয়ার মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করা সীমাহীন ধৃষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পূর্ব বর্ণনায় স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছিল যে, রসূলুলাহ (দঃ)-এর বর্তমানেই হাদীছ লিখিত হইয়া থাকিত, এমনকি স্বয়ং তাঁহার আদেশে পুস্তিকা আকারেও লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু বাবু কোরআন শরীফ গ্রন্থাকারে একত্রিতরূপে সংরক্ষিত এবং প্রতিটি আয়াতের সহিত মোসলমানগণ পূর্ণরূপে পরিচিত না হইয়াছিল তাবৎ নবী (দঃ)-এর নিবেদন অনুযায়ী হাদীছকে ব্যাপকভাবে লিপিবদ্ধ করা এবং পুস্তক আকারে প্রচার করার প্রতি তৎপরতা অবলম্বিত হয় নাই। বরং ব্যক্তিগত পাণ্ডুলিপিরূপে রক্ষিত অবস্থায় এবং সাধারণ্যে পূর্বালোচিত সন্দেহমুক্ত যৌথিক সাক্ষ্যের উপরই সূত্র-পত্রসম্মার চলিয়া আসিতেছিল।

হাদীছ সংরক্ষণের দ্বিতীয় ধাপ :

তারপর যখন প্রথমে আবু বকর (রাঃ) এবং পুনরায় তৃতীয় খলীফা ওসমান (রাঃ) কোরআন শরীফকে সরকারী পরিচালনাধীনে একটি পূর্ণ গ্রন্থাকারে একত্রিত করিবার সুবন্দোবস্ত করিলেন এবং মোসলমানগণ দিন দিন কোরআনের প্রতিটি আয়াতের সহিত পূর্ণ পরিচিত হইয়া গেলেন, এদিকে মোসলমান শাসনকর্তা খলীফাগণও ইসলামী রাষ্ট্রের মূলে কুঠারাঘাতের সমস্ত রকমের ঝড়-ঝুপা ও ঝামেলা হইতে মুক্ত হইলেন, তখন ৯৯ হিজরী সনে অর্থাৎ রসূলুলাহ (দঃ)-এর এশ্বকালের শতাব্দীর মধ্যেই মাত্র ৮৯ বৎসর পরে ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) খলীফা নির্বাচিত হন। তাঁহার মহত্ব ও গুণাবলী আজ চৌদ্দশত বৎসর পরেও বিশ্ব-ইতিহাসের আকাশে দীপ্ত সূর্যের দ্বায় উজ্জল ও ভাস্কর। এবং তাঁহার অসাধারণ গুণরাজি ও মহত্বের দরুণ বিশ্ববাসী তাঁহাকে হযরত রসূলুলাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণের জীবদ্দহানীর চারি-মুখ খোলাকারে-রাশেদীনের সংলগ্নস্থানে অভিব্যক্ত করতঃ পঞ্চম খোলাফায়ে-রাশেদীন উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন।

এই স্বনামধন্য মহান ব্যক্তি খলীফা হওয়ার পর, তিনি এক মহান কার্যে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন, কোরআন শরীফ পূর্ণরূপে স্বীয় রূপ ধারণ করিয়া মোসলমানদের নিকট পূর্ণ পরিচিতির আগুন লাভ করিয়াছে এবং এক স্বয়ং সম্পূর্ণ কিতাব আকারে একত্রিত হইয়া সর্বত্র পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এখন উহার মধ্যে আর কোন প্রকার সংমিশ্রণের আশঙ্কা আদৌ নাই। সুতরাং তিনি খলীফাতুল-মোসলেমীন হিসাবে সরকারীভাবে স্বীয় পরিচালনাধীনে রসূলুলাহ (দঃ)-এর ছাহাবীগণ এবং তাঁহাদের শাগের্দগণের নিকট ভিন্ন ভিন্ন পাণ্ডুলিপি আকারে এবং কণ্ঠরূপে রক্ষিত হাদীছ সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া একত্র করার কার্যে অগ্রণী হইলেন। বেহেতু রসূলুলাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লামের হাদীছের প্রধান কেন্দ্র ছিল পবিত্র মদীনা, সেই জন্য খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) মদীনায় নিযুক্ত গভর্ণর আবু বকর ইবনে হব্বকে এই আদেশ পাঠাইলেন—

انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه

فاني خفت دروس العلم وزهاب العلماء

“আমার আদেশ—আপনি তন্ন তন্ন করিয়া রসূলুলাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লামের এক একটি হাদীছকে খুঁজিয়া বাহির করুন এবং লিপিবদ্ধ করিতে থাকুন। আমার তন্ন হইতেছে, একপ না করিলে কালক্রমে এই জ্ঞান-ভাণ্ডার বিলুপ্ত হইয়া যাইবে; এই জ্ঞান-ভাণ্ডারের রক্ষক—ছাহাবী ও তাবেয়ীগণ ভূ-পৃষ্ঠ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন।” (বোখারী শরীফ)

সুবিধা। লক্ষ্য করুন—সেকালে বিশ্ব-মোসলেম একটি রাষ্ট্রের অধীনে ছিল। সেই রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বা খলীফাতুল-মোসলেমীন—তাও প্রেসিডেন্সিয়াল শাসন ব্যবহার রাষ্ট্রে যেখানে সর্বকমন্ডার একমাত্র অধিকারী প্রেসিডেন্ট হইয়া থাকেন, সেই প্রেসিডেন্ট নিজ পরিচালনাধীন স্বীয় নিযুক্ত গভর্ণরগণের নিকট এক্ষপ লিখিত আদেশ পাঠাইয়া যে কার্য পরিচালনা করিলেন উহা যে কি ধরনের হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়।

নবী ছালাল্লাহ্ আলাইহে অসালামের পর প্রথম শতাব্দীর শেষ অর্থাৎ দ্বিতীয় শতাব্দীর আরম্ভ হইতেই হাদীছসমূহ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধকরণের যুগ আরম্ভ হইল এবং সরকারী পরিচালনাধীনেই তাহা আরম্ভ হয়। কথিত আছে—*الناس على دين ملوكهم* “রাষ্ট্রের নীতি ও গতির দ্বারা অন্তান্ত সমস্ত জনসাধারণ প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে।” সুতরাং সমগ্র মোসলেমজাতিই এই প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইল এবং ঘরে ঘরে রসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহ্ আলাইহে অসালামের হাদীছ খোজ করতঃ সাক্ষাদাতাদের নিকট হইতে হাদীছসমূহ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার কার্যে ব্যাপক সাড়া পড়িয়া গেল। মদীনাবাসী ইমাম মালেক হইতে আরম্ভ করিয়া ইমাম আহমদ ইবনে-হাম্বল, ইমাম আবু যারী, ইমাম বোহুরী, ইমাম বোখারী, ইমাম মোসলেম, ইমাম তিরমিধি, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাছারী প্রমুখ শত শত বিশিষ্ট ইমামগণ রসূলুল্লাহ্ (দঃ)এর হাদীছসমূহকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করেন। ইমাম মালেকের প্রসিদ্ধ কিতাব “মোয়াত্তা” হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় প্রত্যেক কিতাবই আজ তের শত বৎসরের অধিক কাল হইতে বিশ্বের বুকে গ্রহণীয় হইয়া আসিতেছে।

সেই যুগে রসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহ্ আলাইহে অসালামের হাদীছ খুঁজিয়া বাহির করার কিরূপ প্রেরণা মোসলেম সমাজে জাগিয়াছিল তাহার নমুনা বোখারী শরীফের ১২ পৃষ্ঠার বর্ণিত একটি হাদীছের ঘটনা পাঠ করিলে দিবালোকের স্থার স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। ঘটনাটি এই—একজন লোক একটি মাত্র হাদীছের জন্ত স্বীয় আবাসভূমি মদীনা হইতে প্রায় ৬০০ শত মাইল অতিক্রম করিয়া দামেস্ক শহরে আবুদ-দারদা (রাঃ) ছাহাবীর নিকট হাজির হইলেন, ঐ একটি মাত্র হাদীছে-রসূল ছাহাবীর মুখে শুনিয়া আসাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ছারীদ ইবনে-মোছাইয়েব—বিশিষ্ট তাবেরী মোহাদ্দেছ বলেন, আমি এক একটি হাদীছের তালাশে একাপারে কয়েক দিন ও কয়েক রাত্র ভ্রমণ করিয়া কাটাইয়াছি।

আবুল-আলীয়া নামক মোহাদ্দেছ বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের যুগের হাদীছ পিপাসুগণের এক্ষপ পিপাসা ছিল যে, তাঁহারা বহরা শহরে বসিয়া তথাকার লোক মারফৎ কোন একটি হাদীছ লাভ করার পর যদি শুনিতে পাইতেন যে, এই হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী এখনও মদীনায় জীবিত আছেন ; তবে সরাসরি ঐ ছাহাবীর মুখে হাদীছটি শুনিবার উদ্দেশ্যে বহরা হইতে সুদূর মদীনায় উপস্থিত হইতেন। বহরা হইতে মদীনায় দূরত্ব বহু শত মাইল। তদুপরি স্বয়ং ছাহাবীদের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহাও লক্ষ্য করুন—বোখারী শরীফের ১৭ পৃষ্ঠার বর্ণিত আছে, ছাহাবী জাবেয় (রাঃ) স্বয়ং ছাহাবী হইয়াও একটি মাত্র হাদীছ হাসিল করার জন্ত এক মাসের পথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। স্বয়ং জাবেয় (রাঃ) উক্ত ঘটনার বিবরণ দানে বলিয়াছেন, লোক মুখে শুনিতে পাইলাম, সিরিয়ার অবস্থিত একজন ছাহাবী রসূলুল্লাহ্ (দঃ) হইতে একটি বিশেষ হাদীছ বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই খবর শুনামাত্র আমি একটি উট ক্রয় করিলাম এবং উহার উপর সওয়ার হইয়া দীর্ঘ এক মাস ভ্রমণ করতঃ মদীনা হইতে সিরিয়ায় পৌঁছিলাম। খোজ লইয়া জানিতে পারিলাম—ঐ ছাহাবী আবজল্লাত ইবনে ওনাইস আনছারী (রাঃ)। আমি তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া একটি লোক

মারফৎ এই খবর পাঠাইলাম যে, জাবের আপনাত্ত্বারে অপেক্ষারত দণ্ডারমান। লোকটি ফিরিয়া আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কি আবছলার পুত্র জাবের? আমি বলিলাম—হাঁ। এই খবর শুনামাত্র তৎক্ষণাৎ ঐ হাযাবী বাহির হইয়া আসিলেন, আমরা উভয়ে কোলাকুলি করিলাম এবং বলিলাম, আমি জানিতে পারিয়াছি, আপনি বিশেষ একখানা হাদীছ রশূলুলাহ (স:) হইতে বর্ণনা করিয়া থাকেন, ঐ হাদীছখানা শুনিবার জন্য মদীনা হইতে আপনাত্ত্বার নিকট পৌছিয়াছি, কারণ ঐ হাদীছখানা আমি স্বয়ং রশূলুলাহ হাম্মালাহ আলাইহে অসাল্লামের মুখে শুনিতে পারি নাই। অতঃপর সেই হাযাবী ঐ হাদীছখানা আমার নিকট বর্ণনা করিলেন। (জামেউল-বরান ১৩ পৃঃ)

এইরূপে আবু আইয়ুব আনছারী (রাঃ), আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) এবং আরও হাযাবীর নামে অধিক আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, তাঁহারা যীম কঠুহ হাদীছের এক একটি বাক্য শুদ্ধির জন্য মদীনা হইতে মিশরে অবস্থানকারী সঙ্গী হাযাবীর নিকট পৌছিয়াছেন। আমরা এ ধরণের ঘটনাকে অতিরঞ্জিত বলিয়া কল্পনা করিব, কারণ ইসলামের প্রাণবন্ত—নবী হাম্মালাহ আলাইহে অসাল্লামের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ আমাদের হ্রাস পাইয়াছে।

সেই যুগের ইমামগণ এইরূপভাবে শত শত, হাজার হাজার সাক্ষ্যদাতার দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া লক্ষ লক্ষ হাদীছ সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং সেই লক্ষ লক্ষ সংগৃহীত হাদীছ হইতে স্মৃতিমন্ত্রণে এক একখানা হাদীছ-গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ১০,০০০ লক্ষ হাদীছ সংগ্রহ করিয়া উহা হইতে বাছিয়া ৩০,০০০ হাজার হাদীছ সম্বলিত একখানা হাদীছ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইমাম বোখারী (রাঃ) ৬,০০০ লকেরও অধিক হাদীছ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১৮০০ শত জন সাক্ষ্যদাতার মাধ্যমে আর ৪০০০ হাজার হাদীছ বাছিয়া একত্রিত করিয়া বক্ষ্যমান গ্রন্থ “ছহীহ-বোখারী” সকলন করিয়া গিয়াছেন, ইহারও মূল হইল শুধু মাত্র ২৬০২ বা ২৫১৩টি হাদীছ। এইরূপে বহু সংখ্যক হাদীছ গ্রন্থ আমাদের হাতে পৌছিয়াছে।

ইমাম বোখারীর শিক্ষকতায় ১০,০০০ হাজারেরও অধিক লোক বোখারী শরীফ শিক্ষা করিয়াছিলেন, সাধারণভাবে এক লক্ষ লোক তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

ঐ ৪০০০ এবং ২৬০২ সংখ্যাদ্বয়ের তাত্পর্য্য এই যে, এখানে দুইটি জিনিষ—একটি হইল মূল হাদীছ তথা রশূলুলের বাণী ইত্যাদি, দ্বিতীয় হইল উক্ত হাদীছের সাক্ষ্যদাতাগণের নামের ক্রিয়ন্তি তথা সনদ। বলা বাহুল্য—একটি হাদীছের বিভিন্ন সনদ থাকে, এমনকি এক একজন সাক্ষ্যদাতার বিভিন্নতায় একটি মূল হাদীছের এক এক শত সনদও হইয়া থাকে। হাদীছ শাস্ত্রের পরিভাষায় মূল হাদীছ ও সনদের সমষ্টিকে হাদীছ বলা হয়; এই সূত্রে একটি মূল হাদীছ এক শত বা ততোধিক হাদীছ পরিগণিত হইতে পারে। মোহান্দেছগণের সংগৃহীত হাদীছের যে সংখ্যা বর্ণিত হইয়া থাকে তাহা এই পরিভাষার ভিত্তিতেই। বোখারী শরীফে মূল হাদীছের সংখ্যা ২৬০২ কাহারও গণনায় ২৫১৩। উক্ত সংখ্যক মূল হাদীছই পরিভাষিক সঙ্গীমতে আর ৪০০০ সংখ্যায় পরিণত হইয়াছে। তন্মধ্যে বহু সংখ্যক হাদীছ একাধিক স্থানে উল্লেখ হইয়াছে; প্রত্যেক স্থানের হাদীছকে ভিন্ন ভিন্ন গণনা করিলে বোখারী শরীফের হাদীছ সংখ্যা হইবে ৭২৭৫।

ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহে আলাইহে

হাদীছ শাস্ত্রে বিশ্ব-সম্রাট উপাধিতে ভূষিত ইমাম বোখারীর আসল নাম ছিল মোহাম্মদ। তিনি পরিচিত ছিলেন—আবু আবদুল্লাহ নামে। পিতার নাম ছিল—ইসমাইল, পিতামহের নাম ছিল ইব্রাহীম, এপিতামহের নাম ছিল—মুগীরা। ১২৪ হিজরী ১৩ই শওয়াল শুক্রবার, জুমার নামাযের বাদ তিনি বোখারা শহরে ভূমিষ্ট হন। ২৫৬ হিজরী ১লা শওয়াল শনিবার রাত্রে (শুক্রবার দিবাগত রাত্রে) সমরকন্দের অন্তর্গত খরতঙ্গ নামক গ্রামে ইহ-জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। পর দিন (সৈদের দিন) জোহরের নামাযান্তে সেই গ্রামেই সমাহিত হন। তাঁহার বয়স তখন ১৩ দিন কম ৬২ বৎসর ছিল। যুত্থাকালে তিনি কোন পুত্র সন্তান রাখিয়া বান নাই। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ পারস্তের অধিবাসী ছিলেন, এপিতামহ মুগীরা পারস্ত হইতে খোরাসানের বোখারা শহরে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। বাল্যকালেই ইমাম বোখারীর পিতা মারা গিয়াছিলেন। তিনি মাতার নিকটই প্রতিপালিত হন। আহমদ নামে তাঁহার এক ভ্রাতা ছিলেন। ইমাম বোখারীর পিতাও মোহাদ্দেছ ছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই ইমাম বোখারীর উপর আলার বিশেষ রহমত দেখা যাইতে ছিল। বোখারী (র:) বাল্যাবস্থায়ই অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন; তাঁহার মাতা সে অন্ধ আলার দরবারে দোয়া করিতেন। একদিন তাঁহার মাতা ইব্রাহীম (আ: কে স্বপ্নে দেখিলেন, যেন তিনি বলিতেছেন, তোমার কান্নাকাটির দরুণ আল্লাহ তোমার ছেলের চক্ষু ভাল করিয়া দিরাছেন। নিদ্রাভঙ্গের পর স্বপ্নকে সত্যরূপে দেখিতে পাইলেন।

ইমাম বোখারী (র:) বর্ণনা করিয়াছেন—আমি লেখা-পড়া আরম্ভ করার পর দশ বৎসর বয়সে আমার অন্তরে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে এল্‌হাম হয় যে, আমি যেন হাদীছ কণ্ঠস্থ করার তৎপর হই। তখন হইতেই আমি অস্ত্র সব কিছু ছাড়িয়া হাদীছ শিক্ষার প্রতি ধাবিত হইলাম। হাদীছ শিক্ষার জন্য সিরিয়া, মিশর, আল-জাযারের, বছরা, কুফা, বাগদাদ, হেজাজ ইত্যাদি দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিলাম। ১৮ বৎসর বয়সে আমি বিবিধ গ্রন্থ সকলনে ব্যাপৃত হই এবং মদীনায়ে রশূলুলাহ ছানান্নাহ আলাইহে অসাল্লামের রওজা পাকের নিকটবর্তী স্থানে বসিয়া, হাদীছের সাক্ষ্যদাতা বা রাবীগণের জীবনেন্তিহাস রচনায় একখানা কিতাব সকলন করি। ইমাম বোখারী (র:) ৫৬ বৎসর বয়সে নিশাপুর নামক স্থানে কিছুকাল অবস্থান করেন। সেখানে তিনি হাদীছের দরস বা শিক্ষা দান করিতেন। দেশময় সমস্ত লোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া উঠিল; ইহাতে তথাকার কোন কোন মানুষের মধ্যে একটু রেশারেশির ভাব উদ্ভিত হইল। তাই বোখারী (র:) নিশাপুর ত্যাগ করতঃ বোখারার দিকে ফিরিয়া আসিলেন। দেশের জনগণ ইমামকে পুনরায় স্বদেশে পাইয়া আনন্দের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তাঁহার সহিত রাজ্যের শাসনকর্তার মনোমালিঙ্গের সৃষ্টি হইল।

ঘটনা এই ছিল যে—খালেদ ইবনে আহমদ নামক বোখারার তৎকালীন শাসনকর্তা ইমাম বোখারীর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, স্বয়ং তিনি বা তাঁহার পুত্রস্বয় ইমাম বোখারীর সকলিত কিতাব অধ্যয়ন করিতে চাহেন। ইমাম বোখারী (র:) যেন সেই শাসনকর্তা—আমীরের বাসভবনে উপস্থিত হইয়া এই কার্য সমাধা করেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় জানাইলেন—

انى لا ازل العلم ولا احملة الى ابواب السلاطين فان كانت له حاجة الى
شيء من هذا فليخبرنى فى مسجدى اوفى دارى فان لم يعجبك هذا فانت
سلطان فامنعنى من المجلس ليكون لى عند الله عذرىوم
القيامه انى لا اكتم العلم -

“দেখুন। আমি কখনও এলুমকে অপমানিত ও হেয় প্রতিপন্ন করিতে পারিব না। (লক্ষ লক্ষ গরীব জনসাধারণকে উপেক্ষা করিয়া) এই মহান রত্ন—এলুমকে আমীর-ওমরাদের দরওয়াজার প্রত্যাশী বানাইতে পারিব না। অতএব আমীর সাহেব যদি এলুমের প্রতি অমুরাগী ও আকৃষ্ট হইয়া থাকেন তবে তিনি যেন আমার মসজিদ বা বাড়ীতে উপস্থিত হন। আর যদি তিনি আমার এই ব্যবস্থাবলম্বনে অসন্তুষ্ট হন এবং আমার শিক্ষাদান কার্যে বাধা প্রদানের মনস্থ করেন তবে আমি সে বিষয় আদৌ শঙ্কিত নহি। কারণ, তাঁহার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া যদি আমার এই কার্য বন্ধ হইয়া যায় তবে আমি কেরামতের দিন আল্লাহ তায়ালায় নিকট এই বলিয়া কমার্ন গণ্য হইতে পারিব যে—আমি স্বেচ্ছায় এলুম চর্চা বন্ধ করিয়া দেই নাই।”

শাসনকর্তা আমীর এই নিতান্ত স্বাভাবিক ঘটনার দ্বারা মুঞ্চল লাভ না করিয়া কুফলের দিকেই অগ্রসর হইলেন এবং শুধু নিজেরই নহে বরং সমস্ত বোখারাবাসীদের হৃদয়গা টানিয়া আনিলেন। তিনি ইমাম বোখারীর এই ছায় সঙ্গত উত্তরে তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন, এমনকি বিভিন্ন ছলাকলার আশ্রয় গ্রহণে বোখারী (র:)কে দেশ ত্যাগে বাধ্য করিলেন।

হাদীছে-কুদসীতে আছে—**من عادى نى ولما مقداً اذن الله بالحرب** আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন, “যে ব্যক্তি আমার কোন প্রিয়পাত্রের সহিত শত্রুতা ধারণ করে, তাহার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করি!” এখানে ঠিক তাহাই হইল—ইমাম বোখারীর বিরুদ্ধে বড়যন্ত্রে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রত্যেকেই কিছু দিনের মধ্যে আমার অভিলাষে পতিত হইল। কিন্তু ইমাম বোখারী (র:) আর দেশে রহিলেন না। তিনি বোখারা হইতে “বাইকাক” নামক স্থানে চলিয়া গেলেন। এই সময় সমরকন্দের লোকেরা ইমাম বোখারী (র:)কে সমরকন্দ আগমনের জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইলেন। সেমতে তিনি সমরকন্দের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে “খরতজ” নামক গ্রামে যেখানে তাঁহার কিছু আত্মীয়-স্বজনের বসবাস ছিল, তথায় তিনি অবস্থান করিলেন। অতঃপর তিনি সমরকন্দ মুখী পুনঃ যাত্রা করিবেন—এমতাবস্থায় সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার আগমন সম্পর্কে সমরকন্দবাসীদের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সংবাদে তিনি অত্যন্ত হুঃখিত হইলেন এবং সেই যাত্রা তজ্জ করিয়া দিলেন।

ইমাম বোখারী (র:) উল্লিখিত ঘটনা সমূহের দ্বারা ব্যথিত হইয়া হুনিয়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন। একদা তিনি তাহাজ্জুদ নামাযের পর এই বলিয়া আল্লাহ তায়ালাকে ডাকিলেন—

اللهم قد ضاقت على الارض بما رحبت فاقبضنى اليك

“হে আল্লাহ! এই সুপ্রশস্ত জগৎ আমার জন্য সঙ্গীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, অতএব হে প্রভু! তুমি আমাকে আপন কোলে উঠাইয়া লও।” আল্লাহ তায়ালা স্বীয় মাহবুব—ইমাম বোখারীর এই ডাক বার্থ হইতে দিলেন না। তাঁহার আবদার পূরণ করা হইল এবং মাত্র এক মাসের মধ্যেই হাদীছ শাস্ত্রের সুনির্মল গগন হইতে এই জ্যোতির্মান সূর্য চিরতরে অন্তরিত হইয়া গেল।

رحمة الله تعالى واد خلة الجنة الفردوس

আবহুল ওয়াহেদ ইবনে আদম নামক এক বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন—এক রাত্রে আমি রসূলুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসালামকে স্বপ্নে দেখিলাম। তিনি স্বীয় ছাহাবীগণের এক জমাত সহ একস্থানে অপেক্ষমান অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন? আমি রসূলুল্লাহ (দ:)কে সালাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ (দ:)। আপনি কাহার অরেকফর এখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন? রসূলুল্লাহ (দ:) বলিলেন, মোহাম্মদ ইবনে ইসমাইলের অপেক্ষা করিতেছি। স্বপ্ন বর্ণনাকারী বলেন, কিছু দিন পরে

যখন আমি ইমাম বোখারীর মৃত্যু সংবাদ শুনিতে পাইলাম তখন হিসাব করিয়া দেখিলাম, আমি যে সময় স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম ঠিক সেই সময়ই ইমাম বোখারীর মৃত্যু হইয়াছিল। এই স্বপ্নের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, ইমাম বোখারীর পবিত্র আত্মা ইহকাল ত্যাগ করিয়া পরকালের অতিথি হইলে পর স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সঃ) ছাহাবীগণকে লইয়া এই অতিথির অভ্যর্থনা করেন। হাদীছে আছে—হযরত রসুলুল্লাহ (সঃ) করমাইয়াছেন—যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখে, সে প্রকৃত প্রস্তাবে আমাকেই দেখিয়া থাকে; কেননা শরতান কখনও আমার রূপ ধারণ করিতে পারে না।

গালেব ইবনে জিহ্রিল নামক খরতঙ্গ গ্রামবাসী—ইমাম বোখারী (রঃ) বাহার আতিথেয়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি বর্ণনা করিয়াছেন—ইমাম বোখারীকে কবরের মধ্যে রাখা মাত্রই কবরের চতুর্পাশে দেশকের স্তায় স্ফূরণ ও সুবাস ছড়াইতে লাগিল এবং ঐ সুবাস বহুদিন স্থায়ী ছিল। দেশ-বিদেশের লোক জেয়ারতের জন্য আসিয়া ২ থাকার মাটি নেওয়া আরম্ভ করিল, এমনকি আমরা অবশেষে ঐ কবরকে মজবুত বেটনী দ্বারা রক্ষা করিতে বাধ্য হইলাম।

ইমাম বোখারী (রঃ) স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন, যৌবনের আরম্ভে একদা স্বপ্নে দেখিলাম—আমি একটি পাখা হাতে লইয়া হযরত রসুলুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লামের নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছি এবং ঐ পাখার দ্বারা রসুলুল্লাহ (সঃ) হইতে মশা-মাছি ইত্যাদি হটাইয়া রাখিতেছি। ভাল একজন তা'বীর বর্ণনাকারীর নিকট এই স্বপ্ন ব্যক্ত করিলে তিনি আমাকে বলিলেন—তুমি এমন কোন কাজ করিবে যদ্বারা রসুলুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লামের প্রতি 'মৌজু' বা জাল ও মিথ্যা হাদীছের সম্বন্ধ করার মূল উৎপাটিত হইয়া যাইবে। ইহা শুনিয়া আমার মনে প্রেরণা জাগিল যে, আমি এমন একখানা কিতাব লিখিব যাহার মধ্যে সন্দেহমুক্ত ছহীহ হাদীছ থাকিবে; যে হাদীছ সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকিবে উহা গ্রহণ করিব না। এইরূপ মনস্থ করিয়া আমি পবিত্র মকা শরীফের মসজিদে-হারামে বসিয়া এই কিতাব লিখিতে আরম্ভ করি।

তিনি আরও বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এই কিতাবের মধ্যে প্রতিটি হাদীছ এতদূর সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিয়াছি যে, আল্লাহ প্রদত্ত স্বীয় ক্ষমতা, জ্ঞান, এলম ও অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রতিটি হাদীছকে সুন্দররূপে বাছিয়া ও পরখ করিয়া লওয়ার পরেও প্রত্যেকটি হাদীছ লিখিবার পূর্বে গোছল করতঃ দুই রাকাত নামায পড়িয়া আল্লাহ তায়ালায় নিকট প্রস্তোত্রা করার পর যখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, এই হাদীছটি সন্দেহ-লেশহীন ও ছহীহ তখনই আমি উহাকে আমার এই কিতাবের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি, ইহার পূর্বে নহে। এই কিতাবের পরিচ্ছেদ সমূহ পবিত্র মদীনায় রসুলুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লামের রওজা পাকের নিকটবর্তী বসিয়া সাজাইয়াছি এবং প্রতিটি পরিচ্ছেদ লিখিতেও দুই দুই রাকাত নামায পড়িয়াছি। এইরূপে আমি স্বীয় কঠোর চরম লক্ষ্য হাদীছ হইতে বাছিয়া বোল বংসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই কিতাবখানা সঙ্কলন করিয়াছি—এই আশায় অশ্রুপ্রাণিত হইয়া যে, আমি যেন এই কিতাবখানাকে লইয়া আমার দরবারে হাজির হইতে পারি।

আরও কতিপয় শুভ স্বপ্ন :

নজ্জম ইবনে ফোজাইল নামক বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ বর্ণনা করিয়াছেন, আমি স্বপ্নে দেখিলাম—হযরত রসুলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় রওজা শরীফ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন এবং বোখারী (রঃ) তাঁহার পিছনে পিছনে হাঁটিতেছেন। রসুলুল্লাহ (সঃ) যে যে স্থানে পা রাখিয়া হাঁটিতেছেন ইমাম বোখারী (রঃ) তাঁহার পিছনে ঠিক ঠিক ঐ স্থান সমূহে পা রাখিয়া হাঁটিতেছেন। বোখারী নিবাসী আবু হাতেম নামক বিশিষ্ট ব্যক্তিও এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা দিয়াছেন।

ইমাম বোখারীর একজন বিশিষ্ট শাগের্দ বর্ণনা করিয়াছেন—আমি রশূল্লাহ (দ:)কে স্বপ্নে দেখিলাম, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথায় বাইতেছ? আমি আরজ করিলাম, মোহাম্মদ ইবনে ইসমাইলের নিকট বাইতেছি। হযরত (দ:) বলিলেন, তঁাহাকে আমার সালাম বলিও।

আবু বারেন মালুওয়াযী নামক প্রসিদ্ধ একজন মোহাদ্দেছ বর্ণনা করিয়াছেন—একদা আমি পবিত্র কা'বা-ঘরের সংলগ্ন স্থানে শুইয়াছিলাম, তদবস্থায় স্বপ্নে দেখিলাম—রশূল্লাহ (দ:) আমাকে বলিতেছেন, হে আবু বারেন! তুমি কত কাল ইমাম শাফেরীর কিতাব পড়াইতে থাকিবে, আমার কিতাব পড়াও না কেন? আমি আরজ করিলাম—হজুর! আপনার কিতাব কোনটি? হযরত (দ:) উত্তরে করমাইলেন, মোহাম্মদ ইবনে ইসমাইল যে কিতাবখানা সকলন করিয়াছেন উহাই আমার কিতাব।

একটি জিজ্ঞাসার উত্তর

২২শে ডিসেম্বর ১৯৬৭ ইং মণিনিউজ ইংরাজী দৈনিকে বাংলা অনুবাদ বোখারী শরীফের মুখবন্ধ হইতে কতিপয় উদ্ধৃতি লইয়া কুমিল্লার জনৈক মুসলিম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ইমাম বোখারী তাঁহার সংগৃহীত বিপুল সংখ্যক হাদীছ হইতে অত্র গ্রন্থে অল্প সংখ্যক গ্রহণ করিলেন অপরগুলি বাদ দিলেন কেন?

১৩ই জানুয়ারী ১৯৬৮ ইং তারিখের দৈনিক আলোচনায় উক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ করা হইয়াছিল; পাঠকদের উপকারার্থে নিম্নে উহার উদ্ধৃতি দেওয়া হইল। মূল প্রশ্নের উত্তরে যে সব তথ্যের আবশ্যক প্রথমে তাহা ক্রমিক নম্বরে বর্ণনা করা হইতেছে—

(১) প্রকৃত প্রস্তাবে হাদীছ উহাই বাহা রশূললে করীম (দ:)-এর তরফ হইতে আসিয়াছে। আর রশূললে করীমের তরফ হইতে পাওয়া গিয়াছে—সুষ্ঠুরূপে প্রমাণিত ঐরূপ একটি বাক্যও উপেক্ষা করার অবকাশ মোসলমানদের অজ্ঞ নাই। কিন্তু সাধারণ ভাবে সাক্ষীগণ তথা রাবীগণ রশূল্লাহ (দ:)-এর নামে বাহা কিছু বর্ণনা করেন প্রাথমিক আলোচনার এই সবকেই হাদীছ আখ্যায় ব্যক্ত করা হয়।

(২) ছনিয়ার সব কিছুই সাক্য-প্রমাণের উপর নির্ভরশীল, কোন কোন সাক্য মিথ্যা কৃত্রিম, জাল ও হইয়া থাকে। কিন্তু সেই অজুহাতে সত্য সাক্যকে উপেক্ষা করিলে জগত অচল হইয়া পড়িবে। সুতরাং সব সাক্য গ্রহণ করাও যার না আবার সব সাক্য উপেক্ষা করাও যার না। বরং সত্যের মাপকাঠিতে সাক্যসমূহের মধ্যে বাছনী করিতে হয়।

(৩) বহু সংখ্যাকে সাক্যের বাছনী করিতে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই উহার মধ্যে বিভিন্ন রকম ও প্রকার পরিলক্ষিত হইবে যথা—সত্য ও বিতৃষ্ণ সাক্য, মিথ্যা ও জাল সাক্য এবং দুর্বল সাক্য—এর মধ্যেও আবার বিভিন্ন শ্রেণী পাওয়া যাইবে।

হাদীছ শাস্ত্রবিশারদগণ চুলচেরা বিচারে হাদীছ প্রাপ্তির সাক্য বাছনির মধ্যে নিম্ন রকম বিভক্তি করিয়াছেন। সাক্যদাতার গুণাবলী ও উহার মান এবং সাক্য প্রদানের স্মৃতিতার ভিত্তিতেই এই বিভক্তি যথা (ক) যে সাক্যে সত্য ও বিতৃষ্ণতার মাপকাঠির সমুদয় গুণাবলী পূর্ণ মাত্রায় এবং উচ্চমানে বিদ্যমান রহিয়াছে। (খ) যে সাক্যে এই গুণাবলী পূর্ণ মাত্রায়ই বিদ্যমান আছে, কিন্তু সাক্যদাতার স্মৃতিশক্তি এই শ্রেণীর উচ্চমান অপেক্ষা ক্রিষ্ণিত হালকা। (গ) যে সাক্যের মধ্যে এই সব গুণাবলীর অভাব রহিয়াছে, কিন্তু মিথ্যা গণ্য হওয়া বা সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কোন হেতু তথ্য নাই। (ঘ) যে সাক্যের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টিকারী কোন ত্রুটি বা হেতু রহিয়াছে। (ঙ) যে সাক্যে এমন কোন সাক্যদাতা রহিয়াছে বাহার সম্পর্কে হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে নয়, কিন্তু অজ্ঞ কোথাও মিথ্যা বলা প্রমাণিত হইয়াছে। (চ) যে সাক্যে এমন কোন সাক্যদাতা রহিয়াছে বাহার সম্পর্কে হাদীছ বর্ণনার সারা জীবনে একবারও কোন

ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা প্রমাণিত হইয়াছে—এইরূপ ব্যক্তি হাজার তওবা করিলে তাহার সাক্ষ্য কখনও কোন একটি হাদীছও গ্রহণীয় হইবে না।

(৪) সাক্ষ্যের প্রকার ও শ্রেণী বিভক্তির দ্বারাই পরবর্তী লোকদের জন্য হাদীছরূপে প্রাপ্ত বর্ণনা সমূহকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে যথা—“ক” গ্রুপের সাক্ষ্য প্রমাণিত হাদীছ সমূহকে হাদীছ (বিশুদ্ধ) হাদীছ বলা হয়, অর্থাৎ এগুলি যে প্রকৃত প্রস্তাবেই রসুলুলাহ (দঃ)-এর হাদীছ তাহা বিশ্বাস করিতে হইবে। “খ” গ্রুপের সাক্ষ্যের হাদীছ ‘ক’ গ্রুপের নিকটবর্তীই কিন্তু দ্বিতীয় নম্বরে; এই হাদীছকে হাদ্বান (ভাল) হাদীছ বলা হয়, অর্থাৎ ইহা সম্পর্কেও বিশ্বাস স্থাপন করা যায় যে, ইহা রসুলুলাহ (দঃ) হাদীছ। “গ” গ্রুপের সাক্ষ্যের হাদীছকে জয়ীক (দুর্বল) তথা দুর্বল প্রমাণে প্রাপ্ত হাদীছ বলা হয়। “ঘ” গ্রুপের সাক্ষ্যের হাদীছকে মরহদ—উপেক্ষণীয়, মোরামাল—অতিযুক্ত প্রমাণে প্রাপ্ত হাদীছ বলা হয়। “ঙ” গ্রুপের সাক্ষ্যের হাদীছকে মত্‌রুক—বর্জনীয় প্রমাণে প্রাপ্ত হাদীছ বলা হয়। “চ” গ্রুপের সাক্ষ্যের হাদীছকে মোজু’—জালিয়াত সাক্ষীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হাদীছ বলা হয়।

(৫) কালেক্সন—সংগ্রহ করা, ভেরীফিকেশন—বাছনি করা, সিলেক্সন—গ্রহণ করা এইসব ভিন্ন ভিন্ন স্তরের কাজ। সংগ্রহের সময় মোহাদ্দেছগণ সাধারণতঃ হাদীছ নামে প্রচারিত ও বর্ণিত অনেক কিছুকেই কুড়াইয়া লইতেন। সংগ্রহের স্বাভাবিক নিয়মও তাহাই। অতঃপর বাছনি ও গ্রহণের সময় এক এক মোহাদ্দেছ এক এক নীতি অবলম্বন করিয়াছেন এবং সেই নীতি পালনের মাধ্যমেই সংগৃহীত সংখ্যার বিরাট অংশ খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে এবং বাছনিকৃত গ্রহণীয় অংশের সংখ্যা কম হইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য—উক্ত নীতির কঠোরতার তারতম্যের ভিত্তিতেই বাছনিকৃত গ্রহণীয় অংশের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে।

স্মরণ রাখিতে হইবে, আমাদের নিকট রসুলুলাহ (দঃ)-এর হাদীছ বলিয়া প্রমাণিত হওয়ার জন্য কৃত্রিম, বর্জনীয়, উপেক্ষণীয় ও দুর্বল শ্রেণীর সাক্ষ্য প্রমাণ দৃষ্টেই হাদীছ নামে বর্ণিত বহু বর্ণনাকে জয়ীক, মোজু’, মোন্কার, মত্‌রুক ইত্যাদি নামের আখ্যা দেওয়া হয় এবং ঐ সবকে এড়াইয়া চলা হয়। নতুবা হযরত রসুলুলাহ (দঃ)-এর হাদীছ বলিয়া প্রমাণিত একটি অক্ষরকেও এরূপ আখ্যার দ্বারা স্পর্শ করা মোসলমানের পক্ষে অসম্ভব।

(৬) ইমাম বোখারী (রঃ) তাহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে তাহার সংগৃহীত বিপুল সংখ্যক হাদীছ হইতে বাছনি করিয়া শুধু ঐ হাদীছ সমূহকেই গ্রহণ করিয়াছেন বাহা “ক” গ্রুপের সাক্ষ্য প্রমাণিত, অন্য কোন গ্রুপের হাদীছকে তিনি তাহার এই গ্রন্থে शामिल করেন নাই। তার ফলেই ইমাম বোখারীর সর্বমোট সংগৃহীত হাদীছ সংখ্যা এবং এই গ্রন্থের গৃহীত হাদীছের সংখ্যা—উভয় সংখ্যায় বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে এবং এত বড় কঠোর বাছনিই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য।

সাধারণ একজন স্বর্ণকার বা স্বর্ণবণিক তাহার পেশাগত সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারা কতিপাধের ঘর্ষণ করিয়া হাজার হাজার স্বর্ণ-খণ্ডের মান নির্ণয় ও বাছনি করতঃ অল্প সংখ্যক খণ্ড গ্রহণ করেন। তাহার সেই পেশাগত দীর্ঘ সাধনায় অজিত অভিজ্ঞতা ও সেই অভিজ্ঞতার বাছনি কার্যের রহস্যকে পত্র-পত্রিকা মারফৎ হাতড়ানো যে বৃথা চেষ্টা তাহা অতি সুস্পষ্ট। হাদীছ শাস্ত্র তত মহান, তত উর্দ্বের কত সূক্ষ্ম, কত গভীর, কত প্রশস্ত এবং কত বিস্তীর্ণ। এই বিশাল ময়দানে এরূপ উত্তোগ গ্রহণ না করিতে অনুরোধ করি।

দুটী-পত্র

| | |
|--|----|
| রসুলুল্লাহর প্রতি অহীর প্রাথমিক বিবরণ | ১ |
| নিয়্যাতের হাদীছ | " |
| হেরাক্লিয়াস ও আবু সুফিয়ানের প্রণোত্তর | ২১ |
| ঈমানের হাকিকত বা ভাংপড়া | ৩০ |
| হেরাক্লিয়াসের বন্ধুর ঘটনা | ৩১ |
| আরও একটি মর্মান্তিক ঘটনা | " |
| রসুলুল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সুফল | ৩৩ |

প্রথম অধ্যায়—ঈমান

| | |
|---------------------------------------|----|
| ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিস | ৩৪ |
| ঈমানের শাখা-প্রশাখা | ৩৭ |
| মোসলমান কে? | ৪২ |
| ইসলামের উত্তম স্বভাব কি? | ৪৩ |
| ইসলামের বিশিষ্ট ভাল কাজ অন্ন দান | ৪৩ |
| ঈমানের একটি বিশেষ শাখা | ৪৪ |
| রসুলুল্লাহর মহাবত ঈমানের মূল | ৪৪ |
| ঈমানের স্বাদ লাভ করার উপায় | ৪৫ |
| ঈমানের একটি বিশেষ নিদর্শন | ৪৬ |
| ইসলামী জীবনের শপথ ও অঙ্গীকার | ৪৬ |
| দীন-রদ্বাৰ্বে সর্ব্ব ত্যাগ করা | ৪৭ |
| আল্লাহর মা'রেফাত অনুপ্রাণে ভয়ের সকার | ৪৭ |
| ঈমানের প্রতি কিরূপ অনুপ্রাণ আবশ্যক | ৪৯ |
| ঈমানের পরিমাণ কম-বেশী হওয়ার প্রমাণ | ৪৯ |
| লজ্জা-শরম ঈমানের শাখা | ৫০ |

| | |
|--|----|
| ইসলামের স্বীকারোক্তি এবং নামায ও যাকাত | |
| আদায় করিলে মোসলমান গণ্য হবে | ৫০ |
| ঈমান একটি প্রধান আমল | ৫২ |
| খাঁটি ও অখাঁটি ইসলামের বিশ্লেষণ | ৫৪ |
| ব্যাপকভাবে সালাম জারী করা ঈমানের শাখা | ৫৬ |
| কুফরের শাখা-প্রশাখা ছোট বড় হয় | ৫৭ |
| অন্যেকটি গোনাহ কুফরীর শাখা | ৫৮ |
| মোনাফেকের নিদর্শন | ৬২ |
| লাইলাতুল-কদরে এবাদৎ ঈমানের শাখা | ৬৩ |
| জেহাদ করা ঈমানের শাখা | ৬৩ |
| তারাবীর নামায ঈমানের শাখা | ৬৪ |
| রমযানের রোযা ঈমানের শাখা | ৬৪ |
| ইসলাম ধর্ম অতি সহজ | ৬৫ |
| নামায ঈমানের একটি বিশেষ অঙ্গ | ৭০ |
| খাঁটি ইসলামের উপকারিতা | ৭২ |
| আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় আমল | ৭২ |
| আমলে ঈমানের মাত্রা কম-বেশী হয় | ৭৩ |

| | |
|--|-----|
| যাকাত দান করা ইসলামের একটি অঙ্গ | ৭৪ |
| আনাযার যোগদান ঈমানের একটি অঙ্গ | ৭৫ |
| আল্লাহর মহাবত ও ভয় ঈমানের অঙ্গ | ৮০ |
| ঈমান, ইসলাম, এহসান ও কেরামতের বয়ান | ৮৪ |
| বিশেষ জটিল—তকদীর কি? | ৯০ |
| সন্দেহজনক কাজ হইতে সংযমী হওয়া | ৯৪ |
| গণীমতের পঞ্চমাংশ ইসলামী ট্রেটকে দেওয়া | ৯৯ |
| ছওয়ারের নিয়্যতে কাজ করার উপরই | ১০২ |
| হিত ও মঙ্গল কামনা বড় ধর্ম | ১০২ |

দ্বিতীয় অধ্যায়—এলম

| | |
|--|-----|
| এলমের ফজিলত ও প্রয়োজনীয়তা | ১০৫ |
| কথার মধ্যভাগে প্রশ্নের উত্তরদানে বিলম্ব | ১০৭ |
| এলমের কথা দরকার বশত: উচ্চৈঃস্বরে বলা | ১০৮ |
| ওস্তাদ কর্তৃক শাগের্দগণের পরীক্ষা করা | ১০৮ |
| দ্বীনের কথা খোঁচা লোক দ্বারা যাচাই করা | ১০৯ |
| অভিজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম বিষয়ে কিছু পাঠাইলে | ১১১ |
| এলমের মজলিসে ভিতরে স্থান পাইলে | ১১৬ |
| ওস্তাদ অপেক্ষা শাগের্দ অধিক জ্ঞানী হইতে | ১১৭ |
| জান ও মালের নিরাপত্তা | ১২০ |
| ইজ্জতের নিরাপত্তা | ১২১ |
| জ্ঞান, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা | ১২২ |
| জ্ঞান ও নহিহতের কথা এত বর্ণনা না করা | ১২৩ |
| দ্বীনের বুঝ ও জ্ঞান আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত | ১২৫ |
| দ্বীনের জ্ঞান ও এলম হাসিলে প্রতিযোগী | ১২৬ |
| খিজিরের নিকট মুহাম্মদ (সাঃ) সমুদ্রপথে গমন | " |
| কোরআনের এলম দানের দোয়া করা | ১২৬ |
| কি বয়সে জ্ঞাত ঘটনার হাদীছ গ্রহণযোগ্য? | ১২৭ |
| এলম হাসিল করিতে বিদেশে যাওয়া | ১২৭ |
| শিক্ষা লাভ করিয়া শিক্ষাদান | |
| করার ফজিলত | ১২৯ |
| দ্বীনের এলম উত্তীরা অজ্ঞতার প্রাবল্য | ১৩০ |
| কিভাবে এলম উত্তীবে? | ১৩০ |
| পণ্ডর উপর থাকিয়া মহআলাহ বর্ণনা করা | ১৩১ |
| মাথা বা হাতের ইশারায় মহআলার উত্তর | ১৩২ |
| পরস্পর পালাক্রমের ব্যবহার শিক্ষা লাভ | ১৩২ |
| একটি মহআলার প্রয়োজনে হফর করা | ১৩২ |
| শিক্ষা বা নহীহত দান কালে রাগ করা | ১৪০ |
| মুরব্বী ও ওস্তাদের সম্মুখে হাটু গাড়িয়া বসা | ১৪১ |
| প্রয়োজনবোধে কোন কথা পুনঃ পুনঃ বলা | ১৪২ |
| পরিবায়বর্গকে দ্বীন শিক্ষা দিবে | " |

| | |
|---|-----|
| নারীদের দীন শিক্ষায় বিশেষ তৎপরতা | ১৪৩ |
| নারীদের শিক্ষায় জ্ঞান সময় নির্ধারিত করা | " |
| শ্রোতা কথা না বুঝিলে পুনঃ জিজ্ঞাসা করিবে | ১৪৪ |
| আলেমের নিকট এসম লাভের সুযোগ | ১৪৪ |
| হযরত (দঃ)এর নামে মিথ্যা বলা মহাপাপ | ১৪৪ |
| এলেমের বিষয় লিপিবদ্ধরূপে সংরক্ষণ করা | ১৪৫ |
| জ্ঞানের কথা বা নহীত রাজে শিক্ষা দেওয়া | ১৪৭ |
| রাজিবেলা এলম চর্চা করা | ১৪৯ |
| এলম কর্তৃক করার তৎপরতা | ১৪৯ |
| আলেমগণের বক্তব্য চূপ করিয়া শুনা উচিত | ১৫১ |
| কোন আলেমকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়— | ১৫১ |
| বসা আলেমকে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করা | ১৫৫ |
| মানুষকে এলম সামান্যই দেওয়া হইরাছে | ১৫৫ |
| কোন মুতাহাব কার্ণে ভুল ধারণা সৃষ্টির | |
| আশকার উহা বর্জন করা | ১৫৬ |
| শ্রোতার জ্ঞান অহুপাতে কথা বলিবে | ১৫৭ |
| এলম শিক্ষায় লজ্জা-শরম বাধা না হওয়া | ১৫৭ |
| লক্ষ্য-ক্ষেত্রে মহাজানাহ অস্ত্রের দ্বারা জানা | ১৫৮ |
| মহজিদে এলমের চর্চা করা | ১৫৮ |

তৃতীয় অধ্যায়—অজু

| | |
|--|-----|
| অজুর বর্ণনা | ১৫৯ |
| অজু ব্যতিরেকে নামায হইবে না | " |
| অজুর ফজিলত | " |
| অমুজুতি ছাড়া শুধু সন্দেহে অজু ভাঙ্গে না | ১৬০ |
| কারণ বশতঃ অল্প পানি দ্বারা অজু করা | ১৬১ |
| উত্তমরূপে অজু করা উচিত | ১৬৫ |
| অজুর সময় উভয় হাতে মুখ ধুইবে | ১৬৬ |
| প্রত্যেক কাকের আরম্ভে বিহিমলাহ বলা | ১৬৬ |
| পায়খানায় ঘাইতে কি দোয়া পড়িবে ? | ১৬৬ |
| মল-মূত্র ত্যাগের সময় কেবলমুখী বসিবে না | ১৬৭ |
| পানি দ্বারা এস্তেজা করা | ১৬৯ |
| ডান হাতে এস্তেজা করা নিষিদ্ধ | ১৭০ |
| কুলুথ ব্যবহার করা কর্তব্য | ১৭০ |
| লিদ্ দ্বারা কুলুথ ব্যবহার নিষিদ্ধ | ১৭০ |
| প্রত্যেক অঙ্গ এক, দুই বা তিনবার ধুইবে | ১৭০ |
| অজুর মধ্যে নাকে পানি দেওয়া | ১৭৩ |
| অজু-গোসলে ডান দিকের কাজ প্রথম করা | ১৭৪ |
| নামাযের সময় হইলে পানি ভালো করিবে | " |
| মানুষের চুল ভিজান পানি পাক | " |
| যে পাত্রে কুকুর মুখ দিবে উহা ৭ বার ধুইবে | ১৭৫ |
| মল-মূত্রের দ্বার দিয়া কিছু বাহির হইলে | ১৭৬ |
| অজুর সময় অজু পানি ঢালিয়া দেওয়া | ১৭৭ |

| | |
|--|-----|
| অজু ছাড়া কোরআন পড়া যায় | ১৭৭ |
| বেতশ না হইয়া মাধায় চক্র আসার অজু নষ্ট | " |
| অজুর মধ্যে পূর্ণ মাথা মছেহ করা | ১৭৮ |
| অজুর ব্যবহৃত পানি অজু কাজে ব্যবহার | " |
| ত্রীর সঙ্গে এক পাত্রে বা কোন মহিলার - | |
| ব্যবহারের অবশিষ্ট পানি দ্বারা অজু করা | ১৭৯ |
| অজুর ব্যবহৃত পানি নাপাক নহে | ১৮০ |
| পাথর, কাঠ বা পিতলের পাত্রে অজু করা | " |
| এক সের পরিমাণ পানি দ্বারা অজু করা | " |
| চামড়ার মোজার উপর মছেহ করা | ১৮১ |
| গোশত ইত্যাদি খাইলে অজু নষ্ট হয় না | " |
| ছাত্ত, দুধ ইত্যাদি খাইয়া কুলি করা আবশ্যক | " |
| নিদ্রায় অজু ভঙ্গ হয়, তদ্রায় অজু নষ্ট হয় না | ১৮২ |
| অজু ভঙ্গ না হইলেও পুনঃ নূতন অজু করা | " |
| প্রশ্রাবের ছিটা-ফোটা হইতে সতর্ক না থাকা | |
| কবীরা গোনাহ | ১৮৩ |
| মধ্যভাগে কাহারও প্রশ্রাব বন্ধ করাইবে না | " |
| মসজিদের খালি মাটিতে প্রশ্রাব করা হইলে | " |
| শিশুর প্রশ্রাব ধৌত করিতে হইবে | ১৮৪ |
| কোন ব্যক্তিকে নিকটে রাখিয়া প্রশ্রাব করা | " |
| দাঁড়াইয়া প্রশ্রাব করা | " |
| কোন স্থানে রক্ত লাগিলে উহা ধুইতে হইবে | ১৮৫ |
| কাপড়ে দীর্ঘ লাগার স্থান শুষ্ক হওয়ার পূর্বে | " |
| উট, বকরী—হালাল জানোয়ারের প্রশ্রাব | " |
| পানি, ঘৃত ইত্যাদিতে নাপাক পড়িলে | ১৮৭ |
| অপ্রবাহিত বন্ধ পানিতে প্রশ্রাব করা | " |
| নামায অবস্থায় শরীরে নাপাক বস্তু পড়িলে | " |
| খুঁ ও কফ লাগিলে কাপড় নাপাক হয় না | ১৮৮ |
| কোন প্রকার মাদকীয় বস্তু দ্বারা অজু হয় না | ১৮৯ |
| প্রয়োজনে মেয়ে পিতার শরীর স্পর্শ করিবে | " |
| মেছওয়াক করা | " |
| অজু অবস্থায় শয়ন করার ফজিলত | ১৯০ |

চতুর্থ অধ্যায়—গোসল

| | |
|---|-----|
| গোসলের পূর্বে অজু করা | " |
| স্বামী জী একত্রে গোসল করা | ১৯২ |
| গোসলের পানির পরিমাণ | " |
| গোসলে তিনবার মাধায় পানি ঢালা | " |
| সমস্ত শরীরে একবার পানি ঢালা | ১৯৩ |
| হৃথের হাড়ির পানিতে গোসল করা | " |
| হাতে নাপাকী না থাকিলে হাত ধুইবার পূর্বে | " |
| পানির পাত্রে হাত দেওয়া যায় | " |
| একাধিকবার জীসঙ্গের পর গোসল করা | ১৯৪ |
| ফরজ গোসলের পূর্বকায় স্রুগন্ধ থাকায় | " |

করজ গোসল তুলিয়া মসজিদে প্রবেশ করিলে ১২৪
 প্রথমে মাথার ডান পাশ ধৌত করিবে ”
 নির্জন গোসলে উলঙ্গ হওয়া যায় ”
 নির্জন না হইলে পর্দাবাহায় গোসল করিবে ১২৫
 নাপাক অবস্থায় যাম ও এ অবস্থায় চলাকোয়া ১২৬
 নাপাক অবস্থায় গৃহে অবস্থান ও শয়ন করিলে ”
 স্ত্রী-পুরুষের নিজ এখনেই গোসল করজ হইবে ”

পঞ্চম অধ্যায়—হায়েজ বা ঋতু

হায়েজের আরম্ভ কিরূপে হইয়াছে ১২৭
 ঋতুবতী স্বামীর মাথা ধুইয়া ও আচড়াইয়া ”
 হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীর সংস্পর্শনে ২০০
 ঋতু অবস্থায় নারীদের সঙ্গে একত্রে শয়ন করা ”
 ঋতু অবস্থায় রোজা রাখা নিষিদ্ধ ২০১
 ঋতুবতী তওয়াফ ভিন্ন হজ্জের সব করিবে ২০২
 এন্তেহাজার বয়ান ২০৩
 হায়েজের রক্ত পরিষ্কার প্রণালী ২০৪
 হায়েজ অবস্থায় পরিহিত কাপড়ে নামায পড়া ”
 হায়েজান্তে গোসলে সুগন্ধি ব্যবহার ”
 হায়েজ আরম্ভ ও শেষ হওয়ার নিদর্শন ২০৫
 হায়েজ অবস্থায় পরিত্যক্ত নামায পড়িতে ”
 ঋতুবতীর ঈদগাহে বা দোয়ার সমাবেশে ২০৬
 হায়েজের সময় ছাড়া জরদ ও মেটে শ্রাব ২০৭
 এন্তেহাজার অবস্থায় হায়েজ খেবে হকুম ”
 ঋতুবতীর সংস্পর্শনে নামাযের কতি হইবে না ”

ষষ্ঠ অধ্যায়—তায়াম্মুম ২১১

অক্ষমতায় বাড়ীতেও তায়াম্মুম করা যায় ২১৩
 কুক দিয়া হাতের মাটি ফেলিয়া তায়াম্মুম করা ”
 পাক মাটি পবিত্রতা লাভের বস্তু ২১৪
 গোছলে বিপদের আশঙ্কায় তায়াম্মুম ২১৬

সপ্তম অধ্যায়—নামায

নামায করজ হওয়ার বিবরণ ২১৮
 নামায পড়িতে কাপড় পরা করজ ”
 একটি মাত্র চাদরে নামায পড়িবার নিয়ম ২১৯
 লম্বা চাদরে নামায পড়িবার নিয়ম ২২০
 অপ্রশস্ত কাপড়ে কিরূপে নামায পড়িবে ২২০
 বিধমীদের তৈরী কাপড়ে নামায পড়া ২২১
 নামায এবং অশ্রু অবস্থায়ও উলঙ্গ নিষিদ্ধ ২২২
 জামা, পায়জামা, জাদিয়া, জুকা পরিধান ২২২
 হস্তর আবৃত রাখা করজ ”
 উরু হস্তরের অন্তর্ভুক্ত কি-না ২২৩
 নারীগণ কিরূপ বস্ত্রে নামায পড়িবে ২২৪

নজী বস্ত্রে নামায পড়িলে নজার প্রতি
 ধ্যান করিবে না ২২৫
 জুশ-চিহ্নের বা অশ্রু কোন আকর্ষণীয় ছাপের
 কাপড় সম্পৃক্তে নামায পড়িবে না ২২৫
 রেশমী বস্ত্র পরিধান করিয়া নামায পড়া ২২৬
 লাল রঙ্গের কাপড় পরিধান ২২৬
 চৌকি ইত্যাদির উপর নামায পড়া ২২৭
 চাটাইয়ের উপর নামায পড়া ২২৮
 করাস ইত্যাদি বিছানার উপর নামায পড়া ২২৯
 অধিক উত্তাপে বস্ত্রাংশের উপর সেজদা করা ”
 চপ্পল পায়ে রাখিয়া নামায পড়া ”
 চামড়ার মোজা পায়ে রাখিয়া নামায পড়া ”
 কাঁবা দিককে কেবলারূপে গ্রহণ করা ২৩০
 নামায কেবলামুখী হওয়ার আবশ্যকতা ২৩১
 কেবলা নয় এমন দিকে ভুলবশতঃ নামায ২৩২
 মসজিদে থুথু দেখিলে নিজেই পরিষ্কার করা ”
 নামাযে থুথু ফেলার আবশ্যক হইলে ২৩৩
 ক্রটিগোচর মোক্তাদীদের নামাযান্তে সতর্ক
 করা ইমামের কর্তব্য ২৩৪
 কোন গোত্র-বিশেষের মসজিদ বলা যায় কি ”
 মসজিদে কোন বস্তু বর্জন করা ২৩৪
 মসজিদে দাওয়াত করা ও উহা কবুল করা ২৩৫
 মসজিদে বিচার বিভাগীয় কাজ করা ”
 আবাস গৃহে নামাযের স্থান রাখা চাই ২৩৬
 মসজিদে ডান পা প্রথমে রাখিবে ২৩৭
 যে স্থানে কবর আছে তথায় নামায পড়া ও
 কাকেরদের কবর স্থানে মসজিদ তৈয়ার করা ”
 বকরী, উট ইত্যাদি জন্তুর নিকটে নামায পড়া ২৩৯
 আল্লার গজবে শ্রংস স্থান এড়াইয়া নামায ২৪০
 আশ্রয়হীন নারীকে মসজিদে আশ্রয় দেওয়া ”
 প্রয়োজনে পুরুষ মসজিদে নিজা যাইতে পারে ২৪১
 বিদেশ হইতে বাড়ী ফিরিয়া নামায পড়া ২৪২
 মসজিদে বসিবার পূর্বে ২ রাকাত নামায পড়া ”
 মসজিদের ভিতরে অজু ভঙ্গ করা দৃশ্যীয় ”
 মসজিদ তৈরী কিরূপ হওয়া ভাল ”
 মসজিদ তৈরীতে সাহায্য গ্রহণ করা ২৪৪
 মসজিদ বা উহার জিনিষ তৈরী করিতে
 কারিগরের সাহায্য ২৪৫
 মসজিদ তৈরী করার ফজিলত ২৪৬
 মসজিদে সতর্কতার সহিত চলিবে ”
 মসজিদে ভাল কবিতা পাঠ করা ”
 মসজিদে (জেহাদ শিক্ষায়) অস্ত্র চালনা ”

মসজিদে ঋণ আদায়ের তাগিদ করা ২৪৭
 মসজিদ বাড়ি দেওয়া ও পরিষ্কার করা " "
 মসজিদের জমি খাদেম রাখা " "
 কয়েদীকে মসজিদের খুঁটির সহিত বাঁধা " "
 (নিরাশ্রয়) রুগ্নকে মসজিদে আশ্রয় দেওয়া ২৪২
 মসজিদে বাড়ীর দরওয়াজা কাটা যা " "
 বাতায়াতের রাস্তা করা " "
 মসজিদে কপাট ও ভাল-চাবির ব্যবস্থা রাখা ২৫০
 মসজিদে উঠে:যরে কথা বলা ২৫১
 মসজিদে উর্কযুখী হইয়া শোয়া " "
 মসজিদে বা লগ্ন তলবীক করা ২৫২
 মক্কা-মদীনার রাস্তায় মসজিদ ও রমুল্লার
 নামায স্থান সমূহের বর্ণনা ২৫৪
 ইমামের সম্মুখে ছোতরা মোক্তাদীদের যথেষ্ট ২৫৬
 ছোতরা কতটুকু ব্যবধান রাখিবে? " "
 মসজিদের খুঁটি সম্মুখীন নামায পড়া ২৫৭
 আরোহণের পশু বা বৃক সম্মুখী নামায পড়া " "
 খাট, চৌকি ইত্যাদি সম্মুখী নামায পড়া ২৫৮
 নামাযী ব্যক্তির সম্মুখ দিয়া গমনে বাধা দিবে " "
 নামাযীর সম্মুখ দিয়া গমন করা বড় গোনাহ ২৫৯
 ছোট শিককে কাঁধে লইয়া নামায পড়া " "
 নামাযের ওয়াক্ত নির্ধারণ ২৬৩
 নামাযের দ্বারা গোনাহ মাফ হইয়া থাকে ২৬৪
 ওয়াক্তমত নামায আদায় করার ফজিলত ২৬৯
 ওয়াক্তমত নামায না পড়া নামাযকে নষ্ট করা " "
 ঐ ঋকালে তাপ কমিলে জোহর নামায পড়িবে " "
 ওজর বশত: জোহরের নামায বিলম্বে পড়া ২৭৩
 আছরের নামায পড়ার সময় ২৭৪
 আছরের নামায ছুটিয়া যাওয়ার কতি ২৭৭
 আছরের নামায ছাড়িয়া দেওয়ার গোনাহ " "
 আছরের নামাযের ফজিলত " "
 সূর্যাস্তের পূর্বে আছরের ওয়াক্ত অন্ন পাইলে ২৭৮
 মগরেবের নামাযের ওয়াক্ত ২৭৯
 মগরেবকে এশা বলিবে না " "
 এশার নামাযের ফজিলত ২৮০
 ঐয়োজন ছাড়া এশার পূর্বে নিজা যাইবে না ২৮১
 ঘুমের ভাবে বাধ্য হইলে এশার পূর্বে ঘুমাইবে " "
 এশার নামাযের ওয়াক্ত মধ্যরাত পর্যন্ত থাকে ২৮২
 ফজরের নামাযের ফজিলত ২৮৩
 ফজরের নামাযের ওয়াক্ত " "
 যে কোন নামাযের এক রাকাত পড়ার সময়
 পাইলেই ঐ নামায ফরজ হইয়া যাইবে ২৮৩

ফজরের নামায পড়ার পর সূর্য পূর্ণ উদিত
 হওয়ার পূর্বে নফল নামায পড়িবে না ২৮৪
 আছরের নামায পড়ার পর নফল পড়া নিষিদ্ধ " "
 সূর্য উদয় ও অস্তের সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ " "
 আছরের নামাযের পর কাযা পড়া জায়েয ২৮৫
 একদল লোকের নামায কাজা হইলে আজান ও
 জমাতে ঐ কাজা নামায পড়িতে পারে ২৮৬
 নামাযের ওয়াক্ত চলিয়া গেলে স্মরণ হওয়া
 মাত্রই নামায পড়িবে ২৮৮
 এশার পরে পরিবারবর্গের সহিত কথা বলা ২৮৮
 আজানের বিবরণ
 মোসলমানদের মধ্যে আজানের প্রচলন ২৯১
 আজানের ফজিলত ২৯৩
 উঠে:যরে আজান দেওয়া উচিত " "
 বস্ত্রী হইতে আজান শুনা গেলে তথায়
 আক্রমণ করিবে না ২৯৪
 আজানের শব্দ শুনিয়া কি বলিবে " "
 আজান শুনিয়া কি দোয়া পড়িবে? ২৯৫
 আজান দেওয়ার ফজিলত " "
 আজানের মধ্যে কথা বলা " "
 কেহ সময় বলিয়া দিলে অন্ধ ব্যক্তি
 আজান দিতে পারে ২৯৬
 আজান ও একামতের ব্যবধানের পরিমাণ " "
 আজানের পর ঘরে থাকিয়া একামতের ২৯৭
 প্রত্যেক আজান ও একামতে নফল পড়া ভাল " "
 হকরেও আজান দিয়া জমাতে নামায পড়া ২৯৮
 আজান দিবার সময় মুখ উত্তর দিকে ঘুরাইবে ২৯৯
 নামাযে ছুটাছুটি করিয়া আসিবে না " "
 মোক্তাদী নামাযে কোন সময় দাঁড়াইবে ৩০০
 একামতের পর ইমামের কথা বলা ৩০১
 জমাতে সহিত নামায পড়া ওয়াজেয " "
 জমাতে সহিত নামাযের ফজিলত " "
 প্রথর রোজে জোহরের জম্ম মসজিদে যাওয়া ৩০৩
 মসজিদে আসিতে প্রতি পদে হওয়ার ৩০৪
 এশা ফজরের জমাতে হাজির হওয়ার তাকিদ " "
 ইমামের সঙ্গে একজন মোক্তাদী হইলেই
 জমাতে গণ্য হইবে " "
 মসজিদে নামায পড়া ও নামাযের জম্ম বলা ৩০৫
 সকালে-বিকালে মসজিদে যাওয়ার ফজিলত ৩০৬
 ফরজ নামাযের একামত হইলে স্মৃত বা
 নফল আরম্ভ করিবে না ৩০৬
 অসুস্থ অবস্থায় জমাতে শরীক হওয়া ৩০৭
 খাবার উপস্থিত, জমাতে আরম্ভ ৩০৮

সাংসারিক কাজের জগৎ জমাত ছাড়িয়ে না ৩০২
 এলম-মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিই ইমাম হবে ৩১০
 নিযুক্ত ইমাম উপস্থিত না থাকায় অজ্ঞ ইমাম
 জমাত আরম্ভের পর প্রথম ইমাম আসিলে ৩১১
 মোক্তাদী কোন্ সময় সেজদায় নত হইবে ৩১৩
 রুকু-সেজদায় ইমামের পূর্বে উঠিবার পরিণতি ৩১৪
 কীতদাস ইমামতি করিতে পারে " "
 ইমাম নামায পূর্ণাঙ্গ করে নাই, মোক্তাদী
 পূর্ণাঙ্গ করিয়াছে ৩১৪
 বিদ্রোহীদের নিযুক্ত ইমামের মোক্তাদী হওয়া ৩১৫
 এরূপ দীর্ঘ কেরাত পড়িবে না, যাহাতে কর্মবাস্ত
 ব্যক্তিগণ জমাতে যোগদানে বিরত থাকে ৩১৬
 একাকী দীর্ঘ নামায পড়িতে পারে ৩১৭
 কম সময় নামায পড়িলেও আরকান-আহকাম
 স্তূরূপে আদায় করিবে ৩১৭
 কোন কারণে অল্প সময়ে নামায শেষ করা " "
 নামাযে কাঁদিলে ৩১৮
 একামত আরম্ভেই কাতার সোজা করিবে,
 প্রয়োজনে পরেও উহার জগৎ তৎপর হইবে ৩১৮
 কাতার সোজা করিতে ইমাম দৃষ্টি রাখিবে " "
 কাতার সোজা করা নামাযের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ৩১৯
 কাতার সোজা এবং পূর্ণ না করা গোনাহ " "
 লাগালগি সারি বাধিবে কীক রাখিবে না " "
 মহিলা পেছনে দাঁড়াইবে ৩২০
 ইমাম-মোক্তাদীদের মধ্যে আড়াল থাকিলে " "
 নামাযের মধ্যে কোন্ কোন্ স্থানে হাত উঠাইবে
 এবং কতদূর উঠাইবে ৩২২
 নামাযে দাঁড়ান অবস্থায় ডান হাত
 বাম হাতের উপর রাখিবে ৩২৩
 নামাযে আল্লাহর ধ্যান বজায় রাখা কর্তব্য " "
 নামায আরম্ভে তকবীর বলার পর কি পড়িবে ৩২৪
 নামাযে উপরের দিকে তাকান জায়েয নহে ৩২৫
 নামাযে এদিক-ওদিক দেখা জায়েয নহে " "
 নামাযে প্রত্যেকের কেরাত পড়া ওয়াজেব " "
 বিভিন্ন নামাযের মধ্যে কেরাতের বিবরণ ৩২৭
 ছুরার অংশবিশেষ বা ১ রাকাত ২ ছুরা পড়া ৩৩০
 আমীন বলার ফজিলত ও নিয়ম ৩৩১
 কাতারে शामिल না হইয়া নিয়ত বাধা ৩৩২
 নামাযে প্রত্যেক উঠা-বসায় তকবীর বলিবে " "
 রুকুতে হাঁটুর উপর হাতদ্বয়ের ভর করিবে ৩৩৩
 রুকু-সেজদা ভালরূপে না করার পরিণতি " "
 রুকু-সেজদায় কত সময় অবস্থান করিবে ৩৩৪

ভালরূপে রুকু-সেজদা না করিয়া নামায
 পড়িলে এ নামায পুনরায় পড়িবে ৩৩৪
 রুকু-সেজদার মধ্যে দোয়া করা ৩৩৫
 রুকু হইতে উঠাকালে ইমাম কি বলিবে? ৩৩৬
 রুকু হইতে উঠিয়া সোজা ভাবে দাঁড়াইবে " "
 তকবীর বলার সঙ্গেই রুকু-সেজদায় যাইবে ৩৩৭
 সেজদার মহত্ব ও ফজিলত ৩৩৮
 সেজদায় রাহ পাজর হইতে ব্যবধান রাখা ৩৩৯
 সাতটি অঙ্গে সেজদা করিতে হইবে " "
 সেজদা করার নিয়ম ৩৩৯
 প্রথম ও তৃতীয় রাকাতে সেজদা হইতে
 দাঁড়াইবার নিয়ম ৩৪১
 দুই রাকাতের বৈঠকে তকবীর বলিবে " "
 নামাযের মধ্যে বসিবার নিয়ম " "
 নামাযে বসা অবস্থায় কি পড়িবে? ৩৪২
 সালামের পূর্বে দোয়া করিবে ৩৪৪
 মোক্তাদী ইমামের সঙ্গে সালাম করিবে ৩৪৫
 নামাযান্তে আল্লাহর জিকর করা " "
 ইমামের ডান-বামে বা মোক্তাদীমুখী বসা ৩৪৭
 হুর্গক বস্ত্র খাইয়া মসজিদে যাওয়া নিষেধ ৩৪৭
 নারীদের মসজিদে যাওয়া ৩৪৮
 জুমার দিন ও নামাযের আহকাম ৩৫০
 জুমার দিনে গোসল করা ৩৫৫
 জুমার দিন স্নগন্ধি ব্যবহার করা ৩৫৬
 জুমার দিন তৈল ব্যবহার করা " "
 জুমার দিন ভাল জামা-কাপড় পরিধান করা " "
 জুমার দিন কজরে কোন্ ছুরা পড়া উচিত ৩৫৭
 গ্রাম ও শহর উভয়ের মধ্যেই জুমা জায়েয " "
 জুমার নামাযে আদিষ্ট না হইলে সে
 গোসলে আদিষ্ট হইবে কি? ৩৫৭
 জুমার জমাতে উপস্থিতি অসাধ্য হইলে ৩৫৮
 কতদূর ব্যবধান হইতে জুমার উপস্থিত হওয়া " "
 জুমার নামাযের ওয়াক্ত ৩৫৯
 জুমার নামাযের জগৎ পদব্রজে উপস্থিত হওয়া " "
 জুমার দিন মসজিদে কাহাকেও উঠাইয়া " "
 তাহার স্থানে বসিবে না " "
 জুমার আজান " "
 ইমাম মিম্বরে বসিয়া আজানের উত্তর দিবেন ৩৬১
 মিম্বরে দাঁড়াইয়া খোৎবা দিবে " "
 খোৎবা আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা আরম্ভ করিবে " "
 দুই খোৎবার মধ্যে বসিতে হইবে ৩৬২
 ননোযোগের সহিত খোৎবা শুনিবে " "
 খোৎবার সময় আগত ব্যক্তির নামায পড়া " "

| | |
|--|-----|
| খোংবার সময় হাত উঠানো | ৩৬৩ |
| খোংবার মধ্যে বিশেষ দোয়া করা | " |
| খোংবা দানকালীন সকল চূপ থাকিবে | ৩৬৪ |
| জুমার দিনের একটি মূল্যবান সময় আছে | ৩৬৫ |
| জুমার নামাযের পূর্বে ও পরে স্তম্ভ পড়া | " |
| জুমার নামাযের অবসরে আমোদ-আনন্দ | " |
| শক্রর আক্রমণ সম্ভাবনাবস্থায় জমাতে | |
| নামায পড়ার নিয়ম | ৩৬৬ |
| যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় নামাযের নিয়ম | ৩৬৮ |

ঈদের দিন ও উহার নামায

| | |
|--|-----|
| ঈদের দিন আমোদ-এমোদ করা | ৩৬৯ |
| ঈদগাহে বাইবার পূর্বে কিছু খাওয়া উচিত | ৩৭১ |
| ঈদগাহে মিশরের ব্যবস্থা আবশ্যিক মহে | ৩৭২ |
| ঈদের খোংবা নামাযের পরে এবং ঈদের | |
| নামাযে আজান একামত হইবে না | ৩৭২ |
| ঈদের দিন অস্ত্র বহন | ৩৭৩ |
| জিলহজ্জের প্রথম দশ দিন এবাদত করা | " |
| ঈদগাহে এক পথে বাওয়া অস্ত্র পথে আসা | ৩৭৪ |
| বেতের নামাযের বিবরণ | ৩৭৬ |
| বেতের নামায পড়িবার নিয়ম | " |
| যানবাহনে থাকিয়া বেতের নামায পড়া | ৩৭৭ |
| দোয়া-কুহূৎ পড়ার স্থান | ৩৭৮ |
| এস্তেছকা নামাযের বিবরণ | ৩৭৯ |
| বৃষ্টি-বর্ষণ শরীফে বরণ করা | ৩৮১ |
| অধিক বেগে বায়ু বহিবার সময় দোয়া | " |
| বৃষ্টি পাইয়া আল্লাহ ভিন্ন অস্ত্র বস্তুর প্রতি | |
| সম্পূর্ণ করা আলার নাশোকরী | ৩৮২ |
| চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণকালীন নামায | " |
| চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণকালে করণীয় আমলসমূহ | ৩৮৮ |
| কোরআন শরীফে সেজদার আয়াতসমূহ | ৩৮৯ |
| মুসাফিরের নামাযের বিবরণ | ৩৯১ |
| তাহাজ্জুদ নামাযের বিবরণ | ৩৯৭ |
| তাহাজ্জুদে লোকদিগকে আগ্রহান্বিত করা | ৪০০ |
| রহুল (দঃ) কত বেশী তাহাজ্জুদ পড়িতেন | ৪০১ |
| তাহাজ্জুদ নামাযে দীর্ঘ কেরাত পড়া | ৪০২ |
| নবী (দঃ) কত রাকাত তাহাজ্জুদ পড়িতেন | " |
| তাহাজ্জুদের পর নিজা যাওয়া | ৪০৩ |
| তাহাজ্জুদ না পড়িলে শয়তানে ক্রিয়া করে | ৪০৩ |

| | |
|--|-----|
| যে ব্যক্তি সারারাত্র নিজামগ্ন থাকে শরতাম | |
| তাহার কানে প্রস্রাব করে | ৪০৩ |
| শেষ রাত্রে নামায পড়া ও দোয়া করা | ৪০৪ |
| তাহাজ্জুদ নামাযের সময় শেষ রাত্রে | ৪০৫ |
| রহুল (দঃ) রমজানেও তাহাজ্জুদ পড়িতেন | ৪০৬ |
| প্রত্যেক অজুর পরে নামায পড়ার ফজিলত | ৪০৭ |
| নফল এবাদতে প্রাবল্য অবলম্বন করা | " |
| তাহাজ্জুদ পড়ার অভ্যাস ত্যাগ করা চাই না | " |
| রাত্রিবেলা নিজা ডঙ্গ হইলে নামায পড়া | " |
| বেতেরের পর হুই রাকাত নামায বসিয়া পড়া | |
| এবং ফজরের স্তম্ভ না ছাড়া | ৪০৮ |
| ফজরের স্তম্ভের পরে কথাবার্তা বলা | " |
| এস্তেখারার নামায | " |
| ফজরের স্তম্ভের প্রতি বিশেষ তৎপরতা | ৪০৯ |
| ফজরের স্তম্ভে কেরাত কিরণ ? | ৪১০ |
| চাঁপতের নামায | ৪১০ |
| অজ্ঞাত স্তম্ভ নামায | ৪১১ |
| মকা ও মদীনায় হরমের মসজিদে | |
| নামাযের ফজিলত | ৪১২ |
| নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষিদ্ধ | ৪১৪ |
| নামাযরত অবস্থায় মায়ের ডাক শুনিলে | " |
| নামায অবস্থায় সেজদার স্থান পরিষ্কার করা | ৪১৫ |
| বিশেষ প্রয়োজনে নামাযে কোন কাজ করা | " |
| নামাযের সময় যানবাহন—পণ্ড ডাগিয়া | |
| বাওয়ার আশকা হইলে ? | ৪১৬ |
| নামাযে সালামের উত্তর দেওয়া চাই না | ৪১৭ |
| নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রাখা | ৪১৮ |
| নামাযের মধ্যে নামায ভিন্ন অস্ত্র ধ্যান করা | " |
| করজ নামাযে প্রথম বৈঠক ছুটিলে | ৪২০ |
| ভুলবশতঃ পাঁচ রাকাত পড়িয়া কেলে | ৪২১ |
| ভুলক্রমে ২ রাকাত পড়িয়াই যদি সালাম করে | " |
| অষ্টম অধ্যায়—জানায়ার বয়ান | ৪২৩ |
| জানায়ার সঙ্গে যাওয়া | ৪২৪ |
| যতকৈ কাফন পরাইবার পূর্বে ও পরে দেখা | ৪২৫ |
| আত্মীর-বজনকে মৃত্যু সংবাদ দেওয়া | ৪২৭ |
| জানায়ার যোগদানের সংবাদ দেওয়া | ৪২৮ |
| শিশু সন্তানের মৃত্যুতে ছওয়ারায়ে আশা | ৪২৯ |
| মৃতকে গোসল গোসল দেওয়ার নিয়ম | ৪৩০ |
| সাদা কাপড়ে কাফন দেওয়া | ৪৩১ |
| এহরাম অবস্থায় মৃত ব্যক্তির কাফন | ৪৩১ |

| | |
|--|-----|
| সাধারণ তৈরী জামা কাফনে দিবে না | ৪৩২ |
| প্রয়োজনে এক কাপড়েই কাফন দিবে | ৪৩৫ |
| জীবিতকালে খীর কাফন তৈয়ার রাখা | ৪৩৬ |
| নারীদের জন্ত শবযাত্রার যোগ দেওয়া | " |
| নারীদের জন্ত শোক প্রকাশের নিয়ম | " |
| কবর বেয়ারত করা | ৪৩৭ |
| কাহারও মৃত্যুতে ক্রন্দন করা | ৪৩৮ |
| শোক প্রকাশে কয়েকটি অপকর্ম | ৪৪১ |
| কাহারও মৃত্যুতে অনুতাপ প্রকাশ করা | " |
| শোক প্রকাশে মাথার চুল ফেলা নিষেধ | ৪৪২ |
| কাহারও মৃত্যুতে শোকাভিভূত হওয়া | ৪৪৩ |
| শোকাবস্থায় শোকপ্রকাশ হইতে না দেওয়া | ৪৪৩ |
| শোকপ্রাপ্তির প্রথম ভাগে ছবর ও ধৈর্য | ৪৪৪ |
| শোকবাক্য মুখে উচ্চারণ করা | ৪৪৫ |
| রোগীর নিকট বসিয়া কাঁদা | ৪৪৬ |
| জানাযা আসিতে দেখিলে দাড়াইয়া যাইবে | ৪৪৬ |
| জানাযার সহযাত্রীরা বাহকদের স্বাক্ষর হইতে | |
| জানাযা নামাইবার পূর্বে বসিবে না | ৪৪৭ |
| জানাযা লইয়া যথাসম্ভব দ্রুত চলিবে | ৪৪৮ |
| মৃত ব্যক্তি কি বলিয়া থাকে ? | " |

| | |
|---|-----|
| জানাযার নামায সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় | ৪৪৯ |
| দাফনকার্যে যোগদানের ছওয়াব | ৪৫০ |
| জানাযার নামাযে ইমামের দাড়াইবার স্থান | ৪৫১ |
| জানাযার নামাযে আলহামু দুবা পড়া | " |
| পবিত্র ও বরকতের স্থানে সমাহিত হওয়া | ৪৫২ |
| শহীদের জন্ত জানাযার নামায | ৪৫৩ |
| মৃতদেহকে কবর হইতে বাহির করা | ৪৫৪ |
| নাবালগে বালক ইসলাম গ্রহণ করিলে শুদ্ধ | ৪৫৫ |
| মুমুর্ অবস্থায় কাকের কলেমা পড়িলে | ৪৫৬ |
| কবরের উপর ভালো ইত্যাদি গাড়িয়া দেওয়া | ৪৫৭ |
| আত্মহত্যাকারীর অবস্থা কি হইবে ? | " |
| মৃতের প্রতি সর্বসাধারণের প্রশংসা | ৪৫৮ |
| কবরের আজাব | ৪৬০ |
| কবরের আজাব হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করা | ৪৭২ |
| মৃত ব্যক্তিকে তাহার স্থান দেখান হয় | ৪৭৩ |
| মোসলমানের নাবালগে সম্ভান মৃত্যু হইলে | " |
| কাফরেরদের নাবালগে সম্ভানের মৃত্যু হইলে | " |
| সোমবার দিন মৃত্যু হওয়া | ৪৭৮ |
| হযরত রসুলুল্লাহ (দ:) কবরের বিবরণ | ৪৭৯ |
| মৃত ব্যক্তির প্রতি খারাব উক্তি করা চাই না | ৪৮৩ |

ইমাম বোখারী (রঃ) পর্য্যন্ত অনুবাদকের সমদ

ইমাম মোহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বোখারী (রঃ)

- ১। শায়খ মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ফেরাবরী (রঃ)
- ২। " আবু মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ সরখসী (রঃ)
- ৩। " আবদুর রহমান ইবনে মুজাক্কর দাউদী (রঃ)
- ৪। " আবদুল আউয়াল ইবনে দীমা সিজবী (রঃ)
- ৫। " আস সেরাজুল হোসাইন ইবনুল মোবারক ববীদী (রঃ)
- ৬। " আবুল আল্লাস—আহমদ ইবনে আবু ডালেব (রঃ)
- ৭। " ইব্রাহীম ইবনে আহমদ তন্নুখী (রঃ)
- ৮। " শেহাবুদ্দীন—আহমদ ইবনে হজর আসকালানী (রঃ)
- ৯। " বায়হুদ্দীন—বাকারিয়া আনছারী (রঃ)
- ১০। " শামসুদ্দীন রমলী (রঃ)
- ১১। " আহমদ ইবনে আবদুল কুদ্দুস শামসাবী (রঃ)
- ১২। " আহমদ আল-কোশাগী (রঃ)
- ১৩। " ইব্রাহীম আল-কুদী (রঃ)
- ১৪। " আবু তাহের—মোহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম (রঃ)
- ১৫। " শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী (রঃ)
- ১৬। " আবদুল আজীজ দেহলভী (রঃ)
- ১৭। " মোহাম্মদ ইসহাক দেহলভী (রঃ)
- ১৮। " আবদুল গণী মোজাদ্দেরী (রঃ)

মাওলানা মোহাম্মদ কাসেম (রঃ)—১৯। মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব (রঃ)

শায়খুল-হিন্দ সাহমুহুল হাসান (রঃ)—২০। মাওলানা আশরাফ আলী খানভী (রঃ)

মাওঃ শাকীর আহমদ ওসমানী (রঃ)—২১। মাওলানা জফর আহমদ ওসমানী (রঃ)

আজিজুল হক

অনুবাদের হুইজন ওস্তাদ—মাওলানা শাকীর আহমদ (রঃ) ও মাওলানা জফর আহমদ (রঃ)

উভয়ের মধ্যস্থতায় হুইটি সনদ দেখানো হইল—বাহা শাহ আবদুল গণীর উপর মিলিত হইয়াছে।

তৃতীয় একটি সনদ সাহার মাধ্যম সংখ্যা কম হওয়ায় উচ্চমানের পরিগণিত।

ইমাম মোহাম্মদ ইসমাইল বোখারী—(১) মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ফেরাবরী (২) ইয়াহয়্যা ইবনে আশ্কার ইবনে মোকবেল ইবনে শাহান খাওলানী (৩) মোহাম্মদ ইবনে শাজবগ্ত (৪) বাবা ইউসুফ হেরাবী (৫) হাকেক মুকদ্দীন আবুল ফাতিহ আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ (৬) কুতুবুদ্দীন মোহাম্মদ ইবনে আহমদ নহরওয়ালী (৭) আহমদ ইবনে মোহাম্মদ আল-ইজল (৮) মোহাম্মদ ইবনে ছানাহু (৯) ছালেহ ইবনে মোহাম্মদ আল কানানী (১০) শায়খ আবেদ হিন্দী (১১) শাহ আবদুল গণী মোজাদ্দেরী (১২) মাওলানা খলীল আহমদ সাহারনপুরী (১৩) মাওলানা জফর আহমদ ওসমানী—আজিজুল হক।

আরম্ভ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ • وَالْمَلَوَةُ •

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি সারা জাহানের
প্রভু-পরওয়ারদেগার। দরুদ এবং

السَّلَامُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ •

সালাম সমস্ত নবী ও রসুলগণের প্রতি

خُشُوعًا عَلَى سَيِّدِهِمْ وَأَفْضَلِهِمْ نَبِيِّنَا

নিশেষতঃ নবী ও রসুলগণের সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ যিনি—যিনি
আমাদের নবী এবং

خَاتِمِ النَّبِيِّينَ • وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ •

সর্বশেষ নবী—তাঁহার প্রতি দরুদ ও সালাম এবং তাঁহার পরিবারবর্গ
ও সমস্ত ছাত্রাবীগণের প্রতি

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ •

এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাঁহাদের যত খাতি ও পূর্ণ অনুসারী হইবেন—
তাঁহাদের প্রতি।

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ •

আয় আল্লাহ। আমাদিগকে সেই অনুসারী দলভুক্ত বানাইবেন নিজ
কৃপাবলে, হে দয়ানয় সর্বদাত্তিক দয়ালু।

أَمِينَ ! أَمِينَ ! أَمِينَ !

আমীন। আমীন। আমীন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রহমানুর রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে

রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর প্রতি অহী এবং উহার প্রাথমিক অবস্থা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالتَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ

“আমি আপনার প্রতি অহী প্রেরণ করিয়াছি—যেমন নূহ (আঃ) এবং তাঁহার পরবর্তী নবীগণের প্রতি অহী প্রেরণ করিয়াছিলাম।” অর্থাৎ মানব জাতির সংস্কার ও জীবন গঠনের যে নীতি ও আদর্শ আপনার নিকট প্রেরণ করা হইতেছে ইহার ছেলছেলাহ বা ক্রমান্বর্তন হয়রত নূহ (আঃ) হইতে শুরু হইয়া তাঁহার পরবর্তী নবীগণের প্রতি যেমন আসিয়াছিল, তেমনি ভাবে আপনার প্রতিও আসিয়াছে। আল্লাহ তরফ হইতে এরূপ নীতি ও আদর্শ নাযেল হওয়া নূতন বিষয় নহে, যাহা দেখিয়া কেহ আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারে।

হয়রত নূহ আলাইহেছালামের পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি অহী সাধারণতঃ জাগতিক প্রয়োজন ও জীবিকা নির্বাহের কার্য-পদ্ধতি শিক্ষা দানের বিষয়েই বেশী মাত্রায় অবতীর্ণ হইত, ধর্মীয় বিষয় মোটামুটি ও মৌলিক আকারে থাকিত। ইহজীবনেই পরকালের অদিক উন্নতি লাভের ব্যবস্থা—শরীয়তের বিস্তারিত বিবরণ ও আহকাম নূহ (আঃ) হইতেই নাযেল হওয়া আরম্ভ হয় এবং কালক্রমে উহা রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর সম্পূর্ণতা লাভ করে, তাই এখানে হয়রত নূহের প্রতি প্রেরিত অহীর তুলনা উল্লেখ করা হইয়াছে।

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال سمعت

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ. وَإِنَّمَا لِمَا نَوَيْ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوُّهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ *

مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ *

* এই হাদীছ থানা বোখারী শরীফের সাত জায়গায় উল্লেখ করা হইয়াছে, এখানে হাদীছ থানা অসম্পূর্ণ উল্লেখ হওয়ায় ২২০ পৃষ্ঠা হইতে সম্পূর্ণ হাদীছ থানা এখানে উদ্ধৃত হইল।

অর্থ—ওমর (রা:) বলিয়াছেন, রমূল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসালামকে বলিতে শুনিয়াছি, নিশ্চয় জানিও—আল্লার নিকট কাজের ফলাফল মানুষের নিয়্যত অনুসারে হয়। প্রত্যেক মানুষ তাহার কাজের ফলাফল আল্লার নিকট তদ্রূপই পাইবে যত্নপ সে নিয়্যত করিবে। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আল্লার রমূলকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে হিজরত করিবে, সে আল্লার এবং রমূলের সন্তুষ্টি নিশ্চয়ই পাইবে। পক্ষান্তরে (এত বড় কষ্টের নেক কাজটিও কণস্থায়ী জগতের কোন হীনস্বার্থ প্রণোদিত হইয়া কারিলে—যেমন, কিছু) টাকার লোভে বা কোন রমণীর প্রতি আসক্ত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার এবং কামরিপু চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে করিলে তাহার ফল তদ্রূপই সে পাইবে যত্নপ সে নিয়্যত করিয়াছে।

নিয়্যত অর্থঃ—মনে মনে চিন্তা করতঃ উদ্দেশ্য ঠিক করিয়া কাজ করা।

হিজরত অর্থঃ—যে কোন স্থানে, যে কোন সংসর্গে বা যে কোন পরিবেশে থাকিয়া আল্লার দীন পালন করা ছাড়র হইয়া পড়িলে আল্লার আদেশ মতে সেই স্থান, সেই পরিবেশ পরিত্যাগ করা। প্রথম যুগে মোসলমানগণ মকায় তাহাদের ধর্ম-কর্ম অমুষ্ঠানে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় আল্লার তরফ হইতে তাহাদিগকে আদেশ করা হইয়াছিল মকায় পরিত্যাগ করিয়া মদীনায় যাইতে। এই মহান কাজকে কোরআন-হাদীছের ভাষায় “হিজরত” বলা হয়।

সরল ব্যাখ্যাঃ—মানুষ যখনই কোন কাজ করে, সে নিশ্চয়ই একটা উদ্দেশ্য মনে মনে ঠিক করিয়া ঐ কাজের প্রতি অগ্রসর হয়—ইহা মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব। এই উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই মানুষ তাহার কর্মের ফলাফল আল্লার নিকট পাইবে। যেমন, “হিজরত” অতি বড় পুণ্যের কাজ—অতি কঠোর ফরজ কাজ; এতে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ধন-দৌলত, ঘর-বাড়ী সবকিছু পরিত্যাগ করিতে হয়। কোরআন-হাদীছে হিজরতের অনেক ছওয়াব, অনেক ফজিলত বর্ণনা করা হইয়াছে। যখন কোন ব্যক্তি সব কিছু পরিত্যাগ করতঃ এই কঠিন আমলের জন্ত প্রস্তুত হইবে, নিশ্চয় সে একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়া অগ্রসর হইবে। যদি তাহার উদ্দেশ্য হয় এই মহান ত্যাগের দ্বারা আল্লাহকে এবং আল্লার রমূলকে সন্তুষ্ট করা এবং মদীনাতে থাকিয়া ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা, তবে সে তাহার এই কর্মের ফল তাহার উদ্দেশ্য ও নিয়্যত অনুসারেই পাইবে। অর্থাৎ ছওয়াব ও ফজিলতের অধিকারী হইবে, আল্লার নিকট বড় মর্তবা পাইবে, তাহার এই দেশত্যাগ সার্থক হইবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অল্প কোন উদ্দেশ্য নিয়া হিজরত করিবে, যেমন সুখ্যাতি লাভ করা, টাকা উপার্জন করা, কোন রমণীর প্রেম করা বা এই জাতীয় অল্প কোন হীন স্বার্থ হাসিল করা, সে কোনরূপ ছওয়াব বা ফজিলত পাইবে না, বরং আল্লার নিকট তাহার হিজরত অনর্থক হইবে। যেরূপ নানারকম উদ্দেশ্য হাসিলের জন্ত বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করা হয়, তাহার জন্ত মদীনায় আসাও তদ্রূপই গণ্য করা হইবে। আল্লার নিকট হিজরতরূপে গৃহীত হইবে না। এত কষ্ট, এত ত্যাগ স্বীকার করা সত্ত্বেও নিয়্যত খালেছ ও শুদ্ধ না হওয়ার কারণে আল্লার নিকট এত কঠিন আমলেরও কোন মূল্য হয় না।

রসুলুল্লাহ (দঃ) এখানে হিজরতকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। বুখাইয়া দিয়াছেন যে, হিজরত এত বড় মহৎ কাজ ও মহান ত্যাগ হওয়া সত্ত্বেও মানুষের নিয়্যাতের তারতম্যের কারণে তাহার ফলাফলেও কতদূর পার্থক্য হইয়া থাকে। এইরূপে প্রত্যেকটি কাজেই নিয়্যাতের তারতম্যের কারণে পার্থক্য থাকিবে। যেমন—অন্য এক হাদীছে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, (একদল লোক হইতে) সর্বপ্রথম বিচারের জন্য কেয়ামতের দিন এমন একজন লোককে হাজির করা হইবে, যে স্বীয় জীবন কোরবান করিয়া শহীদ হইয়াছিল। সে আল্লাহ তায়ালায় যে সমস্ত নেয়ামত সমূহ উপভোগ করিয়াছে (চক্ষু, কণ, জিহ্বা, হস্ত, পদ, আঙুন, পানি, মাটি, বাতাস, আহার, বিবেক বুদ্ধি ও শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি) সেই সমস্ত তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি এই সমস্ত নেয়ামতের শোকর কি করিয়াছ? শোক্রিয়া স্বরূপ কি কি কাজ করিয়াছ? সে উত্তর করিবে, হে প্রভু! আমি তোমার দ্বীনের জন্য নিছের জীবন পর্যন্ত কোরবান করিয়াছি, জেহাদ করিয়া শহীদ হইয়াছি, তোমার ইসলামের জন্য জীবন দিতেও কুষ্ঠাবোধ করি নাই। তখন আল্লাহ বলিবেন, তুমি মিথ্যা বলিতেছ—তুমি আমার জন্য বা আমার দ্বীন ইসলামের জন্য জেহাদ কর নাই, তুমি জেহাদ করিয়াছ নাম ও যশের জন্য, বড় বীর পুরুষ বলিয়া অভিহিত হওয়ার জন্য। তুমি সে ফল পাইয়াছ, অর্থাৎ লোকে তোমাকে “বড় বীর পুরুষ” বলিয়াছে। আমার জন্য তুমি কোন কাজ কর নাই, সুতরাং আমার এখানে তোমার কোন পুরস্কার নাই। অতঃপর ফেরেশতাগণ আদেশ পাইয়া তাহাকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া দোযখে নিক্ষেপ করিবে। তারপর একজন আলেমকে হাজির করা হইবে। তিনি কোরআন-হাদীছ শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং প্রকাশে বাহ্যিক ভাবে তদ্রূপ আমলও করিতেন, তাহাকেও পূর্বোক্তরূপে জিজ্ঞাসা করা হইবে। তিনি উত্তর দিবেন, দয়াময় প্রভু! আমি জীবনভর আপনার কোরআন এবং আপনার রসুলের হাদীছ শিক্ষা করিয়াছি এবং শিক্ষা দিয়াছি—এ সবই একমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্য করিয়াছি। আল্লাহ বলিবেন, তুমি মিথ্যা বলিতেছ, তোমার উদ্দেশ্য ছিল, লোকে তোমাকে আলেম সাহেব, হাফেজ সাহেব, মাওলানা সাহেব বলিয়া সম্মান করুক, (হাদিয়া নজরানা পেশ করুক ইত্যাদি) সে সব তুমি পাইয়াছ। লোকে তোমাকে যথেষ্ট সম্মান ও তাকীম করিয়াছে। তুমি আমার জন্য বা আমার ইসলামের জন্য কিছুই কর নাই; কাজেই আমার নিকট তোমার কোন পুরস্কারও নাই। অতঃপর ফেরেশতাগণ আল্লাহ তায়ালায় আদেশে তাহাকেও হেঁচড়াইয়া টানিয়া আনিয়া দোযখে নিক্ষেপ করিবে। তারপর একজন ছনী দানশীল ধনীকে উপস্থিত করা হইবে। তাহাকেও ঐরূপ প্রশ্ন করা হইবে এবং সে উত্তর করিবে, হে দয়াময় প্রভু! যে যে স্থানে দান করিলে তুমি সন্তুষ্ট হও, সে সমস্ত জায়গায় আমি দান-খয়রাত করিয়াছি—একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য। আল্লাহ বলিবেন—তুমি মিথ্যুক, তোমার নিয়্যতে ছিল যে, তোমার নাম হউক; লোকে তোমাকে দাতা বলুক, লোকে

তাহা বলিয়াছে। সত্যিকারভাবে তুমি আমার উদ্দেশ্যে কিছুই কর নাই; কাজেই আমার কাছে তোমার কোন পুরস্কার নাই। অতঃপর তাহাকেও ঐরূপে দোষে নিষ্পেক্ষ করা হইবে। (মোসলেম শরীফ)

পাঠকবর্গ! হযরত রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রত্যেকটি কার্য্য এবং প্রত্যেকটি বাক্যের ভিতর জগৎবাসীর জন্য অধিতীয় ও অতুলনীয় আদর্শ মূলনীতি নিহিত থাকে। আলোচ্য হাদীছটির ভিতরেও প্রত্যেকটি মানুষের জন্য তার জীবন গঠন ব্যাপারে অতি মূল্যবান একটি মূলনীতি রহিয়াছে। এখান হইতে উহা চয়ন করিয়া লইয়া জীবনের কর্মসূচীর মূলে ইহাকে স্থান দান করাই স্বীয় জীবনকে স্বার্থক করার একমাত্র উপায় এবং ইহা ব্যতিরেকে তাহার জীবন বার্থ হইতে বাধ্য—এই সতর্কবাণীও প্রত্যেকের স্মরণ রাখা উচিত।

সেই মূলনীতিটি হইল এহ্লাহে-নিয়াত অর্থাৎ নিয়াত দ্রুস্ত করা। এতদ্বারা দুইটি বিষয় বুঝায়; প্রথমত:—কার্য্যের পূর্বে উদ্দেশ্য স্থির করা, গাফলতীর সহিত লক্ষ্যহীন অবস্থায় কোন কাজ না করা। দ্বিতীয়ত:—উদ্দেশ্য স্থির হওয়ার পর উহাকে আল্লাহ ও রসুলের নির্ধারিত কষ্ট পাত্রে ঘসিয়া দেখা যে, ইহা দ্বারা আল্লাহ ও রসুল সন্তুষ্ট হইবেন, কি অসন্তুষ্ট। মোটকথা, কর্ম জীবনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ এরূপ সতর্কতামূলক হওয়া চাই যেমন বাবলা কাঁটার গভীর জঙ্গলে নগ্ন পা রাখিতে হইয়া থাকে। সদা শঙ্কিত থাকিবে, যেন আমার প্রভু আমাকে এরূপ কোনও উদ্দেশ্য চয়নে না দেখেন যাহাতে তিনি অসন্তুষ্ট হন।

এই মূলনীতির প্রভাব অতি বাপক। মানব জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যত ক্ষেত্রের যত কাজ সম্মুখে আসিবে, প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি কাজ তাহাকে অতি সতর্কতা সহকারে এই মূলনীতি সামনে রাখিয়া উহাকে কাজে পরিণত করিতে হইবে। রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে, আন্দোলনের ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এবং সাংসারিক, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক, শিল্প ব্যবসায় ও চাকুরী জীবনের দায়িত্ব পালনে এই মূলনীতির দ্বারা মানব সমাজ বহু উন্নতি সাধন করিবে, এই আশায়ই স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দ:) এবং তাহার পরে তাহার সুযোগ্য খলীফা ওমর (রা:) মিসরের উপর দাঁড়াইয়া সর্বসাধারণে এই হাদীছবানা এবং এই মূলনীতি প্রচার করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়—বর্তমান কালের নেতৃবৃন্দলকারী লীডারগণ এবং আন্দোলনকারী কর্মীগণ সকলেই এই মূলনীতিকে বাদ দিয়া এই মহা-মূল্যবান আদর্শ হইতে বহু দূরে সরিয়া নেতৃবৃন্দ ও আন্দোলন চালাইলেন। তারই ফলে যে উন্নতে মোহাম্মদীর প্রতিটি কর্মীর প্রত্যেকটি কাজ নিখুঁত, মহান, অতি উন্নত এবং কামিয়াব হওয়া উচিত ছিল, সেই উন্নত নামধারীদের প্রতিটি কাজই আজ বিফল ও হীনোন্মত্ত হইতেছে। হীনোন্মত্ত দূর করার বহু প্ল্যান-প্রোগ্রাম করা হইতেছে বটে, কিন্তু সেই প্ল্যান প্রোগ্রামই আবার হীনোন্মত্ত হইয়া যাইতেছে। ইহা হইতে জাতি ও দেশকে বাঁচাইতে হইলে সমাজের প্রত্যেকটি লোকের ভিতর এই মূলনীতির আদর্শ অনুযায়ী এখলাছ, লিপ্সাহিয়াত—আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা, আখেরাতের হিসাবের ভয় করা,

আল্লামার দীন-ইসলামের ও মোসলেম জাতির উন্নতি সাধনের জন্ত নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা এবং আল্লামার বান্দাদের সেবার জন্ত কাজ করা ইত্যাদি আদর্শ, মনোবল ও প্রেরণা সৃষ্টি করিতে হইবে।

এই হাদীছে বর্ণিত মূলনীতির আদর্শ যেমন বড় বড় কর্মক্ষেত্রে প্রযোজ্য তেমনি ব্যক্তিগত দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়সমূহেও প্রযোজ্য এবং প্রতি ক্ষেত্রেই এই আদর্শের অনুসরণ করিলে প্রকৃত উন্নতির পথ খুজিয়া পাওয়া যাইবে।

ইমাম গায়্‌যালী (র:) দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছেন—যেমন আতর ইত্যাদি সুগন্ধি যদি কেহ শুধু সুগন্ধ উপভোগের বা সুন্দর পরিপাটি দেখাইবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে তবে উহা একটি “সোনাহ” কাজ হইবে; উহাতে ছওয়াব বা গোনাহের প্রশংসা আসে না। আর যদি কেহ নিজের অহঙ্কার বা লোক সম্মুখে নিজের বড়ত্ব ও অত্যাচ্ছাদিত লোকদের হেয়ত্ব প্রকাশার্থে অথবা উহা হইতেও জঘন্য—বেগানা নারী বা পুরুষদের চিত্তাকর্ষণার্থে ব্যবহার করে, তবে এই সুগন্ধি এবং সুপারপাট্য তার পক্ষে অতি বড় গোনাহে পরিণত হইবে। আর যদি কেহ এই সব জিনিস ব্যবহার করে রমুল্লাহ (দঃ) সুগন্ধি পছন্দ করিতেন এই উদ্দেশ্যে বা লোক সমাজে গেলে খারাব গন্ধে তাহাদের কষ্ট হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে এবং সুগন্ধি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দ্বারা নিজের মন-মস্তিষ্ক প্রফুল্ল ও স্নিগ্ধ থাকিবে, নিজের কর্তব্য কাজ, দায়িত্ব পালন, এবাদত-বন্দেগী ভাল ভাবে করা যাইবে—এই উদ্দেশ্যে তবে এই সাধারণ কাজের জন্তও সে বহু ছওয়াব আহরণ করিতে পারে। এইরূপ আহরণ, নিজা, বিশ্রাম, ভ্রমণ, মেহনত ইত্যাদি জীবন ধারণের কাজ-কর্মে আল্লামার নির্ধারিত দায়িত্ব পালন ও আল্লামার বন্দেগী সমাধা করিবার শক্তি ও সামর্থ্য সঞ্চয়ের নিয়ন্ত্রিত করিলে এ সমস্ত কার্য সমূহও এবাদতে পরিণত হয়। বিবাহ কার্য এবং স্ত্রী ব্যবহারে যদিও স্থূল দৃষ্টিতে কামরূপ চরিতার্থ করাই হয় তবুও নিজের চরিত্রকে পবিত্র রাখা, কুপথ ও কু-কর্ম হইতে বাঁচিয়া থাকা, নেশা সন্তান হাসিল করা, আখেরাতের পথে এবং কর্তব্য পালনে সাহায্য-কারী সংগ্রহ করা, সুন্নতের পায়গম্বী করা ইত্যাদি সং ও মহৎ উদ্দেশ্যের নিয়ন্ত্রিত করিলে এই সব কাজও বড় বন্দেগীরূপে গণ্য হয় এবং অনেক ছওয়াব হাসিল হয়।

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! চিন্তা করুন, সং ও মহৎ উদ্দেশ্যের নিয়ন্ত্রিত করাতে এবং একটু চিন্তা করিয়া দেলের নিয়ন্ত্রিতটা খাঁটা করিয়া লওয়াতে খাওয়ার খাদ বদলাইয়া যায় না, পরিশ্রমের আয়-রোজগার কম হইয়া যায় না, স্ত্রী ব্যবহারে আনন্দও কমিয়া যায় না—সবই পরিপূর্ণ থাকে, কিন্তু শুধু দেলটা ঠিক করিয়া নিয়ন্ত্রিতটা একটু খোদার দিক করিয়া লওয়াতে কত নেকী কত ছওয়াব হাসিল হইয়া থাকে; কাজের মূল্য ও উৎকর্ষতা কত বাড়িয়া যায়। সত্য বলিতে গেলে পিতল সোনা পরিণত হয়।

হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শিক্ষা এমনই অমূল্য রত্ন যে, এই শিক্ষার ভিতর দিয়া হুনিয়ার কোন কাজে, হুনিয়ার কোন উন্নতি প্রগতির ব্যাপারে আদৌ কোন ক্ষতি হয় না—অথচ কণস্থায়ী জীবনের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিরস্থায়ী

জীবনের উন্নতি ও জীবিকার পথ খুলিয়া যায়। এমনকি সাধারণতঃ যে সমস্ত কাজ-কর্মকে ভোগ-বিনাস মনে করা হয়, উহার ভিতর দিয়াও খোদাকে পাইবার এবং আখেরাতের দৌলত উপার্জনের পথ পরিষ্কার হইয়া যায়। এখানেই কোরআন-হাদীছের শিক্ষার মাহাত্ম্য যে, ইহাতে হুনিয়া নষ্ট না করিয়াই আখেরাতের পথ দেখান হইয়াছে। আর বর্তমান যুগের জড়বাদী মতবাদগুলিতে চিরস্থায়ী জীবনের আখেরাতকে একেবারে ডুবাইয়া দিয়া শুধু কণস্থায়ী জীবন এই হুনিয়ার সুখ-সমৃদ্ধির পথ প্রদর্শন করা হইয়াছে। ইসলামী শিক্ষা হইতে অজ্ঞ থাকার দরুন প্রতি মুহূর্তে শত শত নেকী হাসিলের সুযোগ হইতে আমরা মাহরুম ও বঞ্চিত থাকিতেছি।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মানুষের যাবতীয় কার্যাবলী তিন ভাগে বিভক্ত। যথা :—(১) মা'ছিয়াত অর্থাৎ মন্দ কাজসমূহ, (২) হাছানাত অর্থাৎ ভাল ও সং কাজসমূহ, (৩) মোবাহাত অর্থাৎ মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের কাজসমূহ—মাহাতে ধরা বাধা ছওয়াব বা গোনাহ নাই।

যে সমস্ত কাজ কোরআন-হাদীছে স্পষ্ট ভাষায় গোনাহ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাকে “মা'ছিয়াত” বলা হয়। যথা :—ঘৃষ লওয়া, চুরি করা, জেনা করা, জুরা খেলা, সূদ খাওয়া, শরাব পান করা, আমানতে খেয়ানত করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, নামায না পড়া, যাকাত না দেওয়া, রোযা না রাখা, আল্লাহর রসুলের বা কোরআন-হাদীছের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা ইত্যাদি সমস্তই পাপ এবং মন্দ কাজ। নিয়্যাতের দ্বারা এই শ্রেণীর কাজ সমূহকে কিছুতেই ভাল বা ছওয়াবের কাজে পরিণত করা সম্ভব নয়। অধিকন্তু যদি কেহ পাপ কাজ ছওয়াবের নিয়্যাতে করে তবে তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ করে অথচ মুখে বলে যে আমি এই কাজ করিতেছি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করিবার জন্ত। যেমন কেহ নিমের ফল খাইতেছে আর বলিতেছে আমি মিষ্টির স্বাদ পাইবার জন্ত নিমের ফল খাইতেছি। এইরূপ ব্যক্তিকে শুধু বোকা নয় পাগল বলিতে হইবে। এই জন্তই শরীয়তের ভাষায় এরূপ ব্যক্তিকে শুধু ফাছেকই নয় বরং কাকের বলা হইবে। কারণ সে প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহর সঙ্গে ঠাট্টা করিতেছে।

যে সমস্ত কাজকে শরীয়তে ভাল বা জরুরী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহাকে “হাছানাত” বলা হয়। যেমন—নামায পড়া, রোযা রাখা, যাকাত দেওয়া, হজ্জ করা, সত্য কথা বলা, সত্য নিচায় করা, মেহমানের খেদমত করা, পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের উপকার করা, গরীবের সাহায্য করা, মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা, দায়িত্ব পালন করা, অঙ্গীকার রক্ষা করা, সতীষ রক্ষা করা, মুগ্ধকে মান্ত করা ও ছোটদিগকে মেহ করা ইত্যাদি ইত্যাদি। হাছানাত বা সংকার্যাবলী অবশ্য করণীয়—না করিলে শাস্তি হইবে এইরূপ অপরিহার্য পর্য্যায়ের হইলে তাহাকে “ফরয” বা “ওয়াজেব” বলা হয়। করিবার জন্ত তাকীদ থাকিলে তাহাকে “মুন্নতে-মোয়াকাদাহ” বলা হয় এবং ভাল

কাজ বলিয়া প্রণয়ন করা হইলে বা করিবার জন্ত আদেশ না করিয়া শুধু উৎসাহ প্রদান করা হইয়া থাকিলে তাহাকে মোবাহাব বা নফল বলা হয়। হাছানাত পর্যায়ের কাজগুলি সূর্তু নিয়্যাত ব্যতিরেকে অস্তিত্বহীন এবং নিফল হইয়া যায় অর্থাৎ আল্লাহর নিকট ছওয়াব পাওয়ার যোগ্য থাকে না। বরং অপনিয়্যাতের দরুণ হাছানাত অপকর্মে ও মা'ছিয়াতে পরিণত হইয়া যায়। যেমন—সবচেয়ে বড় হাছানাত (নেক কাজ) হইতেছে ইসলাম গ্রহণ করা অর্থাৎ আল্লাহর এবং আল্লাহর রসুলের আয়ুগতা, আখেরাতের হিসাব-নিকাশ ও বেহেশত ও দোযখের অস্তিত্ব এবং আল্লাহর বাণী কোরআনের এবং রসুলের বাণী কোরআনের এবং রসুলের বাণী হাদীছের সত্যতা স্বীকার করা। ইহাও যদি কেহ শুধু মুখে মুখে স্বীকার করে কিন্তু দেলে দেলে আল্লাহ ব্যতীত হীনস্বার্থ ইত্যাদি অল্প কোনরূপ উদ্দেশ্য রাখে তবে তাহাকে বলে মোনাফেক। মোনাফেকের জন্ত দোযখের সর্বনিম্ন স্তর এবং সবচেয়ে বেশী শাস্তি নির্ধারিত আছে। নামায ইসলামের প্রধান রোকন; ইহা যদি কেহ বিনা নিয়্যাত তথা অন্ততঃ মনের মধ্যে নামায পড়ার এরাদা ও ইচ্ছা ব্যতিরেকে পড়ে তবে আদৌ কোন মূল্য নাই, নামায হইবে না। আর যদি কেহ অপনিয়্যাতে অর্থাৎ রিয়াকারী—লোক-দেখানো বা সুখ্যাতি অর্জন ইত্যাদি হীনস্বার্থের নিয়্যাতে পড়ে তবে তাহাতে ছওয়াবের পরিবর্তে ভীষণ আজাব—ওয়ারেল নামক দোযখের শাস্তি হইবে। পবিত্র কোরআন শরীফে ৩০ পারা ছুরা মাউনে আছে—

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ - الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ.....

“ওয়ারেল-দোযখ ঐ শ্রেণীর নামাযীদের জন্ত যাহারা নামাযের ব্যাপারে মোনাফেক—সময় সময় পড়িলেও উদাসীনরূপে পড়ে; যাহারা লোক-দেখানো উদ্দেশ্যে নামায পড়ে।”

প্রত্যেক নেক কাজেই নিয়্যাত খালেছ করার একান্ত প্রয়োজন আছে। নিয়্যাত খালেছ না হইলে আজাবের কারণ হইবে। যেমন মোসলেম শরীফের একটি হাদীছ উদ্ধৃত হইয়াছে।

যে সব কাজে মানুষকে আল্লাহ তায়ালা স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের অধিকার দিয়াছেন তাহাকে বলে মোবাহাত। যেমন—খাওয়া, পরা, শোওয়া, কথা বলা, দেখা, শোনা, হাটা, চলা, জীবিকা উপার্জন করা, কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় উন্নতি করা, মস্তিষ্ক চালনা করিয়া বিজ্ঞানে উন্নতি করা, বিভিন্ন দেশ পর্যটন করা, বিভিন্ন ভাষা শিখা করা ইত্যাদি। নিয়্যাতের তারতম্য বিশেষভাবে মোবাহ পর্যায়ের কার্যসমূহেই প্রয়োগ হইয়া থাকে।

মোবাহ পর্যায়ের যে কোন একটি কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আল্লাহর দাসত্বের ধ্যান করতঃ নিয়্যাত ঠিক করিয়া করিলে তখন আর ঐ কাজটি শুধু মোবাহ থাকে না, উহা একটি উচ্চ পর্যায়ের ছওয়াবের ও এবাদতের কাজে পরিণত হইয়া যায়। পক্ষান্তরে ঐ কাজটিকেই কোন অপনিয়্যাতে করিলে উহা মা'ছিয়াত বা গোনাহের কাজে পরিণত হইয়া যায়। যেমন ইমাম গাফ্ফারী (রঃ) বর্ণনায় দেখান হইয়াছে যে, সমস্ত মোবাহ কাজসমূহকে নেক কাজে

বা গোনাহতে পরিণত করা নিয়্যাতের উপরই নির্ভর করে। এই হাদীছের ইহাই তাৎপর্য যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদের জন্য একদিকে যেমন মা'ছিয়াত ও হাছানাতে ময়দানের চেয়ে মোবাহাতের ময়দানকে অধিক প্রণয়ন করিয়াছেন, তদ্রূপ এইসব মোবাহাত অর্থাৎ ছনিয়াদারীর সামান্য সামান্য পিতলের জিনিসকে বিরূপে সোনায পরিণত করিয়া ক্ষণস্থায়ী ইহজীবনের শান্তির ও উন্নতির সহিত চিরস্থায়ী আখেরাতের জীবনের অক্ষুরন্ত শান্তি ও আনন্দ লাভের উপায় করিতে হইবে, সেই ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন।

এই হাদীছ খানাতে অহী সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করা হয় নাই। তা সত্ত্বেও ইমাম বোখারী (রঃ) ইহাকে অহীর বর্ণনার শিরোনামাভুক্ত কেমন করিয়া করিলেন? এ বিষয়ে সমালোচনা ও গবেষণা হইয়াছে। সোজা কথা এই যে, যেহেতু দীন ও সত্য ধর্মের ভিত্তিপাত হয় অহীর দ্বারা এবং মানুষের জীবন গঠন আরম্ভ হয় নিয়্যাতের দ্বারা। দেল ঠিক করিয়া মকছুদ ও লফ্য স্থির করিয়া—যে আমার একমাত্র মকছুদ ও জীবনের চরম ও পরম লফ্য আল্লাহকে পাওয়া, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা—এই কথা মনে মনে স্থির করিয়া জীবন যাত্রা আরম্ভ করার দ্বারাই হয় মানুষের জীবন গঠনের ভিত্তিপাত। সেই জন্য নিজে আমল করিয়া দেখাইবার জন্য এবং পাঠকবর্গকেও তদনুরূপ আমল করিবার আগ্রহ ও উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য কেতাব আরম্ভ করার ও অহীর কথা বর্ণনা করার পূর্বে নিয়্যাত সম্বন্ধে হাদীছ খানা বর্ণনা করা হইয়াছে।

২। হাদীছ:—عن عائشة رضى الله تعالى عنها سئل هشام بن حارث: قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال أحيانا يأتيني مثل صائمة الجرس وهو أشده على فيهم عني وقد وعيت عذة ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيهم عنة وإن جبينه ليتفصد عرقا.

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হারেছ ইবনে হেশাম (রাঃ) রসূলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—ইয়া রসূলুল্লাহ (দঃ)! আপনার নিকট অহী কিভাবে আসে? তিনি বলিলেন, কোন সময় এমন হয় যে, একটি (চিড়াকর্ষক) টুং, টুং শব্দ আমি শুনিতে পাই। (সেই আওয়াজ আমাকে এই জগতের অন্তর্ভুক্তি হইতে উদাসীন করিয়া অন্তর্জগতের দিকে আকৃষ্ট করিয়া নেয়। তখন আল্লাহর বাণী আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত

হইতে থাকে এবং ঐ আওয়াজ বন্ধ হইতে না হইতেই বাহা বলা হয় সব কিছুই আমি অন্তরস্থ করিয়া লই।) এই প্রকারের অহী আমার জন্ত বড়ই শ্রান্তিদায়ক হয়। আর কোন কোন সময় স্বয়ং ফেরেশতা মানুষের আকৃতি ধারণ করিয়া আমার নিকট আসেন এবং আমার বাণী আমাকে বলিয়া দেন, আমি তাহা মুখস্থ ও হৃদয়ঙ্গম করিয়া লই। (এই দ্বিতীয় প্রকারের অহীতে বিশেষ কোন শ্রান্তি বা কষ্ট হয় না) প্রথম প্রকারের অহী সম্বন্ধে আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি অতি প্রচণ্ড শীতের সময়ও নবী (দঃ)কে অহী নাযেল হওয়ার সময় ঘরমুক্ত হইতে দেখিয়াছি।

ব্যাখ্যা:—**ملصدة الجرس** অর্থ ঘণ্টার অবিরাম টুপ্ টুপি আওয়াজ। এই আওয়াজ অহী আমার সম্বন্ধে স্বরূপ ছিল। ইহা কখনও কখনও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য লোকেরাও শুনিতে পাইতেন। যেমন ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন—অহী নাযেল হওয়ার সময়ে আমরা মোমাহির ঝাক্ উড়িয়া বেড়াইবার সময় যেমন এক প্রকার বিরতি বিহীন গুঞ্জন শুনা যায়, ঐরূপ আওয়াজ শুনিতে পাইতাম। অহী নাযেল হওয়ার কারণে রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের দৈহিক কোন কষ্ট ভ্রম হইত কি-না; এবং কেন? প্রথম প্রকার অহীর দরুণ যে, রসুলুল্লাহ দেহে অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ হইত তাহা বিধি আয়েশার চাক্ষুষ সাক্ষ্যে যে, প্রচণ্ড শীতের সময় হযরতের চেহারা মোবারক এবং দেহ হইতে ঘাম ঝরিতে থাকিত স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

মানুষের সাক্ষর দেহ নশ্বর জড়পিণ্ড তাহার নিরাকার অনন্ত অসীম আত্মার জন্ত এক প্রকার খাঁচার মত। এই খাঁচার সহিত আত্মার একটা যোগাযোগ নিশ্চয়ই থাকে। এই যোগাযোগকে ছিন্ন করিয়া যখন সকল আত্মার আত্মা যিনি, তাহার দিকে তাহার পূর্ণ যোগাযোগ স্থাপন করিতে হয়, তখন তাহার নিশ্চয়ই কষ্ট ও শ্রান্তি হয় কিন্তু এই শ্রান্তি যে, কি মধুর তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। এই যোগাযোগ যখন পূর্ণরূপে স্থাপিত হয়, তখন দেহের উপর যে, কি চাপ পড়ে তাহা একজন ছাহাবীর বর্ণনায় কিছুটা অনুমান করা যায়। তিনি বলেন—একদিন আমি হযরতের পাশাপাশি বসিয়াছিলাম; হযরতের উরু সামান্য পরিমাণে আমার উরুর উপর ছিল। এই অবস্থায় মাত্র ২১৩ শব্দের একটি অহী নাযেল হওয়াতে আমি মনে করিতেছিলাম যে, হযরত আমার উরুর সমস্ত হাড়ি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। চাক্ষুষ জগতে ইহার কিছু দৃষ্টান্ত হইতে পারে যে, একটি সাধারণ লোহার বা তাহার তারের সহিত বিদ্যুৎ শক্তির যোগাযোগ করিয়া দিলে ঐ তারটির বাহ্যিক পরিবর্তন না হইয়াও তাহার ভিতর এক ভীষণ চাপের ঢেউ খেলে। তাহাতে ঐ তারটির ভিতরে যে অপরিণীম শক্তি ও তাপ মাত্রার সঞ্চয় হয় তাহা-বাহ্যতঃ দৃশ্য না হইলেও তারটিকে স্পর্শ করিলেই তাহা অনুভূত হয়। হাদীছে বর্ণিত আছে যে, অহী নাযেল হওয়ার সময় রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের মুখমণ্ডলে শ্রান্তির ভাব পরিলক্ষিত হইত—তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া গাইত।

৩। হাদীছ :—আয়েশা (রা:) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ ছালামাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অহী আসার ভূমিকা ও প্রাথমিক সূচনা আরম্ভ হয় ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্ন আকারে—স্বপ্নে তিনি যাহা দেখিতেন ঠিক তাহাই দিবালোকের মত প্রকাশ পাইত। কিছুকাল এই অবস্থা চলার পর নিজ হইতেই হযরতের অন্তরে লোকালয় হইতে সংশ্রবহীন হইয়া নির্জনে থাকার প্রেরণা উদ্ভূত হইল। তিনি (হেরা) নামক পর্বত গুহায় (মক্কা শহরের লোকালয় হইতে তিন মাইল দূরে) যাইয়া নির্জনে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি খাইবার জন্ত প্রত্যহ বাড়ী আসিতেন না, পানাহারের জন্ত সামান্য কিছু সম্বল লইয়া যাইতেন এবং তথায় একাদিক্রমে অনেক রাত্রি এবাদত বন্দেগীতে নিরত থাকিয়া যাপন করিতেন। অনেক দিন পর একবার বিবি খাতিজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন এবং আবার ঐরূপ একসঙ্গে অনেক রাত্রি এবাদত-বন্দেগীতে রত হইবার জন্ত কিছু পানাহারের সম্বল সঙ্গে লইয়া যাইতেন। এইভাবে তিনি হেরা পর্বত গুহায় নির্জনে আল্লার ধ্যান ও এবাদতে মগ্ন থাকাকালে হঠাৎ একদিন হেরা গুহার ভিতরেই তাহার নিকট প্রকৃত সত্য আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিল—আল্লার তরফ হইতে জিব্রিল ফেরেশতা অহী (আল্লার বাণী) বহন করিয়া প্রকাশভাবে রসূলুল্লাহ ছালামাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে দেখা দিলেন এবং বলিলেন, আপনি পড়ুন। রসূলুল্লাহ (দ:) উত্তরে বলিলেন—আমি ত পড়া শিখি নাই। রসূলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন—তখন সেই ফেরেশতা (হযরত জিব্রিল (আ:)) আমাকে শক্ত করিয়া ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং আলিঙ্গনের মধ্যে আমাকে এমন শক্তভাবে চাপ দিলেন যে, আমার (প্রাণ বাহির হইয়া যাওয়ার মত) কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। অতঃপর তিনি আমাকে ছাড়িয়া দিয়া দ্বিতীয়বার বলিলেন—আপনি পড়ুন। আমি প্রথম বারের মতই বলিলাম, আমি ত কখনও পড়ার অভ্যাস করি নাই। রসূলুল্লাহ (দ:) বলেন—তখন ঐ ফেরেশতা পুনরায় দ্বিতীয়বার আমাকে শক্ত করিয়া ধরিলেন এবং এমন জোরে আলিঙ্গন করিলেন যে, আমার (প্রাণ বাহির হইয়া যাওয়ার মত) কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। তারপর আমাকে ছাড়িয়া দিয়া তৃতীয়বার বলিলেন, আপনি পড়ুন। আমি (এইবারও) বলিলাম, আমি ত কোন দিন পড়া শিখি নাই। তিনি তৃতীয়বার আমাকে আলিঙ্গন করিয়া চাপিয়া ধরিলেন* এবং ছাড়িয়া দিয়া এই আয়াত পাঠ করিলেন।

† এই অবস্থা হেরা পর্বতের গুহায় নির্জন বাসের ঘটনার ছয় মাস পূর্ব হইতে আরম্ভ হয়। এর পূর্বেও কোন কোন ঘটনা সময় সময় প্রকাশ পাইত। মোসলেম শরীফের একটি হাদীছে বর্ণিত আছে, সময় সময় রসূলুল্লাহ (দ:) গায়েবী আওয়াজ শুনিতে পাইতেন ও আলো দেখিতেন। রাস্তার চলার সময় গাছপালা তাহাকে ছালাম করিত। রসূলুল্লাহ (দ:) ফরমাইয়াছেন—আমি এখনও মক্কায সেই সব গাছপালাগুলিকে চিনি যেগুলি আমাকে নবুয়তের পূর্বে সালাম করিত।

* ঐরূপে আলিঙ্গনের দ্বারা রসূলুল্লাহ ছালামাহু আলাইহে অসাল্লামের ভিতরে কয়েক এবং আধ্যাত্মিক শক্তি আসিতেছিল। তাই তৃতীয়বার চাপিয়া ধরিয়া ছাড়িয়া দিলে তিনি পড়িতে পারিলেন; পড়াও যেমন তেমন পড়া নয়—মানে, মতলব, হকিকত, গুরুত্ব মূলতঃ সহ পড়া।

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ - الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ - **

** প্রথম বারে এই ছুরার উক্ত পাঁচটি আয়াতই নাযেল হয়। আয়াত কয়টির অর্থ এই;—
আপনি আপনার সেই মহাপ্রভু পালনকর্তার নাম লইয়া পড়ুন, (নিজ শক্তিতে নয়; সর্বশক্তির
আকর যিনি তাঁহার নামের বরকতে আপনার মধ্যে শক্তির সঞ্চার হইবে।) যিনি সারা বিশ্বকে
সৃষ্টি করিয়াছেন, বিশেষত; তিনি মানুষের মত জানে ওণে পরিপূর্ণ এত উচ্চদের জীবনকে অতি
নিকট পদার্থ জমাট রক্তপিণ্ড হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনি পড়ুন; আপনার প্রভু দয়ার
সাগর, অত্যন্ত দয়ালু (তিনি আপনার সাহায্য করিবেন; মানুষ কিছুই জানিত না) তিনিই
(বুদ্ধিহীন, বাকশক্তিহীন, জীবনীশক্তি বিহীন) কলমের মাধ্যমে মানুষকে জ্ঞান দান করিয়াছেন।

আপনি বুদ্ধি-বিরেক, জীবনীশক্তি সব কিছু রাখেন। আপনাকে জ্ঞান ও পড়ার কমতা তিনি
নিশ্চয় দিতে পারিবেন; সেই শক্তি লাভের স্বরূপে সেই মহাপ্রভুর মহান নামের বরকত ও
অছিল। গ্রহণ করত: পড়িবার জ্ঞান প্রস্তুত হউন; এখন হইতে যত কিছু আপনার প্রতি অবতীর্ণ
হইবে সবই পড়িবার জ্ঞান প্রস্তুত ও সাহসী হউন। ভবিষ্যতে আর কোন কিছু পড়িতে সাহস
হারা হইবেন না। শুধু পড়াই নয়, প্রতিটি কর্তব্য কাজে মহাপ্রভুর নামের অছিলায় তাঁহার
সাহায্য প্রার্থনার অসোণ ব্যবহার করত: সাহসী হইয়া দাঁড়াইবেন।

প্রকাশ থাকে যে, প্রথম তিনবার ফেরেশতার আত্মান—“আপনি পড়ুন” সেখানেও আরবী
শব্দ “একরা” ছিল; উহা মূল অহী তথা কোরআনের আয়াতভুক্ত ছিল না; উহা ছিল ফেরে-
শতার কথা। উক্ত তিনবারের “একরা—পড়ুন” ক্রিয়াপদের কর্মপদই ছিল চতুর্থবারে পঠিত আয়াত-
খানা। আর এই আয়াতে যে “একরা” রহিয়াছে উহা আল্লার কালাম—কোরআনের অংশ;
এই ক্রিয়াপদের কর্মপদ হইল—যত কিছু পড়ার মত তোমার সম্মুখে আসিবে। উপস্থিত রসুলকে
সম্বোধন করিয়া পড়ায় অক্ষমতা প্রকাশের ঘটনা লক্ষ্যে পড়কে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করত: মানব
গোষ্ঠীকে বলা হইয়াছে, কোন কর্তব্য কাজে সাহস হারা না হইয়া মহাপ্রভুর সূত্রে তাঁহার নিকট
সাহায্য প্রার্থনার অসিলা ধরিয়া কাজ আরম্ভ করিবে। ছোট বড় প্রত্যেক কাজেই তাহা করিবে,
কারণ প্রত্যেক কাজেই প্রভুর সাহায্য আবশ্যক। পবিত্র কোরআনের এই উপদেশ কেয়ামত পর্যন্ত
প্রযোজ্য। একটি দৃষ্টান্ত—এক ব্যক্তিকে তাহার মুরবির তরফ হইতে লিপি পৌছাইবার সময়
আপনি বলিলেন, পড়। উক্ত লিপিতে লেখাছিল, সর্বদা মনোযোগের সহিত পড়। আপনার
আত্মান—“পড়” এবং লিপিতে লেখা উপদেশ—“মনোযোগের সহিত পড়” অর্থাৎ সর্বদা মনো-
যোগের সহিত পড়িবা; উভয় “পড়” শব্দের তাৎপর্ষে যে ব্যবধান তৎক্ষণে ব্যবধানই রহিয়াছে
জিব্রিল ফেরেশতার আত্মান—“পড়ুন” এবং আল্লাহ তায়ালায় কালামের অংশ—“মহাপ্রভুর নামে
পড়ুন”—এই উভয় “পড়ুন” এর মধ্যে। আরও সরল দৃষ্টান্ত—শিক্ষক ছাত্রকে বলে, পড়—একরা বিস্মে
রাষ্ট্রেকা “মহা” প্রভুর নাম লইয়া পড়। এই উভয় “পড়”-এর মধ্যে যে পার্থক্য তৎক্ষণেই
আলোচ্যে স্থলে।

এই পাঁচটি আয়াত (মুখবু ও হৃদয়ঙ্গম করিয়া) লইয়া রশুলুল্লাহ (দঃ) বাড়ী ফিরিলেন। যে অবস্থা হইয়াছে তাহাতে এখনও তাঁহার হৃদয়ঙ্গম থর থর করিয়া কাঁপিতে ছিল+। তাই তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া (গৃহ-সঙ্গিনী পতি সর্বস্ব প্রাণ) খাদিজার কাছে আসিলেন এবং (স্বরাভ্রান্তির আতঙ্কগ্রস্তের স্থায়) বলিলেন—আমার গায়ে কবুল দাও। খাদিজা (রাঃ) কবুল আনিয়া গায়ে দিলেন। কিছু সময় পর ঐ স্বর-স্বর ভাব এবং ভয়-ভয় ভাব চলিয়া গেল। অতঃপর হযরত (দঃ) খাদিজাকে সব বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন। হযরত (দঃ) (বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মস্ত বড় ভারি বোঝা তাঁহার উপর চাপান হইবে বোধ হইতেছে, তাই তিনি বলিলেন, আমার ভয় হইতেছে—আমার জীবনে কুলাইবে কি না? আমার শরীরে সহ্য হইবে কি না, না জীবন বাহির হইয়া যাইবে, স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যাইবে। খাদিজা (রাঃ) (মত্যস্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন এবং রশুলুল্লাহ (দঃ)কে প্রায় বাল্যকাল হইতেই জানিতেন এবং দীর্ঘ পনের বৎসর হইতেও একেবারে অন্তরঙ্গ সঙ্গিনীরূপেই বসবাস করিয়াছেন। তিনি) সাযুনা দিয়া বলিলেন, **وَاللّٰهُ مَا يَخْشَىٰكَ اِلَّا اَبَدًا** (আল্লাহ তোমাকে ভয় করে শুধু এতদিন)। গোদার কসম, কিছুতেই নয়, আল্লাহ আপনাকে কিছুতেই অপদস্ত করিবেন না। (নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করিবেন—আপনাকে জয়যুক্ত করিবেন। কেননা মানবতার চরম উৎকর্ষের মূল সাতটি খাছলতই আপনার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিद्यমান আছে। যথা:—)

১. **اِنَّكَ لَمِنَ الرَّحِمٰى**—আপনি আত্মীয়-স্বজনদের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া আত্মীয়-তার হক আদায় করতঃ আত্মীয়তা রক্ষা করিয়া চলেন। আত্মীয়দের সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করেন না এবং সম্পর্ক ছেদন করেন না*।

+ এই অবস্থায় কম্পন বা ভয় কোন অস্বাভাবিক বস্তু নয়। হঠাৎ অতি বড় একটি বোঝার চাপ তাঁহার উপর গড়িয়াছে—জিব্রিল ফেরেশতার সহিত মোলাকাত; তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত ফেরেশতাগণের প্রেরিত, স্বয়ং সর্বশক্তিমান অসীম অক্ষুরন্ত শক্তির আকরের সঙ্গে যোগাযোগের দ্বারা অত্যাধিক কয়েজের চাপ, সর্বোপরি ভবিষ্যতের গুরু দায়িত্ব ভারের চাপ—এতগুলি চাপ হঠাৎ এক সঙ্গে। কাজেই রক্ত মাংসের শরীরে স্বর, কম্পন ইত্যাদি না হইয়া পারে না। রশুলুল্লাহর আধ্যাত্মিক শক্তি যত বড়ই হউক না কেন দেহটি ত মানুষেরই দেহ ছিল।

* সাধারণতঃ লোক সমাজে মামু-ভাগে, চাচা-ভাতিজা, চাচাত ভাইদের সঙ্গেই বিষয় সম্পত্তির সহিত জড়িত থাকার কারণে বগড়া-বিরোধ মনোমালিন্য বেশী হয়। কিন্তু হযরত রশুলুল্লাহর শিক্ষা এই যে, এই সমস্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়বর্গের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা জন্মান যাইবে না। তাদের সঙ্গে মিলন ও সৌহার্দ বজায় রাখিতে হইবে। এই স্বভাব হযরতের নবুয়ত পাওয়ার পূর্বেই ছিল, তার প্রমাণ খাদিজার এই সাক্ষ্য। আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা ভিন্ন কথা এবং স্বজন-প্রীতি বাহ্য অতীব দুষ্টীয় তাহা হইতেছে এই যে, অশ্রের হক নষ্ট করিয়া, আমানতের খেয়ানত করিয়া, বিচার ক্ষেত্রে অথবা টেটের বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের চাকুরী পদ বা টাকা-পয়সা দেওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার দিকে লক্ষ্য না করিয়া পক্ষপাতিত্ব করা, ইহা হারাম। পক্ষান্তরে নিজের ব্যক্তিগত জ্ঞান মাল দিয়া যথাসম্ভব আত্মীয়গণের হক আদায় করা জরুরী এবং করণ।

২। **وَتَذُقُ الْعَذَابَ**—আপনি সদা সত্যবাদী; মিথ্যা কথা বলেন না।*

৩। **وَتُؤْتِي الْأَمَانََةَ**—আপনি চিরকাল পূর্ণ মাত্রায় অতিশয় বিশ্বাসী আমানতদার; আমানতের খেয়ানত আপনি কখনও করেন নাই। (ব্যক্তিগত লেনদেনের আমানত, পারিবারিক আচার-ব্যবহারের আমানত, সামাজিক বিচার অথবা খেদমত ও সেবার আমানত সবই উদ্দেশ্য।)

৪। **وَتُكْمِلُ الْكُلَّ**—যে সব অনাথ অক্ষম এতীম বিধবা অন্ধ খঞ্জ আছে, আপনি তাহাদের দোখা বহন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যাহাদের উপার্জন করার ক্ষমতা নাই তাহাদের কুজির, খাওয়া-পরার ও থাকার বন্দোবস্ত আপনি করিয়া দেন।

৫। **وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ**—আপনি বেকার সমস্তার সমাধান করিয়া দিয়া থাকেন। অর্থাৎ যাহাদের উপার্জন ক্ষমতা আছে কিন্তু কাজ না পাওয়ার কারণে অভাবগ্রস্ত; আপনি তাহাদের কাজের ব্যবস্থা উপার্জনের সংস্থান করতঃ তাহাদের সাহায্য করিয়া থাকেন।

৬। **وَتُعْزِي الضَّيْفَ**—আপনি অতিথি-সেবা, মেহমানের খেদমত করিয়া থাকেন।

৭। **وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ**—আপনি যাবতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগক্ষেত্রে হুহু জনগণের সাহায্য কল্পে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছেন।

মানবতার উৎকর্ষ এই গুণগুলি যেই মানুষের মধ্যে আছে সেই মানুষ সফলকাম না হইয়া পারে না, আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে কখনও অকৃতকার্য করেন না।

খাদিজা (রাঃ) এইরূপে সান্ত্বনা দিয়া হযরতকে লইয়া বংশের বৃদ্ধ মুরব্বি চাচাত ভাই অরাকা ইবনে নওফেলের নিকট গেলেন। অরাকা সত্যাষেখী সুজ্জানী লোক ছিলেন, অতি বৃদ্ধ হওয়ায় অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। জাহেলিয়াতের যমানাতেই তিনি সত্য ধর্মের তালাশে সিরিয়া দেশে যাইয়া ঈসায়ী ধর্মীয় এক খাঁচী আলেমের নিকট খাঁচী ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এবরানী ভাষা লিখিতেন এবং এবরানী হইতে ইঞ্জিল কেতাবের আরবী তরজমাও করিতেন। (তাহাতে পূর্বের আসমানী কেতাব সমূহে তাঁহার দক্ষতা ও পারদর্শিতা ছিল। তিনি নবীগণের প্রতি অহী ও অহীবাহক ফেরেশতা জিব্রিলের বিষয় জানিতেন।) খাদিজা (রাঃ) অরাকাকে বলিলেন, হে চাচা-পুত্র ভাতা! আপনার ভাই-পো কি বলেন একটু শুনুন। খাদিজা (রাঃ) ঘটনার কিছু বর্ণনাও দিলেন। অতঃপর অরাকা হযরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বলুন। আপনি কি দখেন? রসুলুল্লাহ (সঃ) যাহা কিছু দেখিয়াছেন সমস্ত ঘটনা অরাকাকে খুলিয়া বলিলেন। অরাকা বলিলেন, এ-ত সেই মঙ্গলময় আল্লাহ দূত জিব্রিল ফেরেশতা—যাঁহাকে আল্লাহ মুছা আলাইহেচ্ছালামের উপর অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। হায় আফছুহ! যদি সেদিন আমি যুবক হইতাম—যেদিন আপনি আল্লাহ বাণী প্রচার করিতেন। হায় আফছুহ! যদি সেদিন আমি জীবিত থাকিতাম—যেদিন আপনার দেশবাসী আপনাকে দেশান্তরিত করিয়া ছাড়িলে। শেষের বাক্যটি শুনিয়া হযরত স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন, কি?

* এই বাক্যটি বোখারী শরীফের ৭৪০ পৃষ্ঠায় এবং পরবর্তী বাক্যটি কতুলবারী কেতাবে উল্লেখ আছে।

আমার দেশবাসী আগাকে দেশান্তরিত করিবে। অরাকা বলিলেন—হাঁ, হাঁ,। যে সত্য ধর্ম আপনি প্রচার করিতে আসিয়াছেন এইরূপ সত্য ধর্ম-বাণী যে কেহ ছনিয়াতে লইয়া আসিয়াছেন ছনিয়াবাসী তাঁহার সঙ্গে শক্ততা না করিয়া ছাড়ে নাই। যদি আমি সেই দিন পাই (অর্থাৎ জীবিত থাকি) তবে আমি প্রাণপণে মথাসাধ্য আপনার সাহায্য করিব।*

অতঃপর অল্পদিনের মধ্যেই অরাকা এস্টেবল করিলেন। হেরা পর্বত-গুহার এই ঘটনার পর কিছুদিনের জন্ত অহী বন্ধ থাকিল।×

অহী বন্ধ থাকাকালীন অবস্থা বর্ণনা পূর্বক জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমানিয়াছেন (অহী বন্ধ থাকাবস্থায় যখন আমি অতি ব্যস্ত ও অস্থির ছিলাম তখনকার ঘটনা)—একদা আমি পথ চলিবার কালে হঠাৎ উর্ক দিকের একটি আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। তখন উর্কে তাকাইয়া দেখি, সেই ফেরেশতা (জিব্রিল) যিনি হেরা-পর্বতের গুহায় আমার কাছে আসিয়াছিলেন তিনিই আসমান জমিন পৃথিবীর মাঝখানে (অতিশয় জমকালো সোনার কুরসীতে আকাশ জুড়িয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাকে এত বড় বিরাট

* এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজে কাহারও নিকট যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই বা যাইতে উত্ততও হন নাই। বিবি খাদিজাই তাঁহাকে অরাকার নিকট লইয়া গিয়াছেন। ইহা মাতৃজাতির স্বভাব মূলত কোমলতা যে, তাঁহার প্রিয়জনের কোনরূপ অস্থিরতা দেখিলে প্রাচীন পারদর্শী জ্ঞানীদের কাছে যাতায়াত করিয়া অতি শীঘ্র প্রিয়জনের অস্থিরতা দূর করিতে চেষ্টা করেন। নতুবা প্রকৃতপক্ষে রসুলুল্লাহ (দঃ) আদৌ কোনরূপ অস্থির ছিলেন না, বরং সব ব্যাপারই তিনি ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। নবুওয়ের পদ-মর্যাদা, ফেরেশতার পরিচয়, অহীর হকিকত সব কিছুই তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। অবশ্য নূতন নূতন—প্রাথমিক অবস্থা বলিয়া স্বাভাবিক ভাবে শারীরিক কিছু কষ্ট এবং গুরু দায়িত্বের বোঝার চাপের দরুণ মনেও নানা কথার উদয় হইতেছিল এবং প্রাণপ্রিয়া খাদিজার কাছে তাহা প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। খাদিজার বুদ্ধিমত্তা এবং হামদারদীর উপর তাঁহার পূর্ণ আস্থা ছিল। খাদিজার মনে কষ্ট হয় এই ভয়ে রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার সঙ্গে অরাকার নিকট যাইতেও কোন ওজর আপত্তি করেন নাই। অরাকাও কোন খারাপ কথা বলেন নাই বা খারাপ লোক ছিলেন না। বরং অরাকা রসুলুল্লাহর উম্মতের মধ্যে শামিল কি না এই বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও তিনি যে ‘মোমেন’ ছিলেন এ বিষয়ে আদৌ কোন সন্দেহ নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমি স্বপ্নে অরাকাকে বেহেশতের নহরকূলে সাদা রেশমী পোষাক পরিহিত অবস্থায় দেখিয়াছি; নবীর স্বপ্ন অহী।

× এক রেওয়াজেও আছে—অহী প্রায় তিন বৎসর পর্যন্ত বন্ধ ছিল এবং অল্প একজন ফেরেশতাকে হযরতের তত্তাবধানের জন্ত নিযুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছিল। হযরত জিব্রিল (আঃ)ও মাঝে মাঝে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতেন, কিন্তু যেহেতু প্রথমবারের অহীর ভায়ে হযরতের অনেক কষ্ট হইয়াছিল তাই তিন বৎসর যাবৎ আর অহী আনেন নাই। বরং অহী বন্ধ হওয়ার কারণে মনোবেদনা ও বাকবের মিলনের বিচ্ছেদ-যাতনা অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। সাময়িক ভাবে অহী বন্ধ করিয়া এইরূপ আগ্রহ ও মিলনাকান্না বন্ধিত করাই আল্লার হেকমত ছিল। সাধারণতঃ বলা হয় অহী ছয় মাস কাল বন্ধ ছিল। (ঐ অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

আকারে দেখিলাম যে,) তাঁহাকে দেখিয়া আমি ভয় পাইয়া গেলাম* এবং ভয়ে কাঁপিত কাঁপিতে বাড়ী চলিয়া আসিলাম। বাড়ীতে আসিয়া এইবারও বলিলাম—**دُثْرُونِي دُثْرُونِي** “আমাকে কবল গায়ে দিয়া দাও, আমাকে কবল গায়ে দিয়া দাও। এই দিন এই পাঁচটি আয়াত বা পূর্ণ ছুরা নাযেল হয়—

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ - قُمْ فَأَنْذِرْ - وَرَبَّكَ نَكْبَرُ - وَثِيَابَكَ ظَهَرُ - وَالرَّجَزَ فَاهْجُرْ -

✽ অহী প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণাধিক প্রিয় বান্ধবের সহিত মিলন-সূত্র। বান্ধবের মিলনের যে কি স্বাদ তাহা একমাত্র প্রেমিকজন ব্যতীত অশ্ব কেহই উপলব্ধি করিতে পারে না। যাহারা আমার প্রেমিক হইয়া খাচী পীরের কাছে তালকীন লইয়া আমার জেকের মোজাহাদা করতঃ আমার প্রেমকে সত্যিকার ভাবে খাচী ও স্থায়ী করিয়া লইয়াছেন তাঁহারা আমার প্রেমের মিলনের স্বাদের কিঞ্চিৎ নজীর বা নমুনা অনুভব করিতে পারেন, কিন্তু ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারেন না। এত বড় স্বাদের জিনিষ হইতে বঞ্চিত হইলে প্রেমিকের মন কত উতলা এবং কত উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকে। হযরত রশূলুহ (দঃ) অহী বন্ধ থাকাকালে এইরূপ বিচ্ছেদ যাতনাই ভোগ করিতে-ছিলেন এবং বিচ্ছেদ যাতনা সময় সময় এত চরমে পৌঁছিয়া যাইত যে, তিনি হেরা পর্বতের চূড়ার উপর আরোহণ করিয়া তথা হইতে পড়িয়া আত্মহত্যা করিতে পর্য্যন্ত উদ্ভত হইয়াছেন। কিন্তু পরম প্রেমিক তাঁর দৃষ্টিতে প্রেমার্ত্তিও বাড়াইতেন। সঙ্গে সঙ্গে উর্দু জগতের বাণী আসিত **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ** হে মোহাম্মদ। কি করেন আপনি? আপনি যে আমার রশূল—প্রেরিত দূত। সাধারণ দূত নহেন, আমার প্রতিনিধি দূত; আপনাকে যে সেই প্রতিনিধিদের সমস্ত গুরুদায়িত্ব বহন করিতেই হইবে।

▪ শৈশবাবস্থায় উস্তাদকে, পীরকে বা অথ কোন মুরব্বিকে দেখিয়া ছেলেরা ভয় পায়। কিন্তু সে ভয় কোনরূপ ক্ষতি বা বিপদের আশঙ্কায় হয় না, স্বয়ং বড়দের আদব যাদের অন্তরে আছে তাদের উপর প্রাথমিক অবস্থায় এক প্রকার শ্রদ্ধা ও ভয় মিশ্রিত শক্তিমত্তার প্রভাব পতিত হয়, রশূলুহ ছালামাহ আলাইহে অসালামের এই ভয়ও সেই শ্রেণীর ভয় ছিল, অশ্ব কিছুই নহে।

+ ইহা ২৯ পারা ছুরা মোদাদ্জের প্রথম পাঁচটি আয়াত। অর্থ:—হে কমলীওয়াল! (কবল গায়ে দিয়া ঘুমাইয়া থাকার সময় নাই।) আপনি উঠুন, লোকদিগকে (তাদের ‘রব’ প্রভু সম্বন্ধে, প্রভুর অপিত দায়িত্ব সম্বন্ধে এবং আবেশ্বাতে যে প্রভুর দরবারে উপস্থিত হইয়া এই সব দায়িত্বের হিসাব বুঝাইয়া দিতে হইবে সে সম্বন্ধে) সতর্ক করিয়া দিন। (মানব সমাজের কল্যাণ সাধন এবং তাহাদের প্রকৃত কল্যাণের জন্ত তাহাদিগকে স্বীয় দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা এবং তাহাদেরই হিভের জন্ত তাহাদের কাছে ইসলামের সত্য বাণী প্রচার করাই ইসলাম ধর্মের প্রথম আদেশ।) এবং আপনি (নামায কয়েম করিয়া—প্রভুকে সেজদা করিয়া প্রভুর নিকট মাথা নত করতঃ) প্রভুর মহিমা প্রচার করুন। কাপড় জালা, দেহ ও আত্মা পবিত্র করুন। (এক আমার হইয়া যান;) যাবতীয় অপবিত্রতা—বিশেষতঃ মূর্তি পূজা গায়কুল্লার পূজা এবং এক আমার প্রেম আমার ভক্তি ব্যতিরেকে আল্লাহ-বিরোধী যত কামনা বাসনা প্রেম ভক্তি অর্জনা আরাধনা আছে সব চিরতরে বর্জন ও ত্যাগ করিয়া থাকুন—এ পর্য্যন্ত যেরূপ পাক-পবিত্র রহিয়াছেন চিরকালই তজ্রপ থাকিবেন।

ভারপর আর অহী বন্ধ হয় নাই, অনবরত পর পর অহী আসিতে লাগিল।

৪। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন—প্রথম প্রথম যখন অহী নাযেল হইত তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) অনেক কষ্ট করিতেন। এমনকি, জিব্রিল ফেরেশতা যখন অহী পড়িয়া শুনাইতেন, তখন হযরত (দঃ) সঙ্গে সঙ্গেই জিহ্বা এবং ঠোঁট নাড়িয়া পড়া আরম্ভ করিতেন; × (যাহাতে অহীর একটি অক্ষরও ছুটিয়া না যায় বা বেশী কম না হইতে পারে। ইহাতে রসুলুল্লাহর (দঃ) অনেক কষ্ট হইত।) যাহা লাঘব করার জন্ত কোরআনের এই চারিটি আয়াত নাযেল হয়।

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ - إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ - فَإِذَا قَرَأْتَ آيَاتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ - ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ -

অর্থ—(হে প্রিয় রসুল!) আপনি অহীকে তাড়াতাড়ি মুখস্থ করিবার জন্ত (এত কষ্ট করিবেন না—) সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বা ও ঠোঁট নাড়িবেন না, জিব্রিল যখন পড়েন আপনি মন দিয়া কান লাগাইয়া শুনিবেন। সম্পূর্ণ মুখস্থ ও কণ্ঠস্থ করাইয়া দেওয়ার এবং পুনরায় আপনার মুখে অবিকলরূপে পড়াইয়া দেওয়ার ভার আমার উপর হস্ত, ইহার জিহ্মাদার আমি। অতএব, আমি যখন (জিব্রিলের মুখে আমার অহী) পড়িব তখন আপনি শুধু মনোযোগের সহিত অলুধান ও শ্রবণ করিবেন। পুনরায় বলিতেছি, ঐ অহী পূর্ণরূপে আপনার মুখে পুনরাবৃত্তি করান ও নিভুলরূপে পড়াইয়া দেওয়া আমার জিহ্মায় রহিয়াছে। (ছুরা কেয়ামাহ্)

এই আয়াত নাযেল হওয়ার পর রসুলুল্লাহ (দঃ) সঙ্গে সঙ্গে পড়া বন্ধ করিয়া দিলেন। শুধু জিব্রিল যখন যাহা পড়িতেন খুব মনোযোগ দিয়া পূর্ণ একাগ্রতা সহকারে তাহা কান লাগাইয়া শুনিতেন। তাহাতেই সব কিছু তাঁহার মুখস্থ হইয়া যাইত এবং জিব্রিল চলিয়া যাওয়ার পর অবিকলরূপে তিনি উহা পড়িতে পারিতেন, একটি অক্ষরও এদিক ওদিক হইত না।

৫। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মানব জগতে রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অপেক্ষা বড় দাতা আর হয় নাই ইহাবেও না; তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল। বিশেষ করিয়া যখন রমজান শরীফ আসিত—যখন জিব্রিল (আঃ) তাঁহার সহিত প্রত্যহ সাক্ষাৎ করিতেন, তখন তাঁহার দানশীলতার সীমা পরিসীমা থাকিত না। জিব্রিল (আঃ) পবিত্র রমজান মাসে প্রত্যহ আসিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)কে কোরআন দণ্ড করাইতেন।†

ইবনে আব্বাস (রাঃ) শপথ করিয়া বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের (ফযেজ, বরকত ও আধ্যাত্মিক) দান-দৃষ্টি জীবনীশক্তি নাই বসন্তের মলয় বায়ু অপেক্ষাও অধিকতর শক্তিশালী ও ত্রিাশালী ছিল।

× ইহা বড়ই কঠিন কাজ। কারণ ইহাতে জিহ্বা, ঠোঁট, কান ও মন চারটি অঙ্গকে একই সঙ্গে কর্মব্যস্ত রাখিতে হয়। († অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ব্যাখ্যা :—এই হাদীছে হযরত রসুল্লাহ (দঃ)কে সমস্ত মানব জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা সর্বশ্রেষ্ঠ ছাী বলা হইয়াছে। বাস্তবিকই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা ও দানশীল ছিলেন। হাদীছ শরীফে উল্লেখ আছে, রসুল্লাহ (দঃ) কখনও কোন সাহায্যপ্রার্থীর প্রতি “না” শব্দ ব্যবহার করেন নাই। রসুল্লাহ (দঃ)-এর মর্যাদা অনেক উর্দ্ধে; ছনিয়ার ধন-দৌলত তাঁহার মর্যাদার তুলনায় অতি নগণ্য ও তুচ্ছ বস্তু। এই সব বস্তু দান করা ত তাঁহার নিকট খুবই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এই হাদীছে যে তাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ছাী ও দাতা বলা হইয়াছে তাহার অর্থ শুধু এতটুকুই নহে, বরং আরও ব্যাপক। অর্থাৎ যে দানের দ্বারা কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি পশুত্বের স্বভাব বিশিষ্ট মানুষের জড়পিণ্ড ও মাটির আধ্যাত্মিক উন্নতির কারনে ফেরেশতারও উর্দ্ধে উঠিয়া যায় সেই আধ্যাত্মিক ফয়েজ দানেও তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা ছিলেন। রসুল্লাহ (দঃ)-এর ফয়েজ কত শক্তিশালী কত ব্যাপক ছিল তাহা কিঞ্চিৎমাত্র উপলব্ধি করিবার জন্য বসন্তের মলয় বায়ুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ছনিয়ার বৃকে বসন্তের বায়ুর দ্বারা কি ব্যাপক পরিবর্তনই না আছে। হিম-ঋতুর প্রকোপে গাছের পাতা ঝরিয়া গাছগুলি জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় থাকে, শুষ্ক-লতা অগ্নিদগ্ধের ছায় বিবর্ণ ও শ্রীহীন হইয়া যায়, সমস্ত পশু-পক্ষী এমনকি মানুষের মনের পুলক পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু যখনই ঋতুরাজ মধুকাল বসন্তের হাওয়া জীবনীশক্তি সঞ্চার করিতে থাকে—তখনই পশু-পক্ষী, জীব-জন্তু, বৃক্ষ-লতা, গাছপালা সকলেই নূতন জীবন ধারণ করিয়া উঠে। বসন্তের জীবনী শক্তিবাহী মলয় বায়ুর বদৌলতে গাছপালার শুক ডালগুলি নূতন পাতায় ফলে-ফুলে সুশোভিত হয়, অগ্নিদগ্ধ মাটি সবুজ ঘাসে ছাইয়া যায়, সকলের প্রাণেই উল্লাসের ঢেউ খেলিতে থাকে। তেমনই ভাবে যুগ যুগান্তব্যাপী মৃতবৎ আত্মসমূহ এবং মেঘাচ্ছন্ন অস্তরঙ্গগুলি রসুল্লাহ ছান্নান্নাহ আল্লাইহে অসান্নান্নেমের আবির্ভাবে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার ছোহবতের ও শিক্ষার ফয়েজ ও বরকতের কল্যাণে শুধু সজীব, জীবন্ত ও আলোকিতই নহে—বরং এমন সজীবনী শক্তিসম্পন্ন, জীবনদাতা ও আলোদাতা হইয়াছিলেন যে, তাঁহার

† দওর করানোর অর্থ—পরস্পর একে অত্কে পাঠ করিয়া শুনানো। যেমন বর্তমানেও হাফেজদের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত আছে যে, একজন হাফেজ সাহেব প্রথমে পড়েন, অন্ত হাফেজ সাহেব শুনিতে থাকেন—যাহাতে একটি জের জবরেরও ভুল না হয়; তারপর দ্বিতীয় হাফেজ সাহেব পড়েন, প্রথম হাফেজ সাহেব শুনেন। এইরূপে পুরা কোরআন শরীফ একে অত্কে শুনাইয়া থাকেন এবং পুরা কোরআন শরীফের হেফজ কায়ম রাখেন। এইরূপেই জিব্রিল (আঃ) পড়িয়া শুনাইতেন হযরতকে, আবার হযরত পড়িয়া শুনাইতেন জিব্রিলকে। প্রত্যেক রমজানেই এইরূপ করিতেন—এমনকি যে বৎসর রসুল্লাহ (দঃ) এন্তেকাল করেন সেই বৎসর সম্পূর্ণ কোরআন শরীফ দুইবার দওর করিয়াছিলেন।

আলোচ্য হাদীছের এই অংশই অত্র পরিচ্ছেদে লক্ষণীয় যে, অহী সংরক্ষণে কিরূপ বাহিক সুব্যবস্থাও আল্লাহ তায়ালা রাখিয়াছিলেন। পবিত্র কোরআন অহীরই প্রধান বস্তু।

সমস্ত জগতকে নূতন জীবনের ও নূতন আলোকের সন্ধান দিতে পারিয়াছিলেন। এই তথ্যটি কোন এক কবি কি সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন!

در فشانى نے تری قطروں کو دریا کر دیا

دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا

خود نہ تھے جو راہ پر فیروں کے ہادی بن گئے

کیا نظر تھی جس نے مرد و نکو مسیحا کر دیا

অর্থাৎ রসুল্লাহ ফয়েজ ও শিক্ষা সমূহ কি অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ছিল যে, তিনি বিন্দুকে সাগরে পরিণত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ যাহারা জ্ঞানে ও গুণে নগণ্য বিন্দুবৎ ছিল তাহাদিগকে তিনি সাগর সমতুল্যরূপে গড়িয়াছিলেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তরকে আলোকপূর্ণ ও অন্ধ চক্ষুকে জ্যোতির্মান করিয়া দিয়াছিলেন। যাহারা মৃত ছিল তাহাদিগকে তিনি শুধু জীবিতই নহে—জীবনদাতারূপে গঠন করিয়াছিলেন। যাহারা নিজেরাই পথ পথভ্রষ্ট—তাহাদিগকে তিনি গঠন করিয়াছিলেন সারা জগতের পথ প্রদর্শক ও পরিচালকরূপে।

আলোচ্য হাদিছে রসুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সেই বৈশিষ্ট্যের দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। জগতের প্রত্যেক সৃষ্টিজীব ও সৃষ্টবস্তু যেক্রপ বসন্তের সূরীতল মলয় বায়ুর দ্বারা জীবনীশক্তি লাভ করিয়া থাকে, হযরত রসুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আধ্যাত্মিক ফয়েজের সামান্য ছিটা ফোটার দ্বারা তার চাইতে অধিক জীবনীশক্তি জগদ্বাসী লাভ করিয়াছে ও কেয়ামত পর্যন্ত তাহা লাভ করিতে থাকিবে। হযরত রসুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন এই দুনিয়াতে ছিলেন তখন তাঁহার ছোহবত ও সাহচর্য্য দ্বারা এবং মজলিসের দ্বারা এই ফয়েজ বিতরিত হইত। উপযুক্ত ক্ষেত্র ও পাত্রসমূহ তদ্বারা ফঞ্জিলত ও ফুলিত হইত। হানযালা (রাঃ) নামক এক ছাহাবী একদিন হযরতের দরবারে উপস্থিত হইয়া এই অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাষ বর্ণনা করিয়াছেন। হানযালা (রাঃ) হযরতের নিকট আরজ করিলেন, ইয়া রসুল্লাহ! আপনার ছোহবতে ও সাহচর্য্যে যখন আমরা থাকি তখন আমাদের মনের এমন অবস্থা হয় যে আমরা আল্লাকে, আখেরাতকে এবং বেহেশত-দোজখকে যেন চাক্ষুষ দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু যখন আপনার দরবার হইতে উঠিয়া স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে যাইয়া মিশি তখন আর দেলের ঐরূপ অবস্থা থাকে না; ঈমানের আভা যেন কম হইয়া যায়। ঐরূপ পরিবর্তনের জন্ত আমরা খুবই দুঃখিত। হযরত বলিলেন—আমার মজলিসে তোমাদের দেলের যে অবস্থা হয় ঐ অবস্থা সব সময় থাকিলে তোমরা এত উর্দ্ধে উঠিয়া যাইতে যে, ফেরেশতাগণ রাস্তাঘাটে এবং তোমাদের শয়ন-শয্যায় তোমাদের সঙ্গে মোছাকাফা করিতেন।

হযরত রসুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এন্তেকালের পর এই নেয়ামত হইতে দুনিয়া মাহরুম হইয়া গিয়াছে। কারণ, এই মোবারক দরবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং এই

সেই মোবারক নজরও উঠিয়া গিয়াছে। আনাস (রাঃ) এই দিকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—আমরা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) দাফন কার্য সমাধা করিতে না করিতেই আমাদের অন্তরের অবস্থার পরিবর্তন অনুভূত হইয়াছে। ছাহাবী আনাসের উক্তির অর্থ এই নয় যে, ছাহাবীগণের ঈমান পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। না, না, ঈমানের জ্যোতি ও আভার উপর কিঞ্চিৎ মলিনতা আসিয়া গিয়াছে এই কথাটিই মাওলানা রুমী এইভাবে বুঝাইয়াছেন :—

گر زباغ دل خلاله کم بود — بر دل سالک هزاران غم بود

অর্থাৎ আল্লাহর আশেক বাঁহারা তাঁহাদের অন্তর-উজান হইতে একটি মাত্র তৃণ কমিয়া গেলেই তাঁহারা অত্যধিক বিচলিত হইয়া পড়েন যে, হায়! আমাদের ঈমান বৃদ্ধি নষ্ট হইয়া গিয়াছে প্রকৃত প্রস্তাবে ঈমান নষ্ট হয় না। ঈমানের আভা ও জ্যোতি কিছু কমিয়া যায় মাত্র।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সেই ফযেজ তাঁহার পর তাঁহার প্রদত্ত কোরআন হাদীছের এলেমের ও আলেমের মাধ্যমে কিছুটা রহিয়া গিয়াছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই কথা নিজেই বলিয়া গিয়াছেন।

اللَّهُ أَجُودُ جُودًا وَأَنَا أَجُودُ بِنِيَّ أَدَمَ وَأَجُودُ لَهُمْ بِبَدِيٍّ رَجُلٍ عَلِمَ عِلْمًا فَفُشِّرَ -

অর্থাৎ আল্লাহ চেয়ে বড় ছখী ও বড় দাতা আর কেহ নাই। তারপর মানব জাতির মধ্যে সবচেয়ে বড় ছখী ও বড় দাতা আমি। আমার পরে সবচেয়ে বড় ছখী ও বড় দাতা সেই আলেম ব্যক্তি যিনি এলেম হাসিল করিয়াছেন এবং ছনিয়ায় মত্ত না হইয়া সেই এলেম প্রচার ও প্রসারেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। এই বিষয়টিই মাওলানা রুমী এইরূপে বুঝাইয়াছেন :—

چونکه خورشید رفت و ما را کرد داغ - چاره نبود در مقامش از چراغ
چونکه گل رفت و گلستان شد خراب - چاره نبود در مقامش از گلاب

অর্থাৎ সূর্য যখন আমাদের কাছে অন্ধকারে ফেলিয়া অন্তর্মিত হইয়া যায় তখন চেরাগ জ্বলাইয়া কিঞ্চিৎ আলো হাসিল করা ব্যতিরেকে আমাদের আর গত্যন্তর থাকে না। গোলাপ ফুল যখন ছনিয়াতে পাওয়া যায় না এবং গোলাপ ফুলের উজান বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন গোলাপী আতর ও গোলাপের পানি হইতে সুগন্ধি লাভ করা ব্যতিরেকে গোলাপ ফুলের সুগন্ধি হাসিল করার অণু বোন উপায় থাকে না। এইরূপ নবী (দঃ) যখন ছনিয়াতে নাই, নবীর মজলিস নাই, নবীর দৃষ্টি নাই, তখন নবীর খাটি নায়েবদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাঁহাদের মজলিসে নবীর বাণী শ্রবণ করা ব্যতিরেকে মানব মুক্তির অণু কোনও পথ নাই।

৬। হাদীছ :—* আবুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন—আবু সুফিয়ান আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, + ছোলেহ-হোদায়বিয়ার+ পর তিনি বাণিজ্য করিতে সিরিয়া দেশে গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে মক্কার কাকের কোরায়েশ দলের আরও অনেক সৎদাগর ছিল। তিনি বলেন, এই সময় হঠাৎ একদিন রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস আমাদিগকে ডাকিয়া পাঠান। হেরাক্লিয়াস তখন ইলিয়া শহর (বায়তুল-মোকাদ্দাসে) আসিয়াছিলেন। সেখানে তিনি দরবার সাজান এবং দরবারে তাঁহার পরিষদবর্গের সম্মুখে একসঙ্গে আমাদিগকে ডাকিয়া পাঠান; দোভাষীর মারফৎ কথাবার্তা হয়। হেরাক্লিয়াস দোভাষী মারফৎ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, আরব দেশে যে লোকটি নবুয়তের দাবী করিতেছেন তাঁহার ঘনিষ্ঠ কোন আত্মীয় আপনাদের মধ্যে কেহ আছেন কি? যদি থাকেন, তিনি কে? আবু সুফিয়ান বলেন—আমি বলিলাম, হ্যাঁ আছে, আমিই তাঁহার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। হেরাক্লিয়াস তখন আমার সম্বন্ধে বলিলেন, এই লোকটিকে আমার নিকটে বসাও এবং তাহার অত্যন্ত সাথীদিগকে তাহার নিকটবর্তী পিছনে বসাও। তারপর হেরাক্লিয়াস দোভাষীকে বলিলেন, তুমি তাহাদিগকে (আবু সুফিয়ানের সঙ্গীদিগকে) বল, আমি ইহার নিকট (আবু সুফিয়ানের নিকট) নবুয়তের দাবীদার লোকটি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। যদি ইনি কোন কথা মিথ্যা বলেন, তবে আপনারা তাহার

* এই হাদীছখানার তরজমা মদীনা শরীফে রসূল ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদের বিশিষ্ট স্থানে—রওজা সংলগ্ন “রওজাতুম মিন্ রিয়াজিল জান্নাহ”তে বসিয়া লেখা হইয়াছে।

+ আলোচ্য ঘটনাটি যখন সংঘটিত হইয়াছিল তখন আবু সুফিয়ান কাকের ছিলেন কিন্তু রসূল্লাহ (সঃ) কর্তৃক মক্কা বিজয়ের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। মোসলমান অবস্থায় তিনি আবুল্লাহ ইবনে আব্বাসের নিকট ঐ ঘটনাটি বর্ণনা করেন।

+ ষষ্ঠ হিজরীতে রসূল্লাহ (সঃ) প্রায় পনের শত ছাহাবা সঙ্গে লইয়া “ওমরা” করার উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওয়ানা হন। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পথ মক্কার নিকটবর্তী “হোদায়বিয়া” নামক স্থানে কোরায়েশগণ কর্তৃক তিনি মক্কায় প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হন। উভয় পক্ষ হইতে যুদ্ধের হুকার শুনা যাইতে লাগিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষ একটি মীমাংসায় উপনীত হইয়া দশ বৎসরের মেয়াদে একটি সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধি চুক্তিই ইতিহাসে “ছোলেহ-হোদায়বিয়া” নামে পরিচিত। ইহার বিবরণ ইনশা-আল্লাহ তৃতীয় খণ্ডে রসূলুল্লাহ জেহাদ সমূহের ঐতিহাসিক বিবরণে বর্ণিত হইবে। ছোলেহ-হোদায়বিয়ার দ্বারা শান্তি হইয়া কোরায়েশদের জয় সিরিয়ার বাণিজ্য পথে মোসলমানদের দ্বারা সৃষ্ট অবরোধ দূর হইল এবং তাহারা অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য পুনরারম্ভ করিল।

‡ রোম ও পারস্যের মধ্যে যুদ্ধ হইতেছিল। রোম সম্রাট খুষ্টান হেরাক্লিয়াস মানসত মানিয়া ছিলেন যে, যদি রোমানগণ এই যুদ্ধে জয়ী হয় তবে তিনি পদতলে পড়িবে ইলিয়া (বায়তুল মোকাদ্দাস) জেয়াজত করিবেন। যুদ্ধে রোমানগণ জয়ী হইলে সম্রাট হেরাক্লিয়াস বায়তুল মোকাদ্দাসে উপস্থিত হন।

মিথ্যাটুকু আমাকে ধরাইয়া দিবেন। আবু সুফিয়ান (এখন মোসলমান অবস্থায়) বলিতেছেন যে, খোদার কসম—যদি তখন আমার সঙ্গীগণ কর্তৃক আমি মিথ্যাবাদীরূপে প্রচারিত হওয়ার লজ্জা আমাকে বাণ্য প্রদান না করিত তাহা হইলে আমি রোম সম্রাটের নিকট মোহাম্মদের বিরুদ্ধে অবশ্যই মিথ্যা বলিতাম। (তাঁহার মিশনকে ব্যর্থ করার এই সুবর্ণ সুযোগ আমি কিছুতেই ছাড়িতাম না।)

হেরাক্লিয়াস ও আবু সুফিয়ানের প্রণোত্তর :

হেরাক্লিয়াস—এই লোকটির জন্ম কিরূপ বংশে ?

আবু সুফিয়ান—তাঁহার জন্ম অতি উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বংশে।

হেরাক্লিয়াস—এইরূপ কথা অর্থাৎ নবুয়তের দাবী আপনাদের বংশে তাঁহার পূর্বে অল্প কেহ করিয়াছেন কি ?

আবু সুফিয়ান—না।

হেরাক্লিয়াস—ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ তাঁহার দলভুক্ত হয় বেশী, না—গরীব জনসাধারণ ?

আবু সুফিয়ান—গরীব জনসাধারণ।

হেরাক্লিয়াস—তাঁহার দলের লোক সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়িতেছে, না—কমিতেছে ?

আবু সুফিয়ান—কমিতেছে না, বরং ক্রমান্বয়ে সংখ্যা বাড়িতেছে।

হেরাক্লিয়াস—কেহ তাঁহার ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর সেই ধর্মের আভ্যন্তরীণ কোনও দোষ-ত্রুটি দেখিয়া সে ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উহা পরিত্যাগ করে কি ?

আবু সুফিয়ান—না।

হেরাক্লিয়াস—নবুয়তের দাবী করিবার পূর্বে কখনও কি এই লোকটির কোন মিথ্যাবাদিতা আপনাদের নিকট ধরা পড়িয়াছে ?

আবু সুফিয়ান—না।

হেরাক্লিয়াস—এই লোক কি কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ বা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন ?

আবু সুফিয়ান—না।

কিন্তু আমরা সম্প্রতি একটি সন্ধিচুক্তি করিয়াছি; জানি না ঐ ব্যাপারে তিনি কি করেন।× (আবু সুফিয়ান বলেন,) এই কথাটুকু ছাড়া তাঁহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার মত সুযোগ আমি আর পাই নাই।

হেরাক্লিয়াস—তাঁহার (দলের) সঙ্গে আপনাদের কোনও যুদ্ধ হইয়াছে কি ? এবং হইয়া থাকিলে যুদ্ধের ফলাফল কি হইয়াছে ?

× আবু সুফিয়ান এখানে চুক্তিভঙ্গের যে আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন তাহা প্রকৃত পক্ষে রহুল্লাহর কোনও ত্রুটির দরুণ নহে বরং কোরায়েশগণই সন্ধির শর্তের বরখেলার রহুল্লাহ পক্ষীয় এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নিজ পক্ষীয় দলকে গোপনে সমর-সাহায্য করিয়া চুক্তিভঙ্গের সূচনা করে। আবু সুফিয়ান নিজেদের সেই বিশ্বাসঘাতকতার বিষয় ফলের ভয়ে শঙ্কিত ছিলেন।

আবু সুফিয়ান—হাঁ যুদ্ধ হইয়াছে। যুদ্ধে কখনও তিনি জয়ী হন, আমরা পরাজিত হই (যেমন বদরের যুদ্ধ)। কখনও আমরা জয়ী হই, তিনি পরাজিত হন (যেমন ওহোদের যুদ্ধ)।

হেরাক্লিয়াস—তিনি আপনাদিগকে কি কি আদেশ করিয়া থাকেন?

আবু সুফিয়ান—তিনি আমাদিগকে এই কাজসমূহের আদেশ করিয়া থাকেন—

أَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُنَا

بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْبِدْقِ وَالْعَفَافِ وَبِوَفَاءِ الْوَعْدِ

وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَالْمِلَّةِ ۝

১। এক আল্লার বন্দেগী কর, অন্য কাহারও পূজা করিও না, কাহাকেও আল্লার সহিত শরীক করিও না (—মানুষ-পূজা, মুক্তি-পূজা, দেব-দেবীর পূজা, পীর-পয়গাম্বর পূজা ইত্যাদি করিও না) এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের যাবতীয় কুসংস্কার ত্যাগ কর।

২। নামায কয়েম কর। (ঐ তৌহিদকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে বাস্তবে রূপায়িত করিতে কাহাকেও সেজদা না করিয়া এক আল্লাহকে সেজদা করতঃ নামায পড়।)

৩। যাকাৎ † দান (করিয়া গরীবের উপকার) কর। (গরীবের প্রতি দয়ালু হও)।

৪। সত্যবাদী হও (মিথ্যা বলিও না, প্রতিজ্ঞা রক্ষায় বিশ্বস্ত প্রমাণিত হও)।

৫। সংযমী হও। (চরিত্রের সততা ও সতীত্ব রক্ষা করিয়া পবিত্র জীবন-যাপন কামরিপু ও লোভরিপু দমন করিয়া যাবতীয় দুর্নীতি ও দুঃচরিত্রতা বর্জন করিয়া চল)।

৬। আমানতের পূর্ণ হেফাজত করিয়া প্রত্যেকের হক নিজ দায়িত্ব ভানে তাহাকে পৌঁছাইয়া দাও (আমানাতে খেয়ানত বা দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করিও না)।

৭। মানুষের সহিত কর্কশ ব্যবহার করিয়া বিচ্ছেদ ও ভাঙ্গন সৃষ্টিকারী হইও না, বরং প্রত্যেকের সাথে মধুর ব্যবহার দ্বারা মিল মহব্বত কয়েম রাখ। বিশেষতঃ মাতা-পিতা, ভাই-বোন, চাচা-ভাতিজা, মামু-ভাগ্নে, কুহু-খালা এবং আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, যাহাদের সহিত সকল সময় মেলামেশা ও উঠাবসা হইয়া থাকে তাহাদের সহিত কর্কশ ব্যবহার করিয়া তাহাদের মনে ব্যথা দিও না; সর্বাবস্থায় তাহাদের সহিত ভাল ব্যবহার দ্বারা পরস্পর মিল-মহব্বত কয়েম রাখিয়া চক্ক।*

† ادا. الامانة. الزكاة. বোখারী শরীফ ১৮৭ পৃষ্ঠায় الوفاء. কতছলবারীতে এবং মোসলেম শরীফে উল্লেখ আছে।

* আরবী ভাষায় الملة. শব্দটি এতই ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় যে, এত দীর্ঘ অনুবাদ করিয়াও আমার মনে হইতেছে না যে, শব্দটির পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করিতে পারিয়াছি।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

আবু মুফিয়ান বলেন—এই দশটি প্রশ্ন ও উত্তরের পর হেরাক্লিয়াস প্রতিটি উত্তরের উপর মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দোভাষীকে বলিলেন—তুমি বুঝাইয়া দাও যে, আমি প্রথম প্রশ্ন তাঁহার (রসুলুল্লাহ) বংশ সম্বন্ধে করিয়াছি। আপনি বলিয়াছেন, তাঁহার বংশ অতি সম্ভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে আল্লার রসুলগণ উচ্চ বংশেই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন এই করিয়াছি যে, ইতিপূর্বে আপনাদের মধ্যে এই দাবী কেহ করিয়াছে কি? আপনি বলিয়াছেন—না। আমার মন্তব্য এই যে, যদি একরূপ কথা ইতিপূর্বে কেহ বলিয়া থাকিত, তবে আমি মনে করিতাম যে, লোকটি অস্ত্রের অনুকরণ করিতেছে; অস্ত্রের দেখাদেখি একটা কথা বলিতেছে। তৃতীয় প্রশ্ন এই করিয়াছিলাম যে, তাঁহার বাপ-দাদা পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেহ রাজা বাদশা ছিলেন কি না? আপনি বলিয়াছেন—না। আমার মন্তব্য এই যে, যদি তাঁহার পূর্বপুরুষের মধ্যে কেহ রাজা-বাদশাহ থাকিতেন তবে সন্দেহ করা যাইত যে, হয়ত তিনি তাঁহার বাপ-দাদার সিংহাসন লাভ করিতে চাহেন। চতুর্থ প্রশ্ন এই করিয়াছিলাম যে, উক্ত লোকটি এই কথা বলার পূর্বে অর্থাৎ নব্যতের দাবী করার পূর্বে কখনও কোন কথায় তাঁহাকে আপনারা মিথ্যাবাদীরূপে পাইয়াছেন কি? আপনি বলিয়াছেন—না। আমার ধারণা এই যে, যে লোক জীবন ভর মানুষের বেলায় মিথ্যা পরিহার করিয়া আসিয়াছেন তিনি যে হঠাৎ আল্লার সম্বন্ধে মিথ্যা বলিবেন ইহা অবাস্তব। পঞ্চম প্রশ্ন এই করিয়াছিলাম যে, প্রভাবশালী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ তাঁহার অনুগামী হইতেছে বেশী, না—গরীব জনসাধারণ? আপনি বলিয়াছেন যে, গরীব জনসাধারণ। আমার মন্তব্য এই যে, সাধারণতঃ গরীব জনসাধারণই প্রথমে সত্য নবীগণের অনুগামী হইয়া থাকে। ষষ্ঠ প্রশ্ন এই করিয়াছিলাম যে, তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, না—কমিতেছে? আপনি বলিয়াছেন, বৃদ্ধি পাইতেছে। আমরা মন্তব্য এই যে, বাস্তবিক পক্ষে সত্য ধর্ম এবং সত্য ঈমানের ইহাই লক্ষণ যে, ক্রমাশয়ে উহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং এইভাবে উহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সপ্তম প্রশ্ন এই করিয়াছিলাম যে, তাঁহার ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর কেহ সেই ধর্মের আভ্যন্তরীণ কোন বিষয় অপছন্দ করিয়া ধর্ম পরিত্যাগ করে কি? আপনি বলিয়াছেন—না। আমার মন্তব্য এই যে, বাস্তবিকই সত্যিকারের ঈমান ও সত্যিকারের ধর্ম যখন মানুষের অন্তঃস্থলে বদ্ধমূল হইয়া

আত্মীয়-স্বজনের সহিত ভাল ব্যবহার করা তাহাদের উপকার করা, বিপদে তাহাদের সাহায্য করা ইহা মানব চরিত্রের অতি উচ্চ স্তরের স্বভাব, ইহাকে স্বজন-তোষণ বলা যায় না। নিন্দনীয় স্বজন-তোষণ ও ঘৃণিত স্বজন-প্রীতির অর্থ এই যে, অস্ত্রের হক নষ্ট করিয়া স্বীয় আত্মীয়ের মন রক্ষা করা। যেমন, রাষ্ট্রীয় আমানতের মাল বা পদ উপযুক্ত স্থানে ও যোগ্যতর ব্যক্তিকে না দিয়া নিজের অযোগ্য আত্মীয়কে দেওয়া। নিজের মাল আত্মীয়কে দেওয়া দুষণীয় নহে এবং আত্মীয়তার মাপকাঠিতে নয়, বরং যোগ্যতার মাপকাঠিতে মাপিয়া যদি কোন যোগ্যতম আত্মীয়কে রাষ্ট্রীয় পদ বা মাল দেওয়া তাহা হইলেও দুষণীও হইবে না।

যায়, তখন সে উহার এত আশ্বাদ লাভ করে যে, সে আর তাহা কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে না। অষ্টম প্রশ্ন এই করিয়াছিলাম যে, এই লোকটি বিশ্বাসঘাতকতা বা চুক্তিভঙ্গ করেন কি? আপনি বলিয়াছেন—না। আমার মন্তব্য এই যে, বাস্তবিকই সত্য নবীগণ কখনও বিশ্বাসঘাতকতা বা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। নবম প্রশ্ন এই করিয়াছিলাম যে, আপনাদের সঙ্গে তাঁহার কোন যুদ্ধ হইয়াছে কি না, হইয়া থাকিলে যুদ্ধের ফলাফল কি? আপনি বলিয়াছেন—যুদ্ধ হইয়াছে এবং যুদ্ধে কখনও তিনি জয়লাভ করিয়াছেন, আবার কখনও পরাজিতও হইয়াছেন। আমার মন্তব্য এই যে, প্রকৃত প্রস্তাবে পাখিব ব্যাপারে সর্বক্ষেত্রে সর্বদা জয়ী হওয়া পয়গাম্বরের কোন বিশেষত্ব নহে; বরং কষ্ট, সাধনা, তিতিকা, পরাজয় ও পরীক্ষার ভিতর দিয়া পরিণামে জয়যুক্ত হওয়াই তাঁহাদের সাধারণ নিয়ম। দশম প্রশ্ন এই করিয়াছিলাম যে, তিনি কি কি আদেশ ও নিষেধ করিয়া থাকেন? আপনি বলিয়াছেন যে, তিনি এক আল্লার বন্দেগী করিতে আদেশ করেন, কাহাকেও আল্লার শরীক করিতে নিষেধ করেন—(মূর্তি বা দেব দেবীর পূজা বা মানুষ পূজা করিতে নিষেধ করেন।) আল্লার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়িতে, সত্যবাদী হইতে এবং বিশ্বস্ত, সদাচারী ও সংযমী হইতে পরোপকারী, সদয় ও সদ্যবহারকারী হইতে বলেন। আমার মন্তব্য এই যে, আপনি যাহা কিছু বলিয়াছেন বাস্তবিকই যদি সে সব সত্য হয়, তবে নিশ্চয় জানিবেন, এই ব্যক্তি অতি শীঘ্র আমার পায়ের তলার এই দেশ পর্য্যন্ত জয় ও অধিকার করিয়া লইবেন। এ সম্বন্ধে আমার পূর্ণ জ্ঞান ও সন্দেহাতীত বিশ্বাস ছিল যে, তিনি (অর্থাৎ আখেরী পয়গাম্বর—শেষ যাদানার নবী) আসিবেন। কিন্তু আমার এই ধারণা ছিল না যে, তিনি আপনাদের আরববাসীদের মধ্য হইতে হইবেন।+ যদি আমি বুঝি যে, আমি তাহার নিকট পৌঁছিতে পারিব, তবে নিশ্চয়ই আমি তাঁহার খেদমতে হাজির হইয়া তাঁহার দর্শন লাভ করিব। আর যদি আমার ভাগ্যে তাঁহার দর্শন ও সাহচর্য লাভ জোটে তবে তাঁহার পদ ধোত করিয়া জীবনকে সার্থক করিব।

এই পর্য্যন্ত প্রশ্নোত্তর ও মন্তব্য প্রকাশ করার পর হেরাক্লিয়াস রসুলুল্লাহ ছালামাছ আলাইহে অসাল্লামের প্রেরিত পত্রখানা আনাইলেন এবং উহা পাঠ করা হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) পত্রখানা দেখিয়া কল্বী নামক ছাহাবীর হাতে বোছরার* শাসনকর্তার মারফৎ হেরাক্লিয়াসের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। পত্রখানার ভাষা ও মর্ম এই ছিল :

+ পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহে আমাদের হজরত (দঃ) সম্বন্ধে পৃথাকপৃথাকরূপে সকল কথা বর্ণিত ছিল। কিন্তু পাদ্রিগণ আসল কিতাবের বর্ণনা ও শব্দাবলী পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছিল। হেরাক্লিয়াস আসল কিতাবের একত বর্ণনা দেখেন নাই। পরিবর্তিত বর্ণনা দেখিয়াছিলেন—সেই জগ্গই তিনি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই যে, আখেরী পয়গাম্বর আরব দেশে পয়দা হইবেন।

* বর্তমান জর্দানের অন্তর্গত তৎকালীন একটি শহরের নাম বোছরা।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ০

مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هَرَقُلَ عَظِيمِ الرُّومِ - سَلَامٌ عَلَى
مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَاِنِّي اَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْاِسْلَامِ - اَسْلِمْتَ تَسْلِمَ
يُؤْتِكَ اللَّهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ - فَاِن تَوَلَّيْتَ فَاِن عَلَيْكَ اِثْمَ الْبِرِّيْسِيِّينَ
وَيَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ لَا نَعْبُدَ
اِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ -
فَاِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُونَ -

“বিছমিল্লাহের রাহমানের রাহীম”

প্রেরক—আল্লাহর দাস, আল্লাহর নিয়োজিত ও প্রেরিত রমূল মোহাম্মদ।

প্রাপক—রোমান জাতির বিশিষ্ট ব্যক্তি হেরাক্লিয়াস।

সম্ভাষণ—শান্তি তাহাদের জন্য যাহারা সত্য পথের অনুসারী। অতঃপর—

আমি আপনাকে ইসলামের আকুল আহ্বান জানাইতেছি। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন (স্বীয় সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তার আনুগত্য স্বীকার করুন)। তাহা হইলেই আপনি শান্তি (ও মুক্তি) লাভ করিতে পারিবেন। আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার (পরকালের মুক্তি এবং ইহকালের রাজত্বের সম্মান ও সুখ ভোগ) দান করিবেন।† যদি আপনি আমার এই আহ্বানে সাড়া না দেন, তবে (আপনার পাপ ত আপনার থাকিবেই, তদতিরিক্ত) আপনার প্রজাবর্গ ও অনুচরবর্গের পাপের বোঝাও আপনার উপর পড়িবে। (আল্লাহ তাঁহার স্বীয় পবিত্র বাণীর মধ্যে নবী ও নবীর উন্মত্তগণের পক্ষ হইতে ফরমাইয়াছেন) হে কেতাবধারী জ্ঞানীগণ! আসুন; (সংস্কার পরিহার করিয়া ও স্থির মস্তিষ্ক লইয়া আমরা চিন্তা করি—) আপনাদের ও আমাদের মধ্যে (পার্থক্য কতটুকু?) যতটুকু ঐক্যমত ততটুকুর মধ্যে আমরা সকলে এক হইয়া যাই। আপনারাও নাস্তিক নন আমরাও নাস্তিক নই। আপনারাও সাকারবাদী

† হেরাক্লিয়াস নাছরানী ছিলেন। ইহুদী বা নাছরানী ইসলাম গ্রহণ করিলে হাদীছ অনুযায়ী সে দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হইয়া থাকে, এতদ্বিধি তাঁহার অমুকরণ করিয়া অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করিবে, সে কারণেও তিনি অধিক ছওয়াবের অধিকারী হইবেন।

মূর্তিপূজক বা দেব-দেবীর পূজারী নন—নিরাকারবাদী এক খোদাবাদী, একত্ববাদী এবং আমরাও সাকারবাদী নই, মূর্তিপূজক বা দেব দেবীর পূজারী নই—নিরাকারবাদী এক খোদাবাদী, একত্ববাদী। আসুন আমরা সকলে একত্র ও একতাবদ্ধ হইয়া এক নিরাকার খোদার বন্দেগী করি; এক খোদার সঙ্গে অল্প কাহাকেও শরীক না করি; এক আল্লাহ ব্যতীত অল্প কাহাকেও—কোন মানুষকে বা কোন সৃষ্ট পদার্থকে আমরা খোদা রূপে গ্রহণ না করি। (মুখের কথায় বা অল্পকে বুঝাইতে অনেকেই সততার পরিচয় দিয়া থাকে, কিন্তু যাহার মধ্যে কার্য্যতঃ ও স্বার্থের বিপক্ষে সততা পাওয়া যায় সে-ই প্রকৃত মানুষ। এই জন্য আল্লাহ তায়ালা মোসলমানগণকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে,) তোমাদের আন্তরিক আহ্বানেও যদি তাহারা সাড়া না দেয়, তবে খবরদার! তোমরা যেন শ্রোতে ভাসিয়া না যাও। একতা লাভ করিতে গিয়া মূলমন্ত্র যেন ভুলিয়া না যাও। যদি তাহারা তোমাদের এই সরল সত্য ডাকে সাড়া না দেয় তবে তোমরা (আদৌ কোনরূপ ভয়, দুর্বলতা বা হীনমন্ত্রতা—Inferiority complex নিজেদের মধ্যে আসিতে দিও না।) দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়া দাও যে, আপনারা সাক্ষী থাকুন, আমরা কিন্তু অটল অনড়—এক খোদারই উনাসক এক খোদারই আনুগত্য স্বীকারকারী।

আবু সুফিয়ান বলেন—হেরাক্লিয়াস যখন তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিলেন এবং পত্র পড়া শেষ হইল, তখন লোকদের মধ্যে ভীষণ হট্টগোল ও হৈ হোল্লা পরিয়া গেল। (আর কোন কথা হইতে পারিল না;) আমাদিগকে বাহির করিয়া দেওয়া হইল। বাহিরে আসিয়া আমি আমার সঙ্গীদিগকে বলিলাম ওহে! আমার মনে হয় আবু কাবশার পুত্রের+ (মনোবাহু যেন পুরা হইয়া যাইবে,) তাঁহার মিশন এত শক্তিশালী হইয়াছে যে, খেতাবদের রাজা রোম সম্রাট পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভয় করে। আবু সুফিয়ান বলেন—সেই দিন হইতেই আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে মোহাম্মদ (দঃ)-এর মিশন বিজয়ী ও সফলকাম হইবে—এমনকি মক্কাবিজয়ের সময়ে আল্লাহ তায়ালা আমাকে মুসলমান হওয়ার তৌফিক ও সামর্থ্য দান করিলেন।

ইবনে নাতুর* হেরাক্লিয়াসের পক্ষ হইতে সিরিয়া প্রদেশের শাসনকর্তা এবং প্রধান পাদ্রী ছিলেন, বিশেষতঃ তাঁহার সহিত হেরাক্লিয়াসের বন্ধুত্বও ছিল। তিনি বলিয়াছেন—

+ রসুলুল্লাহ আদি পুরুষদের মধ্যে কোন একজন অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম ছিল আবু কাবশাহ। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার ছদ্ম-নামের এই নাম ছিল। মক্কার কাকেরগণ রসুলুল্লাহ প্রতি শত্রুতামূলকভাবে তাঁহাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এই অপরিচিত লোকটির সহিত সম্পৃক্ত করিয়া রসুলুল্লাহকে অভিহিত করিত। “মোহাম্মদ” শব্দের অর্থ প্রংশসিত তাছাড়া কোরায়েশ বংশের কোন খ্যাতনামা ব্যক্তির দ্বারা পরিচয় করা হিলে রসুলুল্লাহ মর্যাদা বাড়িয়া যায় তাই তাহারা ঈর্ষা বশে রসুলুল্লাহকে ইবনে আবু কাবশাহ তথা আবু কাবশার বংশধর বা পুত্র বলিয়া অভিহিত করিত।

* ইবনে নাতুর একজন প্রসিদ্ধ পাদ্রী ছিলেন, পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

হেরাক্লিয়াস যখন ইলিয়া (বায়তুল-মোকাদ্দাস) আসিয়াছিলেন, তখন একদিন সকাল বেলায় তাঁহাকে খুবই বিস্ময়চিত্ত ও চিন্তাযুক্ত দেখাইতেছিল। তখন দরবারের একজন পাদ্রী বলিলেন, আমরা আপনাকে অত্যন্ত বিস্ময় দেখিতেছি। (কারণ কি?) ইবনে নাতুর বলেন, হেরাক্লিয়াস জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। যখন দরবারের লোকেরা চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিল তখন হেরাক্লিয়াস বলিলেন—আজ রাত্রে আমি জ্যোতিষবিচার গণনা দ্বারা জানিতে পারিয়াছি যে, খত্‌নাধারী জাতির বাদশাহ জয়লাভ করিয়াছেন।^১ অতএব দেখা দরকার বর্তমান জাতি নিঃস্বের মধ্যে কোন্ জাতি খত্‌না করে। দরবারের সকলেই বলিল, ইহুদী জাতি ভিন্ন অন্য জাতি খত্‌না করে না। কিন্তু ইহুদী জাতি এত দুর্বলচেতা, বিচ্ছিন্ন ও ছত্রভঙ্গ যে, ইহাদের জন্য আপনি মোটেই চিন্তা করিবেন না। অবশ্য রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের শাসনকর্তাগণকে আপনি লিখিয়া পাঠান যে, ইহুদী জাতিকে কেন সমূলে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়। এই বিষয়ে চিন্তা ও আলোচনা হইতেছিল এমন সময় হেরাক্লিয়াসের দরবারে একজন লোককে উপস্থিত করা হইল যাহাকে গাস্‌লানের শাসনকর্তা পাঠাইয়াছিলেন; সেই লোকটি রসুলুল্লাহ খবর বলিতেছিল। সেই লোকটির নিকট যখন হেরাক্লিয়াস সব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন তখন দরবারের লোকদিগকে আদেশ করিলেন, দেখ—এই লোকটির খাত্‌না করান কি না? সকলে অনুসন্ধান করিয়া বলিল, হাঁ—সে খাত্‌না করানো এবং তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, আরবজাতি সকলেই খত্‌না করিয়া থাকে। অতঃপর হেরাক্লিয়াস বলিলেন, ইহারাই বর্তমান যুগের বাদশাহ। আমি জ্যোতিষ শাস্ত্রে যাহা দেখিয়াছি তাহাতে ইহাদেরই বিজয় ঘোষণা করা হইয়াছে।

† হেরাক্লিয়াস জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এবং তদ্বারাই তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রে যাহা দেখা যায় কদমিৎ উহার কোনও কোনটা প্রকৃত ঘটনার সঙ্গেও খাপ খাইয়া যায়। যেমন, এই ক্ষেত্রে ঘটিয়াছিল—এ সময় কোরায়েশগণ রসুলুল্লাহ (দঃ) সঙ্গে ছোলেহ-হোদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে এই ছোলেহ ও সন্ধিই রসুলুল্লাহ (দঃ) তথা মোসলেম জাতির বিজয় ঘোষণা করিয়াছিল। কারণ, ইতিপূর্বে কোথাও মোসলেম জাতির সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল না। হোদায়বিয়ার ঘটনাতে আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় কোরায়েশগণ দলবদ্ধভাবে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করায় স্বাধীন জাতি ও শক্তি হিসাবে মোসলমান জাতির সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হইল। এখান হইতেই রসুলুল্লাহ (দঃ) তথা মোসলেম জাতির জয়ের সূচনা হয়। হেরাক্লিয়াস জ্যোতিষবিচার দ্বারা তাহাই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন পন্থীদের জন্য তাহাদের নিজ নিজ পন্থায় রসুলুল্লাহ (দঃ)র আবির্ভাব ও বিজয়বার্তা প্রকাশ করিয়াছিলেন; যেন কাহারও কোন ওজর আপত্তির সুযোগ না থাকে।

আল্লাহ তায়ালা অনেক এহ-নকজকে নানারূপ পরিবর্তন ও বিষয় বস্তুর আবির্ভাবের আলামত ও নিদর্শন বা কার্যকারণ স্বরূপ করিয়া রাখিয়াছেন। কোন কোন এহ নকজের এই

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

তারপর হেরাক্লিয়াস রোম শহরে তাঁহার জনৈক বন্ধু—তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে ও পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহে হেরাক্লিয়াস সমতুল্য বিজ্ঞ ও পারদর্শী ছিলেন, তাঁহার নিকট এই বিষয়ে পত্র লিখিলেন এবং ইলিয়া হইতে হেমস শহরে গমন করিলেন। হেমস শহরে থাকা অবস্থায়ই রোমের সেই বন্ধুর উত্তর পাইলেন। উত্তরে তিনি হেরাক্লিয়াসের সঙ্গে একমত হইয়া মন্তব্য করিলেন যে, আশ্চর্য্য যমানার নবী আবির্ভূক্ত হইয়াছেন এবং আরবের তিনিই সেই নবী।

অতঃপর হেমস শহরেই হেরাক্লিয়াস রোম সাম্রাজ্যের সমস্ত বড় বড় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে ডাকিয়া আনিবেন, একটি দ্বিতল রাজপ্রাসাদের চত্বরে তাঁহাদিগকে একত্রিত করিয়া বাহিরে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। তারপর হেরাক্লিয়াস উপরতলা হইতে লোকদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—হে রোমবাসিগণ! যদি ইহ-পরকালের মুক্তি ও মঙ্গল চাও এবং রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধি কামনা কর, তবে তোমরা এই নবীর হাতে ‘বায়আত’—দীক্ষা গ্রহণ কর; তাঁহার আনুগত্যের অঙ্গিকারে আবদ্ধ হইয়া যাও। মাত্র এতটুকু বলার সঙ্গে সঙ্গেই দরবারস্থ লোকগণ জংলী গাধার স্থায় চীৎকার করিতে করিতে বহির্গমনের জন্ত ছুটিয়া চলিল, কিন্তু দরওয়াজাসমূহ বন্ধ থাকায় তাহারা বাহির হইতে পারিল না; যেহেতু পূর্ব হইতেই এই ব্যাঙ্গ্য করিয়া রাখা হইয়াছিল। হেরাক্লিয়াস এই

প্রভাবকে আল্লাহ তায়ালা চাক্ষুস প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন—যেমন সূর্য্যের তাছির ও কার্য্যকারিতায় দিবা-রাত্রির আবর্তন ঘটে ও ঋতুর পরিবর্তন হয়, চন্দ্রের তাছিরে জোয়ার ভাটা হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপ অনেক গ্রহ নক্ষত্রের সঙ্গেই আল্লাহ তায়ালা জাগতিক পরিবর্তনের যোগাযোগ রাখিয়াছেন। কোনও একজন পয়গাম্বরকে আল্লাহ তায়ালা এ বিষয় বিস্তারিত জ্ঞান দান করিয়াছিলেন। কিন্তু বহু পূর্বেই এই বিচার আসল বিষয় বস্তুগুলি জগৎ হইতে লোপ পাইয়া যায়। পরবর্তী জ্যোতিবিদগণ এ বিষয় তাহাদের জ্ঞানের দাবী করে বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের কোন জ্ঞানই নাই। কারণ, আসল বিজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার পর সঠিকভাবে গণনা করার ক্ষমতা কাহারও হইতে পারে না। তাই অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় জ্যোতিষীদের গণনা শতকরা নিরানব্বইটাই মিথ্যা ও ভুল প্রমাণিত হয়। আন্দাজে টিল ছোড়ার স্থায় কোনও একটা হয়ত লক্ষ্য বস্তুতে লাগিয়া যায় এবং প্রচারের সময় ঐ একটাই সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। তা-ছাড়া এসব বিষয়ের চর্চায় সাধারণ্যে একটি মারাত্মক ক্ষতিকর ধারণার সূত্রপাত এই হয় যে, জাগতিক পরিবর্তন ও সাধারণ ঘটনা সমূহের মধ্যে কেবলমাত্র ঐ সমস্ত নগণ্য সূক্ষ্ম পদার্থগুলির অপরিসীম প্রভাব, শক্তি, ক্ষমতা ও দক্ষতার ধারণাই মনের কোণে জাগিয়া উঠে। এরূপ ধারণা শেরেক ও কুফরী। এক হাদীছে আছে—“কোন এক রাজ্যে বৃষ্টিপাত হইল, আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক এই বৃষ্টির ব্যাপারে কাফের সাজিবে—তাহারা বলিবে যে, “অমূল্য নক্ষত্রের দ্বারা বৃষ্টিপাত হইয়াছে”। প্রচলিত জ্যোতিষবিজ্ঞান এরূপ অত্যধিক ভুল, মিথ্যা ও শেরেক এবং কুফরীর সূত্রসমূহ বিজ্ঞমান থাকায় উহা শিক্ষা ও বিশ্বাস করা শরীয়তে একেবারে হারাম সাব্যস্ত করা হইয়াছে।

দৃশ্য দর্শনে লোকদের ঈমান ও ইসলাম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া গেলেন। (তিনি নিশ্চিতরূপে ধরিয়া লইলেন যে, রসুলুল্লাহ প্রতি তাঁহার যে, ভাবের উদয় হইয়াছে এবং যেই ভাবাবেগের ফলে তিনি পূর্ব মন্তব্যসমূহ করিয়াছিলেন সেই ভাবের উপর চলিতে থাকিলে তাঁহার হাতে রাজত্ব থাকিবে না। তাই তিনি রাজত্বের লোভে ও ক্ষমতার মোহে তাঁহার সেই উপস্থিত ভাবকে বিসর্জন দিয়া দেশবাসীকে যেই সত্য কথা বলিয়াছিলেন উহার মোড় ঘুরাইয়া দিলেন।) তিনি পুনঃ লোকদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, ওহে! আমি তোমাদিগকে ইতিপূর্বে যাহা কিছু বলিয়াছি তদ্বারা তোমাদের নিজ ধর্মের উপর কতটুকু আস্থা ও দৃঢ়তা আছে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য বলিয়াছি। সেমতে আমি দেখিতেছি, স্বীয় ধর্মের প্রতি তোমাদের পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রহিয়াছে। এই ব্যাখ্যা শুনিয়া জনসাধারণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইল এবং সমবেতভাবে তাঁহাকে সেজ্জদা করিয়া চলিয়া গেল। এই ছিল হেরাক্লিয়াসের শেষ অবস্থা।

বিশেষ দৃষ্টব্য :—এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—অধুনা অনেকেই এই বিষয়টি বুঝিতে মারাত্মক ভুল করিয়া থাকে। অর্থাৎ হেরাক্লিয়াস রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর প্রতি যে প্রকাশ্য আহ্বান জানাইলেন যে, যদি তোমরা ইহ-পংকালের মুক্তি কামনা কর, তবে এই নবীর প্রতি আনুগত্য স্বীকার কর। এতদসত্ত্বেও হেরাক্লিয়াস মোমেন ও মুসলমান বলিয়া গণ্য হন নাই। এক হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, (এই ঘটনার

ও এখানে একই ঘটনার তিনটি খণ্ড উল্লেখ করা হইয়াছে : (১) আবু সুফিয়ানের বর্ণনা (২) ইবনে নাভুয়ের বর্ণনা (৩) হেরাক্লিয়াসের বন্ধুর সঙ্গে পত্রালাপ। একই ঘটনা প্রবাহের এই তিনটি অংশ। এখানে একটি কথা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লেখিত আরববাসী লোকটি ও দেহুইয়া কালবী নামক পত্রবাহক ছাহাবী একই ব্যক্তি। তজ্জপ গাসসানের শাসনকর্তা বোছরার শাসনকর্তাও একই ব্যক্তি। পূর্ণ ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ এই যে, সম্রাট হেরাক্লিয়াস ইলিয়া শহরে থাকাকালীন অবস্থায় জ্যোতিবিজ্ঞার দ্বারা খত্নাদারী জাতির বাদশার জয় অনুভব করিয়া নানারূপ জয়না-করনার রত ছিলেন। এদিকে তাঁহার উদ্দেশ্যে লিখিত রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর পত্রখানা লইয়া আরবাসী দেহুইয়া কালবী বোছরায় নিযুক্ত গাসসান কবিলার শাসনকর্তা মারফত তাঁহার নিকট পৌঁছিলেন, তখন দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত সমস্ত ঘটনা ঘটিল। হেরাক্লিয়াস তখন পত্র প্রেরকের পবিচয় ঘোটাছুটি জানিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার হাল হকিকত পূর্ণভাবে অবগত হইবার জন্য পত্র পুলিশ পাঠ করিবার পূর্বেই আবু সুফিয়ানের দলকে ডাকা হয় এবং প্রথম বর্ণিত ঘটনা ঘটে। হট্টগোলের ভিতর দিয়া হেরাক্লিয়াসের দরবার ভাঙ্গিয়া গেলে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার কথা জনসাধারণ গ্রহণ করিবে না। তাই তিনি রোম নিবাসী নাছারাদের প্রসিদ্ধ আলেম সর্বশ্রেষ্ঠ পাদ্রীর নিকট বিস্তারিত বিষয় লিখিয়া চিঠি দিলেন এবং ইলিয়া ত্যাগ করিয়া দেশের বিশিষ্ট শহর হেমসে চলিয়া গেলেন। তথায় যাইয়া ঐ পাদ্রীর নিকট হইতে উত্তর পাইলেন। পাদ্রীকে তাঁহার সহিত একমত দেখিয়া দেশবাসীকে এই সত্য নবীর আনুগত্যের আহ্বান জানাইবার সাহস করিলেন এবং তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত ঘটনা সংঘটিত হইল।

আনুমানিক দুই বৎসর পর) তবুকের যুদ্ধের সময় হেরাক্লিয়াস রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট পত্র লিখিয়াছেন এবং তাহাতে তিনি নিজেকে মুসলমান বলিয়া উল্লেখ করেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) উহা দেখিয়া বলিয়াছেন—

كذب عدو الله ليس بمسلم بل هو على نصرنا نيته

‘মিথ্যাবাদী খোদার দুষমন। ধোকাবাজী করিয়াছে; সে কস্মিনকালেও মুসলমান নহে; বরং সে এখনও নাহরানী বর্মের উপরই রহিয়াছে। এখানে অনেকের মনেই প্রশ্ন উদয় হইবে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর প্রতি এত সুন্দর মর্যাদাপূর্ণ সম্মানসূচক মন্তব্যকারী হেরাক্লিয়াসের ছায় ব্যক্তি মুসলমান বলিয়া গণ্য হইল না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য ইসলাম ও ঈমানের পূর্ণ হাকিকত ও তাৎপর্য উপলব্ধি করা একান্ত আবশ্যক।

ঈমানের হাকিকত বা তাৎপর্য :

মানুষের মধ্যে শুধু জ্ঞান ও বিবেক রত্নই নহে—বরং কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি রিপুও আছে। যাহারা সাধনা করিয়া সংযম অভ্যাস করিয়া জ্ঞানের দ্বারা রিপুকে জয় করিতে পারেন তাহারাই মানুষ হইতে পারেন; নতুবা শুধু জ্ঞান অর্জনের দ্বারা মানুষ প্রকৃত মানুষ হইতে পারে না। হেরাক্লিয়াস ইতিপূর্বে আসমানী কেতাবের বা জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রমাণ অনুসারে ভাবাবেগ বশতঃ যাহা কিছু মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহার মূলে শুধু তাহার জ্ঞান ও পরিচয় লাভই ছিল। কিন্তু ঈমান রত্ন হাশিলের জন্য শুধু ভাবের উদয় ও জ্ঞানই যথেষ্ট নহে, বরং উদীয়মান ভাব ও জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব প্রকার ভয়-ভীতি, মোহ ও লালসা এবং সামাজিক বিধিবন্ধন ও সংস্কার ইত্যাদিকে বিসর্জন দিয়া ত্যাগ স্বীকার করতঃ পূর্ণভাবে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের প্রতি আত্মসমর্পণ ও আত্মগত্যা স্বীকার করা এবং জীবনের সর্বস্তরে সেই আত্মগত্যা প্রয়োগের প্রজ্ঞতি মনে-প্রাণে গ্রহণ করা আবশ্যক। ইহা ব্যতিরেকে ঈমানও হাশিল হয় না, মুক্তিও পাওয়া যায় না। স্বার্থোদ্ধার বা স্বার্থহানির অপচিন্তা কিম্বা সামাজিক বিধিবন্ধন ও সংস্কারের মোহ ইত্যাদির সংঘর্ষের সময় নফছের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও আত্মগত্যা স্বীকার এবং মনে-প্রাণে সেই আত্মগত্যের প্রজ্ঞতি গ্রহণ করা ব্যতিরেকে যে ঈমান হাশিল হয় না তাহার প্রমাণ কোরআন শরীফেই পরিষ্কার

উল্লেখ রহিয়াছে—“يَعْرِضُونَ كَمَا يَعْرِضُونَ أَبْنَاءَهُمْ”—“ইহুদী ও নাছারাদের মধ্যে এমন বহু লোক আছে যাহাদের রসুলুল্লাহর পরিচয় ও জ্ঞান একরূপ হাশিল রহিয়াছে যে রূপ তাহাদের স্বীয় সম্ভান সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট পরিচয় হাশিল আছে।”

কিন্তু যেহেতু তাহারা এই পরিচয় ও জ্ঞানের সঙ্গে আত্মসমর্পণ ও পূর্ণ আত্মগত্যা স্বীকার করে নাই, তাই তাহারা ঈমানদার গণ্য হয় নাই—কাকেরই রহিয়া গিয়াছে।

হেরাক্লিয়াসের জ্ঞান ছিল, ভাবাবেগও অত্যধিক ছিল, কিন্তু স্বার্থের অর্থাৎ রাজত্বের চিন্তা ছিল ততোধিক। যদি তিনি এই স্বার্থের লোভ ও রাজত্বের মোহকে সত্যের

যাতিরে ত্যাগ করিতে পারিতেন তবেই তিনি মুক্তি পাইতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিতে পারেন নাই। যখন তিনি দেখিলেন যে, সত্যকে স্বীকার করিয়া লইলে তাঁহার স্বার্থে আঘাত লাগিবে, রাজত্ব চলিয়া যাইবে, তখনই তিনি উদীয়মান ভাবকে প্রতিহত করিতে লাগিলেন এবং কথাবার্তার মধ্যে “যদি আমি বৃষ্টি” ইত্যাদি দুর্বলতাসূচক ভাব প্রকাশ করিলেন। অবশেষে স্বউদিত ভাবকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিলেন এবং দেশবাসীকে যে সত্যের ডাক শুনাইয়াছিলেন উহার বিকৃত অর্থ করিয়া অবিচলিত গিতে সত্যধর্ম গ্রহণ করার মত সংসাহস হইতে বিরত রহিলেন। কাজেই তিনি ইসলাম ও ঈমান রত্ন হইতে বঞ্চিত থাকিয়া গেলেন। পক্ষান্তরে অবিচলরূপে অকাতরে এবং নির্ভয়ে সত্যকে গ্রহণ করার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হেরাক্লিয়াসেরই বন্ধুর ঘটনায় সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যায়; যাহা ছিল প্রকৃত ঈমান।

হেরাক্লিয়াসের বন্ধুর ঘটনা :

পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, রোম শহরে হেরাক্লিয়াসের এক বন্ধু ছিলেন, যাহার নিকট হেরাক্লিয়াস সম্পূর্ণ ঘটনার বিবরণ দিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই বন্ধুটির নাম ছিল “জাগাতের”। হেরাক্লিয়াস তাঁহার নিকট পত্র লিখার পর পত্রবাহক ছাত্রাবী দেহুইয়া (রাঃ)কে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন, রোম শহরে একজন বড় পাখী আছেন তাঁহার নাম জাগাতের। রোমবাসীগণ তাঁহার অত্যধিক অনুগত। আপনি তাঁহার নিকট রসুলুল্লাহ ছালালাছ আলাইহে অসাল্লামের পত্রখানা নিয়া উপস্থিত হউন। তিনি রোমবাসীগণকে আহ্বান জানাইলে আশা করা যায় তাহারা তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিবে। দেহুইয়া (রাঃ) পত্রখানা লইয়া জাগাতেরের নিকট উপস্থিত হইলেন। জাগাতের রসুলুল্লাহ ছালালাছ আলাইহে অসাল্লামের পত্রখানা পাঠ মাত্র রসুলুল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাসে তাঁহার মন-প্রাণ ভরিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি খুষ্টানী পোষাক ত্যাগ করিয়া নূতন পোষাক পরিধান করতঃ কো-রূপ ইত্যন্তঃ ব্যতিরেকে সত্যধর্ম ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দান পূর্বক খোলাখুলি ভাবে রোমবাসীদিগকে ইসলামের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাইলেন। রোমবাসীগণ সংস্কারাচ্ছন্ন থাকায় তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না, বরং অতি মাত্রায় উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে ভীষণ প্রহারে মারিয়া ফেলিল দেহুইয়া (রাঃ) হেরাক্লিয়াসের নিকট ফিরিয়া আসিয়া জাগাতেরের সকল অবস্থা বর্ণনা করিলেন। হেরাক্লিয়াস উহা শুনিয়া বলিলেন, আমি ত পূর্বেই বলিয়াছিলাম যে, আমার ভয় হয়, ইসলাম গ্রহণ করিলে খুষ্টানগণ আমাকে মারিয়া ফেলিবে। দেখুন জাগাতের রোমবাসীদের নিকট আমার তুলনায় অধিক শ্রদ্ধেয় ছিলেন, তবুও তিনি বাঁচিতে পারিলেন না। (কতছল-বারী ১—৩৬)

আরও একটি মর্মান্তিক ঘটনা :

দেহুইয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রোমবাসীগণ হেরাক্লিয়াসের দরবার হইতে চলিয়া যাওয়ার পর তিনি আমাকে ডাকিলেন এবং একজন প্রধান পাখীকেও ডাকাইয়া আনিলেন।

সমস্ত রোমবাসীদের উপর এই পাদ্রীর অতিশয় প্রাধান্য, তিনি রশুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পত্রখানা দেখা মাত্রই বলিলেন—ইনিই সেই আখেরী যামানার নবী যাহার শুভাগমনের সুসংবাদ হযরত ঈসা (আঃ) দিয়াছিলেন। যে যাহাই বলুক, অথবা আমাকে মারিয়া ফেলুক, আমি তাঁহার উপর ঈমান আনিবই এবং তাঁহার আনুগত্য স্বীকার ও তাঁহার অনুসরণ করিবই। হেরাক্লিয়াস বলিলেন—আমি এইরূপ করিলে ত আমার রাজত্ব থাকিবে না। তখন ঐ পাদ্রী পত্রবাহক দেহুইয়া (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি এই পত্রদাতা রশুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট যান এবং তাঁহার খেদমতে আমার সালাম পেশ করিয়া এই সংবাদ দিবেন যে, আমি “আশ্‌হাছ আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাহু আন্না মোহাম্মাদার রশুলুল্লাহ” পড়িয়া তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছি। তাঁহার আনুগত্য স্বীকার ও গ্রহণ করিয়াছি। রোমবাসী আমার কথা মানে নাই। এই বলিয়া তিনি রোমবাসীকে সত্য ধর্মের আহ্বান জানাইলে তাহারা তাঁহাকে মারিয়া ফেলিল। (ফতুল্ল-বারী ১—৩৬)

পাঠকবৃন্দ। লক্ষ্য করুন, “জাগাতের” ও এই পাদ্রী স্বীয় প্রাধান্য, মান-সম্মান, ভয় ভীতি বা সংস্কার ইত্যাদির প্রতি বিন্দুমাত্র ক্রক্ষেপ না করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ইসলাম গ্রহণ-পূর্বক রশুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আনুগত্য মানিয়া লইতে কোন প্রকার ইতস্ততঃ বা দ্বিধা বোধ করিলেন না, ইহাকে বলে প্রকৃত ঈমান। হেরাক্লিয়াস কিন্তু এইরূপ করিতে পারেন নাই। তিনি সর্বদাই “রাজত্ব চলিয়া যাইবে” এই ভয়ে ভীত ছিলেন। তিনি পত্রবাহক দেহুইয়া (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—আমি জানি যে, তিনি আল্লার প্রেরিত সত্য নবী, কিন্তু আমি আমার দেশবাসীকে ভয় করি, তাহারা আমাকে মারিয়া ফেলিবে এবং আমার রাজত্ব চলিয়া যাইবে, নতুবা আমি তাহার আনুগত্য গ্রহণ করিতাম। (ফতুল্ল-বারী ১—৩১)

হেরাক্লিয়াসের অবস্থা এই ছিল যে, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহের প্রমাণাদি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের নিদর্শনাবলীর প্রভাবেই তাঁহার অন্তরে ঐ প্রকার ভাবাগের উদয় হইয়াছিল। পরন্তু তিনি ইচ্ছাকৃত কিছুই করেন নাই, পক্ষান্তরে তিনি ঐ স্বউদ্ভূত ভাবকে চাপিয়া রাখিতেই চেষ্টা করিয়াছিলেন। অষ্টম হিজরীতে মুতার যুদ্ধে তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনাও করিয়াছিলেন। (ফতুল্ল-বারী ১—৩১)

এতদ্ভিন্ন ৯ম হিজরী সনে যে, স্বয়ং নবী (দঃ) ত্রিশ সহস্র মোজাহেদ লইয়া তবুকের জেহাদে প্রায় তিন শত মাইল অগ্রসর হইয়াছিলেন উক্ত জেহাদের প্রতিপক্ষ মূলতঃ রোমান-বাহিনীই ছিল। এবং তখনও রোমের শাসনকর্তা এই হেরাক্লুসই ছিল; সে মদীনা আক্রমণের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিল।

নবী (দঃ) ঐ পরিস্থিতিতেও তাহাকে ইসলামের আহ্বান জানাইয়া দ্বিতীয় আর এক-খানা পত্র এই দেহুইয়া (রাঃ) মারফৎই পাঠাইয়াছিলেন। তখনও তিনি অগ্নান চিত্তে

ইসলাম গ্রহণে ব্যর্থ হইয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি নবীজীর পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন এবং লিখিয়াছিলেন, “ইন্নী মোছলেমোন”—অর্থাৎ আমি ইসলাম গ্রহণকারী হইয়াছি। কিন্তু নবী (দঃ) তাহার এই দাবীকে মোনাফেকী সাব্যস্ত করাপূর্বক বলিয়াছিলেন, **كذب عد**—আল্লাহর দুশমন মিথ্যা বলিয়াছে, **اللہ لیس بمسلم بل هو علی نصرانیتہ**—আল্লাহ তাহার দুষ্মন মিথ্যা বলিয়াছে, সে ইসলাম গ্রহণ করে নাই, বরং সে খৃষ্টানই রহিয়াছে। (ফতহুল বারী ১—৩১)

রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সুফল :

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আল্লাহর অতি প্রিয় মাহবুব ; তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন বিফল যায় না। তাহার মর্যাদা রক্ষাকারীকে আল্লাহ তায়ালা প্রতিদান দিয়া থাকেন ; সে কাফের হইলে চির জাহান্নামী হওয়া হইতে অব্যাহতি পায় না, কিন্তু জাহান্নামে আজাব ভোগ অবস্থায়ও উহার ফল ভোগ করিতে পারে। যেমন, আবু লাহাবের ছায় মূঢ় কাফের যাহার চিরআজাবগ্রস্ত হওয়া অকাট্য প্রমাণে প্রমাণিত ; সে প্রতি সামবারে তাহার দুইটি অঙ্গুলীর মধ্য হইতে শীতল পানীয় পাইয়া থাকে, শুধু এই জন্তে যে, হযরতের ভূমিষ্ঠ হওয়ার সুসংবাদে আনন্দিত হইয়া সুসংবাদ প্রদানকারিণী ক্রীতদাসীকে ঐ দুইটি অঙ্গুলীর ইশারা করতঃ মুক্তি দিয়াছিল।

হেরাক্লিয়াস খ্রীষ দোষে দৈমান হইতে নাহুরুম ও বঞ্চিত রহিয়াছিল, কিন্তু রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চিঠিকে সে সম্মান করিয়াছিল, তজ্জন্ম শুধু তাহাকেই নয়, তাহার বংশধরকেও আল্লাহ তায়ালা উহার সুফল প্রদান করিয়াছেন। ইতিহাসে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) হেরাক্লিয়াস কর্তৃক তাহার পত্রের সম্মান প্রদর্শনের কথা অবগত করিয়া বলিলেন, **ثبت الله ملكه** “আল্লাহ তাহার রাজ্যকে কায়েম রাখুন।” আল্লাহর প্রিয় নবীর এই আশীর্বাদ বাণী বৃথা যায় নাই। বরং এই সংকার্ধের ফলেই রোমানদের রাজ্য ধ্বংস হয় নাই, বহুকাল তাহাদের মধ্যে রাজত্ব চলিয়াছিল। কারণ তাহার ঐ পত্রখানাকে রেশমী কাপড়ে জড়াইয়া সোনার সিক্ককে সযত্নে রাখিয়া দিয়াছিল এবং বংশ পরম্পরায় তাহারা একে অঙ্গকে এই অঙ্গিত করিয়া বাহিত যে, এই পত্রখানা বিশেষ যত্ন সহকারে রাখিও। যাবৎ ইহা আমাদের হাতে থাকিবে তাবৎ আমাদের রাজত্ব কায়েম থাকিবে। পক্ষান্তরে পারস্ত সম্রাট হযরত রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পত্রের অবমাননা করিয়াছিল, রাগান্বিত হইয়া উহাকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই সংবাদ শুনিয়া বদ দোয়া করিয়া বলিয়াছিলেন, “হে আল্লাহ! তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলুন।” ফলে অল্পকালের মধ্যেই পারস্ত সম্রাট সর্বশেষে জগতের বুক হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। (ফতহুল বারী)

প্রথম অধ্যায়

ঈমান

পাঁচটি মৌলিক জিনিসের উপর ইসলাম ধর্মের ভিত্তি স্থাপিত। উহাদের মধ্যে সর্ব প্রথম হইতেছে 'ঈমান'। ঈমান কাহাকে বলে?

আল্লামার নিকট হইতে হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যাহা কিছু বহন করিয়া আনিয়া কোরআনরূপে এবং হাদীছের মাধ্যমে মানব জাতিকে দান করিয়াছেন ঐ সবকে অন্তরের সহিত বিশ্বাস ও মোখিক স্বীকার করিয়া কার্যে পরিণত করার জন্ত প্রস্তুত থাকাকে 'ঈমান' বলে। অন্তরে দৃঢ়বিশ্বাস রাখিয়া মুখে স্বীকার করতঃ আল্লাহ তায়ালার সমুদয় আদেশ নিষেধগুলিকে ব্যবহারিক জীবনে কার্যে পরিণত করার নাম ইসলাম। সমস্ত আদেশ নিষেধগুলিকে কার্যে পরিণত করার সৌকর্য্য এবং আন্তরিক বিশ্বাসের দৃঢ়তার প্রতিফলনের তারতম্য অনুপাতে ঈমানের উন্নতি ও অবনতি হইয়া থাকে। কোরআন শরীফের বহু আয়াতে এই উন্নতি ও অবনতির প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। এ ছাড়া ঈমানের বহু শাখা প্রশাখাও আছে। যেমন—আল্লামার প্রিয় ব্যক্তি, বস্তু ও কার্যকে ভালবাসা এবং আল্লামার অপ্ৰিয় যাবতীয় বস্তুকে অপছন্দ করা ঈমানের একটি শাখা। স্বীয় চরিত্রে ঐ শাখা-প্রশাখার উন্মেষ ও অস্তিত্বের কম বেশী হওয়ার দরুনও ঈমানের উন্নতি-অবনতি হইয়া থাকে।

আরবী ভাষায় ঈমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস। কিন্তু যে ঈমান মানব জাতির কল্যাণের উৎস এবং পরকালের নাজাত, মুক্তি ও সুখ-শান্তির একমাত্র পথ সে ঈমান শুধু মাত্র বিশ্বাসের নামই নহে। বরং সেই ঈমান-রত্ন বহু সাধনার ধন। সাধনা ব্যতিরেকে ঐ অমূল্য রত্ন হাসিলও হয় ন, রক্ষিতও হয় না।—এই বিষয়টি বুঝাইবার জন্তই বোখারী (রঃ) কয়েকজন মনীষীর কয়েকটি মূল্যবান কথা উল্লেখ করিতেছেন।

ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রঃ) খোলাফায়ে-রাশেদীনগণের অনুরূপ খলীফা ও বিশিষ্ট তাবয়ী ছিলেন। একদা তিনি তাঁহার আলজেরিয়াস্থ গভর্ণরকে একটি হেদায়েত-নামা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। উহাতে তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন—“নিশ্চয় জানিও ঈমানের অন্তর্গত বিভিন্ন পর্য্যায়ের অনেকগুলি বিষয় বস্তু রহিয়াছে—(১) ফরয ও ওয়াজেবসমূহ, (যেগুলি অবশ্য করণীয়, যেমন—আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্য স্বীকার করতঃ কলেমা পড়া, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া, রমযানের রোযা রাখা, যাকাত দান করা, হজ্জ করা, দ্বীনের এলম শিখা, জেহাদ করা ইত্যাদি।) (২) মশরু' বা জায়েয বিষয়সমূহ (যেগুলির উপর মানুষ তাহার স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মশক্তি প্রয়োগ করিয়া কাজ করার জন্ত আল্লাহ তায়ালার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে)। (৩) নির্দ্ধারিত সীমা সমূহ, (অনেক স্থলে আল্লাহ তায়ালার মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মশক্তি প্রয়োগের অনুমতি দিয়াছেন, কিন্তু কোন স্থানেই তাহাকে লাগামহীন ছাড়িয়া দেন নাই। বরং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আল্লাহ তায়ালার সীমা নির্দ্ধারিত

করিয়া দিয়াছেন সেই সকল সীমা লঙ্ঘন করার অনুমতি মোটেই নাই। যেমন—আল্লাহ তায়ালা মানুষকে চক্ষু দান করিয়াছেন এবং তদ্বারা জাগতিক কাজকর্ম দেখা ও আল্লাহ সৃষ্টি জগতের নৈপুণ্য দেখিয়া জ্ঞান আহরণ করার অনুমতি দিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সীমা নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন যে, শরীয়তের নিষিদ্ধ বস্তু দেখিতে পারিবে না। যেমন—অন্তের ছতর (গুপ্তস্থান) দেখা; বেগানা স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা ইত্যাদি। এইরূপে মানুষের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় ও শক্তিকে পরিচালিত করিবার অনুমতি আল্লাহ তায়ালা দিয়াছেন বটে, কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই সীমা নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং ঐ নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করা মহাপাপ। (৪) স্ত্রী—অর্থাৎ রসুলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁহার খোলাফায়ে-রাশে-দীনের আদর্শসমূহ। (এই আদর্শসমূহ হইতে আদবকায়দা ও নিয়ম-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী দৈনন্দিন জীবন, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন, সাধনা, ভক্তনা, ও এবাদত বন্দেগীর জীবন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন প্রভৃতিকে গঠিত ও পরিচালিত করিতে হইবে। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই ঐ পবিত্র আদর্শকে মুহূর্তের জন্যও পরিত্যাগ করা চলিবে না।) যাহারা ঈমানের অঙ্গ স্বরূপ উপরোক্ত চারিটি বিষয়-বস্তুকে পূর্ণরূপে আয়ত্ত ও রক্ষা করিবে তাহাদের ঈমান পূর্ণাঙ্গ হইবে। পক্ষান্তরে যাহারা এইগুলিকে যত্ন ও সাধনার সহিত পূর্ণ না করিবে তাহাদের ঈমান অঙ্গহীন ও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। অতএব বুঝা গেল যে ঈমান কেবলমাত্র বিশ্বাসের নামই নহে; কর্মময় জীবনের অন্তর্হীন সাধনা ও প্রযত্ন উহার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রহিয়াছে। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) এ কথাও উক্ত চিঠিতে উল্লেখ করিয়াছেন যে—যদি আমি বাঁচিয়া থাকি, তবে আমি ঈমানের এই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শাখা-প্রশাখা সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দান করিব, যাহাতে জনসাধারণের পক্ষে উহা বুঝিতে ও তদনুযায়ী আমল করিতে সহজ হয়। আর যদি আমি মরিয়া যাই, তবে জানিয়া রাখিও—তোমাদের সংসর্গে থাকিয়া তুমত করার আদৌ কোন অভিপ্রায় আমার নাই।”

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলিয়াছেন— **ليطمئن قلبي**

অর্থাৎ আমি আমার অন্তরের সমস্ত অঙ্ক-অচ্ছাহ (মানবীয় দুর্বলতা) দূর করতঃ একীণ ও বিশ্বাসকে গাঢ় হইতে গাঢ়তর করিয়া ঈমানের উন্নতি সাধন করিতে চাই।

ছাহাবী মোয়ায (রাঃ) তাঁহার সঙ্গীদিগকে বলিতেন—ভাই! একটু বস; কিছুক্ষণ আমরা (দ্বীনের কথা, আল্লাহ ও রসুলের কথা আলোচনা করিয়া) ঈমানকে বদ্ধিত ও উন্নত করি।

ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিতেন—প্রতিবন্ধকতায় কর্মজীবন এবং ত্যাগ তিতিকা ও কষ্ট-ক্লেশের পরীক্ষার ভিতর দিয়া যে অটল বিশ্বাস প্রমাণিত হয় উহাই আসল পূর্ণাঙ্গ ঈমান। ঐরূপ বিশ্বাস ব্যতিরেকে শুধু মুখে বুলি আড়োড়ানো বা ভাবাবেগ প্রকাশের নাম ঈমান নহে।

আবুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিতেন—প্রত্যেক জিনিসেরই কোন না কোন গুণাগুণ বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থাকিবেই; এই সব গুণাগুণ বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারাই জিনিসটির পরিচয় হয়। সেহেতু ঈমানেরও কতিপয় গুণ এবং প্রতিক্রিয়া আছে—উহা এই যে, ঈমানদার ব্যক্তির আল্লার উপর বিশ্বাস এবং ভয় ও ভক্তি এত বাড়িয়া যায় যে, (আল্লার স্পষ্ট আদিষ্ট কাজগুলি ত করেই এবং নিষিদ্ধ কাজগুলিও চিরতরে বর্জন করে। এতদ্ব্যতীত) যে কোন কাজে বা কথায় তাহার মনে যদি সামান্য মাত্র খটকা বা সংশয়ের উদয় হয় যে, হয়ত এই কাজটি বা কথাটি পরিণামে আল্লার অসন্তুষ্টির কারণ হইতে পারে বা ইহাতে আল্লার অনুমোদন না থাকিতে পারে, ঈমানের প্রতিক্রিয়ার ফলে তাহাও সে বর্জন করিয়া চলে। মানুষের জীবনে এই অবস্থা যখন উপস্থিত হয়, তখনই তাহার ঈমান পূর্ণতা লাভ করে এবং খাটী তাকওয়া তাহার হাসিল হয়। কোরআন শরীফের একটি আয়াতে আছে:—

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَتِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

অর্থ:—আল্লাহ তায়ালা হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে এবং নূহ, ইব্রাহীম, মুছা ও ঈসাকে (এতস্তিন্ন সমস্ত পয়গাম্বরগণকে) একই ধর্ম এবং একই ঈমান ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার আদেশ করিয়াছেন; এবং ইহাও বলিয়া দিয়াছেন যে, এই মূল ধর্মকে সকলে ঠিক রাখ—ইহাতে বিভিন্ন মত পোষণ করিও না।

অন্য এক আয়াতে আছে:— لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا

অর্থ:—তোমাদের প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পথ এবং ভিন্ন ভিন্ন তরিকা ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি।

উক্ত আয়াতদ্বয়ের সমষ্টিগত তৎপর্য্য এই যে, বিভিন্ন নবীগণের শরীয়তের ধর্ম পালনের পদ্ধতি ও প্রণালীর এবং ধর্মাচরণের খুঁটিনাটি বিষয়ে হযরত পার্থক্য আছে বটে; কিন্তু মূল ধর্মের ভিতরে কোন পার্থক্য নাই। এক আল্লার দাসত্ব স্বীকার করতঃ একান্ত অঙ্গুগত হইয়া তাহার আদেশ পালনার্থে প্রতিযোগিতা করিয়া নেক কাজে অগ্রসর হওয়াই ঈমানের আসল মূল। এখানে ধর্মীয় অমুতানাদি ও আচরণের পার্থক্য স্বরূপ বলা যায়—যেমন নামায কয়েম করার হুকুম প্রত্যেক নবীর শরীয়তেই ছিল, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতে আদায় করার হুকুম হইয়াছে শুধু শেষ নবী মোহাম্মদ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শরীয়তে।

অন্য এক আয়াতে আছে:— قُلْ مَا يَعْجُبُكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ

অর্থ:—তোমরা যদি আমার প্রভু আল্লাহকে না ডাক, তাহার নিকট প্রার্থনা না কর, তবে তাহাতে আমার প্রভুর কোনই ক্ষতি নাই।

আবহুলাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এখানে আল্লাহ তায়ালায় নিকট প্রার্থনা (দোয়া) করাকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

অতএব সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, ঈমান রত্ব কত ব্যাপক ও সম্প্রসারিত এবং কত খুঁটিনাটি বিষয়বস্তু ইহার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। সুতরাং ঈমান শুধু বিশ্বাস করার নামই নহে।

ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিষের উপর

৭। হাদীছ :— عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ

অর্থ :—আবহুলাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে আসলাম বলিয়াছেন—পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের সৌধ স্থাপিত। (১) এক আল্লাহই মাবুদ, অন্য কোনও মাবুদ (পূজনীয়) নাই, মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রসূল; ইহা প্রকাশ্য-ভাবে স্বীকার ও গ্রহণ করিয়া লওয়া, (২) নামায পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করা, (৩) যাকাত দান করা, (৪) হজ্জ করা, (৫) রমযান মাসে রোযা রাখা।

ঈমানের শাখা-প্রশাখা

আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার যে সমস্ত পন্থা আছে বা যত প্রকার নেক ও সংকাজ আছে উহার প্রত্যেকটিই মূল ঈমানের শাখা প্রশাখা; অতএব, ঈমানের শাখা অনেক। ইমাম বোখারী (রাঃ) এখানে কোরআনের দুইটি আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন, যাহাতে মানব জাতির কল্যাণের ও সত্যিকারের মানুষ হওয়ার পন্থারূপে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কয়েকটি মোটামুটি কাজ আঙ্গুলের উপর গণনা করিয়া দিয়াছেন। সেই হিসাবে আয়াত দুইটি অতি মূল্যবান ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই এখানে উহার ব্যাখ্যা বিশেষভাবে করা হইতেছে। প্রথম আয়াত :—

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
وَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفَى الرِّقَابِ - وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِوَعْدِهِمْ
إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ - أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ مَدَقُّوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ -

অর্থ :—প্রকৃত প্রস্তাবে নেক ও সংবাজ এইগুলি :—(১) সর্ব প্রথমে মোটামুটি কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের দ্বারা দেল ও অন্তরকে ঠিক করিতে হইবে—(ক) আল্লাহকে বিশ্বাস করিয়া ভয় ও ভক্তির সহিত তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে এবং উপলব্ধি করিতে হইবে যে, আল্লাহই আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতেই আমরা আসিয়াছি। (খ) আবার একদিন আমাদের সকলকেই আল্লাহ নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং বিচারের সম্মুখীন হইতে হইবে। চোখ, কান, হাত, পা, জ্ঞান, বুদ্ধি, আলো-বাতাস ধন-দৌলত ইত্যাদি যাহা কিছু নেয়ামত আল্লাহ তায়ালা আমাদের দান করিয়াছেন, আমরা উহার সদ্যবহার করিয়াছি কি অসদ্যবহার করিয়াছি তাহার হিসাব দিতে হইবে। সেই শেষ বিচারের দিনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত সমূহের সদ্যবহার কৃতঃ হিসাব দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। (গ) ফেরেশতাদের সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে যে, তাঁহারা নিষ্পাপ, ত্রুটিহীন ; কখনও আল্লাহ বিরুদ্ধাচরণ করেন না, বা তাঁহাদের দ্বারা কোন ভুল-ত্রুটি হওয়া সম্ভব নহে। তাঁহারা আল্লাহর বাণী পয়গাম্বরগণের নিকট অবিকলরূপে পৌছাইয়া দিয়াছেন, বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই এবং ইহাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই। (ঘ) আল্লাহ কোরআনকে পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, ইহার অন্তর্গত কোন একটি অক্ষরের মধ্যেও অদৌ কোনরূপ সন্দেহ দোষ বা ভুল-ত্রুটি নাই। (ঙ) আল্লাহর নবীগণের প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে হইবে যে, তাঁহারা আল্লাহর প্রেরিত সম্পূর্ণ নিষ্পাপ মানুষ ও সত্য পথ প্রদর্শক ছিলেন। যে যুগের, যে দেশের বা যে জাতির জন্য যিনি নবী হইয়া আসিয়াছেন—সেই যুগের, সেই দেশের সমগ্র জাতি তাঁহাকেই আদর্শ পথপ্রদর্শকরূপে মানিয়া চলিতে হইবে, যেমন—কেয়ামত পর্য্যন্ত শেষ যুগের জন্য সময় বিশ্বমানবের পয়গাম্বর হইলেন হযরত মোহাম্মদ (দঃ)। কেয়ামত পর্য্যন্ত সকলকে একমাত্র তাঁহারই আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে।

(২) পাখিব ধন-দৌলত ও বিষয়-সম্পত্তির দিকে স্বভাবগত ভাবে মানুষের মনের মায়া ও আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধন-সম্পত্তি যথাস্থানে দান করিতে হইবে। যথা—ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দিগকে, (পিতৃহীন, কর্মশক্তিহীন অসহায়) এতিম বালক বালিকাদিগকে, অভাবগ্রস্ত দরিদ্রদিগকে (যাহারা কঠোর পরিশ্রম করিয়াও অভাব মোচনে অক্ষম) পথিকদিগকে, (যাহারা প্রবাসে অভাবে পড়িয়াছে), যাক্ষাকারী ভিক্ষুকদিগকে, (যে সব অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধ, রুগ্ন ও আতুর ইত্যাদি কর্মশক্তিহীনতার দরুণ ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইতেছে।) এবং দাসকে আবদ্ধ মানুষকে, (তাঁহাদের মুক্তির জন্য) দান করিতে হইবে ঃ

(৩) আল্লাহর নির্দেশিত এবং তাঁহার রসুলের (দঃ) প্রদর্শিত নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহর দাসদের প্রতীক নামায কায়েম (পূর্ণাঙ্গ আদায় ও জারী) করিতে হইবে।

ঃ এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, যাকাৎ ভিন্ন এই সমস্ত দানের স্থান সমূহ বর্ণিত হইল। ইহার পর যথাস্থানে যাকাৎের উল্লেখ হইয়াছে।

(৪) স্বীয় ধনের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত স্বরূপ দিতে হইবে।

(৫) অঙ্গীকার করিলে উহা রক্ষা করিতে হইবে। (আল্লাহর সহিত অঙ্গীকার বা মানুষের সহিত অঙ্গীকার—সমস্ত অঙ্গীকারই অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে হইবে)।

(৬) ধৈর্যধারণের অভ্যাস করিতে হইবে। ভীষণ অভাবের তাড়নার সময়, ছবিসহ রোগ যাতনার সময় এবং শত্রুর আক্রমণ ইত্যাদি ভীষণ বিপদের সময়।

যাহারা এই সংগুণাবলী অর্জন করিতে সক্ষম হইবে, তাহারাই খাটি সত্যবাদী এবং তাহারাই প্রকৃত ঈমানদার ও মোত্বাকী পরিগণিত হইবে। (২ পারা ৬ রুকু)

দ্বিতীয় আয়াত :—(১৮ পারা ১ রুকু)

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْمَغْرِبِ
مَعْرُوفُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ط
إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَبِأَنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ - فَمَنْ ابْتَغَى
وَرَاءَ ذَلِكَ فَاُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ -
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يَحْفَظُونَ - أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ - الَّذِينَ يَرِثُونَ -
الْأَرْضَ دُونَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ -

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানব জীবনকে স্বার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আটটি গুণ অর্জনের শর্ত উল্লেখে বলিতেছেন :

স্বীয় জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারিয়াছে তাহারা—

(১) যাহারা (আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলকে মান্য করিয়া কেয়ামতের হিসাব নিকাশ, বেহেশত-দোযখকে বিশ্বাস করিয়া) ঈমানদার হইয়াছে।

(২) যাহারা ভয় ও ভক্তির সহিত, আল্লাহর দরবারে কাকুতি-খিনতির সহিত নামায কয়েম করিয়াছে।

(৩) যাহারা বৃথা সময় নষ্ট করা হইতে বিরত রহিয়াছে। (চক্ষু, কণ, জিহ্বা, দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি, বাক্শক্তি, কর্মশক্তি, চলনশক্তি চিন্তাশক্তি, প্রভৃতি যে সব অমূল্য শক্তির সমারোহ আল্লাহ তায়ালা মানুষকে দান করিয়াছেন, ঐগুলিকে জীবনের স্থায়ী উন্নতিমূলক কার্যে ব্যয় করিবে। অবনতির বা অনর্থক কাজে অপচয় করা হইতে বিরত থাকিতে হইবে)।

(৪) যাহারা পবিত্রতা সাধন করিয়াছে। (আত্মার পবিত্রতা, দেহের পবিত্রতা, বস্ত্রের পবিত্রতা, স্ত্রীর পবিত্রতা, অর্থের পবিত্রতা, ইত্যাদি সর্ব প্রকারের পবিত্রতাই ইহার অন্তর্ভুক্ত। হিংসা, বিদ্বেষ, নির্দয়তা নির্ভরতা, আত্মভরিতা, কুপণতা, স্বার্থান্ধতা, ক্রোধান্ধতা, কপটতা, মোহান্ধতা, ইত্যাদি অপবিত্র স্বভাব সমূহ হইতে আত্মাকে শোধিত রাখিতে হইবে। সুদ, ঘৃষ, শোষণ, ছনীতি, ত্রি-জুয়াচুরি, ধোকাবাজী ইত্যাদি সর্ব প্রকার হারাম উপায় হইতে অর্থকে পবিত্র রাখিতে হইবে। তত্বপরি শরীয়ত অনুযায়ী যাকাৎ দান করিতে হইবে। অর্থের উপরই মানুষের সর্বস্ব নির্ভর করে, তাই অর্থের অপবিত্রতা তাহার প্রতিটি স্তরকেই অপবিত্র করিয়া দেয়। কাজেই অর্থের পবিত্রতা ব্যতিরেকে মানুষের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না।) ×

(৫) যাহারা সংযম অভ্যাস করিয়া কাম-রিপুকে দমন করিয়া রাখিয়াছে। অর্থাৎ দেহের রাজা ও জীবনীশক্তির মূলধন বীর্ষের অপচয় বা অপব্যয় করে নাই। অবশ্য বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধা রমণী অথবা (এর চেয়েও অধিক আধিপত্য যাহার উপর স্থাপিত হইয়াছে : বিবাহের ঋণ শরীয়ত অনুমোদিত অপর সূত্র—) স্ব স্ব সূত্রে অজিত রমণীর গর্ভে মানব বীজ বপনোদ্দেশ্যে যদি বীর্ষ ব্যয় করে তবে তাহা দূষণীয় নহে। এতদ্ব্যতীত যাহারা অন্য কোনও গহিত উপায়ে (হস্ত মৈথুন, পুংমৈথুন, পশু মৈথুন, বেগানা স্ত্রী দর্শন, স্পর্শন বা ব্যবহার ইত্যাদি দ্বারা) বীর্ষ ব্যয় করিবে ও কাম-রিপু চরিতার্থ করিবে তাহারা নিশ্চয়ই ব্যভিচারী সাব্যস্ত হইবে।

(৬, ৭) যাহারা নিজেদের নিকট গচ্ছিত আমানতের এবং নিজেদের ওয়াদা অঙ্গীকারের পুরাপুরি রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছে। আমানতের অর্থ—দায়িত্ব গ্রহণ করা। দায়িত্ব অনেক প্রকারের আছে—যথা আল্লাহর আমানত+, সামাজিক আমানত, রাষ্ট্রীয় আমানত, চাকরী ও পদের আমানত, ব্যক্তিগতভাবে গচ্ছিত টাকা-পয়সা, জমি-জমা বা গোপনীয় কথার আমানত ইত্যাদি। অনুরূপভাবে অঙ্গীকার এবং শপথও অনেক প্রকারের—আল্লাহ তায়ালার নিকট শপথ, সমাজের নিকট শপথ, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের শপথ, ব্যক্তিগত ওয়াদা রক্ষার শপথ ইত্যাদি।

× এক হাদীছে বর্ণিত আছে—কোন কোন ব্যক্তি অসহায় আশ্রয়হীন ও বিপদগ্রস্ত হইয়া আল্লাহকে ডাকিতে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তাহার ডাক শোনে না, কারণ তাহার পানাহারের বস্ত্র ও পরিধেয় বস্ত্র ইত্যাদি প্রত্যেকটিই হারাম এবং অসহুণায়ে অজিত।

+ আল্লাহর আমানতের অর্থঃ—আল্লাহর আদেশ ও নিষেধাবলী অনুযায়ী স্বীয় জীবনকে গঠিত ও পরিচালিত করার গুরুদায়িত্ব ভার গ্রহণ করা। এই গুরুদায়িত্বকেই কোরআন শরীফের ২২শে পারা ৫ম রুকুতে আল্লাহ তায়ালা আমানত বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—আমি আসমান, জমিন ও পর্বতমালাকে আমার আমানত বা বিশেষ একটি গুরুদায়িত্বভার গ্রহণ করার প্রতি আহ্বান জানাইলে উহারা সকলেই ভয়ে ভীত হইয়া নিজ নিজ অক্ষমতা প্রকাশ করিল, কিন্তু মানব জাতিকে সেই আহ্বান জানান হইলে তাহারা উহা গ্রহণ করিয়া নিল।

(৮) যাহারা আজীবন নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান রহিয়াছে।

অর্থাৎ কখনও সে সাধনায় কাস্ত হয় নাই—হান, কান, পাত্র নির্বিশেষে কোনও বাধা বিপত্তি লক্ষ্য না করিয়া চিরজীবন একনিষ্ঠ সাধনা করিয়াই গিয়াছে।

যাহারা এই গুণগুলি অর্জন করিতে পারিয়াছে, তাহারাই হইবে ফেরদৌস বেহেশতের অধিকারী, তাহারা তথায় অমর জীবন লাভ করিয়া অনন্তকাল অফুরন্ত সুখ-শান্তি ভোগ করিবে।

৮। হাদীছ:— **عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال**

الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

অর্থ:—আবু হোরায়ারা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছালাম্মাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঈমানের শাখা-প্রশাখা যাট হইতে অধিক এবং লজ্জা শরম ঈমানের অন্ততম শাখা।

ব্যাখ্যা:—অতঃ এক হাদীছে ঈমানের শাখা-প্রশাখা সত্তর হইতেও অধিক বলিয়া উল্লেখিত আছে। কোন কোন হাদীছে সাতাত্তরের প্রতিও ইঙ্গিত রহিয়াছে। এক হাদীছে বর্ণিত আছে—ঈমানের সর্বশ্রেষ্ঠ শাখা হইল ইহা স্বীকার করা যে—আল্লাহ ভিন্ন অতঃ কোনও মাবুদ নাই। সর্বাপেক্ষা ছোট শাখা—কষ্টদায়ক বস্তুকে চলাচলের পথ হইতে অপসারিত করা।

লজ্জা-শরমকে ঈমানের একটি বিশেষ শাখা বলা হইয়াছে। কারণ, ঈমান যেমন মানুষকে কুকর্ম হইতে নিবৃত্ত করে, তদ্রূপ লজ্জা-শরমও মানুষকে অনেক কুকর্ম হইতে বিরত রাখে।

লজ্জা-শরম মানব চরিত্রের একটি বিশিষ্ট গুণ। দুর্বলতা ও পবিত্রতা এই দুইয়ের সংমিশ্রনে ঐ গুণটির উৎপত্তি। নিন্দিত হইবার আশঙ্কায় যে কোনও কাজ করিবার বা কথা বলিবার প্রতি মানুষের মনে যে একটা অনিচ্ছা ও সঙ্কোচভাব এবং দুর্বলতা স্বভাবতঃ উদ্ভূত হয় তাহাকেই হা'য়া বা লজ্জা-শরম বলা হয়।

প্রকার ভেদে লজ্জা-শরমও কয়েক প্রকার। যথা—ভাল কাজ করিতে বা কোনও ভাল কথা বলিতে যদি শরম বোধ হয় তবে উহা প্রকৃতপক্ষে শরম নহে, রবং উহা এক প্রকার দুর্বলতা ব্যতীত অতঃ কিছুই নহে; এরূপ শরমকে ঈমানের শাখা বলা হয় নাই। যেমন—কোন দরকারী কথা আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে এই ভাবিয়া শরম বোধ হয় যে এই সামান্য কথা জিজ্ঞাসা করিলে লোকে কি মনে করিবে? বা কোনও কামেল পারের সাহচর্যে থাকিতে এই মনে করিয়া লজ্জা করা যে, লোকে বলিবে, মোল্লা তাবেদার হইয়া গিয়াছে। কিম্বা কোনও গরীব অসমর্থ ব্যক্তি তাহার বোঝাটা মাথায় উঠাইয়া দিবার সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাহাকে সাহায্য করিতে শরম বোধ হয় এই ভাবিয়া যে, লোকে কি মনে করিবে? এইগুলিকে ঈমানের শাখা বলিয়া প্রশংসা করা হয় নাই, রবং এইগুলি এক প্রকারের অহঙ্কার-সঞ্জাত হীনমত্ততা (Inferiority complex) অর্থাৎ মনের নীচতা ও দুর্বলতা মাত্র।

যে শরমকে হাদীছে ঈমানের শাখা বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে উহা এই—নির্দয়তা ও নির্ভরতামূলক কাজকরিতে বা অভদ্র ব্যবহার করিতে বা কাহেশ ও পাপের কাজ করিতে বা প্রকাশে স্বামী স্ত্রী সুলভ ব্যবহার করিতে বা পরপুরুষ পরস্ত্রীর সহিত পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করিতে বা কথাবার্তা বলিতে ইত্যাদি এই শ্রেণীর কার্যে যে শরম বোধ হয়। বস্তুতঃ এই পন্থায়ের শরমকেই প্রকৃত প্রস্তাবে লজ্জা-শরম বলা যাইতে পারে। কারণ, এসবের মধ্যে পবিত্রতার প্রাধান্য রহিয়াছে, শুধু দুর্বলতা ও অশক্তিই নহে।

এক হাদীছে আছে—রসূলুল্লাহ (দঃ) একদা ছাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে পূর্ণ মাত্রায় লজ্জা কর। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, আল্লাহ শোকর—আমরা ত আল্লাহ তায়ালাকে লজ্জা করিয়া থাকি। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমরা সাধারণতঃ যতটুকু লজ্জা করিয়া থাক, শুধু ঐটুকুই আমার উদ্দেশ্য নয়। যে ব্যক্তি আল্লাহকে পূর্ণ মাত্রায় লজ্জা করার দাবী রাখে, তাহার কর্তব্য—স্বীয় মাথার মধ্যে যে সমস্ত শক্তি আছে, যথা—স্মরণশক্তি, বিবেচনাশক্তি চিন্তাশক্তি ইত্যাদি এবং মাথা সংলগ্ন ইন্দ্রিয়গুলি, যথা—চক্ষু, কর্ণ নাসিকা, জিহ্বা ইত্যাদিকে কুকর্ম ও কুপথ হইতে বিরত রাখা। পেট এবং পেট-সংলগ্ন-রিপু (নফছ ও শুণ্ডাঙ্গ)কে তদ্রূপ রক্ষা করা, (অর্থাৎ হারাম খাওয়া ও ব্যভিচারী হইতে বিরত থাকা।) তদুপরি তাহার আরও কর্তব্য হইবে যে, যত্ন তথা এই অস্তিত্বের বিলুপ্তিকে স্মরণ করতঃ আখেরাতের দিকে ধাবিত হওয়া এবং হুনিয়ার মোহ ও ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করা। যে ব্যক্তি এ সমস্ত কাজ পূরাপূরি সাধন করিবে, সে-ই আল্লাহকে পূর্ণ মাত্রায় লজ্জা করে বলিয়া সাবাস্ত হইবে। (তিরমিযী শরীফ)

একজন মহামনীষী লজ্জার ব্যাখ্যা এই করিয়াছেন—তোমার সর্বদেহ মালিক (আল্লাহ তায়ালা) যেন তোমাকে এমন জায়গায় বা এমন কাজে দেখিতে না পান, যেখানে যাইতে বা যাহা করিতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন—ইহাই প্রকৃত লজ্জা।

এই সমস্ত বিবরণ অনুযায়ী স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃত লজ্জা শরম কাহারও হাসিল হইলে সে শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী হইতে পারে। এই সূত্রেই 'হায়া' বা লজ্জা শরমকে ঈমানের একটি অত্যন্ত বিশিষ্ট শাখা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

মোসলমান কে ?

৯। হাদীছ :-
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
 عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ
 وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ.

অর্থ :-আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন—মোসলমান ঐ ব্যক্তি যাহার কোনও কথা বা কার্যের দ্বারা অন্য

মোসলমানদের কষ্ট না ঘটে। মোহাজের ঐ ব্যক্তি যে আল্লার নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে পরিত্যাগ ও বর্জন করিয়াছে।

ব্যাখ্যা :—“মোসলেম” শব্দের মধ্যে শান্তির অর্থ নিহিত রহিয়াছে; সুতরাং যাহার দ্বারা অতের অশান্তি ঘটে, তাহাকে মোসলেম বলা যাইতে পারে না। তদ্রূপ মোহাজের অর্থ “ত্যাগী”। যে আল্লার নিষিদ্ধ বস্তুকে পরিত্যাগ না করিবে, তাহাকেও ত্যাগী বলা যাইতে পারে না। অত এক হাদীছে আছে—“মোমেন ঐ ব্যক্তি যাহার প্রতি প্রত্যেকটি মানুষের আস্থা থাকে এবং তাহার তরফ হইতে সমস্ত লোক নির্ভয়ে ও নিরাপদে থাকিত পারে।” “মোমেন” শব্দের মধ্যে নিরাপত্তা ও আস্থাভাজন হওয়ার অর্থ নিহিত আছে; সুতরাং যাহার প্রতি আস্থা স্থাপন করা না যায় ও যাহার তরফ হইতে মানুষ নির্ভয়ে নিরাপদে থাকিতে না পারে, তাহাকে “মোমেন” বলা যাইতে পারে না। অর্থাৎ মোসলেম বা মোমেন শব্দের দাবীদারদের মধ্যে চরিত্রগুণ উল্লিখিত পরিমাণে থাকা চাই, নতুবা সে ঐ নামের উপযুক্ত নহে।

লক্ষ্য করুন—ইসলাম কত বড় মহান ধর্ম যে, উহার নির্ধারিত প্রতিটি নামবাচক শব্দের মধ্যেও শান্তি, শৃঙ্খলা, সত্যতা এবং সংঘম ইত্যাদি গুণের মহান আদর্শ সমূহের ইঙ্গিত রহিয়াছে।

ইসলামের উত্তম স্বভাব কি ?

১০। হাদীছ :—ছাহাবী আবু মুছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—ছাহাবীগণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ ব্যক্তি সর্বোৎকৃষ্ট মোসলমান ? হযরত (দঃ) বলিলেন, যাহার কোনও কথা বা কার্য দ্বারা অত মোসলমানের কোন কষ্ট না হয়।

ইসলামের বিশিষ্ট ভাল কাজ অন্ন দান :

১১। হাদীছ :—
عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تَطْعُمُ
الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ -

অর্থাৎ—আবু মুছা ইবনে আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, ইসলামের বিশিষ্ট ভাল কাজ কি ? হযরত (দঃ) বলিলেন, অন্ন দান করা এবং পরিচিত অপরিচিত নিবিশেষে সকলকে সালাম করা।

ব্যাখ্যা :—সালামের উদ্দেশ্য শুধু মুখে “আসসালামু আলাইকুম” বলাই নহে, মুখে বলার সঙ্গে কার্য ও চরিত্রের দ্বারা উহার অর্থকেও প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—পরিচিত অপরিচিত সকলকেই শান্তি, নিরাপত্তা ও আশীর্বাদ প্রদান করিতে হইবে।

এই হাদীছের মধ্যে অশ্রু আরও তিনটি গুণের উল্লেখ আছে, যথা—মিষ্টভাষী হওয়া কর্কশভাষী না হওয়া, স্বীয় আত্মীয় ও জ্ঞাতীগোষ্ঠীর সহিত সদ্যবহার করা এবং গভীর রাতে যখন অশ্রু সকলে নিদ্রামগ্ন থাকে তখন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিদ্রা ত্যাগ করতঃ নামায পড়া।

ঈমানের একটি বিশেষ শাখা

১২। হাদীছ :— **عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ مَنْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ**

অর্থ :—আনাছ (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—কোন ব্যক্তি মোমেন হইতে পারে না যাবৎ না সে অশ্রু মোসলমান ভাই-এর জন্য ঠিক সেইরূপ ব্যবস্থা ও ব্যবহারপন্থা করে, যে রূপ ব্যবস্থা ও ব্যবহার সে নিজের জন্য পছন্দ করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা :—অশ্রু একটি হাদীছের দ্বারা এই হাদীছটির তাৎপর্য আরও স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (দ:)—এর খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, আমি ইসলাম গ্রহণ করিতে চাই, কিন্তু আমি জেনা (ব্যভিচার) হইতে বিরত থাকিতে অক্ষম। রসুলুল্লাহ (দ:) তাহাকে স্নেহভরে ডাকিয়া নিকটে বসাইলেন এবং প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি ইহা পছন্দ কর যে, তোমার মা বোন বা মেয়ের সঙ্গে অপর কেহ জেনা করে? সে রক্তাক্ত চোখে উত্তর করিল—ইহা কার্য্যে পরিণত করা ত দূরের কথা কেহ এরূপ ইচ্ছা পোষণ করা মাত্রই আমি তাহাকে তরবারির আঘাতে ছুই টুকরা করিয়া ফেলিব। রসুলুল্লাহ (দ:) বলিলেন, তাহা হইলে তুমি যে মহিলার সঙ্গে জেনা করিবে সেও ত কাহারও মা, বোন বা মেয়ে হইবে!

কি সুন্দর শিক্ষা ও কত যুক্তিপূর্ণ উপদেশ! এর সুফল কত ব্যাপক! এই আদর্শের ভিত্তিতে সকল প্রকার বাগড়া, বিবাদ, দ্বेष, হিংসা, শত্রুতা, খেয়ানত, ধোকাবাজী, কাহারও অনিষ্ট করা ইত্যাদি এমনকি চুরি, ডাকাতি সকল প্রকার ব্যভিচারের অবসান হইতে পারে।

রসুলুল্লাহ (দ:) মহক্বৎ ঈমানের মূল

১৩। হাদীছ :—আবু হোরাযরা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঐ খোদার কসম যাঁহার হাতে আমার জ্ঞান—তোমাদের কেহ মোমেন গণ্য হইবে না যাবৎ না আমার প্রতি তাহার মহক্বৎ ও ভালবাসা তাহার মাতা-পিতা ও সন্তান-সন্ততি অপেক্ষা অধিক হয়!

১৪। হাদীছ :— **عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ**

অর্থ :—আনান্ন (রাঃ) হইতে বণিত আছে—রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যাহার হাতে আমার জীবন তাঁহার অর্থাৎ আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি—কোন ব্যক্তি মোমেন হইতে পারিবে না, যাবৎ না তাহার মাতা-পিতা, ছেলে-মেয়ে এবং জগতের সমস্ত লোক অপেক্ষা অধিক মহবৎ ও ভালবাসা আমার সঙ্গে রাখিবে।

ব্যাখ্যা :—এক হাদীছে বণিত আছে, একদা ওমর (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন—আপনার প্রতি আমার মহবৎ সকলের চাইতে বেশী আছে, কিন্তু নিজের জীবন হইতে বেশী মনে হয় না। রসুলুল্লাহ (দঃ) শপথ করিয়া বলিলেন, তা হইবে না; নিজের জীবন হইতেও অধিক মহবৎ আমার প্রতি রাখিতে হইবে। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া ওমর (রাঃ) বলিলেন, এখন স্বীয় জীবন হইতেও অধিক মহবৎ আপনার সঙ্গে আমার হাসিল হইয়াছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, এখন আপনি মোমেন হইতে পারিয়াছেন।

রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার নিজের প্রতি অধিক মহবতের আদেশ স্বীয় কোনও স্বার্থের জন্ত করেন নাই; বরং মানবের কল্যাণের জন্তই এই আদেশ করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা রসুল (দঃ)কে স্বীয় সন্তুষ্টি ও পছন্দের নমুনা বানাইয়া পাঠাইয়াছেন। তাই রসুল (দঃ)-এর অনুসরণের উপরই মানব জাতির কল্যাণ ও নাজাত নির্ভর করে। পরন্তু, পূর্ণ অনুসরণ মহবৎ ও ভালবাসা ব্যতিরেকে হয় না।

এখন মহবতের অর্থ রসুল হিসাবে ভক্তি ও ভালবাসা; তাহাও শুধু মোখিক ও ভাবাবেগের বা আত্মীয়তার মহবৎ উদ্দেশ্য নয়। বরং রসুল হিসাবে একরূপ গভীর মহবৎ যাহার দরুন রসুলুল্লাহ (দঃ) অনুসরণ ও আনুগত্যের প্রতি পূর্ণ আকর্ষণ জন্মে। কোন প্রকার স্বার্থ, মোহ, ভয় বা কষ্টই তাঁহার অনুসরণ ও আনুগত্য হইতে নিবৃত্ত করিতে সক্ষম না হয়। সাধারণ ভালবাসা বিভিন্ন কারণে অনেক কাকেরের মধ্যেও দেখা যায়, যেমন—রসুলুল্লাহ (দঃ) চাচা আবু তালেব রসুলুল্লাহ (দঃ)কে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। কিন্তু আবু তালেবের সেই ভালবাসা কেবলমাত্র স্বীয় ভ্রাতৃপুত্র বা নিজ গোষ্ঠির ভাল ছেলে হিসাবে ছিল, আল্লাহর রসুল হিসাবে নহে।

ঈমানের স্বাদ লাভ করার উপায়

১৫। হাদীছ :—
عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ
إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ
فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ۔

অর্থ :—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বসিয়াছেন—এমন তিনটি গুণ আছে যে, কাহারও ভিতরে ঐ তিনটি গুণের সমাবেশ হইলে সে ঈমানের মাধুর্য্য ও সুস্বাদ অল্পভব করিতে পারিবে। (১) আল্লাহ ও রসুলের (দঃ) প্রতি সর্বাধিক মহব্বৎ হওয়া, অর্থাৎ পাখিব আকর্ষণ অপেক্ষা আল্লাহ ও রসুলের (দঃ) প্রতি সর্বাধিক মনের টান ও প্রাণের আকর্ষণ হওয়া। (২) কাহাকেও ভালবাসিলে তাহা একমাত্র আল্লার উদ্দেশ্যেই হওয়া। অর্থাৎ আল্লার প্রিয় ব্যক্তি বা বস্তুকে শুধু আল্লার উদ্দেশ্যে ভালবাসা এবং আল্লার অপ্রিয় ব্যক্তি বা বস্তুকে শুধু আল্লার উদ্দেশ্যেই অপ্রিয় গণ্য করা; কাহারও সহিত কাম-ভাবের বশে বা স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ভালবাসা না করা। (৩) ইসলাম ও ঈমানের প্রতি এত গাঢ় অনুরক্ত হওয়া যে, ইসলাম হইতে বঞ্চিত হইয়া কুফুরির দিকে যাওয়াকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ হওয়া তুল্য অপছন্দনীয় গণ্য করা।

ঈমানের একটি বিশেষ নিদর্শন

১৬। হাদীছ :—

عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أَيُّهُ الْإِيمَانُ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ الْإِيمَانِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ.

অর্থ :—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বসিয়াছেন—আনছারদের (মদীনাবাসী ছাহাবীদের) সঙ্গে মহব্বৎ রাখা ঈমানের আলামত ও নিদর্শন। তাঁহাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা মোনাফেকীর পরিচায়ক।

ব্যাখ্যা :—মদীনাবাসী ছাহাবীগণ দ্বীন-ইসলামের একনিষ্ঠ খাদেম ছিলেন; এই কারণেই তাঁহাদিগকে “আনসার”—দ্বীনের সহায়কারী উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এই হিসাবে যদি কেহ তাঁহাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে তবে সে নিশ্চয় মোনাফেক হইবে। আর মিত্রভাব পোষণ করিলে নিশ্চয় উহা তাহার ইসলামের প্রতি অনুরাগের নিদর্শন হইবে।

ইসলামী জীবনের শপথ ও অঙ্গীকার

১৭। হাদীছ :—ওবাদা ইবনে ছামেত (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার ছাহাবীগণের মধ্যে উপবিষ্টাবস্থায় তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—তোমরা আমার নিকট শপথ বা দীক্ষা গ্রহণ কর এবং অঙ্গীকারাবদ্ধ হও যে, আল্লার সহিত কোনও বস্তুকে শরীক করিবে না, চুরি করিবে না, জেন্না (বাতিচার) করিবে না, আপন সন্তানকে হত্যা করিবে না*, কাহারও উপর মিথ্যা

* ইসলাম-পূর্ব যুগে আদিম বর্বর আরববাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল যে, মেয়ে সন্তান হওয়াকে তাহারা অপমান মনে করিত; এমনকি কোনও নিষ্ঠুরায়া পিতা স্বীয় কন্যা সন্তান জীবিতাবস্থায়ই মাটি চাপা দিয়া দিত। কেহ কেহ আবার অধিক খরচে গড়িয়া অভাবগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় ছেলে মেয়ে উভয় শিশু সন্তান মারিয়া ফেলিত। এই সকল অমানুষিক নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার মূলে ইসলাম কুঠারাঘাত হানিয়াছে—এই সবার বিরুদ্ধে কোরআন শরীফের একাধিক আয়াত নামেল হইয়াছে; রসুলুল্লাহ (দঃ)ও এরূপ কুসংস্কার হইতে বিরত থাকার অঙ্গীকার লইয়াছেন।

দোষারোপ করিবে না—ভিত্তিহীন অপবাদ ও অভিযোগ আনিবে না এবং আমার (তথা শাসন কর্তৃপক্ষের) বিরুদ্ধাচরণ করিবে না—এই সব বিষয়ে যাহা আল্লাহ বিধান বিরোধী না হয়। (রসূল (সঃ) আরও বলিলেন—)

যে ব্যক্তি এই সব অঙ্গীকার অনুযায়ী চলিবে, নিশ্চয়ই সে আল্লাহর নিকট তাহার সফল ও পুরস্কার পাইবে। পরন্তু, যদি কেহ কোনও নিষিদ্ধ কাজ করিয়া ফেলে এবং শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী নির্দিষ্ট শাস্তি তাহার উপর প্রয়োগ করা হয়, তবে সেই শাস্তি (গ্রহণে কুষ্ঠা বোধ করিবে না। কারণ, ঐ শাস্তি) তাহার গোনাহের কাফ্ফারা হইবে, কিন্তু যদি তাহার ঐ কাজ জনসমাজে প্রকাশ না হওয়ায় শরীয়তের বিধানগত জাগতিক শাস্তিভোগ হইতে সে রক্ষা পাইয়া থাকে, তবে গোনাহের বিচারের ভার আল্লাহর উপর আস্ত থাকিবে, আপেরাতে তাহাকে শাস্তিও দিতে পারেন মাফও করিতে পারেন। সেমতে ছাহাবীগণ এই শপথ বা দীক্ষা গ্রহণ করতঃ অঙ্গীকারাবদ্ধ হইলেন।

দীন রক্ষার্থে সর্বস্ব ত্যাগ করা বড় ধর্ম

১৮। হাদীছঃ— عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ
الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفَتَنِ -

অর্থঃ—আবু সায়েদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছালামুল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, সেই দিন অতি নিকটবর্তী—যখন একজন মোসলমানের জন্ত উত্তম সম্পদ হইবে মাত্র কয়েকটি বকরী, যেগুলিকে ঘাইয়া সে পাহাড়-পর্বতের চূড়ায়—যেখানে বৃষ্টির পানিতে ঘাস-পাতা জন্মায় এমন স্থান অনুসন্ধান করিয়া সেখানেই বসবাস করিবে। (সমস্ত জগৎ তখন ফেৎনা-ফাসাদে পরিপূর্ণ হইবে, তাই) সে স্বীয় দীনকে রক্ষা করার জন্ত লোকালয় হইতে সরিয়া পড়িবে।

ব্যাখ্যাঃ—উল্লিখিত হাদীছের মূল উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক মোসলমানের কর্তব্য হইল দীন ও ধর্মকে সর্বোপরি ও সকলের উর্দে স্থান দেওয়া। যখন চতুর্দিকের ফেৎনা-ফাসাদের দ্বারা স্বীয় দীন আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা হইবে তখন দীনকে রক্ষা করার জন্ত ধন-জন, বাড়ী-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি সব কিছু পরিত্যাগ করতঃ পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গলে নির্বাসিত জীবন যাপনেও কুণ্ঠিত হওয়ার জন্ত সকল মুসলমানকে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে ও প্রেরণা দেওয়া হইয়াছে।

আল্লাহর মা'রেফাত অনুপাতে তাঁহার প্রতি ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে

‘আল্লাহর মা'রেফাত’-এর অর্থ—আল্লাহকে চেনা ও আল্লাহর তত্ত্ব জ্ঞান হাঙ্গিল করা। ইহা মানুষের ইচ্ছাধীন ও আয়ত্তাধীন ক্রিয়াবিশেষ। অবশ্য বাহ্যিক অঙ্গের ক্রিয়া নহে, বরং ইহা অন্তরের ঐকান্তিক সাধনার প্রক্রিয়া। সুতরাং উহা নিজে নিজেই উৎপত্তি হয়

না, বরং প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া অক্লান্ত অধ্যবসায়ের মাধ্যমে উহা অর্জন করিতে হয়। প্রথমতঃ দেলের ময়লা সমূহ (হীন স্বার্থ-চিন্তা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য, নিষ্ঠুরতা, নির্দয়তা, হিংসা, বিদ্বেষ, পরনিন্দা ইত্যাদি)কে দূর করিতে হইবে। এই সকল আবিলতা ও কলুষতা হইতে মুক্ত হইয়া দেল যখন আয়নার মত পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হয় এবং তদবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করতঃ আল্লার ধ্যানে মগ্ন হওয়া যায়, তখন দেলের মধ্যে আল্লার মহৎ গুণাবলী প্রতিবিম্বিত ও বিকশিত হইয়া থাকে। আল্লার এই মহৎ গুণাবলীকে দেলের মধ্যে ধরিয়া ও ভরিয়া রাখা এবং হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া রাখার নামই “মা’রেফাত”। আল্লার এই মা’রেফাত ও তত্ত্ব-জ্ঞান হাসিল করাই মানব জীবনের চরম কাম্য বস্তু। ইহা হাসিল করা মানুষের ক্ষমতা ও আয়ত্তের নয়, ইচ্ছা করিলে সাধনা করিয়া হাসিল করিতে পারে। কারণ, মানুষের বাহ্যিক অঙ্গের প্রক্রিয়াগুলি যেমন তাহার ইচ্ছাধীন; তাহার আভ্যন্তরীণ অঙ্গের সং বা অসং ক্রিয়াগুলিও তেমনি তাহার ইচ্ছা ও ক্ষমতার বহির্ভূত নহে+। তাই মানুষের চেষ্টা ও সাধনার তারমধ্যে আল্লার মা’রেফাত ও তত্ত্ব-জ্ঞান কম বা বেশীরূপে হাসিল হইয়া থাকে। এবং এই মা’রেফাত লাভের তারতম্য অনুপাতেই মানুষের ভিতরে আল্লার ভয়ের সঞ্চার হয়। নিম্ন বর্ণিত হাদীছটিতে রসুলুল্লাহ (দঃ) এই তথ্যটিই স্বীয় অবস্থার দ্বারা সম্যক ব্যক্ত করিয়াছেন।

১৯। হাদীছ :- আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অলাল্লাম ছাহাবীদিগকে কোন আমলের আদেশ করিতে এমন আমলের আদেশ করিতেন যাহা সর্বদা সহজে করিয়া যাওয়া সম্ভব হয়। সে জ্ঞাত্ত তিনি যথাসম্ভব অল্প ও সহজ আমলের শিক্ষা দিতেন। ছাহাবীগণ নেক কাজের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহশীল ছিলেন; তাহারা বেশী বেশী ও কঠিন কঠিন এবাদৎ ও সাধনা নিজেদের উপর টানিয়া লইবার চেষ্টায় থাকিতেন এবং মনে মনে একরূপ ভাব পোষণ করিতেন যে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) নিষ্পাপ, তাহার মর্তব্য অতি উর্দ্ধে; সেই জ্ঞাত্ত এবাদতের প্রয়োজন তাহার নাই। এই ভাবিয়া) তাহারা কোন কোন সময় বলিয়া ফেলিতেন—ইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) ! আমরা ত আপনার মত নই; আপনি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ—পূর্বাপর সমস্ত গোনাহ-ই আপনার জ্ঞাত্ত মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (তাই আপনার স্থায় আমাদের কম এবাদৎ করিলে চলিবে কেন? একরূপ উক্তিকে রসুলুল্লাহ (দঃ) অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া উঠিতেন; তাহার চেহারা মোবারকের উপর রাগের নিদর্শন প্রকাশ পাইত। তারপর ঐ ভুল ধারণা নিরসনে বলিতেন, নিশ্চয় জানিও—আল্লাহকে আমি সবচেয়ে বেশী ভয় করিয়া থাকি। কারণ, আল্লার মা’রেফাত ও তত্ত্ব-জ্ঞান সকলের চেয়ে বেশী আছে আমার।

+ এই জ্ঞাত্তই আল্লাহ তায়ালা কোরআনে ঘোষণা করিয়াছেন—**وَلَكِنْ يَأْخُذْكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ تَلَوْنَهُمْ** অর্থ—তোমাদের অন্তকরণ ইচ্ছাকৃতভাবে যে সকল ক্রিয়া সমাধা করিবে তজ্জন্ত আল্লাহ তোমাদিগকে দায়ী করিবেন, যদি অন্তরের ক্রিয়াকলাপ মানুষের আয়ত্তাধীন না হইত, তবে উহার দরুণ সে দায়ী হইত না।

ব্যাখ্যা :—ইহা দ্বারা রসুলুল্লাহ (দঃ) এরূপ বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, তোমরা হয়ত মনে বরিয়াছ—আমার মর্তবা বড় সে জ্ঞান আমি খোদাকে ভয় কম করিব, তাহার এবাদৎ বন্দেগী কম করিব, শুইয়া শুইয়া আরামে জীবন যাপন করিব। না, না—তাহা কখনই নহে। আল্লাহ যেমন মর্তবা বড় করিয়াছেন, আমাকে তাহার মা'রেফাত এবং তত্ত্ব-জ্ঞান সকলের চেয়ে বেশী দান করিয়াছেন। সেই অনুপাতে আমি আল্লাহ তায়ালাকে ভয়ও সকলের চেয়ে বেশী করিয়া থাকি। তবে আমি তোমাদের এবং সমগ্র মানব জাতির জ্ঞান এমন নীতি, এমন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে চাই, যাহা সকলে সর্ব সময় অনায়াসে করিতে পারে।

রসুলুল্লাহ (দঃ) ব্যক্তিগতভাবে অনেক বেশী এবাদৎ করিতেন, যেমন এক হাদীছে আছে—রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে তাহার পদদ্বয় ফুলিয়া যাইত, কোন কোন সময় পা কাটিয়াও যাইত। এই অবস্থা দেখিয়া জনৈক ছাত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ত নিষ্পাপ, আপনি কি জ্ঞান এত কষ্ট করেন? রসুলুল্লাহ (দঃ) উত্তর করিলেন—“যে আল্লাহ আমাকে নিষ্পাপ করিয়াছেন, আমি কি তজ্জ্ঞান তাহার শোকর অঙ্গায় করিব না?”

পাঠকবৃন্দ! উল্লিখিত হাদীছের তাৎপর্য অনুযায়ী প্রমাণিত হয় যে—আল্লাহ মা'রেফাত যাহার মধ্যে যত বেশী হইবে আল্লাহ ভয়ও তাহার মধ্যে তদনুপাতে বেশী হইবে। অধুনা অনেকেই মা'রেফাত দাবী করিয়া থাকে বটে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ ভয়, আল্লাহ এবাদৎ বন্দেগী, সাধনা আরাধনা ইত্যাদিতে তাহাদিগকে সেরূপ অগ্রণী দেখা যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ ভূয়া দাবীদারদিগকে ধোকাবাজ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে।

ঈমানের প্রতি বিরূপ অনুরাগ আবশ্যিক

ইমাম বোখারী (রঃ) ১৫নং হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন মোসলমান কে ঈমানের প্রতি এরূপ আনন্দ ও দৃঢ় অনুরাগী হইতে হইবে যাহার কলে ঈমানের বিপরীত তথা কুফরের প্রতি তাহার ক্ষোভ, উৎকর্ষা, অসন্তোষ এবং ভীতি ও ত্রাস এরূপ অধিক পরিমাণে সৃষ্টি হয় যেসকল অগ্রিকূণ্ডে নিকিপ্ত হওয়ার প্রতি ইচ্ছা আছে। এই অবস্থাটা মূল ঈমানের বিশেষ অঙ্গ; যাহার মধ্যে এই অবস্থা নাই তাহার ঈমান অসম্পূর্ণ এবং এই অবস্থার পরিমাণ অনুযায়ীই ঈমানের পূর্ণতা লাভ হইবে। এই অবস্থা ব্যতিরেকে ঈমান অত্যন্ত খণি ও দুর্বল।

ঈমানের পরিমাণ কম-বেশী হওয়ার প্রমাণ

২০। হাদীছ :—আবু সারীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতীগণ বেহেশতে এবং দোষখীরা দোষখে যাওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাগণকে আদেশ করিবেন—যাহাদের অন্তরে অন্ততঃ সন্নীবা-বীজ

পরিমাণ ঈমান আছে তাহাদিগকে দোষথ হইতে বাহির করিয়া আন। ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে এমন অবস্থায় দোষথ হইতে বাহির করিয়া আনিবেন যে, তাহারা অনবরত আগুনে পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া গিয়াছে। তখন তাহাদিগকে আবে-হায়াতের (জীবনী-শক্তির) নদীতে ফেলা হইবে। সেখান হইতে তাহারা নূতন জীবন লাভ করতঃ অতিশয় সুন্দর রূপ ধারণ করিয়া উঠিবে।

ব্যাখ্যা :—এই হাদীছের দ্বারা ঈমান একটি পরিমাণ-বিশিষ্ট বস্তু হওয়া সাব্যস্ত হয় এবং উহার পরিমাণে কম বেশী হওয়াও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। অতঃপর এক হাদীছে ঈমানের কম-বেশী হওয়া সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে যে—আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদিগকে বলিবেন, দোষথবাসীদের মধ্যে যাহাদের অন্তরে এক দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) পরিমিত ঈমানের অস্তিত্ব দেখিতে পাও তাহাদিগকে দোষথ হইতে বাহির করিয়া লইয়া আইস। দ্বিতীয়বার বলিবেন, যাহাদের অন্তরে অর্দ্ধ দীনার পরিমিত ঈমান খুঁজিয়া পাও, তাহাদিগকেও বাহির করিয়া আন। তৃতীয়বার বলিবেন, যাহার অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমানের অস্তিত্বও পাও, তাহাকেও বাহির করিয়া লও। তারপরও এমন এক শ্রেণীর লোক অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে যাহাদের অন্তরে অণু হইতেও সূক্ষ্মতর ঈমানের অস্তিত্ব থাকিবে। তাহাদের সেই ঈমান এতদূর সূক্ষ্ম হইবে যে, উহার অস্তিত্ব নবী ও ফেরেশতা-গণের অনুভূতির আওতায় আসিবে না; তাহাদিগকে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা দোষথ হইতে বাহির করিবেন।

লজ্জা-শরম ঈমানের শাখা

২১। হাদীছ :—আবুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জনৈক আনহারী ব্যক্তির নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন। ঐ ব্যক্তি তাহার ভ্রাতাকে লজ্জা-শরমের ব্যাপারে নছিহত ও ভৎসনা করিতেছিল (যে, তুমি লজ্জা কর কেন?) রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে এ বিষয়ে রাগ করিও না; (লজ্জা শরম ভাল জিনিষ) যেহেতু লজ্জা-শরম ঈমানের একটি শাখা।

ব্যাখ্যা :—লজ্জা-শরম এক জিনিষ এবং হীনমত্ততা বা আত্মাভিমান প্রসূত মনের নীচতা ও দুর্বলতা (Inferiority complex) ভিন্ন জিনিষ। এ বিষয়ে ৮ নং হাদীছের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে। লজ্জা-শরমের বিষয়ে কাহাকেও রাগ বা তিরস্কার করা চাই না; যেমন এই হাদীছে বর্ণিত হইল। কিন্তু মনের নীচতা ও দুর্বলতা পরিহার করার শিক্ষা দিবে।

ইসলামের স্বীকারোক্তি এবং নামায ও যাকাত আদায় করিলে
তাহাকে মোসলমান গণ্য করা হইবে

অর্থাৎ কোনও ব্যক্তির পক্ষে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যাপারে মোসলমান গণ্য হইবার জ্ঞান এবং মোসলমান হিসাবে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা, অধিকার ও দাবীদায়ার যোগ্যতা

লাভ করিবার জন্য তাহার মধ্যে দুইটি বিষয় প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক। প্রথমতঃ তাহার কোন কার্য বা কথা ইসলামের স্বীকারোক্তির কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটায়। দ্বিতীয়তঃ সঠিকভাবে নামায ও যাকাত আদায় করার ব্যাপারে সে ত্রুটিহীন হয়। এই দুইটি বস্তুর অস্তিত্ব কাহারও মধ্যে পাওয়া গেলে তাহাকে মোসলমান দলভুক্তরূপে মানিয়া লইতে হইবে। এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্যায়ে স্বযোগ-সুবিধা ও অধিকারাদি দানের ব্যাপারে তাহার আন্তরিকতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন হইবে না; সে সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব দেওয়ার জন্য সে আল্লাহর নিকট দায়ী থাকিবে। অবশ্য যদি কোনও ইসলামী বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে তাহাকে পাখিব শাস্তি বিধানও করা হইবে। ইসলামী সংবিধানের উল্লিখিত ধারাটি কোরআন ও হাদীছ উভয়ের দ্বারা প্রমাণিত।

কোরআনের আয়াত—

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ

অর্থ:—অতঃপর (হে মোসলমানগণ! তোমাদিগকে আদেশ করা যাইতেছে—) যদি তাহারা (কাকেরগণ) ইসলামদ্রোহিতা—কুফর* এবং শেরক বর্জনপূর্বক (খাটী তোহিদের দিকে অর্থাৎ এক আল্লাহকে, আল্লাহ বাণীকে, আল্লাহ প্রেরিত পয়গাম্বরকে বিশ্বাস ও স্বীকার করিয়া লওয়ার দিকে) প্রত্যাবর্তন করে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তবে তাহাদিগকে মুক্ত পরিবেশের সুযোগ দান কর—তাহাদের জ্ঞান-মালের নিরাপত্তা দান কর। (১০ পাঃ ৭ কঃ)

২২। হাদীছ:— عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ يُحَمِّدُوا رَسُولَ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْأَسْلَامِ وَحِسَابِهِمْ عَلَى اللَّهِ

অর্থ:—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন আল্লাহ তরফ হইতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি, আমি যেন বিপথগামী জগৎবাসীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাই—জihad করিয়া যাই যে পর্যন্ত না তাহারা এই স্বীকারোক্তি করিবে যে, এক আল্লাহই মাবুদ ও উপাস্ত; তিনি ভিন্ন অস্ত কোনও মাবুদ

* 'কুফর' অর্থ আল্লাহকে, আল্লাহ বাণীকে, আল্লাহ রসূলকে স্বীকার ও গ্রহণ করার মতবাদ উপেক্ষা করা। 'শেরক' অর্থ আল্লাহকে স্বীকার করার সঙ্গে মাবুদরূপে অস্ত্র-কাউকে কিম্বা আল্লাহ বিরোধী বস্তু ও মতবাদকে স্বীকার করিয়া চলা—উভয়টিই তোহিদ বিরোধী।

বা উপাস্ত নাই এবং মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার সাক্ষাৎ রহুল এবং নাগায় কায়ম করিবে ও যাকাত দান করিবে। বাহারা এই কয়টি কাজ পূর্ণ করিবে তাহার (মোসলমান হিসাবে) জ্ঞান মাল রক্ষার অধিকার পাইবে। অবশ্য ইসলামের বিধান লঙ্ঘনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইবে। (আর উল্লেখিত বাহিক কার্যাবলীর দ্বারা শুধুমাত্র পাখিব আশ্রয়কার অধিকার পাইবে।) আন্তরিক অবস্থার ছাড়া (অন্তর্যামী) আল্লাহ তায়ালার নিকট দায়ী থাকিবে। (ওদনুসারেই পরকালে আল্লাহ তায়ালার দরবারে তাহার হিসাব-নিকাশ হইবে।)

ব্যাখ্যা :- যে ব্যক্তি মোসলমান দলভুক্ত গণ্য হইবে সে জ্ঞান-মালের নিরাপত্তার অধিকারী হইবে, কিন্তু ইসলামী আইনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসমূহ যাহা শরীয়তে বিধিবদ্ধ আছে উহা তাহার উপর অবশ্যই প্রবর্তিত হইবে। যেমন—চুরি করিলে হাত কাটা যাইবে, জেনা করিলে ‘ছগ-ছার’ (প্রস্তরাঘাতে প্রাণ নাশ) করা হইবে, খুনের বদলে খুন করা হইবে, ধর্মীয় কর্তব্য ও অন্নষ্ঠান সমূহ পালন না করিলে তজ্জন্ত নিদিষ্ট শাস্তি প্রদান করা হইবে ইত্যাদি।

স্মরণ রাখিবে প্রকাশ্যে মোসলমান দলভুক্তি ইহকালের জন্ত রক্ষাকবচ বটে, কিন্তু অন্তরে কুটিলতা রাখিয়া বাহিক দলভুক্তির দ্বারা কেহ কখনও মোমেন হইতে পারিবে না এবং পরকালে নাজাত ও মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না ; বরং মোনাফেকের অধিক আজাব হইবে। আল্লাহ তায়ালার বলিয়াছেন—“মোনাফেকগণ দোবখের সর্বনিম্ন তলার থাকিবে।” (৫ পারা শেষ রুকু দ্রষ্টব্য)

ঈমান একটি (ইচ্ছাকৃত ও উপার্জিত) প্রধান আমল

উপরোক্ত শিরোনামার তাৎপর্য এই যে—ঈমান যেহেতু একটি আন্তরিক বস্তু, ইহা কোনও বাহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা অর্জিত হয় না, তাই বলিয়া এরূপ ধারণা করাও নিতান্ত ভুল হইবে যে, ঈমান হাসিল করার ব্যাপারে মানুষের নিজস্ব কিছু করণীয় বা চেষ্টা চরিত্রের প্রয়োজন নাই। বরঞ্চ, প্রকৃত প্রস্তাবে ঈমান একটি প্রধান “আমল”। আমল কাহাকে বলা হয়? আল্লাহ তায়ালার মানুষকে বিবেচনা শক্তি দান করিয়াছেন এবং আভ্যন্তরীণ ও বাহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি পরিচালনার দ্বারা সকল প্রকার কার্যাবস্থার জন্য কর্মশক্তিও দান করিয়াছেন। সেই বিবেচনাশক্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া ইচ্ছাকৃতভাবে কর্মশক্তি প্রয়োগ করতঃ আভ্যন্তরীণ বা বাহিক কোনও অঙ্গের দ্বারা কোনও কার্য সমাধা করাকেই আমল বলে। এতদ্ব্যতীত ঈমানও একটি আমল। কারণ, ঈমানের উৎপত্তিস্থল “কল্ব” অর্থাৎ দেহ বা অন্তঃকরণ। কল্ব মানুষের একটি আভ্যন্তরীণ অঙ্গ। মানুষ স্বীয় বিবেচনাশক্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া ইচ্ছাকৃতভাবে কর্মশক্তি প্রয়োগ করতঃ চেষ্টা ও সাধনা করিয়া তাহার কল্ব অঙ্গের দ্বারা ঈমান রত্ব অর্জন করিতে পারে। বরং এরূপ চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা অর্জিত ঈমানকেই শরীয়তে উত্তম ঈমান গণ্য করা হয়। সুতরাং ঈমান নিছক একটি ঐচ্ছিক ও অর্জনীয় আমল, শুধু তাহাই নহে বরং সর্বপ্রধান আমল।

কারণ অহাং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সম্পাদিত সমস্ত ধর্মীয় কার্যাবলী ঈমানেরই ডাল-পালা ও শাখা-প্রশাখা স্বরূপ। ঈমানের মূল ও শিকড় অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রোথিত এবং উহার শাখা-প্রশাখা সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রসারিত ও পরিব্যাপ্ত। সেই জন্যই নাজাতকামীদের কর্তব্য হইবে সর্বদা মূল ঈমানের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমবায়ে উহাকে সরস, সতেজ ও শ্রামল রাখার প্রতি যত্নবান হওয়া। আলোচ্য শিরোনামার বিষয়টির প্রমাণে কতিপয় কোরআনের আয়াত ও একটি হাদীছ উল্লেখ করা হইতেছে।

প্রথম আয়াত:—وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“আল্লাহ তায়ালা বেহেশতীদিগকে জাগতিক জীবনে তাহাদের কৃত সাধনার প্রতি সন্তুষ্টির স্বীকৃতি স্বরূপ বলিবেন, (হে বেহেশতবাসী!) তোমাদিগকে এই বেহেশতের দ্বারা পুরস্কৃত করা হইয়াছে তোমাদের কৃত আমলের বদৌলতে। (২৫ পাঃ ১৩ রূঃ)

এখানের আমল দ্বারা ঈমানকেও বুঝাইয়াছে, বরং বেহেশতের অধিকারী হইবার জন্য ঈমানই সর্ব প্রদান নির্ভরস্থল। যদি ইহা ইচ্ছাকৃত চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা অজিত না হইত, তবে ইহার উপর প্রতিদান বা পুরস্কার বিরূপে হইতে পারে।

দ্বিতীয় আয়াত:—فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“আল্লাহ তায়ালা শপথ করিয়া বলিতেছেন, তাহারা (মানব) জীবনভর কি আমল করিতেছিল সে সম্বন্ধে তাহাদিগকে নিশ্চয় জিজ্ঞাসাবাদ করিব এবং বিচার করিব। (১৪ পাঃ ৬ রূঃ)

অনেক ইমামগণ এখানে “আমল” শব্দের উদ্দেশ্য ঈমান বলিয়াছেন—অর্থাৎ প্রত্যেক মানবকে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু—“মাবুদ বা উপাস্ত একমাত্র আল্লাহ, তিনি ভিন্ন কোনও মাবুদ নাই”—এই স্বীকারোক্তি ও অঙ্গীকার-বাক্যের উপর সে পূর্ণরূপে আমল করিয়াছে, না অন্য কাহাকেও মাবুদ বানাইয়া সে অনুযায়ী জীবন-যাপন করিয়াছে।

উল্লেখিত জিজ্ঞাসা বস্তুটিই ঈমান; ঈমান মানুষের ইচ্ছা ও অর্জন-ক্ষমতাত্ত্বিক না হইলে উহার জ্ঞান প্রশ্ন করা হইবে কেন; কেনই বা সে উহার জ্ঞান দায়ী হইবে?

২৩। হাদীছ :—আবু হোরাঈরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা রসূলুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসালামের খেদমতে আরজ করা হইল, সর্বোৎকৃষ্ট আমল কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলের প্রতি খাটি বিশ্বাস স্থাপন করা—অর্থাৎ ঈমান। পুনরায় আরজ করা হইল—তারপর? হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ রাস্তায় জেহাদ করা। আবার আরজ করা হইল—তারপর? হযরত (দঃ) বলিলেন, একরূপ (আদব, মহব্বৎ, ভক্তি, ভজনা ও সাধনার সহিত) হজ্জ করা যাহা আল্লাহ দরবারে গ্রহণযোগ্য হয়।

এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হইল যে—জেহাদ, হজ্জ ইত্যাদির স্থায় ঈমানও একটি আমল, বরং সর্বশ্রেষ্ঠ আমল—যাহা যথোপযুক্ত চেষ্টা ও সাধনায়ই হাসিল হইতে পারে।

খাঁচী ও অখাঁচী ইসলামের বিশ্লেষণ

যদি খাঁচীভাবে সর্বাস্তকরণে ইসলামকে গ্রহণ করা না হয়, শুধু আশ্রয়ক্ষামূলক বা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বাহ্যিক দলভুক্তি ও আনুগত্য দেখান হয়, তবে প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ ইসলামের আদৌ কোনও মূল্য হইবে না। এরূপ ইসলামের নামধারী ব্যক্তি মোমেন হওয়ার দাবীও করিতে পারে না, তাহাকে মোমেন বলিয়া আখ্যায়িতও করা যাইবে না। পবিত্র কোরআনেই আছে—

قَالَتِ الْأَمْرَأَةُ آمَنَّا قُلْ لَّمْ تُوْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ -

অর্থঃ—একদল গ্রাম্যলোক যাহাদের অন্তরে ঈমান ছিল না, শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তি ও লোক দেখানো ভাবে কিছু বাহ্যিক আমল তাহারা করিত; তাহারা নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া ঈমানের দাবীদার হইল। আল্লাহ তায়া। এই আয়াতে রসূলুল্লাহ (সঃ)কে আদেশ করিলেন, “আঃ নি তাহাদিগকে বলুন, তোমরা মিথ্যাবাদী—তোমরা ঈমানদার হও নাই; তবে হাঁ, প্রকাশ্যে ইসলামের আনুগত্য দেখাইতেছ, এইটুকু দাবী করিতে পার। এখনও তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করে নাই। (২৬ পাঃ ১৪ কঃ)

এই আয়াতে প্রমাণিত হইল—পাখিব লোভ, স্বার্থোদ্ধার বা ভয় ইত্যাদির দরুণ মৌখিক স্বীকারোক্তি ও বাহ্যিক আমলের ইসলাম আল্লাহ নিকট মূল্যহীন হইবে।*

* বর্তমান কালের ধর্ম বিবজ্জিত শিক্ষা ও বিশ্বমীর সভ্যতার অনুকরণ-প্রিয়তার যুগে এক প্রকার মোসলমানের আবির্ভাব হইয়াছে, যাহারা শুধু বংশগত ভাবেই মোসলমান। অর্থাৎ মোসলমান পূর্বপুরুষ ও মুসলিম বাপ দাদার ঔরসজাত হিসাবে মোসলমান বলিয়া পরিচিত। সামাজিক বাধ্য বাধ্যকতা বা শুধু ক্ষুতি উপভোগ ও দলভুক্তি হিসাবে ঈদ, কোরবানী ইত্যাদি এমনকি, হজ্জ-যাত্রার ক্ষয় মোসলমানদের বাহ্যিক ধর্মীয়চরিত্রাদিতেও যোগদান করে, কিন্তু স্বীয় বিবেচনাশক্তি দ্বারা পরিচালিত ও উদ্বুদ্ধ হইয়া এরূপ মনোবল ও দৃঢ়তা অর্জন করে নাই যে, একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত মতবাদ ও আল্লাহ মনোনীত ধর্ম ইসলাম গ্রহণীয় বিধায় আমি সর্বাস্তকরণে উহাকেই গ্রহণ করিতেছি এবং অতঃ সমস্ত মতবাদ বর্জনীয়, অতএব আমি সে সব বর্জন করিতেছি। এহেন বংশানুক্রমিক মোসলমানদের সতর্ক হওয়া এবং উক্ত আয়াতের মর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখা কত বা।

মদীনায় ঐ গ্রামবাসী মোনাফেকের দল যাহারা কেবল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার উদ্দেশ্যে ইসলাম ও ঈমানের দাবী করিয়া থাকিত, কিন্তু তাহাদের উপর প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলাম ও ঈমানের কোনই প্রভাব ছিল না এবং ইসলামের প্রতি তাহাদের প্রকৃত শ্রদ্ধাও ছিল না। পক্ষান্তরে তাহারা ইসলামকে অচল হয় মনে করিত, এমনকি খাঁচী মোসলমানদিগকে বোকা, নির্বোধ ইত্যাদি বলিয়া বিজ্ঞপ ও উপহাস করিতেও বিধা বোধ করিত না। এই সকল মোনাফেক মোসলমানীর দাবী-

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

বাহ্যিক স্বীকারোক্তি ও আমলের সঙ্গে সঙ্গে খাটীভাবে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন ও নিষ্ঠার সহিত ইসলামের যাবতীয় অনুশাসনকে গ্রহণ করার দৃঢ় প্রস্তুতি থাকিলে সেই ইসলামই আল্লার নিকট গ্রহণীয় হইবে। একমাত্র এই প্রকার ইসলামকে উদ্দেশ্য করিয়াই কোরআনের ঘোষণায় রহিয়াছে—**إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ** আল্লার মনোনীত ধর্ম একমাত্র ইসলাম” (৩ পাঃ ১০ কঃ)। শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তিতে এই আয়াতের উদ্দেশ্য হাসিল হইবে না।

২৪। হাদীছ :- ছাহাবী সায়া'দ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম, তিনি একদল লোককে দান করিলেন। কিন্তু তন্মধ্যে এমন একজন লোককে তিনি কিছুই দিলেন না, যাহাকে আমি ঐ দনের মধ্যে সর্বোত্তম (দ্বীনদার-পরহেজগার) বলিয়া মনে করিতাম। এতদৃষ্টে আমি আরজ করিলাম—ইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)! আপনি অধিক ব্যক্তিকে দান করিলেন না? আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস—সে “মোমেন”। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, (এরূপ দৃঢ়ভাবে) “মোমেন” বলিও না, “মোসলেম” বল। আমি কিছু সময় চুপ করিয়া রহিলাম, কিন্তু আমার মনে ঐ খেয়াল ও ধারণা আবার প্রবল হইয়া উঠিল। আমি পুনরায় এরূপ বলিলাম; তিনিও পুনরায় এরূপই বলিলেন—“মোমেন” বলিও না, “মোসলেম” বল। তৃতীয়বার এরূপ প্রশ্ন করিলে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন—হে সায়া'দ। (অনেক সময়) আমি অপছন্দনীয় ব্যক্তিকেও দান করি শুধু এই কারণে যে, (তাহার ঈমান এখনও দুর্বল;) আমার আশঙ্কা হয় (তাহাকে দান করিয়া স্বচ্ছল না রাখিলে অভাবে পড়িয়া) সে হয়ত (ইসলাম ত্যাগ পূর্বক) দোষখের পথে চলিয়া যাইতে পারে। X

দারদের সহিত বর্তমান যুগের নামধারী বংশগত মোসলমানদের তুলনা করিলে মোটেই অতিরঞ্জিত বা অত্যাচার হইবে না। কারণ, ইহারা শুধু যুগ প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী রাজনৈতিক, সামাজিক, পঞ্চায়েতী নেতৃত্ব ও পদ-মর্যাদা ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সমূহকে এই বিরাট মোসলেম সমাজের নিকট হইতে নিজেদের কুক্ষিগত করার জন্ত নিজেদেরকে মোসলেম সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দেয়। পক্ষান্তরে ইসলামের কোনও প্রভাবই তাহাদের উপর নাই এবং ইসলামের প্রতি কোনরূপ দরদ, অন্ধা দৃঢ়তা বা একীন তাহাদের অন্তরে নাই।

X কোনও ব্যক্তিকে দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে সাধ্যানুযায়ী তাহার মন রক্ষা করিয়া চলাকে শরীয়তের পরিভাষায় “তালীফে-কুলুব” বলা হয়। শরীয়তে এরূপ মনস্তি বিধান করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। কারণ, ঈমান-রত্নের বিকাশ সকলের অন্তরেই মাত্র এক দুই দিনেই হইয়া যায় না। খাটি মোমেনদের সংগ্রহে থাকিলে পর্যায়ক্রমে উহা হাসিল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সে অংশই এরূপ ব্যক্তির সন্ততিবিধান করতঃ তাহাকে ঈমানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সুযোগ দান করা বিধেয়।

ব্যাখ্যা ৩—“মোমেন” শব্দের অর্থ ঈমানদার। খাঁচীভাবে ভয় ও ভক্তির সহিত বিশ্বাস করতঃ সেই বিশ্বাসামুপাতিক জীবন যাপনের আন্তরিক প্রস্তুতি মনেপ্রাণে গ্রহণ করাকে ঈমান বলা হয়। ইহা কোনও বাহ্যিক অথবা দৃশ্য বস্তু বা ক্রিয়া নহে। ভয়, ভক্তি, বিশ্বাস ও আন্তরিক প্রস্তুতি এ সবই অন্তরের অন্তঃস্থলীয় অদৃশ্য অবস্থা এবং প্রতিক্রিয়া ও গুণাগুণ বিশেষ—যাহা বাহ্যদৃষ্টির আওতাভুক্ত নহে। অতএব কোনও ব্যক্তি বিশেষকে নিশ্চিতরূপে “মোমেন” বলার অধিকার অন্তর্য্যামী আল্লাহই থাকিতে পারে। অতঃ কেহই এই অধিকার পাইতে পারে না।

“মোসলেম” অর্থ ইসলাম গ্রহণকারী। শরীয়তের আদেশ-নিষেধ, হুকুম-আহকামের প্রতি স্বীকারোক্তি ও ঐগুলিকে বাহ্যতঃ পালন করার নাম “ইসলাম”। ইহা অবশ্যই কতকগুলি প্রকাশ্য ক্রিয়া-কলাপ এবং বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টিবিশেষ। তাই ইহার উপর ভিত্তি করিয়া পরস্পর একে অপরকে দৃঢ়তার সহিতও “মোসলেম” বলিতে পারে।

সায়্যাদ (রাঃ) তাঁহার পছন্দনীয় ব্যক্তিকে শপথ করিয়া দৃঢ়তার সহিত “মোমেন” বলিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার অনধিকার চর্চা ছিল—কারণ, কোনও ব্যক্তিবিশেষকে এরূপ দৃঢ়ভাবে মোমেন বলার অধিকার আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও হইতে পারে না। তাই রসুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সায়্যাদ (রাঃ)কে বাধা দান করিয়া বলিলেন—অদৃশ্য ও অন্তরঙ্গ সম্পর্কিত ব্যাপারে এরূপ দৃঢ়তা প্রকাশ এবং সাব্যস্তমূলক উক্তি করা বাঞ্ছনীয় নহে। হয়ত ঐ ব্যক্তি অন্তরে অন্য ভাব পোষণ করিয়া থাকিতে পারি। তবে ইহা তাহার প্রতি তোমার ভাল ধারণা থাকিলে তুমি তাহাকে দৃঢ়ভাবেও মোসলেম বলিতে পার। কারণ, ইসলাম কোনও অন্তঃস্থলীয় অদৃশ্য বস্তু নহে, উহার অন্তর্ভুক্তি মানুষের প্রকাশ্য দৃষ্টির আওতাভুক্ত।

পাঠকবর্গ! এখানে একটি বিষয় স্মরণ রাখিবেন যে—“মোমেন” ও “মোসলেম” শব্দদ্বয়ের মূল “ঈমান” ও “ইসলামের” মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন এবং এই দুইটির ব্যবহারিক তাৎপর্য্য ও বিশ্লেষণ উপলব্ধি করানো—ইহাই ছিল রসুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বাধাদানের উদ্দেশ্য। নতুবা যে ব্যক্তি সম্পর্কে এই কথাবার্তা হইতেছিল তিনি অতি বড় মর্ত্য্যার ছাহাবী ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল—জোয়াইল (রাঃ)। অতঃ স্থানে স্বয়ং নবী (দঃ) তাঁহার বড় মজ্জিলত বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা দেখান হইল যে, অখাঁচী ইসলামের দ্বারা “মোমেন” আখ্যা লাভ করা ত দূরের কথা খাঁচী ইসলাম ক্ষেত্রেও “মোমেন” আখ্যার ব্যবহার অত্যন্ত সতর্কতা সাপেক্ষ।

ব্যাপকভাবে সালাগ জারী করা ঈমানের একটি শাখা

বিশিষ্ট ছাহাবী আম্মার (রাঃ) বলিয়াছেন—তিনটি শব্দকে বে আয়ত্ব করিতে পারি। সে সর্বোচ্চ ঈমানের অধিকারী হইবে। (১) নিজ হইতেই নিজের ইনসাক করা, অর্থাৎ

নিম্নের উপর আল্লার বা বান্দাদের যে হক আছে, প্রত্যেকটি হক কাহারও দাবী বাতিরেকেই পূর্ণরূপে আদায় করা। (২) পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালামঃ করা। (৩) গরীব হওয়া সত্ত্বেও সামর্থ্য অনুযায়ী সংকাজে দান করা।

ইমাম বোখারী (রঃ) আলোচ্য শিরোনামায় ১১ নং হাদীছটি উল্লেখ করিয়াছেন।

কুফরের শাখা-প্রশাখা পরস্পর ছোট-বড় হয়

অর্থঃ—যেমন নেক কাজসমূহ ঈমানের শাখা-প্রশাখা এবং উহা পরস্পর ছোট-বড় হয়, তদ্রূপ গোনাহের কাজসমূহ কুফরের শাখা-প্রশাখা এবং উহাও পরস্পর ছোট-বড় হয়।

এখানে আরও একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে—যেমন আল্লার হক আদায় না করাও গোনাহ, তাই উহাকে কুফরের শাখা বলা যায়, তেমনি কোন মানুষের হক আদায় না করাও গোনাহ, তাই উহাকেও কুফরের শাখা বলা যাইবে।

২১। হাদীছঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমাকে দোষ দাখ দেখানো হইয়াছে। তখন আমি দেখিয়াছি—দোষখী-দের অধিকাংশই নারী। কারণ, তাহারা “কুফরী” বেশী করিয়া থাকে। জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহারা কি আল্লার কুফরী করিয়া থাকে? নবী (দঃ) উত্তরে বলিলেন, স্বামীর কুফরী (অর্থঃ না-শোকরী ও নেমক-হারামী) এবং এহুসান ও উপকারের কুফরী করিয়া থাকে। নারী জাতির স্বভাব এই যে, যদিও তুমি তাহার প্রতি আদর্শবান এহুসান, সদ্ব্যবহার ও উপকার কর, কিন্তু তোমার কোনও একটি মাত্র ক্রটির সে (সব কিছু ভুলিয়া গিয়া তোমার সকল উপকার অস্বীকার করতঃ) বলিবে—আমি জীবনে কখনও তোমার নিকট হইতে সদ্ব্যবহার পাইলাম না।

এখানে ইমাম বোখারী (রঃ) আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীছের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, ঐ হাদীছটি “ঋতু অবস্থায় রোযা রাখিতে পারিবে না” শিরোনামায় বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইবে। সেই হাদীছে নারী জাতির আরও দুইটি মারাত্মক দোষের কথা উল্লেখ হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি হইল যে—নারী জাতি স্বভাবতঃ কথায় কথায় অভিশাপ ও তিরস্কার অত্যন্ত বেশী করিয়া থাকে। আর দ্বিতীয়টি হইল এই যে, নারী স্বভাবতঃই অতি ছলনাময়ী হইয়া থাকে। হযরত রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলেন—নারী জাতি সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা তরলমতি ও অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াও শুধু ছলনার দ্বারা অতিশয় হুশিয়ার, চালাক চতুর পুরুষের বুদ্ধিকেও ঘোলাটে করিয়া দিতে সর্বাধিক পটু দেখা যায়।

পাঠকবর্গ। আলোচ্য বর্ণনা দ্বারা নারী জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য নহে। বরং নারী জাতির ক্রটি সংশোধন ও চরিত্র গঠন করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। রসুলুল্লাহ

ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শিক্ষা ও আদর্শ জাতি গঠন ও জাতীয় চরিত্র সংশোধনে অতি ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। হযরত (দঃ) জাতীর ক্ষুদ্রতম ছিদ্র পথেও প্রবেশ করতঃ উহার গলদ দূর করার প্রতি তৎপর হইয়াছেন এবং জাতিকেও তহুন্নাযী শিক্ষা দান করিয়াছেন। নারী জাতির উপরই সংসারের সুখ-সমৃদ্ধি, শান্তি ও শৃঙ্খলা সব কিছু নির্ভর করে। তাহাদের চলনায়, তাহাদের অভিশাপ ও ভৎসনার দাপটে এবং তাহাদের না-শোকর-গোজারীপূর্ণ কর্কশ ব্যবহার বহু স্বামীর সুখের সংসার নরকে পরিণত হয়। অনেক সময় ইহার বিষময় ফলাফল ও বিধ্বংসী পরিণতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। তাই রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই ভয়াবহতার মূল কারণ—উপরোক্ত দোষগুলির প্রতি সংস্কারের অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন। এসনকি, ঐ দোষগুলিকে অত্যন্ত কঠোর শব্দ “কুফর” বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইহা তাঁহার অপরিমিত দূরদর্শিতারই পরিচায়ক।

প্রত্যেকটি গোনাহ কুফরীর শাখা

অর্থাৎ গোনাহ যত ছোটই হউক না কেন, উহাকে মামুলী গণ্য করা চাই না এবং উহা হইতে দূরে থাকিবার প্রতি তৎপর হওয়া চাই। কারণ, উহা কুফরীর একটি শাখা। যেক্রপভাবে প্রত্যেকটি নেক আমলকে ঈমানের শাখা বলা হইয়াছে।

গোনাহ সমূহ কুফরীর শাখা ও কুফরী যুগের প্রথা হওয়া সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু শুধু কুফরীর শাখা-প্রশাখা পরিদৃষ্ট হওয়ার দরুন কোনও ব্যক্তিকে “কাফের” বলা যাইবে না—যে পর্য্যন্ত না সে আল্লাহ, আল্লাহ রসুলের বা আল্লাহ বাণীর প্রতি স্বীকারোক্তি হানিকর কোনও কাজ বা উক্তি করিবে। তবে ইঁা, সাধারণ গোনাহ সমূহের অন্তর্ধানকারী কাফের সাব্যস্ত না হইলেও তাহার মধ্যে কুফরীর শাখা আছে বলিতে হইবে। যেমন, বলা হয়—সে চোর না হইলেও চোরাই মাল তাহার ঘরে আছে।

কুফরীর শাখা-প্রশাখা—গোনাহসমূহ মাফ হওয়ার উপযোগী। অর্থাৎ তওবা ইত্যাদির দ্বারা মাফ হয়। কিন্তু আসল কুফর ও শেরক আল্লাহ তায়ালা কখনও মাফ করিবেন না। উহা বর্জন পূর্বক ইসলাম গ্রহণ করিলেই উহা মাফ হইতে পারে; উহা মাফ হইবার অত কোন উপায় নাই। এ সম্বন্ধে কোরআন শরীফে সুস্পষ্ট ঘোষণা রহিয়াছে। (৫ পাঃ ১৫ কঃ)।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

অর্থ:—আল্লাহ সঙ্গে শরীক করা (অংশীদারিতা ইহা) আল্লাহ কিছুতেই মাফ করিবেন না। তাহা ছাড়া অত্যাগত বিষয় আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করিবেন মাফ করিবেন।

এই আয়াতে শুধু শেরকই উল্লেখ আছে, কিন্তু কুফরও তদ্রূপই অক্ষমার্হ। কারণ, বস্তুতঃ শেরক ও কুফর পরস্পর বিজড়িত। “শেরক” অর্থ কাহাকেও আল্লাহকে, আল্লাহ রসুলকে বা আল্লাহ বাণীকে অস্বীকার করা। আল্লাহ সঙ্গে কাহাকেও শরীক করা হইলে সে ক্ষেত্রে আল্লাহকে অস্বীকারই করা হয়, কারণ প্রকৃত পক্ষে যিনি আল্লাহ তিনি ত

ওয়াহুদাছ লা-শারীফালাহু—তিনি এক, অবিভীত তাঁহার কোন শরীক বা দোসর নাই। তজ্জপ আল্লাহ, আল্লার রসুল, আল্লার বাণীকে অস্বীকার করিলেও নিশ্চয় অত্কে আল্লার সঙ্গে শরীক করা হইয়া থাকে। কারণ, কোনও লোক যখন আল্লার অস্তিত্কে বা রসুলের ও কোরআনের সত্যতাকে অস্বীকার করে, তখন সে নিশ্চয়—হয়ত অত্ কাহারও অনুকরণে উহা করে কিম্বা স্বীয় প্রবৃত্তির বশে উহা করিয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাও আল্লার সঙ্গে শরীক করারই নাসান্তর। কেননা, মানুষ বিনাশর্তে বশতা স্বীকার করিবে, ইহা একমাত্র আল্লারই সার্বভৌম অধিকার। অত্চ এ বক্তি আল্লার সেই অলঙ্ঘনীয় অধিকার অত্ মানুষকে বা স্বীয় প্রবৃত্তিকে অর্পন করিয়াছে, তাই এক্ষেত্রেও শের্ক করা হইল।

এখানে ইহাও প্রকাশ পায় যে, প্রতিটি গোনাহ শের্কেরও শাখা, তাই গোনাহকে অন্ধকার যুগের কাজ বলা হইবে। কারণ, প্রতিটি গোনাহে স্বীয় প্রবৃত্তির বশতা থাকে; অত্চ মানবের কর্তব্য হইল—একমাত্র আল্লার বশতায় চলা। ইহারই ইঙ্গিত এই আয়াতে রহিয়াছে—

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا هَوَاهُ - أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

“হে রসুল! বলুন ত—যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তিকে মাবুদ বানাইয়াছে। আপনি লইতে পারেন কি তাহার সংশোধনের দায়িত্ব?” (১৯ পাঃ ২ কঃ)।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তির দাসত্ব করিয়া চলিয়াছে, তাহাও সৃষ্টিকর্তাপালনকর্তার বিরুদ্ধাচরণে তাহার সংশোধন হইবে কিরূপে?

২৬। হাদীছঃ—আবুযর গেফারী ছাহাবীর শাগেরদ মা'রুর (রঃ) বর্ণনা করেন—একদা আমি আবুযর গেফারীর (রাঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখিলাম, তাঁহার পরিধানে একছোড়া কাপড় এবং তাঁহার ক্রীতদাসের পরিধানেও অবিকল ঐরূপ একছোড়া কাপড়। আমি তাহাকে ভৃত্যের সহিত ঐরূপ সমতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, একদা আমি আমার ভৃত্যকে গালি দিতে বাদীর বাচ্চা বলিয়া গালি দিলাম। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শুনিয়া বলিলেন, হে আবুযর! তাহাকে তাহার মাতার সঙ্গে জড়াইয়া গালি দিতেছ? তোমার মধ্যে কুফরী যুগের স্বভাব রহিয়াছে। হযরত (দঃ) আরও বলিলেন—

أَخْرَأَكُمْ خَوْلَكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ

فَلْيُطْعِمَهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبِسَهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تَكْلِفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ

فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَاعَيْنُوهُمْ

“এই সব ক্রীতদাস (বা ভৃত্যগণ) তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে তোমাদের করতলগত করিয়াছেন। অতএব, যে কোনও মোসলমানের অধীনে তাহারই

অন্য এক ভাই (তথা তাহারই মত একজন মানুষ ভৃত্য শ্রমিক বা ক্রীতদাস রূপে) থাকিবে; সেই মোসলমানের কর্তব্য হইবে—এ ভাইকেও যজ্ঞপই খাওয়ানো, পরানো যজ্ঞপ সে নিজে খাইয়া ও পরিয়া থাকে। আর সাবধান! তোমরা কখনও এ ভাই এর উপরে এতদূর গুরুভারের কাজ চাপাইয়া দিও না, যাহা তাহার সাধ্যাত্ত নহে। যদি কখনও এরূপ কোন কাজ তাহার দ্বারা করাইতে হয়, তবে তোমরা নিজেরাও এ কাজে তাহার সাহায্য করিবে।”

ব্যাখ্যা :—আবুযর (রাঃ) নবীজীর উক্ত আদেশের পূর্ণ আনুগত্যে স্বীয় ভৃত্যকে নিজের সহিত পূর্ণ সমতা দান করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার ভাবাবেগ ও নবীজীর আনুগত্যে চরম উৎসর্গ-প্রীতি ছিল। নতুবা অত্যাচার দলীল-প্রমাণে সাব্যস্ত হয় যে উক্ত আদেশটির মূল উদ্দেশ্য সমতা নয়, বরং উদারতা (ফতহুল বারী)।

বোখারী শরীফেরই এক হাদীছে আছে—তোমার ভৃত্য তোমার জন্ত খাবার তৈরী করিলে উহা হইতে অন্ততঃ এক গ্লাস তাহাকেও দিও।

২১। হাদীছ :—

عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيمًا عَلَى قَتْلِ مَا حَبَّه

অর্থ :—আবু বক্রাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছালামুল্লাহ আলাইহে অসালাম বলিয়াছেন—জুই দল মোসলমান যখন তরবারি হাতে লইয়া পরস্পর বগড়া দিবাদে লিপ্ত হয়, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ই দোষখের উপযুক্ত বলিয়া সাব্যস্ত হইয়া যায়। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)! হত্যাকারী ব্যক্তি দোষখের উপযুক্ত হইবে ইহা বোধ-গম্য, কিন্তু নিহত ব্যক্তি দোষখের উপযুক্ত হইবে কেন? হযরত (দঃ) উত্তরে বলিলেন—কারণ, নিহত ব্যক্তিও যখন তরবারি হাতে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিল, তখন তাহারও ইচ্ছা এই ছিল যে, সে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করিবে, (সুতরাং সেও দোষখেরই উপযুক্ত)।

এই হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, মোসলমানদের পরস্পর লড়াই-বগড়া করা কুফরীর একটি শাখা, তাই এই কাজের পরিণাম ফল উভয়ের জন্তই দোষখ। অন্য এক হাদীছে স্পষ্টতঃই উল্লেখ আছে—سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

“মুসলমান মুসলমানকে গালি দিলে গালিদাতা ফাছেক হইয়া যায় এবং মুসলমান মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়াই করিলে তাহা কুফরী কাজ বলিয়া পরিগণিত হয়।”

“মাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং কোন প্রকার অত্যাচার-অত্যাচার করে নাই, একমাত্র তাহারাই পরিভ্রাণ পাওয়ার যোগ্য (৭ পাঃ ১৫ কঃ)। তখন ছাহাবীগণ ভাবিলেন—আমাদের প্রত্যেকেরই কম-বেশী কিছু অত্যাচার-অত্যাচার (অর্থাৎ গোনাহ) নিশ্চয়ই আছে; তাহা হইলে এই আয়াতের মর্মানুসারে দেখা যাইতেছে, আমরা কেহই পরিভ্রাণ পাইতে পারি না। এই ভাবিয়া তাহার (ভীত ও চিন্তিত হইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট) আরজ করিলেন—আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে কোন একটিও অত্যাচার-অত্যাচার (গোনাহ) করে নাই? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহা-দিগকে সত্যনা দিয়া বলিলেন—এই আয়াতে (যুলুম শব্দটির দ্বারা) সাধারণ অত্যাচার-অত্যাচার বা সাধারণ গোনাহ উদ্দেশ্য করা হয় নাই, বরং সব চেয়ে বড় অত্যাচার-অত্যাচার “শেরক”কে

উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। যেমন অত্র এক আয়াতে বলা হইয়াছে—**إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ** “নিশ্চয় জানিও “শেরক” সবচেয়ে বড় অত্যাচার—বড় অত্যাচার।” (২১ পাঃ ১১ রূঃ)।

ব্যাখ্যাঃ—“যুল্ম” শব্দের অর্থ অত্যাচার-অত্যাচার। গোনাহ মাত্রই আল্লাহ নাকরমানী হওয়ার কারণে অত্যাচার এবং নিজের প্রতি অত্যাচার। ছাহাবীগণ ইহা বুঝিতে পারিয়াই ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে—ফোনও গোনাহ করে নাই এমন নিষ্পাপ আমাদের মধ্যে কে আছে? অতএব দেখা যায় আমাদের মধ্যে কেহই, পরিজ্ঞান পাইবার যোগ্য নহে। রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উক্ত আয়াতের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন যে—এই আয়াতে সাধারণ গোনাহের অর্থে যুল্ম শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই, বরং এখানে “শেরক”কে যুল্ম বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ শেরক করা হইলে কেহই পরিজ্ঞান পাইবে না ইহা ঐব। অনেকে অজ্ঞতা বশতঃ “শেরক”কে যুল্ম বা অত্যাচার মনে করে না, কিন্তু ইহা তাহাদের নিতান্ত মূর্খতা। বিশ্ব-প্রখ্যাত জ্ঞানী “লোকমান” স্বীয় পুত্রকে নহিহত ও উপদেশ দান প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, যাহা কোরআন শরীফেও উল্লেখ আছে—

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“হে বৎস। আল্লাহ সঙ্গে শরীক করিও না; নিশ্চয় জানিও—শেরক অতি বড় যুল্ম।” আলোচ্য হাদীছে নবী (সঃ) উক্ত আয়াত দৃষ্টের যুল্মের ব্যাখ্যা শেরকের দ্বারা করিয়াছেন।

মোনাকেকের নিদর্শন

২৯। হাদীছঃ—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ

অর্থঃ—আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—মোনাকেকের তিনটি চিহ্ন……(১) কথায় কথায় মিথ্যা বলিবে, (২) ওয়াদা ও অঙ্গীকার করিয়া ভঙ্গ করিবে, (৩) আমানতে খেয়ানত করিবে।

৩০। হাদীছঃ—**عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَتْ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَمَلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَمَلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَّعَاهَا إِذَا أُؤْتِيَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ**

অর্থ :—আবুল্লাহ ইবনে আস্ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এমন চারিটি চরিত্রদোষ আছে যে, কোন ব্যক্তির মধ্যে উহার সমষ্টি পাওয়া গেলে সে পুরাপুরি মোনাফেক পরিগণিত হইবে এবং উহার কোনও একটি পাওয়া গেলে তাহার মধ্যে মোনাফেকের খাঙ্কলত ও স্বভাব আছে বলা হইবে। (১) আমানতে খেয়াতন করা (২) কথায় কথায় মিথ্যা বলা (৩) অঙ্গীকার ভঙ্গ করা (৪) কাহারও সঙ্গে মতানৈক্য বা বিরোধ হইলে তাহাকে গালাগালি করা।

ব্যাখ্যা :—মোনাফেক দুই প্রকার। (১) মতবাদীক মোনাফেক ; অর্থাৎ অন্তরে মোটেই নাই, শুধু মৌখিক দাবীতে বা বাহ্যিক আসলে মোসলমানরূপী। এই শ্রেণী কাফের এবং প্রকাশ্য কাফের অপেক্ষা কঠিন আজাব ভোগ করিবে। (২) আমলী মোনাফেক ; অর্থাৎ অন্তরে সঠিক ঈমান বিद्यমান আছে, কিন্তু ইসলামের বরখোলাফ কাজ করিয়া থাকে এই শ্রেণী কাফের নয়, বরং ফাছেক ; আজাব ভোগ করিতে হইলেও অবশেষে চিরবেহেশতী হইবে। উল্লেখিত হাদীছদ্বয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর মোনাফেকী উদ্দেশ্য।

লাইলাতুল-কদরে এবাদত করা ঈমানের শাখা

৩১। হাদীছ :— عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -

অর্থ :—আবু হোরাযরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি ঈমানের দ্বারা উদ্ধুদ্ধ হইয়া এবং আখেরাতে আল্লাহ নিকট ছওয়াব পাইবার আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া লাইলাতুলকদরে এবাদত করিবে, এই ব্যক্তির পূর্ববর্তী (ছগীরা) গোনাহসমূহ মাফ হইয়া যাইবে।

জেহাদ করা ঈমানের শাখা

৩২। হাদীছ :—আবু হোরাযরা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—যে ব্যক্তি কেবলমাত্র এই আকর্ষণের বশবর্তী হইয়া আল্লাহ রাস্তায় জেহাদ করিতে বাহির হইবে যে, একমাত্র আল্লাহ উপর ঈমান ও তাঁহার রসুলের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও অকুণ্ঠ সমর্থনই তাহাকে জেহাদের প্রতি আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করিয়াছে (অন্ত কোনও মোহে নহে)। আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্ত নির্ধারিত রাখিয়াছেন—হয় তাহাকে ছওয়াব ও গণীমতের ঙ্গ মাল-দৌলত দ্বারা সাফল্যমণ্ডিত করিয়া স্বর্গে ফিরাইবেন,

ঙ্গ কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদে (ধর্মযুদ্ধে) জয়ী হইয়া শত্রু পক্ষ হইতে যে সকল মালামাল, অর্থ-সম্পদ, অস্ত্র-শস্ত্র বা সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি হস্তগত হইয়া থাকে, উহাকেই ‘গণীমত’ বলা হয়। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পূর্ববর্তী অন্ত কোনও নবীর শরীয়তে এই সকল মাল (অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

নতুবা সোজাশুজি বেহেশতে পৌঁছাইবেন। (রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেন—) যদি সকলের কষ্ট হইবে ইহা লক্ষ্য না করিতাম, তবে আমি প্রতিটি জেহাদকারী দলেই যোগদান করিতাম+। (জেহাদের প্রতি) আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা এই—আম্মার রাস্তায় শহীদ হই, আবার জীবিত হইয়া পুনরায় শহীদ হই এবং পুনরায় জীবিত হইয়া আবার শহীদ হই।

তারাবীর নামায (করয নয়, কিন্তু) ঈমানের শাখা

৩৩। হাদীছঃ— **عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه.**

অর্থঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি ঈমানের দ্বারা উদ্ধুদ্ধ হইয়া এবং আখেরাতে আম্মার নিকট ছওয়াব পাইবে এই আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া রমজানের নামায (তারাবীর) আদায় করিবে তাহার পূর্ববর্তী (ছগীরা) গোনাহ মাক্ফ হইয়া যাইবে।

রমযানের রোযা রাখা ঈমানের শাখা

৩৪। হাদীছঃ— **عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه.**

অর্থঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি ঈমানের দ্বারা উদ্ধুদ্ধ হইয়া এবং ছওয়াবের আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া রমযানের রোযা রাখিবে তাহার পূর্ববর্তী (ছগীরা) গোনাহ মাক্ফ হইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যাঃ—লাইলাতুল কদর, রমযানের রোযা ও তারাবীর ইত্যাদির বিশেষত্ব ও মর্তবা দৃশ্যও নহে বা ব্যবহারিক যুক্তি-প্রমাণে সাব্যস্ত হওয়ার বস্তুও নহে। এ সবার বিশেষত্ব মর্তবা একমাত্র আল্লাহ ও রসুলের ঘোষণার প্রতি অকুণ্ঠ ও অকাট্য বিশ্বাস ও একী

ভোগ করার অনুমতি ছিল না; বরং উহা একত্রিত করা হইত এবং ঐ যুদ্ধ আম্মার দরবারে কবুল হওয়ার নিদর্শন স্বরূপ আকাশ হইতে অগ্নিশিখা আসিয়া ঐগুলি ভষ্ম করিয়া দিত।

কিন্তু আমাদের শরীয়তে ঐ সকল মালামাল এই বিধান মতে উপভোগ করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে যে, ঐ সকল বিজিত ও প্রাপ্ত সম্পূর্ণ মাল ঐ যুদ্ধে নিয়োজিত আমীর অথবা রাষ্ট্রের খলীফার নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। তিনি ঐ মালের এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগার বাইতুল মালে রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত মাল মুজাহিদগণের মধ্যে বণ্টন করিবেন।

+ রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং কোনও জেহাদে যোগদান করিলে সেই জেহাদে বিশেষভাবে সকলেই যোগদানের জন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িত। অথচ সকলের জন্ত সব সময় শক্তি সামর্থ্য সঞ্চয় করা সম্ভব হইত না বিধায় তাহারা মর্মাহত হইত। তাহাদের এই মনোবেদনার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই রসুলুল্লাহ (দঃ) প্রয়োজন না হইলে স্বয়ং সর্বদা জেহাদে शामिल হইতেন না।

স্থাপন করার উপরই নির্ভর করে। আল্লাহর ঘোষণা:—**لِيَةِ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ الْفِ شَهْرٍ** “লাইলাতুল-কদরের এক রাত্রির এবাদৎ হাজার মাসের এবাদৎ অপেক্ষা উত্তম।” যে ব্যক্তি এই ঘোষণা ও ৩১ নম্বর হাদীছের প্রতি খাটা ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিবে, সেই বিশ্বাসই তাহাকে লাইলাতুল-কদরের এবাদতের প্রতি আকৃষ্ট ও সক্রিয় করিয়া তুলিবে। এই বিশ্বাস অন্তরে থাকাবস্থায় কেহই ঐ রাত্রিকে নিজায় কাটিতে দিতে পারে না। তজ্জপই যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘোষণা—**كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ** “তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হইয়াছে” এবং ৩৪ নম্বর হাদীছে পূর্ণ বিশ্বাসী হইবে, সে কখনও রোযা ভঙ্গ করিবে না। ঐ সকল ঘোষণার প্রতি ঈমান ও বিশ্বাসই তাহাকে রোযা রাখায় আকৃষ্ট করিবে। এইরূপে যে ব্যক্তি ৩৩ নম্বর হাদীছে বিশ্বাসী; ঐ বিশ্বাসই তাহাকে তারাবীর নামাযের প্রতি অনুপ্রাণিত করিবে।

উপরোল্লিখিত তিনটি হাদীছের মধ্যে যে—**إِيْمَانًا وَحَسَنَانَا** “ঈমানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ, ছওয়াবের আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া” বলা হইয়াছে, উহার তাৎপর্য ইহাই যে—যে ব্যক্তি অথ কোন প্রকারের মোহ বা ভাবাবেগে পরিচালিত হইয়া নহে, বরং কেবলমাত্র আল্লাহ ও রসুলের উপরোক্ত ঘোষণাসমূহের প্রতি অগাধ বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হইয়া এবং নিছক ছওয়াবের আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া এই সব এবাদৎ করিবে কেবলমাত্র তাহারই জগৎ পূর্ববর্ণিত সুসংবাদ।

প্রকাশ থাকে যে, আখেরাতের যাবতীয় আমলই তজ্জপ। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসুলের আদেশ বা ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আমল করিবে কেবলমাত্র সে-ই উহার পুরস্কার পাইবে। পক্ষান্তরে ছন্নিয়ার কোন মোহে বা অথ কোনও সাময়িক কারণে যত বড় নেক আমলই করা হউক না কেন, আখেরাতে উহার কোন ছওয়াব পাওয়া যাইবে না।

ইসলাম ধর্ম অতি সহজ

হযরত নবী (স:) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালায় নিকট বিশেষ পছন্দনীয় ধীন ও ধর্ম এই ধীনে-মোহাম্মদী, যাহা মধ্যে কোন প্রকার বক্ততা নাই এবং যাহা অতিশয় পবিত্র ও অতি সহজ।

৩৫। হাদীছ:— **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرُورٌ يُشَادُّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشُرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرُّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ**

অর্থ—আবু হোরাযরা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—ধীন (অর্থাৎ ধীনের বিধি-বিধান ও উহার পন্থাসমূহ) অত্যন্ত সহজ ও সরল। কিন্তু যে কোনও ব্যক্তি ধীনের সঙ্গে বাড়াবাড়ি করিবে সে পরাজিত হইবে। তাই সকলের

কর্তব্য হইবে, ঠিকভাবে দৃঢ়তার সহিত ইসলামের নির্দেশিত পথ অবলম্বন পূর্বক অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি বা বাড়াবাড়ি না করিয়া ধীরস্থির গতিতে মধ্য পন্থা অবলম্বন করিয়া চলা এবং আল্লার রহমত ও করুণার আশা পোষণ করা এবং সকাল-বিকাল ও শেষ রাত্রে নফল এবাদৎ দ্বারা (অধিক নৈকট্য লাভ ও উন্নতির পথে) সাহায্য গ্রহণ করা।

ব্যাখ্যাঃ—ইসলামের ধর্মীয় বিধানসমূহ সমষ্টিগত ভাবে অর্থাৎ প্রতিটি বিষয়ের সমস্ত ধারা ও উপধারা সমূহের সম্মিলিত ফরমূলা দৃষ্টে এই দাবী অনস্বীকার্য যে, ইসলাম ধর্মের বিধানাবলী ও পন্থাসমূহ অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সহজসাধ্য। ইহার কোনও ধারা বা বিধান এরূপ কোনও নিয়ম বা ফরমূলায় গঠিত নয় যদ্বারা কেহ কোন সময় কোন অবস্থায় অচল হইয়া পড়িতে পারে বা কোন বিধান মানুষ্যের সাধ্যের উর্দ্ধে যাইতে পারে। যেমন “নামায”—ইহার সাধারণ পন্থা ও বিধান হইল দাঁড়াইয়া পড়া, কিন্তু কেহ দুর্বল হইলে সে বসিয়া পড়িবে, আরও দুর্বল হইলে কাযা করিবে। এই কাযা আদায় করার সুযোগ না পাইয়া মরিয়া গেলে মাল দ্বারা ফিদ্যা আদায় করিবে। সেই ফিদ্যা আদায় করার মধ্যেও এরূপ সুযোগ-সুবিধার সুত্র আছে যে, উহা ধনী-গরীব কাহারও অসাধ্য হইবে না। নামাযের জন্ত “অজু” করা অপরিহার্য, কিন্তু পানি ব্যবহারে অসমর্থ হইলে মাটি, বালু বা পাথরের উপর তায়াম্মুম করিবে। সাধারণতঃ এই তিনটি বস্তু কোথাও দ্রুত হয় না। তাহাও যদি অপ্রাপ্য হয়, তখন মহম্মদ সাহ এই যে—নামাযের সময় অনুসারে বিনা অজুতেই নামাযের কার্য সমূহ সম্পাদন করিবে, পরে পানি বা তায়াম্মুমের বস্তু পাওয়া গেলে তখনকার অবস্থানুসারে ব্যবস্থাবলম্বন পূর্বক ঐ নামায কাযা পড়িবে। নামাযের জন্ত ছুরা-কেরাত পাঠ করা অপরিহার্য, কিন্তু উহা জানা না থাকিলে আপাততঃ শিক্ষা করা সাপেক্ষে শুধু “ছোবহানালা, আলহামহুলিল্লাহ” পড়িয়া নামায আদায় করিবে। এইভাবে প্রতিটি এবাদতের বিধি-ব্যবহার মধ্যেই সামর্থ্যানুযায়ী ও সহজ সাধ্য হইবার জন্ত সুযোগ সুবিধার কোনই অনটন নাই, আছে শুধু আমাদের আন্তরিকতাপূর্ণ আগ্রহের অভাব।

এবাদৎ ছাড়া “মোয়া’মালাত” অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি পাখিব ও অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত ব্যবস্থা ও বিধি-নিষেধগুলিও তজ্রপ। শরীয়তের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিয়ম কানুন, ধারা-উপধারা সম্মিলিত ফরমূলা কোন ক্ষেত্রেই অসহজ বা উন্নতি ও প্রগতির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী নহে।

অনেকে হয়ত এক্ষেত্রে ইসলামের অকাট্য বিধান “হুদ হারাম” বিষয়টি লইয়া আলোচনা করিবেন যে, ইহা ত ব্যাকিং ব্যবস্থার অন্তরায়। অথচ ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাকিং ব্যবস্থা একটি সুফলদায়ক, বরং বর্তমান যুগে বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্ত একটি অপরিহার্য মাধ্যম। তজ্রপ “ইলিওরেল বা বীমা” ব্যবস্থা; উহাও ইসলাম ও শরীয়তের বিধানে নিষিদ্ধ ও হারাম; অথচ এই ব্যবস্থাও বিপদগ্রস্ত, অনাথ এতিম-বিধবার জন্ত এবং আকস্মিক কতি-এসুদের জন্ত অত্যন্ত সহায়ক।

এই শ্রেণীর সমালোচনা বস্তুতঃ ইসলামী বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞানের স্বল্পতা প্রসূত। ব্যাঙ্কিং একটি আধুনিক ব্যবস্থা বটে, কিন্তু উহার জ্ঞান সুদপস্থা ছাড়া শরীয়তে বিকল্প ব্যবস্থা রহিয়াছে। তজ্জপ বীমা ব্যবস্থার প্রয়োজন মিটাইবার এবং উহার সুফল লাভেরও শরীয়ত সম্মত বিকল্প ব্যবস্থা রহিয়াছে। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় সুদপস্থার বিকল্প পস্থাটি সুদপস্থা অপেক্ষা এবং বীমা ব্যবস্থার বিকল্প পস্থাটি প্রচলিত হারাম পস্থা অপেক্ষা জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধনে অধিক সুফলদায়কও বটে। সংক্ষেপে একটি বিষয় অনুধাবন করুন।

দীর্ঘ দিনের ইতিহাসে দেখা যায়, পুঁজিপতিরা তথা গরীবদেরকে দারিদ্রের যাতাকলে দাবাইয়া রাখিয়া তাহাদের শ্রম এবং মধ্যবিত্তদেরকে বিভিন্ন মারপেঁয়ের চাপাকলে পৌঁচাইয়া দিয়া তাহাদের ধন শোষণ করতঃ কতিপয় লোক ধনে সম্পদে হিরাটকায় হওয়ার নীতি ভূপৃষ্ঠে আস্তানা জমাইয়া ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখা গিয়াছে যে, জনগণের সংখ্যা গরিষ্ঠ গরীব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী পুঁজিপতিদের পোষণে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে এবং ব্যক্তিগত মালিকানাকে পুঁজিপতিদের মূল মনে করিয়া উহাকে নিবিচারে খতম করিতে তাহারা গারমুখী হইয়া উঠে; ফলে যুগে যুগে দেশে দেশে ধ্বংস ও বিপর্যায় নামিয়া আসে।

ইসলাম-পূর্ব যুগেও পুঁজিপতিদের অভিশাপ ও যাতাকল চালিত ছিল, তাই ইসলাম মানবীয় কল্যাণের স্বাভাবিক কারণে ব্যক্তি-মালিকানা সমর্থন করিয়াছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমৃদ্ধ সাংসাজিক ও অর্থনৈতিক বিধি-বিধান এমনভাবে সুবিকল্পিত করিয়াছে যাহাতে কোন পথেই পুঁজিপতিদের তথা ব্যক্তি বা গোষ্ঠি ও গ্রুপবিশেষ অহুদের মাথায় কাঠাল ভাঙ্গিয়া শুধু নিজেদের ভুরি ভরার স্বযোগ না পায়। অর্থ বর্জন বা লাভের ভাগী করার ক্ষেত্রে যত দূর সম্ভব বেশী সংখ্যায় জনগণকে স্বযোগ দান করাই ইসলামের নীতি। পুঁজিপতিদের চেপ্টা হইল কায়দ-কানুন করিয়া অহুদের টাকার লাভ সম্পূর্ণ বা উহার সিংহ ভাগ গুটি কয়েক মানুষের ভোগ করা। ইসলামের বিধি-বিধান ইহার সম্পূর্ণ অন্তরায়। গব্বির কোরআন পরিস্কার বলিয়াছে—**كَيْلَا يَكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَعْيُنَاءِ** “ধন-সম্পদ যেন শুধু ধনীদের মধ্যেই কুঞ্চিত না থাকে।” বড় শোহক তথা ক্ষমতাধিকারী শাসকদের যেমন ভাতা হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের বিধানে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ইসলাম উক্ত নীতিরই বিকাশ সাধন করিয়াছে; বিস্তারিত বিবরণ সুদীর্ঘ; এখানে সেই নীতির দৃষ্টিতেই আলোচ্য বিষয়দ্বয়ের উপর আলোকপাত করা হইতেছে।

ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা :— প্রচলিত পন্থায় এই ব্যবস্থাটি পুঁজিপতিদের একটি ফন্দি ও ফাঁদ। কতিপয় ধনী তাহাদের কিছু ধন একত্রিত করিয়া বা সিন্দুক এবং টেবিল-চেয়ার লইয়া বসে। মধ্যবিত্ত লোকদের কোটি কোটি টাকা একত্রিত হইলে নিজেদের টাকার শত গুণ বেশী টাকা লোন নিয়া ব্যক্তিগত বড় বড় ব্যবসা চালায়। তজ্জপরি ব্যাঙ্কেরও বড় বড় ব্যবসায় যে বিরাট লাভ হয় উহার মাত্র সামান্য অংশ সেভিংস এবং ফিক্স-ডিপোজিটার

দেরকে দিয়া লাভের সর ও সিংহ ভাগ কতিপয় বিত্তবান ডাইরেক্টরই নিয়া যায় এবং তাহারা এক একজন লক্ষপতি ও কোটিপতি হয়, আর মূল টাকার মালিক যাহারা, তাহারা নিজেদের অবস্থার উপরই থাকে। ইহা সম্ভব হয় একমাত্র সুদীর্ঘস্থায়ী মাধ্যমে।

শরীয়তের বিকল্প ব্যবস্থা হইল এই যে, ব্যাংকের সমুদয় লোন বা লগ্নি মিল-কারখানায় ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সুদ ভিত্তিক না করিয়া সকলের ক্ষেত্রেই এমনকি ডাইরেক্টরদের লোনের ক্ষেত্রেও অংশীদার ভিত্তিক করিতে হইবে। তদুপ ব্যাংকের সকল সুত্রের আয়ের বটন কাহারও জন্ত সুদ ভিত্তিক না করিয়া অংশীদার ভিত্তিক করিতে হইবে। ডাইরেক্টরগণ, সেভিং ও ফ্রিজ-ডিপোজিটরগণ সকলে এক নির্ধারিত ফরমুলার অধীনে যথাসম্ভব বেশী সংখ্যায় কারেন্ট-একাউন্টরগণও কোম্পানী এবং লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের স্থায় অংশীদার গণ্য হইবে। কিন্তু প্রচলিত সাধারণ লিমিটেডের স্থায় নয়—যে, ডাইরেক্টরগণ বেতন-ভাতা, গাড়ী-বাড়ী ও জাকজমকের মাধ্যমে এবং কল-কৌশলে সব সর খাইবে; আর শেয়ার হোল্ডারদের জন্ত ডাইরেক্টরদের ইচ্ছাধীন রিবিট ঘোষণা করিবে। বরং প্রাইভেট লিমিটেডের স্থায় সকল অংশীদার সম সুযোগে লাভবান হইবে। ইহাকে শরীয়তের পরিভাষায় “মোজারাবা” বলা হয়।

এই পন্থায় ব্যাংকিং ব্যবস্থা জায়েয ও শুদ্ধ হয় এবং উহার লাভে অধিক সংখ্যক জনগণ লাভবান হওয়ার সুযোগ পায়। একে ত ডাইরেক্টর বা বড় বড় ব্যবসায়ী ও মিল মালিকগণ সামান্য সুদে ব্যাংকের টাকা লগ্নি নিয়া নিজেরা অধিক লাভের অধিকারী হইতে পারে না; ব্যাংকের টাকার অংশকে নিজের টাকার অংশের স্থায় লাভের অংশীদার বানাইতে হয়। দ্বিতীয়তঃ—ব্যাংকের টাকার সুযোগ-সুবিধা ও লাভের সিংহ ভাগ শুধু ২০।৫০ জন ডাইরেক্টরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না যে, তাহারা উহা দ্বারা ফুলিয়া ফাপিয়া উঠিবে, বরং উহা লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি জনসাধারণের মধ্যে সম অনুপাতে বন্টিত হইয়া থাকে।

বীমা ব্যবস্থা :—এই ব্যবস্থাটিও প্রচলিত পন্থায় পুঞ্জীভূতিত্বের আর একটি কৌশল। জনগণের টাকা কুড়াইয়া উহার ব্যবসা-বাণিজ্যের লাভ গুটী কয়েক ডাইরেক্টর ভোগ করিয়া থাকে। জনগণের টাকার লাভ গুটী কয়েক মালিকের ভোগ বিলাস যোগাইবে ইহা অনুমোদন কেন করা হইবে? জনগণের টাকার লাভ সংগ্রহ করার সুযোগের অধিকারী হইল জন-সাধারণের প্রতিষ্ঠান বাইতুল মাল—যাহার তত্ত্বাবধায়ক হইবে সরকার। সরকার সেই ব্যবসা ইত্যাদির শুধু পরিচালক হইয়া উহার লাভ বাইতুল মালের মাধ্যমে সর্ব-সাধারণের কল্যাণে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করিলেন। সেই ব্যবস্থায় বাইতুল-মালের বীমা শাখা কিস্তি ও প্রিমিয়াম দাতাদের সাহায্য ও করিবেই, এতদ্বিন্ম বীমা ব্যবস্থার উদ্ভূত লাভ যাহার দ্বারা বর্তমান পন্থায় গুটী কয়েক ডাইরেক্টর বিলাস বহুল গাড়ী-বাড়ী ভোগের সহিত লাখ লাখ কোটি কোটি টাকার পুঞ্জী করিতেছে; বাইতুল-মাল সেই লাভের টাকা এসব অনাথ

নিরাশ্রয় এতিম-বিধবাদের সাহায্য খাতে ব্যয় করিবে যাহাদের অভিভাবক জীবিত থাকাকালেও বীমার প্রিমিয়াম দানে অসমর্থ ছিল। এই হিসাবে বীমা ব্যবস্থার বর্তমান পন্থা অপেক্ষা ইসলাম অনুমোদিত পন্থা জন-কল্যাণে কত অধিক উন্নত তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই ভাবিতে পারে। বর্তমান পন্থায় অনর্থ এতিম-বিধবাদের কল্যাণ অপেক্ষা পুঞ্জিপতি ডাইরেক্টরদের কল্যাণই অধিক। পক্ষান্তরে ইসলাম অনুমোদিত পন্থায় কল্যাণের সবটুকু জনগণের মধ্যে বিতরিত, এমনকি প্রিমিয়ামদানে অসমর্থ গরীব-দুঃখী নিরাশ্রয় এতিম-বিধবাও সেই কল্যাণের ভাগী হইয়া থাকে।

অন্য নিরাশ্রয় এতিম-বিধবাদের কল্যাণ ও সহায়তায় ইসলামী বিধান এত অধিক অগ্রসর যে, উহাকে কোন কোম্পানীর উপর নির্ভরকারী রাখে নাই বা প্রিমিয়ামের টাকা জমা থাকার উপর সীমাবদ্ধ রাখে নাই। ইসলাম বিধানগত ভাবে এতিম বিধবার রক্ষণ-বেক্ষণ বাইতুল-মালের মাধ্যমে সরকারের দায়িত্ব সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছে। রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বাইতুল-মাল প্রতিষ্ঠা করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ فِئَاءً فَهُوَ لِيَّ

“কোনও ব্যক্তি ধন-সম্পত্তি রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে উহা তাহার উত্তরাধিকারীগণের জন্ত ; আমি (অর্থাৎ রাষ্ট্রের খলীফা) উহাকে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিব না। আর যদি কোনও ব্যক্তি অসহায়-নিরুপায় এতিম-বিধবা পরিবারবর্গ রাখিয়া মারা যায়, তবে আমি (অর্থাৎ রাষ্ট্রের খলীফা) তাহার ঐ অসহায় পরিবারবর্গের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিব”। ইহা কি ইসলামের অতুলনীয় সমাজ ব্যবস্থা নহে ? বিধানগত বহুমুখী আয়ের ভাণ্ডার বাইতুল-মালের মাধ্যমে এই ঘোষণার বাস্তবায়ন শুধু সম্ভবই নহে সহজও বটে। অতঃ কোন সমাজ ব্যবস্থায় এই প্রকার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার নজীর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কি ? রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরেও মোসলেম কর্ণধারগণ বহুকাল পর্যন্ত ইসলামের এই সকল মহতী পরিকল্পনাকে বাস্তবে পণিত করিয়া চলিয়াছিলেন, ইহা শুধু কাগজ-কলমের পরিকল্পনাই ছিল না।

মোসলেম সমাজ ইসলামী শিক্ষা হইতে দূরে সরিয়া অনৈসলামিক শিক্ষা ও ভাবধারায় নিমজ্জিত হইবার পর তাহাদের আত্মগৌরব ও আত্মনির্ভরশীলতা লোপ পাইয়া গিয়াছে এবং নিজেদের সহজ ও হালাল পরিকল্পনা সমূহ কার্যক্ষেত্র হইতে উধাও হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে বিজাতীয় শোষণ-নীতির অনুকরণে অসাধু উপায়ের হারাম পরিকল্পনা সমূহ প্রচলিত হইয়াছে। ইহা আমাদের কর্মের ফল। রসুলুল্লাহ (সঃ) সতর্কবাণী করিয়াছেন—যে ক্ষেত্রেই কোন সুলতান (অর্থাৎ ইসলামী রীতি) উঠিয়া যাইবে সে ক্ষেত্রে ঐ সুলতানের পরিবর্তে অতঃ একটি বেদয়াৎ (অর্থাৎ অনৈসলামী রীতি) উহার স্থলাভিষিক্ত হইবেই।

ইসলামের সামগ্রিক গ্লান-পরিষ্কারের সুদীর্ঘ ফরমুলা হইতে কোনও একটি মাত্র ধারাকে বাছিয়া লইয়া উহা কঠিন হওয়া সম্পর্কে সমালোচনা করা নিতান্তই মূর্থতা। কেননা, যেমন কোন বিশিষ্ট ফরমুলায় তৈরী মিকশার বা টনিকের পূর্ণ ফরমুলা পরিত্যাগ করতঃ কেবলমাত্র উহার দুই একটি উপাদান লইয়া ব্যবহার করিলে সেই মিকশার বা টনিকের ফল পাওয়া ও দূরের কথা, উহা অসার ও বিজ্ঞ বোধ হওয়া এবং উপকারের পরিবর্তে অপকার হওয়াই স্বাভাবিক। তেমনি ভাবে ইসলামের অর্থ নৈতিক উন্নতি ও কল্যাণে বিধায়ক পরিষ্কারের ফরমুলা হইতে শীর্ষস্থানীয় ব্যবস্থাকে পরিত্যাগ করিয়া “সুন্দ, জুয়া হারাম” এই বিধানটি তিন্ত ও কঠিন বোধ হইলে তজ্জন্ত ইসলাম দায়ী হইবে না এবং ৩৫ নম্বরে বর্ণিত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছ সমালোচনার সম্মুখীন হইবে না। সে জন্ত দায়ী ও দোষী হইবে উহারাই যাহারা ইসলামের এই সকল মহতী পরিষ্কার ও ফরমুলাকে নিজেদের ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও ইসলামী শিক্ষা হইতে বঞ্চিত থাকার ফলে অকেজো ও পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে।

নামায ঈমানের একটি বিশেষ অঙ্গ

৩৬। হাদীছ :- ছাহাবী বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনায পৌছিয়া (“কোবা” ত্যাগ করতঃ) প্রথম হইতে স্বীয় (বংশের) মাতুল সম্পর্কীয় আত্মীয়গণের মধ্যে অবস্থান করিলেন। তখন প্রথমাবস্থায় তিনি ১৬ বা ১৭ মাস পর্যন্ত বাইতুল-মোকাদ্দসের দিকে (কা’বা শরীফের বিপরীত) মুখ করিয়া নামায পড়িতেন। কিন্তু সর্বদাই তিনি কা’বা শরীফের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়ার প্রতি আকাঙ্ক্ষিত থাকিতেন। (আল্লাহ তায়ালা তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতঃ যোল বা সতর মাস পর নূতন হুকুম প্রবর্তন করিলেন যে, কা’বা শরীফের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়ুন।) এই হুকুমের পর নবী (দঃ) (স্বীয় মসজিদে) সর্বপ্রথম আছরের নামায সকলকে লইয়া কা’বা শরীফের দিকে পড়িলেন। এক ব্যক্তি (নূতন প্রণয়) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়িয়া অকস্মিক এক মহল্লার মসজিদের নিকট দিয়া যাইতেছিল, এই মসজিদের মুহল্লিগণ পূর্ব নিয়মানুযায়ী বাইতুল-মোকাদ্দসের দিকে নামায পড়িতেছিলেন। তাহারা রুকু অবস্থায় থাকাকালে এই ব্যক্তি তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিল, আমি শপথ করিয়া সাক্ষ্য দিতেছি এইমাত্র আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে মকামুখী হইয়া নামায পড়িয়া আসিয়াছি। ইহা শুনিয়া এই নামাযীগণ রুকু অবস্থায়ই মকা শরীফের দিকে ফিরিয়া গেলেন।

● মদীনার অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল ইহুদী; তাহাদের কেবলা ছিল বাইতুল-মোকাদ্দাস। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বাইতুল-মোকাদ্দসের দিকে নামায পড়ায় এতদিন তাহারা গবিত ও সন্তুষ্ট ছিল। এখন যখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি কা’বামুখী হইয়া নামায পড়ার আদেশ হইল, ইহুদিরা তাহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া নানা

প্রকার অথবা প্রশ্নাবলীর অবতারণা আরম্ভ করিয়া ছিল। (কিন্তু পূর্বাচ্ছেই আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে এই সকল প্রশ্নকারীদিগকে জ্ঞানশূন্য বোকা আখ্যায়িত করিয়া তাহাদের অথবা প্রশ্নাবলী সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং উহার উত্তর দান করিয়াছিলেন*)।

ছাহাবীগণের মধ্যে কয়েকজন এই নূতন প্রথা প্রবর্তন হইবার পূর্বেই বাইতুল-মোকাদ্দছ মুখী হইয়া নামায পড়াকালে হুত্বামুখে পতিত হইয়াছিলেন। তাহাদের সম্পর্কে ছাহাবীদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হইল যে, (তাহারা শুধু অস্থায়ী কেবলার দিকে মুখ করিয়াই নামায পড়িয়া গিয়াছেন, স্থায়ী কেবলা লাভের সুযোগ তাহারা পান নাই, সুতরাং) তাহাদের অবস্থা কিরূপ হইবে। তখন এই আশ্রিত নাযেল হয়—**وَمَا كَانَ لِلَّهِ لِيُفْضِيَ عَ أَيِّمَانِكُمْ**—“আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ঈমানকে নষ্ট করিবেন না”। (২ পারা ১ রুকু)

ব্যাখ্যা ৩:— বাহ্যতঃ এই আয়াতে “ঈমান” শব্দটির উদ্দেশ্য নামায। কারণ নামায সম্পর্কীয় একটা ভাবনা খণ্ডনেই এই আয়াত নাযেল হয়। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, নামায ঈমানের একটি এমনই অপরিহার্য অঙ্গ যে, কোরআন শরীফে নামাযকে সরাসরি ঈমান বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। তবে প্রকাশ্যে নামায শব্দের পরিবর্তে ঈমান শব্দ ব্যবহার করারও একটি নিগূঢ় তত্ত্ব রহিয়াছে, তাহা এই যে, বাইতুল-মোকাদ্দসমুখী হইয়া নামায পড়ার আদেশ থাকাকালীন যাহারা সেই দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িয়াছিলেন, তাহারা একমাত্র ঈমান তাকিদে তথা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হওয়ার দরুনই তাহার আদেশানুযায়ী এই করিয়াছিলেন। তাহাদের এই নামাযকে যদি বরবাদ ও বিফল গণ্য করা হয়, তবে প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের ঈমানকেই বিফল গণ্য করা হইবে। কারণ, তাহারা এই সময় একমাত্র আল্লাহ ও তাহার আদেশের প্রতি ঈমানের অমুরাগেই বাইতুল-মোকাদ্দসমুখী হইয়া নামায পড়িয়াছিলেন। এই বিষয়টি বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই উক্ত আয়াত নাযেল হয় যে—তাহাদের এই নামাযকে বিফল সাব্যস্ত করার অর্থ প্রকারান্তরে তাহাদের ঈমানকেই বিফল গণ্য করা হইবে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কখনও তোমাদের (মোসলমানদের) ঈমানকে বিফল ও নিরর্থক করিবেন না।

• কোরআন শরীফের দ্বিতীয় পারা এই বিষয়েই আরম্ভ হয়। আল্লাহ বলেন—“অচিরেই যখন কেবলা পরিবর্তনের আদেশ আসিবে, তখন একদল নির্বোধ লোক এই প্রশ্ন করিবে যে, কোন্ জিনিস মোসলমানদের কেবলার পরিবর্তন সাধন করিল? আপনি বলিয়া দিন—(আল্লাহর আদেশই এই পরিবর্তনের একমাত্র কারণ। ইহার উপর আর কোনও প্রশ্ন আসিতে পারে না। কারণ) সকল দিকের মালিকই একমাত্র আল্লাহ; (তিনি যখন যে দিক্কে ইচ্ছা কেবলা নির্দিষ্ট করিতে পারেন, তাহাতে কাহারও কোনরূপ প্রশ্নের অধিকার নাই। এইভাবে কতৃৎ ও ক্ষমতা-স্বত্বের উত্তর দানের পর নিগূঢ় রহস্যময় উত্তর দিয়া) আল্লাহ আরও বলেন—“কেবলা পরিবর্তন আদেশের মাধ্যমে আসি দেখিতে চাই, কোন্ ব্যক্তি (স্বীয় পূর্ব প্রথার ব্যতিক্রম দেখিয়া) রসুলের (দঃ) অমুরাগ হইতে ফিরিয়া দাঁড়ায়। ইহার দ্বারাই প্রমাণ হইবে যে—কোন ব্যক্তি আল্লাহ ও রসুলের (দঃ) আদেশের অমুসারী এবং কোন ব্যক্তি কেবলমাত্র রীতি ও প্রথার অমুরাগী”।

খাঁটি ইসলামের উপকারিতা

৩৭। হাদীছঃ— سَمِعَ أَبُو سَعِيدٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَكَسَنَ إِسْلَامَهُ يَكْفِرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَّهَا وَكَانَ
بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْكَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ وَالسَّيِّئَةُ
بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَبَّأَ وَزَالَ اللَّهُ عَنْهَا -

অর্থঃ—আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন, কোন মানুষ যখন ইসলাম কবুল করে এবং তাহার ইসলাম-গ্রহণ খাঁটি ও পূর্ণাঙ্গ হয়, তখন আল্লাহ তায়ালা তাহার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেন। পূর্বের হিসাব পরিষ্কার হওয়ার পরমুহূর্ত (তথা ইসলাম গ্রহণের পর) হইতে তাহার জন্ত কার্যানুপাতিক প্রতিফল এই হিসাবে দান করা হয় যে, নেক কার্যে এক-এর পরিবর্তে দশ হইতে সাত শত গুণ পর্য্যন্ত এবং গোনাহের কাছে সমান সমান (এক-এর পরিবর্তে একই) প্রতিফল দান করা হয়। কিন্তু যদি আল্লাহ তাহার গুনাহ মাফ করিয়া দেন, (তবে উহার কোনই প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে না)।

৩৮। হাদীছঃ— عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلَّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا
إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ وَكُلَّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا -

অর্থঃ—আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ খাঁটি ও পূর্ণাঙ্গ হইবে, তাহার প্রতিটি নেক আমলের ছওয়াব দশ হইতে সাত শত গুণ পর্য্যন্ত লেখা হইবে এবং গোনাহের কাছে সমান গোনাহ হইবে।

আল্লাহর নিকট ঐ পরিমাণ আমল অধিক পছন্দনীয়

যাহা সর্বদা পালন করা যায়।

৩৯। হাদীছঃ—একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আয়েশা রাজিয়ারাহু আনহার গৃহে আসিয়া দেখিলেন, তথায় অত্র একটি মহিলা বসিয়া আছে। নবী (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মহিলাটি কে? আয়েশা (রাঃ) তাহার পরিচয় বলার সঙ্গে ইহাও বলিলেন, এই মহিলাটি রাত্রিভর তাহাজ্জুদ নামায পড়েন—নিদ্রা যান না। ইহা শুনিয়া

নবী (স:) বলিলেন—এরূপ করা ভাল নয়; তোমরা এই পরিমাণ আমল অবলম্বন করিবে, যাহা সদা সর্বদা পালন করিতে পার। তিনি শপথ করিয়া ইহাও বলিলেন যে, (তোমরা বেশী পরিমাণ আমল করিলে) অবশ্য আল্লাহ তায়ালা ছওয়াব দান করিতে ক্লান্ত বা কুণ্ঠিত হইবেন না, কিন্তু (অবশেষে) তোমরাই ক্লান্ত হইয়া ঐ আমল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবে। যে পরিমাণ আমলকে সর্বদা বজায় রাখিয়া চলা যায় উহাই আল্লাহ নিকট অধিক পছন্দনীয়।

ব্যাখ্যা:—আল্লাহ তায়ালা নৈকট্য লাভের জন্ত কোরআন শরীফ তেলাওয়াত, আল্লাহ জিকর-তছবীহ, নফল নামায-রোযা ইত্যাদি কিছু আমল অজিফা তথা সর্বদার অভ্যাসরূপে অবলম্বন করা আবশ্যক এবং উহা এই পরিমাণ অবলম্বন করা ভাল, যাহা যৌবনে ও বৃদ্ধাবস্থায়—সব সময়েই বজায় রাখা সহজ হয়। অতি মাত্রার এবাদত স্বভাবতঃই ক্লান্তি বশতঃ কিছুদিন পরে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হওয়া নিশ্চিত। সুতরাং অধিক মাত্রায় অস্থায়ী এবাদৎ অপেক্ষা অল্প মাত্রায় স্থায়ী এবাদৎ অধিক পছন্দনীয়। কারণ, শেষফলে ইহারই পরিমাণ বেশী দাঁড়াইবে। কচ্ছপ ও খড়গোসের প্রতিযোগিতার গল্প লক্ষ্যণীয়।

আমলের পরিপ্রেক্ষিতে ঈমানের মাত্রা কম-বেশী হয়

৪০। হাদীছ:—আনাছ (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—“গোওয়াহুহেদ” বা মোমেনদের মধ্যে (যাহারা পাপী এবং পাপের শাস্তি ভোগে যাহাদিগকে দোষখে যাইতে হইয়াজে, তাহাদের মধ্য হইতে শাস্তি ভোগ করার পর) সর্ব প্রথম ঐ ব্যক্তিকে দোষখ হইতে বাহির করা হইবে যাহার অন্তরে যবের দানা পরিমাণ ঈমানের অস্তিত্ব থাকিবে। তারপর যাহার অন্তরে গমের দানা পরিমাণ ঈমান থাকিবে। তারপর যাহার অন্তরে চীনার দানা পরিমাণ বা অণু পরিমাণ ঈমান মণ্ডলুদ থাকিবে।

পাঠকবর্গ। উল্লেখিত বর্ণনার লোভেরা সকলেই একমুখবাদী মোমেন, অথচ তাহাদের ঈমানের পরিমাণ পরস্পর কম-বেশী দেখা যাইতেছে। ইহা শুধু তাহাদের আমলের কম-বেশীর দরুনই হইবে।

৪১। হাদীছ:—একদা এক ইহুদী ব্যক্তি খলীফা ওমর (রা:)কে বলিল, আপনাদের কোরআনের মধ্যে (মোসলেম জাতির জন্ত অতি বড় সুসংবাদের) একটি আয়াত রহিয়াছে। আমাদের ইহুদী জাতির জন্ত যদি ঐরূপ একটি আয়াত নাযেল হইত তবে আমরা ঐ (সুসংবাদের) দিনটিকে (চিরস্মরণীয় করার জন্ত) ঈদের দিন বানাইতাম। ওমর (রা:) জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কোন্ আয়াত? ইহুদী বলিল—

أَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“হে মানব জাতি! আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন ও ধর্মকে পরিপূর্ণ করিয়া দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত* সম্পূর্ণ করিয়া দিলাম, আর আমি তোমাদের জন্য একমাত্র ইসলামকেই দীন ও ধর্মরূপে পছন্দ ও মনোনীত করিলাম। (৬ পাঃ ৫ রূঃ)

ওমর (রাঃ) বলিলেন—কোন দিন কোন স্থানে এই আয়াতটি নাযেল হইয়াছিল তাহা আমরা ঠিক ঠিক রূপে জানিয়া রাখিয়াছি। (বিদায় হজ্জ) রসুলুল্লাহ (দঃ) আরাফার ময়দানে উপবিষ্ট থাকাবস্থায় জুম্মা'র দিন এই আয়াতটি নাযেল হইয়াছিল। (অর্থাৎ এই আয়াত নাযেল হওয়ার দিনটি আমাদের ধর্মে পূর্ব হইতেই দুই ঈদ-বিশিষ্ট ১০ দিনরূপে নির্দিষ্ট রহিয়াছে, সুতরাং নূতনভাবে ঐ দিনকে ঈদের দিনে পরিণত করার প্রয়োজন আমাদের নাই।

● উল্লিখিত আয়াতটির দ্বারা স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হইল যে, শরীয়তের হুকুম-আহকাম আদেশ-নিষেধাবলী সম্পূর্ণ করাকেই দীন সম্পূর্ণ করা বলা হইয়াছে। সুতরাং ইহার মধ্যে যাহার যতটুকু ক্রটি থাকিবে তাহার দীনও ততটুকু অসম্পূর্ণ থাকিবে এবং যাহার মধ্যে ঐ হুকুম-আহকাম যে পরিমাণে পূর্ণ হইবে তাহার দীনও সেই পরিমাণে উর্দ্ধে উঠিবে—ততটুকু পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে।

যাকাত দান করা ইসলামের একটি অঙ্গ

৪২। হাদীছ :-তালহা ইবনে ওবাইহুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা নজদবাসী জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন। সুদূর প্রান্ত হইতে ছফর করিয়া আসায় তাঁহার মাথার চুল এলোমেলো অবস্থায় ছিল। তিনি বিড় বিড় করিয়া কিছু বলিতেছিলেন। আমরা শুধু বিড় বিড় শব্দই শুনিতেছিলাম, কিন্তু কোন কিছুই বুঝিতেছিলাম না যে, তিনি কি বলিতেছেন। নিকটবর্তী হইলে পর বুঝা গেল, তিনি ইসলামের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, ইসলামের অঙ্গ কি কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, রাত্র-দিন চব্বিশ ঘণ্টায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া। আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন, ইসলামের অঙ্গ হিসাবে আমার যিদ্দায় এই পাঁচ ওয়াক্তের অতিরিক্ত আরও কোন ফরয নামায আছে কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—না। অবশ্য ফরয না থাকা সত্ত্বেও যদি আপনি ইচ্ছা করিয়া অতিরিক্ত কিছু নামায পড়েন (তবে উহা ইসলামের অঙ্গই হইবে বটে, কিন্তু ফরয অঙ্গ নহে, বরং নফল অঙ্গ)। তৎপর রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন এবং

* এখানে “নেয়ামত” শব্দ দ্বারা দীন-ইসলামকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মাধ্যমে দীর্ঘ তেইশ বৎসর ব্যাপী ইসলামের সমস্ত আহকাম বিস্তারিতভাবে শিক্ষাদান করিয়া এবং মক্কা তথা সমগ্র আরব জাহানকে মোসলমানদের করতলগত করিয়া দিয়া বশ্ততঃ আল্লাহ তায়ালা জাহেবী ও বাতেনী (ভিতর বাহির) দুইদিক দিয়াই তাঁহার একমাত্র মনোনীত দীন-ইসলামকে সম্পূর্ণতা দান করতঃ মোসলেম জাতির উপর অতি বড় কৃপাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

† শুক্রবার সাপ্তাহিক ঈদ আর ৯ই জিলহজ্জ দিনটি মহান হজ্জের আসল দিন এবং এই দিনটিই ঈদুল-আজহার প্রকৃত মূল যাহা পরবর্তী দিনে উদ্‌যাপিত হয়।

পূর্ণ রমজান মাসের রোযা রাখা (ইহাও ইসলামের একটি ফরয অঙ্গ)। আগন্তুক পুনরায় তদ্রূপই জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা ব্যতীত অত্ৰ কোনও রোযা আমার উপর ফরয আছে কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—না। অবশ্য আপনি যদি ইচ্ছা করিয়া নিজ খুশিতে অতিরিক্ত কিছু রোযা রাখেন (তবে উহা ইসলামেরই নফল অঙ্গ হইবে)। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে যাকাতের বিষয়ে বলিলেন। আগন্তুক এবারও ঐরূপ প্রশ্ন করিলেন যে, যাকাতের ব্যাপারে আমার উপর অত্ৰ আর কিছু ফরয আছে কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—না। অবশ্য আপনি যদি নিজের খুশিতে ও আগ্রহভরে দান-খয়রাত করেন (তবে উহা ইসলামের নফল অঙ্গ স্বরূপ হইবে।) অতঃপর ঐ ব্যক্তি এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন যে, কসম খোদার—আমি এ সন্দের মধ্যে একটুকুও বেশ-কম করিব না; (পূর্ণ মাত্রায় ঠিক ঠিক রূপে এই সকল আহকাম আদায় করিব।) রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যদি সে তাহার কথার উপর অটল থাকে, তাহা হইলে তাহার নাজাত অনিবার্য এবং তাহার জীবন নিশ্চিতরূপে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

জানাযার সৎকারে* যোগদান করা ঈমানের একটি অঙ্গ

৪৩। হাদীছঃ— عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَيُفْرِغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحْدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيْرَاطٍ.

অর্থঃ—আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি ঈমানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া ও ছওয়াবের আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া কোনও মোসলমানের জানাযার সহগামী হইবে এবং জানাযার নামায ও দাফন কার্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সঙ্গেই থাকিবে, সে ব্যক্তি দুই “কীরাত” ছওয়াব —প্রত্যেক “কীরাত” ওহেদ পাহাড় সমান, হাসিল করিয়া বাড়ী ফিরিবে। আর যে ব্যক্তি দাফন কার্য সমাধার পূর্বেই শুধু নামায পড়িয়া চলিয়া আসিবে সে এক “কীরাত” পরিমাণ ছওয়াব লাভ করিবে।

এই হাদীছটি আয়েশা (রাঃ) নবী (দঃ) হইতে শুনিয়াছেন। এই হাদীছ শ্রবণে আবছলামাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, পূর্বে আমি বহু সংখ্যক কীরাত ছওয়াব

* মোসলমান মৃতের গোছল দেওয়া, কাফনের কার্য সমাধা করা এবং জানাযার নামায পড়িয়া শবদেহ বহন করিয়া গোরস্থানে লইয়া যাওয়া তারপর দাফন কার্য সমাধা করা সবই ইহার অন্তর্ভুক্ত।

হেলায় হারাইয়াছি। তিনি উক্ত হাদীছ জ্ঞাত হওয়ার পূর্বে অনেক সময় দাফনে শামিল না থাকিয়া শুধু জানাযার নামায পড়িয়াই চলিয়া আসিতেন। (১৭৭ পৃঃ)

পরবর্তী পরিচ্ছেদ সম্পর্কে ভূমিকা :

ইসলাম ও ঈমানের উন্নতির দিক একটি হইল জাহেদী বা স্থল উন্নতি, অপরটি হইল বাতেনী বা আধ্যাত্মিক উন্নতি।

স্থল উন্নতিগুলি মোটামুটি এই—(১) দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা অনুষ্ঠিত কতকগুলি আমল, (২) বাক্যে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন স্বীকারোক্তি এবং (৩) অন্তরের কতিপয় বিশ্বাস।

প্রকৃত প্রস্তাবে ঈমানের এই স্থল দিকটা নিতান্তই সীমাবদ্ধ। কারণ, মানুষের দেহ ও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং দৈহিক শক্তিসমূহ সবই আদি ও অন্ত উভয় দিক হইতেই সীমাবদ্ধ। তাই উহা দ্বারা সংঘটিত আমল সমূহও নেহাং সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে মানুষের নিরাকার আত্মা যদিও আদির দিক হইতে সীমাবদ্ধ, কিন্তু অন্তের দিক হইতে উহা অসীম অক্ষয় অব্যয় এবং অনর। মানুষের এই অদৃশ্য নিরাকার অসীম ও অমর আত্মার ক্রিয়াও দুই প্রকার। সীমাবদ্ধ এবং সীমাহীন। সীমাবদ্ধ প্রকার ক্রিয়া হইল—কতিপয় প্রকৃত সত্যের প্রতি অকাট্যরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া জীবন যাত্রা আরম্ভ করা। ইসলাম মানুষকে কতিপয় প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিয়া সেই সত্যগুলিকে অবিচলিতরূপে বিশ্বাস করার নির্দেশ দিয়াছে। যথা—(১) আল্লাহ একজন আছেন—তিনি সর্বশক্তিমান, সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, পানাহার দাতা, বিধানকর্তা ও বিচারকর্তা প্রভৃতি মহৎ গুণাবলীর সহিত আল্লাহ অস্তিত্বে ও একত্বে অটলরূপে বিশ্বাসী হইতে হইবে।

তদুপরি মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সংপথ প্রদর্শনের জন্ত নিষ্পাপ ফেরেশতার দ্বারা নিভুল কিতাব (কোরআন শরীফ) নিষ্পাপ রসুলের মাধ্যমে বিশ্ব-মানবের প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন এবং নিষ্পাপ রসুল স্বীয় ব্যবহারিক জীবনের কার্যাবলীর দ্বারা সেই কিতাবের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া নিভুল আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তাই (২) আল্লাহ কিতাব, (৩) আল্লাহ ফেরেশতা এবং (৪) আল্লাহ রসুল ও তাঁহার আদর্শের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অক্ষম অচেতন জড় পদার্থরূপে সৃষ্টি করেন নাই, বরং তাহাকে পরিমাণ মত ইচ্ছাশক্তি এবং কর্মশক্তি দান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব, মানুষ তাহার লক্ষশক্তি সমূহের সদ্যবহার করিয়াছে কি অসদ্যবহার করিয়াছে, ইহার হিসাব লওয়ার জন্ত একটি সময়ও ধার্য করিয়া রাখিয়াছেন, উহাকেই বলা হয় আখেরাত বা পরকাল। সেই হিসাব-পরীক্ষায় কৃতকার্য হইলে তাহাকে বেহেশত দান করিয়া পুরস্কৃত করা হইবে এবং অকৃতকার্য প্রমাণিত হইলে দোষে শাস্তি দেওয়া হইবে। তাই (৫) আখেরাতের হিসাব-নিকাশ এবং (৬) বেহেশত-দোষথের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উপরোক্ত ছয়টি বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা যদিও মানুষের আত্মা সম্পর্কিত ক্রিয়া বটে, কিন্তু এসবই উহার প্রাথমিক ও সীমাবদ্ধ ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এই সকল প্রাথমিক অনুষ্ঠানাদি ও বিশ্বাস সমূহের দ্বারা মানুষ তাহার জীবন সাত্রা আরম্ভ করিবে মাত্র। সুতরাং এই সকল বিশ্বাসের মধ্যে বিন্দুমাত্র শিথিলতা বা নড়চড় হইলে তাহার সামগ্রিক জীবন সৌধেরই ভিত্তিহীন নড়চড় হইয়া পড়িবে। ফলে সে তাহার ইসলামী জীবনের ইমারত রচনায় অগ্রসর হইতে কিম্বা উহার সাধনা কঠিতে সক্ষম হইবে না।

এ পর্য্যন্ত আলোচনার দ্বারা স্পষ্টতঃই বুঝা গেল যে—ইসলাম ও ঈমানের স্থূল উন্নতির মোটামুটি যে তিনটি বিষয়বস্তু রহিয়াছে, উহার প্রথম ও দ্বিতীয়টি বাহ্যিক অঙ্গ সম্পর্কিত ক্রিয়া হওয়া বিধায় যেমন সীমাবদ্ধ, তদ্রূপ তৃতীয় বিষয়টি আত্মার ক্রিয়া হওয়া সত্ত্বেও উহা সীমাবদ্ধ এবং শুধু প্রাথমিক ক্রিয়া মাত্র।

ইহার পরেই আরম্ভ হয় মানুষের অসীম আত্মার সীমাহীন উন্নতির পর্য্যায় এবং উহাকেই বলা হয়, ইসলাম ও ঈমানের বাস্তব বা আধ্যাত্মিক উন্নতি। এই পর্য্যায়ের উন্নতির দিকটা অতিশয় বিস্তীর্ণ ও বিগল, শুধু বিশালই নহে বরং সীমাহীনও। এই অকৃত্রিম প্রধান বস্তু হইতেছে—আল্লাহর খাঁচী প্রশংসা বা প্রেম। এ সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালাই পবিত্র কোরআনে বলেন—**وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ** অর্থাৎ—“প্রকৃত ও পূর্ণ ঈমানদার যাহারা তাহার খাঁচীভাবে আল্লাহর প্রেমিক হইয়া থাকেন” (১ পাঃ ৩ রঃ)।

এরূপ প্রেমিক তাহার যে, আল্লাহর প্রেমের সঙ্গে অল্প প্রেমের মিশ্রণ বা ভেজাল তাহাদের অন্তরে মোটেই নাই। কিন্তু যে পর্য্যন্ত প্রেমের একনিষ্ঠতা প্রমাণিত না হইবে ততক্ষণ প্রেমকে খাঁচী বলা যাইতে পারে না; একনিষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গে অকৃত্রিম আনুগত্যেরও বিশেষ দরকার। ঈমানের স্থূল উন্নতির বিষয়বস্তুগুলির ভিতর দিয়াই সেই একনিষ্ঠতা ও অকৃত্রিম আনুগত্যের বিকাশ হইয়া থাকে। যথা—নামায (ভজন), রোযা (সংযম সাধনা), যাকাত (জন-সেবা), হজ্জ (আল্লাহর নির্দ্দারিত ক্ষেত্রে সকলে সমবেত ভাবে কেন্দ্রীভূত হইয়া আল্লাহর আনুগত্যের এবং প্রেমের পরিচয় দেওয়া), জেহাদ (আল্লাহর হুকুমত কায়ম করার ক্ষমতা জ্ঞান-মাল কোরবান করা) ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু যদি এই সবের ভিতর দিয়া প্রেমিকের অন্তরে এরূপ আত্মতৃপ্তি, এতটা অহমিকতা আসিয়া যায় যে—সে স্বীয় কার্যকলাপের দ্বারা এরূপ নিষ্টিপ্ত ও নিশ্চিন্ত হইতে পারে যে, তাহার অন্তরে প্রেমোপ্সদের অস্তিত্বের কোন ভয়ই আর উদ্ভিত হয় না, অথবা প্রেমোপ্সদের তরফ হইতে তাহার সম্ভটির নিদর্শন স্বরূপ পুরস্কারের প্রতি ঐকান্তিক আসক্তি ও অদম্য স্পৃহা জন্মে না, তবে সেই প্রেম কখনও প্রকৃত একনিষ্ঠ খাঁচী প্রেম নহে, বরং উহা কৃত্রিম এবং নামে মাত্র প্রেম বলিয়াই গণ্য হইবে। খাঁচী প্রেমের অধিকারী এবং প্রকৃত প্রেমিক হইতেছে ঐ ব্যক্তি যে প্রেমোপ্সদের সম্ভাব্য বিধানের জগৎ অকাতরে সব কিছু করিয়াও এক পলকের ভয়েও

তাঁহার অসন্তুষ্টির ভীতি হইতে নিশ্চিন্ত অথবা নিলিপ্ত হইতে পারে না। কারণ, খাঁচী প্রেমের তেজস্ক্রিয়া এতই তীব্র যে, উহার গ্রাসে সর্বস্ব উৎসর্গ করিয়াও আত্মতৃপ্তি লাভ হইতে পারে না। তাই প্রেমিকের মনে সদা সর্বদা অসম্পূর্ণতাবোধ এবং যথোপযুক্তরূপে প্রেমাপ্পদের জন্ত হক আদায় না করিতে পারার চিন্তাই অনুক্ষণ জাগরিত হইতে থাকে। এই বিষয়টি আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফেও এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ -

অর্থাৎ—খাঁচী ও পূর্ণাঙ্গ ঈমানদারদের অবস্থা এই যে, তাঁহারা আল্লাহর কাজ করিয়া কখনই গণিত হন না আত্মশ্লাঘাও অনুভব করেন না, বরং সর্বদাই তাঁহারা বিনয় ও নম্রতায় জড়সড় এবং ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকেন এই ভাবিয়া যে, আল্লাহর কার্যের যথাযোগ্য হক আমার দ্বারা আদায় হইল কি না। তাঁহারা আল্লাহর রাস্তায় যথাসাধ্য দান করেন, সাধ্যানুসারে আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালন করেন এবং যথোচিতরূপে এবাদত-বন্দেগীও করিয়া থাকেন, কিন্তু এতদসঙ্গেও তাঁহাদের অন্তরাত্মা ভয়ে কঁপিতে থাকে এই ভাবিয়া যে, তাহাদিগকে একদিন স্বীয় প্রভুর দরবারে হাজির হইতে হইবে ও স্বীয় কৃতকর্মের জন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জওয়াবদেহী করিতে হইবে। না-জানি সেখানে কোন বিষয়ে কোন গোপন সূক্ষ্ম ত্রুটির কারণে বা কোন সূক্ষ্মতম উপধারা লজ্জনের দ্বায়ে দোষী সাব্যস্ত হইতে হয় না কি। (১৮ পাঃ ৪ কঃ)

প্রকৃত প্রস্তাবে খাঁহারা আধ্যাত্মিক দিক দিয়া উন্নতি লাভ করিয়া চলেন, তাঁহারা কখনই স্বীয় কৃতকার্যতার দিকে তথা পিছপানে ফিরিয়া তাকাইবার ফুরছত বা স্বেযোগই পান না। তাঁহাদের দৃষ্টি সর্বদা উন্নতির দিকে তথা উর্দ্ধ দিকে এবং সম্মুখ পানেই নিবদ্ধ থাকে। প্রেমাপ্পদের অসন্তুষ্টির ভীতি ও প্রেমপাত্রের সন্তুষ্টির কামনা, বাসনা ও স্পৃহা লইয়া তাঁহারা সর্বদা উন্নতির ময়দানে সম্মুখ পানে ধাবিত হইতে থাকেন। এ সম্পর্কে কোরআন শরীফে ছুরা আশ্বিয়াতে তের জন পয়গাম্বরের সাধনাময় জীবন-কাহিনী বর্ণনা করিয়া তাঁহাদের বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا - وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

অর্থাৎ “তাঁহারা (পূর্বোল্লিখিত নবীগণ) সকলেই নেক কার্যাবলীর প্রতি অত্যন্ত আগ্রহশীল ও উৎসাহী ছিলেন এবং সৎকার্যাদি যথাসাধ্য শীঘ্র সমাধা করার জন্ত আজীবন অতি মাত্রায় ব্যস্ত থাকিতেন এবং তাঁহারা আমার ভয় অন্তরে পোষণ করিয়া ও আমার হওয়াবের (পুরস্কার দানের) প্রতি লালায়িত থাকিয়া আমার এবাদত-বন্দেগীতে সদা-নিরত থাকিতেন এবং আমার নিকট ভয়াতুর, সদাবিনয়ী, অহমবঞ্চিত ও বিনম্র থাকিতেন।”

ইহাই হইতেছে খাঁচী প্রেম তথা আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই উন্নতির ক্ষেত্র অতি বিশাল, শুধু বিশালই নহে বরং সীমাহীন; ইহার কুল-কিনারা নাই। কারণ, ইহার মূল বস্তু হইল এশক বা প্রেম। আর এশক ও প্রেম সকল প্রকার রূপ রেখা এবং ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে এমনই এক বস্তু, যাহার কোনই সীমা পরিসীমা নাই, কুল নাই কিনারাও নাই।

খাঁচী প্রেমিকদের উৎসাহ, উত্তম, কার্য্য-প্রণালী ও চিন্তাধারা সাধারণ লোকের চেয়ে অনেক উর্কে, যাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অল্প কেহ অনুভব ও অনুমান করিতে পারে না। তাঁহাদের অনুভূতি অতিশয় তীক্ষ্ণ ও গভীর হইয়া থাকে। যেমন, একদা কোনও এক প্রেমিক ব্যক্তি রাত্রিকালে নিজা উপভোগ করিতেছিল। গভীর রাত্রে একটি কপোতের ক্রন্দন শূরে হঠাৎ তাহার নিজা ভঙ্গ হইল; তখন সে ভীষণ অনুতপ্ত হইয়া আক্ষেপের শূরে বলিল—

لقد هتفت فى جنح ليل حمامة — على فنى وهذا رانى لنائم
وازعم انى هائم ذوصباغة — بسعدى ولا ابكى وتبكى الحمام
كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا — لما سيقننى بالبقاء الحمام

অর্থাৎ—“গভীর রাত্রে এই কপোতটি গাছের ডালে বসিয়া তাহার প্রেমাস্পদের বিচ্ছেদ যাতনার কাদিতেছে, আমি নিজার কোলে অচেতন! আমি প্রেমিক বলিয়া দাবী করি, অথচ প্রেমাস্পদের জন্ত আমার ক্রন্দন নাই, কিন্তু কপোত ক্রন্দন রত? খোদার কসম! নিশ্চয়ই আমি কপট ও কৃত্রিম, নতুবা কপোত আমার আগে কাদিতে সক্ষম হইত না।”

খাঁচী প্রেমিক তথা আধ্যাত্মিক উন্নতিকামীগণ সন্মুখে উন্নতির বিশাল সমুদ্র দৃষ্টে নিজেদের অকিঞ্চিৎকর সাধনা ও সিদ্ধির প্রতি লক্ষ্য করিয়া এরূপ ধারণা পোষণ করিতে থাকেন যে—আমিত এখনও কিছুই করিতে পারি নাই। কারণ, বিশাল সমুদ্রের তুলনায় লক্ষ লক্ষ মণ পানিও বিন্দুবৎ নগণ্যই মনে হইয়া থাকে। তাই তাঁহারা ভাবেন যে, আমিত এখনও বিন্দু পরিমিত উন্নতিও হাসিল করিতে পারি নাই। আমার কার্য্যক্রম অত্যন্ত নগণ্য, অথচ আমি মোমেন তথা আল্লার প্রেমিক বলিয়া দাবী করিয়া থাকি। দেখা যায়, আমার কাজের চেয়ে কথা অনেক বেশী ও বড়। সুতরাং তাঁহারা অনেক সময় এরূপ বলিয়াও ফেলেন যে, আমি মোনাফেক (কপটচার)-এর পর্য্যায়ভুক্ত বটে। এমনকি, এ-পর্য্যায়ের ভয়-ভীতির নিকট পরাজিত হইয়া অনেক কাঁচা বয়সের প্রেমিকগণ আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়া বসেন। কিন্তু পাকা বয়সের প্রেমিকগণ ঐ ভয়-ভীতির নিকট এরূপ শোচনীয় ভাবে পরাজিত হন না, বরং তাঁহারা চেষ্টা ও সাধনার ময়দানে অতি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে থাকেন। তাঁহারা কোথাও থামেন না, তাঁহাদের জেহাদ মোজাহাদা ত্যাগ তিতীক্ষা ও সাধনা দ্বারা হয় না, অবিরাম গতিতে চলিতেই থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও রূহানী শক্তি ক্রমাশয়ে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মাওলানা রুমী ইহার প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন—

اے برادر بے نہایت درگھیزست — هرچه بروے می رسی بروے مایست

“হে ভাতা! খাঁচী প্রেম তথা আধ্যাত্মিক উন্নতির ময়দান অতি বিশাল ও সীমাহীন—
উহার কুল কিনারা নাই। যতটুকু অগ্রসর হইতে পার, হইতে থাক; কোথাও ক্ষান্ত হইও না।”

ইমাম বোখারী (র:) প্রথমে ঈমানের অনেকগুলি ছোট বড় অঙ্গ বা শাখা প্রশাখা বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—নামায, রোযা, যাকাৎ, হজ্জ প্রভৃতি এবং লাইলাতুল-কদরের এবাদৎ, তারাবীর নামায ও জানাযার সংকারে যোগদান করা ইত্যাদি। এ সবই সীমা নির্দ্ধারিত ও নির্দিষ্ট আইন-কানুন পর্য্যায়ের বিষয়াবলী। এ সবের দ্বারা প্রথম দিক—অর্থাৎ ঈমানের স্থূল বা বাহ্যেরী উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। নিজের পরিচ্ছেদ ও শিরোনামায় ইমাম বোখারী (র:) দ্বিতীয় দিক—অর্থাৎ ইসলাম ও ঈমানের আধ্যাত্মিক উন্নতির সন্ধান দিতেছেন এবং বড় বড় আল্লাহওয়ালারা—বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিভিন্ন মূল্যবান উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এখানে প্রমাণ করিতেছেন যে—তাহারা কত খাঁচী প্রেমিক ছিলেন। মাণ্ডকে-হাকীকী বা প্রকৃত প্রেমাস্পদ আল্লার প্রেম তাঁহাদের অন্তরে কত অধিক গাঢ় ছিল এবং একমাত্র সেই প্রেমের কারণেই তাঁহাদের মধ্য হইতে সকল প্রকারের গর্ব ও অহমিকা সম্পূর্ণরূপে নিষ্টিত হইয়া তাঁহাদের অন্তরে আল্লার ভয়-ভীতি কত প্রবল ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত ছিল।

আল্লার মহব্বৎ এবং তদ্রূপন আতঙ্ক যে, অজ্ঞাতে নেক আমল

বরনাদ হইয়া যায় নাকি! ইহা ঈমানের অঙ্গ :

ইব্রাহীম তাইমী (র:)† বলিয়াছেন—আমি যখনই আমার কথাকে (মোমেন হওয়ার দাবী) আমার আমলের সহিত তুলনা করিয়া দেখি, তখনই আমার মনে হয় যে, আমি মোনাকেক শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইয়া যাই নাকি। কারণ, আমি স্বীয় কথা ও কার্যের অসামঞ্জস্যের দ্বারা নিজেকে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত করিতেছি।

ইবনে আবী মোলায়কা (র:)‡ বর্ণনা করিয়াছেন—আমি ত্রিশজন ছাহাবীর সঙ্গে সাক্ষাতের ও তাঁহাদের সাহচর্য লাভের দৌভাগ্য অর্জন করিয়াছি। তাঁহাদের প্রত্যেককেই দেখিয়াছি, তাঁহারা সর্বদা এই ভয়ে ভীত থাকিতেন যে, তাঁহারা মোনাকেক শ্রেণীভূত হইয়া যান নাকি। (কেননা তাঁহারা ত মধ্যাহ্নের আলোকোজ্জ্বল দীপ্ত সূর্য্য অর্থাৎ রসুলুল্লাহর (স:) সময়ের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাহার তুলনায় পূর্ণ চন্দ্রের জ্যোৎস্নাও

† ইব্রাহীম তাইমী (র:) রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের যুগের নিকটবর্তী ২২ হিজরীর একজন বিশিষ্ট ভাবেশী।

‡ ইবনে আবী মোলায়কা (র:) ১১৭ হিজরীর একজন বিশিষ্ট ভাবেশী ছিলেন। আরেশা (রা:) আবহুলাহ ইবনে ওমর (রা:) প্রমুখ বহু ছাহাবীর শিষ্য লাভ করিয়াছেন তিনি।

অন্ধকার বলিয়া মনে হয়×)। তাঁহাদের কাহাকেও ঈমানের, পরহেজগারীর গর্ব ও বড়াই করতঃ একরূপ উক্তি করিতে শুনি নাই যে—আমার ঈমান জিব্রাইল অথবা মিকাইল ফেরেশতার ঈমানের সমতুল্য।

হাসান বহরী (রঃ)+ বলিতেন— (আমি যেই আল্লার ভোহিদের কলেমা পড়িয়া মোসলমান হইয়াছি সেই আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, যত মোমেন অতীত হইয়াছেন ও বর্তমানে আছেন এবং ভবিষ্যতে হইবেন, সকলেই মোনাফেকীর ভয়ে ভীত ও চিন্তিত*। পক্ষান্তরে যত মোনাফেক অতীত হইয়াছে ও বর্তমান আছে এবং ভবিষ্যতে হইবে, সকলেই মোনাফেকী হইতে শঙ্কাহীন ও নিশ্চিন্ত। অতএব) মোমেন মাত্রই মোনাফেকে পরিগণিত হওয়ার ভয়ে সর্বদা আতঙ্কিত থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে যে ব্যক্তি মোনাফেক, কেবলমাত্র সে-ই মোনাফেকী হইতে নিঃশঙ্ক-চিন্ত থাকিতে পারে।

অতীত কাল হইতেই “মোরজেয়া” নামক একটি ফের্কা বা দলের আবির্ভাব হইয়া আসিয়াছে। তাহাদের মতবাদ ও বিশ্বাস এই যে, ‘ঈমান অর্থাৎ অন্তরে বিশ্বাস ঠিক থাকিলে অশ্রান্ত পাপ কার্যের দ্বারা ঈমানের কোনও ক্ষতি হইতে পারে না।’ প্রথম দিকে যখন এই ফের্কার আবির্ভাব হয়, তখন কোন এক ব্যক্তি আবু ওয়ায়েল(রঃ) নামক বিশিষ্ট তাবেরীকে ঐ প্রকার মতবাদের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, উহা ঠিক কিনা? আবু ওয়ায়েল (রঃ) বলিলেন, একরূপ মতবাদ ও উক্তি নিছক ভুল ও মিথ্যা। আমার ওস্তাদ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি নিজ কানে নিম্নে বর্ণিত হাদীছ শুনিয়াছেন—

88। হাদীছ :- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

× এইরূপ বিষয়েরই আরও কিছু বিশদ বিবরণ এমঃ হাদীছের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে।

+ হাসান বহরী (রঃ) একজন বিশিষ্ট মতবার তাবেরী ছিলেন। ওমর (রাঃ)এর খেলাফতের সময় তিনি জয়গ্রহণ করিয়াছেন, ১১০ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। বহু ছাহাবী হইতে তিনি এলুম্ হাসিল করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তির কেবলমাত্র শেষ অংশটুকু ইমাম বোখারী (রঃ) উদ্ধৃত করিয়াছেন। অমূল্যরত্ন হিসাবে আমরা তাঁহার সম্পূর্ণ কথাটির অনুবাদ দিয়াছি। অতিরিক্ত অংশের অনুবাদ বন্ধনীর মধ্যে দিয়াছি।

* খাঁচী মোমেন মাত্রই তাঁহার মনে সর্বদা এই ভয় সংশয়ের উদয় হইবে যে, আমি মোমেন হওয়ার দাবী করিতেছি, মোমেনের লেবাহ্-গোষাক পরিধান করিতেছি, মোমেনের সুরত-আকৃতি অবলম্বন করিতেছি—অথচ আমার আভ্যন্তরীণ চরিত্রকে ও আধ্যাত্মিক অন্তরাঙ্গাকে তদ্রূপ গড়িয়া তুলিতে পারিতেছি না। আমার ভিতরকে বাহির অনুযায়ী, খতাবকে সুরত অনুযায়ী, কার্যকে কথা অনুযায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণরূপে গড়িয়া তুলিতে পারিতেছি না। এমতাবস্থায় আমি মানুষকে প্রভাবশালী মোনাফেক কপটাচারী শ্রেণীভুক্ত হইয়া যাই নাকি।

অর্থ:—আবহুলাহ ইবনে মসউদ (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রশূল্লাহ ছালামাহ আল্লাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন মোসলমান অপর মোসলমানকে গালি দিলে, সে ফাসেকের কাজ করিল বলিয়া সাব্যস্ত হয় এবং কোন মোসলমান অস্ত্র মোসলমানের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি কাটাকাটি করিলে সে কাফেরের কাজ করিল বলিয়া সাব্যস্ত হয়।

ব্যাখ্যা:—যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আল্লাহর রশূলের (দ:) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া স্বীয় অবাধ্যতা প্রকাশ করে তাহাকে ফাসেক বলে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রশূল (দ:)কে অস্বীকার করে তাহাকে কাফের বলা হয়। সাধারণ পাপের চেয়ে ফাসেকী কার্যের পাপ অপেক্ষাকৃত বড় এবং কুফরী কার্যের পাপ তার চেয়েও বড়। এই হাদীছের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, ঈমান শুধু দেলের বিশ্বাসের নামই নহে, বরং পাপের কাজ হইতে বিরত থাকাও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। অধুনা অনেকে বলিয়া থাকে ধর্ম ব্যক্তিগত Private বস্তু; সুতরাং সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে পাপ করিলে তাহাতে ধর্মের কোন ক্ষতি হইবে না। কেননা, ধর্মের সঙ্গে এ সবের কি সম্বন্ধ? এইরূপ ধারণা বস্তুত: অতীতের সেই “মোরজেয়া” ফেকীর ব্যক্তিদের ভ্রান্ত ধারণারই অনুরূপ। আলোচ্য হাদীছটির দ্বারা ঐ ধারণার অসারতা প্রমাণিত হইল। পাপ কার্য নিশ্চয় ঈমানের ও ধর্মের ক্ষতি সাধন করে ইহাতে সন্দেহ নাই। পাপ কাজ হইতে তওবা* না করিয়া মৃত্যু হইলে পরিণাম অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই কারণেই কোরআন শরীফে মোমেনদের পরিচয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—**وَلَمْ يَصْرُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ** (“যাহারা মোমেন) তাঁহারা সজ্ঞানে কখনও কৃত কুর্মের উপর হট করেন না।” অর্থাৎ—কোন সময় কোনও কুখ্যা কুকাঙ্ক তাঁহাদের দ্বারা সংঘটিত হইয়া পড়িলে, উহার উপর এক-ওয়েমী বা জেদ না করিয়া যথাসীত্র উহা হইতে তওবা করিয়া উহা বর্জন করেন এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হন। (৪ পা: ৫ রু:)

৪৫। হাদীছ:—ওবাদা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা (রমজান মাসে) রশূল্লাহ ছালামাহ আল্লাইহে অসাল্লাম “লাইলাতুল-কদর” সম্বন্ধে (নিদিষ্টরূপে উহার তারিখ) জ্ঞাত করাইবার জন্য স্বীয় গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন; পশ্চিমধ্যে ছইজন মোসলমান বিবাদ করিতেছিল। তখন রশূল্লাহ (দ:) ছাহাবীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমি “লাইলাতুল-কদর” সম্বন্ধে (উহার নিদিষ্ট তারিখ ইত্যাদির বিষয় সমূহের অহীপ্রাপ্ত হইয়া) তোমাদিগকে শুনাইবার ও জ্ঞাত করাইবার জন্য আসিয়াছিলাম। কিন্তু অমুক অমুক ব্যক্তিদ্বয় পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়াতে আমার নিকট হইতে সেই অহীর দ্বারা প্রাপ্ত এলুম

* পাপ কার্য হইতে প্রত্যাবর্তন করত: পুনরায় পাপানুষ্ঠানে বিরত থাকার নাম তওবা। স্বীয় কৃত পাপের জন্য মনে প্রাণে লজ্জিত, অনুতপ্ত ও অনুশোচনাগ্রস্ত হইয়া পুনরায় কদাপি ঐ পাপানুষ্ঠান না করার কঠিন প্রতিজ্ঞা ও অস্বীকার করত: আল্লাহ তায়ালায় নিকট সকাভরে ও আন্তরিকভাবে ক্ষমা ভিক্ষা করাকেই প্রকৃত প্রস্তাবে তওবা বলা হইবে।

উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। (এবং তাহা পুনরায় ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই। এই কথা শুনিয়া ছাহাবীগণ অন্ততপ্ত হইবেন, তাই) রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—সেই এলুম আমাকে পুনরায় ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই বটে, কিন্তু (লাইলাতুল-কদরের নির্দিষ্ট তারিখ ইত্যাদি) এই শুভ রক্ত ও বরকত হইতে বর্তমানে বঞ্চিত হইতে হইলেও আগামীতে তোমরা সতর্ক হইয়া চলিলে (অর্থাৎ পরস্পর ঐরূপ বাগড়া বিবাদ ইত্যাদি দ্বারা আল্লাহর রহমতের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করিলে) আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হইয়া উন্নতি ও উর্দ্ধগতির উপায় ও পথ পাইতে পারিবে। (এখন নির্দিষ্ট তারিখ হইতে বঞ্চিত হইয়া অলসরূপে বসিয়া না থাকিয়া) সকলে নিরলসভাবে ও সতর্কচিত্তে রমজানের ২৭শে, ২৭শে এবং ২৯শে রাতে লাইলাতুল-কদর অব্বেষণ কর। (অর্থাৎ এই রাত্রিগুলিতে এবাদৎ-বন্দেগী করতঃ আল্লাহর প্রতি রুজু ও ধাবিত হইয়া লাইলাতুল-কদরের ফজিলত হাসিল করায় তৎপর হও। উহার মধ্য হইতেই কোনও একটি রাত্রি লাইলাতুল-কদর হইবে।)

ব্যাখ্যা :—আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত ঘটনার দ্বারা একটি অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে—জাতির ভিতরে সংঘর্ষ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সমাজের অভ্যন্তরে বাগড়া-বিবাদ, আত্মকলহ ও ফেঁকা-বন্দী বা দঙ্গাদলি আরম্ভ হইয়া গেলে জাতির সীমাহীন উন্নতি ও অসীম উর্দ্ধগতির দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়। এমনকি ঐ অবস্থায় নেতৃস্থানীয় নবী বা নায়বে-নবীগণ পর্য্যন্ত গাধেবী মদদ ও আল্লাহর এল্হামী পৃষ্ঠপোষকতা বা ঐশ্বরিক সাহায্য লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া যান। যেমন আলোচ্য ঘটনায় দুইজন মোসলমানের কলহের দরুন রসুলুল্লাহ (দঃ) নিকট হইতে অহীপ্রাপ্ত বিশেষ ফলপ্রসূ একটি বিষয়ের এলুম ও তত্ত্ব উঠাইয়া নেওয়া হইল। এইরূপে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনেও স্বীয় কোন অপকর্মের দরুন নেক আমলের তৌফিক ও উন্নতির পথ বন্ধ হইয়া যায়, অনেক সময় নেক আমল বরবাদও হয়।

আলোচ্য পরিচ্ছেদের মূল বিষয় ইহাই ছিল যে, মোমেনের সর্বদা শক্তিত থাকা চাই যে, জীবনের কৃত আমল বিনষ্ট হইয়া যায় না—কি, আল্লাহর পথে উন্নতির দ্বার আমার জন্ত রুদ্ধ হইয়া যায় না—কি। প্রশ্ন হইতে পারে যে, নেক আমল কায়দা-কানুন মতে শুদ্ধরূপের হইলে উহা বিনষ্ট কিরূপে হয়? নেক আমল করিতে থাকিলে উন্নতির দ্বার কেন রুদ্ধ হইবে? এই পরিচ্ছেদের হাদীছদ্বয়ে ইহারই উত্তর রহিয়াছে যে, অনেক গোনাহ আছে যাহার অভিশাপে কৃত নেক আমল বিনষ্ট হয়। যেমন—মোসলমানের পরস্পর লড়াই করা কুফুরী তুল্য বড় গোনাহ; কুফুরী গোনাহের দ্বারা নেক আমল বিনষ্ট হয়। তদ্রূপ নির্দিষ্ট তারিখ জ্ঞাত হইয়া নিশ্চিত লাইলাতুল-কদরের এবাদৎ দ্বারা উন্নতি লাভের পথ পরস্পর বিবাদের দরুন রুদ্ধ হইয়া গেল। ঐরূপ অভিশাপময় আরও অনেক গোনাহই আছে, সুতরাং মোমেন বান্দার পথ সর্বদাই কটাকাটীর্ণ, তাহার জীবন ভয়সঙ্কুল সে নিশ্চিত হইতে পারে না। ইহা হইল ভয়-ভীতির সাধারণ ও স্থূল সূত্র। আর এশুক ও প্রেম ত নিতাস্তই স্বতন্ত্র ভিত্তি; সে প্রেমাস্পদের ব্যাপারে ভয়-ভীতির জন্ত কোন যুক্তি বা কারণ চায় না।

ঈমান, ইসলাম, এহসান ও কেরামতের তারিখ সম্পর্কে জিব্রিল কেরেশতার জিজ্ঞাসায় রসুলুল্লাহ (দঃ) ব্যাখ্যা দান

নিম্নে বর্ণিত হাদীছটি “হাদীছে জিব্রিল” নামে পরিচিত। অধিকন্তু হাদীছটিকে “উম্মুছ ছুন্নাহ” (সমস্ত হাদীছের জননী) বলা হইয়া থাকে। নবী (দঃ) দীর্ঘ তেইশ বৎসরের নবী-জীবনে নানব জাতির কল্যাণ ও মুক্তির সন্ধান দানে যাহা কিছু কার্যকরীভাবে শিক্ষা দিয়াছিলেন, উহার সার-নির্ধায়ে এই হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবনের শেষ সময়ে একদা জিব্রিল কেরেশতা অপরিচিত ব্যক্তির বেশে আসিয়া কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করেন। তৎপরে রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ বিষয় কয়টির মূল্যবান ব্যাখ্যা অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করেন।

রুকের যেমন প্রাথমিক স্তরে উহার মূল ও শিকড়, দ্বিতীয় স্তরে ডালপালা এবং তৃতীয় স্তরে উহার ফুল ও ফল হইয়া থাকে—তদ্রূপ ইসলাম ধর্মেরও তিনটি স্তর বা পর্যায় রহিয়াছে। প্রথম পর্যায়—অন্তরে সন্দেহাতীত অকাট্য বিশ্বাস স্থাপন, ইহা মূল ও শিকড় স্বরূপ। দ্বিতীয় পর্যায়—কাছে ও কথায় ঐ বিশ্বাস অনুযায়ী কার্যক্রম ও উহার অনুসরণ, ইহা ডালপালা স্বরূপ। তৃতীয় পর্যায়—সীমাহীন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি অর্জন, ইহা ফুল ও ফল স্বরূপ। নিম্নে বর্ণিত হাদীছে রসুলুল্লাহ (দঃ) সংক্ষেপে উক্ত তিনটি পর্যায়ের ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

৪৬। হাদীছ :—

عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَآتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَلِقَائِهِ وَتُؤْمِنَ بِأَبْعَثَ* قَالَ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ ۖ وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَعْرُوفَةَ وَتُصُومَ رَمَضَانَ ۖ قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ

* মোসলেম শরীফে ওমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত এই ঘটনার হাদীছটির মধ্যে স্থানে স্থানে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লিখিত আছে। অনুবাদের মধ্যে ঐ বিষয়গুলিও অত্রস্থ রাখা হইয়াছে। নিম্নে ঐ সকল অতিরিক্ত বাক্যাংশগুলিও উদ্ধৃত হইল।

ঐ হাদীছে এই স্থানে ইহাও উল্লেখ আছে—وَتُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ وَخَيْرِهِ وَشَرِّهِ

ও এখানে মোসলেম শরীফের হাদীছে আছে—

ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله -

ও যেহেতু ইহাও আছে—وَتُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ وَخَيْرِهِ وَشَرِّهِ

تَعْبُدَ اللَّهَ كَمَا نَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ مَتَى السَّاعَةُ
 قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِاعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا
 وَلَدَتْ الْأَمَةُ رِبَّهَا × وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاةُ الْأَبْلِ الْبُؤْمِ فِي الْبُنْيَانِ فِي خَمْسٍ
 لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عِزُّهُ عَلِيمٌ
 السَّاعَةَ الْآيَةُ ثُمَّ أَذْبَرَ فَقَالَ رُدُّوهُ عَلَيَّ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هَذَا جِبْرِيلُ
 جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِيْنَهُمْ -

অর্থ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা রসূলুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে
 অসাল্লাম প্রকাশ্য দরবারে সকলের সম্মুখে বসিয়াছিলেন। এমন সময় একজন (অগরিচিত)
 লোক তাঁহার দরবারে আসিলেন এবং (অতি সরলভাবে) জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈমান
 কাহাকে বলে? [অর্থাৎ ঈমানের হকিকত বা মূল তথ্য কি? +] রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন,
 ঈমান [তথা যে বিশ্বাস দ্বারা জীবন-সাধনার প্রারম্ভ হইবে উহা] এই যে—(১) প্রথমতঃ
 আল্লাহর অস্তিত্বে ও একত্বে বিশ্বাস করিতে হইবে। (২) তারপর আল্লাহর যে সকল বিশেষ
 বার্তাবাহক দূত আছেন, তাঁহাদিগকে ফেরেশতা বলা হয়, সেই ফেরেশতাগণের অস্তিত্বের

× মোসলেম শরীফের হাদীছে ইহাও আছে—

كَانَتِ الْخَلَاءُ الْعَرَاءُ رُؤُوسِ النَّاسِ مَلُوكِ الْأَرْضِ

+ ঈমান শব্দের অর্থ :—এমন অকাট্য আন্তরিক বিশ্বাস বাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় বা
 শিথিলতার অবকাশও না থাকে। সুতরাং মানব জাতির উন্নতি, শান্তি ও সুক্তি, যে বিশ্বাসের উপর
 নির্ভরশীল—সেই বিশ্বাস যাহার-তাহার উপর হস্ত করা যায় না। কি কি বিষয়-বস্তুর উপর বিশ্বাস
 স্থাপন করিয়া সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করতঃ কর্মজীবন ও ধর্মজীবন গঠন করিলে মানুষের
 সামগ্রিক জীবন সাফল্যমণ্ডিত হইবে, তাহাই জিজ্ঞাস্য এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) তাহারই সন্ধান দিয়াছেন।

* ফেরেশতাগণ অত্যন্ত কর্মশালী, সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ ও ত্রুটিহীন। তাহারা আল্লাহর
 আদেশ যখন তখন পালনকারী ও আল্লাহর আদেশে ছনিয়ার সমুদয় কার্য পরিচালনাকারী। তাহারা
 আলোর তৈরী; তাহাদের মধ্যে অন্ধকার ঘোটেও নাই। পাপকর্ম্য করার প্রবৃত্তি তাহাদের
 আদৌ নাই এবং তাহারা নিভুলভাবে আল্লাহর বাণী তাহার আদিষ্ট স্থানে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।
 এই বিষয়গুলির উপরও দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।

উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। (৩) আল্লাহর কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে [যে, উহা সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং অবিসংবাদিতরূপে আল্লাহরই প্রেরিত কিতাব]। (৪) আল্লাহর পয়গাম্বরগণের উপরও পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করিতে হইবে [যে, মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা আল্লাহর প্রেরিত সত্য নবী। তাঁহারা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, তাঁহাদের মধ্যে কোনরূপ স্বার্থ-প্রেরণার লেশমাত্র ছিল না এবং তাঁহারাই মানব জাতির আদর্শ ও সম্পূর্ণ নির্ভুল আদর্শ]। (৫) তারপর ইহাও বিশ্বাস করিতে হইবে যে—মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হইতে হইবে এবং স্বীয় কৃতকর্মের হিসাব দেওয়ার জন্য ভাল-মন্দ কর্মফল ভোগ করার নিমিত্ত আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে ×। (৬) তারপর ইহাও সম্পূর্ণরূপে সমর্থন ও বিশ্বাস করিতে হইবে যে—বিশ্বে প্রতিনিয়ত যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে উহা আমাদের পছন্দনীয় হউক বা অপছন্দনীয় এবং মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে ভাল-মন্দ যাহা কিছু করিয়া থাকে—সবের মধ্যেই সর্বশক্তিমান আল্লাহর কর্তৃত্ব রহিয়াছে এবং আদিকাল হইতেই আলেমুল গায়ের সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালার নিকট পূর্বাভাসে ঐ সঠিক তালিকাও প্রস্তুত রহিয়াছে*। উল্লিখিত ছয়টি মৌলিক বিষয়ের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করার নাম “ঈমান”। এই ছয়টি বিষয়ের উপর অটল বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক মানুষের কর্ম-জীবন বা জীবন-সাধনা আরম্ভ করিবে]।

এ অপরিচিত আগন্তুক (জিভ্রিল ফেরেশতা) দ্বিতীয় প্রশ্ন এই করিলেন যে, ইসলাম কি বস্তু? ইসলাম ধর্ম কাকে বলে? রসুলুল্লাহ (দ:) উত্তরে বলিলেন, (১) খাঁটিভাবে আল্লাহকে এক বলিয়া যে দৃঢ় বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করা হয় সেই বিশ্বাসের প্রকাশ্য শপথ ও স্বীকারোক্তি সর্ব সমক্ষে প্রকাশ পূর্বক এক আল্লাহ গোলামী অবলম্বন করিতে হইবে।

† আল্লাহর একত্ব বিশ্বাস করার অর্থ শুধু এতটুকুই নহে যে আল্লাহ একজন আছেন—মামুলীভাবে ইহা বিশ্বাস করা, বরং আল্লাহই যে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা, বিধানকর্তা, বিচারকর্তা এবং আল্লাহ-ই যে অনাদি-অনন্ত, চিরজীবন্ত, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী তাহা বিশ্বাস করা। এতদ্ব্যতীত আল্লাহ তায়ালার আরও যে সকল সহঃ ণ্ডাবলীর অধিকারী সেই ণ্ডাবলীর সহিত আল্লাহর অস্তিত্বে ও একত্বে অটল বিশ্বাসী হইলেই প্রকৃত একত্ববাদী গণ্য হইবে।

× হিসাব-নিকাশে ঐহারা সংকর্য করিয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইবে তাঁহারা আল্লাহর সন্তুষ্টভাজন হইয়া পুরস্কারের স্থান বেহেশতে চিরমুখময় অনন্ত জীবন-যাপন করিবেন এবং যাহারা মন্দ কার্য করিয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইবে তাহারা দোষখবাসী হইয়া কঠোর শাস্তি ভোগ করিবে।

* উপরোল্লিখিত ষষ্ঠ বিষয়টির নামই হইতেছে “তকদীর” অর্থাৎ অদৃষ্ট বা নিয়তি। ইহার বিবরণ মূল হাদীছটির পূর্ণ অর্থবাদের শেষে “বিশেষ” ভূঁইয়া” শাফায়ে দেওয়া হইবে।

† “ইসলাম” শব্দের অর্থ পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে বা যে কোন বস্তুর নিকট আত্মসমর্পণের নাম ইসলাম নহে। বরং একমাত্র আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া আল্লাহর নির্দ্বিগ্নিত বিষয়-বস্তুকে কার্য্যক্ষেত্রে পালন করতঃ ইহ-পরকালের শান্তি ও মুক্তি লাভের পথ ইসলাম। সেই সকল বিষয়বস্তুগুলি কি কি, এখানে তাহাই জিজ্ঞাস্য—রসুলুল্লাহ (দ:) তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন।

শুধু তাহাই নহে, বরং উহার বিপরীত সব কিছুকে বর্জনের ও অস্বীকৃতির স্পষ্ট ঘোষণা দান পূর্বক কার্য্যাতঃও শেরেক তথা অংশীদারবাদকে এড়াইয়া চলিতে হইবে। মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার সাচ্চা রসূল বলিয়া অন্তরে যে দৃঢ় বিশ্বাস আছে ঐ বিশ্বাসেরও তজ্রপ প্রকাশে ঘোষণা দিতে হইবে। [ইহাই কালেমা শাহাদতের সারমর্ম ;] “আশ্‌হাছ আল্‌ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকা লাহু ওয়া আশ্‌হাছ আল্লা মোহাম্মাদান আবদুল্লহু ওয়া রাসুলুহু”। অর্থ—আল্লারই বন্দেগী ও দাসত্ব করিব ; আল্লার সহিত তাহাকেও শরীক করিব না, মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার বিশিষ্ট বান্দা ও রসূল।” [অন্তরের বিশ্বাসের সঙ্গে উহা ব্যবহারিক জীবনে কার্য্যে প্রমাণিত করাও অপরিহার্য্য ; তাই] (২) দৈনিক পাঁচটি নির্দ্ধারিত সময়ে, আল্লার দরবারে হাজির হইয়া আল্লার নির্দ্ধারিত আদেশ ও রসূলের নির্দিষ্ট আদর্শ অনুসারে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করিতে হইবে। (৩) [স্বীয় অর্থের ও আত্মার পবিত্রতা সাধনের মানসে এবং আল্লার সৃষ্টির সেবার উদ্দেশ্যে আল্লার নির্দ্ধারিত নিয়মানুযায়ী] যাকাত দান করিতে হইবে। (৪) [সংযম অভ্যাস করিয়া কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি রিপু দমনের জন্য] পূর্ণ রমজান মাসের রোযা রাখিতে হইবে। (৫) [প্রত্যেক মোসলমানের আকাঙ্ক্ষা রাখিতে হইবে যে,] সামর্থ্য্যবান হইলেই হজ্জব্রত পালন করার জন্ত আল্লার নির্দ্ধারিত কেন্দ্র—মক্কাহিত কা’বা গৃহে পৌছিতে হইবে।

সেই অপরিচিত আগন্তুক (জিভ্রিল ফেরেশতা) তৃতীয় প্রশ্ন করিলেন এই যে— “এহসান” কি? [এখানে “এহসান” শব্দের অর্থ—ভালর চাইতে ভালরূপে এবং উত্তমের চাইতেও উত্তমরূপে কর্তব্য কার্য্য সমাধা করা। অর্থাৎ মানুষের জীবন-সাধনায় কৃতকার্য্য হইতে হইলে যেমন তাহাকে ছয়টি সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে এবং পাঁচটি সীমাবদ্ধ অনুষ্ঠান নিয়মিত পালন করিয়া যাইতে হইবে, তজ্রপ তাহার সীমাহীন আত্মার অসীম উন্নতি সাধন করতঃ ভালর চাইতে ভাল এবং তার চাইতে অধিক ভাল হইতে হইলে তাহার পক্ষে কি করা কর্তব্য তাহাই এখানে জিজ্ঞাস্যঃ। আল্লার রসূল (দঃ) এখানে তাহারই পথ দেখাইতেছেন এবং সে সন্ধানই দিতেছেন।] রসূলুল্লাহ (দঃ) উত্তরে বলিলেন—“এহসান” তথা সেই অসীম উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে হইলে, তোমাকে আল্লার গোলামী করিয়া চলায় আজীবন সাধনা করিয়া যাইতে হইবে, আর সেই সাধনা হইবে এইরূপ একনিষ্ঠ সাধনা যেন তুমি স্বয়ং খোদা তায়ালাকে দেখিতেছ। কেননা, যদিও তুমি খোদাকে দেখিতেছ না, কিন্তু খোদা ত তোমাকে দেখিতেছেন।

■ “মানুষ” শুধু রক্ত মাংস ও অস্থিমজ্জায় গঠিত জড়পিণ্ডের নাম নহে, বরং অসীম আত্মা ও সসীম দেহ এই দুই-এর প্রকৃত সমন্বয় সাধনের নাম মানুষ। মানুষের সুল দেহ কুলিয়া কাঁপিয়া বেদবহুল ও মোটা হইলে বা ৫৭ গজ লম্বা হইলেই তাহাতে মানুষের উন্নতি লাভ হয় না। মানুষের উন্নতি হয় তাহার অসীম আত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতির দ্বারা। সেই উন্নতির উপায় ও পথকেই এখানে “এহসান” নামে ব্যক্ত করা হইয়াছে এবং রসূলুল্লাহ (দঃ) উহারই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

[তাই তোমাকে বিরামহীনরূপে সেই একনিষ্ঠ সাধনা করিয়া যাইতে হইবে। মনিবের সম্মুখে অন্ধ ভৃত্য—যদিও সে মনিবকে দেখিতে পায় না তবুও মনিবকে দেখা অবস্থার ছায়, বরং অধিক একাগ্রতার সহিত বিরামহীন সাধনা করিয়া চলে; কারণ সে জানে যে, মনিব তাহাকে দেখিতেছেন—যাহা বিরামহীনরূপে ঐকান্তিক সাধনায় ত্রুটি থাকার মূল কারণ। মানবের অবস্থা আল্লার সম্মুখে তদপেক্ষা অধিক জিয়াশীল নয় কি? অতএব তাহার সাধনা বিরতি ও শৈথিল্য বিহীন হইবে না কেন?

এই সাধনা কেবলমাত্র নামায বা মসজিদেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না; এই সাধনার সুবিস্তৃত ক্ষেত্র এবং তাৎপর্য্য হইবে এই যে—নামায, রোযা ইত্যাদি নেক আমল সমূহে, তহপরি হাটে-ঘাটে, মাঠে-ময়দানে, ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক বা পারিবারিক জীবনে, কণা-বার্তায়, বক্তৃতায় এবং লেখনী বা মস্তিক চালনায় ও চিন্তাধারায় অর্থাৎ মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতি পর্যায়ে, প্রতিটি স্তরে ও প্রত্যেক পদক্ষেপে এমনকি উঠা-বসা, চলা-ফেরা পানাহার ইত্যাদি যাবতীয় দৈনন্দিন সাংসারিক ও বৈয়রিক কার্য্যসমূহে একরূপভাবে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে এবং এমনভাবে কর্মজীবন যাপন ও চরিত্র গঠন করিতে হইবে যাহাতে ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, তুমি একটা উচ্ছৃঙ্খল, উদ্ভট, স্বেচ্ছাচারী দানব-বিশেষ নহ। বরং তুমি আল্লার অমুগত আল্লার গুণে গুণান্বিত আল্লারই একজন দাস, এমন দাস যে স্বীয় মনিবকে সম্মুখে চাক্ষুষ দেখিতেছ। বলা বাহুল্য—কোন ভৃত্য বা কুতদাস যখন কর্তব্যরত অবস্থায় স্বীয় মনিব ও মাওলাকে স্বচক্ষে দেখিতে পায়, তখন তাহার অন্তরে কতই না ভয় ও ভক্তির ভাব জাগ্রত থাকে এবং সেই ভয় ও ভক্তির আড়ালে একাগ্রচিত্তে ও স্তূৰূপে কার্য্য সমাধা করার কিরূপ আশ্রয় চেষ্টাই না সে করিয়া থাকে; মানব তাহার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে এই প্রকার ঐকান্তিক চেষ্টা ও নিরবিচ্ছিন্ন সাধনার মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিবে, ইহারই নাম “এহসান”+।]

ঐ আগন্তুক চতুর্থ প্রশ্ন এই করিলেন যে, কেয়ামত বা মহাপ্রলয় কবে আসিবে এবং উহার নির্দিষ্ট দিন-তারিখ কবে? (অর্থাৎ—মানুষ যে সকল কর্তব্যাকর্তব্য পালন করিবে ও

+ সাধারণতঃ এই হাদীছের অর্থে যদিও নামাযের মধ্যে এহসানের মত বা তথা উপরে বর্ণিত অবস্থা হাসিলের কথা বলা হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কেবল তাহাই নহে, বরং মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি পদক্ষেপে উপরোক্ত অবস্থা সৃষ্টি করার নাম “এহসান”। আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত الله تبارك و تعالیٰ শব্দের অর্থ নিজেকে আল্লার দাসরূপে রূপায়িত করিয়া তদনুযায়ী সামগ্রিক জীবনকে সুগঠিত ও পরিচালিত করা। মোসলেম শরীফের রেওয়ায়েতে এই মর্ম্মই ব্যক্ত হইয়াছে—ان تخشى الله كانك تراه অর্থাৎ সর্বদা তোমার অন্তরে আল্লার ভয়-ভক্তি এরূপ জাগ্রত রাখ, যেন তুমি তাঁহাকে দেখিতেছ। (পরন্তু, যদিও তাঁহাকে দেখিতেছ না, কিন্তু তিনি তোমাকে অবশ্যই দেখিতেছেন)।

উল্লিখিত এহসানের পর্যায়ে পৌছার পথকে সহজ করার জন্তই “তাছাওক” বা তরীকতের আবিষ্কার হইয়াছে। এই পর্যায়ে হাসিল করাই মানব জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য।

কঠোর সাধনা করিয়া কর্মজীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য চেষ্টারত থাকিবে, উহার ফলাফল নিশ্চয় একদিন প্রকাশিত হইবে এবং সেই দিন ও সময়টি কখন আসিবে তাহা নিদিষ্ট ও নির্দ্বারিতরূপে বলিয়া দিন।)

রসূলুল্লাহ (দ:) বলিলেন—এই প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে আমি আপনার চাইতে অধিক কিছু জানি না। কেননা কেয়ামত বা ইহজগতের প্রলয়ের নিদিষ্ট তারিখ সম্বন্ধে আপনি যেমন অজ্ঞ আমিও তদ্রূপই অজ্ঞ। অবশ্য ঐ সময় বা মহাপ্রলয়ের দিনটি নিকটবর্তী হওয়ার আলামত বা নিদর্শন আমি আপনাকে বলিয়া দিতেছি।

যখন সন্তান-সন্ততিগণ মাতা-পিতার ঔদয়জাত হওয়া সত্ত্বেও উহারা তাহাদের অবাধ্য তাহাদের নাকরমান, তাহাদের প্রতি চাকর-চাকরানীর স্থায় ব্যবহারকারী হইবে এবং যখন চরিত্রহীন ও অতিশয় নিম্নস্তরের ইতর প্রকৃতির রাখাল মজুর শ্রেণীর লোকদের হাতে কতৃৎ ও রাজ্য শাসনের ভার চলিয়া যাইবে এবং ধন-দৌলত অর্থ-সামর্থ্যও ঐ শ্রেণীর লোকদের হাতেই চলিয়া যাইবে এবং তাহারা ঐ অর্থের সদ্যবহার না করিয়া প্রতিযোগিতা-মূলক ভাবে বড় বড় মহল—অট্টালিকাদি তৈয়ার করিবে এবং উহাতেই গোরব বোধ করিবে। এই সবই হইবে কেয়ামত তথা জগৎ ধ্বংসের পূর্ববর্তী আলামত। (অর্থাৎ কেয়ামত বা মহাপ্রলয়ের নিকটবর্তী জগতে ব্যাপক পরিবর্তন ও ওলট-পালট দেখা দিবে। ছেলে-মেয়েরা মুরব্বীদের সঙ্গে এমনকি জননী মাতার সহিত মেয়ে পর্যন্ত একরূপ অবাধ্যতার পরিচয় দিবে যেন ছোটরাই মুরব্বী। চরিত্রহীন ইতর প্রকৃতির লোকেরাই তখন প্রবল হইয়া উঠিবে এবং সংলোকের অস্তিত্ব লোপ পাইতে থাকিবে। মূল প্রশ্ন কেয়ামত কবে আসিবে, উহার নিদিষ্ট তারিখ কেহই বলিতে পারে না। কারণ,) ইহা ঐ পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে একটি যাহা আল্লাহ ভিন্ন আর কেহই জানে না। এই শেষ প্রশ্নের সমর্থনে হযরত রসূলুল্লাহ (দ:) এই আয়াতটি পাঠ করিলেন—

৫ রসূলুল্লাহ (দ:)কে কাকেররা পাঁচটি প্রশ্ন করিয়াছিল, উহারই উত্তরে এই আয়াত নাযেল হয়। আয়াতের অর্থ:—(১) কেয়ামত বা মহাপ্রলয় অস্বপ্নিত হওয়ার নিদিষ্ট তারিখ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন এবং (২) তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া থাকেন; (তাই কখন কোথায় কি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হইবে এসব বিষয়ের বিস্তারিত তত্ত্ব সঠিকরূপে ও সরাসরি ভাবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই অবগত আছেন। মানুষ এই বিষয়ে যতটুকু জানিতে পারে উহা শুধু আবহাওয়া সংক্রান্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও স্বতন্ত্র পরিবর্তনজনিত প্রতিক্রিয়া দৃষ্টে বা যান্ত্রিক সাহায্যে সম্ভাব্যমূলক নিদর্শনাদি অনুভব করিয়া কেবল আনুমানিক ধারণা জন্মায় মাত্র; উহা কখনই সুনিশ্চিত বা সরাসরি অবগত হওয়া নহে)। (৩) মাতৃগর্ভে অবস্থিত সন্তান—ছেলে, কি মেয়ে তাহাও সঠিক-ভাবে এবং নিদিষ্টরূপে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। (৪) ভবিষ্যতে কে কি করিবে এবং (৫) কোথায় কাহার মৃত্যু হইবে, তাহাও একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সঠিক অভ্যন্তরীণে অবগত আছেন। (বস্তুত কেবলমাত্র এই পাঁচটি বিষয়েরই নহে, বরং পৃথিবী ও আকাশের সমুদয় বিষয়ের সুনির্দিষ্ট গায়েবী-এলম বা ভবিষ্যৎ জ্ঞানের একমাত্র অধিকারী আল্লাহ তায়ালা; নিশ্চয় তিনি অস্বপ্ন্যামী, সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানী। (২১ পারা, ছুরা লোকমান, শেষ রুকু

এই পর্য্যন্ত প্রশ্নোত্তরের পর ঐ আগন্তুক চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে হযরত রসূলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবীগণকে আদেশ করিলেন—তাহাকে আমার নিকট কিরাইয়া আন। কিন্তু আগন্তুক মুহূর্তে কোথায় চলিয়া গেলেন, ছাহাবীগণ তাহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—ঐ আগন্তুক জিব্রিল ফেরেশতা ছিলেন। (প্রশ্নোত্তরের ভিতর দিয়া) তোমাদিগকে দীন ও ধর্মের প্রধান বিষয়সমূহ জ্ঞাত করাইবার জন্য আসিয়াছিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—(“তকদরী কি ? উহার তাৎপর্য্য ও বিবরণ—)

জাগতিক কার্য্যক্রম ও ঘটনা-প্রবাহ সাধারণতঃ দুই প্রকার। প্রথম প্রকার যাহা মানুষের কোনরূপ হস্তক্ষেপ বা ইচ্ছা-অনিচ্ছা ব্যতিরেকে স্বভাবতঃই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে—যাহাকে প্রাকৃতিক ঘটনা বলা হয়। দ্বিতীয় প্রকার যাহা মানুষের দ্বারা এবং তাহারই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে—যাহাকে মানবিক কার্য্যক্রম বা মানুষের দ্বারা সম্পাদিত কার্য্য বলিয়া গণ্য করা হয়।

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত উভয় প্রকারের সমস্ত বিষয় ও ঘটনাসমূহ যত বড় বা যত ছোটই হউক না কেন, প্রতিটি কার্য্য ও ঘটনার মধ্যেই (১) সর্বশক্তিমান আল্লাহর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব রহিয়াছে। তদুপরি আল্লাহ যেহেতু সর্বজ্ঞ, আলেমুলগায়েব; তাই (২) অনন্তকাল ব্যাপিয়া যে কোন প্রকারের যাহা কিছু ঘটিবে, বা যাহার দ্বারা যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হইবে, অনাদিকাল হইতেই আল্লাহ তায়ালা সে সব জানেন। এমনকি আল্লাহ সেই অশ্রান্ত জ্ঞান অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট টাইম-টেবল (Time table—রেল কোম্পানীর সময় নির্দ্বারক তালিকা)-এর স্থায় পূর্ব হইতেই সব কিছুর পূর্ণ তালিকা পর্য্যন্ত তিনি প্রস্তুত রাখিয়াছেন। (৩) যেহেতু আল্লাহ এলুম (জ্ঞান) ও জানা কখনই ভ্রাম্যক বা অপ্রকৃত—অবাস্তব হইতে পারে না, সুতরাং ঐ তালিকার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হওয়া কদাপি সম্ভব নহে। উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের সমষ্টির নামই হইয়াছে “তকদীর” অর্থাৎ অদৃষ্ট বা নিয়তি।

এই বর্ণনায় স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে—“তকদীর” বলিতে যাহা কিছু বুঝায় তাহা বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালায় দুইটি ছেফৎ বা গুণেরই বিশেষ অন্বচ্ছেদ মাত্র। উহার একটি হইতেছে “কুদরত” অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালায় সর্বশক্তিমান হওয়া। আর দ্বিতীয়টি হইতেছে “এলুম” অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালায় অনাদিকাল হইতেই সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী হওয়া।

জাগতিক ঘটনা প্রবাহের প্রথম প্রকারের ঘটনাসমূহ সম্বন্ধে তকদীরের বিষয়ে বিশেষ কোনও বিধা বা সংশয়ের উদয় ছিল না। এমনকি এই প্রকারের কোনও ঘটনা কোনরূপ বাহ্যিক কারণ ও হেতুর আবরণে পরিবেষ্টিত থাকিলেও, যেহেতু কার্য্য কারণ পরস্পরায় শেষ পর্য্যন্ত ঐ কারণের কারণ তত্ত্ব কারণ হাতড়াইয়া পাওয়া যায় না কিম্বা নিজেদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা উহার রহস্যজাল ভেদ করিতে অসমর্থ হয়, তাই বাধ্য হইয়া সেখানে তকদীরকে স্বীকার করিয়া লওয়া হয় এবং নিজেদের পরিভাষায় উহাকে “প্রাকৃতিক” বলিয়া অভিহিত করা হয়।

আর দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ মানুষের দ্বারা অনুষ্ঠিত কার্যক্রম সম্বন্ধে তরুদীরের বিষয়ে নানা প্রকার সংশয়ের উদয় হইয়া থাকে। তাই এখানে একটি বিষয় বিশেষরূপে চর্চণীয় যে—আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সম্পূর্ণ অক্ষম নির্জীব জড়পদার্থরূপেও সৃষ্টি করেন নাই, কিম্বা স্বয়ং-সম্পূর্ণ, সক্ষম, সর্বশক্তিমান করিয়াও সৃষ্টি করেন নাই। বরং আল্লাহ তায়ালা মানুষকে নেহাৎ স্বাভাবিক, সীমাবদ্ধ ও পরিমিত জ্ঞানশক্তি দান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও, ঐ সকল প্রদত্ত শক্তিসমূহকে আল্লাহ তায়ালা একান্তই স্বীয় কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার কর্তৃত্বের বিধানে ইহাও বিধিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন যে—মানুষ তাহার শক্তিসমূহ কোন ভাল বা মন্দ পথে পরিচালিত করিলে উহাতে আল্লার তরফ হইতে কোনরূপ প্রত্যক্ষ বাধা সৃষ্টি করার কোনও বাধ্যবাধকতা মোটেই থাকিবে না। অতথায় কর্ম জগতের মূল রহস্য—“পরীক্ষা” অনুষ্ঠিত হইতে পারে না।

মানবকে উল্লিখিত শ্রেণীর শক্তিতে শক্তিমান করিয়া, ভাল-মন্দ চিনিবার জ্ঞান শরীয়তকে মাপ-কাঠিরূপে প্রদান করতঃ আল্লাহ তায়ালা তাহাকে (মানবকে) কর্মক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিয়াছেন; **لِيَنْظُرَ كَيْفَ يَعْمَلُونَ** “পরীক্ষার দ্বারা প্রকাশ করিয়া দিবার জ্ঞান যে—হে মানব; তোমরা কোন্ পথ অবলম্বন কর।” এখন চিন্তা করিয়া দেখুন যে, মানুষ নিশ্চিতরূপে স্বীয় কর্মফল ভোগ করিবে না কেন? নিশ্চয় ভোগ করিবে। কারণ, আল্লাহ তায়ালা মানবকে যে ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতাটুকু দান করিয়াছেন—যদ্বারা মানব জাতি অপরাপর অক্ষম নির্জীব জড়পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও ভিন্ন পরিগণিত হয়; ঐ শক্তি ও ক্ষমতাকে সং বা অসং—ভাল বা মন্দ পথে পরিচালিত করার জ্ঞান মানবই দায়ী। এতদৃষ্টে তরুদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপনের দ্বারা কর্মক্ষেত্রে কোনও বাধার সৃষ্টি হইতে পারে কি?

তরুদীর বলিতে আল্লাহ যে অসীম কর্তৃত্ব, প্রাধাত্য ও শক্তিমত্তা বুঝায়, উহার উপর বিশ্বাস স্থাপনের দ্বারা বহু সুফল প্রতিফলিত হইতে পারে। যথা—(১) কর্মক্ষেত্রে মানুষ নিজকে বাহ্যতঃ যৎকিঞ্চিৎ ক্ষমতাবান দেখিতে পাইলেও সে নিজকে স্বয়ং সম্পূর্ণ তথা অবিমিশ্র শক্তির অধিকারী বলিয়া ধারণা করিবে না। যেক্রপভাবে ফেরাউন-প্রকৃতির ব্যক্তিগণ নিজেদের সম্পর্কে ঐ প্রকার ধারণা পোষণ করতঃ উহা কার্যে পরিণত করিতে যাইয়া বহু অশান্তির সৃষ্টি করিয়া থাকে। (২) আল্লাহ তায়ালা যে, মহান ও সর্বশক্তিমান তাহা সর্বদা মনে জাগ্রত থাকিবে এবং নিজকে সর্বদাই তাঁহার মুখাপেক্ষী, সাহায্য-প্রার্থী ও দয়ার ভিত্তারীকূপে গণ্য করিয়া জীবনের সকল কার্য পরিচালিত করিবে। (৩) কোনও কার্যে শত চেষ্টার পরেও অকৃতকার্য বা বিফল হইলে তাহাতে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া একেবারে মনে ভাঙ্গিয়া ধৈর্য্যহার্য হইয়া পড়িবে না, বরং স্বীয় মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দান করিবে যে—সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা তরফ হইতেই একরূপ হইয়াছে এবং নিশ্চিতই ইহার অন্তরালে হয়ত আল্লাহ তায়ালা এমন কোনও সুফল প্রস্তুত ইঙ্গিত অথবা

মঙ্গল-সূচক ইচ্ছা নিহিত রহিয়াছে, যদ্বকরন ইহাই আমার জ্ঞাত তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। তাই ইহাতে আমাদের কিছুই করিবার নাই; আমরা ত তাঁহার গোলাম মাত্র। অতএব, মনিবের যাহা ইচ্ছা গোলামের প্রতি করিতে পারেন। মনের মধ্যে এই প্রকার ভাব জাগ্রত করিয়া ধৈর্য্য ধারণ পূর্বক উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে। (৪) কোনও বিষয়ে বাহত: স্বীয় চেষ্টা ও শক্তির দ্বারা কৃতকার্য্য ও সফলকাম হইলেও, তজ্জগৎ ঐ ব্যক্তি ফেরাউন প্রকৃতির হইবে না, বরং মনে মনে আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞ ও শোকরগোজার হইবে এই ভাবিয়া যে, আল্লাহ তায়ালাই তাঁহার অপার করুণাবলে আমাকে এই সাফল্য লাভের তৌফিক ও সুযোগ দান করিয়াছেন; ফলে তাহার স্বভাবে নম্রতা আসিবে; উগ্রতা ও ওদ্ধত্য সৃষ্টি হইবে না, আল্লাহর বান্দাদের প্রতি সে বিনয়ী ও সদয় হইবে।

এসবই হইতেছে তকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপনের অনিবার্য্য ও বাস্তব প্রতিক্রিয়ার সফল। ইহার পরিবর্তে কেহ যদি তকদীরের নামে স্বীয় কর্মজীবনে দুর্বলতা টানিয়া আনে, অর্থাৎ অকর্মজ, নিরুৎসাহ ও উদ্বমহীন হইয়া পড়ে তবে তাহা ঐ ব্যক্তির নিজের ত্রুটি ও শয়তানের ধোকা ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

তকদীরের যে সংজ্ঞা ও তাৎপর্য্য বর্ণিত হইল এবং তকদীরের উপর ঈমান স্থাপনের যে ফলাফল ব্যক্ত হইল—এই সব তথ্যের প্রতি পবিত্র কোরআনেই সংক্ষেপে ইশারা রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

مَا آمَا بَ مِنْ مِّمِّيَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْلَا تَتَأَسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُهَبُّ كُلَّ مُكْتَلٍ فَخُورٍ

অর্থ :- ভূপৃষ্ঠে যে কোন বিপদ-আপদ, দুর্ঘ্যোগ-দুর্ভোগের আগমন হয় এবং উহার যে কোনটা কোন মানুষের উপর আসে উহার প্রত্যেকটাই কিতাবে তথা লোহে-মাহকুজে লিখিত আছে—উক্ত বিপদ ও দুর্ঘ্যোগকে আধি সৃষ্টি করার পূর্বেই, বরং ঐ মানুষটিকে সৃষ্টি করার পূর্বেই। (তদ্রূপই জগতে যখন যে সুযোগ-সুদিন, সুখ-সমৃদ্ধির সঞ্চার হয় এবং উহা যে কাহারও জীবনে সমাগত হয় উহারও প্রত্যেকটাই কিতাবে লিখিত আছে—উহাকে সৃষ্টি করিবার পূর্বেই।) এইরূপে লিখিয়া রাখা (আমি) আল্লাহর পক্ষে নিতান্তই সহজ ব্যাপার। এই তথ্যটা তোমাদিগকে জ্ঞাত করান হইল শুধু এই উদ্দেশ্যে হে, তোমরা কেহ কোন মনোবাহু হইতে বঞ্চিত বা উহা লাভে ব্যর্থ হইলে কিম্বা কোন ধন-জনহারা হইলে সে যেন ক্ষোভ-বিহ্বল বা শোক-বিহ্বল হইয়া না পড়ে। (ধৈর্য্যধারণ

করিয়া মনোবল অক্ষুন্ন রাখে) এবং কেহ আল্লার তরফ হইতে ভাল অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সে যেন ঔদ্ধত্য, দস্তে ও খুশিতে উন্মত্ত না হয়; (শুকুরগোজার—আল্লার নিকট কৃতজ্ঞ ও বান্দাদের প্রতি বিনয়ী হয়।) কোন অহঙ্কারী দাস্তিককে আল্লাহ মোটেই পছন্দ করেন না। (২৭ পারা ১১ রুকু)

তকদীরের উপর ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা যে অপরিহার্য, তাহা মোসলেম শরীফের একটি হাদীছ দ্বারা বিবেশরূপে প্রমাণিত। হাদীছটি এই:—

এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে বলিল, আমাদের দেশে নূতন মতবাদের একদল লোক আবির্ভূত হইয়াছে। তাহারা একদিকে বেশ কোরআন শরীফ পাঠ করিয়া থাকে এবং জ্ঞান-চর্চা তথা ধর্মীয় গবেষণাদিও করিয়া থাকে, কিন্তু অতীতকালে তাহারা তকদীরের প্রতি বিশ্বাসী নহে, বরং তাহারা তকদীরকে অস্বীকার করিয়া থাকে। এতদ্বারা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহাদিগকে বলিয়া দিও যে, আমাদের তথা খাতি মোসলেম জাতির সহিত তাহাদের কোনই সংশ্রব নাই; তাহারা মোসলেম জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন। আমি মহান আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, তাহারা যত প্রকার ও যত বড় নেক আমলই করুক না কেন, এমনকি পাহাড় সমতুল্য স্বর্ণও যদি তাহারা আল্লার রাস্তায় দান-খয়রাত করে, তথাপি উহা আল্লার দরবারে কবুল হইবে না; তাহারা উহার কোন ছওয়াবই পাইবে না যাবৎ না তাহারা উক্ত ইসলাম বিরোধী ধারণা ও মতবাদ পরিত্যাগ করিয়া তকদীরের উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও ঈমান স্থাপন করে।×

পাঠকবর্গ! এখানে তকদীরের যে ব্যাখ্যা ও তত্ত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে সেই অমুযায়ী ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের এই উক্তি অত্যন্ত সঙ্গত। তকদীরকে অস্বীকার করা প্রকারান্তরে আল্লাহ তায়ালায় দুইটি বিশেষ ছেফৎ ও গুণকে বা উহার ব্যাপকতাকে অস্বীকার

× আরও এক হাদীছে আছে, হযরত রশূল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন—কোন ব্যক্তি মোমেন বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে না যাবৎ না সে (নিম্নে বর্ণিত) চারিটি বিষয়ের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে। (১) আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই। (২) আমি (আল্লার রশূল;) সত্য ও খাতি দীন প্রচারের জন্ত প্রেরিত হইয়াছি। (৩) যত্না অনিবার্য এবং তৎপর হিসাব দিবার জন্ত পুনরুজ্জীবিত হইতে হইবে। (৪) তকদীর বরহক্ (তিরমিজী শরীফ)

এই সব হাদীছ দৃষ্টে প্রত্যেক নাজাতকামী মোসলমানের লক্ষ্য রাখা কর্তব্য যে, “বুঝ ও যুক্তিতে আসে না” ইত্যাদি কোন অভুহাতে তকদীরকে অস্বীকার করা নাজাতের পরিপন্থী হইবে। কেহ আবশ্যক মনে করিলে যুক্তি-যুক্তরূপে বুঝিবার চেষ্টা করিতে পারে, আজীবন সেই চেষ্টা চালাইয়া যাইতে পারে, কিন্তু অভুহাত দেখাইয়া উহাকে এনকার করার কোনই অবকাশ নাই। অবশ্য তকদীরের কোন ভুল ব্যাখ্যা মনে গাঁথিয়া লইয়া কর্মজীবনে হাত-পা গুটাইয়া নিরুৎসাহ, নিকর্ষ হইয়া বা চেষ্টা ও তদবীরবিহীন হইয়া বসিয়া থাকাও সমর্থনীয় নয়। অনেক ক্ষেত্রে তকদীরের ভুল ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাকের প্রতি নানাপ্রকার ঘোষারোপ করিতেও শুনা যায়, উহার পরিণতিও অত্যন্ত ভয়াবহ।

করা। কারণ, পূর্বেই বলা হইয়াছে, তবদীর বলিতে যাহা কিছু বুঝায় বস্তুতঃ উহা আল্লাহ তায়ালার দুইটি ছেফৎ বা গুণেরই বিশেষ অনুচ্ছেদ মাত্র। বলা বাহুল্য, যে কোন ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার কোনও একটি ছেফৎ বা গুণকে অস্বীকার করিলে ঈমান ও ইসলাম বহাল থাকিতে পারে না।

সন্দেহজনক কাজ হইতে সংযমী হওয়ার কজিলত ও সুফল

৪৭। হাদীছঃ—عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْكَفَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشْتَبِهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الْمُشْتَبِهَاتِ كَرَاعٍ يَرعى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَكْرُمَةٌ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا عَلِلَتْ مَلَاحَ الْجَسَدِ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»

অর্থঃ—নোমান ইবনে বশীর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে—“হালাল” ষ্টম্প এবং “হারাম” ষ্টম্প। আর এই দুইটির মধ্যস্থলে কতগুলি “সন্দেহ জনক” শ্রেণীর বিষয়বস্তুও রহিয়াছে। এগুলি কোন্ পর্যায়ভুক্ত তাহা অধিকাংশ লোকেরাই নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত করিতে পারে না। যে ব্যক্তি ঐ সন্দেহজনক বিষয়গুলি হইতে সংযমী হইবে (এগুলিকে সময়ে পরিহার করিয়া চলিবে) একমাত্র তাহারই দ্বীন ঈমান ও আবরু-ইজ্জত সুরক্ষিত ও কলুষমুক্ত থাকিবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়বস্তু সমূহে লিপ্ত হইবে, তাহার অবস্থা এরূপ—যেমন কোন রাখাল তাহার পশুপালকে (সরকারী বা কাহারও) সংরক্ষিত স্থান (Protected area) এর নিকটবর্তী চরাইয়া থাকে; তদবস্থায় অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার পশুগুলি ঐ সংরক্ষিত এলাকায় ঢুকিয়া পড়িবে (এবং তদ্বন্ধন রাখাল বিপদগ্রস্ত হইবে। তদ্রূপ মধ্যস্থলীয় সন্দেহজনক বিষয়বস্তুগুলি হইতে যে ব্যক্তি সংযমী না হইবে এবং উহা হইতে দূরে না থাকিবে,

† এই হাদীছটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হাদীছ। মানুষ কি উপায়ে স্বীয় দ্বীন ও ধর্মজীবনকে রক্ষা ও হেফাজত করিতে এবং মানবতার উৎকর্ষ ও উন্নতি সাধন করিতে পারে তাহারই উপায় এই হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। তাছাড়া এই হাদীছটির আরও অসংখ্য অনেক বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। তাই প্রথমতঃ সরল অনুবাদ তৎপর ব্যাখ্যা এবং তারপর “বিশেষ দৃষ্টব্য” আকারে ইহার একটি সূক্ষ্ম তত্ত্বের বিশ্লেষণ করা হইবে।

অচিরেই অনিবার্ধরূপে তাহার নক্ষ বা প্রবৃত্তি স্পষ্ট হারামে লিপ্ত হইয়া পড়িবে, ফলে সে ছনিয়া ও আখেরাতে অপদস্থ হইবে)। তোমরা শুনিয়া রাখ, প্রত্যেক বাদশারই সংরক্ষিত এলাকা থাকে (যেখানে অস্ত্র সকলের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকে)। অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালার নিষিদ্ধ বিষয়বস্তু সমূহই ছনিয়ার বৃকে তাঁহার সংরক্ষিত স্থান তুল্য; (সেখানে কাহারও প্রবেশ করিতে নাই, অধিকন্তু উহার নিকটবর্তী হওয়া তথা সন্দেহজনক বিষয়ে লিপ্ত হওয়াও উচিত নহে।

সন্দেহজনক বিষয়-বস্তু হইতে স্বীয় দ্বীন-ধর্ম ও আবরু-ইজ্জতকে কলুষমুক্ত, পরিচ্ছন্ন ও সুরক্ষিত রাখিতে এবং মানবতার উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়া উর্দ্ধগামী হইতে সহজে সক্ষম হওয়ার জন্য) আরও শুনিয়া রাখ, মানুষের অজুদের ভিতরে অর্থাৎ মানব দেহের মধ্যে এমন একটি অংশ আছে যে, সেই অংশটি যখন যথার্থরূপে ঠিক হইয়া যায়, তখন মানুষের পূর্ণ অজুদই ঠিক হইয়া যায়। (অর্থাৎ সম্পূর্ণ মানব দেহটিই তখন সঠিকভাবে পরিচালিত হইতে থাকে।) পক্ষান্তরে সেই অংশটি যখন খারাপ হইয়া পড়ে, তখন সমস্ত অজুদটিই খারাপ হইয়া যায় (অর্থাৎ মানব দেহের কোন অংশ বা কোন অঙ্গই তখন সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না)। বিশেষভাবে জানিয়া রাখা উচিত যে, সেই অংশটি হইতেছে আ'কল বা বিবেক।*

ব্যাখ্যা :—শরীয়তের যাবতীয় হুকুম-আহকাম (আদেশ-নিষেধাবলী) চারি প্রকার দলীল দ্বারা প্রমাণিত হইয়া থাকে। কোরআন, হাদীছ, এজমা ও কেয়াছ। উহার যে কোনও একটি দ্বারা যে কোন বিষয় সুনির্দিষ্টরূপে “হালাল” বৈধ ও গ্রহণীয় বলিয়া প্রমাণিত হইবে উহাই হালাল এবং যে কোন বিষয় সুস্পষ্টরূপে “হারাম” নিষিদ্ধ ও বর্জনীয় বলিয়া প্রমাণিত হইবে উহাই হারাম। এতদৃষ্টে হালাল ও হারাম অতি স্পষ্ট বস্তু এবং ঐ সকল দলীল, প্রমাণ ও মাপকাঠি দ্বারা উভয়কে বাছিয়া লওয়া অত্যন্ত সহজ। অধিকন্তু ইহাও স্পষ্ট যে, হালালকে গ্রহণ করা যাইবে এবং হারামকে বর্জন করিতে হইবে—ইহাতে কোন প্রকার মতদ্বৈধতা বা কোন প্রকার দুর্বলতা বশতঃ এদিক সেদিক বিন্দুমাত্রও নড়চড় করিবার অবকাশ নাই। কিন্তু হালাল ও হারাম পর্যায়দ্বয়ের মধ্যবর্তী আরও কতিপয় বিভিন্ন পর্যায় রহিয়াছে। যথা—(১) মকরুহ, (২) খেলাফে-আওলা বা অবাঞ্ছনীয়, (৩) ইমাম ও খাটী ওলামাদের মতবিরোধমূলক বিষয়াদি। এতদ্ব্যতীত এমন আরও বহু বিষয়াদি আছে যাহা শরীয়তে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এবং তাহা ছাড়াও দৈনন্দিন কার্যকলাপের ভিতর দিয়া প্রায়শই এরূপ বিষয়াদি আমাদের সম্মুখবর্তী হইতে থাকে যাহা নির্দিষ্টভাবে হালাল বলিয়াও নিশ্চিত হওয়া যায় না, কিম্বা হারাম বলিয়াও স্থির করা যায় না—এই সকল অনিশ্চিত

* قلب “কলব” শব্দের প্রকৃত অর্থ দেল বা হৃদয়। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হইল উহার মধ্যে নিহিত আ'কল বা বিবেক, এমনকি কেহ কেহ বলেন যে, এখানে কলব শব্দটি সরাসরি আ'কল বা বিবেক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। (ফতুল্লাবারী)

ও সন্দেহমূলক বিষয়গুলিকে সমস্তে পরিহার করিয়া চলাই একান্ত বাঞ্ছনীয়। কেননা, এই সমস্ত সন্দেহজনক বিষয়-বস্তু সমূহ হইতে বিরত থাকিলে এক দিকে জাগতিক ব্যাপারে যেমন লাভবান হওয়া যায়, কারণ সন্দেহের স্থানে পা রাখিলেই স্বীয় মান-মর্যাদা বলুণ্ডিত হওয়ার এবং নানা প্রকার কুংসা রটিবার সুযোগ উপস্থিত হয়। অত্র দিকে তেমনি স্বীনের ব্যাপারেও লাভের সীমাই থাকে না, কারণ যে ব্যক্তি স্বীয় নফ্ছ ও প্রবৃত্তিকে সন্দেহের স্থান হইতে বিরত রাখিতে অভ্যস্ত হইবে সে নিশ্চয়ই যাবতীয় কুপ্রলোভনের বস্তু হইতে, যাবতীয় কুকর্ম হইতে এবং যাবতীয় হারাম কার্য হইতে স্বীয় নফ্ছকে ফিরাইয়া রাখিতে সক্ষম হইবে।

হারাম ও সন্দেহজনক কার্যাবলী হইতে বাঁচিতে চাহিলে সর্বপ্রথম স্বীয় আকল ও বিবেককে যথার্থরূপে সূষ্ঠ ও ঠিক করিতে হইবে। কারণ, মানুষের বিবেকই মানবদেহরূপী কারখানার জ্ঞাত বৈদ্যাতিক মোটর (Electric motor) স্বরূপ। মোটর ঠিকভাবে চালু থাকিলে কারখানার প্রতিটি শাখা, উহার প্রত্যেকটি অংশ ও সমস্ত কল-কজার চাকাগুলিই রীতিমত চলিতে থাকিবে। আর মোটরে গোলযোগ থাকিলে উহার সহিত সংযোগ রক্ষাকারী সমস্ত মেশিন ও উহার অংশগুলির মধ্যেও গোলযোগ দেখা দিবে। অবশ্য মোটরের সহিত চাকাগুলির সক্রিয় সংযোগ রক্ষার প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নতুবা মেশিনের বিভিন্ন অংশের সহিত সংযোগ বিহীন শুধু মোটর চালাইয়া বসিয়া থাকিলে উদ্দেশ্য সফল হইবে না এবং ঐ প্রকার নিরর্থক ও অনিয়মিত পরিচালনার ফলে কারখানা ফেল (Fail) হইয়া যাইবে। অতএব মেশিনের সমস্ত কলকজা ও উহার বিভিন্ন অংশ-গুলিকেও রীতিমত চালু রাখিয়া মোটরের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কারণ উহার ভাল-মন্দের প্রভাব সমস্ত কারখানার উপর পড়িয়া থাকে। তদ্রূপ মানবের কর্তব্য তাহার বিবেক-বুদ্ধিকে সূষ্ঠ করিয়া তারপর সেই সূষ্ঠ জ্ঞান-বিবেকের দ্বারা স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে পরিচালিত করা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আলোচ্য হাদীছটিকে হাদীছে-তাওক্বা, হাদীছে-হালাল-হারাম, হাদীছে এছলাহে-কাল্ব বা আধ্যাতিক শুদ্ধি লাভের হাদীছ বলা হয়। নবী (দঃ)-এর হাদীছ সমূহের মধ্যে চারিটি হাদীছ এমন আছে যাহাকে সমস্ত শরীয়ত ও তরীকত তাছাওফের মূল উৎস বলা যাইতে পারে। হাদীছগুলি এই :—

১ম—নিয়তের হাদীছ (সর্বপ্রথমে—১ নম্বরে যে হাদীছটির অনুবাদ হইয়াছে)

২য়—نَعَمْ مَا يُرِيْبُكَ اِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ “সন্দেহজনক বিষয় ত্যাগ করিয়া

নিঃসন্দেহ বিষয়কে অবলম্বন কর।”

৩য়—اَزْهَدْ فَيْمًا فِىْ اَيْدِى النَّاسِ “মানুষের হাতের কোন কিছুর আশা ও

লিপ্সা রাখিও না.” ৪র্থ—উপরে বর্ণিত আলোচ্য হাদীছটি।

এই হাদীসের শেষ অংশ..... *الاجساد مضمغة* “মানবদেহের মধ্যে একটি বিশেষ অংশ আছে যাহার উন্নতি-অবনতির উপর সম্পূর্ণ দেহের উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করে” এই তথ্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ইহাতে মানুষের সৃষ্টি-তত্ত্ব ও দেহ-তত্ত্বের ইঙ্গিত দানে মানবের প্রকৃত উন্নতির উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছে এবং সতর্ক করা হইয়াছে যে—শূল দেহের উন্নতি অপেক্ষা সূক্ষ্ম আত্মার উন্নতির উপরই মানুষের প্রকৃত ও মুখ্য উন্নতি নির্ভর করে। আত্মার উন্নতি সাধিত না হইলে মানব জীবন বিফল ও অত্যন্ত বিড়ম্বনায় পতিত হয়।

উপরোক্ত বাক্যটি পূর্ণরূপে অনুধাবন করার জন্য মানব-দেহ সংক্রান্ত কয়েকটি তথ্যমূলক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জ্ঞাত হওয়া আবশ্যিক ; যাহা অতিশয় উচ্চ পর্যায়ের ও গবেষণামূলক। তাই মনোযোগের সহিত ইহার প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে।

মানুষের অজুদ বা অস্তিত্ব দুই ভাগে বিভক্ত—“শূলদেহ” যাহা বাহ্য দৃষ্টিতে বা যান্ত্রিক সাহায্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া থাকে এবং “সূক্ষ্ম আত্মা”+ যাহা ঐক্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না। মানুষের শূলদেহে সৃষ্টির মূলে যে রূপ বিভিন্ন উপাদান রহিয়াছে, যথা—পানি, মাটি, বায়ু ও অগ্নি সেরূপ তাহার এই ভৌতিক দেহাভ্যন্তরে পাঁচ প্রকারের আত্মাও রহিয়াছে। ১ম—পশুর আত্মা ; যদ্বারা খাওয়া-শোওয়া, কামরিপু চরিতার্থ করা ইত্যাদি প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়। ২য়—হিংস্র জন্তুর আত্মা ; যদ্বারা ঘেঁষ, হিংসা, ক্রোধ ও রাগের বশীভূত হইয়া মারামারি কাটাকাটি করতঃ প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে ; ৩য়—শয়তানের আত্মা ; যাহার প্ররোচনায় পাপাচার, অহংকার, মিথ্যা ও সূক্ষ্ম কুট-কৌশলের দ্বারা মানুষকে ধোকা দেওয়া ইত্যাদির প্রবৃত্তি উদ্ভূত হয়। ৪র্থ—ফেরেশতা-আত্মা ; যদ্বারা সঙ্গাচার, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যতা, সত্যতা, পরোপকারিতা ও আল্লাহর বশুতা স্বীকার করা ইত্যাদির আগ্রহ ও আকর্ষণ জন্মিয়া থাকে। ৫ম—মনুষ্যদেহের আত্মা ; যাহার কর্তব্য হইতেছে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় আত্মাকে বশ করতঃ উহাদিগকে কুপ্রবৃত্তির দিক হইতে

+ অস্ত্রান্ত্র প্রাণীর স্থায় মানুসও একটি প্রাণী বটে, কিন্তু অস্ত্রান্ত্র প্রাণীর স্থায় মানুস কেবল-মাত্র নিম্ন জগতের ভৌতিক পদার্থের দ্বারাই সৃষ্ট নয়। মানুষের দেহ ভৌতিক পদার্থে সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দেহ-মধ্যস্থ মাটি, পানি, আগুন ও বায়ু জাতীয় পদার্থ নিচয়ের সংমিশ্রণে যে বাষ্প বা বিদ্যুৎ জাতীয় সূক্ষ্ম ও শক্তি-শালী পদার্থের সৃষ্টি হয়, সেই বাষ্পের দ্বারাই মানুষের নফছে-আত্মারা (প্রবৃত্তি) সৃষ্ট। ইহা অতি শক্তিশালী পদার্থ, এমনকি বিদ্যুৎ অপেক্ষাও বেশী শক্তিশালী। কিন্তু উহা ভাল-মন্দ বিবেচনা ও পরিণাম-চিন্তা বিবজ্জিত। তজ্জপরি মানবদেহের সৃষ্টি মূলে উর্দ্ধ জগতের একটি জিনিষও মিশ্রিত রহিয়াছে। তাছাওফের পরিভাষায় সেই জিনিষটির নাম হইতেছে “রুহ”। উহাই মানবাত্মা এবং উহাই বিবেক ও আকলের আকর। “রুহ” উর্দ্ধ জগৎ হইতে আল্লাহর আদেশে মানুষের ভিতরে আবিস্কৃত হয়।

ফিরাইয়া দিয়া ফেরেশতা-আত্মার সদগুণাবলীতে গুণাবিত ও পরিচালিত করা এবং আল্লার মা'রুফাত ও মহব্বত হাছেল করতঃ হুনিয়াতে আল্লার খেলাফত তথা আল্লার হুকুম-আহকাম জারীর পরিবেশ কায়ম করা।

প্রথমোক্ত তিনটি আত্মাকেই তাছাওফের পরিভাষায় “নফ্ছে আন্নারা” বলা হয় এবং চতুর্থ ও পঞ্চম এই দুইটিকে রুহ, আ'কল বা লতিফা বলা হয় এবং এইটিই হইতেছে বিবেক, বুদ্ধি ও মানবাত্মা। এতদদৃষ্টে দেখা গেল যে—ঐ পাঁচ প্রকারের আত্মাই তাছাওফের পরিভাষায় দুই নামে পরিচিত হইয়াছে। একটি হইল—নফ্ছে আন্নারা; ইহার তিনটি বিভাগ যথা—পশুর আত্মা, হিংস্র জন্তুর আত্মা ও শয়তানের আত্মা। দ্বিতীয় হইল—রুহ অর্থাৎ মানবাত্মা বা বিবেক ও আ'কল; ইহার দুইটি বিভাগ যথা—ফেরেশতা-আত্মা ও মনুষ্যাত্মার আত্মা।

রসূলুল্লাহ (দঃ) **اَلَا اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً** বলিয়া মানব দেহের যে বিশিষ্ট অংশটির প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়াছেন, সে অংশটিই হইতেছে এই রুহ বা আ'কল ও বিবেক। ইহার উন্নতিতে পূর্ণ মানব দেহের উন্নতি এবং ইহার অবনতিতে সম্পূর্ণ মানব দেহের অবনতি ঘটিয়া থাকে; তাহাই হয়ত রসূলুল্লাহ হাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—

اِذَا مَلَعْتُ مَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ

অর্থাৎ রুহ বা জ্ঞান-বিবেক রক্তটির উন্নতি সাধিত হইলে সমগ্র মানব দেহেরই উন্নতি হইবে এবং উহার অবনতিতে সমগ্র মানব দেহেরই অবনতি ঘটিবে।

এখন দেখিতে হইবে যে, ঐ অংশটির উন্নতির অর্থ কি? বস্তুতঃ প্রতিটি জিনিষের উন্নতি বা অবনতির বিচার করা হয় উহার উপর অপিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের সূচুতার দ্বারা। তাই এখানে দেখিতে হইবে যে রুহ বা বিবেকের উপর কি কি দায়িত্ব ও কর্তব্য অপিত হইয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। কারণ, রুহ—মানবাত্মা বা বিবেক বলিয়া যে দুইটি আত্মার নামকরণ হইয়াছিল অর্থাৎ ফেরেশতা-আত্মা ও মনুষ্যাত্মার আত্মা উহাদের কর্তব্য ছিল সদাচার, সত্যতা, সত্যতা ও আল্লার বশবর্তীতা ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট করা এবং সঙ্গে সঙ্গে নফ্ছের মধ্যে যে অপর তিনটি শক্তি বা আত্মা আছে উহাদিগকে বশে আনিয়া ফেরেশতা-আত্মার সদগুণাবলীতে পরিচালিত করা, অতএব রুহ বা বিবেকের দায়িত্ব এবং কর্তব্যও তাহাই হইবে। এই মহান কর্তব্য পালনে রুহ—মানবাত্মা বা বিবেক যতটুকু উন্নতি করিতে পারিবে, পূর্ণ মানব দেহটি ততটুকুই উন্নতি লাভ করিবে। এমনকি অবশেষে ঐ রুহ—মানবাত্মা যে উর্ক জগৎ হইতে আসিয়াছিল পুনরায় সে মানবদেহকে লইয়া সেই উর্ক জগতে অর্থাৎ—বেহেশতে যাইয়া পৌছিবে। পক্ষান্তরে রুহ—মানবাত্মা নিজের এককর্তব্যে অটুত করতঃ নিজেই যদি নষ্ট তথা ঐ তিন প্রকার আত্মার বশত্বা স্বীকার করার অবনতিতে পতিত হয়, তাহা হইলে পূর্ণ মানবদেহই অবনতির তিমির গর্তে পতিত হইবে। অবশেষে ঐ রুহ—মানবাত্মা মানবদেহকে লইয়া সর্ব নিম্ন জগতে তথা জাহান্নামে পৌছিবে।

আধ্যাত্মিক জ্ঞানবিশারদগণ রুহ বা বিবেকের উন্নতির পাঁচটি স্তর বর্ণনা করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করিয়াছেন। পূর্বেই ইঙ্গিত করা হইয়াছিল যে, রুহ—মানবাত্মা বা আ'কল ও বিবেককে তাছাওফের পরিভাষায় “লতিফা” নামেও নামকরণ হইয়া থাকে। সেই অনুসারেই রুহের উন্নতির পাঁচটি স্তরের নিম্নলিখিতরূপে নামকরণ করা হইয়াছে। যথা—(১) লতিফায়ে-কাল্ব; মানুষ যখন আল্লাহকে স্মরণ করে, আল্লার নাম উচ্চারণ করতঃ জ্বের করে তখন সে এই লতিফায়ে-কাল্বের কর্তব্য পালন করে। (২) লতিফায়ে-রুহ; মানুষ যখন আল্লার মহৎ গুণাবলীর ধ্যান করে এবং ঐ ধ্যানের দ্বারা নিজের মধ্যেও ঐ গুণের প্রতিবিম্ব হাসিল করে, যেমন—আল্লাহ দয়ালু, দয়াময় ইহার ধ্যান করতঃ এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করে যে, আমাকেও দয়ালু হইতে হইবে এবং দয়ালুর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হইবে; তখন হয় লতিফায়ে রুহের কর্তব্য পালন। (৩) লতিফায়ে-সের'; মানুষ যখন আল্লার গুণাবলীর প্রতিবিম্ব নিজের মধ্যে হাসিল করায় সচেষ্ট হয় তখন তাহার ছিনার অভ্যন্তরে আল্লার মা'রেফাতের তথা আল্লার গুণাবলীর তত্ত্বজ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়; ইহাই হইতেছে লতিফায়ে-সের'-এর কর্তব্য। (৪) লতিফায়ে-খফী; মানুষের মধ্যে যখন আল্লার মা'রেফাতের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায় তখন মানুষ আল্লার গুণে মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়া আল্লার আশেক ও প্রেমিকে পরিণত হইয়া যায় এবং নিজের নফসের সব কুপ্রবৃত্তির প্রতি ঘৃণা জন্মিয়া যায় এবং সেগুলিকে ফানা ও বিলুপ্ত করিয়া দেয়—অর্থাৎ সেগুলিকে পূর্ণরূপে দখল ও অধিকার করার শক্তি ও সামর্থ্য অর্জন করে; ইহাই হইতেছে লতিফায়ে-খফীর কর্তব্য। (৫) লতিফায়ে-আখ্ফা; মানুষ ফানা-ফিল্লাহ অর্থাৎ নফসের সমুদয় কুপ্রবৃত্তিগুলিকে দখল ও দমন করার সামর্থ্য লাভ করার পর, বকা-বিলাহ তথা আল্লার গুণে গুণান্বিত হওয়ার মর্তবায় পৌছে, যাহাকে আল্লার খেলাফত লাভ বলে; ইহাই হইতেছে লতিফায়ে-আখ্ফার মর্তবা ও মর্যাদা। এই অবস্থাতেই রুহ বা বিবেক ও আ'কলের পূর্ণ শুদ্ধি হইয়া যায়। এই অবস্থার পরে আর বিবেক ও আ'খলাক কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইতে হয় না। রসুলুল্লাহ (দঃ) মানবকে স্বীয় আ'কল ও বিবেককে সঠিক করার যে প্রেরণা দান করিয়াছেন, উহার উদ্দেশ্য হইতেছে মানবাত্মার চরম ও পরম উন্নতির উচ্চ পর্যায়।*

গণীমতের × পঞ্চমাংশ ইসলামী ষ্টেটকে দেওয়া এবং উহা

উসূল করা ইসলামের একটি অঙ্গ

পাঠকবৃন্দ। দুনিয়াতে বিভিন্ন প্রকারের ধর্মমত ও তৎসম্পর্কিত মতবাদ প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু উহার কোনটিতেই মানুষের পরিপূর্ণ জীবন-দর্শন বা জীবন যাপন প্রণালীর

• উল্লেখিত হাদীছের বিস্তারিত তথ্যাবলী মাওলানা শামসুল হক সাহেব কর্তৃক বর্ণিত।

× গণীমতের মাল কাহাকে বলে—৩২নং হাদীছের ফুটনোট দেখুন।

পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা দেখা যায় না। কোনটিতে কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক এবাদৎ-বন্দেগী অর্থাৎ পরলৌকিক জীবন-দর্শন সম্বন্ধে কিছু ব্যবস্থা রহিয়াছে, কিন্তু জাগতিক জিন্দেগী সম্বন্ধে কোনই ব্যবস্থা নাই। আবার কোনটিতে শুধু পাখিব জীবন অর্থাৎ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক ও পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু ব্যবস্থা রহিয়াছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয়ের কোন ব্যবস্থাই উহাতে নাই। ইসলাম যেহেতু কোনও মানুষের মনগড়া মতবাদ নয়, বরং ইহা সমস্ত জগতের মানব জাতির জন্য সমভাবে কল্যাণকর ও সম্যকরূপে মঙ্গল বিধায়ক এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যাহা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান আল্লার দরবার হইতে তাহারই নিয়োজিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ প্রতিনিধি রসূল (দঃ) কর্তৃক আনীত ও প্রচারিত। তাই ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-দর্শন ও পরিপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা সম্বলিত মানবধর্ম। ইহাতে মানব জীবনের প্রয়োজনীয় কোন একটি দিকও বাদ পড়ে নাই বা কেবলমাত্র কোনও একদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া অন্য দিককে ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। তাই দেখা যায়—ইসলাম ধর্মের মধ্যে আধ্যাত্মিক চরম উন্নতি সাধনের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক তথা—পারিবারিক, অর্থনৈতিক, সমাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবস্থা সমূহও উহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। যেমন—প্রকৃত শান্তিদাতা আল্লার আইন জারী করতঃ হুনিয়াতে শান্তি স্থাপনের ব্যবস্থা করার জন্য জেহাদকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কৃষি, শিল্প বাণিজ্য, চাকুরী বা মজহুরী ইত্যাদি দ্বারা হালাল উপায়ে অর্থ উপার্জন করাকেও ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বিবাহের দ্বারা শুদ্ধরূপে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন পূর্বক হুনিয়া আবাদ করাকেও ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তজ্জপ ইসলামী ষ্টেটের বহনেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং তজ্জন্ত নানাপ্রকার আয়ের পথকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে গণীমতের মাল হইতে এক পঞ্চমাংশ ইসলামী ষ্টেটে জমা দেওয়া এবং উহা রাষ্ট্রীয় আয়রূপে উন্মূল করাও ইসলামের অন্তর্ভুক্ত একটি বিশেষ ব্যবস্থা।

ইমাম বোখারী (রঃ) এখানে তাহাই একটা হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন।

৪৮। হাদীছঃ— ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন— (তদানীন্তন আরবে) আবদুল কায়েস নামক একটি গোত্র ছিল (তাহারা বাহরাইন নামক স্থানে বসবাস করিত)। তাহাদের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায়ে রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে আসিল। প্রাথমিক পরিচয়াদির পর রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন—লাজিত ও লজ্জিত হইবার পূর্বেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ও অনুরাগিত হওয়ায় আপনাদিগকে ধন্যবাদকা তাহারা আরজ করিল, ইয়া রসূলুল্লাহ! জিল্‌কদ, জিলহজ্জ, মোহাররম ও রজব এই চারিটি বিশেষ সম্মানিত মাস ব্যতীত অন্য সময় আমরা আপনার খেদমতে হাজির হইতে

ঐ অর্থাৎ যুদ্ধের দ্বারা বশতা স্বীকারে বাধ্য করার পূর্বেই অনুরাগিত হওয়ায় আপনাদিগকে ধন্যবাদ। নতুবা লাজিত, অপমানিত হইতে হইত এবং এখন সাক্ষাতে উভয়েরই লজ্জা বোধও হইত।

অক্ষম। কারণ, আপনার দরবারে উপস্থিত হওয়ার পথিমধ্যে “মোজার” গোত্রীয় কাকেরদের বাসস্থান, (তাই অন্য সময় যাতায়াত করা আমাদের জন্য সম্ভবপর ও নিরাপদ নহে+)। আপনি আমাদিগকে কয়েকটি স্পষ্টতর উপদেশ ও আদেশ-নিষেধ বলিয়া দিন, যাহা অনুসরণ করিয়া আমরা সকলে বেহেশত লাভের উপযুক্ত হইতে পারি। এতদ্ব্যতীত তাহারা (সেকালের) প্রচলিত পানীয় সমূহের (মধ্যে হালাল-হারামের) বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) প্রথমতঃ তাহাদিগকে চারিটি কর্তব্যের আদেশ করিলেন—(১) এক আল্লার উপর ঈমান আনার আদেশ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—“এক আল্লার উপর “ঈমান” কাহাকে বলে জান কি ? তাহারা আরজ করিল, আল্লাহ এবং আল্লার রসুলই (দঃ) তাহা ভালরূপ বলিতে পারেন। তিনি বলিলেন, উহার অর্থ এই—কায়মনো-বাক্যে এই অঙ্গীকার ও স্বীকারোক্তি করা যে, একমাত্র আল্লাহই মা'বুদ (অর্থাৎ তাঁহার প্রেরিত ও মনোনীত মতবাদ—ইসলামই একমাত্র গ্রহণীয়, আমি উহাকেই গ্রহণ করিতেছি।) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনও মা'বুদ নাই (অর্থাৎ—অন্য সকল প্রকার মতবাদ বর্জনীয়, সুতরাং সে সব আমি বর্জন করিতেছি।) এবং মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার রসুল ঃ (অর্থাৎ—তাঁহার বণিত সকল আদেশ-নিষেধ ও প্রদর্শিত আদর্শসমূহ আল্লার তরফ হইতেই প্রেরিত ও মানব জাতির জন্য নির্ধারিত প্রকৃত সত্য আদর্শ; এতদ্ব্যতীত অন্য সকল প্রকার আদর্শই বাতিল ও বর্জনীয়।) (২) নামায উত্তমরূপে আদায় করা (৩) যাকাত দান করা। (৪) রমজান মাসের রোযা রাখা এবং গণীমতের মালের পঞ্চমাংশ (বাইতুল মালে জমা) দেওয়া। ইহা ছাড়া রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে চারিটি বস্তু (ব্যবহার করিতে) নিষেধ করিলেন×—(সেকালে আরব দেশে চারি প্রকার পাত্র প্রসিদ্ধ ছিল যাহাতে মত্ত তৈরী করা হইত। তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে এই সকল পাত্রে তৈরী পানীয় বস্তু, এমনকি যে কোন কার্ঘ্যে এই সমস্ত পাত্রের ব্যবহারও নিষেধ করিলেন; যেন পাত্র দেখিয়া মদের

+ সে কালের কাকের মোশরেকরাও উক্ত চারিটি মাসকে সন্মানিত গণ্য করিত। এই চারি মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি, কাটাকাটি ইত্যা-লুণ্ঠন হইতে সকলেই বিরত থাকিত।

† এখানে একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে আল্লার সাক্ষা রসুলরূপে মানিয়া ও গ্রহণ করিয়া লওয়ারকে আল্লার উপর ঈমান আনারই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গণ্য করা হইয়াছে। কারণ “এক আল্লার উপর ঈমান”এর ব্যাখ্যা দুইটি বিষয়ের যুগপৎ সমন্বয়ের দ্বারা করা হইয়াছে অর্থাৎ এক আল্লাহকে মা'বুদ বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কেও সত্য রসুলরূপে মানিয়া লওয়া। সুতরাং মোহাম্মদ (দঃ)কে রসুলরূপে মানিয়া লওয়া ব্যতিরেকে শুধু তাওহীদ অর্থাৎ এক আল্লাহকে মা'বুদ বলিয়া স্বীকার করাকে “আল্লার উপর ঈমান” গণ্য করা হইবে না। এ সম্পর্কে বিস্তারিত দলীল-প্রমাণ দ্বিতীয় খণ্ডে ৭২৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যায় বণিত আছে।

× হাদীছের মধ্যে এই চারিটি পাত্রের নাম নিম্নলিখিতরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা—حتم এক প্রকার সবুজ রঙ্গের কলসী। زقاق খেজুর গাছের গুলির মধ্যস্থল খোলা করিয়া মটকার ছায় তৈরী এক প্রকার পাত্র। دابة কুনা কছর খোলা বা বাওয়াস। حرقاق চতুষ্পার্শ্বে বানিশ করা, চিনা মাটির তৈরী বায়েম বিশেষ। (অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

কথা মনে পড়িয়া না যায় বা কেহ অশু জিনিষের ছলনায় মত্ত তৈরী করিতে না পারে।) রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে ইহাও বলিলেন, এই সব আদেশ-নিষেধকে আপনারা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লউন এবং দেশে গিয়া সকলকে ইহা জানাইয়া দিবেন।

ছওয়াবের নিয়াতে কাজ করার উপরই আমলের ছওয়াব নির্ভর করিয়া থাকে

লكن جهاد و نية
নেক কাজের নিয়াতেও ছওয়াব হয়, যেমন হাদীছে আছে
মক্কা নগরী মোসলমানদের করতলগত হওয়ার পর যখন মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করার মত অতি বড় একটি ছওয়াবের কাজের হুকুম রহিত হইল, তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—জেহাদ করিয়া ছওয়াব হাসিলের পথ এবং জেহাদের নিয়াত ও প্রয়োজন হইলে হিজরত করিব এই নিয়ত দ্বারা ছওয়ার হাছিলের পথ সর্বদাই খোলা থাকিবে।

৪৯। হাদীছ :—আবুহুলাই ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন—যখন কেহ ছওয়াব হাসিলের নিয়াতে স্বীয় পরিবারবর্গের জন্য টাকা পয়সা খচর করে, তখন তাহার ঐ খরচ ছদকারূপে পরিগণিত হইয়া থাকে।

৫০। হাদীছ :—সাদ ইবনে আবু অকাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তুমি যাহা কিছু খরচ করিবে উহার ছওয়াব নিশ্চয় পাইবে ; এমনকি জীর (প্রতি ভালবাসা দেখাইয়া আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাহার) মুখে লোক্কা (খাত্ত-গ্রাস) তুলিয়া দেওয়াতেও ছওয়াব হইবে।

অর্থাৎ সাধারণ দৃষ্টিতে যাহাকে ছওয়াবের আমল গণ্য করা হয় না, কিন্তু সঠিক নিয়াত দ্বারা উহাতেও, এমনকি শরীয়ত অনুমোদিত আনন্দ উপভোগের কাজেও ছওয়াব হাসিল হয়।

হিত ও মঙ্গল কামনা বড় ধর্ম

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—হিত কামনা করা এবং মঙ্গল কামনা করাই ধর্ম। আল্লার (দ্বীনের) মঙ্গল কামনা করা, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের (আদর্শ ও মিশনের) মঙ্গল কামনা করা, (খাঁচী) মোসলমান শাসনকর্তাদের মঙ্গল কামনা করা ও সর্বসাধারণ মোসলমানদের মঙ্গল কামনা করা।

ব্যাখ্যা :—আল্লার দ্বীনের মঙ্গল কামনার অর্থ আল্লার দ্বীনকে মনে প্রাণে গ্রহণ পূর্বক জীবনের প্রতি স্তরে উহাকে যথার্থরূপে প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিফলিত করা এবং উহার তবলীগ অর্থাৎ সাধারণে প্রচার ও বিস্তারের জন্য যথাসাধ্য সচেষ্ট হওয়া, প্রয়োজনে জেহাদ করিয়া উহার উপর যাবতীয় সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধ ও প্রতিহত করা।

প্রাচীনকালে আরবদেশে এই সকল পাত্রের শরাব অর্থাৎ মত্ত তৈয়ার করা হইত, কারণ এগুলির মধ্যে পানীয় বস্তুতে ক্ষত মাদকতা সৃষ্টি হইতে। মদ্যপান হারাম (নিষিদ্ধ) হওয়ার প্রাথমিক অবস্থায় ঐ সকল পাত্রের ব্যবহারও নিষিদ্ধ ছিল, পরে অবশ্য শুধু মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ রহিয়াছে, কিন্তু সাধারণ কার্যে ঐ সব পাত্রের ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা মনচ্ছ বা রহিত হইয়াছে।

রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মঙ্গল কামনার অর্থ তাঁহার শিক্ষা ও আদর্শ মনেপ্রাণে গ্রহণ পূর্বক অবিকলিত ভাবে উহার অনুসরণ করিয়া যাওয়া ও সর্বদা তাঁহার অনুগত থাকা এবং তাঁহার আদর্শকে সর্বপ্রকার বাধা বিপত্তির হাত হইতে রক্ষা করতঃ তাঁহার আদর্শ ও মিশনকে সারা বিশ্বে সমুন্নত রাখার চেষ্টায় ত্রুতী থাকা।

খাঁটী মোসলমান শাসনকর্তার মঙ্গল কামনার অর্থ এই—তায় বিচারক ও সদাচারী মোসলমান শাসনকর্তার সর্বপ্রকার তায় নীতি ও আইন-কানুনের অনুগত থাকা এবং তায় কাজে সহযোগীতা করিয়া যাওয়া, অতায়ভাবে তাঁহার প্রতি বিদ্রোহী না হওয়া।

মোসলমান জনসাধারণের মঙ্গল কামনার অর্থ তাহাদের সর্বপ্রকার হক আদায় করা, তাহাদের মধ্যে “আম্ব-বিল-মারুফ ও নিহি আনিল-মোনকার” অর্থাৎ সৎপথ প্রদর্শন ও কুপথ হইতে বিরত রাখার চেষ্টা সর্বদা করিয়া যাওয়া। সর্বাবস্থাতেই সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ ব্যবহার বজায় রাখিয়া চলা। বিশেষতঃ স্বীয় গুণ বা পদমর্যাদা ও সাধ্যানুসারে সর্বসাধারণের উপকার ও উন্নতির জন্ত সর্বশক্তি প্রয়োগ করা। যেমন—কোন ব্যক্তি ডাক্তার হইয়াছে, সে ডাক্তারি করিয়া শুধু টাকা উপার্জন করিলেই চলিবে না। বরং সর্বসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে এবং গরীব-দুঃখীর উপকারার্থে সাধ্যানুযায়ী সচেষ্ট হইবে। অথবা কোন ব্যক্তি ধনাঢ্য হইয়াছে, সে শুধু নিজের পেটই ভরিলে, এমনকি কেবলমাত্র যাকাৎ, ফৎরা আদায় করিয়া ক্ষান্ত হইলেই চলিবে না। তাহাকে সর্বসাধারণের উপকার ও গরীব কান্দালের সাহায্য যথাসাধ্য করিয়া যাইতে হইবে। ধনাঢ্য ব্যক্তির মালের উপর যাকাৎ ভিন্ন আরও হক রহিয়াছে। কোরআন শরীফে ২ পারা ৬ রুকুতে আছে—

.....وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
যাহারা নামাজ কায়েম করে, যাকাৎ দান করে, এতদ্ভিন্ন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্ত আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিছকিন, অসহায়-পথিক ও যাক্ষাকারীকে দান করে।”

হাদীছে আছে—“মালের উপর যাকাৎ ভিন্ন আরও অনেক হক আছে।” (তিরমিজী)
হাদীছে আরও আছে—لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَىٰ جَنْبِهِ

অর্থ:—“ঐ ব্যক্তি মোমেন নহে—যে নিজে পেট ভরিয়া খায় ও তাহার প্রতিবেশী তাহার নিকটেই অনাহারে দিন কাটায়।” (মেশকাত শরীফ)

এইরূপে যে ব্যক্তি আলেম তাহার কর্তব্য দ্বীনের শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিয়া যাওয়া এবং সর্বসাধারণকে সৎপথে পরিচালিত করার আন্তরিক আগ্রহের সহিত লাগিয়া থাকা—যেমন রসুলুল্লাহ (দঃ) করিতেন। মানবজাতিকে সৎপথে আনয়নে তাঁহার কি অপরিমিত আগ্রহ ও বিরামহীন চেষ্টা যত্নই না ছিল। যদরূপ আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

“মনে হয় আপনি এই অহুতাপে প্রাণ দিয়া দিবেন যে, কাকেররা কেন ঈমান আনে না।” (১০ পারা ১৩ রুকু)

এইরূপে শারীরিক শক্তি সামর্থ্য দ্বারাও জনগণের বিপদ উদ্ধারে আপ্রাণ চেষ্টা করা চাই। এ সবই হইল সর্বসাধারণের মঙ্গল কামনার অর্থ। এতদ্ব্যতীত ইহার আরও দুইটি শাখা আছে। যথা—

প্রথমতঃ এই যে, কোনও সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হইলে তৎসংশ্লিষ্ট সমস্ত কার্যাবলী ও দায়িত্বসমূহ সুচারুরূপে নির্বাহ করতঃ সর্বসাধারণের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত রাখা।

দ্বিতীয়তঃ এই যে, রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক কোনও ক্ষমতার অধিকারী হইলে সেই ক্ষমতার বিনুমাত্র অপব্যবহার না করিয়া স্বার্থপরতা, লোভ, মোহ, স্বজন-প্রীতি ইত্যাদি সবপ্রকার দুর্নীতি ত্যাগ পূর্বক জনগণের একনিষ্ঠ খাদেমরূপে কাজ করিয়া যাওয়া।

৫১। হাদীছঃ—জরীর ইবনে আবুহুলাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমি হযরত রশূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাতে হাত দিয়া বায়আ'ত ও দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি এবং অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছি যে—নামায যথাসাধ্য উত্তমরূপে আদায় করিব, যাকাৎ দান করিব, প্রত্যেক মোসলমানের খায়েরখাহী বা হিত সাধন ও মঙ্গল কামনা করিব।

৫২। হাদীছঃ—ছাহাবী মুগিরা ইবনে শোবা (রাঃ) কুফার শাসনকর্তা ছিলেন, হঠাৎ তিনি এস্টেকাল করেন। তখন জরীর ইবনে আবুহুলাহ (রাঃ) নামক ছাহাবী যাহাতে রাজ্যের মধ্যে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হইতে পারে সে উদ্দেশ্যে সকলকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং সকলের উদ্দেশ্যে এক শুভেচ্ছামূলক বক্তৃতা করিলেন। তিনি প্রথমতঃ আল্লাহর প্রশংসা করিয়া তারপর বলিলেন—মোসলেম ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনারা এক খোদার ভয় সর্বদা অন্তরে জাগ্রত রাখিবেন এবং সর্বদা শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবেন। যাবৎ নূতন শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া না আসেন আপনারা এ সমস্ত বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। নূতন শাসনকর্তা অতি সত্বরই নিযুক্ত হইয়া আসিবেন। তারপর বলিলেন—আপনারা মৃত শাসনকর্তার জন্ত মাগফেরাতের (ক্ষমা প্রাপ্তির) দোয়া করুন। তিনি ক্ষমা করা ভাল বাসিতেন, আপনারা দোয়া করুন যেন আল্লাহ তাঁহাকে ক্ষমা করেন। তারপর তিনি বলিলেন—আমার এই বক্তৃতা করার একমাত্র কারণ এই যে, আমি যখন নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাতে বায়আ'ত করিয়াছিলাম, তখন নবী (দঃ) আমার উপর এই শর্ত আরোপ করিয়াছিলেন যে, “সকল মুসলমানের মঙ্গল কামনা করিবে।” আমি সেই শর্তে বায়আ'ত করায় আপনাদের বর্তমান পরিস্থিতির যোগ্য মঙ্গল কামনা করিয়া এই বক্তৃতা করিলাম। এই বলিয়া তিনি নিজের ও সকলের জন্ত এসুতেগফার ও ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ মিস্কার হইতে নামিয়া আসিলেন।

● এই বক্তৃতায় মৃত শাসনকর্তার মঙ্গল কামনা করা হইল যে, তাঁহার জন্ত মাগফেরাতের দোয়া নিজেও করিলেন এবং অজ্ঞ সকলকে উহার আহ্বান জানাইলেন। সর্বসাধারণের মঙ্গল কামনা করা হইল যে, তাহাদিগকে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির হাত হইতে রক্ষার জন্ত চেষ্টা করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়*

এল্ম

এ'লেমের ফজিলত ও প্রয়োজনীয়তা

কোরআন শরীফে আছে—

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

অর্থ:—যাঁহারা ঈমান আনিয়াছেন এবং বিশেষতঃ এল্ম হাসিল করিয়াছেন আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদিগকে অনেক উচ্চাসনের অধিকারী করিবেন (২৮ পা: ২ কঃ)।

এল্ম ব্যতীত মানুষ উন্নতি লাভ করিতে পারে না, তাই আল্লাহ তায়ালা হযরত রসূলুল্লাহ (দঃ)কে এল্মের উন্নতি এবং জ্ঞান বর্ধনের দোয়া শিক্ষা দান করিয়াছেন এবং সেই দোয়া করার আদেশ করিয়াছেন। (১৬ পা: ১৫ কঃ)

“আপনি বলুন—হে প্রভু! আমার এল্ম বদ্ধিত করিয়া দিন।
أَنَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ — এতদ্বিধা আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন —

“আল্লামার বান্দাদের মধ্যে আলেমগণের অন্তরেই খোদার ভয় থাকে।”+ (২০ পা: ১৬ কঃ)
আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন (২৩ পা: ১৫ কঃ)—

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“এল্মের অধিকারীগণ এবং এল্মহীনগণ কখনও সমপর্যায়ের হইতে পারে কি?”

আরও আছে— قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

“দোষখবাসীরা এই বলিয়া আক্ষেপ করিবে যে, হায়! (ছনিয়ায় থাকাকালে) যদি আমরা (দ্বীনের কথা) অস্তের নিকট হইতে শুনিয়া শিক্ষা করিতাম বা অন্ততঃ বিবেক বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম-জ্ঞান লাভ করিতাম, তবে (আজ) আমরা দোষখীদের দলভুক্ত হইতাম না” (২৯ পারা ১ কঃ)

* এই অধ্যায়ের পরিচ্ছেদগুলির আসল বিষয়বস্তু ঠিক রাখিয়া পাঠকদের সুবিধার্থে উহার ধারাবাহিকতার মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন শিরোনামা একত্রিকরণও হইয়াছে।

+ এই আয়াতের দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান ও খাঁটি এল্মের নিদর্শন বা আলামত এইরূপে নির্ধারিত হয় যে—যে জ্ঞান ও এল্ম আল্লামার ভয়-ভক্তির বাহক ও অছিলা হয় এবং যদ্বারা মানুষের মনে আল্লামার ভয় ও ভক্তির সঞ্চার হয়, উহাকেই প্রকৃত জ্ঞান ও এল্ম বলা যাইতে পারে।

হযরত রসূলুল্লাহ ছালাম্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—(১৬ পৃঃ)

إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ
وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ.

উপরোক্ত হাদীছটি একখানি দীর্ঘ হাদীছের অংশ বিশেষ। সম্পূর্ণ হাদীছটির পূর্ণ বিবরণ এইরূপ—দামেস্ক শহর নদীনা শরীফ হইতে প্রায় ছয় শত মাইল দূরে অবস্থিত। সেখানে আব্দ-দরদা (রাঃ) নামক বিশিষ্ট ছাহাবী বাস করিতেন। একদা এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হে আব্দ-দরদা (রাঃ)। আমি মদীনা হইতে দীর্ঘ ছয় শত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আপনার নিকট পৌছিয়াছি শুধু মাত্র এই উদ্দেশ্যে যে, আমি শুনিতে পাইয়াছি, আপনি হযরত রসূলুল্লাহ ছালাম্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে একখানা হাদীছ বর্ণনা করিয়া থাকেন, ঐ হাদীছখানা আমি আপনার নিকট হইতে শুনিব, ইহা ব্যতীত অন্য কোনও উদ্দেশ্যে আমি এখানে আসি নাই। তখন আব্দ-দরদা (রাঃ) বলিলেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ ছালাম্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—(১) যে ব্যক্তি এলুম হাসিল করার উদ্দেশ্যে পথ অতিক্রম করিবে, আল্লাহ তায়ালা সেই অছিলায় তাহার জন্ত বেহেশতের পথ সহজ ও সুগম করিয়া দিবেন। (২) নিশ্চয় জানিও, স্বীনের শিক্ষা ও জ্ঞান অন্বেষণকারী তালেবে-এলুমকে সন্তুষ্ট করার জন্ত ফেরেশতাগণ তাঁহাদের সম্মুখে স্বীয় পাখা ও ডানা বিছাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করেন (এবং ফেরেশতাগণ তালেবে-এলুমদের খেদমতে রত থাকেন।) (৩) সাত আসমান ও ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত সকল জীব এমনকি পানির মধ্যে অবস্থানকারী মৎস্য জাতীয় জীবজন্তু পর্যন্ত আলেমের জন্ত মাগফেরাতের দোয়া করিতে থাকে*। (৪) একজন শরীয়তের পায়রবীকারী খাঁচা আলেম যিনি সর্বদা এলুম চর্চায় রত থাকার দরুন অন্য কোনও নফল এবাদৎ বা অজিকা ইত্যাদির জন্ত সময় পান না, তাঁহার মর্যাদা ও ফজিলত একজন এলুমহীন আবেদ—নফল এবাদৎ-বন্দেগীতে মশগুল ব্যক্তির তুলনায় এরূপ, যেমন পুণিমার চাঁদের মর্যাদা

* কারণ খাঁচা আলেমগণ দ্বারা হুনিয়াতে আল্লাহর স্বীনের উন্নতি হওয়ার তাঁহাদের অছিলায় হুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালায় রহমত বর্ষিত হয়, যদ্বারা হুনিয়ার অবস্থানকারী সকল প্রাণীই লাভবান হইয়া থাকে। যেমন সাধারণতঃ দেখা যায় যে, পৃথিবীতে বৃষ্টিপাত না হইলে পশু পাখী, মৎস্য ইত্যাদি সকল জীবই নিস্তেজ ও অধীর হইয়া পড়ে এবং নববর্ষের বৃষ্টি বর্ষণে প্রাণী মাত্রই সতেজ, আনন্দমুখর ও পুলকিত হইয়া উঠে। হুনিয়াতে বৃষ্টিপাত ইত্যাদি আল্লাহর রহমত খাঁচা আলেমগণের দ্বারা আল্লাহর স্বীন জারী হওয়ার বদৌলতেই হইয়া থাকে এবং আল্লাহ-প্রদত্ত অনুভূতির দ্বারা প্রত্যেক প্রাণীই আল্লাহর রহমতের সেই অছিলাকে উপলব্ধি করিতে পারে বলিয়া তাহারা সেই অছিলা তথা আলেমগণের জন্ত ক্ষমা ও মাগফেরাতের দোয়া করিয়া থাকে।

সাধারণ নকশের উপর পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। (৫) নিশ্চয় জানিও আলেমগণ নবীদের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী। এই পৃথিবীতে নবীগণের ত্যাজ্য সম্পত্তি একমাত্র এলুম। যে ব্যক্তি উহা হাসিল করিয়াছে সে অতি মূল্যবান সম্পদ লাভ করিয়াছে (মেশকাত শরীফ)। বোখারী শরীফে উল্লেখিত হাদীছটির শুধু ৫ নং ও ১নং বিষয় দুইটি উল্লেখ আছে।

বিশিষ্ট ছাহাবী হযরত আবু-জর গেফারী (রাঃ) বলেন, আমাকে কতল বা হত্যা করার জ্ঞান যদি তোমরা আমার গর্দানের উপর তরবারি রাখিয়া দাও এবং আমি বুঝিতে পারি যে, তরবারি চালিত করিয়া আমার কতল ক্রিয়া সম্পন্ন করার পূর্ব মুহূর্তে আমি এতটুকু সময় ও সুযোগ পাইব যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি মাত্র বাণী তাঁহার উম্মতগণকে শিক্ষাদান করিতে বা তাহাদের নিকট পৌছাইয়া দিতে পারিব, তবে তাহাও আমি অবশ্যই করিব, ততটুকু সুযোগও আমি কখনও হাতছাড়া হইতে দিব না।

ওমর (রাঃ) বলিতেন, **تفقوا قبل ان تسودوا** “সর্দার বা নেতা নির্বাচিত অথবা কর্মকর্তা নিয়োজিত হইবার পূর্বে তোমাদের তাফাকোহ অবশ্যই হাসিল করিতে হইবে।” (১৭ পৃঃ)

এখানে ‘তাফাকোহ’ হাসিল করার অর্থ কেবলমাত্র এলুম হাসিল করাই নহে, বরং কোরআন ও রসুলের (দঃ) স্মরণ তথা হাদীছের ভিতরে সমুদয় আধ্যাত্মিক বিষয়াদি সহ জাগতিক বিষয়সমূহ সম্বন্ধে যে আলো দান করা হইয়াছে এবং আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্তার যে সব সমাধান তাহাতে দেওয়া হইয়াছে এবং রসুলের (দঃ) পরবর্তী যুগত্রয়ে অর্থাৎ ছাহাবাগণের যুগে, তাবয়ীগণের যুগে ও তাবয়ে-তাবয়ীগণের যুগে পরবর্তী সমস্তা সমূহের যে সব সমাধান তাঁহারা কোরআন ও হাদীছের আলোতে দান করিয়া গিয়াছেন সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে এক একটি করিয়া আয়ত্ত করিতে হইবে এবং এসবকে জ্ঞানের মূলধনরূপে হাতে লইয়া ভবিষ্যৎ-কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে; যাহাতে সেই মূলধনরূপী জ্ঞান-প্রদীপের আলোতে সমুখবর্তী প্রতিটি সমস্তার সমাধান খুজিয়া পাওয়া যায় এবং সর্বস্তরেই হায-অহায, সত্য-মিথ্যা সৎ-অসৎএর বিচার বিশ্লেষণ করা সহজ হয়। খলীফা ওমর (রাঃ) কতৃক এই আদেশ জারীর পর হইতেই তাফাকোহ হাসিলের ট্রেনিং প্রথা চালু করা হইয়াছিল। নৈতিক ট্রেনিং এর সঙ্গে সঙ্গে বৈষয়িক ট্রেনিং এরও ব্যবস্থা ছিল।

কথার মধ্যভাগে প্রশ্নের উত্তরদানে বিলম্ব করা

৫৩। হাদীছ :—আবু হোরাযরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদিন মজলিসে কোন একটি বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় একটি গ্রাম্য লোক আসিয়া (ঐ আলোচনারত অবস্থায়ই) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কেয়ামত কবে আসিবে? রসুলুল্লাহ (দঃ) (ঐ প্রশ্নের উত্তরে কিছু না বলিয়া) স্বীয় বক্তব্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন। ইহাতে কেহ বেহ মন্তব্য করিল যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) হযরত প্রশ্নটি শুনিয়াছেন, কিন্তু এইভাবে প্রশ্ন করা নাপছন্দ করিয়াছেন। আর কেহ কেহ মন্তব্য করিল

যে, হয়ত তিনি প্রশ্নটি আদৌ শুনিতে পান নাই। কিন্তু বক্তব্য শেষ করিয়া রমুল্লাহ (দ:) জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রশ্নকারী কোথায়? সে ব্যক্তি আরজ করিল, আমি উপস্থিত আছি ইয়া রমুল্লাহ।*

নবী (দ:) বলিলেন—যখন আমানতের খেয়ানত করা হইতে থাকিবে (তথা দায়িত্ব-জ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত ও দায়িত্ব পালনের ক্রটি হইতে থাকিবে) তখন কেয়ামতের অপেক্ষা করা। (অর্থাৎ তখন মনে করিবে যে, কেয়ামত বা জগতের ধ্বংস ও প্রলয় নিকটবর্তী হইয়াছে)। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, আমানতে খেয়ানতের রূপ কি হইবে? উত্তরে হযরত (দ:) বলিলেন, বিশেষতঃ হুকুমত ও রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনা বা শাসন ক্ষমতার ভার যখন অযোগ্য পায়ে অর্পিত হইবে, অযোগ্য ও অবিদ্বান লোকদিগকে যখন রাষ্ট্রীয় কার্যে ও ক্ষমতায় নির্বাচন বা নিযুক্ত করা হইবে, তখন জগৎ ধ্বংসের অপেক্ষা করিতে থাকিবে।

ব্যাখ্যা :—সকল প্রকার আমানতের খেয়ানত কেয়ামত বা জগৎ ধ্বংস নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। বিশেষতঃ শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা জনসাধারণের অর্থের অপচয় এবং রাষ্ট্রীয় কার্যে দায়িত্ব পালনের প্রতি অবজ্ঞা ও শাসন ক্ষমতার অপব্যবহার দ্বারা দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং রক্ষকের নামে ভক্ষকের অভিনয় ইত্যাদি বিশেষ ভাবে কেয়ামতের আলামতরূপে পরিগণিত।

এলমের কথা দরকার বশতঃ উচ্চৈঃস্বরে বলা †

৫৪। হাদীছ :—আবুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, এক সফরে পথ চলিতে নবী ছালামাহ আলাইহে অসালাম আমাদের পেছনে রহিয়া গিয়াছিলেন। আমরা আছর নামাযের প্রায় শেষ ওয়াক্তে এক স্থানে অজু আরম্ভ করিলে হযরত আমাদের নিকট পৌঁছিলেন। আমরা তাড়াহুড়া বশতঃ পূর্ণাঙ্গ পান্না ধুইয়া কেবলমাত্র মুছিয়া ফেলার স্থায় অসম্পূর্ণভাবে পান্না ধুইলাম, পায়ের গোড়ালী শুষ্ক থাকিল; উহাতে পানি পৌঁছিল না। নবী (দ:) আমাদের এইরূপ করিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, এই সমস্ত পায়ের (শুক) গোড়ালী দোযখের অগ্নিতে দগ্ধ হইবে; দুই-তিনবার এইরূপ বলিলেন।

ওস্তাদ কর্তৃক শীগেদগণের পরীক্ষা করা

৫৫। হাদীছ :—আবুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা নবী ছালামাহ আলাইহে অসালামের নিকট বেহ খেজুর গাছের মাথি (গাছের মাথার অভ্যন্তরস্থ মিষ্ট কোমল অংশ) আনিয়াছিল। হযরত তাহা খাইতে লাগিলেন এবং ছাহাবীগণকে লক্ষ্য

* কাহারও বক্তব্য শেষ করার পূর্বে কথার মধ্যভাগে প্রশ্ন করা যদিও বে-আদবী বটে, কিন্তু যেহেতু এই ব্যক্তি গ্রাম্য অশিক্ষিত লোক ছিল, তাই হযরত তাহার এই প্রকার প্রশ্নে তাহাকে তিরস্কার করেন নাই। প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বক্তব্য শেষে উত্তর দিয়াছেন।

† নবী (দ:) সাধারণতঃ নীচ স্বরে কথা বলিতেন এবং ইহাই স্মরণত।

করিয়া বলিলেন, এক প্রকার গাছ আছে যাহার পাতা কখনও ঝড়িয়া পড়ে না। মোমেন ব্যক্তির সাথে ঐ গাছের তুলনা হইতে পারে, (অর্থাৎ মোমেন ব্যক্তি যেমন সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে—সর্বাবস্থায় স্বীয় প্রভুর ভক্ত ও অনুরক্ত থাকে এবং পরোপকারে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিয়া রাখে, তদ্রূপ ঐ গাছটিও সর্বাস্থীন পরোপোকারী এবং কোন ঋতুতেই উহার মধ্যে কোনও পরিবর্তন আসে না।) বল দেখি! সেই গাছটি কোন্ গাছ? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্ত সফলেরই ধারণা জঙ্গলের বিভিন্ন প্রকার গাছের প্রতি খাতিত হইতে লাগিল। আমার মনে ধারণা হইল যে, উহা খেজুর গাছ হইবে; কিন্তু ঐ মজলিসের মধ্যে আমি সকলের চেয়ে বয়োজনীয় ছিলাম, বড়দের সম্মুখে কিছু বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিলাম। ছাহাবীগণ শেষ পর্যন্ত বলিতে অপারগ হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ (দঃ)! আপনি বলিয়া দিন, উহা কি গাছ। হযরত (দঃ) বলিলেন, উহা খেজুর গাছ। তখন আমি আমার পিতা ওমর (রাঃ)কে আমার ঐ মনের কথা খুলিয়া বলিলাম। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, যদি তুমি উহা বলিয়া দিতে, তাহা হইলে আমি এতদূর সন্তুষ্ট হইতাম যে, ছনিয়ার কোনও ঐচ্ছিক ধন সম্পত্তি পাইলেও তদ্রূপ সন্তুষ্টিলাভ হইত না। (কারণ, তাঁহার মনের উত্তর সঠিক উত্তর ছিল। হযরত (দঃ) উহা শুনিতে তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ে তিনি তাঁহার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হইতেন।)

দ্বীনের কথা যোগ্য লোক দ্বারা যাচাই করিয়া লইবে

৫৬। হাদীছ :—ছাহাবী আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, অনাবশ্যক প্রশ্নাবলীর দ্বারা কোন কোন ছাহাবী রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বিরক্ত করিয়া তুলিলে ঐ সম্পর্কে কোরআন শরীফের একটি বিশেষ আয়াত নাযেল হয়; যদ্বারা ঐ প্রশ্নাবলী হইতে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। তাই ছাহাবীগণ রসূলুল্লাহ (দঃ)কে প্রশ্ন করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন এবং কোনও বুদ্ধিমান বিদেহী আগন্তকের প্রতীকায় থাকিতেন। (কারণ নূতন আগন্তক এই সকল বিধিনিষেধ সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকার দরুন খোলাখুলিভাবে প্রশ্ন করিবে, রসূলুল্লাহ (দঃ) উহার উত্তর দিবেন ও ছাহাবীগণ সেই উত্তর শুনিয়া তদ্বারা জ্ঞান ও এলুম হাসিল করিবেন।)

একদা আমরা মসজিদের মধ্যে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মজলিসে বসিয়া ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি উটের উপর সওয়ার হইয়া আসিল এবং উট হইতে অবতরণ করিয়া উহাকে বাঁধিল; তারপর মসজিদের ভিতরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের মধ্যে মোহাম্মদ (দঃ) কে? (আনাছ (রাঃ) বলেন, ঐ সময়) নবী (দঃ) হেলান দেওয়া অবস্থায় আমাদের মধ্যস্থলে বসিয়াছিলেন। আমরা উত্তর করিলাম—এই যে হেলান দেওয়া উপবিষ্ট নূরানী চেহারাওয়ালা। অতঃপর সে নবী (দঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিল, আমি আপনার নিকট কয়েকটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিব এবং কড়াকড়ির সহিত জিজ্ঞাসা করিব; আপনি তজ্জন্ত মনে ব্যথিত হইবেন না। নবী (দঃ) বলিলেন, আপনার যাহা ইচ্ছা—মন খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তখন সে বলিল, আপনার প্রেরিত

এক ব্যক্তি আমাদেরকে বলিয়াছে, আপনি ইহা দাবী করিয়া থাকেন যে—আল্লাহ আপনাকে রমূল নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন। নবী (দঃ) বলিলেন, সে সত্য এবং ঠিকই বলিয়াছে। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আসমান কে সৃষ্টি করিয়াছে? হযরত রমূল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ। সে জিজ্ঞাসা করিল, এই সবেৰ মধ্যে উপকারী বস্তুনিচয় কে সৃষ্টি করিয়াছে? নবী (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ। সে বলিল, আমি আপনার ও আপনার পূর্ববর্তী সকলের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা যিনি আসমান-জমিন সৃষ্টি করিয়াছেন, পাহাড়-পর্বত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং এই সবেৰ মধ্যে অসংখ্য উপকারী বস্তুনিচয় রাখিয়াছেন—তাঁহার কসম দিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, সত্যই কি আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সমস্ত জগৎদ্বারী প্রতি রমূল নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন? নবী (দঃ) উত্তর করিলেন—আল্লাহ শপথ করিয়া বলিতেছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে সমস্ত জগৎদ্বারী প্রতি তাঁহার রমূল নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন। অতঃপর ঐ লোকটি বলিল, যেই আল্লাহ আপনাকে রমূলরূপে প্রেরণ করিয়াছেন আমি আপনাকে সেই আল্লাহ কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি—আল্লাহ তায়ালা কি আপনাকে এই আদেশ করিয়াছেন যে, দিবা-রাত্রে আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করিতে হইবে? নবী (দঃ) বলিলেন—আমি আল্লাহ কসম করিয়া বলিতেছি, আল্লাহই দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করিবার আদেশ করিয়াছেন। লোকটি ঐরূপেই বলিল, আমি আপনাকে আল্লাহ কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি—স্বয়ং আল্লাহই কি আপনাকে আদেশ করিয়াছেন যে, আমাদের পূর্ণ রমজান মাসের রোযা রাখিতে হইবে? নবী (দঃ) বলিলেন, আমি আল্লাহ কসম করিয়া বলিতেছি, স্বয়ং আল্লাহই আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, আমাদের পূর্ণ রমজান মাসের রোযা রাখিতে হইবে। লোকটি বলিল, আমি আপনাকে আল্লাহ কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি—স্বয়ং আল্লাহই কি আপনাকে আদেশ করিয়াছেন যে, আমাদের মালদারের নিকট হইতে যাকাত উমূল করিয়া গরীবদিগকে দান করিতে হইবে? নবী (দঃ) বলিলেন, আমি আল্লাহ কসম করিয়া বলিতেছি, স্বয়ং আল্লাহই আমাকে এই আদেশ করিয়াছেন যে, ধনীদিগের নিকট হইতে যাকাত উমূল করিয়া গরীবদিগকে দান করিতে হইবে। লোকটি এইরূপে হজ্জের বিষয়ও প্রশ্ন করিল এবং নবী (দঃ) পূর্বোক্ত ঐরূপেই উত্তর দিলেন।

তারপর লোকটি বলিল, আমি আমার সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছি। আমার নাম জেমাম-ইবনে ছা'লাবাহ। লোকটি প্রত্যাবর্তনকালে শপথ করিয়া বলিল, যেই আল্লাহ আপনাকে সত্যের বাহকরূপে পাঠাইয়াছেন, সেই মহান আল্লাহ শপথ করিয়া বলিতেছি, (আপনি যাহা কিছু আল্লাহ তরফ হইতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়া আমাদেরকে শিক্ষা দিয়াছেন,) আমি উহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করিব না। লোকটির দৃঢ়তা দেখিয়া হযরত (দঃ) বলিলেন, যদি সে তাহার কথার সত্যবাদী প্রমাণিত হয় তবে নিশ্চয়ই সে বেহেশতবাসী হইবে।

অভিজ্ঞ বিশ্বস্ত ব্যক্তি ধর্ম বিষয়ে কিছু লিখিয়া বা বিশ্বস্তসূত্রে পাঠাইয়া দিলে তাহা গ্রহণ যোগ্য

এই পরিচ্ছেদের মধ্যে ইমাম বোখারী (র:) একটি বিশেষ জ্ঞানের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। উহা হইতেছে এই যে, একে অশ্রের নিকট কোনও বিষয় ব্যক্ত করার তিনটি স্তর আছে, যথা—সাক্ষ্য, শিক্ষা ও সংবাদ। সাক্ষ্যের পর্যায়টি সকলের উপরে। কেননা সাক্ষ্যের দ্বারা অশ্রের উপর একটি জিনিষ বাধ্যতামূলকরূপে চাপাইয়া দেওয়া হয়। সেই জন্তই সাক্ষ্য পর্যায়ের মধ্যে শুধু সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত হওয়াই যথেষ্ট নহে, বরং তৎসঙ্গে সংখ্যারও আবশ্যক হইবে। অন্ততঃপক্ষে বিশ্বস্ত দুই জন পুরুষ বা এক জন পুরুষ ও দুই জন স্ত্রীলোক সাক্ষ্যদানকারী হইতে হইবে। ইহার কম হইলে সাক্ষ্য বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। সাক্ষ্যের জন্ত আরও একটি বিষয় অত্যাৱশ্যক যে, সাক্ষীকে সাক্ষ্য গ্রহণকারী সাক্ষাতে উপস্থিত হইতে হইবে, অসাক্ষাতে লিখিত পত্ররূপে বা টেলিগ্রাম, টেলিফোন, টেলিভিশন, ইত্যাদি পন্থায় প্রদত্ত সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না*। দ্বিতীয় পর্যায় হইল শিক্ষা; শিক্ষাদানকারী সত্যিকারের জ্ঞানী ও প্রকৃত জ্ঞানদানেচ্ছু খাতি ও বিশ্বস্ত হইতে হইবে। তাছাড়া শিক্ষার্থীর প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, সে তাহার দান করা বিষয় সমূহকে পূর্ণ মর্যাদা সহকারে গ্রহণ করে কিনা, মনোযোগের সহিত শ্রবণ ও গ্রহণ করতঃ উহার অর্থ, মর্ম ও বিশদ ব্যাখ্যা সম্যকরূপে অনুধাবন করতঃ (মুখস্থ করার বিষয়াবলী) যত্নের সহিত মুখস্থ করিয়া রাখে কি না। তৃতীয় পর্যায় হইল সংবাদ; ইহার জন্ত আবশ্যক হইল সংবাদদাতা পূর্ণ বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী হওয়া। শিক্ষা ও সংবাদ পর্যায়দ্বয়ের জন্ত সংখ্যারও আবশ্যক হয় না, সাক্ষাতেরও প্রয়োজন হয় না।

ইমাম বোখারী (র:) এখানে প্রমাণ করিতে চাহেন যে, বিশ্বস্ত সূত্রে লিখিত আকারে যদি কোন জ্ঞান দান করা হয়, তবে শরীয়ত অনুযায়ী উহা গ্রহণযোগ্য †। কারণ,

* সাক্ষ্যের জন্ত এই দুইটি বিশেষ শর্ত মোটামুটিরূপে লেখা হইল। এ বিষয়ে আরও বহু বিস্তারিত তথ্য আছে যাহার পূর্ণ বিবরণ ফেকার কিতাব সমূহে পাওয়া যাইবে।

† লিখিত আকারে এলম সাক্ষাতে দান করা বা প্রেরণ করা (যদি প্রেরকের লেখা চিনিতে পারে) বা লোক মারফৎ এলম প্রেরণ করা, এ সবই যদি খাতি বিশ্বস্তসূত্রে হয় তবে উহা গ্রহণযোগ্য হইবে, কিন্তু যেহেতু হাদীছ শাস্ত্রে অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করা হয় সেজ্জাত উল্লিখিত কোনও সূত্রে প্রাপ্ত হাদীছকে আখ্‌বারানা "الخبر" হাদ্দাহানা "حدَّثنا" শব্দদ্বয় দ্বারা ব্যক্ত করা যাইবে না। কারণ এই শব্দ দুইটি একমাত্র সাক্ষাতে নিজ কানে শ্রবণ করা অর্থাৎ শিক্ষাদাতা ওস্তাদ স্বয়ং পড়িয়াছেন, শিক্ষার্থী শাগের্দ মনযোগের সহিত ওস্তাদের শব্দগুলি শ্রবণ করিয়াছেন বা ওস্তাদের সম্মুখে শাগের্দ পড়িয়াছে, ওস্তাদ পূর্ণ একাগ্রতার সহিত শুনিয়াছেন এবং স্বীয় কণ্ঠস্থ বা লিপির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার ব্যাপারে শাগের্দের ভুল ত্রুটির প্রতি পূর্ণ খেয়াল রাখিয়াছেন। কেবলমাত্র এই সূত্রদ্বয়ে প্রাপ্ত হাদীছকেই "হাদ্দাহানা বা আখ্‌বারানা" বলিয়া ব্যক্ত করা হয়।

ইহা শিক্ষা পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। ধর্মীয় বিষয়সমূহে বিশ্বস্ত হওয়ার প্রথম শর্তই হইল, জ্ঞানদাতা আল্লার আইন মান্যকারী অর্থাৎ মোসলমান হওয়া; তারপর পরিচিত ও সত্যবাদী হওয়া।

(১) রসুলুল্লাহ (দ:) কোথাও সৈন্যদল প্রেরণ করিলে (গোপনীয়তা রক্ষার্থে) গন্তব্য স্থানের নাম প্রকাশরূপে উল্লেখ করিতেন না, বরং সেনাপতির হাতে একটি লিপি দিয়া কোনও নির্দিষ্ট স্থানের নাম বহিয়া দিতেন যে, ঐ স্থানে পৌঁছিয়া লিপি পাঠ করিবে, উক্ত লিপিতে সঠিকরূপে গন্তব্য স্থানের উল্লেখ থাকিত এবং তদনুযায়ী সৈন্য পরিচালিত হইত এবং সকলেই উহা মানিয়া চলিত। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে—বিশ্বস্তরূপে প্রাপ্ত লিখিত বিষয় গ্রহণযোগ্য।

(২) আবুবকর ছিদ্দিক (রা:) তাঁহার খেলাফৎ আমলে ওমর ফারুক (রা:) এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট ছাহাবীগণকে লইয়া তাঁহাদের সর্বসম্মত পরামর্শে হযরত রসুলুল্লাহ (দ:) কর্তৃক অক্ষরে অক্ষরে লিপিবদ্ধরূপে সুরক্ষিত ভিন্ন ভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন আকারের লিখিত পবিত্র কোরআনের ছুরা ও আয়াত সমূহকে বিশেষ সতর্কতার সহিত একত্রিত করিয়া গ্রন্থাকারে এক জেলদ কোরআন শরীফ লেখাইয়াছিলেন। উহা স্বয়ং খলীফার তত্ত্বাবধানে সরকারী হেফাজতে রাজধানী মদীনা শরীফে রক্ষিত ছিল। খলীফা ওসমান (রা:) তাঁহাঃ খেলাফত-কালে ঐ কোরআন শরীফের জেলদখানাকে সম্মুখে রাখিয়া তত্পরি পুনরায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতঃ সাত জেলদ কোরআন শরীফ লেখাইয়া রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নরদের নিকট এক এক জেলদ পাঠাইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে—আমার প্রেরিত কোরআন শরীফ জেলদের কোনরূপ ব্যতিক্রমে কাহারও নিকট কোরআনরূপে কিছু লেখা থাকিলে তাহা অগ্নিদাহ পূর্বক নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে।

ইমাম বোখারী (র:) দেখাইতে চাহেন যে—খলীফা ওসমান (রা:) কর্তৃক লিখিতরূপে প্রেরিত কোরআন শরীফ সমস্ত ছাহাবা ও তাবয়ীগণই বিনা বিধায় মানিয়া লইয়াছিলেন, এমনকি তিনি “জামেউল-কোরআন” রূপে আখ্যায়িত হইয়াছিলেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বস্তমুদ্রে লিখিতরূপে প্রাপ্ত বিষয়-বস্তু গ্রহণযোগ্য।

বিশেষ দৃষ্টব্যঃ—সাধারণতঃ খলীফা ওসমান (রা:)কে “জামেউল-কোরআন” অর্থাৎ কোরআন সঙ্কলক বলা হয়। এতদ্বিধা খলীফা ওসমান (রা:) আদেশ জারী করিয়াছিলেন, যে, তাঁহার প্রেরিত কোরআন শরীফের ব্যতিক্রমে কোরআনরূপে কিছু লেখা থাকিলে তাহা যেন নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হয়। এই দুইটি কথাই মূলধন করিয়া ইসলামের শত্রু কুচক্রিরা নানা অবাস্তব বিষ ছড়াইয়া থাকে এবং নানা প্রকার কল্পনার অবতারণা করিয়া প্রতারণার সূত্র যোগায়।

কোরআন সঙ্কলনের প্রকৃত ইতিহাস এই যে—কোরআনের প্রতিটি শব্দ ও আয়াত নাযেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যাবতীয় উপায়ে উহাকে সুরক্ষিত করিয়া রাখা হইত। আয়াত নাযেল হওয়ার সাথে সাথে উহা রসুলুল্লাহ (দ:) কর্তৃক ও হৃদয়স্থ হওয়ার তার স্বয়ং আল্লাহ

তায়াল্লাই গ্রহণ করিয়াছিলেন, যেমন ৪ নং হাদীছে ইহার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। তারপর ছাহাবীগণ কতৃক মুখস্থ ও কণ্ঠস্থ করা হইত। তত্পরি রসুলুল্লাহ (দঃ) চারজন সুদক্ষ লেখক নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং আয়াত নাযেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের কাহাকেও ডাকিয়া নিজ তত্ত্বাবধানে উহা লেখাইয়া রাখিতেন* এবং অগ্ৰাণু ছাহাবীগণও যথাসম্ভব লিখিয়া লইতেন। এইরূপে দীর্ঘ ২৩ বৎসরকাল কোরআনের আয়াতসমূহ ধীরে ধীরে নাযেল হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহা মুখস্থরূপে ও লিখিত আকারে সুরক্ষিত হইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) বর্তমান থাকা কালেই হাজার হাজার ছাহাবীদের মুখে মুখে তেলাওয়াত হইতে থাকে। তত্পরি প্রতি বৎসর যতটুকু নাযেল হইত বৎসর শেষে রমজান মাসে ফেরেশতা জিব্রাইলের সঙ্গে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এই সম্পূর্ণ অংশটুকু দণ্ড করিতেন—একে অণ্ডকে শুনাইতেন, এমনকি ২৩শ বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ণ কোরআন শরীফ এইরূপে দুইবার দণ্ড করেন, যেমন ৫নং হাদীছে এই বিষয়টি বিস্তারিতরূপে উল্লেখ হইয়াছে। এইরূপে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বর্তমানেই যাবতীয় উপায় অবলম্বনের সহিত লিপিবদ্ধরূপে পূর্ণ কোরআন শরীফ সুরক্ষিত হইয়াছিল।

কিন্তু লিখিত আয়াত ও ছুরা সমূহ ধারাবাহিক ভাবে একত্রিত বা গ্রন্থাকারে সুবিন্যস্তরূপে ছিল না, বরং বিচ্ছিন্নরূপে বিভিন্ন বস্তুর উপর লিখিত ছিল। কারণ, প্রথমতঃ সে কালের সাধারণ রীতিই হয়ত এই ছিল। তা ছাড়া হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বর্তমানে অহীর দ্বারা স্বয়ং আল্লাহ তায়াল্লা কোন কোন আয়াতের তেলাওয়াত মনছুখ বা রহিত করিয়া দিতেন তখন উহা বাদ দিতে হইত। আরও একটি বিশেষ কারণ এই ছিল যে—কয়েকটি বিভিন্ন ছুরার আয়াত সমূহ এককালীন নাযেল হইতে থাকিত। যেমন এখন এক ছুরার একটি আয়াত নাযেল হইল আর একবার অগ্ন ছুরার অগ্ন একটি আয়াত নাযেল হইল, আর একবার অগ্ন ছুরার অগ্ন একটি আয়াত নাযেল হইল, আর একবার অগ্ন ছুরার, আর একবার এই প্রথম ছুরার আর একটি আয়াত নাযেল হইল। এইরূপে বিভিন্ন ছুরার আয়াত এককালীন নাযেল হইত। তখন হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) লেখকদিগকে নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন যে—এই আয়াতটি অমুক ছুরার অমুক স্থানে লিখিয়া রাখ। তত্পরি সময়, স্থান, শানে রুযুল ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে পরের আয়াত আগে, আগের আয়াত পরে নাযেল হইত; কোরআন নাযেল হওয়ার সময় প্রকৃত ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হইত না। এমতাবস্থায় কোরআন নাযেল হওয়াকালে উহাকে সুসজ্জিত সুবিন্যস্ত গ্রন্থাকারে তৈরী করা সম্ভবই ছিল না।

এতদ্ভিন্ন আরও একটি বিষয় ছিল, তাহা এই যে—বাংলা দেশেও যেমন সচরাচর দেখা যায়—পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ বিভিন্ন অংশে এবং বিভিন্ন জেলায় ও অঞ্চলে এক বাংলা ভাষার মধ্যেই উচ্চারণ, শব্দ ও বাক্য ব্যবহারে বিভিন্নতা ও ব্যবধান থাকে।

যেমন—পানি, পানকে অঞ্চল বিশেষ হানি, হান এবং ঘোড়া, দড়িকে ঘোরা, দরি বলা হইয়া থাকে। একটি তরকারি গাছকেই পর্যায়ক্রমে ডাটা, ডাঙ্গা, মাইরা ইত্যাদি বলা হয়। পশ্চিম বঙ্গে “আমি যাব, সে যাবে” বলা হয়, পূর্ব বঙ্গে ঐ অর্থেই আমি যাইবু, সে যাইবে; বলা হয়। তদ্রূপ প্রত্যেক ভাষার মধ্যে এরূপ কিছু আঞ্চলিক ব্যবধান থাকে, কিন্তু ইহার দ্বারা আসল অর্থে বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন ঘটে না, শুধুমাত্র উচ্চারণ, শব্দ ও বাক্যের রূপের পরিবর্তন হইয়া থাকে। আরব দেশের বিভিন্ন গোত্রের মাতৃভাষা একই আরবী ভাষার মধ্যেও উল্লিখিত রূপের ব্যবধান ও ব্যতিক্রম বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ তায়ালায় তরফ হইতে জিব্রিল (আঃ) কর্তৃক হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) নিকট কোরআন শরীফ কেবলমাত্র কোরআয়েশ গোত্রের ভাষার উচ্চারণ ও কায়দার উপরই নাযেল হইয়াছিল। কিন্তু প্রথমাবস্থায় বৃদ্ধ-জওয়ান সব রকমের শোকই সবেমাত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইতেছে, এমতাবস্থায় অপেক্ষাকৃত কঠিন ব্যবস্থা সমীচীন ছিল না। তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) আল্লাহ তায়ালায় সুস্পষ্ট অনুমতি গ্রহণ পূর্বক গোত্রের লোকদিগকে আরবী ভাষায়ই নিজ নিজ উচ্চারণ ও কায়দায় কোরআন শরীফ পড়িতে অনুমতি দিতেন। কারণ উহাতে অতি সামান্য ও নগণ্য পরিবর্তন হইত, তাও অর্থের পরিবর্তন বিন্দুমাত্রও ঘটিত না—শুধু কোন কোন শব্দের উচ্চারণ, রূপ ও বাক্যের আকার পরিবর্তন হইত মাত্র। আসল আরবী ভাষায় কোরআন অপরিবর্তিতই থাকিত।

মোট কথা এই—রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্তমানেই কোরআন শরীফ যাবতীয় উপায়ে সুরক্ষিত হইয়াছিল এবং তাঁহারই তত্ত্বাবধানে অক্ষরে অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। প্রথমতঃ—জেল্দ বা গ্রন্থাকারে একত্রিত ছিল না, দ্বিতীয়তঃ—আরবী ভাষারই বিভিন্ন আকারের উচ্চারণ ও কায়দায় পড়ার অনুমতি ছিল।

খলীফা আবুবকর (রাঃ) তাঁহার খেলাফতকালে ওমর (রাঃ) এবং অন্ত্যান্ত ছাহাবীগণের সর্বসম্মত পরামর্শ অনুযায়ী প্রথম দিকটি পূরণ করিলেন। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ সতর্কতার সহিত কোরআন শরীফের সমস্ত আয়াত ও ছুরাসমূহকে ঙ্গত্রিতরূপে এক জেল্দ বা গ্রন্থ আকারে লেখাইলেন এবং ঐ কোরআন শরীফ জেল্দকে স্বীয় তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্রীয় হেফাজতে রাখিয়া দিলেন। উহা রাজধানী মদীনায়াই রহিল; উহা বা উহার অনুলিপি বিভিন্ন দেশে পাঠান হইল না। তাছাড়া খলীফা আবুবকর (রাঃ) কোরআন শরীফকে পূর্ণরূপে একত্রিত করার প্রতিই অত্যধিক দৃষ্টি রাখিলেন—যেন একটি অক্ষরও বাদ না থাকিয়া যায়। কিন্তু ছুরা সমূহের তরতীব ও স্থান নির্ণয়ের দিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিলেন না। কারণ কোরআনের প্রতিটি ছুরা এক একটি অধ্যায় বা প্রবন্ধের মত; কোন গ্রন্থের অধ্যায় বা প্রবন্ধ সমূহের তরতীব ও সংবিধান ব্যবধান হইলে উহাতে অর্থ ও আসল বিষয়-বস্তুর মধ্যে কোন পরিবর্তন আসে না। এই জন্তই কতিপয় ছাহাবীর নিকট-ছুরাসমূহের স্থান নির্ণয় বা তরতীব বিভিন্ন রূপ ছিল। যথা ছাহাবী আলী (রাঃ) সর্বপ্রথম ছুরা “একরা”

তারপর “আল মোদাছ্‌ছের” তারপর “আল-মোজাম্মেল” তারপর “তাক্বাত” তারপর ছুরা “তাকবীর”—এইরূপে কোরআন নাযেল হওয়া অবস্থার তরতীব রাখিয়াছিলেন। ছাহাবী ইবনে মসউদ (রাঃ) প্রথমে ছুরা “বাক্বারহ” তারপর “নেছা” তারপর “আল-এমরান” এইরূপে রাখিয়াছিলেন। এই বিভিন্নতায় কোন ক্রটি আসে না, অবশ্য বাহ্যতঃ একটু বিশৃঙ্খল দেখায়।

তাই খলীফা ওসমান (রাঃ) তাঁহার খেলাফতকালে খলীফা আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক সংগৃহীত ও লিখিত কোরআন শরীফ জেলদখানা সম্মুখে রাখিয়া সাত জেলদ কোরআন শরীফ লেখাইলেন, উহাতে তিনি তৎপর হইলেন। প্রথমতঃ—অধিকাংশ ছাহাবীগণের মতামত লইয়া যতদূর সম্ভব নানা প্রকার প্রমাণাদির পরিপ্রেক্ষিতে ছুরাসমূহকে প্রকৃত তরতীব ও বিশ্বাস মতে রাখার চেষ্টা করিলেন। দ্বিতীয়তঃ—হযরত রসুলুল্লাহ (সঃ) যামানায় ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় আরববাসী বিভিন্ন গোত্রের উচ্চারণ ও কায়দায় কোরআন পড়ার যে অনুলমতি ছিল, সমস্ত ছাহাবীগণের এজ্‌মা দ্বারা ঐ অনুলমতিকে শুধুমাত্র সাময়িক সুযোগ গণ্য করতঃ আগামীর জ্ঞাত চিরতরে ঐ অনুলমতি রহিত করিয়া দিলেন। আর কোরআনেশ গোত্রের উচ্চারণ ও কায়দা তথা কোরআনের (নাযেল হওয়ার) আসলরূপে লিখিত সাত জেলদ কোরআন শরীফ বিভিন্ন প্রদেশে পাঠাইয়া ইহাকে বাধ্যতামূলক করিয়া দিলেন। এবং অত্র কোন উচ্চারণ ও কায়দায় বা অত্র তরতীবে কাহারও নিকট কিছু লেখা থাকিলে উহা অগ্নিদাহ করিয়া দিবার নির্দেশ দিলেন যেন সর্বত্র কোন রকম ব্যবধান ব্যতিরেকে অবিকল একই রকম কোরআন শরীফ প্রচলিত হয় এবং অজ্ঞতা প্রসূত কোন বিতর্কের দ্বারা বিভেদের সৃষ্টি না হয়। ইহা খলীফা ওসমানের মহান কীতি ও অতি সুফলপ্রসূ পদক্ষেপ ছিল।

এই বর্ণনায় স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হইল যে—প্রকৃত প্রস্তাবে কোরআনের সঙ্কলন ও সংরক্ষণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময় তাঁহারই তত্ত্বাবধানে হইয়াছিল। খলীফা আবুবকর উহাকে গ্রন্থরূপে একত্রিত করিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রন্থ আকারে সাধারণে প্রচারের কোন ব্যবস্থা করেন নাই, বরং রাজধানী মদীনাতে স্বীয় তত্ত্বাবধানেই রাখিয়া দিয়াছিলেন। গ্রন্থাকারে সাধারণে প্রচারের ব্যবস্থা আরম্ভ করিলেন খলীফা ওসমান (রাঃ)। তাই তিনি সর্বসাধারণের নিকট “জামেউল কোরআন” “কোরআনের একত্রিকরণকারী” বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

৫৭। হাদীছ ৩ঃ—আবুহুলাই ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পারস্ত সম্রাট (পরবেজ ইবনে হুরমুজ ইবনে নওশেরওয়ান) খুসরুর নিকট একখানা লিপি লিখিয়াছিলেন এবং লিপিখানা আবুহুলাই ইবনে হোজাফা ছাহাবীর হাতে অর্পণ করিয়া বাহরাইনের শাসনকর্তা (মোনজের ইবনে ছাওয়ার) নিকট পৌছাইতে বলিয়াছিলেন। বাহরাইনের শাসনকর্তা ঐ লিপিবাহক সহ গিলিখানাকে পারস্ত সম্রাট

খুসরুর নিকট পাঠাইলেন। খুসরু লিপি পাঠ করিয়া (ক্রোধে) উহা ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহা শুনিয়া বদ-দোয়া করিলেন, হে খোদা! তাহারা যেমন আমার পত্রকে টুকরা করিয়াছে তাহারাও যেন অনুরূপ ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া ধ্বংস হয়।*

৫৮। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তৎকালীন বড় বড় রাজা-বাদশাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত ও আহ্বান জানাইয়া পত্র পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। তখন তাঁহার নিকট আরজ করা হইল যে, রাজা-বাদশাহগণ শীলমোহরযুক্ত লিপি না হইলে উহা গ্রহণ করেন না। তখন নবী (দঃ) রোপোর একটি অঙ্গুরী বিশেষ শীলমোহর তৈরী করাইলেন, উহার উপর **الله رسول محمد** “আল্লাহ, রসুল, মোহাম্মদ”

এই শব্দ কয়টি তিন লাইনে অঙ্কিত ছিল।+ (আনাছ (রাঃ) বলেন) উক্ত অঙ্গুরী আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অঙ্গুলিতে পরিহিত দেখিয়াছি—এখনও উহা আমার চোখে ভাসিতেছে।

এলমের মজলিসে ভিতরে স্থান পাইলে তথায় বসিবে, নচেৎ
পিছনেই বসিবে, ফিরিয়া যাইবে না।

৫৯। হাদীছঃ—আবু ওয়াক্কেদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছাহাবীগণকে লইয়া মসজিদে বসিয়া (তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতে) ছিলেন। এমন সময় তিন ব্যক্তি তাঁহার মজলিসের দিকে আসিতেছিল; তন্মধ্যে এক ব্যক্তি চলিয়া গেল এবং দুই ব্যক্তি মজলিসে হাজির হইল। একজন ভিতরে সম্মুখভাগে জায়গা দেখিতে পাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া বসিল এবং অপর ব্যক্তি (ভিতরে ঢুকিবার তৎপরতা দেখাইতে লজ্জা বোধ করিয়া) সকলের পেছনেই বসিয়া পড়িল। মজলিস খতম হইলে পর রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ তিন ব্যক্তি সম্মুখে মস্তব্য করিতে যাইয়া বলিলেন—একজন (আল্লার রসুলের তথা) আল্লার নিকটবর্তী হওয়ার জন্য তৎপর হওয়ায় আল্লাহ তাহাকে নিকটেই স্থান লাভের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি (অপরকে কোনরূপ বিরক্ত করিতে) লজ্জা বোধ করিলেন; আল্লাহ তায়ালাও (তাহাকে মাহরুম ও বঞ্চিত রাখিতে) লজ্জা বোধ করিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে সুতরাং আল্লাহও তাহাকে (এই মজলিসের শিক্ষা ও বরকত হইতে) মাহরুম করিয়া দিয়াছেন।

• ইতিহাস সাকী যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) দোয়া অকরে অকরে প্রতিকলিত হইয়াছিল; অচিরেই পারস্য জাতির সহস্র বৎসরের সাম্রাজ্য সমূলে ধ্বংস হইয়া তথায় ইসলামী খেলাফত কায়ম হইয়াছিল।

+ নীচের দিক হইতে পড়া হইলে “মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ” হয়।

ওস্তাদ অপেক্ষা শাগের্দ্ অধিক জ্ঞানী বা সংরক্ষণকারী হইতে পারে ;
তাই প্রত্যেকের একে অন্যকে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য।

৬০। হাদীছ :— من أبى بكرة قال النبى صلى الله عليه وسلم

.....فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمٍ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَلَا هَلْ بَلَغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُ اشْهَدُوا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ قُرْبَ مَبْلَغِ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ وَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَفْضِرُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

অর্থ :—আবু বকরা (রাঃ) অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বিশিষ্ট ছাহাবী। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন—বিদায়-হজ্জ জিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে কোরবাণীর দিন মিনার ময়দানে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় উষ্ট্রের উপর উপবিষ্ট থাকিয়া ভাষণ দিতেছিলেন ; আমি তাঁহার উষ্ট্রের লাগাম ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম। (সেই ভাষণে যেহেতু কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলাম কর্তৃক প্রবর্তিত নিরাপত্তার মৌলিক অধিকার ও মৌলিক দায়িত্বের একটি বিশেষ মূলনীতি বর্ণিত হইতেছিল ; তাই হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় বক্তব্য-বিষয়ের গুরুত্ব শ্রোতাদের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য) প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন—আজিকার দিনটি কোন্ দিন ? নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই প্রশ্ন শুনিয়া আমরা সকলেই নীরব নিস্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, (আজিকার দিনটি কোন্ দিন ইহা তিনি নিশ্চয়ই জানেন। তবে এই প্রশ্নের অর্থ কি ?) বোধ হয় এই দিনটির প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ নাম “ইয়াওমুন-নহ’র” (কোরবাণীর দিন) বদলাইয়া দিয়া অথ কোন নাম প্রবর্তন করিবেন। তাই আমরা মূল প্রশ্নের উত্তর দানে বিরত থাকিয়া শুধু এতটুকু আরজ করিলাম যে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুল সর্বাধিক বেশী জানেন। তখন নবী (দঃ) নিজেই বলিলেন, এই দিনটি পবিত্র “ইয়াওমুন নহ’র” নয় কি ? (যেই দিনটিকে অতি মহান পবিত্র দিন গণ্য করতঃ পূর্বকাল হইতেই সর্ববাদী সম্মতরূপে এমনকি কাকের বর্বরগণ পর্যন্ত উহাতে কেহই কাহারও জ্ঞান, মাল বা ইজ্জৎ-আবরূ হরণ করাকে হালাল মনে করে না।) আমরা সম্মুখে বলিয়া উঠিলাম—হাঁ, হাঁ ইহা পবিত্র ইয়াওমুন-নহ’র। তারপর নবী (দঃ) আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মাসটি কোন্ মাস ? আমরা সকলেই পূর্ববৎ নীরব নিস্তব্ধ থাকিলাম ও মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম বোধ হয় নবী (দঃ) এই

মাসের প্রচলিত নাম বদলাইয়া দিবেন। তাই এবারেও আমরা আরজ করিলাম, আল্লাহ এবং আল্লার রসূল সর্বাধিক বেশী জ্ঞাত আছেন। তখন নবী (দ:) নিজেই বলিলেন, এইটি পবিত্র জিলহজ্জ মাস নয় কি? (যে মাসের সর্ববাদীসম্মত পবিত্রতা রক্ষার্থে মানুষ তাহার জীবনঘাতী শত্রুকে পূর্ণ সুযোগে ও বাঘে পাইয়াও তাহাকে নিরাপত্তা দান করিয়া থাকে।) আমরা সম্বরে বলিয়া উঠিলাম—হাঁ, হাঁ ইহা সেই পবিত্র মহান জিলহজ্জ মাস। তৃতীয়বার নবী (দ:) জিজ্ঞাসা করিলেন—এইটি কোন্ এলাকা? এইবারও আমরা পূর্বের জায়গা ভাবিলাম এবং নীরবতা অবলম্বন করতঃ ঐ আরজই করিলাম। তখন নবী (দ:) নিজেই বলিলেন, ইহা পবিত্র মহান “হেরেম শরীফ” এলাকা নয় কি? (যে স্থানের সম্মান এত বড় যে, সেখানে কোন পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ এবং গাছ-পালা বা ঘাস-পাতার পর্য্যন্ত কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা আদি ক’ল হইতেই হারাম গণ্য হইয়া আসিতেছে।) আমরা সম্বরে বলিয়া উঠিলাম—হাঁ, হাঁ ইহা সেই পবিত্র হেরেম শরীফ এলাকা।

এইরূপে শ্রোতৃবর্গের মনকে পূর্ণরূপে আকৃষ্ট করিয়া এবং তাহাদের হৃদয়ে একাগ্রতা ও পূর্ণ শ্রদ্ধা সৃষ্টি করিয়া, নবী (দ:) উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, তোমরা সকলে একাগ্রচিত্তে শুনিয়া মানসপটে অক্ষিতরূপে জানিয়া রাখিও, তোমাদের (তথা প্রত্যেকটি মোসলমানের এবং ইসলামী রাষ্ট্রের অমুগত নাগরিকের) বক্তৃতা—তোমাদের জ্ঞান, তোমাদের মাল-সম্পত্তি, তোমাদের ইজ্জত, তোমাদের শরীরের চামড়া পর্য্যন্ত যেক্রমে আজিকার মহান ইয়াওমুন-ন’হরের দিনে, এই পবিত্র জিলহজ্জ মাসে, এই পবিত্র হেরেম শরীফে হারাম—সুরক্ষিত ও অস্পর্শিত; ঠিক এইরূপেই সর্বদিনে, সর্বমাসে ও সর্বস্থানে হারাম ও সুরক্ষিত গণ্য হইবে। (একে অস্তুর জ্ঞান, মাল ও ইজ্জতের উপর আঘাত করিতে পারিবে না।) অচিরেই তোমরা আল্লার দরবারে হাজির হইবে; আল্লাহ তোমাদের সমুদয় আমলের হিসাব লইবেন।

বক্তব্য শেষে নবী (দ:) শ্রোতাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এই মহান মূলনীতিটি স্পষ্টরূপে তোমাদিগকে পৌছাইয়া দিলাম ত? এক বাক্যে সকলেই স্বীকার করিল—হাঁ, হাঁ। তখন তিনি বলিলেন, হে খোদা! এই স্বীকারোক্তির উপর সাক্ষী থাকিও। নবী (দ:) আরও বলিলেন—এই মহান মূলনীতি যাহারা আমার নিকট উপস্থিত থাকিয়া শুনিয়াছে তাহারা অনুপস্থিতবর্গকে এবং অতঃপর একে অতঃকে কেয়ামত পর্য্যন্ত শুনাইয়া, জানাইয়া, শিক্ষা দিয়া দিতে বাধ্য থাকিবে। কারণ অনেক ক্ষেত্রে এমন হইবে যে, আমার বাণীর মূল শ্রোতা (যে অতঃকে শুনাইতে যাইয়া ওস্তাদ হইবে সে) অপেক্ষা তাহার শাগর্দ ঐ বাণীকে অধিক সংরক্ষণ ও কার্য্যকরী করিতে এবং অধিক স্মরণ রাখিতে সমর্থ হইবে।

অর্থাৎ—রসূলের (দ:) এক একটি অমিয় বানীর ভিতরে এমন সূক্ষ্ম তত্ত্ব নিহিত থাকে যাহা কেহ বেশী বুঝিতে পারে, কেহ কম বুঝে, আবার কেহ মোটেই বুঝে না। তাই

এমন ব্যক্তি যিনি ঐ তত্ত্বজ্ঞান কম রাখেন, তিনি যদি অন্ততঃ অবিকল শব্দগুলি মুখস্থ ও কঠস্থ করিয়া উপযুক্ত শাগের্দকে শিক্ষা দিয়া দিতে পারেন, তবে সেহ উপযুক্ত শাগের্দ রমুলের (দঃ) এক একটি বাণী হইতে শত শত মাছমালাহ-মাছায়েল, রাষ্ট্রের মূলনীতি, শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী আইন কানুন বুঝিয়া বাহির করতঃ উহা প্রকাশ ও প্রচার করিয়া বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধন করিতে সক্ষম হইবে। তদুপরি একে অল্পকে শিক্ষা দেওয়ার দ্বারা ঐ বিষয়টি অমর ও চিরস্থায়ী হওয়ার সুযোগ পাইবে। কারণ প্রথম শিক্ষা লাভকারী ব্যক্তি তাহার স্মৃতিশক্তি কম হওয়ায় সহজেই উহা ভুলিয়া যাইতে পারে। পরন্তু তাহার নিকট শিক্ষা লাভকারীর স্মৃতিশক্তি অধিক প্রথম হওয়ায় তাহার দ্বারা ঐ বিষয়টি বহুদিন স্থানী হইবে এবং প্রচার পরম্পরায় উহা অমর ও চিরস্থায়ী হইতে পারিবে।)

হযরত (দঃ) মোসলেম জাতিকে বিশেষভাবে আরও বলিলেন, (আমি তোমাদিগকে অন্ধকার যুগের মারামারি কাটাকাটি হইতে মুক্ত, ইসলামী ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ রাখিয়া যাইতেছি।) খবরদার! তোমরা আমার পরে পুনরায় কাকেরদের স্মারপরম্পর মারামারি কাটাকাটিতে লিপ্ত হইও না।

ব্যাখ্যা :- এই হাদীছটি বিশ্বমানবের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য এমন একটি সাংবিধানিক-ছন্দ ও মূলনীতি যাহা বিশ্বের ইতিহাসে ইতিপূর্বে কোথাও শোনা যায় নাই। ইহা মানুষের কল্পিত বিষয় নহে, বরং ইহা বিশ্বশ্রষ্টার প্রেরিত ও বিশ্বশান্তির অগ্রদূত আল্লাহ রমুল কর্তৃক প্রচারিত। পরবর্তী যুগে প্রত্যেক স্মারপরায়ণ রাষ্ট্রই ইহাকে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও রাষ্ট্রনায়কদের মৌলিক দায়িত্বরূপে এবং রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

উল্লেখিত নিরাপত্তা-বিধান ইসলামী রাষ্ট্রে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রনায়কের মৌলিক দায়িত্ব এবং প্রত্যেকটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার; যাহারা মোসলেম জাতিভুক্ত তাহাদের এই অধিকার ইসলাম ধর্ম সূত্রে প্রাপ্য এবং যাহারা মোসলমান নয় তাহাদের এই অধিকার ইসলামী রাষ্ট্রের বাধ্যতা ও আবহুগত্য সূত্রে প্রাপ্য। অতএব, এই অধিকার সে পর্য্যন্তই অক্ষুণ্ণ থাকিবে যাবৎ কোন মোসলমান স্বীয় ধর্মমত পরিবর্তন পূর্বক “মোরতাদ” প্রমাণিত না হইবে এবং যাবৎ কোন অমোসলেম নাগরিক স্বীয় আবহুগত্যের শপথ লঙ্ঘনকারী বলিয়া প্রমাণিত না হইবে।

এই মূলনীতির মধ্যে তিনটি বস্তুর নিরাপত্তা দান তথা এই তিনটি বস্তুর নিরাপত্তার দায়িত্বভার প্রত্যেকটি রাষ্ট্রনায়কের স্বন্ধে স্থাপন করা হইয়াছে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে—একটি হইল নিরাপত্তার মৌলিক অধিকার, ইহা রাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রাপ্য হক ও স্মার্য দাবী। আর একটি হইল নিরাপত্তার দায়িত্বভার, ইহা রাষ্ট্রনায়কদের জিন্মাদারী ও তাহাদের ঘাড়ে চাপানো বোঝা। আল্লাহ এবং আল্লাহ রমুল তথা কোরআন ও হাদীছের শিক্ষানুযায়ী রাষ্ট্রনীতির মূল বস্তু হইবে “দায়িত্ববোধ বা দায়িত্বজ্ঞান”। অর্থাৎ—রাষ্ট্রনায়কদের

এই দায়িত্বভার বহন করিতে হইবে যে, প্রত্যেকটি নাগরিকের জ্ঞান-মাল, আবহ-ইচ্ছত যেন নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকে। এমনকি প্রতিটি নাগরিকের শরীরের চামড়াটুকুও যেন নিরাপদে থাকে এবং অত্যাচারে উহার উপর সামান্যতম আঁচড়ও যেন আসিতে না পারে। এই দায়িত্বভার সুষ্পষ্টরূপে বহন করাই হইল ইসলামী রাষ্ট্রনীতির মূল বস্তু। যাহারা এই দায়িত্বভার বহন করিয়া কার্য্যতঃ স্বীয় যোগ্যতা দেখাইতে সক্ষম হইবে, একমাত্র তাহারাই রাষ্ট্রনায়কত্বের কুরছীতে অধিষ্ঠিত থাকিবার যোগ্য বিবেচিত হইবে। অন্যথায় কেহ কুরছী আঁকড়াইয়া থাকিতে পারিবে না।

বর্তমান জগতের মনগড়া রাষ্ট্রনীতির মূলবস্তু সাব্যস্ত করা হয় অধিকারের দাবীকে। এমনকি শাসনতন্ত্রকে পর্য্যাপ্ত অধিকারের দাবীর উপর ভিত্তি করিয়া রচনা করা হইয়া থাকে। এইরূপে দায়িত্বজ্ঞানের অভাব ও দাবী-দাওয়ার আধিক্য দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে, ফলে হুনিয়া হইতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। অতএব, শান্তি শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে কোরআন ও হাদীছের শিক্ষানুযায়ী দায়িত্বজ্ঞান অর্জনের প্রতি সচেষ্ট হইতে হইবে। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দায়িত্বজ্ঞান জন্মিলে অধিকার প্রাপ্তি আপনা আপনিই আসিতে বাধ্য।

এই হাদীছে তিনটি নিরাপত্তার উল্লেখ হইয়াছে—(১) জ্ঞান, (২) মাল, (৩) ইচ্ছত। ইসলামী আইন ও ধারা-উপধারার ভিত্তি এই মূলনীতির উপরই স্থাপিত।

জ্ঞানের নিরাপত্তা :

পবিত্র কোরআন দ্বারা প্রমাণিত আছে—ইচ্ছাকৃত ঘটনায় খুনের বদলা খুন, কানের বদলা কান, নাকের বদলা নাক, চোখের বদলা চোখ, দাঁতের বদলা দাঁত এবং জখমের বদলা সমপরিমাণ জখম। ভুল বা অসতর্কতা বশতঃ এরূপ কিছু ঘটিলে তাহার শাস্তিও নির্দ্ধারিত আছে। আলোচ্য হাদীছে **كُلُّ دَمَاءٍ كَمِ** তোমাদের রক্ত ও **بِشَارِكُمْ** তোমাদের চামড়া বলিয়া ঐ নিরাপত্তাকেই বুঝাইয়াছে। ফেকাহ তথা ইসলামী আইন-শাস্ত্রে কিতাবুল-কেছাছ, কিতাবুল-দিয়াত, কিতাবুল-জেনায়াত ও কিতাবুল-তা'হীরের কতক অংশে এই নিরাপত্তার ধারা-উপধারাই বর্ণিত হইয়াছে।

মালের নিরাপত্তা :

প্রথমতঃ ইসলাম ধন-সম্পত্তি মাল-দৌলতের উপর মালিকের স্বাধিকার ও ব্যক্তিগত মালিকানার স্বীকৃতি দান করে। পবিত্র কোরআনের শত শত বিধান ও আয়াত দ্বারা উহা প্রমাণিত হয়। যথা—এতিমের মাল-সম্পত্তি তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়ার কঠোর আদেশ এবং উহা আত্মসাৎ করার প্রতি বঠোর নিষেধাজ্ঞা, তহপরি আত্মসাৎকারীর উপর ভীষণ আজাব ও শাস্তির সংবাদবাহী অনেক আয়াত বর্ণিত আছে। ইচ্ছাকৃত খরিদ-বিক্রি (ইত্যাদি) সূত্র ভিন্ন কাহারও ধন-সম্পত্তি গ্রাস করার প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপে কয়েকটি আয়াত বর্ণিত আছে। উত্তরাধিকারের বিধান, যাকাত ও হজ্জ ফরজ

হওয়ার ধান কোরআনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এইরূপ আরও বহু বিধান কোরআনে উল্লেখ আছে যাহা ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বের স্বীকৃতির স্পষ্টতর প্রমাণ। শত শত হাদীছও এই বিষয়টিকে প্রমাণিত করিয়া থাকে। আলোচ্য হাদীছে **أموالكم** “তোমাদের ধন-সম্পত্তি” বলিয়া ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বের সনদ দান পূর্বক উহার নিরাপত্তার দায়িত্ব ও অধিকার বুঝান হইয়াছে। সুস্পষ্ট কোরআনের আয়াত ও হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত চোরের হাত কাটার শাস্তি বিধান ও ডাকাতে হাত-পা উভয়কে কাটার শাস্তি-বিধান এবং ফেকাহ শাস্ত্রের “বাবুছ্ছারাকাছ্ছ” ও বাবু-কাতয়েত-তরীক, “কিতাবুল গছব” ইত্যাদির মধ্যে বর্ণিত ধারা ও উপধারা সমূহ এই মালের নিরাপত্তার জন্ত প্রবর্তিত হইয়াছে।

অবশ্য অসহপায়ে অবৈধরূপে অজ্ঞিত ও সঞ্চিত ধনের মালিক ঐ উপার্জনকারী কখনও হইতে পারিবে না। বরং ঐ মাল আসল মালিককে ফেরৎ দিতে হইবে; ফেরৎ না দেওয়া পর্য্যন্ত তাহার শত তওবাও কবুল হইবে না এবং আখেরাতে দ্বিগুণ আজাব ভোগ করিতে হইবে।

ইজ্জতের নিরাপত্তা: আলোচ্য হাদীছে **أموالكم** “তোমাদের আরক-ইজ্জত” এই শব্দটির দ্বারা উক্ত নিরাপত্তাকে ব্যক্ত করা হইয়াছে। কোরআনের আয়াত ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত “হদ্দে-কজ্জফ”—মিথ্যা যেনার তোহমতের দরুন ৮০টি বেজাঘাত এবং “হদ্দে-যেনা”—অবিবাহিত পুরুষ বা মেয়ের যেনার শাস্তি ১০০টি বেজাঘাত এবং বিবাহিতের যেনার শাস্তি প্রস্তরঘাতে মারিয়া ফেল’, তছপরি ফেকাহ শাস্ত্রের কিতাবুল-হুহদ ও কিতাবুত-তাহীরে বর্ণিত ধারা ও উপধারাসমূহ উক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা স্বরূপই প্রবর্তন করা হইয়াছে।

ইসলামী ism বা নীতি রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককে উল্লিখিত তিনটি নিরাপত্তা সমান দান করিয়া থাকে। ইত্তর-ভদ্র, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, হিন্দু-মোসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টান, রাজা-প্রজা নিবিশেষে সকলের জন্তই সমানভাবে এই তিনটি নিরাপত্তার দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া থাকে এবং কার্যাক্ষেত্রে বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকে। ছহীহ হাদীছে বর্ণিত আছে—একদা কোরায়েশ বংশীয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোন একটি মহিলার দ্বারা চুরি প্রমাণিত হইলে পর তাহার পক্ষে সমুদয় সুপারিশকে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) অগ্রাহ্য ও প্রত্যাখ্যান পূর্বক তাহার হাত কাটিয়া দিলেন এবং সুপারিশকারীর প্রতি ভৎসনা করতঃ ক্রোধস্বরে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিলেন—(খোদা না করুন—) মোহাম্মদের (দঃ) মেয়ে ফাতেমাও যদি এইরূপ অপরাধ করে, তবে তাহারও হাত কাটিয়া দেওয়া হইবে। হযরত (দঃ) আরও বলিলেন, পূর্ববর্তী অনেক জাতি এই কারণে ধ্বংস হইয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে সকলের জন্ত সমান নিরপেক্ষ ইনসাফ ছিল না। গরীব অপরাধ করিলে তাহার বিচার ও পুরাপুরি শাস্তি হইত, কিন্তু বড় লোকেরা অপরাধ করিলে উহার কোনও বিচার অথবা শাস্তি হইত না কিম্বা হইলেও মনগড়া মতে হইত। যে জাতির মধ্যে এইরূপ পক্ষপাতিত্বমূলক ইনসাফ হয় উহার ধ্বংস অনিবার্য।

জ্ঞান, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা

ইমাম বোখারী (র:) বলিয়াছেন, মানুষের কথা ও কাজের পূর্বে এলুম—জ্ঞান ও শিক্ষা আবশ্যিক। মানুষ যে বিষয় বলিবে বা যে কাজ করিবে সে বিষয় প্রথম তাহার এলুম—জ্ঞান ও শিক্ষা থাকিতে হইবে। অতএব মানুষের জ্ঞান এলুম—জ্ঞান ও শিক্ষার গুরুত্ব অপরিমিত।

অতঃপর বোখারী (র:) একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলিয়াছেন যে, **انما العلم بالتعلم**। এলুম ও জ্ঞান উহাই নির্ভরযোগ্য যাহা অধ্যয়নলব্ধ হয়। স্বয়ম্ভু জ্ঞানী ও আলেম দ্বারা অসংখ্য ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতিই সাধিত হয়। যেরূপ স্বয়ম্ভু ডাক্তার মানুষের জীবনের জ্ঞান ভয়ঙ্কর বিপদ।

দীন ও ধর্মীয় বিষয়ে আলোচ্য তথ্যটি অতীব প্রয়োজনীয়। কারণ, দীন ও ধর্ম আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট প্রেরিত, তাই উহা রসূলের পরিত্যক্ত সম্পদ[†]। উন্নতগণ সেই সম্পদ রসূল (দ:) হইতে পরস্পরায় লাভ করিয়াছে এবং করিতে থাকিবে। সুতরাং উহার এলুম ও জ্ঞান উহাই নির্ভরযোগ্য গণ্য হইবে যাহা পরস্পর সূত্রে রসূল (দ:) পর্যন্ত সংযুক্ত হয় এবং তাহা একমাত্র শিক্ষা গ্রহণ ও অধ্যয়নের মাধ্যমেই হইতে পারে। দীন ও ধর্মে যাহারা সেই অধ্যয়ন ছাড়া স্বয়ম্ভু জ্ঞানীরূপে গজাইয়া উঠে তাহারা বস্তুত: মানুষের ঈমানের জ্ঞান ভয়ঙ্কর বিপদ হইয়া দাঁড়ায়। একটি সুন্দর প্রবাদ—স্বয়ম্ভু ডাক্তার জানের পক্ষে বিপদ, আর স্বয়ম্ভু ধর্ম-জ্ঞানী ঈমানের পক্ষে বিপদ। অতঃপর ইমাম বোখারী (র:) অধ্যাপনা ও শিক্ষাদান সম্পর্কেও একটি উত্তম কথা বলিয়াছেন। পবিত্র কোরআন ৩ পারা ১৬ রুকুতে ধর্মপ্রাণ লোকদের

প্রতি আদেশ রহিয়াছে **كُونُوا رِبَاً نَبِيَّيْنَ** “তোমরা রব্বানী হও”। ইবনে আব্বাস (রা:) বলিয়াছেন, “রব্বানী” অর্থ দীন ও ধর্মে জ্ঞানী, আলেম, প্রজ্ঞাশীল; অর্থাৎ “রব্বানী” আখ্যার শ্রেণী ভুক্তির জ্ঞান দীন ও ধর্ম সম্পর্কে তিনটি গুণের প্রয়োজন—জ্ঞানী হইতে হইবে, আলেম হইতে হইবে এবং প্রজ্ঞাশীল হইতে হইবে। এওস্তিন বোখারী (র:) একটি চতুর্থ গুণেরও উল্লেখ করিয়াছেন যাহা “রব্বানী” শব্দের সহিত অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। রব্বানী শব্দের মূল “রব্ব”; “রব্ব” অর্থ পোষক ও প্রতিপালক। শিশুদের লালন-পালনে, তাহাদের পানাহার দানে ধাপে ধাপে ছোট হইতে বড় ও নরম হইতে শক্তের প্রতি অগ্রদর হইয়া আদর-যত্ন ও কোশলের সহিত তাহাকে আহাৰ্য্য গলাধঃ করাইতে হয়। সেমতে “রব্বানী,” আখ্যার যোগ্য শুধুমাত্র ঐ আলেম যিনি আল্লাহর বান্দাদিগকে দীনের এলুম ও শিক্ষা ঐরূপ সুকৌশল ও আদর-যত্নের সহিত গ্রহণ করাইতে সদা সচেষ্ট থাকেন। আলেম সম্প্রদায় এই চারিটি গুণধারী হইবেন, ইহাই উক্ত আয়াতের নির্দেশ।

[†] এ সম্পর্কে ইমাম বোখারী (র:) এখানে একটি হাদীছের অংশবিশেষের উদ্ধৃতি দিয়াছেন। পূর্ণ হাদীছটির বিবরণ “এলুমের কজিলত” পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

জ্ঞান ও নছিহতের কথা এত বর্ণনা করিবে না যে, শ্রোতাদের মধ্যে বিরক্তি আসে

৬১। হাদীছ :— আবুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদিগকে ওয়াজ শুনাইতেন। এক ব্যক্তি আরজ করিল, আমাদের বাসনা—আপনি প্রতি দিনই আমাদের ওয়াজ শুনান। তিনি বলিলেন, প্রতিদিন ওয়াজ শুনাইতে এই জন্ত বিরত থাকি যে, আমি পছন্দ করি না—তোমাদের মধ্যে ইহার দ্বারা কোনরূপ উৎকণ্ঠা বা বিরক্তি উপস্থিত হউক। আমি তোমাদিগকে কয়েক দিন পর পর নছিহত করি; কেননা নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদের এই ভাবেই ওয়াজ-নছিহত করিতেন যেন আমরা বিরক্ত হইয়া না পড়ি।

এই হাদীছ দ্বারা বোখারী (রাঃ) এই মছআলাহও বয়ান করিয়াছেন যে, দীন শিক্ষা দানে লোকদের সুবিধার্থে সময় ও দিন নির্দিষ্ট করা জায়েয আছে; বেদাত নহে।

৬২ হাদীছ :—

من انس عن النبي صلى الله عليه وسلم
يَسْرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا بِشَرُّوْا وَلَا تُنْفِرُوْا

অর্থ :—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা (আল্লার বান্দাদের জন্ত) সহজ পস্থা অবলম্বন কর, কঠিন পস্থা অবলম্বন করিও না। তাহাদিগকে খোশ খবরী শুনাইয়া আহ্বান জানাও, ভীতি প্রদর্শন করিয়া তাড়াইবার পস্থা অবলম্বন করিও না।

ব্যাখ্যা :—অনেক ক্ষেত্রে কথার মূল উদ্দেশ্য ও স্থান বিশেষের প্রতি লক্ষ্য না করায় শুধু বাক্য ও শব্দের ব্যাপকতার দ্বারা নিছক ভুল ও ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়া থাকে। তাই আলোচ্য হাদীছটি অনুধাবন করার জন্ত প্রথমতঃ ইহার দ্বারা রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল এবং ইহার স্থান বিশেষ কি ছিল তাহা উপলব্ধি করা আবশ্যক।

হযরত রসূলুল্লাহ (দঃ) দেশ-বিদেশে ছাহাবীগণকে স্বীয় প্রতিনিধি স্বরূপ মোবাল্লেগ—দীন প্রচারক, মোয়াল্লেম—দীন শিক্ষাদাতা, আমেল—শাসনকর্তা বানাইয়া পাঠাইতেন। ঐ সমস্ত প্রতিনিধিবর্গকে হযরত (দঃ) বিশেষ বিশেষ অমৃত উপদেশ দান পূর্বক বিদায় করিতেন। আলোচ্য হাদীছটি ঐ বিশেষ অমৃতময় উপদেশাবলীর অঙ্গতম একটি উপদেশ। এই উপদেশ দ্বারা হযরত (দঃ) স্বীয় প্রতিনিধিবর্গকে সর্বসাধারণের সম্মুখে দীন প্রচার, সর্বসাধারণকে দীন শিক্ষাদানে, সর্বসাধারণের উপর শাস্তি-শৃঙ্খলার সহিত শাসনকার্য পরিচালনার (Administration) ক্ষেত্রে সর্বাধিক জরুরী ও প্রয়োজনীয় বিষয়টি বর্ণনা করিয়াছেন।

অনেক সময় দেখা যায়—কোন একটি উত্তম সুন্দর বিষয়কে প্রচার করা হয়, কিন্তু অনভিজ্ঞ প্রচারকের অনভিজ্ঞতা প্রসূত ত্রুটিপূর্ণ কর্কশ ও কঠোর ভাবধারা এবং অশোভন

অকৃতিকর প্রচার পদ্ধতি ও তিক্ত ভাব-ভঙ্গি ইত্যাদির দরুন মানুষ ঐ বিষয়টিকে আদৌ গ্রহণ করিতে রাজী হয় না। উহাকে কঠিন বোঝা মনে করতঃ উহা হইতে ভাগিয়া থাকে, বরং উহার প্রকৃত স্বাদ ও সৌন্দর্য্য প্রচারকের তিক্ত উক্তি সমূহের অন্তরালে ঢাকিয়া যাওয়ায় মানুষের মধ্যে বিষয়টির প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হয়। অথচ অভিজ্ঞ প্রচারক হইলে সে তাহার ভাব-ভঙ্গিমা, হৃদয়গ্রাহী প্রচার-পদ্ধতি রুচিময় দৃষ্টান্ত ও উপমা সমূহের দ্বারা সম্পূর্ণ বিপরীত—একটি অতি কঠিন ও কঠোর বিষয়কেও মানুষের প্রিয় ও গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলিতে পারে। শিক্ষা দানের বেলায়ও তদ্রূপই—অভিজ্ঞ ও যোগ্য শিক্ষক সহজ শিক্ষা পদ্ধতির দ্বারা কঠিন হইতে কঠিন বিষয়কেও সহজ হইতে সহজতর করিয়া তুলিতে পারে। কিন্তু অনভিজ্ঞ অযোগ্য শিক্ষকের ত্রুটিপূর্ণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দরুন বোধগম্য বিষয়ও বিপরীত রূপ ধারণ করিয়া বসে, ফলে শিক্ষার্থীগণ উহাকে কঠিন মনে করিয়া উহা হইতে ভাগিয়া পলায়ন করে। এইরূপে শাসনকার্য্য পরিচালন ক্ষেত্রেও ভাল ও সহজ সাধ্য আইন-কানুন বিধি-নিষেধ অনভিজ্ঞ অযোগ্য পরিচালকের অনভিজ্ঞতার ত্রুটিপূর্ণ শাসন-ব্যবস্থার দরুন মানুষ ক্ষেপিয়া উঠে, বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়, আইনের প্রতি মানুষের বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা জন্মিয়া উঠে, আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। অথচ অভিজ্ঞ ও যোগ্য পরিচালক হইলে সে মানুষকে নিম্নের বড়িও চিনির স্থায় খাওয়াইয়া তাহাদিগকে আইনের প্রতি আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিতে সক্ষম হয়।

ইমান অধ্যায়ে ৩৫ নম্বর হাদীছে হযরত (দ:) দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে ফরমাইয়াছেন **الدِّينُ يَسْرُ** “দ্বীন-ইসলাম অতি সহজ”। আলোচ্য হাদীছে হযরত (দ:) তাহার প্রতি-নিধিবর্গকে সতর্ক করিয়াছেন—দ্বীন-ইসলাম প্রচারের ও শিক্ষাদানের সময় উহাকে মানুষের সম্মুখে একপভাবে তুলিয়া ধরিতে হইবে যেন উহার প্রকৃত রূপ “সহজ হওয়া” স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে, মানুষ উহাকে সহজে বুঝিয়া নিতে সক্ষম হয়, মানুষ উহার প্রতি আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয়। খবরদার! তোমার ভাব-ভঙ্গিমা, তোমার বর্ণনার দরুন আল্লাহর সেই সহজ মনোমুগ্ধকর দ্বীন-ইসলাম যেন আল্লাহর বান্দাদের নিকট কঠিন অবোধগম্য বিশ্বাদ তিক্ত ও ঘৃণারযোগ্য পরিগণিত না হয়। ডেমনি ভাবে ঐ দ্বীন-ইসলামের সহজ সুলভ বিধি-নিষেধগুলি পরিচালনা ও প্রয়োগ করিতে একরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ কর যাহাতে মানুষ উহাকে রহমত মনে করিয়া উহার সুশীতল ছায়াতলে স্থান লাভে সচেষ্ট হয়। খবরদার! তোমার পরিচালন দোষে এবং প্রয়োগ পদ্ধতির ত্রুটিতে আল্লাহর সহজ দ্বীনকে যেন কেহ কঠিন মনে না করে এবং উহার প্রতি আল্লাহর বান্দাগণ বীতশ্রদ্ধ হইয়া না উঠে।

সারকথা এই যে—আলোচ্য হাদীছের মূল উদ্দেশ্য ও শুদ্ধ ব্যাখ্যা একমাত্র এতটুকু যে, দ্বীন তথা শরীয়তের আদর্শ ও আদেশ-নিষেধাবলীর প্রচার ও শিক্ষাদান এবং উহা জনগণের উপর পরিচালন ও প্রয়োগ করিতে যথাসম্ভব সহজ মনোমুগ্ধকর ও আকর্ষণীয় পন্থা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু কাট-ছাট করার প্রয়াস বাতুলতা মাত্র।

ভালরূপে জানিমা রাখিতে হইবে যে—“শরীয়ত” একটি আল্লাহ এবং আল্লাহর রশ্মলের নির্ধারিত নির্দেশিত সমষ্টিগত বস্তু। উহাকে পূর্ণমাত্রায় সকলের গ্রহণীয় করাইবার জন্ত সুব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। এ-কারণেই শরীয়তেব নির্ধারিত কোন একটি সামান্যতর বিষয়ের উপর আঘাত হানিলে নিছক বোকামী বই আর কি হইবে? যেমন—কোন একটি মিক্শচার ঔষধ রোগীকে সহজে খাওয়াইবার জন্ত উহার নির্ধারিত প্রেস্ক্রিপশনের মধ্যে কোন প্রকার ছাট-কাট বা রদবদল করা বুদ্ধিহীনতার পরিচয়ই হইবে। কোন ডাক্তার বরং কোন বুদ্ধিমান লোকই এরূপ করিতে অনুমতি দিবে না। হাঁ; প্রেস্ক্রিপশন অবিকলরূপে ঠিক রাখিয়া যে কোন উপায়ে সহজভাবে উহাকে রোগীর গলাধঃকরণ-ই হইল বুদ্ধিমানের কাজ। এই পরামর্শই আলাচ্য হাদীছে দেওয়া হইয়াছে।

দ্বীনের বুঝ ও জ্ঞান আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত

৬৩। হাদীছ:—

من معاوية رضى الله تعالى عنه يقول قال

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ
وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأَمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ
لَا يَضُرُّ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ.

অর্থ:—মোয়াবিয়া (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে সসাল্লাম বলিয়াছেন—আল্লাহ তায়ালা যাহাকে (ছনিয়া-আখেরাতের) উন্নতি, সাফল্য ও মঙ্গল দানের ইচ্ছা করেন, তাহাকে দ্বীনের এলুম ও ধর্মজ্ঞান দান করেন। নবী (স:) আরও বলেন, আমি বিতরণকারী বই নহি; জ্ঞান ও এলুমদাতা বস্তুত: একমাত্র আল্লাহ তায়ালা।

নবী (স:) আরও বলিয়াছেন, এই উম্মতের একদল লোক কেয়ামত পর্যন্ত দ্বীন ও হকের উপর দৃঢ়ভাবে কায়ম থাকিবে, কোন প্রকার বাধা বিপত্তিই তাহাদিগকে রুখিতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা:— “আমি বিতরণকারী” বাক্যটির উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য এই যে, এলুম ও ধর্মজ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই দান করেন, কিন্তু যে কোন জ্ঞান ও এলুম প্রকৃত প্রস্তাবে উহা আল্লাহর তরফ হইতে কি-না, তাহা প্রমাণিত ও বিশ্বাসযোগ্য তখনই হইবে, যখন উহা নবীর (স:) মাধ্যমে আসিয়াছে বলিয়া দেখা যাইবে। তাই কেবলমাত্র নবীর (স:) নিকট হইতে উপযুক্ত ওস্তাদ মাধ্যমে বিশ্বস্ত সূত্র-পরম্পরা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিয়মতান্ত্রিকরূপে শিক্ষা গ্রহণ দ্বারাই প্রকৃত জ্ঞান ও খাঁটি এলুম অর্জিত হইতে পারে। কেননা, আল্লাহ চিরাচরিত নিয়ম ও বিধানই এই যে, নবী এবং নায়েবে নবী—ওস্তাদ ও খাঁটি পীরের মাধ্যমেই জ্ঞান এলুম ও ফয়েজ দান করিয়া থাকেন। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা নবীকেই একমাত্র বিতরণকারী নিযুক্ত করিয়াছেন, সুতরাং নবীর তরফ হইতেই উহা হাসিল করিতে হইবে,

অন্য কোথাও উহা পাওয়া যাইবেন না। যেমন—সরকারী কন্ট্রোলার মাল সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ডিলার ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট হইতে পাওয়া যাইতে পারে না।

দীনের জ্ঞান ও এলুম হাসিলে প্রতিযোগী হওয়া

قَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ كِبَرِ سِنِهِمْ

“নবী ছালাম্মাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণ বৃদ্ধ বয়সেও এলুম হাসিল করিতেন।

৬৪। হাদীছঃ—مِنْ مَبْدِئِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَةٍ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا۔

অর্থঃ—আবুহুলাই ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছালাম্মাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (মানব জগতে) প্রতিযোগিতা করিয়া হাসিল করার উপযোগী গুণ মাত্র দুইটি—(একটি সাখাওয়াত বা দানশীলতা, দ্বিতীয়টি হেকমত বা সত্যিকারের ধর্মজ্ঞান। অর্থাৎ) (১) এক ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা ধন-দৌলত দান করিয়াছেন, সে উহা জমা করিয়া রাখে না, বরং আল্লাহ রাস্তায় খরচ করার কাজে আজীবন লিপ্ত থাকে। (২) এক ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা দীনের এলুম তথা সত্যিকারের ধর্মজ্ঞান দান করিয়াছেন, সে এই এলুমের দ্বারা জীবনের সমস্ত সমস্যাগুলোর সমাধান করে এবং লোকদিগকে অবৈতনিকভাবে উহা শিক্ষাদান করিতে থাকে এবং লোকদের মধ্যে উহা অযাচিতভাবে অনবরত বিতরণ করিতে থাকে। এই ব্যক্তিদ্বয়ের গুণদ্বয় বিশেষ প্রতিযোগিতার সহিত অর্জনযোগ্য।

এলুম লাভের জন্য খিজিরের নিকট হযরত মুছার সমুদ্রপথে গমন

এই পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (রঃ) এলুম হাসিলের গুরুত্ব দেখাইয়াছেন যে, মুছা (আঃ) বড় মর্তব্য হইয়াও তাঁহার অপেক্ষা নিম্নমানের ব্যক্তি খাজা খিজিরের নিকট সঙ্কটময় সমুদ্রপথে গমন করিয়াছিলেন এলুম হাসিলের জন্য; যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে। ৯৭ নম্বরে অনুদিত সুদীর্ঘ হাদীছ খানা এই পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে উল্লেখ হইয়াছে। হাদীছখানার অনুবাদ সম্মুখে আসিতেছে।

কোরআনের এলুম দানের দোয়া করা

৬৫। হাদীছঃ—আবুহুলাই ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছালাম্মাহু আলাইহে অসাল্লাম মল-ত্যাগের স্থানে গমন করিলেন; আমি তাঁহার জন্য পানি উপস্থিত করিয়া রাখিলাম। হযরত (রাঃ) উহা দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন, পানি কে রাখিয়াছে? উত্তরে আমার নাম বলা হইল। হযরত (দঃ) আমাকে বৃকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং আমার জন্ত দোয়া করিলেন—

اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْكِتَابَ اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْحِكْمَةَ وَفَقِّهِهُ فِي الدِّينِ -

“হে আল্লাহ! তাহাকে কোরআনের এলুম দান কর, পরিপক্ক জ্ঞান দান কর এবং দীন-ইসলামের সঠিক বুঝশক্তি দান কর।”

কোরআনের এলুম এবং দ্বীনের এলুম ও জ্ঞান যে কত বড় অমূল্য রত্ন এবং উহা যে কত বস্তু ফজিলতের বড় তাহা এই ঘটনার দ্বারা প্রকাশ পায়। কারণ হযরত রসূলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় প্রিয়পাত্র স্নেহের ভ্রাতা (চাচার ছেলে) ইবনে আব্বাসের প্রতি বিশেষ সম্বদ্ধ হইয়া তাঁহার খেদমতের প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ দরবারে এলুম-দ্বীনের জন্তই দরখাস্ত করিলেন। যদি ইহা অমূল্য ধন ও সর্বশ্রেষ্ঠ দৌলত না হইত তবে এই ক্ষেত্রে হযরত রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আল্লাহ নিকট এই জিনিষের প্রত্যাশী হইতেন না।

কি বয়সে জ্ঞাত ঘটনার হাদীছ গ্রহণযোগ্য?

৬৬। হাদীছ :-মাহমুদ ইবনে রবী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার স্মরণ আছে—নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কূপের পানি ভরা ডোল হইতে পানি মুখে লইয়া (কৌতুক স্বরূপ) আমার চেহারার উপর কুল্লি করিয়াছিলেন। আমি তখন মাত্র পাঁচ বৎসরের বালক।+

ব্যাখ্যা :-এখানে প্রমাণিত হইল যে, অপরিণত বয়সে এমনকি পাঁচ বৎসরের বালকও যদি তাহার স্মরণীয় বিষয় বর্ণনা করে যাহা তাহার পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব, তবে উহা গ্রহণীয়।

এলুম হাসিল করিতে বিদেশে যাওয়া

জাবের ইবনে আব্বাস (রাঃ) দীর্ঘ এক মাসের পথ ছফর করিয়া আব্বাস ইবনে ওনাইস (রাঃ) ছাহাবীর নিকট পৌঁছিয়াছিলেন; একটি হাদীছ লাভের উদ্দেশ্যে।

ব্যাখ্যা :-ইমাম বোখারী (রাঃ) তাঁহার “আদাবুল-মোফরাদ” নামক কেতাবে উক্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনা করিয়াছেন যাহা এই—

জাবের ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এই সংবাদ জ্ঞাত হইলাম যে, (সিরিয়ায় অবস্থানরত) একজন ছাহাবী একটি হাদীছ বর্ণনা করেন যাহা তিনি রসূলুল্লাহ (দঃ)

† হযরত রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই দোয়া পূর্ণরূপে কার্য্যকরী হইয়াছিল। আল্লাহ তায়ালা ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে সর্বশ্রেষ্ঠ মোফাচ্ছের (কোরআন ব্যাখ্যাকার) ও দ্বীনের জ্ঞানভাণ্ডার বানাইয়াছিলেন। বোখারী শরীফের কয়েক স্থানে হাদীছটি উল্লেখ আছে। অনুবাদে ৩১ ও ২৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত দোয়ার শব্দ একত্র করা হইল।

+ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সেই কুলির বয়সে অতি বৃদ্ধাবস্থায়ও মাহমুদ ইবনে রবী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর চেহারার লাভণ্য ও সৌন্দর্য্য কিশোরের স্থায় ছিল।

হইতে গুনিয়াছেন (আমি উহা গুনি নাই)। তাই আমি একটি উট ক্রয় করিলাম এবং সমুদয় প্রস্তুতি গ্রহণ পূর্বক যাত্রা করিলাম। দীর্ঘ এক মাস ভ্রমণ করিয়া সিরিয়ায় পৌছিলাম; এ ছাহাবী ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে ওনাইস (রাঃ)। আমি তাঁহার গৃহ দ্বারে উপস্থিত হইয়া দারোওয়ানকে বলিলাম, সংবাদ দাও যে, জাবের আপনার দরওয়াজায় দাঁড়াইয়া আছে। প্রশ্ন আসিল আবদুল্লাহর পুত্র? আমি বলিলাম, হাঁ। তৎক্ষণাৎ এই ছাহাবী ছুটিয়া আসিলেন এবং আমাকে বৃকে জড়াইয়া ধরিলেন। আমি বলিলাম, একটি হাদীছ সম্পর্কে আমি সংবাদ পাইয়াছি যে, আপনি উহা রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে গুনিয়াছেন; আমার আশঙ্কা হইল—উহা শুনিবার পূর্বে আমার মৃত্যু আসিয়া যায় না কি। অর্থাৎ উক্ত হাদীছখানা শুনিবার উদ্দেশ্যে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য ক্রত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছি এবং এক মাসের পথ ভ্রমণ করিয়া আপনার নিকট পৌছিয়াছি।

যে হাদীছটি সম্পর্কে এই ঘটনা উহা বোখারী শরীফ ১১১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে—
 وَيَذْكُرُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَيْسٍ—قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَحْشُرُ اللَّهُ الْعِبَادَ فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعْدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الدِّيَّانُ

অর্থ:—জাবের রাজিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে ওনাইস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করা হয়—তিনি বলিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ তায়ালা (কেয়ামতের দিন) সকল মানুষকে হাশর-মাঠে একত্রিত করিবেন। অতঃপর সকলকে সম্বোধন করিবেন। সেই সম্বোধনের ধ্বনি নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকলেই সমভাবে শুনিতে পাইবে X। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন—একমাত্র আমিই সর্বাধিপতি, কর্মকল দানের ক্ষমতাবান একমাত্র আমিই।

X বোখারী শরীফ ৪৭০ পৃষ্ঠায় এক হাদীছে আছে—

يَجْمَعُ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي مَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُبْصِرُهُمُ النَّاطِرُ وَيَسْمَعُهُمُ الدَّاعِي وَتَدْنُو مِنْهُمْ الشَّمْسُ

“কেয়ামতের হিসাব-নিকাশের দিন আল্লাহ তায়ালা পূর্বাগত সকলকে একত্রিত করিবেন এক বিশাল ময়দানে, এরূপ ময়দান যেখানের প্রত্যেক দর্শক উপস্থিত সকলকে দেখিতে পাইবে (কারণ উক্ত ময়দানে কোন প্রকার উচ-নীচ বা আড়াল থাকিবে না।) এবং প্রত্যেক আহ্বানকারী উপস্থিত সকলকে তাহার কথা শুনাইতে সক্ষম হইবে এবং সূর্য অতি নিকটবর্তী হইবে।

এতদ্বিধা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কতৃক কালাম বা বাণী প্রদানকালে বাহাকে বা বাহাদিগকে বাণী দান করেন তাহাদের জন্য উহা শ্রবণে নিকটবর্তীতা ও দূরবর্তীতার ব্যবধান হয় না।

পাঠকবৃন্দ! হাদীছ লাভের জন্য এইরূপ পরিশ্রম করার আরও বহু ঘটনা বিদ্যমান রহিয়াছে। “এলমের ফজিলত ও প্রয়োজনীয়তা” পরিচ্ছেদে একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে— এক ব্যক্তি একটি মাত্র হাদীছ লাভের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফ হইতে প্রায় ছয় শত মাইল ভ্রমণ করিয়া দামেস্ক শহরে পৌঁছিয়াছিলেন।

শিক্ষা লাভ করিয়া শিক্ষাদান করার ফজিলত

৬৭। হাদীছ :— আবু মুহা আশয়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে হেদায়েত ও এলুম দান করিয়া পাঠাইয়াছেন উহার দৃষ্টান্ত—(চৈত্র-বৈশাখ মাসের) প্রবল মৌসুমী বৃষ্টি। যখন উহা ভূপৃষ্ঠে বর্ষিত হয়, তখন নরম ও উর্বর জমিগুলি শস্ত-শ্রামল এবং সবুজ তরুলতা ও ঘাস পাতায় পরিপূর্ণ হয়, (যদ্বারা ঐ জমি নিজেও সৌন্দর্য লাভে উপকৃত হয়, অপরকেও খাদ্য দান করিয়া উপকৃত করে।) আর যে জমিগুলি নীচু অথচ শুষ্ক, ঐ গুলিতে বৃষ্টির পানি জমিয়া থাকে, (ঐ জমির মধ্যে উর্বরাশক্তি না থাকায় সবুজ ঘাস বা শস্ত-শ্রামলতার সৌন্দর্য হইতে নিজে বঞ্চিত থাকে, কিন্তু অন্ত্রে উহা হইতে উপকৃত হয়—) সকলে ঐ পানি পান করে পশুপালকে পান করার এবং ঐ পানির দ্বারা অশ্রাঞ্জ জমিতে চাষাবাদ করে। আর যে জমিগুলি উষর, পাথরের ছায় শক্ত ও সমতল; ঐগুলি (সমতল হওয়ার দরুন পানি জমাইয়া রাখিতে অক্ষম; সুতরাং কেহ উহা) হইতে কোন প্রকার উপকার লাভ করিতে পারে না (এবং অনুর্বর শক্ত পাথরের ছায় হওয়ার দরুন উহাতে ঘাস পর্য্যন্ত জন্মায় না, তাই) নিজেও সৌন্দর্য হইতে বঞ্চিত থাকে।

উল্লেখিত প্রথম দৃষ্টান্তটি ঐ ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য যে দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে— আল্লাহ তায়ালা যে এলুম ও হেদায়েতের বাহকরূপে হযরত (দঃ)কে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা শিক্ষা করিয়া নিজেও উপকৃত হইয়াছে এবং অপরকেও শিক্ষা দিয়া উপকৃত করিয়াছে। তৃতীয় দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির যে সেই এলুম ও হেদায়েতের প্রতি মোটেই মনোযোগ দেয় নাই, উহা গ্রহণ করে নাই।

ব্যাখ্যা :—উল্লেখিত প্রথম প্রকারের জমি ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে নিজে হেদায়েত ও এলুমকে গ্রহণ করিয়া অপরকেও শিক্ষা দেয়; তৃতীয় প্রকার জমির তুল্য ঐ বদনছীব, যে সেই রত্নকে গ্রহণ না করিয়া উহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। হাদীছের মধ্যে স্পষ্টতঃ এই দুই শ্রেণীরই উল্লেখ হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকার জমির তুল্য ঐ আলেম-বে-আমল যে নিজে আমল করে না, অপরকে শিক্ষা দেয়। যুগা প্রদর্শনার্থে হযরত (দঃ) এই শ্রেণীর মানুষের উল্লেখ করেন নাই।

দ্বীনের এলুম উঠিয়া অজ্ঞতার প্রাবল্যের আশঙ্কা

রবীয়া (রঃ) নামক একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী ঃ বলিয়াছেন—যাহার নিকট এলুম আছে তাহার নিজকে ধ্বংস করা ঠিক নয়। অর্থাৎ আলেম হইয়া এলুম বিতরণ না করা এবং ছনিয়ার লাভে ব্যাপৃত থাকা এবং উহার লালায়িত হওয়া আলেম হিসাবে নিজকে ধ্বংস করারই শামিল।

৬৪। হাদীছঃ—

عن انس رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيُثْبِتَ الْجَهْلُ وَتُشْرَبَ الْخُمُرُ وَيُظْهَرَ الزِّنَا -

অর্থঃ— আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম করমাইয়াছেন, কেয়ামতের আলামত—এলুম উঠিয়া যাইবে, অজ্ঞতা প্রবল হইবে, মত্ত পান আরম্ভ হইবে, ঘেনা বা ব্যাভিচার বৃদ্ধি পাইবে, এমন কি উহা আর লুকায়িত বস্তু থাকিবে না।

৬৯। হাদীছঃ— আনাছ (রাঃ) একদা বলিলেন, আমি এমন একটি হাদীছ বয়ান করিব যাহা আমার পর (হযরত (দঃ) হইতে সরাসরি শ্রবণকারী) অথু কেহ বয়ান করিবে না। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, কেয়ামতের কতিপয় আলামত এই—এলুম দুর্লভ হইয়া যাইবে, অজ্ঞতা প্রবল হইবে, প্রকাশ্যে ব্যাভিচার হইবে, নারীর সংখ্যা অধিক হইবে, পুরুষের সংখ্যা কমিয়া যাইবে, এমনকি এক একটি পুরুষের তদ্বাবধানে পঞ্চাশটি নারী আশ্রিত হইবে।

৭০। হাদীছঃ—আবু হোরায়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (কেয়ামতের নিকটবর্তী) এলুম উঠিয়া যাইবে অত্যা ও কেৎনা-ফাসাদ তথা বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলার আধিক্য হইবে, অতি মাত্রায় কাটাকাটি মারামারি হইবে।

কিভাবে এলুম উঠিবে?

খলীফাতুল-মোসলেমীন ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) মদীনায় নিযুক্ত শাসনকর্তাকে লিখিত নির্দেশ পাঠাইলেন—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছসমূহকে অনুসন্ধান করিয়া লিপিবদ্ধ কর। আমার আশঙ্কা হইতেছে, এলুম বিলীন হইয়া যাইবে এবং ছনিয়ার বুক হইতে আলেমগণ বিলুপ্ত হইয়া যাইবেন। তবে ছহীহ ব্যতীত অথু কিছুই প্রতি লক্ষ্য করা উচিত নয়। (আর এলুমের প্রসারে তৎপর হওয়া একান্ত

ঃ “রবীয়া” মদীনাবাসী একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞ ও জ্ঞানী ইমাম মোজতাহেদ ছিলেন। তাঁহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রসার এত বেশী ছিল যে, তিনি সেকালে “মহাজ্ঞানী রবীয়া” নামেই পরিচিত ছিলেন। ১৩৬ হিঃ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কর্তব্য।) অশিক্ষিতদেরকে শিক্ষা দানের জন্য বসিতে হইবে। এলুম যখন মুষ্টিমেয় লোকের কুক্ষিগত হইয়া পড়িবে, তখন এলুমের ধ্বংস অনিবার্য।

৭১। হাদীছ :-আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি শুনিয়াছি, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন আল্লাহ তায়ালা এলুমকে তাঁহার বান্দাদের নিকট হইতে জবরদস্তি ছিনাইয়া বা কাড়িয়া লইবেন না, কিন্তু আলেমদিগকে উঠাইয়া নিয়া এলুম উঠাইবেন। যখন ছনিবার বৃকে আলেম থাকিবে না তখন জনগণ জাহেল ও অজ্ঞ ব্যক্তিকে সরদার নিযুক্ত করিবে এবং সেই সমস্ত জাহেল সরদারদের নিকটই সবকিছু জিজ্ঞাসা করা হইবে। এবং উহারা কিছুই না জানা সত্ত্বেও ফৎওয়া (—ধর্মীয় বিধানাবলীর রায় ও ফয়ছালাহ) দিবে; যদ্বারা তাহারা নিজেও গোমরাহ (পথভ্রষ্ট) হইবে। অপরকেও গোমরাহ করিবে। (২০ পৃঃ)

অতিরিক্ত এলুম হাসিল করা

এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক মোসলমানের উপর যে সব ফরজ-ওয়াজেব রহিয়াছে, ঐ সবের এলুম এবং যে যে কাজ করিবে উহা সম্পর্কে হালাল-হারামের এলুম হাসিল করা ত ফরজে আসেন; অর্থাৎ প্রত্যেকের উপরই উহা ফরজ। এতদ্বির অতিরিক্ত এলুমেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। প্রত্যেক অঞ্চলে এইরূপ অন্ততঃ প্রয়োজনীয় মছালা-মছায়েল জ্ঞাত হইতে পারে। ইহা ফরজে কেফায়া—প্রত্যেক অঞ্চলের সকলের উপর সমষ্টিগতভাবে ফরজ।

পশুর উপর থাকিয়া মছালা বর্ণনা করা*

৭২। হাদীছ :-আমর ইবনে আ'ছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছান্নান্নাহ আলাইহে অসাল্লাম বিদায়-হজ্জের সময় মিনার ময়দানে জমরা-আক্কাবার নিকটে (উটের উপর) সওয়ার ছিলেন। চতুর্পার্শ্ব হইতে সর্বসাধারণ তাঁহার নিকট মছালা জিজ্ঞাসা করিতেছিল। এক ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমি লক্ষ্য করি নাই—কোরবাণীর পূর্বেই চুল কামাইয়া ফেলিয়াছি। হযরত (দঃ) বলিলেন, তজ্জুহ কোন গোনাহ হইবে না, এখন কোরবাণী কর। অতঃপর এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আমি লক্ষ্য করি নাই—কঙ্কর নারিবার পূর্বেই কোরবাণী করিয়া ফেলিয়াছি। হযরত (দঃ) বলিলেন, তাহাতে গোনাহ হইবে না, এখন কঙ্কর মার। ঐ সময় যত লোকই কার্যাদি অগ্র পশ্চাৎ করিবার মছালা জিজ্ঞাসা করিল, প্রত্যেককেই হযরত (দঃ) উত্তর দিলেন—গোনাহ হইবে না, এখন করিয়া লও।+

* কোন কোন হাদীছে আছে—“কোন পশুকে বক্তৃতা মঞ্চ বানাইও না।” তাই বোঝার (রাঃ) এখানে দেখাইতেছেন যে, উক্ত হাদীছের উদ্দেশ্য এই যে, কোন পশুকে অধিক কষ্টে রাখিয়া উহার উপর বসিয়া বক্তৃতা দিবে না, সেই আশঙ্কা না হইলে এরূপ করা যায়।

+ হজ্জের আহকাম সমূহে ভুল বশতঃ উলট-পালট করিয়া ফেলিলে তাহাতে গোনাহ হইবে না, কিন্তু দম (জানোয়ার জবেহ করিয়া কাফ্ফারা) আদায় করিতে হইবে।

মাথা বা হাতের ইশারায় মছআলার উত্তর দেওয়া

৭৩। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হজ্জের সময় নবী (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল—কঙ্কর মারার পূর্বে কোরবাণী করিয়া ফেলিয়াছি। নবী (দঃ) হাতের দ্বারা ইশারা করিয়া দেখাইলেন যে, তাহাতে কোনও গোনাহ হইবে না। অতঃপর এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল—কোরবাণীর পূর্বেই চুল কাটিয়া ফেলিয়াছি। নবী (দঃ) হাতের দ্বারা ইশারা করিলেন—তচ্ছত্ত কোনও গোনাহ হইবে না।

নবী (দঃ) একটি প্রতিনিধি দলকে ঈমান ও কতিপয় বিষয়ের
এলম শিক্ষা দিয়া তাহাদের দেশবাসীকে
উহা শিক্ষা দিতে বলিয়াছিলেন

এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য—প্রত্যেক মোসলমান ঘোনের এলম যতটুকু শিখিতে পারে উহা
অপরকে শিখাইতে সচেষ্ট হওয়ার কর্তব্য নির্দেশ করা। এখানে ৪৮নং হাদীছের উল্লেখ হইয়াছে।

একটি মছআলার প্রয়োজনেও ছফর করা

৭৪। হাদীছ :—ওক্বা (রাঃ) নামক ছাহাবী একটি মেয়েকে বিবাহ করিলেন। কিছু
দিন পর অতঃপর একটি মহিলা আসিয়া বলিল, আমি ওক্বা ও তাহার স্ত্রী উভয়কে দুধ
পান করাইয়াছিলাম। (অর্থাৎ তাহার দুধ-ভাই বোন, তাহাদের মধ্যে বিবাহ চলিতে
পারে না।) ওক্বা বলিলেন, আমি এই ঘটনা জানি না এতদিন তুমি আমাকে এই
খবর দেও নাই। (শুধু বাড়ীতে খবর পাঠাইলেন; তাহারাও বলিল, আমাদের মেয়েকে
সে দুধ পান করাইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না।) তখন ওক্বা (রাঃ) (মক্কা হইতে
প্রায় ৩২০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া) মদীনায় পৌঁছিলেন এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু
আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উক্ত ঘটনা আরজ করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন,
এরূপ কথা উত্থাপিত হওয়ার পর তুমি কিভাবে ঐ নারীকে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করিবে?
এই কথার উপর ওক্বা (রাঃ) তাহার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলেন; পরে অতঃপর স্বামীর
সহিত তাহার বিবাহ হইল।

পরস্পর পালাক্রমের ব্যবস্থায় শিক্ষা লাভ করা

৭৫। হাদীছ :—ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এবং আমার এক প্রতিবেশী
আনছারী রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে হাজির থাকার জন্য পালা-
ক্রমের ব্যবস্থা করিয়া লইলাম। একদিন আমি হযরতের (দঃ) দরবারে হাজির থাকিতাম
(সে আমার ও তাহার সাংসারিক কাজ-কর্ম দেখিত;) আর একদিন সে রসুলুল্লাহ (দঃ) দরবারে
উপস্থিত থাকিত, আমি তাহার ও আমার সংসার দেখিতাম। যে দিন আমি উপস্থিত
থাকিতাম সে দিন অহী ইত্যাদির সমুদয় খবর তাহাকে বাড়ী আসিয়া শুনাইতাম ও
শিক্ষাদান করিতাম এবং যে দিন সে উপস্থিত থাকিত সে দিন সে আমাকে শিক্ষা দিত।

এক দিন ঐ ব্যক্তি তাহার পালার দিনে এশার (নামাযের) সময় এক ভয়ঙ্কর সংবাদ নিয়ে দৌড়িয়া আমার বাড়ী উপস্থিত হইল এবং দরওয়াজায় প্রবেশ করিয়া আমাকে ডাকিতে লাগিল। আমি হতভম্ব হইয়া তাহার প্রতি ছুটিয়া আসিলাম; সে বলিল, এক ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। (ওমর (রা:) বলেন—) সে সময় আমাদের নিকট একরূপ সংবাদ আসিতেছিল যে, গাস্‌সান গোত্রীয় কাফের রাষ্ট্র মোসলমানদের বিরুদ্ধে মদীনার উপর আক্রমণ চালানোর প্রস্তুতি করিতেছে; আমরা সর্বদা ঐ বিষয়ে শঙ্কিত ও জল্পনা কল্পনারত থাকিতাম। তাই আমি ঐ প্রতিবেশীর আতঙ্কবস্থা দৃষ্টে জিজ্ঞাসা করিলাম, গাস্‌সানী শত্রু চড়াও করিয়াছে কি? সে বলিল, না—তারচেয়েও বড় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে; রসুলুল্লাহ (দ:) খ্যীয় স্ত্রীগণকে তালাক দিয়া দিতেছেন। তখন আমি (আমার মেয়ে—হযরতের এক স্ত্রী হাফছার নাম লইয়া) বলিলাম—হাফছার সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে, সে সর্বহারী ও সর্বস্বান্ত হইয়াছে। আমি পূর্ব হইতেই আশঙ্কা করিতেছিলাম যে, একরূপ কিছু একটা ঘটা আসন্ন। অতঃপর আমি প্রস্তুত হইলাম এবং রসুলুল্লাহ (দ:) মসজিদে আসিয়া তাহার সঙ্গে ফজরের নামায পড়িলাম। নামাযান্তে তিনি একটি (কাঁচা) দ্বিতল কক্ষে চলিয়া গেলেন। আমি হাফছার নিকট যাইয়া দেখি, সে কাঁদিতেছে। আমি বলিলাম, এখন কাঁদ কেন? আমি পূর্বেই তোমাকে সতর্ক করিয়াছিলাম। রসুলুল্লাহ (দ:) তোমাদিগকে তালাক দিয়া দিয়াছেন কি? সে বলিল, তালাক দেওয়ার বিষয় কিছু জ্ঞাত নহি, কিন্তু হযরত (দ:) আমাদের হইতে পৃথক হইয়া ঐ দ্বিতল কোঠায় অবস্থান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমি পুনরায় মসজিদে আসিলাম; দেখিলাম, মিশ্বরের চতুষ্পার্শ্বে কিছু লোক বসিয়া কাঁদিতেছে; আমিও সেখানেই তাহাদের সঙ্গে বসিয়া পড়িলাম। কিন্তু তালাক দানের বিষয় স্থিরকৃতরূপে অবগতির স্পৃহা আমার ভিতর প্রবল হইয়া উঠিল; তাই আমি হযরতের (দ:) অবস্থানস্থল ঐ দ্বিতল কক্ষের নিকটবর্তী আসিলাম। সিঁড়ির নিকট একটি হাবশী গোলাম বসিয়াছিল, তাহাকে বলিলাম—হযরতের (দ:) খেদমতে আমার প্রবেশের অনুমতি-প্রার্থনা জানাও। সে ভিতরে যাইয়া কথা বলিল এবং ফিরিয়া আসিয়া আমাকে জানাইল যে, আমি রসুলুল্লাহ (দ:) খেদমতে আপনার আগমনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলাম, কিন্তু হযরত (দ:) কোন উত্তর দেন নাই। ইহা শুনিয়া আমি পুনরায় মসজিদের মিশ্বরের নিকটে লোকদের সঙ্গে আসিয়া বসিলাম। কিন্তু পুনরায় ঐ স্পৃহা আমার ভিতর অধিক প্রবল হইয়া উঠিল, আমি আবার ঐ কক্ষের নিকটবর্তী আসিয়া দরওয়ানকে এরূপ বলিলাম। এবারেও সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, হযরত (দ:) কোন উত্তর দেন নাই। আমি মসজিদে আসিয়া বসিলাম এবং তৃতীয়বার

† এই আশঙ্কার হেতু ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর পরবর্তী বর্ণনা হইতেই বুঝা যাইবে।

× যে বিষয়ে সতর্ক করিয়াছেন এবং যাহা কিছু বলিয়াছিলেন—বিস্তারিত বিবরণ ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর পরবর্তী বর্ণনায় পাওয়া যাইবে।

পুনরায় ঐরূপই করিলাম, দারওয়ান এইবারও ঐ কথাই শুনাইল। এইবার যখন আমি কক্ষের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু দূরে আসিয়া শুনিতে পাইলাম, দারওয়ান আমাকে ডাকিয়া বলিতেছে, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আপনাকে প্রবেশেষ অনুমতি দান করিয়াছেন।

আমি ঘরের ভিতরে যাইয়া দেখি—হযরত (দঃ) একটি খালি চাটাই-এর উপর খেজুর গাছের ছোবরা ভরা একটি চামড়ার বালিশে হেলান দিয়া শায়িত অবস্থায় আছেন। চাটাই-এর উপর কোন বিছানা বা চাদর না থাকায় তাঁহার শরীরে উহার বুনটের রেখা অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। আমি তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া বসিবার পূর্বেই সালাম করিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, হুজুর আপনি স্বীয় বিবিগণকে তালাক দিয়াছেন কি? হযরত (দঃ) আমার দিকে তাকাইয়া উত্তর করিলেন, না—তালাক দেই নাই। এতদশ্রবণে আমি উল্লসিত হইয়া আল্লাহ্-আকবার বলিয়া হর্ষধ্বনি দিলাম। তারপর আমি তাঁহার মন আকর্ষণের জন্য দাঁড়ান অবস্থায়ই একটি ঘটনার বিবরণ দান করিতে আরম্ভ করিলাম যে—ইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) দেখুন। আমরা মক্কাবাসী কোরায়েশ বংশীয়গণ এইরূপ অভ্যস্ত যে, পুরুষগণ সর্বদাই নারীদিগকে প্রভাবিত করিয়া রাখিয়া থাকি, নারীদের পক্ষ হইতে কোন প্রতিউত্তর কখনও বরদাশত করা হয় না। কিন্তু মদীনার অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং আমরা যখন হইতে মদীনায় অবস্থান করিতে আরম্ভ করিয়াছি তখন হইতে ধীরে ধীরে আমাদের নারীগণ মদীনাবাসী নারীদের অভ্যাসে অভ্যস্ত হইতে শুরু করিয়াছে। ইহা শ্রবণে রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে মুহ হাসি ফুটিয়া উঠিল।

তারপর বলিলাম, এমন কি একদিন আমার জীকে আমি কোন একটি বিষয়ে ধমক দিলে সে আমাকে প্রতিউত্তর করিয়া উঠিল, তাহাতে আমি ভীষণ চটিয়া গেলাম। তখন সে আমাকে বলিল, আমার একটি মাত্র প্রতিউত্তরেই আপনি এরূপ চটিয়া উঠিলেন। অথচ রসুলুল্লাহ (দঃ) জীগণও ত তাঁহার সঙ্গে প্রতিউত্তর করিয়া থাকেন, এমনকি কখনও কখনও তাহাদের কেহ কেহ (গৃহের মধ্যে) রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে পৃথক ও দূরে দূরে থাকিয়া দিন কাটাইয়া দেন। আমি আমার জীর মুখে এই সংবাদ শুনিয়া আতঙ্কিত ও স্তম্ভিত হইয়া উঠিলাম এবং বলিলাম, যে-ই আল্লাহ রসুলের সঙ্গে এই প্রকার ব্যবহার করিবে তাহার কপালপোড়া সর্বহারা হইয়া অনিবার্য। এই বলিয়া আমি তৎক্ষণাৎ রওয়ানা হইয়া হাফছার নিকট আসিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা কি রসুলুল্লাহ (দঃ) সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাক? সে উহা স্বীকার করিল। আমি তাহাকে বলিলাম, তুমি কপালপোড়া সর্বহারা হইয়াছ; তোমার কি ভয় হয় না যে, আল্লাহ রসুলের (দঃ) অসন্তুষ্টির দরুন তুমি আল্লাহ অসন্তুষ্টি ও অভিশাপে পতিত হইয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে? আমি তোমাকে রসুলুল্লাহ (দঃ) অসন্তুষ্টি তথা আল্লাহ অসন্তুষ্টি ও গজব হইতে সতর্ক করিয়া দিতেছি। খবরদার! কখনও তুমি রসুলুল্লাহ (দঃ) নিকট খোর-পোষ ইত্যাদি বৃদ্ধির

দাবী করিবে না, তাঁহার কোন কথাই প্রতিউত্তর করিবে না, সর্বদা তাঁহার চরণতলে থাকিয়া জীবন কাটাইবে। তোমার যাহা কিছু প্রয়োজন হয় তুমি আমার নিকট দাবী জানাইবে। তোমাদের মধ্যে কেহ যদি রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিশেষ সন্তুষ্টি-ভাজন ও প্রিয়পাত্র হওয়ার দরুন ঐরূপ কোন কিছু বরো তথাপি তাহার দেখা-দেখি তুমি কিন্তু খবরদার—কখনও ঐরূপ কিছু করিবে না। (এই বাক্যটি দ্বারা) বিবি আয়েশার প্রতি ইঙ্গিত করা হইতেছিল; এখানেও হযরত (দঃ) মুহাম্মাদি হাসিলেন।

ওমর (রাঃ) বলিতেছেন, তারপর আমি বিবি উম্মে-সাল্‌মার (রসুলুল্লাহ (দঃ) এক জী, ওমর (রাঃ)-এর দূর সম্পর্কীয় খালা) নিকট উপস্থিত হইয়া ঐরূপ নহীহত শুনাইতে লাগিলাম। তিনি আমার এই ধরনের কার্য্যকে অনধিকার চর্চা আখ্যায়িত করিয়া বলিলেন—আপনি সর্বস্থানেই স্বীয় অধিকার দেখাইতে চান। এমনকি রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁহার জীবগের ব্যাপার সমূহের মধ্যেও অধিকার খাটাইতেছেন।* তাঁহার এই উত্তরে আমি আমার অভিযানে বাধাপ্রাপ্ত হইলাম এবং আমার ধারণা, ইচ্ছা ও অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। বিবি উম্মে-সাল্‌মার এই ঘটনা শ্রবণে হযরত (দঃ) পুনরায় মুহাম্মাদি হাসিলেন।

ওমর (রাঃ) বলেন—পুনঃ পুনঃ হযরতের (দঃ) হাসিমুখ দেখিয়া আমার মনে সাহসের সঞ্চার হইল, তখন আমি বসিয়া পড়িলাম। (তাঁহাকে আমি যে অবস্থায় শায়িত দেখিয়া ছিলাম তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে,) এখন আমি তাঁহার কক্ষের চতুর্দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, সেখানে তিনটি মাত্র কাঁচা চামড়া এবং চামড়া পাকা করার জন্য বাবলা গাছের পাতা ভিন্ন আর কিছুই নাই। রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ঐরূপ নিঃস্বল অবস্থায় দরিদ্রবেশে থাকিতে দেখিয়া আমি আমার অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না—কাঁদিয়া ফেলিলাম; দর দর করিয়া আমার চোখের পানি বহিতে লাগিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ওমর! কাঁদ কেন? আমি আঃজ করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ! পারস্য সম্রাট “কেসরা” রোম সম্রাট “কায়ছর” তাহারা আল্লাহর উপাসক নয়, আল্লাহর একত্ববাদীও নয়; তথাপি তাহারা কত রকম আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস, সুখ-স্বচ্ছন্দের মধ্যে রহিয়াছে। আল্লাহ তাহাদিগকে ছনিয়ার সব কিছু দান করিয়াছেন।

* আল্লাহর রসুল (দঃ)কে বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট করার বিষয় কুফল ওমর (রাঃ) যাহা বলিয়াছেন তারচেয়ে অধিক বলিলেও তাহা অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু বিবি উম্মে-সাল্‌মা (রাঃ) যে সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন তাহাও একটি বাস্তব সত্য। স্বামী-স্ত্রীর প্রণয়ের সূক্ষ্ম সম্পর্ক ও দাম্পত্য সূত্রের প্রবণতা দৃষ্টে অনেক ক্ষেত্রে অপরাধকে অপরাধ গণ্য করা হয় না বা বড় অপরাধকেও কতিপয় মামুলী বিষয়রূপে দেখা হয় এবং উহার দ্বারা সংঘটিত অসন্তুষ্টি হইয়া থাকে। যাহা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সীমাবদ্ধ ব্যাপার বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে, ঐরূপ ক্ষেত্রে মহম্মাদিও ভিন্ন ধরনেরই।

✽ হাদীছে উল্লেখ আছে, হযরত (দঃ) মুহাম্মাদি অপেক্ষা বড় বা অধিক হাসিতেন না।

আর আপনি আল্লাহ রসূল, অথচ—দরিদ্রবেশী নিঃসম্বল ! (ওমর (রাঃ) ভালরূপেই জানিতেন যে—নিঃসম্বলতা ও দরিদ্রবেশ রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ইচ্ছাকৃত ছিল†; তিনি ছনিয়ার ভোগ-বিলাসকে নগণ্য ও তুচ্ছ মনে করিতেন। তাই বেশী কিছু বলিতে সাহসী না হইয়া ওমর (রাঃ) এই বলিলেন,) আপনি দোয়া করুন—আল্লাহ আপনার উম্মৎকে অধিক স্বচ্ছলতা দান করুন।

এথাবৎ রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হেলান দেওয়া অবস্থায় শায়িত ছিলেন; ওমরের (রাঃ) শেষ কথাটি শুনিয়া উহার উত্তরে বিশেষ তৎপরতা প্রদর্শনে তিনি সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং ওমরের এই উক্তির প্রতি অতিশয় বিস্ময় প্রকাশ পূর্বক তেজোদৃষ্ট ভাষায় বলিলেন—

أَوْفَى شَكِّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ - أَوْلَيْكَ قَوْمٌ عَجَلَتْ لَهُمْ
طَبِيبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا -

হে খাত্তাবের পুত্র (ওমর)। তুমি এখনও (কি এহেন হীন ধারণার বশবর্তী রহিয়াছ যে—মোসলমানগণ আল্লাহ প্রিয়পাত্র হওয়ায় তাহারা ছনিয়ার ভোগ-বিলাসের অধিকারী হওয়া চাই? এবং তুমি) এই বিষয়টির প্রতি সন্দেহাতীতরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পার নাই কি? যে—রোমীয়, পারসিক ইত্যাদি জাতিগণ যাহারা ছনিয়ার জাকজমকপূর্ণ ভোগ-বিলাসের মধ্যে আছে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে যাহা কিছু সুখ-শান্তি দিবার, তাহা এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের মধ্যেই দান করতঃ সুখ-ভোগের অংশ পরিশোধ করিয়া দিয়াছেন। (কারণ চিরস্থায়ী জীবনের বেলায় তাহাদের পক্ষে সুখ-শান্তির বিষয়ে কোন বিবেচনাই করা হইবে না।) হযরত (দঃ) আরও বলিলেন—

أَمَّا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ

“তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও? যে, অমোসলমানদের জন্য সুখ শান্তি (পাওয়া ভাগ্যে থাকিলে) উহার স্থান হইল একমাত্র ক্ষণস্থায়ী ছনিয়ার; চিরস্থায়ী আখেরাতে সুখ-

† তিরমিযি শরীফে বর্ণিত এক হাদীছে আছে—হযরত রসূলুল্লাহ (দঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আল্লাহ তায়ালা আমার নিকট এই প্রস্তাব পাঠাইলেন যে—আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বচ্ছলতার জন্য তিনি মক্কা নগরীর ককরময় ভূমিকে স্বর্ণে পরিণত করিয়া দিতে চান। আমি আরজ করিলাম—হে আমার পালনকর্তা। আমি উহার আকাঙ্ক্ষা রাখি না, আমি ভালবাসি এই যে—একদিন আহা করিব, আর একদিন অনাহারে কাটাইব। অনাহারে থাকিয়া আপনাকে স্মরণ করিব, আপনার প্রত্যাশীরূপে আপনার নিকট ভিক্ষা চাহিব এবং আহা করিয়া আপনার শোকর আদায় করিব।

শান্তির লেশমাত্র তাহারা পাইবে না। পক্ষান্তরে মোসলমানদের জন্য সুখ-শান্তির আসন্ন স্থান হইল আখেরাত; (আর হুনিয়ার অবস্থা তাহাদের বেলায় সাময়িক ব্যবস্থাধীন থাকে।) ”

(ওমর (রাঃ) বলেন—হযরতের (দঃ) এই উত্তর শুনিয়া) আমি স্বীয় দুর্বল মনোবৃত্তিসূচক ও হীন ধারণাব্যঞ্জক উক্তির জন্য আল্লাহ নিকট আমার পক্ষে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে অনুরোধ জানাইলাম।

● আলোচ্য হাদীছের মূল ঘটনার আসল তত্ত্ব এই ছিল যে—রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় জীবনের প্রতি কতিপয় পারিবারিক বিষয়ের দরুন রাগান্বিত হইয়াছিলেন। সেই জন্য পরিবারবর্গকে শাস্ত্রোক্ত করার মানসে দীর্ঘ এক একমাস কাল তাহাদের হইতে পৃথক থাকা অবলম্বন করিয়া ঐ দ্বিতল গৃহে একাকী অবস্থানরত হইয়াছিলেন; ইহা হইতেই “তালাক দান” খবরের সূত্রপাত হয়। এই ঘটনার পরবর্তী অবস্থার বিবরণ তালাকের অধ্যায়ে একটি পরিচ্ছেদের হাদীছে বর্ণিত আছে। ইনশা-আল্লাহ তায়ালা সেখানে এ বিষয়ের আলোচনা করা হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—উল্লিখিত হাদীছের মধ্যে ওমরের (রাঃ) শেষ কথাটির উত্তরে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বিশেষ দৃঢ়তার সহিত একটি অমূল্য তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ প্রবসত্য বাস্তব তথ্যটি পবিত্র কোরআনের বহু আয়াতে এবং আরও অনেক হাদীছে বর্ণিত আছে। অধুনা এই বিষয়টির প্রতি মোসলমানদের বিশ্বাস শিথিল হইয়া আসায় অনেক ক্ষেত্রে নানাপ্রকার সংশয়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে। তাই এই বাস্তব তথ্যটিকে ভালরূপে অনুধাবন করা আবশ্যক বিধায় নিম্নে এই তত্ত্ব সম্বলিত আয়াত এবং আরও কতিপয় হাদীছ উদ্ধৃত করা হইতেছে।

কোরআন শরীফের ২৫ পারায় একটি ছুরা আছে—“ছুরা যুখরুফ”। যুখরুফ শব্দের অর্থ—জাকজমকপূর্ণ ভোগ-বিলাস। সেই ছুরার দ্বিতীয় রুকু শেষ ভাগে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ

سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ - وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُورًا عَلَيْهَا

يَتَكَبَّرُونَ - وَزُخْرَفًا وَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ أَعِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ -

অর্থ—যদি এরূপ আশঙ্কা না হইত যে, (লালসার কবলে পতিত হইয়া) জনসাধারণ একই ধরণের (কাফের দলভুক্ত) হইয়া যাইবে, তবে আমি (নানাপ্রকার নিগূঢ় তত্ত্বময় রহস্যের পরিপ্রেক্ষিতে) কাফেরদিগকে ইহজগতের ধন-দৌলত আরও এত বেশী দান করিতাম

যে, তাহাদের গগনচুম্বী অট্টালিকা সমূহের ছাদ, দি'ড়ি ও দরজা-কপাট এবং খাট-পালঙ্ক সব কিছু রোপা (এবং স্বর্ণের) দ্বারা নির্মিত হইত। তাছাড়া আরও কত কত ভোগ বিলাসের সামগ্রী তাহাদিগকে দান করিতাম। কিন্তু (হে মানব! স্মরণ রাখিও) এই সবই শুধু ক্ষণস্থায়ী জাগতিক জীবনের সামগ্রী মাত্র। পক্ষান্তরে আখেরাতের চিরস্থায়ী অফুরন্ত সুখ-শান্তি (মোসলমান তথ্য) মোস্তাক্বীনদের জন্য পালনকর্তা আল্লাহ তায়ালার নিকট নিদিষ্ট রহিয়াছে।

হাদীছ শরীফে আছে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, ক্ষণস্থায়ী ছনিয়াকে স্বীয় গৃহ গণ্য করিবে এই ব্যক্তি যাহার জন্য চিরস্থায়ী আখেরাতে শান্তির স্থান নাই। ছনিয়ার ধন-সম্পত্তিকে ধন-সম্পত্তি গণ্য করিবে এই ব্যক্তি যাহার জন্য আখেরাতে কোন ধন-সম্পত্তি নাই। ছনিয়াতে ধন সম্পত্তি জমা করায় ব্যাপৃত হইবে এই ব্যক্তি যাহার বৃদ্ধি নাই। (মেশকাত শরীফ)

রসুলুল্লাহ (দঃ) আরও বলিয়াছেন, ফাসেক-ফাজের ব্যক্তিকে ভোগ-বিলাসের মধ্যে দেখিয়া উহার প্রতি তুমি লালায়িত হইও না; তুমি জান না সে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কিরূপ ভীষণ কষ্টে পতিত হইবে। মৃত্যুতুল্য কষ্ট-যাতনা ভোগ করিয়া যাইবে কিন্তু মৃত্যু ঘটিবে না। (মেশকাত শরীফ)

পাইকবন্দ। লক্ষ্য রাখিবেন, এই ধরণের আয়াত ও হাদীছ সমূহের তাৎপর্য ও মুখ্য উদ্দেশ্য—মোসলমানদের অন্তর হইতে ছনিয়ার লালসা এবং ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাস ও উহার আকাঙ্ক্ষা-স্পৃহার বিলুপ্তি সাধন পূর্বক প্রতিটি মোসলমানের অন্তরে এই ভাব সৃষ্টি করা যে, সে যেন আখেরাতের কামিয়াবি তথা আল্লাহর সন্তুষ্টিতে তাহার প্রকৃত উন্নতি ও একমাত্র লক্ষ্য বস্তু গণ্য করে। এই উদ্দেশ্যটি মানব কল্যাণের জন্য অমৃত ত্রুতা, পক্ষান্তরে ছনিয়ার লালসা ও ভোগ-বিলাসের স্পৃহা মানুষের জন্য বিষতুল্য—ইহা একটি বাস্তব সত্য। তদুপরি হাদীছ শরীফেও স্পষ্ট উল্লেখ আছে—**حب الدنيا رأس كل خطيئة**—“ছনিয়ার লালসা তথা ভোগ-বিলাসের আকাঙ্ক্ষা-স্পৃহা সমস্ত অপরাধের মূল।” যত রকম অসৎকর্ম পাপাচার ছার্থ্য ও ছনীতি আছে এই সবার মধ্যে ছনিয়ার লালসা তথা টাকা-পয়সা, নাম-ধাম, আরাম-আয়েশ ও ভোগ বিলাসের স্পৃহা বিद्यমান রহিয়াছে। তাই হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করিয়া প্রিয় উম্মতকে ছনিয়ার লালসা হইতে মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তদুপরি আলোচ্য আয়াত ও হাদীছসমূহ অল্প আরও এক দিক দিয়া বিশেষ সুফল দায়ক। যে ব্যক্তি এসব বর্ণনা ও তথ্যের প্রতি পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত হইবে সে দারিদ্র্য বা যে কোন কষ্ট-ক্লেশে, আপদ-বিপদে বিচলিত হইয়া স্বীয় লক্ষ্যস্থল আখেরাতকে ভুলিয়া যাইবে না বা কোন প্রকার দুঃখ-কষ্টের আক্রমণে সে আখেরাতের পথচ্যুত হইবে না। বরং নিমজ্জমান ব্যক্তির হৃদয় বিশাল তরঙ্গমালার সহিত অবিরাম সংগ্রাম করিয়া স্বীয় লক্ষ্যস্থল তীরপানে অগ্রসর হইতে থাকিবে।

ইহাই হইল এই ধরনের আয়াত ও হাদীছসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য, কর্ম-জীবনে হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকা বা আর্থিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও প্রগতিব ময়দানে অগ্রসর না হওয়া এইসব আয়াত ও হাদীছের উদ্দেশ্য মোটেই নহে।

অধুনা মোসলমান সমাজের একদল লোক যাহারা কোরআন-হাদীছের প্রতি শ্রদ্ধা কম রাখা, যাহারা কোরআন হাদীছ বুঝে না এবং বুঝিবার চেষ্টাও করে না। তাহারা না বুঝিয়া বা ইসলামের শত্রু কুচক্রিদের প্ররোচনায় লোকচক্ষে কোরআন-হাদীছকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে এই ধরনের আয়াত ও হাদীছের প্রতি কটাক্ষ করিয়া থাকে যে—এই সব আয়াত ও হাদীছ মোসলমানদের উন্নতি ও প্রগতিতে বাধা দান করিয়া থাকে। তাহারা যদি মোসলমানদের গৌরবময় ইতিহাস হইতে অজ্ঞ না হইতে তবে কখনও এইরূপ কুউক্তি করিত না। প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটনা ইহার বিপরীত, কারণ এইসব আয়াত ও হাদীছসমূহের প্রথম শ্রোতা ছাহাবায়ে-কেরামগণ অনাহারে থাকিয়া, পেটে পাথর বাঁধিয়া বাবলা গাছের পাতা খাইয়া, নগ্নপদে পাহাড় পর্বত অতিক্রম করতঃ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া, শত শত দুঃখ-কষ্ট মাথায় নিয়াও ছনিয়া-আখেরাতের যে বিরাট উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন আমরা উহার স্বপ্নও দেখিতে পারিব না। এসব কাল্পনিক কাহিনী বা ভাবাবেগের প্রবণতা নহে, বরং বাস্তব সত্য ঘটনা। খন্দকের জেহাদ, যাতুর রেকার জেহাদ, জায়শুল-খাবাতের জেহাদ, তবুকের জেহাদ ইত্যাদি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাবলীর প্রকৃত বিবরণ খুঁজিয়া দেখুন। ছাহাবা-কেরামদের মধ্যে এই প্রেরণা এবং এত কর্মক্ষমতা কিরূপে আসিয়াছিল? একমাত্র এই সমস্ত আয়াত ও হাদীছ সমূহ দ্বারাই ছাহাবীগণ ছনিয়ার লালসা ও ভোগ-বিলাসের স্পৃহা হইতে আত্মশুদ্ধি হাসিল করার তাহাদের অন্তরে যে অপরাজ্জের মনোবল এবং অদম্য জয়বা ও অনুপ্রেরণা হাসিল হয় তদ্বারাই তাহারা ধীন-ছনিয়ার উন্নতি ও কামিয়াবি সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ফলকথা এই যে, এখানে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন জিনিষ। প্রথমটি হইল, ছনিয়ার লালসা ও ভোগ বিলাসের আকাঙ্ক্ষা-স্পৃহা। আর দ্বিতীয়টি হইল কর্মজীবনে বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টার ময়দানে অগ্রসর হওয়া। আলোচ্য আয়াত ও হাদীছসমূহের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য হইল প্রথমটির বিলুপ্তি সাধন করা; দ্বিতীয়টির নহে। বরং যাহারা স্বীয় আত্মাকে প্রথমটি হইতে পবিত্র ও শুদ্ধ করতঃ রসূলুল্লাহ (দঃ) বর্ণিত তথ্যকে পূর্ণ অনুধাবন করিয়া লইতে পারিয়াছেন, ছনিয়ার ধন দৌলত, টাকা-পয়সা তাহাদের জন্ত ক্ষতিকর হইতে পারে না। কারণ তাহারা যেহেতু আখেরাত তথা আল্লার সন্তুষ্টিতে স্বীয় লক্ষ্যস্থল রূপে স্থির করিয়া লইয়াছেন, তাই যেমন কোনও আপদ-বিপদ তাহাদিগকে পথচ্যুত করিতে পারিবে না তেমনিভাবে ধন-দৌলত সুদ-সন্তোষও তাহাদিগকে পথচ্যুত করিতে পারিবে না। বরং তাহারা সমস্ত ধন-দৌলত এবং ঐশ্বর্য্য-সম্পদকেও ঐ রাস্তায়ই নিয়োগ করিবেন। কোন এক কবি বলিয়াছেন—

نه مردست آن كه دنيا دوست دارد — اگر دارد برائے دوست دارد

“এ ব্যক্তি মানুষ নামে পরিচিত হইবার উপযুক্ত নয়, যে ছুনিয়া তথা ধন-দৌলতকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছে। মানুষ এই ব্যক্তি যে ধন-দৌলত পাইয়া সর্বোপরি বন্ধু যে আল্লাহ সেই আল্লাহর রাস্তায় উহাকে নিয়োগ করিয়াছে। মাওলানা রুমী (রঃ) বলিয়াছেন—

آب در کشتی هلاک کشتی است — آب اندر زیر کشتی پستی است

“নৌকার ভিতরে পানি প্রবেশ করিলে সেই পানি নৌকার ধ্বংস টানিয়া আনিবে, কিন্তু নৌকার তলার নীচে থাকিলে উহা নৌকার জন্য সাহায্যকারী হইবে।

ধন-দৌলতের সহিত মানবের সম্পর্কও ঠিক তদ্রূপই। হৃদয়ের বাহিরে (হাত পায়ে দ্বারা অঙ্গিত ও সঞ্চিত হইয়া সংকাজে ব্যয়িত হইতে) থাকিলে উহার দ্বারা ইহ-জীবন ও পরজীবন উভয় জীবনের উন্নতি সাধন কার্যে সাহায্য পাওয়া যাইবে। পক্ষান্তরে হৃদয়ের ভিতরে অর্থের মায়া প্রবেশ করিয়া কাল্পনের ধনের মত কেবল পুঞ্জি হইয়া থাকিলে তদ্বারা জীবনের ধ্বংস সাধনই হইবে।

শিক্ষা বা নছীহত দান কালে রাগ করা

৭৬। হাদীছ :—আবু মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি অভিযোগ করিল, ইয়া রসুল্লাহ (দঃ)। অমুক ব্যক্তির জন্য আমি জমাতে শামিল হইতে পারি না, কারণ সে নামায অত্যধিক লম্বা করিয়া পড়ে। এই কথা শুনিয়া নবী (দঃ) এরূপ রাগান্বিত হইয়াছিলেন যে, আমরা তাঁহাকে তদ্রূপ রাগান্বিত হইতে আর কখনও দেখি নাই। তিনি রাগতঃবরে বলিলেন, হে লোক সকল! তোমাদের অনেকে এরূপ কাজ করিয়া থাকে, যদ্বারা মানুষের মধ্যে দ্বীনের কাজ হইতে বিরক্তি সৃষ্টি হয়। এরূপ কার্য হইতে তোমাদের সতর্ক থাকা আবশ্যক। লক্ষ্য রাখা দরকার যে, নামায যেন অত্যধিক লম্বা হইয়া না পড়ে।* কারণ জমাতের মধ্যে রুগ্ন, হর্বল ও কর্মব্যস্ত ব্যক্তিগণও থাকে।

৭৭। হাদীছ :—যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট পথে পাওয়া বস্তুর বিষয় মহাআলাহ জিজ্ঞাসা

* দ্বীনের কাজের প্রতি অলসতা ও অবহেলার বর্তমান যুগে অনেকে এইরূপ হাদীছের দ্বারা ভুল ধারণা জন্মাইয়া লয় যে, “ইয়া আ’তাইনা”, “কুল্হ আল্লাহ” ইত্যাদি ছোট ছোট ছুরা দিয়াই নামায পড়াইতে হইবে। কিন্তু এরূপ হাদীছের পূর্ণ ঘটনা উপলব্ধি করিলেই এই ধারণার অসারতা প্রমাণিত হয়। এশার নামাযের মধ্যে আড়াই ছিপারা ব্যাপী ছুরা বাকারার মত লম্বা কেবলেব বিরুদ্ধে এই সতর্কবাণী ছিল এবং এই সতর্কবাণীর সঙ্গে সঙ্গে হযরত (দঃ) নিজেই এশার নামাযের জন্য ১১, ১৫, ১৯, ২১ আয়াত বিশিষ্ট ছুরা সমূহের নাম বলিয়া উহা পড়িতে আদেশ করিয়াছেন। প্রত্যেক নামাযের জন্য কেবলেব ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ স্মরণরূপে নির্ধারিত আছে, উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত উপায়ে নামায আদায় করা ইমামের কর্তব্য।

করিল। তিনি বলিলেন, (প্রকৃত মালিকের পরিচয় লাভের জন্য) থলিয়া ও উহার বন্ধনের দড়ি ইত্যাদি (নিদর্শন সমূহ) ভালরূপে দেখিয়া লও, তৎপরে এক বৎসর পর্য্যন্ত ঢোল-শোহরত দ্বারা খবর করিতে থাক। অগত্যা মালিকের সন্ধান না পাইলে (নিজে গরীব হইলে বা অথ কোন গরীবের প্রতি) উহা খরচ করিতে পার। কিন্তু খরচ করার পর যদি মালিক আসে তবে তাহাকে উহা আদায় করিতে হইবে। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, যদি হারানো উট পাওয়া যায়? এই প্রশ্ন শুনিয়া রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এত রাগান্বিত হইলেন যে, তাঁহার চেহারা মোবারক লাল হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, উটের (মত এত বড় জানোয়ারের) বিষয়ে তোমার মাথা ঘামানোর প্রয়োজন কি? উহা কখনও তোমার প্রত্যাশী নয়; উহার ভিতরে পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে, হাঁটিয়া চলিবার ক্ষমতা উহার আছে এবং সে নিখিলে মাঠে-ঘাটে চরিয়া বেড়াইতে পারে। তুমি উহাকে আটকাইয়া রাখিও না অমনিতেই উহার মালিক উহার সন্ধান পাইয়া যাইবে। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হারান বকরীর বিষয়ে কি বলেন? হযরত (দঃ) বলিলেন, (উহার হেফাজত করা চাই;) কারণ, হয় তুমি বা অথ কেহ উহার হেফাজতকারী হইবে, নচেৎ উহা বাঘের খোরাক হইবে।

মুরব্বী ও ওস্তাদের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসা

৭৮। হাদীছ :—আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (অनावश्यक অতিরিক্ত প্রশ্নাবলীতে বিরক্ত হইয়া রাগান্বিত ভাবে) বলিলেন, তোমাদের যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হুজুর আমার পিতা কে? তিনি বলিলেন, তোমার পিতা হোজ্রাফাহ।^১ অপর এক ব্যক্তিও অনুরূপভাবে জিজ্ঞাসা করিল, আমার পিতা কে? হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমার পিতা ছালাম। রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ক্রোধান্বিত হইয়া বার বার বলিতেছিলেন, জিজ্ঞাসা কর। (আর সরল-মনা লোকগণ রসুলুল্লাহ (দঃ) ক্রোধাবস্থা বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিয়া যাইতেছিলেন। এমতাবস্থায় ওমর (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চেহারার উপর রাগের নিদর্শন দেখিতে পাইয়া তাঁহার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমরা (আল্লাহ ও রসুলের অসম্ভুতির কাজ হইতে) তওব করিতেছি; আমরা আল্লাহ প্রতি রব্ব অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা হিসাবে, ইসলামের প্রতি দ্বীন হিসাবে, মোহাম্মদের রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি পয়গাম্বর হিসাবে পূর্ণ তুষ্টি লাভ করিতেছি। (তাঁহাদের আদেশ-নিষেধ সরল-সঠিকভাবে পালন করিয়া যাইব, আনাবश्यक প্রশ্নাদি করিব না।) এইরূপ বলিতে থাকায় রসুলুল্লাহ (দঃ) ক্ষান্ত হইলেন।

১ এই প্রশ্নকারীর অবস্থা ছিল এই যে, তাহাদের আকৃতি তাহাদের পিতার স্থায় না হওয়ায় ব্যঙ্গ করিয়া উপহাস স্বরূপ তাহাদিগকে অশ্লের ঔরষজাত বলিয়া ইঙ্গিত করা হইত। সেই জন্যই তাহারা প্রশ্ন করিল; যেন রসুলুল্লাহ (দঃ)এর ফরমান অনুযায়ী সকলে ঐরূপ কথা হইতে বিরত থাকে।

প্রয়োজন বোধে কোন কথা পুনঃ পুনঃ বলা

৭৯। হাদীছ :— আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছালামুহ আল্লাইহে অসালাম যখন কোন কিছু বয়ান করিতেন, তখন (কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রোতাগণ যাহাতে তাঁহার বক্তব্য উত্তমরূপে অনুধাবন করিয়া লইতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া) পুনঃ পুনঃ তিনি বর্ণনা করিতেন। আর কোন লোকদের নিকট আসিলে (ক্ষেত্র বিশেষ) তিনবার সালাম করিতেন।

ব্যাখ্যা :— তিনবার সালাম কথা প্রসঙ্গটি বিশেষ অবস্থায় প্রযোজ্য ; নিম্নে বর্ণিত স্থানসমূহ উহার উপযোগী গণ্য হইতে পারে। যথা—(১) কাহারও বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করার পূর্বে দরওয়াজায় দাঁড়াইয়া সালামের দ্বারা অনুমতি প্রার্থনা করা শরীয়তের বিধান। সেস্থলে প্রথমবারে উত্তর না পাইলে দ্বিতীয়বার সালাম করিবে, তখনও উত্তর না পাইলে তৃতীয়বারও সালাম করা চাই। প্রথমবারেই কিরিয়া আসা কিম্বা তৃতীয়বারের পরেও অনর্থক অপেক্ষা করা উচিত নয়। (২) গৃহাভ্যন্তরস্থিত ব্যক্তির নিকট যাওয়াকালীন প্রথমে অনুমতি প্রার্থনার সালাম, সাফাতে দ্বিতীয় সালাম এবং কার্য সমাপ্তে বিদায়কালে তৃতীয় সালাম করিবে। (৩) কোন বড় মজলিসে বা জনসভায় উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইতে থাকাকালে সভার প্রথম ভাগ, মধ্যভাগ এবং শেষভাগের প্রতি সালাম করিতে পারে। (৪) অনেক বড় সভায় দাঁড়াইয়া আবশ্যক বোধে ডাইনে বায়ে সম্মুখে সালাম করা যায়। (চতুর্থটি শরহে তারাজেম—শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভীর কেতাবে এই হাদীছেরই ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে।)

পরিবারবর্গকে এবং ভৃত্যকেও দ্বীন শিক্ষা দিবে

৮০। হাদীছ :—আবু যুহা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছালামুহ আল্লাইহে অসালাম বলিয়াছেন, তিন প্রকারের লোক দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হইবে। (১) যে ব্যক্তি ইহুদী বা নাছরানী ছিল, সেই ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া সে মোহাম্মদ ছালামুহ আল্লাইহে অসালামের উপর ঈমান আনিয়াছে (২) ঐ ক্রীতদাস গোলাম যে আল্লার হুকুম আদায় করে এবং স্বীয় মনিবের হুকুম আদায় করে। (৩) যাহার নিকট কোন ক্রীতদাসী ছিল (যাহাকে সে এসমিতেই ব্যবহার করিতে পারিত, কিন্তু) সে তাহাকে ভালরূপে আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়াছে, উত্তমরূপে দ্বীনের এলম শিক্ষা দিয়াছে, তারপর তাহাকে আজাদ করিয়া বিবাহ করতঃ জীবন মর্যাদা দান করিয়াছে, ঐ ব্যক্তিও দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হইবে।

এই হাদীছ বর্ণনাকারী একজন বিশিষ্ট তাবেরী আ'মের শা'বী (রাঃ) তাঁহার ছাত্রদিগকে বলিতেন, তোমরা বিনা ক্লেশে এত বড় হাদীছ পাইলে ; পূর্বের যমানায় এর চাইতে ছোট একটি হাদীছের জহাও মানুষ বহু দূর দেশ হইতে পথ অতিক্রম করিয়া মদীনায় আসিত।

ব্যাখ্যা :—প্রথম ব্যক্তি ঈমান ও দ্বীন ইসলাম গ্রহণে দ্বিগুণ ছওয়াব পাইবে, দ্বিতীয় ব্যক্তি আল্লার প্রতিটি হুক তথা প্রতিটি ফরজ-ওয়াজেব ও শরীয়তের হুকুম পালনে দ্বিগুণ ছওয়াব পাইবে। তৃতীয় ব্যক্তি ক্রীতদাসী আজাদ করায় দ্বিগুণ ছওয়াব পাইবে।

নারীদের দ্বীন শিক্ষা দানে বিশেষ তৎপরতা

৮১। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে কোন ঈদের জামাতে আপনি উপস্থিত ছিলেন কি ? তিনি বলিলেন, হাঁ। অবশ্য হযরতের বিশেষ নৈকট্য লাভ আমার না থাকিলে আমার ভাগ্যে তাহা জুটিত না, কারণ তিনি বয়কনিষ্ঠ ছিলেন। এক ঈদের দিন আমি হযরতের সঙ্গেই বাহির হইলাম। যে স্থানে নিশান বা পতকা উড্ডীন ছিন—নবী (দঃ) ঐ স্থানে আসিলেন এবং নামায আদায় করিলেন, তারপর খোৎবা (তথা ইসলামী ভাষণ) প্রদান করিলেন। তাঁহার ধারণা হইল, পেছনে উপবিষ্টা মহিলাগণ হয়ত তাঁহার ভাষণ শুনিতে পায় নাই ; এই ভাবিয়া তিনি বেলাল (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া তাহাদের নিকট চলিয়া গেলেন এবং তাহাদিগকে নছীহত করিলেন ও আল্লার রাস্তায় খরচ করার আহ্বান জানাইলেন। নবী (দঃ) মহিলাদিগকে দানের প্রতি পুনঃ উৎসাহ দিলেন এবং বলিলেন, আমার মাতা-পিতা তোমাদের কল্যাণে উৎসর্গ। মহিলারা তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়া তাহাদের অলঙ্কারাদি খুলিয়া দিতে লাগিল, আর বেলাল (রাঃ) ঐগুলিকে সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

নারীদের শিক্ষার জন্ত ভিন্ন সময় নির্দ্ধারিত করা

৮২। হাদীছ :—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা মহিলাগণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিল, পুরুষদের জন্ত আমরা আপনার নিকটবর্তী হইতে পারি না। অতএব আপনি কেবলমাত্র আমাদের জন্ত একটি দিন নির্দ্ধারিত করিয়া দিন। সেমতে নবী (দঃ) বিশেষভাবে তাহাদের নিকট একদিনের ওয়াদা করিলেন। তিনি সেই দিন তাহাদের নিকট যাইয়া ওয়াজ নছীহত করিলেন এবং শরীয়তের নির্দেশাবলী শুনাইলেন। তাহাদিগকে তিনি যে সব নছীহত শুনাইলেন তন্মধ্যে ছিল—তোমাদের মধ্যে যে কেহ তিনটি শিশু সন্তানকে কেয়ামতের দিনের জন্ত পাঠাইয়া দিবে (অর্থাৎ শৈশবাবস্থায় সন্তানের মৃত্যু হইলে যে মাতা ছবর ও ধৈর্য্যধারণ করিবে) তাহার জন্ত ঐ শিশু সন্তানগুলি দোযখের অগ্নি হইতে ঢাল স্বরূপ রক্ষাকবচ হইয়া দাঁড়াইবে। একজন জ্রীলোক জিজ্ঞাসা করিল, দুইটি সন্তান হইলে? রসূলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন হাঁ—দুইটি সন্তান হইলেও ঐরূপ হইবে।*

* তিরমিযী শরীফে আছে—একদা রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন : যাহার দুইটি শিশু সন্তানের মৃত্যু হইবে আল্লাহ তাহাকে ঐ মহিষতে ধৈর্য্য ধারণের প্রতিদানে বেহেশতে দাখেল করিবেন। আয়েশা (রাঃ) প্রশ্ন করিলেন, একটি সন্তান মরিলে? হযরত (দঃ) বলিলেন, একটি সন্তান মরিলেও তজ্রুপই হইবে।

শ্রোতা কোন কথা না বুঝিলে পুনঃ জিজ্ঞাসা করিবে

৮৩। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) নবী ছালাম্মাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হইতে কোন বিষয় শুনিয়া অনুধাবন করিতে না পারিলে, পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে না পারা পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেন। একদিন নবী ছালাম্মাহু আলাইহে অসাল্লাম বয়ান করিলেন—(কেয়ামতে) যাহার হিসাব-নিকাশ লওয়া হইবে সে শাস্তি ভোগ করিবে। আয়েশা (রাঃ) প্রশ্ন করিলেন, আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিতেছেন—“যাহার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হইবে তাহার হিসাব অতি সহজ হইবে এবং সে অত্যন্ত সন্তুষ্টিতে হিসাবের ময়দান হইতে বেহেশতের দিকে চলিয়া আসিবে। (এই আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, হিসাব-নিকাশ হওয়া সত্ত্বেও একদল লোক বেহেশতে যাইবে, কোনও শাস্তি ভোগ করিবে না)। নবী (দঃ) বলিলেন, এই আয়াতে যে বিষয়কে হিসাব বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে তাহা প্রকৃতপক্ষে হিসাব নহে, বরং উহা শুধু জ্ঞাত করানোর জন্য কৃত আমল-নামা উপস্থিত করা মাত্র। (উহার উপর জিজ্ঞাসাবাদ বা কৈফিয়ত তলব হইবে না। সে জন্যই উহাকে “সহজ হিসাব” আখ্যায়িত করা হইয়াছে, কারণ উহা নামে মাত্র হিসাব। আসলে হিসাব লওয়া হইবে না।) কিন্তু (প্রকৃত প্রস্তাবে “হিসাবে লওয়া” বলা হয়) হিসাবদাতাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসাবাদ ও কৈফিয়ত তলব করা হইলে; (কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা যে ব্যক্তির সঙ্গে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন) সে পরিত্রাণ পাইবে না। (ধারণা আল্লাহ তায়ালা নিকট এরূপ পড়াকড়িভাবে হিসাব দিয়া কে বাঁচিতে পারে?)

আলেমের নিকট কোন এলুম লাভের সুযোগ পাইলে

অনুপস্থিতকে তাহা শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য

দ্বীনের শিক্ষা সম্প্রসারণে প্রত্যেকে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সক্রিয় হওয়ার কর্তব্য নির্দেশই এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য। এই পরিচ্ছেদের মূল বাক্য—**ليبلغ الشاهد الغائب**—“উপস্থিত অনুপস্থিতকে পৌঁছাইয়া দিবে”—স্বয়ং হযরত নবী (দঃ) বিদায়-হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ উপলক্ষ্যে বলিয়াছিলেন। উক্ত ভাষণের হাদীছখানা আবুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীছখানা দ্বিতীয় খণ্ডে বিদায়-হজ্জ পরিচ্ছেদে অনূদিত হইবে। এতদ্ব্যতিরিক্ত আবু বকর (রাঃ)ও বর্ণনা করিয়াছেন যাহার অনুবাদ ৩০নং হাদীছরূপে হইয়াছে। ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়ের ভাষণেও হযরত (দঃ) এই বাক্যটি বলিয়াছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডে ৯৩৭ নম্বরে উহা অনূদিত হইবে।

হযরত রুসুল্লাহ (দঃ) নামে মিথ্যা বলা মহাপাপ

৮৪। হাদীছ :—**سمعت عليا قال النبي صلى الله عليه وسلم**

لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مِنْ كَذَبِ عَلَىٰ فَالْيَسِيرِ النَّارَ

অর্থ—আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) ফরমাইয়াছেন, আমার নাম মিথ্যা বলিও না, যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলিবে সে নিশ্চয় দোষে যাইবে।

৮৫। হাদীছ — যোবায়ের রাভিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—
আব্বা ! আপনি রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামে হাদীছ বর্ণনা করেন
না কেন—যেমন অধুক অধুক ব্যক্তিগণ করিয়া থাকেন ? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি
সর্বদা নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাহচর্যে থাকিতাম বটে, কিন্তু (আমি সতর্কতা
স্বরূপ তাঁহার নামে হাদীছ কম বর্ণনা করিয়া থাকি। কারণ,) আমি শুনিয়াছি, হযরত (দঃ)
বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার নামে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলিবে তাহার ঠিকানা দোষে হইবে।

৮৬। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বলেন, আমি (সতর্কতা হেতু) বেশী হাদীছ বর্ণনা করা
হইতে বিরত থাকি। কারণ, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি
ইচ্ছাকৃত আমার নামে মিথ্যা বলিবে তাহার ঠিকানা দোষে হইবে।

৮৭। হাদীছ :—من سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال -

مَنْ يَقُولُ عَلَى مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيُتَبَرَأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ -

অর্থ—ছালামাহ ইবনে আকওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে
অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কথা বলিবে যাহা আমি বলি নাই
তাহার ঠিকানা দোষে হইবে।

৮৮। হাদীছ :—من أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم -

مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيُتَبَرَأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ -

অর্থ—আবু হোরাযরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম
বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যারূপে কোন কিছু আমার সম্পৃক্ত করিবে সে যেন
জানিয়া রাখে, নিশ্চয় তাহার ঠিকানা দোষে হইবে।

এসময়ের বিষয় লিপিবদ্ধরূপে সংরক্ষণ করা +

৮৯। হাদীছ :—আবু হোরাযরা (রাঃ) বলিতেন—ছাহাবীগণের মধ্যে কাহারও নিকট
আমার চাইতে বেশী হাদীছ থাকিতে পারে না, তবে হাঁ—আবুহুলাহ ইবনে আমরের

+ এই পরিচ্ছেদে একটি সন্দেহ দূর হয়। রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হাদীছ
লিপিবদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন—এরূপ প্রমাণ পওয়া যায়। এই পরিচ্ছেদের হাদীছসমূহ
দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঐ নিষেধাজ্ঞা সাময়িক এবং বিশেষ কারণবীন ও ব্যাপক আকারে লিপিবদ্ধ করার
প্রতি ছিল। বিস্তারিত আলোচনা ভূমিকায় বর্ণিত হইয়াছে।

নিকট হয়ত থাকিতে পারে। কারণ, তিনি লিখিয়া রাখিতেন; আমি তাহা করি নাই।

৯০। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ইহজগৎ ত্যাগকালীন অসুস্থতা যখন অধিক বাড়িয়া চলিল তখন তিনি বলিলেন—কাগজ কলম আন; আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু লিখিয়া দেই যদ্বারা তোমরা পথভ্রষ্টতা হইতে রক্ষা পাইবে। (হযরতের যাতনা লক্ষ্য করিয়া) ওমর (রা:) (ভাবিলেন, রসুলুল্লাহ (দ:) রোগ যন্ত্রণা এই সময়ে চরমে পৌঁছিয়াছে, এমতাবস্থায় তিনি উম্মতের মহব্বতেই এরূপ বলিতেছেন; তবে তাহার কষ্টের প্রতি লক্ষ্য করা আমাদের কর্তব্য। তাই তিনি) বলিলেন, আমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব বিদ্যমান রহিয়াছে। (অর্থাৎ পূর্ণ ব্যাখ্যা ও কর্ম-পদ্ধতির বিবরণ সহ যাহা স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দ:) দীর্ঘ তেইশ বৎসর কাল শিক্ষা দান করিয়াছেন এবং কার্যতঃ দেখাইয়া বাস্তবরূপ দান করিয়াছেন) সেই কোরআনই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এই ব্যাপারে ছাহাবীগণের মতানৈক্য দেখা দিল এবং কথা কাটাকাটি বাড়িয়া গেল। তখন নবী (দ:) সকলকে বলিলেন, তোমরা উঠিয়া যাও—আমার সম্মুখে বসিয়া বিবাদ করিও না। তোমাদের বিবাদের মীমাংসা অপেক্ষা উত্তম বিষয়ে তথা আল্লাহর সাক্ষাৎ-খ্যানে আমি মগ্ন আছি; আমাকে এই অবস্থায়ই থাকিতে দাও।

তারপর ইহজগৎ ত্যাগের পূর্বে নবী (দ:) তিনটি বিষয়ের বিশেষ আদেশ করিলেন—(১) মোশরেক-পৌত্তলিদিগকে আরব ভূখণ্ড হইতে বহিস্কার করিয়া দিও। (২) বহির্দেশ হইতে আগত প্রতিনিধি দলের অতিথিবৃন্দকে উপহার দিও যেরূপ আমি দিয়া থাকিতাম। তৃতীয়টি স্মরণ নাই।

ইবনে আব্বাস (রা:) এই ঘটনা বর্ণনা করিয়া বিশেষ অমৃত্যুতাপের সহিত বলিলেন—বড়ই দুর্ভাগ্যজনক বিষয় ছিল যদ্বন্ধন আমরা রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অন্তিমকালীন লিপি হইতে বঞ্চিত থাকিয়া গেলাম।

ব্যাখ্যা :—এই ঘটনার পরও রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ৩৪ দিন জীবিত ছিলেন, কিন্তু কিছু লিখিয়া দিবার অভিপ্রায় পরে আর প্রকাশ করেন নাই। ইহা হইতে বুঝা যায়, রসুলুল্লাহ (দ:) যাহা লিখিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন তাহা কোনও নূতন বা অত্যাবশ্যকীয় বিষয় ছিল না। নতুবা কোন বাধাই রসুলুল্লাহ (দ:)কে উহা হইতে বিরত রাখিতে পারিত না। ওমর (রা:) ঠিক এইরূপ ভাবিয়াই রসুলুল্লাহ (দ:) কষ্টের প্রতি লক্ষ্য করাকে অগ্রগণ্য মনে করিয়াছিলেন। এতদ্বিধা এই ঘটনার পর এই দিনই (আছাহুছ-ছিয়ার দৃষ্টব্য) অথবা শনি কিম্বা রবিবার জোহর নামাযান্তে হযরত (দ:) মাথায় পট্টি

✽ আমাদের নিকট যে সংখ্যার হাদীছ পৌঁছিয়াছে তাহাতে উক্ত সম্ভাবনাও বাস্তবায়িত নহে। আবু হোরায়রার (রা:) হাদীছ সংখ্যা ৫৩৬৪। পক্ষান্তরে আবুহুলাই ইবনে আমরের (রা:) হাদীছ সংখ্যা ৭০০।

বাধিয়া অতিকষ্টে স্বীয় মসজিদে বিশেষ ভাষণও দান করিয়াছিলেন যাহা হযরতের শেষ ভাষণ ছিল। ঐ ভাষণে হযরত (দ:) অনেক বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন; হযরত যাহা লিখিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন তাহা সেই ভাষণেই হযরত বলিয়া দিয়াছেন। ভাষণটির বিবরণ পঞ্চম খণ্ডে “শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের চার দিন পূর্বে” পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত আছে।

এতদ্বিধা মতানৈক্যের উক্ত ঘটনার পর নবী (দ:) তিনটি বিশেষ আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া এই হাদীছেই বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে; অতএব আরও কিছু তাহার বলিবার থাকিলে তাহা নিশ্চয় তিনি পরে বয়ান করিতেন।

মোসলেম শরীফে আছে—এই অসুস্থতার মধ্যেই একদিন রসূলুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লাম আয়েশা (রা:)কে আদেশ করিলেন, তোমার বাপ-ভাইকে ডাকিয়া আন; আমি (খেলাফতের বিষয়) লিখিয়া দিয়া যাই, যেন অস্ত্র কেহ আকাজক্ষা না করে। কিন্তু পরে হযরত নিজেই বিরত থাকিয়া বলিলেন, আল্লাহ এবং মোসলমানগণ আবু বকর ব্যতীত অস্ত্র কাহাকেও (খলীফারূপে) গ্রহণ করিবেন না।

এই পরিচ্ছেদে আলোচ্য বিষয়টির প্রমাণে আরও দুইটি হাদীছ উল্লেখ হইয়াছে। প্রথমটিতে আছে—রসূলুল্লাহ (দ:) আলী (রা:)কে শরীয়তের কয়েকটি মহআলাহ লিখিয়া দিয়াছিলেন। দ্বিতীয়টিতে আছে—আবু শাহ নামক ব্যক্তিকে হযরত (দ:) তাহার ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়ের ভাষণ লিখিয়া দিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডে ১৫৩ নম্বরে প্রথম হাদীছটি এবং তৃতীয় খণ্ডে মক্কা বিজয়ের ভাষণে দ্বিতীয়টি অনূদিত হইবে।

জ্ঞানের কণা বা নছীহত রাত্রিকালে শিক্ষা দেওয়া

৯১। হাদীছ :— উম্মুল-মোমেনীন উম্মে-ছালামা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রাত্রিবেলা নবী ছালামাহ আলাইহে অসাল্লাম নিজা হইতে হঠাৎ শিহরিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন ছোবহানাল্লাহ। এই রাত্রিকালে কত বিপদাপদ ও বিপর্যয়ের ঘনঘটা ছনিয়ায় উপর নামিয়া আসিতেছে এবং কত প্রকার রহমতের ভাণ্ডারও খুলিয়া দেওয়া হইতেছে। (অর্থাৎ—এমতাবস্থায় আশ্চর্য্যের ব্যবস্থা করা ও রহমত লুটিবার প্রতি অসম্মত হওয়া কত জরুরী। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য ও আক্ষেপের বিষয় যে, মানুষ নির্বোধ বেথেয়ালের স্তায় এই সমস্ত চিন্তা একেবারে উপেক্ষা করিয়া সারা রাত্রি নিদ্রায় কাটাইতেছে।) ঘরে যাহারা শুইয়া আছে তাহাদিগকে (তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য) জাগাইয়া দাও। (অর্থাৎ—তোমরা সকলে এই সময় আল্লাহর প্রতি ধাবিত হইয়া এই সব বিপর্যয় হইতে রক্ষা পাইবার ও আল্লাহর রহমত লুটিয়া আনিবার প্রতি সচেষ্ট হও।) বহু লোক এই ছনিয়াতে সাজ-শয্যা ও বেশ-ভূষায় আবৃত আছে, কিন্তু (তাহাদের নিকট নেক আমল ন. থাকায়) আখেরাতে তাহারা উলঙ্গ (অর্থাৎ একেবারে নিঃস্বল) অবস্থায় উঠিবে।

ব্যাখ্যা :— হুনিয়ার স্বাভাবিক রীতি-নীতিতে দেখা যায়, রাত্রিকালে আগামী দিনের সমুদয় কার্যাবলীর প্রোগ্রাম তৈরী করা হয় এবং দিনের বেলা ঐ প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ-কর্মের ব্যস্ততায় কাটে। সৃষ্টির স্বভাবও তদ্রূপই; সেই জন্তই বোধ হয় শরীয়তে প্রত্যেক রাত্রিকে উহার পরের দিনের সহিত গণনা করা হয়। আগামী দিনে হুনিয়ার বৃকে যত প্রকার বিপর্যয় বা উন্নতি, আপদ-বিপদ বা সুখ-শান্তির ঘটনা ঘটবে সৃষ্টি জগতের ব্যবস্থাকারী ফেরেশতাগণ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালায় নির্দেশ অনুযায়ী উহার প্রোগ্রাম রাত্রিকালেই তৈয়ার করেন।

স্বাভাবিক কার্যপদ্ধতিতে পরিলক্ষিত হয়, যখন যে উপলক্ষ্য দেখা যায় ঠিক তখনই সে উপলক্ষ্যের কাজ কর্মের উপযুক্ত সময় বলিয়া গণ্য করা হয়। সুতরাং রাত্রিকালে যখন আগামী দিনের ভাল-মন্দের প্রোগ্রাম তৈয়ার হইতে থাকে, তখন নিম্নায় বিভোর না থাকিয়া আগামী জীবনের আশ্বর্য্যকামূলক ব্যবস্থা ও উন্নতি লাভের চিন্তা-সাধনায় মগ্ন হওয়া উচিত।

আজ পর্য্যন্ত হুনিয়ায় যত সাধক, আওলিয়া দরবেশ আধ্যাত্মিক দৌলত লাভ করিয়া গিয়াছেন, প্রত্যেকেই এই রাত্রিকালের সাধনা ও আরাধনার দ্বারাই সবকিছু সন্ধান পাইয়াছেন।* মুসলমানদের সোনালী যুগে কমতা বা ধন-সম্পদের অধিকারীগণও উন্নতির জন্ত রাত্রিকালের ঐ মধুর সময় স্বীয় পালনকর্তার প্রতি একাগ্রচিত্তে মগ্নতা অবলম্বন পূর্বক সাধনা করিতেন। আল্লাহ তায়ালাও পবিত্র কোরশানে খাটী মোমেনদের স্বভাব বর্ণনায় বলেন—

تَسْتَجِأْنِي جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا.

“মধুর নিদ্ৰা ভঙ্গ করিয়া আরাম-আয়েশের বিছানা ত্যাগ পূর্বক তাহার ভয়ের আতঙ্ক ও আশার আলো লইয়া পালনকর্তাকে ডাকিতে থাকে।” (২১ পাঃ ১৫ কঃ)

খোলাফায়ে-রাশেদীনের যুগ পর্য্যন্ত ধারাবাহিকভাবে এবং তাঁদের পরেও অনেক ধন-সম্পদের অধিকারী, কমতা ও পদের অধিকারী, কতৃৎ ও নেতৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিগণ এই নীতি অবলম্বনেই উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।

* গওছে-আজম শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)কে “সাজ্জার” নামক দেশের বাদশাহ এই মর্মে এক অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে—আমি আমার রাজ্যের “নিমরুজ্জ” নামক বিরাট এলাকাকে আপনার খেদমতে হাদিয়া স্বরূপ আপনার খানকার জন্ত ওয়াকফ্ করিয়া দিতে চাই। গওছে আজম (রঃ) উহা গ্রহণ করিলেন না, বরং উহার প্রতি উপেক্ষা ও তাজ্জিয়াপূর্ণ উত্তরে ইহাও লিখিলেন যে—

زَاذَكَ يَا فِتْمَ خَيْرًا زَ مَلِكِ نَيْمِ شَبْ—مِنْ مَلِكِ نَيْمِ رَوْزَرَا بَيْكِ جُونَمِي خَرَمِ

“যখন হইতে আমি গভীর রাত্রির মধুর রাজত্বের খোঁজ পাইয়াছি, তখন হইতে আপনার নিমরুজ্জের স্থায় রাজত্বকে একদান। যবের মূল্যও দান করি না।”

শয়তান অতিশয় চতুর ও দূরদর্শী; আল্লাহ ও আল্লার রসূল (দ:) যে পথ দেখাইয়া মানবকে উন্নতির দিকে নিয়া যাইতে চান, শয়তান ঠিক সেই পথটির মুখেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করিয়া থাকে। আর আমরাও শয়তানের সেই বেড়াঙ্কালসমূহকে ছিন্ন করতঃ ঐ রাস্তায় অগ্রসর না হইয়া নিবোধের মত ধ্বংসের পথেই পরিচালিত হইয়া থাকি। আজ আমরা সামান্য ধন-সম্পদ লাভ করিলেই বা কোন প্রকার ক্ষমতা ও পদের অধিকারী হইলেই উন্নতির উৎস ঐ রাত্রিকালের সময়কে ক্লাবে ও বৈশালায়ে মত্তপান গান-বাজনা ও রং-তামাসা ইত্যাদিতে কাটাইয়া থাকি; এই অবস্থায় আমাদের প্রতি আল্লার গজব নামিয়া আসিবে না কেন? কালক্রমে মুসলিম জাতির অধঃপতন এই পথেই ঘটিয়াছে।

রাত্রিবেলায় এলুম চর্চা করা

৯২। হাদীছ :— ইবনে ওমর (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শেষ জীবনে একদা এশার নামাযান্তে আমাদের প্রতি দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, তোমরা কি লক্ষ্য করিয়াছ? এই রাত্রে ছুনিয়ার বৃকে যত মানুষ আছে (এমনকি এইমাত্র যে জন্মগ্রহণ করিল) আজ হইতে একশত বৎসরের মাধায় উহাদের একটি প্রাণীও জীবিত থাকিবে না।

ব্যাখ্যা :—মাসুকের জন্ত এই ছুনিয়া যে কত ক্ষণস্থায়ী তাহা হৃদয়ঙ্গম করাইতে রসূলুল্লাহ (দ:) এই সরল ও বাস্তব সত্যটির প্রতি ছাহাবীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। অতঃপর এক হাদীছে রসূলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের বয়স “ষাট হইতে সত্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ।” সাধারণ বয়সের মাত্রা ইহাই, উর্কে উঠিলে একশতের মধ্যে; ইহার চাইতে অধিক অতিশয় নগ্ন।

এলুম কঠিন করার তৎপরতা

৯৩। হাদীছ :—আবু হোরায়ারা (রা:) বলেন, সকলেই বলে—আবু হোরায়ারা হাদীছ অনেক বেশী বর্ণনা করে। মোহাজের ও আনহার ছাহাবীগণ রসূলুল্লাহ (দ:) হইতে ঐ পরিমাণ হাদীছ বর্ণনা করেন না যে পরিমাণ আবু হোরায়ারা বর্ণনা করে।

আবু হোরায়ারা (রা:) বলেন, আল্লার নিকট সকলকে উপস্থিত হইতে হইবে; কোরআন শরীফের দুইটি আয়াতের প্রতি লক্ষ্য না করিলে আমি একটি হাদীছও বর্ণনা করিতাম না। তারপর তিনি **ان الذين يكتُمون ما اُنزلنا** আয়াতদ্বয় + তেলাওয়াত

† এক হাদীছে এশার পর রাত্রি জাগরণ নিষেধ করা হইয়াছে, কেননা ইহাতে কজরের নামায কাছা হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু এখানে ইমাম বোখারী (র:) বুঝাইয়াছেন যে, এলুম চর্চায় এশার পরেও রাত্রি জাগরণ দৃশ্যীয় নহে। এলুম চর্চাকারীগণ কজর নামাযের লক্ষ্য নিশ্চয় রাখিবে।

+ আয়াতদ্বয়ের অর্থ :—মানব জাতির জন্ত আমার প্রেরিত হেদায়েতের সরল ও সুস্পষ্ট আয়াতসমূহকে যাহারা লুকাইয়া রাখিবে, তাহাদের প্রতি আল্লার এবং সকলের লা'নত ও অভিশাপ। অবশ্য যাহারা ঐ স্বভাব হইতে তওবা করিয়া সংশোধিত হইবে এবং ঐ সব প্রকাশ করিয়া দিবে, আল্লাহ তাহাদের তওবা কবুল করিবেন। (১ পারা ২ রুকু)

করিলেন। তিনি আরও বলিলেন, আমাদের মোহাজের ভাইগণ বাজারে বেচা-কেনায় লিপ্ত থাকিতেন, আনছার ভাইগণ কৃষিকর্ম ও গৃহস্থালী কাজে ব্যস্ত থাকিতেন। আর আমি (আবু হোরাযরা) রসুলুল্লাহ ছালাম্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে সর্বদা লাগিয়া থাকিতাম। অন্তেরা যখন অনুপস্থিত তখনও আমি উপস্থিত এবং অন্ত কেহ যাহা না রাখিত আমি উহা (বিশেষ যত্নের সহিত করিয়া) স্মরণ রাখিতাম।

৯৪। হাদীছ :— আবু হোরাযরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি একদা আরজ করিলাম—ইয়া রসুলুল্লাহ। আমি আপনার অনেক হাদীছ শুনি, কিন্তু স্মরণ রাখিতে পারি না। রসুলুল্লাহ ছালাম্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন—তোমার চাদর বিছাও। আমি চাদরখানা বিছাইলাম, তিনি উহার উপর হাতের অঙ্গুলি ভরিয়া কিছু দান (করার আয় হস্ত চালনা) করিলেন এবং ঐ চাদরখানা আমার সীনার সঙ্গে মিলাইতে আদেশ করিলেন ; আমি তাহাই করিলাম। এই ঘটনার পর আর আমি হযরতের কোন কথা ভুলি নাই।

আরও একটি ঘটনা আবু হোরাযরা (রাঃ) বলিয়াছেন। একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার বিশেষ একটি বক্তব্য প্রকাশ উপলক্ষ্যে বলিলেন, আমার বক্তব্য শেষ করা পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি স্বীয় কাপড় বিছাইয়া রাখিবে, তারপর নিজ বক্ষে সেই কাপড়টি আলিঙ্গন করিবে সে আমার বক্তব্য কণ্ঠস্থ রাখিতে পারিবে। তৎক্ষণাৎ আমি গায়ের কম্বলটা বিছাইয়া রাখিলাম ; বক্তব্য শেষে কম্বলটি বক্ষে আলিঙ্গন করিলাম ; সত্য সত্যই হযরতের বক্তব্যের কিঞ্চিৎও আর আমি ভুলি নাই। (২৭৪ পৃঃ)

প্রথম ঘটনাটি ত স্পষ্টতই ব্যাপকরূপে হাদীছ স্মরণ রাখার ব্যবস্থা ছিল। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঐরূপই ছিল, কিন্তু শুধু ঐ বিশেষ বক্তব্যটি স্মরণ রাখার দৃষ্ট ছিল।)

৯৫। হাদীছ :—আবু হোরাযরা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছালাম্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে এল্‌মের দুইটি থলিয়া কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম। একটি থলিয়া (দ্বীনের হুকুম-আহকাম সম্বন্ধীয়,) বিতরণ করিয়াছি। দ্বিতীয় থলিয়াটি (এমন এল্‌ম যাহা প্রচার করিতে রসুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করেন নাই ; প্রকাশ করিলে সাধারণের বিশেষ কোন ফলও হইবে না, বরং উহা) প্রকাশ করিলে (এক শ্রেণীর লোকের স্বরূপ প্রকাশ পাওয়ায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইবে ; ফল কিছু হইবে না, বরং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইয়া) আমার গলা কাটা যাইবে।

ব্যাখ্যা :— দ্বিতীয় থলিয়ায় কি প্রকারের এল্‌ম ছিল তাহার দৃষ্ট কাহারও মাথা ঘামাইতে হইবে না। স্বয়ং ছাহাবী আবু হোরাযরার নানাপ্রকার ইঙ্গিতেই উহা প্রকাশ পায়। রসুলুল্লাহ, ছাহাবী, খোলাফা বা শাসনকর্তাদের পর হইতে যে সমস্ত বিপথগামী ও অত্যাচারী শাসকদের আবির্ভাব হইবে, রসুলুল্লাহ ছালাম্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সে সকলের নাম, ঠিকানা ও সময়ের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। ঐ সকল নাম-ঠিকানা আবু হোরাযরার

কষ্ট হইল। ছাহাবী শাসনকর্তাদের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরে ঐ সমস্ত বিপৎগামী শাসকদের সময় নিকটবর্তী হইলে পর আবু হোরাযরার মনে সব কিছু জাগিয়া উঠে। কিন্তু ইহা প্রকাশে ফল হইবে না, বরং শাস্তি ও শৃঙ্খলা বিপন্ন হইবে, তাই তিনি ঐ সবেবর্ণনা হইতে বিরত থাকেন।

আলেমগণের বক্তব্য চূপ করিয়া শুনা উচিত

১৬। হাদীছ :- জরীর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিদায়-হজ্জের সময় তাঁহাকে আদেশ করিলেন, সকলকে চূপ থাকিতে বল। তারপর হযরত (দঃ) ফরমাইলেন হে মোসলমানগণ! আমার (ছনিয়া ত্যাগের) পরে তোমরা কাফেরদের কার্যকলাপে লিপ্ত হইও না যে, তোমরা একে অপরকে হত্যা করিতে আরম্ভ কর।

কোন আলেমকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়—কে বেশী এলুম
রাখে? তবে কি উত্তর দিবেন?

১৭। হাদীছ :- ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, উমাই ইবনে কাযাব (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন—এক দিন মুসা (আঃ) বনী-ইস্রাঈলদের মধ্যে ওয়াজ করিতে দাঁড়াইলেন। (তাঁহার ওয়াজে মুগ্ধ হইয়া) এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি অপেক্ষা বড় আলেম আর কেহ আছেন কি? এবং সর্বাপেক্ষা বড় আলেম কে? মুছা (আঃ) বলিলেন, সবচেয়ে বড় আলেম আমি নিজেকেই মনে করি। (প্রশ্নের উত্তর ঠিকই ছিল, কারণ মুছা (আঃ) নবী ছিলেন এবং স্বীনের এলুম নবীর সমান কাহারও হয় না। কিন্তু সরাসরি নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করা আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করিলেন না। ঐ প্রশ্নের উত্তর সর্বজ্ঞ আল্লাহ প্রতি হাওয়ালা ও স্তম্ভ করতঃ **أنا أعلم**। অর্থাৎ এ বিষয়ে আল্লাহই বেশী এবং ভাল জানেন; এরূপ উত্তর দেওয়া উচিত ছিল। যেহেতু মুছা (আঃ) তাহা করেন নাই, তাই আল্লাহ তায়ালা মুছা (আঃ) এর প্রতি অহী পাঠাইলেন, হে মুছা! আমার একজন বিশিষ্ট বান্দা আছে; ছই সমুদ্রের মিলনস্থানে তাঁহার দেখা পাইবে। তিনি তোমার চাইতে অধিক এলুম রাখেন। মুছা (আঃ) আল্লাহ দরবারে আরজ করিলেন, ইয়া আল্লাহ! কি করিয়া আমি তাঁহার সাক্ষাৎ পাইতে পারি? আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, (তাঁহার তালাশে বাহির হও,) সঙ্গে থলিয়ার মধ্যে একটি ভাজা মংস্ত লইয়া লও। যে স্থানে যাইয়া ঐ মংস্তটি জীবিত হইবে এবং তোমার নিকট হইতে নিখোজ হইয়া যাইবে ঠিক উহারই আশে-পাশে আমার ঐ বান্দাকে পাইবে। মুছা (আঃ) তাঁহার খাদেম “ইউশা”কে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন এবং সঙ্গে করিয়া থলিতে একটি ভাজা মংস্ত লইলেন। মুছা (আঃ) খাদেমকে বলিয়া দিলেন, মংস্তটি নিখোজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে সংবাদ দেওয়া তোমার বড় কাজ। খাদেম বলিল, আপনি আমাকে বেশী কাজের চাপ প্রয়োগ করেন নাই।

অতঃপর তাঁহারা দুই জনেই সমুদ্রের কিনারায় কিনারায় চলিতে চলিতে এমন এক-স্থানে পৌঁছিলেন যথায় একটি বিরাট পাথর ছিল। তথায় পৌঁছিয়া তাঁহারা উভয়েই পাথরের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িলেন। (মুছা (আঃ) নিদ্রিতই ছিলেন, ইত্যবসরে ইউশা জাগিয়া দেখিতে পাইলেন,) মৎস্য জীবিত হইয়া থলি হইতে সমুদ্র বক্ষে লাফাইয়া পড়িল। আল্লার কুদরত—এই মৎস্য সমুদ্রের পানিতে যতদূর চলিল পানির মধ্যে একটি ছিদ্র রহিয়া গেল। খাদেম ভাবিলেন, মুছার (আঃ) নিদ্রা ভঙ্গ করিব না। (তিনি জাগ্রত হইলেই তাঁহাকে জ্ঞাত করিব। খোদার শান—এমন একটি আশ্চর্য ব্যাপার; কিন্তু মুছা (আঃ) জাগ্রত হইলে পর তাঁহার নিকট উহা বলিতে ইউশা ভুলিয়া গেলেন।) আবার তাঁহারা চলিতে আরম্ভ করিলেন, দিবারাত্রি চলিয়া যখন ভোর হইল তখন মুছা (আঃ) খাদেমকে বলিলেন, এবার চলিতে চলিতে খুব ক্লান্তি বোধ করিতেছি, নাশ্তা আন। মুছা (আঃ) মৎস্যের ঐ ঘটনার পূর্বে কোনরূপ ক্লান্তি বোধ করেন নাই। যেহেতু মৎস্যের ঘটনার স্থানটি তাঁহার নির্দেশিত গন্তব্যস্থল ছিল, উহা অতিক্রম করার পরই তাঁহার ক্লান্তি বোধ হইতে লাগিল। খাদেম বলিল—হায়! আপনি ত জানেন না—আমরা যখন পাথরের নিকট শুইয়া ছিলাম তখন মৎস্যের এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটয়াছিল, কিন্তু আমি তাহা আপনার নিকট বর্ণনা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম; শয়তানই তাহা উল্লেখ করা হইতে আমাকে ভুলাইয়াছে। মৎস্যের পূর্ণ ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। মৎস্যের চলন-পথে পানির মধ্যে ছিদ্র সৃষ্টি হইয়াছে—ইহাতে তাঁহারা উভয়েই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মুছা (আঃ) বলিলেন, উহাই ত সেইস্থান, যে স্থানের খোঁজে আমরা বাহির হইয়াছি। তৎক্ষণাৎ তাঁহারা পুনরায় চলিত পথে ফিরিলেন এবং সেই পাথরের বরাবর আসিয়া দেখিলেন, গভীর সমুদ্রে পানির উপর সবুজ রং মখমলের বিছানায় আল্লার একবন্দা আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া আছেন।* তিনি ছিলেন খাযের (আঃ) (সাধারণতঃ যাহাকে খিযির বলা হয়)। মুছা (আঃ) তাঁহাকে সালাম করিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, (মোদলমান বিহীন) এই দেশে সালাম কিরূপে? মুছা (আঃ) বলিলেন, (আমি এদেশীয় নই) আমি মুছা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, বনী-ইসরায়েলের নবী মুছা? মুছা (আঃ) বলিলেন—হাঁ। তারপর মুছা (আঃ) বলিলেন, আমি কি আপনার সঙ্গে থাকিতে পারি এই উদ্দেশ্যে যে, আপনি আপনার আল্লাহ-প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান হইতে আমাকে কিছু শিক্ষা দিবেন? তিনি বলিলেন, আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরিতে পারিবেন না। কারণ, আল্লাহ আমাকে এক প্রকার এল্ম দান করিয়াছেন যাহার রহস্য

* আলোচ্য হাদীছখানা বোখারী শরীফে ১২ জায়গায় বর্ণিত হইয়াছে। ৬৮৯ পৃষ্ঠার রেওয়াজেতে এই তথ্য স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। উক্ত রেওয়াজেতে হইতে আরও তথ্য অনুবাদে শামিল করা হইয়াছে।

আপনি অবগত নহেন এবং আপনাকে আল্লাহ অথ প্রকার এল্‌ম দান করিয়াছেন যাহা আমি আপনার মত জানি না।

মুছা (আ:) বলিলেন, আমি আপনার সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করিয়াই থাকিব, আপনার কোন আদেশের ব্যতিক্রম করিব না। তখন খিযির (আ:) মুছা (আ:)কে বলিয়া দিলেন, আপনি আমার নিকট কোনও বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন না, যে পর্য্যন্ত না আমি নিজে উহা ব্যক্ত করি। এই বলিয়া তাঁহারা সমুদ্রের কিনারা ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। পার হওয়ার জ্ঞাত নৌকার সন্ধান পাইতেছিলেন না, এমন সময় একটি নৌকা তাঁহাদের নিকটবর্তী হইয়া যাঠতেছিল, তাঁহারা নৌকা চালকের সঙ্গে আলাপ করিলেন। নৌকা-চালক খিযির (আ:)কে চিনিতে পারিয়া বিনা পয়সায় নৌকায় উঠাইয়া লইল। নৌকা চলাকালীন একটি চড়ুই পাখী নৌকার বাতায় বসিয়া সমুদ্রের মধ্যে একবার কি দুইবার ঠোঁট মারিল। খিযির (আ:) বলিলেন, হে মুছা! এই চড়ুই পাখীটার ঠোঁটে লাগিয়া সমুদ্রের যতটুকু অংশ আসিয়াছে আমার ও আপনার সমস্ত এল্‌ম আল্লাহ তায়ালার এল্‌মের তুলনায় ততটুকু অংশও হইবে না। তারপর খিযির (আ:) নৌকার একখানা

ঐ খিযির (আ:)—এর নিকট যে বিষয়ের এল্‌ম ছিল, উহা ছিল সৃষ্টি-ব্রহ্মের এল্‌ম। উহা দ্বারা আধ্যাত্মিক তথা আখেরাতের কোনও উন্নতি ত হয়ই না, হুনিয়াতেও মানব কল্যাণ সম্পর্কীয় কোন উন্নতি, যথা—চরিত্র গঠন, নৈতিক চরিত্র সংশোধন বা হুনিয়াতে শান্তিরক্ষা ইত্যাদি ব্যবস্থা পরিচালনার কোন উন্নতি সাধিত হয় না। তাই উহার গুরুত্ব কম এবং উহার সঙ্গে নবীগণের বিশেষ সম্পর্কের কোন আবশ্যকও হয় না। হযরত মুছার (আ:) নিকট ছিল শরীয়ত তথা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ এবং আল্লাহকে রাজী ও সন্তুষ্ট করার এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি, চরিত্র গঠন ও সংশোধন ইত্যাদির এল্‌ম—যাহার উপর মানবের সর্বাধিক কল্যাণ ও নাজাত নির্ভর করে; উহার গুরুত্ব অনেক বেশী। তাই আল্লাহ তায়ালা এই এল্‌ম প্রচারের জ্ঞাত বিশেষরূপে নবী ও রসূল প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই এল্‌ম হুনিয়াতে নবী ও রসূলের নিকট অনেক বেশী থাকে এবং সেই হিসাবেই মূল ঘটনার প্রশ্নের উত্তরে মুছা (আ:) বলিয়াছেন, সব চাইতে বড় আলেম আমি নিজেই মনে করি; আমার চাইতে বেশী এল্‌মওয়াল কেহ নাই। যেহেতু উত্তরটা আল্লাহ তায়ালার পছন্দ হয় নাই, তাই আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, আমার এক বন্দা আছে যাহার নিকট তোমার চাইতে বেশী এল্‌ম রহিয়াছে। যদিও উহা বিশেষ এক বিভাগের; যে বিভাগ হযরত মুছার সম্পর্কীয় নহে এবং হযরত মুছার সম্পর্কীয় বিভাগ অপেক্ষা নিম্ন স্তরের। হযরত মুছার উল্লিখিত উত্তরে কোন বিভাগের উল্লেখ ছিল না, বরং উত্তরটা সামগ্রিক ও ব্যাপক আকারের ছিল, সুতরাং যে কোন বিভাগের এল্‌ম দ্বারা উহার খণ্ডন যুক্তিযুক্ত। অবশ্য হযরত মুছার উদ্দেশ্য ব্যাপক আকারের ছিল না, কিন্তু উত্তরের বাহ্যিক আকার ও রূপটাই আপত্তিকর ছিল। এতটুকু বিদ্যাতি সাধারণতঃ আপত্তিজনক না হইলেও নবীর পক্ষে উহাকে আল্লাহ তায়ালা নাপছন্দ করিয়াছেন।

তথ্য খুলিয়া ফেলিলেন। (ভাঙ্গার পর অবশ্য পুনরায় গড়াইয়া দিলেন, কিন্তু তখন) মুছা (আঃ) বলিলেন, ইহারা আমাদিগকে বিনা পয়সায় নোকার উঠাইয়াছিল, আর আপনি তাহাদের নোকা ভাঙ্গিয়া নোকারোহী সকলকে ডুবাঁইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহা ভাল করেন নাই। খিযির (আঃ) বলিলেন, আমি আগেই বলিয়াছিলাম, আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করিতে পারিবেন না। মুছা (আঃ) বলিলেন, আমার ভুল হইয়া গিয়াছে; আশা করি এই জন্ত আপনি আমার প্রতি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে না এবং আমার উপর কঠোরতা আরোপ করিবেন না। মুছা (আঃ) এইবার প্রকৃত পক্ষেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আবার তাহারা চলিতে লাগিলেন। এক স্থানে যাইয়া দেখেন, একটি ছেলে অস্থান ছেলেদের সঙ্গে খেলা-খুলা করিতেছে। খিযির (আঃ) সেই ছেলেটির মাথায় খুলি উঠাইয়া মারিয়া ফেলিলেন। মুছা (আঃ) বলিলেন, আপনি একটি নির্দোষ ছেলেকে মারিয়া ফেলিলেন? অথচ সে কাহাকেও মারে নাই। আপনি বড়ই অবাঞ্ছিত কাজ করিয়াছেন। খিযির (আঃ) বলিলেন, আমি আপনাকে ত পূর্বেই বলিয়াছিলাম, আপনি ধৈর্য্যাহারা হইবেন; এইবার একটু শক্তভাবেই বলিলেন। মুছা (আঃ) বলিলেন, তৃতীয়বার কিছু জিজ্ঞাসা করিলে আমাকে আর আপনার সঙ্গে রাখিবেন না, তখন আমারও আর কোন ওজর-আপত্তি থাকিবে না। এই বলিয়া চলিতে চলিতে তাহারা এক গ্রামে পৌঁছিলেন এবং গ্রামবাসীগণকে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্ত অনুরোধ করিলেন, কিন্তু গ্রামবাসী রাজী হইল না। তাহারা ঐ গ্রামে দেখিতে পাইলেন, একটি দেওয়াল ধ্বসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। খিযির (আঃ) ঐ দেওয়ালটিকে হাতে ধরিয়া সিধা করিবার শ্রায় ইশারা করিলেন—আল্লাহ কুদরতে সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালটি সিধা হইয়া গেল। এইবার মুছা (আঃ) বলিয়া উঠিলেন, গ্রামবাসীরা আমাদের মেহমানদারী করিল না; সুতরাং আপনি ইচ্ছা করিলে এই কার্খার জন্ত তাহাদের হইতে পারিশ্রমিক আদায় করিতে পারিতেন। তখন খিযির (আঃ) পরিত্রা বলিয়া বলিলেন—এইবার আপনার ও আমার সঙ্গ ভঙ্গ হইল। এই পর্য্যন্ত যাহা কিছু ঘটয়াছে এবং যাহা দেখিয়া আপনি ধৈর্য্যাহারা হইয়াছেন প্রত্যেকটির রহস্য উদ্ঘাটন করিতেছি; শুনুন!

ঐ নোকার ব্যাপার হইল এই যে, ঐ দেশে এক স্বৈরাচারী জালাম বাদশাহ আছে সে কোনও ভাল এবং নিখুঁত নোকা দেখিলেই ছিনাইয়া লয়। উক্ত নোকার মালিকগণ অত্যন্ত গরীব, তাই আমি ঐ নোকাটিকে খুতযুক্ত দোষী করিয়া উহা রক্ষা করার ব্যবস্থা করিয়াছি। তারপর ছেলে হত্যার রহস্য হইতেছে এই যে, ছেলেটি অনিবার্যরূপে কাকের হইতে চলিতেছিল, অথচ তাহার মাতা-পিতা মোমেন। আমার আশঙ্কা হইল যে, এই ছেলের মমতার বন্ধন হয়ত মাতা-পিতাকেও কুফরীর মধ্যে জড়িত করিয়া ফেলিবে। তাই আমার ইচ্ছা হইল—আল্লাহ তায়ালা এই ছেলের পরিবর্তে তাহাদিগকে স্নেহের যোগ্য কোনও সুসন্তান দান করেন। আর দেওয়ালের ঘটনার রহস্য এই যে, দেওয়ালটির

মালিক দুইটি এতিম ছেলে; তাহাদের পিতা অতি নেককার ছিলেন। তিনি ঐ শিশু দুইটির জন্য কিছু ধন-দৌলত ঐ দেওয়ালের নীচে পুতিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হইল, এই সমস্তের হেফাজত করা, যেন এই এতিমদ্বয় বড় হইয়া তাহাদের ঐ প্রোথিত ধন বাহির করিতে পারে। এই সমস্ত আল্লাহ তায়ালারই ইঙ্গিত ছিল; আমার ইচ্ছায় কিছুই করি নাই। ইহাই হইল উক্ত ঘটনাগুলির রহস্য, যাহার জন্য আপনি ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারেন নাই।

পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করিয়া নবী ছালাম্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ মুছাকে রহম করুন! তিনি ধৈর্য্য ধারণ করিলে ভাল হইত; তাহাদের আরও বহু ঘটনা আমরা শুনিতে পারিতাম।

ব্যাখ্যা :—এই হাদীছের শিক্ষা এই যে, কোন আলেমকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়—“অধিক এল্ম কে রাখেন”? তবে বলিবে, “আল্লাহই তাহা ভাল জানেন।” আরও শিক্ষা এই যে, এল্ম হাসিল করার জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়া বিদেশ সফরে বাহির হইতেও কুণ্ঠিত হইবে না। যেমন মুছা (রাঃ) করিয়াছিলেন, এমনকি সঙ্কটপূর্ণ সামুদ্রিক ভ্রমণ পর্য্যন্ত সাগ্রহে কবুল করিয়াছিলেন।

আলোচ্য ঘটনায় উল্লেখিত দুই সমুদ্রের মিলনস্থলটি হইল লোহিং সাগর যে, সিনাই উপত্যকার দুই পার্শ্ব দিয়া দুইটি উপসাগর শাখায় বিভক্ত হইয়াছে—মুয়েজ উপসাগর এবং আকবা উপসাগর; উক্ত উপসাগরদ্বয়েরই মিলনস্থল যাহা লোহিত সাগরের অংশবিশেষ দুই সমুদ্রের মিলনস্থলের উদ্দেশ্য ঐ উপসাগরদ্বয়ের মিলনস্থল। এই ঘটনা তথ্যই ঘটয়াছে।

বসি আলেমকে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করা

৯৮। হাদীছ :—আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী ছালাম্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাযির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আল্লাহ রাস্তায় জেহাদ কি প্রকারে হয়? আমাদের কেহ যুদ্ধ করে রাগের বশীভূত হইয়া, কেহ বা জেদের বশীভূত হইয়া। ঐ ব্যক্তি দাঁড়ানো ছিল, আর রসূলুল্লাহ (সঃ) বসিয়াছিলেন, তাই তিনি তাহার প্রতি মাথা উঠাইয়া তাকাইলেন এবং বলিলেন, আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ ও উন্নত করার জন্য যুদ্ধ করা—একমাত্র উহাই আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ গণ্য হইবে।

মুছাআলাহ :—যদি কেহ কোন এসন এবাদতে রত থাকে যে, তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হইলে সে ঐ এবাদতে বাধাপ্রাপ্ত হইবে না, এইরূপ স্থলে এবাদতরত ব্যক্তিকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করা যায়। (২৩ পৃষ্ঠায় ৭২ হাদীছ)

মানুষকে এল্ম অতি সামান্যই দেওয়া হইয়াছে

৯৯। হাদীছ :—আবুহুলাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নবী ছালাম্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে মদীনার এক জনশূন্য স্থানে চলিতেছিলাম; হযরতের

হাতে লাঠি স্বরূপ একখানা খেজুরের ডালা ছিল। এমতাবস্থায় তিনি একদল ইহুদীর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন; তখন তাহারা একে অন্তর্কে বলিতে লাগিল, রুহ বা আত্মা কি বস্তু সে বিষয় তাহাকে প্রশ্ন কর। এক ব্যক্তি বলিল, তাহাকে কোন প্রশ্ন করিও না; হয়ত তিনি ঐ উত্তরই দিয়া দিবেন যাহা তোমরা পছন্দ কর না। (অর্থাৎ এমন উত্তর দিতে পারেন যদ্বারা তিনি সত্য নবী বলিয়া প্রমাণিত হইবেন, অথচ ইহা তোমরা পছন্দ কর না।) অতঃপর এক ব্যক্তি বলিল, প্রশ্ন করিবই। এই বলিয়া এক ব্যক্তি সম্মুখে দাঁড়াইল এবং বলিল, হে আবুল কাসেম (দ:)! রুহ কি বস্তু? নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম চুপ থাকিলেন। আমি ভাবিলাম, এখন অহী আসিবে, এই ভাবিয়া আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। বস্তুতঃ তখন অহী নাযেল হইল। অহী নাযেল হওয়ার পর হযরত (দ:) এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا.

অর্থ:—তাহারা আপনাকে রুহের বিষয় প্রশ্ন করে। আপনি বলিয়া দিন—রুহ (কোন উপকরণ-উপাদান ব্যতিরেকে শুধু) আল্লাহর হুকুমে সৃষ্ট একটি বিশেষ বস্তু; (বিষয় ব্যাখ্যা তোমরা অনুধাবন করিতে পারিবে না, কারণ) মানবকে এলুম বা জ্ঞান অতি সামান্যই দেওয়া হইয়াছে। (যদ্বারা উহার রহস্য উপলব্ধি করা সম্ভব নহে)।

কোন মোস্তাহাব কার্যে ভুল ধারণা সৃষ্টির

আশঙ্কায় উহা বর্জন করা

১০০। হাদীছ:—আয়েশা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, তোমাদের বংশধর অর্থাৎ মকীবাসী কোরায়েশগণ যদি সবেমাত্র নব মোসলেম না হইত, তবে আমি কা'বা ঘরকে ভাঙ্গিয়া নূতনভাবে তৈয়ার করিতাম। (উত্তর দিকে হাতীমরূপে) যে অংশ পরিত্যক্ত রহিয়াছে উহা সমেত তৈরী করিতাম এবং কা'বা ঘরের পোতা (বর্তমানের ছায় উচু না করিয়া) জমিন সমান করিয়া দিতাম এবং উহাতে দুইটি দরওয়াজা রাখিতাম; একটি প্রবেশ করার একটি বাহির হইবার। আবুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা:) তাহার খেলাফতের সময় এই অনুযায়ীই কা'বা-ঘরকে বানাইয়াছিলেন। (কিন্তু তিনি হাজ্জাজের হাতে শহীদ হইলে পর হাজ্জাজ আবার উহাকে ভাঙ্গিয়া পূর্বের ছায় কোরায়েশদের নির্মাণ আকারে বানাইয়া দেয়; এখন পর্যন্ত ঐরূপই আছে।)

ব্যাখ্যা:—কা'বা-ঘর ভাঙ্গিয়া উহার সংস্কারের অভিপ্রায় হযরতের জমিয়াছিল; কিন্তু তিনি উহা কার্যকরী করিতে বিস্মৃত থাকেন। কারণ, কোরায়েশগণ তখন সবে মাত্র ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। হযরতের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের আস্থা তখনও পর্যন্ত তত দৃঢ় হয় নাই। এমতাবস্থায় যদি তিনি খোদার ঘর ভাঙ্গা আরম্ভ করেন তবে তাহারা হয়ত বিরূপ ভাব

পোষণ করিবে। এই আশঙ্কায় হযরত রসূলুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লাম ঐ কার্য হইতে বিরত থাকেন, কারণ উহা কোন ফরজ বা ওয়াজিব কাজ ছিল না। এই হাদীছের বিষয়-বস্তুর আরও বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ড “বাইতুল্লাহ শরীফের প্রতিষ্ঠা” পরিচ্ছেদে রহিয়াছে।

শ্রোতার জ্ঞান অনুপাতে কথা বলিবে

১০১। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছালামাহ আলাইহে অসাল্লাম উটের উপর সওয়ার ছিলেন ; মোয়া'জ (রাঃ) তাঁহার সঙ্গেই পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন। নবী (দঃ) বলিলেন—হে মোয়া'জ ! মোয়া'জ উত্তর করিলেন—নতশিরে হাজির, ইয়া রসূলুল্লাহ ! এইভাবে তিনবার ডাকিয়া তৃতীয়বারে নবী (দঃ) বলিলেন, যে কোন ব্যক্তি খাঁচীভাবে আন্তরিকতার সহিত এই স্বীকারোক্তি গ্রহণ করিবে যে, একমাত্র আল্লাহই মা'বুদ (অর্থাৎ তাঁহার প্রদত্ত মতবাদ—ইসলামই গ্রহণীয় ; আমি উহা গ্রহণ করিতেছি)। অতঃপর কোন মা'বুদ নাই, (অর্থাৎ ইসলাম ব্যতীত সকল প্রকার মতবাদ বর্জনীয়, আমি তাহা বর্জন করিতেছি) এবং মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) নিশ্চয়ই আল্লার রসূল ; (অর্থাৎ তাঁহার বর্ণিত সকল হুকুম-আহকাম আল্লার পক্ষ হইতেই।) সেই ব্যক্তির উপর দোযখ হারাম হইয়া যাইবে। মোয়া'জ আরজ করিলেন, এই ঘোষণা ও সুসংবাদ সকলকে শুনাইয়া দেই যেন সকলেই সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারে ? নবী (দঃ) বলিলেন, এরূপ করিলে সর্বসাধারণ ভরসা জন্মাইয়া বসিবে। (ভুল বুঝের বশীভূত হইয়া আমল করা ছাড়িয়া দিবে।) মোয়া'জ (রাঃ) জীবনভর এই হাদীছটি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। মৃত্যুর সময় (কয়েকজন বিজ্ঞ লোককে ডাকিয়া) এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, যেন হাদীছকে লুফাইয়া রাখার গোনাহ না হয়।

ব্যাখ্যা :—রসূলুল্লাহ (দঃ) এই হাদীছ সর্বসাধারণকে শুনাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন—যাহারা ইহার সঠিক মর্ম ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিবে না। কিন্তু কাহাকেও এই হাদীছ শুনাইবে না এই উদ্দেশ্য হযরতের ছিল না ; নহুবা হযরত (দঃ) নিজে মোয়া'জ (রাঃ)কে শুনাইতেন না।

এল্-ম শিক্ষার লজ্জা-শরম বাধা না হওয়া

মোজাহেদ (রাঃ) বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি শিক্ষা গ্রহণে লজ্জা বোধ করিবে অথবা অহঙ্কার বা তাকান্বুরী করিবে সে এল্-ম হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

আয়েশা (রাঃ) বলিতেন, মদীনার মহিলাগণ অত্যন্ত ভাল ; ধীরে ধীরে শিক্ষা গ্রহণ করিতে লজ্জাবোধ তাহাদের জন্ত বাধার সৃষ্টি করিতে পারে না।

১০২। হাদীছ :—উম্মে-ছালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, উম্মে-ছালামা নামক এক মহিলা রসূলুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আসিয়া আরজ করিল, ইয়া

রসুলুল্লাহ (দ:)। আল্লাহ তায়ালা হক কথা প্রকাশ করিতে লজ্জিত হন না ; (অর্থাৎ সেরূপ আমিও লজ্জাবোধ না করিয়া একটি মহাআলাহ জিজ্ঞাসা করিতেছি—) জীলোকদের স্বপ্নদোষ হইলে গোছল ফরজ হইবে কি ? রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, (শুধু দেখিলেই হইবে না, বরং) বীর্ঘ্য (বাহির হইয়াছে) দেখিলে গোছল করা ফরজ হইবে। উম্মে ছালামা (রা:) তখন লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া বলিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ (দ:)। জীলোকদের কি স্বপ্নদোষ হইয়া থাকে ?* হযরত (দ:) বলিলেন, নিশ্চয় ; নচেৎ সন্তান মায়ের আকৃতি পায় কিরূপে ? (অর্থাৎ সন্তান কোন সময় মায়ের আকৃতি পাইয়া থাকে ; ওদ্বারা বুঝা যায় যে, মাতৃজাতির বীর্ঘ্যস্থলিত হওয়া স্বাভাবিক ; স্বপ্নদোষে তাহাই হয়।)

লজ্জা-ক্ষেত্রে মহাআলাহ অন্তের দ্বারা জানা

১০৩। হাদীছ :—আলী (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন—আমার অত্যধিক মজি × নির্গত হইত। রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট সেই বিষয় মহাআলাহ জিজ্ঞাসা করিতে আমি লজ্জা বোধ করিলাম ; কেননা তিনি আমার খণ্ডর। আমি মেকদাদ নামক ছাহাবীকে জিজ্ঞাসা করার জন্ত অনুরোধ করিলাম। সে জিজ্ঞাসা করিল ; তখন হযরত (দ:) উত্তর দিলেন—পুরুষাঙ্গ ধুইয়া ফেল এবং অজু করিয়া লও, গোসল করিতে হইবে না। (৪১ পৃ:)

মজ্জিদে এল্‌মের চর্চা করা

১০৪। হাদীছ :—আবুহুলাহ ইবনে ওমর (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি মসজিদের ভিতর দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসুলুল্লাহ ! আমরা কোন স্থান হইতে এহরাম বাধিব ? হযরত (দ:) বলিলেন, মদীনা দিকের বাসিন্দাগণ “জোহুফা” হইতে, নজদ এলাকা দিকের বাসিন্দাগণ “করণ” হইতে, ইয়ামান এলাকা দিকের বাসিন্দাগণ “ইয়ালামলাম” হইতে।

জিজ্ঞাসিত বিষয়ের অধিক উত্তর দেওয়া

১০৫। হাদীছ :—আবুহুলাহ ইবনে ওমর (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল—এহরাম অবস্থায় কিরূপ কাপড় পরিধান করিব ? নবী (দ:) বলিলেন, জামা পায়জামা, পাগড়ী, টুপী ব্যবহার করিতে পারিবে না ; এবং কুসুম ফুলের বা জাকরানের রঙ্গীন কাপড়ও ব্যবহার করিবে না। (মোজাও ব্যবহার করিবে না, তবে) জুতা না থাকা বশতঃ চামড়ার মোজা ব্যবহার করিতে পারিবে, কিন্তু পায়ের মধ্যপৃষ্ঠের উচ্চ স্থান এবং গোছের নিম্ন ভাগে উভয় দিকের গিঁটঘর উন্মুক্ত থাকে এইরূপে উপরের সম্পূর্ণ অংশ কাটিয়া ফেলিতে হইবে।

* পূর্বে তাহার স্বপ্নদোষ হয় নাই ; পরে ত তিনি হযরতের (দ:) বিবি, সাহারা উহা হইতে সুরক্ষিত।

× কাম স্পৃহার উত্তেজনায় লিঙ্গ দ্বারে বীর্ঘ্য ছাড়া লালার স্রাব পদার্থ নির্গত হয়—উহাই ‘মজি’।

তৃতীয় অধ্যায়

অজু

অজুর বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন—

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ -

অর্থ—তোমরা যখন নামাযের জ্ঞা প্রস্তুত হও, তখন সম্পূর্ণ মুখ-মণ্ডল এবং দুই হাত
কম্বুই পর্য্যন্ত এবং দুই পা গিঁটদ্বয় পর্য্যন্ত ধোত কর এবং মাথা মছেই কর।

ইমাম বোখারী (র:) বলেন—উক্ত অঙ্গগুলি ধোত করার মাত্রা হযরত রসুল্লাহ ছালাল্লাহ
আলাইহে অসাল্লাম এক এক বার (সর্বনিম্ন); দুই দুই বার (উত্তম); তিন তিন বার
(অতি উত্তম) দেখাইয়াছেন; তিন বারের বেশী তিনি কখনও করেন নাই। আক্ষেপণ
রসুল্লাহ ছালাল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের বর্ণিত এই সীমাকে লঙ্ঘন করা মকরুহ সাব্যস্ত
করিয়াছেন।

অজু ব্যতিরেকে নামায হইবে না

১০৬। হাদীছ:—

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ

অর্থ—আবু হোরাযরা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুল্লাহ ছালাল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম
বলিয়াছেন—যাহার অজু নাই, অজু না করা পর্য্যন্ত তাহার নামায হইবে না।

অজুর ফজিলত

১০৭। হাদীছ:—

أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا

محببين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل -

অর্থ :—আবু হোরাযর! (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—আমার উম্মতগণ হাত-পা, মুখমণ্ডল উজ্জল ও নূরানী-অবস্থায় কেয়ামতের দিন উপস্থিত হইবে। অজুর ক্রিয়ায় তাহাদের ঐ অবস্থা হইবে। যে ব্যক্তি বন্ধিত আকারে নূরানী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাহার কর্তব্য—ঐ সব অঙ্গ ধোয়ায় (পূর্ণতার নিশ্চয়তা বিধান) নির্ধারিত সীমা অপেক্ষা অধিক ধোয়া।

নিশ্চিত অনুভূতি ছাড়া শুধু সন্দেহে অজু ভাঙ্গি না

১০৮। হাদীছ :—আবু আস ইবনে তমীম (রাঃ) তাহার চাচা হইতে বর্ণন করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট বলা হইল—কোন ব্যক্তি নামাযের মধ্যে একরূপ অছওয়াছা (অমূলক সন্দেহ) অনুভব করে যেন তাহার অজু ভাঙ্গিয়া গেল। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যাবৎ শব্দ না শুনিবে বা হৃগন্ধ অনুভব না করিবে (অর্থাৎ যাবৎ অজু ভঙ্গের দৃঢ় অনুভূতি না হইবে) নামায ছাড়িবে না।

ব্যাখ্যা :—এক হাদীছে আছে—অজুর মধ্যে নানাপ্রকার অছওয়াছা বা সন্দেহ সৃষ্টিকারী এক (দল) শয়তান আছে উহার (সদস্যদের) নাম “অলাহান”।

মানুষ যে পথের পথিক হয় শয়তান ঐ পথের পথিক সাজিয়া নানাপ্রকার কুপ্ররোচনা দ্বারা তাহাকে দীন হইতে বিমুখ করিবার চেষ্টা করে। যে ব্যক্তি পরহেজগার নামাযী তাহাকে সরাসরি নামাযে বাধা দিলে সে উহা হইতে কান্দ হইবে না। সুতরাং শয়তান তাহার নিকট পরহেজগারীর পথ অবলম্বন করিয়া আসিয়া থাকে। অজুর মধ্যে নানাপ্রকার সন্দেহ একটার পর আর একটা সৃষ্টি করিতে থাকে, এইরূপে তাহাকে অজুর মধ্যে দীর্ঘ সূত্রিতার বেড়াজালে ফেলিয়া অল্প দিনের মধ্যেই জমাত হইতে মাহরুম করিয়া দেয়। তারপর কিছু দিনের মধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হইতে বন্ধিত করে। যদি সে কোন রূপে অজু করিয়া নানায় আরম্ভ করিয়া দেয় তথাপিও ঐ শয়তান তাহাকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে দেয় না। এই বুঝি অজু ভাঙ্গিয়া গেল—ইত্যাকার নানা সন্দেহ সৃষ্টি করিতে থাকে, যদ্বরূপ সে বার বার নামায ছাড়িতে থাকে ও বার বার অজু করিতে থাকে, অজুর মধ্যে ত দীর্ঘ সূত্রিতা আছেই। এইরূপে শেষ পর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তি নামাযকে একটি বড় জঞ্জাল মনে করিতে বাধ্য হয়, আরও যে কি হয় তাহা বলা যায় না। তাই একরূপ অছওয়াছা একটি মারাত্মক রোগবিশেষ। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) উহা হইতে রক্ষা পাইবার পন্থা শিক্ষা দিয়াছেন যে, স্পষ্ট নিদর্শন ও সুনিশ্চিত অনুভূতি ব্যতিরেকে শুধু মনের অমূলক সন্দেহের বশবর্তী হইবে না।

আবু বকর সিদ্দীক রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পোত্র প্রসিদ্ধ তাবেয়ী—কাসেম ইবনে মোহাম্মদ (রাঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল—নামাযের মধ্যে আমার নানাপ্রকার সন্দেহের সৃষ্টি হইতে থাকে, উহা হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি? তিনি বলিলেন,

তুমি কোনরূপ সন্দেহের প্রতি ভ্রক্ষেপ না করিয়া নামায পড়িতে থাক। যাবৎ তুমি শয়তানকে এই বলিয়া তাড়াইয়া না দিবে যে, আমি অশুদ্ধ ও অসম্পূর্ণ নামাযই পড়িব, তাবৎ শয়তান কিছুতেই তোমাকে ছাড়িবে না। (নানা প্রকার সন্দেহের সৃষ্টি করিতেই থাকিবে, যদ্বারা জামাত, ওয়াক্ত এমনকি নামায হইতে তোমাকে মাহরুম ও বঞ্চিত করিয়া দিবে।)

কারণ বশতঃ স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা কম পানি দ্বারা পূর্ণাঙ্গ অজু করা

১০৯। হাদীছ :- ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছালাম্মাহু আলাইহে অসাল্লামের তাহাজ্জুদ নামায দেখার জন্য তাঁহার বিবি—আমার খালা মায়মুনা রাজিয়াল্লাহু অনাহার ঘরে এক রাত্রে শুইয়া রহিলাম। (ইবনে আব্বাস তখন নাবালক ছিলেন এবং মায়মুনা (রাঃ) স্বত্ব অবস্থায় ছিলেন।) আমি বালিশের চওড়া দিকে শুইলাম এবং নবী (দঃ) ও তাঁহার বিবি লম্বা দিকে শুইলেন। আমি ঘুমের ভান করিয়া রহিলাম, কিন্তু ঘুমাইলাম না। নবী (দঃ) এশার নামায পড়িয়া ঘরে আসিলেন এবং চার রাকাত নফল নানায পড়িলেন, অতঃপর বিবির সঙ্গে কিছু সময় কথাবার্তা বলিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। যখন রাত্রি অর্ধেক বা তার চেয়ে একটু বেশী বা কম হইল, তখন তিনি জাগিয়া উঠিলেন এবং বসিয়া চোখ-মুখ হইতে নিদ্ৰাভাব মুছিয়া ফেলিলেন। তারপর তিনি আ'ল-এমরান ছুরার শেষ দিকের দশটি আয়াত পাঠ করিলেন। তারপর তিনি একটা লটকানো পুরানা মশক হইতে পানি লইলেন এবং পূর্ণাঙ্গ ও উত্তমরূপে অল্প পানি দ্বারা অজু করিলেন। তারপর তিনি নামাযে দাঁড়াইলেন। (ইবনে আব্বাস এসব চুপি চুপি দেখিলেন,) তিনি বলেন, যখন দেখিলাম—নবী (দঃ) নামায আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন তখন আমিও উঠিলাম এবং নবী (দঃ) যেরূপ করিয়াছিলেন আমিও সেরূপ করিলাম এবং তাঁহার বাম পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নামাযে শরীক হইলাম। নবী (দঃ) ডান হাতে আমার ডান কান ধরিয়া পেছন দিক দিয়া টানিয়া আনিয়া আমাকে তাঁহার ডান পার্শ্বে দাঁড় করাইলেন, কানে একটু মোচড়ও দিলেন। নবী (দঃ) দুই দুই রাকাত করিয়া ছয়বার নামায পড়িলেন এবং পরে এক রাকাত দ্বারা বেতের পড়িলেন। তারপর তিনি শুইয়া রহিলেন। নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহার নাকের শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। ফজরের ওয়াক্ত হইয়া গেল, মোয়াজ্জেন আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল; তিনি উঠিয়া ছোট কেরাতে দুই রাকাত (ফজরের ছুন্নত) পড়িলেন, তারপর মসজিদে যাইয়া (ফজরের) নামায পড়িলেন নূতন অজু করিলেন না।

† মোসলেম শরীফে ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত এক হাদীছে **ثم اوتر بسلامت** “তারপর তিন রাকাত বেতের পড়িলেন” স্পষ্ট উল্লেখ আছে; সেই অনুসারে আলোচ্য হাদীছেয় অস্পষ্ট বাক্যটির অর্থ এইরূপ হইবে—(যষ্ঠ দুই রাকাতের) পরে এক রাকাত (কে এ দুই রাকাতের সঙ্গে মিলাইয়া) তিন রাকাত বেতের পড়িলেন।

ব্যাখ্যাঃ— ইমাম বোখারী (র:) এখানে একটি সন্দেহ দূর করিয়াছেন যে, নিজার দরুন নবীগণের অজু ভঙ্গ হয় না। যেহেতু তাঁহাদের কাল্ব নিজাবস্থায়ও জ্ঞাত থাকে, কারণ তাঁহাদের প্রতি নিজাবস্থায় স্বপ্নাকারে বস্তুতঃ অহী আসিয়া থাকে। যেমন ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনায় আছে যে, তিনি স্বপ্নে ইসমাইল (আঃ)কে কোরবানী করিতে দেখিয়া উহাকেই আল্লার নির্দেশ রূপে গ্রহণ করতঃ নিজের ছেলেকে কোরবানী করিতে উদ্বৃত্ত হন। তাঁহার স্বপ্ন যদি অহী পর্ধ্যায়ের অকাট্য প্রমাণ পরিগণিত না হইত তবে তিনি এরূপ করিতে পারিতেন না। কেবলমাত্র স্বপ্ন দেখিয়া কোন একজন মানুষকে হত্যা করার জন্ত উদ্বৃত্ত হওয়া যায় না।

আলোচ্য হাদীছে উল্লেখিত ছুরা আল-এমরানের দশটি আয়াত এই—

(১) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ - الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا - سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ - (২) رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تَدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ - وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارِهِ (৩) رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا - رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ (৪) رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ - إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (৫) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُم مِّنْ ذَكَرَ أَنِّي بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ - فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَآخَرُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا أَوْ قَتَلُوا لَا كُفْرَنَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أَن خَلَّوْهُمْ جَنَّتْ تَجْرِي مِّنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ - ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ - وَاللَّهُ

مِنْ دَعَا حُسْنِ الثَّوَابِ ۝ (ۛ) لَا يَغُرَّرَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْإِلَادِ ۝
 (ۛ) مَتَاعٌ قَلِيلٌ - ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ - وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝ (ۛ) لَكِنَّ الَّذِينَ
 اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نَزِلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ -
 وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ بَرَّاهُ ۝ (ۛ) وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
 وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَشَعَيْنَ لَلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
 ثَمَنًا قَلِيلًا - أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ - إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝
 (ۛ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا - وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

অর্থ:—[১] (এই বিশাল) ভূমণ্ডল ও (বিস্তীর্ণ) আকাশ সমূহের সৃষ্টি ও সৃষ্ট-
 নৈপুণ্যের মধ্যে এবং রাত্রি ও দিনের গমনাগমন ও ছোট-বড় হওয়ার মধ্যে (আল্লার
 মা'রেকাত তথা তাঁহার একত্ব, তাঁহার অসীম কুদরত ও গুণাবলীর তথ্য-জ্ঞান লাভের)
 বহু নিদর্শন ও প্রমাণ নিহিত রহিয়াছে; খাঁটি জ্ঞানীগণ উহা উপলব্ধি করিতে পারেন।
 (প্রকৃত প্রস্তাবে জানী তাহারা) যাহারা উঠা বসা, শোয়া (ইত্যাদি) সর্বাবস্থায় (তথা
 জীবনের প্রতিটি স্তরে স্বীয় সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, ও পালনকর্তা) আল্লাহকে স্মরণ করিয়া
 চলে। (অর্থ্যৎ সে যে প্রতিটি মুহূর্তেই আল্লার দৃষ্টি-গোচরে আছে তাহা পূর্ণ মাত্রায়
 লক্ষ্য রাখিয়া জীবন যাপন করিয়া থাকে—যে অবস্থাকে ৪৬নং হাদীছে “এহুমান” নামে
 ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই অবস্থা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করা ও স্বীয় কর্তব্যবোধ তথা
 ঈমানের পরিপক্বতার উন্নতি সাধনের মানসে) জমীন ও আসমান সমূহের সৃষ্টি-রহস্য ও
 সৃষ্টি-নৈপুণ্যের মধ্যে ধ্যান ও চিন্তা করিয়া এই সত্যকে মনে-প্রাণে উপলব্ধি পূর্বক স্বীকার
 করিয়া লয় যে, হে আমাদের পালনকর্তা। এই বিরাট ভূ-খণ্ড ও বিস্তৃত আকাশ সমূহ
 তথা সমগ্র বিশ্ব জগতকে তুমি অথবা সৃষ্টি কর নাই। (আমরা যেন তোমার আজ্ঞাবহ
 দাস রূপে জীবন যাপন করি সেই উদ্দেশ্যে উহা আমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছে;) অথবা
 কাজ করা হইতে তুমি পাক-পবিত্র, মহান—অতি মহান। অতএব আমাদের (তোমার
 দাস বানাইয়া) দোষখের আজ্ঞাবহ হইতে পরিভ্রাণ দান কর। [২] যাহাকে তুমি দোষখ

হইতে রক্ষা না করিবে সে চিরতরে লাক্ষিত হইতে বাধ্য ; (যে লাঞ্জনাকে মানুষ পাপ করিয়া নিজেই নিজের উপর টানিয়া আনে) এই শ্রেণীর ব্যক্তির যাহারা নিজেই নিজের উপর অত্যাচারী তাহাদের জন্ত কেহ সাহায্যকারী হইবে না।

[৩] হে আমাদের রক্ষাকর্তা পালনকর্তা! ঈমানের প্রতি আহ্বানকারীর (তথা আপনার কোরআন, আপনার রসূল ও নায়েবে-রসূলগণের) উদাত্ত আহ্বান আমরা শুনিতে পাইলাম যে, “হে বিশ্বাসীরা! তোমরা স্বীয় সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তার উপর ঈমান আন” আমরা এই আহ্বানে সাড়া দিয়াছি এবং আপনার প্রতি ঈমানকে সর্বাস্তুরূপে গ্রহণ করিয়া লইয়াছি। হে পালনকর্তা! আপনি আমাদের সমুদয় দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করিয়া দিন এবং সমস্ত অপরাধ মার্জনা করুন এবং মৃত্যু পর্যান্ত যেন সংলোকদের দলভুক্ত থাকিতে পারি এইরূপ তৌফিক দান করুন। [৪] হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদের ঐ জিনিষ দান করুন—পয়গাম্বরগণের মারফতে আপনি যে জিনিষের আশা আমাদের দিয়াছেন (অর্থাৎ চির সুখময় বেহেশত) এবং কেয়ামতের দিন আমাদের লাঞ্জন হইতে রক্ষা করুন। নিশ্চয় আপনি স্বীয় ওয়াদা অঙ্গীকারের ব্যতিক্রম করেন না। (কিন্তু আমাদের নিজেদেরই ভরসা নাই যে, আমরা আপনার ওয়াদার বস্তু বেহেশত লাভের উপযুক্ত মোমেন হইতে পারিব কি—না। তাই মনে সংশয়ের উদয় হয়, আশঙ্কা আসে এবং আপনার নিকট ভিক্ষা চাইতে বাধ্য হই।)

[৫] (এইরূপে সাচ্চা দেলে যাহারা স্বীয় পালনকর্তার নিকট দোয়া করিয়া থাকে তাহাদের সেই দোয়া তিনি কবুল করিয়া লইয়াছেন। আল্লাহ বলেন—) আমি কোনও কর্মীর কোন কর্ম ও আমলকেই বিফল যাইতে দেই না; এ বিষয়ে প্রত্যেক নর-নারীই সমান। কারণ উভয়ই (আল্লাহ বন্দা হিসাবে) সম পর্যায়ভুক্ত। তাই যাহারা আমার রাস্তায় নানাপ্রকার কষ্ট-যাতনা ভোগ করিয়া থাকে, দেশ ত্যাগে বাধ্য হইয়া হিজরত বরণ করে এবং জেহাদ করে ও শাহাদত বরণ করে তাহাদের সমস্ত গোনাহ-খাতা আমি নিশ্চয় মাফ করিয়া দিব এবং তাহাদিগকে বেহেশতে স্থান দান করিব, যাহার মহল সমূহ-সংলগ্নে সুশীতল নদী-নহর বহিতে থাকিবে। এসব সামগ্রী কর্ম-ফল স্বরূপ আল্লাহ নিকট পাওয়া যাইবে; আল্লাহ প্রদত্ত কর্ম-ফল অতি উত্তম হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

[৬] তোমরা কাকেরদিগকে জাঁকজমকের সহিত শহরে শহরে চলাফেরা করিতে দেখিয়া ভুল ধারণার বশবর্তী হইও না (যে, তাহারা আল্লাহ প্রিয়পাত্র—সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির উপযুক্ত। তাহা কখনও নহে) [৭] এ সব নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী জাঁকজমক মাত্র; এই জীবনের পরই তাহাদের একমাত্র বাসস্থান হইবে দোযখ বা নরক এবং উহা অতিশয় কষ্ট-ক্লেশের স্থান। [৮] কিন্তু যাহারা স্বীয় পালনকর্তার ভয়-ভক্তির অধীন জীবনকে পরিচালিত করিয়াছে তাহাদিগকে বেহেশত দান করা হইবে—যাহার মহল সমূহের সংলগ্নে

নদী-নহর প্রবাহিত হইতে থাকিবে। সে বেহেশতে তাহারা আল্লাহর মেহমানরূপে চিরকাল দসবাস করিতে থাকিবে। নেক বান্দাদের জন্য আল্লাহর নিকট রক্ষিত সামগ্রী অতি উত্তম।

[৯] পূর্বের আসমানী কেতাবধারী লোকদের মধ্যে এমনও আছে, যাহারা আল্লাহর উপর ঈমান রাখে এবং স্বীয় কেতাবের সঙ্গে মোসলমানদের প্রতি অবতানিত কেতাবের উপরও পূর্ণ ঈমান রাখে এবং অন্তরে খোদার ভয়-ভীতি রাখিয়া থাকে। হীন স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া আল্লাহ (কেতাবের) আয়াতসমূহকে বিকৃত করে না; তাহারা স্বীয় পালন-কর্তার নিকট তাহাদের কার্যের প্রতিদান লাভ করিবে। আল্লাহ অতি স্বল্পই এই সব হিসাব-নিকাশ চুকাইয়া দিবেন।

(১০) হে ঈমানদারগণ! ধৈর্যধারণকারী হও, (জেহাদের ময়দানে এবং দ্বীনের উপর) প্রতিযোগিতার সহিত অটল ও স্থির থাকিতে অভ্যস্ত হও, (বাহ্যিক ও আন্তরিক) সীমান্ত রক্ষায় তৎপর থাক* এবং আল্লাহর প্রতি ভয়-ভক্তি রাখ; তাহা হইলে তোমরা সফলকাম হইতে পারিবে।

উত্তমরূপে অজু করা উচিত

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, অজুর সময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে ময়লা ইত্যাদি হইতে পরিকার করা উত্তম ও ভালরূপে অজু করার মধ্যে शामिल।

১১০। হাদীছঃ— উছামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রশূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (হজ্জের দিন) আরাফার ময়দান হইতে যখন রওয়ানা হইলেন, রাস্তায় এক স্থানে সওয়ারী হইতে নামিয়া পাহাড়ের এক বাঁকে বাইয়া প্রস্রাব করিলেন এবং তাড়া-তাড়ি অল্প পানি দ্বারা অজু করিলেন। আমি তাঁহাকে অজুর পানি ঢালিয়া দিতে ছিলাম। আমি আরজ করিলাম, হজুর নামায পড়িবেন কি? তিনি বলিলেন, নামাযের

• বাহ্যিক সীমান্ত রক্ষার অর্থ হইতেছে—ইসলামী রাষ্ট্র ও মোসলমানদিগকে হেফাজত ও কাকেরদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করার জন্য মোজাহেদরূপে সীমান্ত রক্ষাকার্যে যোগদান করা— ইহার বহু বহু ফজিলত হাদীছে বর্ণিত আছে।

আন্তরিক সীমান্ত রক্ষা করার অর্থ হইতেছে—স্বীয় অন্তরকে নফ্ছ ও শয়তানের আক্রমণ হইতে এবং কর্মজীবনকে নফ্ছ ও শয়তানের দখল হইতে রক্ষা করা। ইহার সহজ উপায় হযরত রশূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক হাদীছে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—বিশ্বাদময় তিক্ততার কারণসমূহ বিত্তমান থাকাবস্থায়ও পূর্ণ ও উত্তমরূপে অজু করায় অভ্যস্ত হওয়া, এক নামায পড়ার পর পরবর্তী নামাযের প্রতি আকৃষ্ট ও অপেক্ষারত অবস্থায় থাকা এবং বাসস্থান হইতে মসজিদ দূরে হইলেও সর্বদা মসজিদের জমাতে শরীক হওয়া (—এইভাবে সর্বদা সর্বক্ষেত্রে নিজকে আল্লাহ গোলামীতে নিয়োজিত রাখা) ইহাই হইল (আন্তরিক) সীমান্ত রক্ষা, ইহাই হইল সীমান্ত রক্ষা, ইহাই হইল সীমান্ত রক্ষা। (তিরমিজী) (ইহা দ্বারা শয়তানের আক্রমণ হইতে অন্তর সুরক্ষিত থাকিয়া দেহ রাজ্য শয়তানের তাবেদারীমুক্ত থাকিবে।)

স্থান সম্মুখে X। এই বলিয়া পুনরায় সওয়ার হইয়া চলিলেন। মোজদালেফার ময়দানে পৌঁছিয়া খুব ভালরূপে অঙ্ক করিলেন, তারপর একামত বলা হইলে মাগরেবের নামায আদায় করিলেন। তারপর সকলে নিজ নিজ উট বাঁধিয়া আসিলে পুনরায় একামত বলা হইল এবং এশার নামায পড়িলেন; মধ্যভাগে কোনও নামায পড়েন নাই।

অজুর সময় উভয় হাতে মুখ ধোত করিবে

১১১। হাদীছঃ—একদা ইবনে আব্বাস (রাঃ) অঙ্ক করিতে বসিলেন। এক হাতের আঙ্গুলে পানি লইয়া ক্লিষ্ট করিলেন ও নাকে পানি দিলেন। তারপর আবার পানি লইয়া উহার সঙ্গে দ্বিতীয় হাত মিলাইয়া দুই হাত দ্বারা মুখ ধুইলেন। তারপর এক হাতের অঙ্গুলীতে পানি লইয়া ডান হাত (কনুই পর্য্যন্ত) ধোত করিলেন এবং বাম হাতও এইভাবে ধুইলেন। তারপর মাথা মছেহ করিয়া এক আঙ্গুল পানি লইয়া ডান পায়ের উপর ঢালিয়া দিয়া ধোত করিলেন এবং ঐরূপে বাম পাও ধুইলেন। সর্বশেষে বলিলেন, “আমি হযরত রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এইরূপে অঙ্ক করিতে দেখিয়াছি।”

প্রত্যেক কাজে এমনকি জীসহবাসের পূর্বেও বিছমিল্লাহ বলা

১১২। হাদীছঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি যদি জীর সঙ্গে মিলনের পূর্বে—*

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

এই দোয়াটি পড়িয়া লয় এবং ঐ মিলনের দ্বারা কোনও সম্ভান জন্মে, তবে সেই সম্ভানকে শয়তান (দীন ও দুনিয়ার) কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না।

পায়খানায় যাইতে কি দোয়া পড়িবে?

১১৩। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পায়খানায় যাইতে এই দোয়া পড়িতেন—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

X কারণ হজ্জের সময় আরাফার ময়দান হইতে রওয়ানা হইয়া এশার নামাযের ওয়াক্ত মোজদালেফায় পৌঁছিয়া সেখানেই মাগরেব এবং এশা উভয় নামাযই এশার ওয়াক্তে পড়িতে হয়। পশ্চিমধ্যে মাগরেবের নামায আদায় করিলে সেই নামায শুদ্ধ হইবে না।

* দোয়াটির উচ্চারণ এই—বিছমিল্লাহে, আল্লাহ্মা জায়েব্ নাশ্-শায়তানা ওয়া জায়েবিশ্-শায়তানা মা-রাজাকতানা।

অর্থ—আল্লাহ নামে আরস্ত। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের শয়তান হইতে বাঁচাইয়া রাখ এবং আমাদের বাহা দান কর উহাকেও শয়তান হইতে বাঁচাইয়া রাখ।

ঐ দোয়াটির উচ্চারণ এই—আল্লাহ্মা ইন্নী-আ'উজ্-বিকা মিনাল্ খুব্ছে ওয়াল খাবায়েছে।
অর্থ—হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি সমস্ত দৃষ্ণতিকারী (ভূত-প্রেত ইত্যাদি) হইতে এবং সমস্ত রমকের অশ্লীল অভ্যাস ও দৃষ্ণতি হইতে।

মল-মুত্র ত্যাগের সময় কেবলামুখী বসিবে না অবশ্য সন্মুখে আড়াল থাকিলে

১১৪। হাদীছ :- আবু আইউব আনছারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মল-মুত্র ত্যাগের সময় কেহ কেবলামুখী বসিবে না। কেবলা দিকে পিঠও দিবে না, পূর্ব বা পশ্চিমমুখী হইয়া বসিবে।×

এই হাদীছ বর্ণনাকারী আবু আইউব আনছারী (রাঃ) বলেন, আমরা কয়েকজন মোসলমান এক সময় সিরিয়া দেশে গেলাম (সিরিয়া তখন মোসলমান অধিকৃত দেশ ছিল না।) সেখানে দেখিলাম, সমুদয় পায়খানাগুলিই কেবলামুখী করিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে। আমরা অপারগ অবস্থায় ঐ পায়খানায় প্রবেশ করিতাম, কিন্তু সাধ্যানুযায়ী কেবলা দিক হইতে মোড় দিয়া বাসিতাম এবং (যেহেতু পূর্ণ-মাত্রায় কেবলা দিক হইতে ফিরিয়া বসা সম্ভব হইত না, তাই) আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতাম।+

ব্যাখ্যা :- হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী স্বয়ং এবং তাঁহার সঙ্গীগণের ঘটনা দ্বারা পণ্ডিত প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য হাদীছের মর্ম ও অর্থ অনুযায়ী কোন প্রকার আড়াল থাকা অবস্থায়ও, এমনকি তৈরী পায়খানার ভিতরেও কেবলামুখী হইয়া মল-মুত্র ত্যাগ করা নিষিদ্ধ। ইমাম আবু হানিফার মজহাব ইহাই। আড়াল সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রাঃ) যাহা ইঙ্গিত করিয়াছেন উহার সূত্র হইল পরবর্তী হাদীছ—যাহার বিবরণ সন্মুখে আগিতেছে।

পা-দানির উপর বসিয়া মল ত্যাগ করা

এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য মল ত্যাগের জন্ত পা-দানি বিশিষ্ট পায়খানা তৈরী করা উত্তম। রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গৃহে সেই ব্যবস্থা ছিল।

১১৫। হাদীছ :- আবুছল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিতেন, লোকেরা বলে, মল-মুত্র ত্যাগকালে কেবলামুখী বা কেবলার দিকে পিঠ করিয়া বসিবে না। অথচ আমি একদা আমার ভগ্নি—হযরতের বিবি হাফ্‌ছাহ রাজ্জিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহ-ছাদে উঠিয়া ছিলাম; তথা হইতে হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়িল—রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (পায়খানার ভিতর) পা-দানির উপর বসিয়া আছেন; হযরতের পিঠ কেবলার দিকে ছিল।

ব্যাখ্যা :- এই হাদীছ দৃষ্টেই আবুছল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবী এবং কোন কোন ইমামের মজহাব এই যে, পায়খানার ভিতর, এমনকি সন্মুখ বা পেছনে কোন আড়াল থাকিলেই মল-মুত্র ত্যাগে কেবলার দিকে মুখ বা পিঠ করা দুষণীয় নহে। ইমাম আবু হানিফার মজহাব প্রথমোক্ত হাদীছটির উপর স্থাপিত। তাঁহার মজহাবে কোন অবস্থাতেই

× পূর্ব-পশ্চিমমুখী বসিবার আদেশ মদীনাবাসীর জন্ত। যাহাদের কেবলা দক্ষিণে।

+ হাদীছ বর্ণনাকারীর নিজ ঘটনার অংশটুকু বোখারী শরীফের ৭৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে।

মল-মুত্র ত্যাগকালে কেবলামুখী হওয়া বা কেবলার দিকে পিঠ দেওয়া জায়েয নহে। তিনি বলেন, ১১৪ নং হাদীছটি অতি সুস্পষ্ট এবং বিধানগত ঘোষণা স্বরূপ ব্যাপক আকারের মৌখিক উক্তি। পক্ষান্তরে ১১৫নং হাদীছের বিষয়টি হযরতের উক্তি নহে, অধিকন্তু উহা ধীর-স্থিরবিহীন অতি ক্ষীণ ও দ্রুত অপসারিত দৃষ্টির মাধ্যমে শুধুমাত্র একবার একজনের এক নজরে অনুভূত বিষয়; ইহাতে প্রকৃত রূপের বিধাহীন অবগতি হয় না। এত দুর্বল বিষয় দ্বারা ১১৪নং হাদীছে বর্ণিত সুস্পষ্ট মৌখিক উক্তি ও বিধানগত ব্যাপক আকারের ঘোষণার মধ্যে কোন প্রকার রদ-বদল করা যায় না।

ইমাম বোখারী (রাঃ) আলোচ্য হাদীছ দ্বারা বাড়ীর ভিতরে মল ত্যাগের জ্ঞান বিশেষ স্থান তৈরী করার বাস্তবতা সম্পর্কেও একটি পরিচ্ছেদ লিখিয়াছেন।

মল ত্যাগের জ্ঞান নারীদের অরণ্যে-প্রান্তরে যাওয়া

উপরের পরিচ্ছেদে তৈরী পায়খানার মল ত্যাগের কথা বলা হইয়াছে, উহার পরে স্বগৃহে মল ত্যাগের ব্যবস্থা রাখার কথা বলা হইয়াছে। আলোচ্য পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য এই যে, স্বগৃহে মল ত্যাগের ব্যবস্থা না থাকিলে জনশূন্য মাঠে-জঙ্গলে, পাথারে-প্রান্তরে মল ত্যাগের জ্ঞান যাইতে পারে। এক্ষেত্রে দুইটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথমটি হইল—লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কোন মানুষের দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনার স্থল না হয়। নৌকা চলাচলের নদী-খালের কূলে যেভাবে মল ত্যাগের জ্ঞান বসা হয় উহা হারাম ; ঐরূপ ব্যক্তিদের প্রতি হাদীছে রসূল্লাহ (দঃ) কর্তৃক লা'ন ও অভিশাপের উল্লেখ রহিয়াছে। দ্বিতীয়টি হইল—মালিকের আপত্তির জায়গা বা যেস্থানে মল ত্যাগ করিলে লোকদের কষ্ট হওয়ার আশঙ্কা ; যেমন—পথে, ঘাটে, ছায়ায় বা ফলের গাছের নিকটবর্তী ইত্যাদি স্থানেও মল ত্যাগ করিবে না। এই সব বিষয় লক্ষ্য রাখিয়া প্রয়োজনে নারীগণও বিশেষ পর্দার সহিত বাহিরে মল ত্যাগের জ্ঞান যাইতে পারে। অবশ্য নারীগণ ঐরূপ ক্ষেত্রে শুধু রাত্রে যাওয়ায় অভ্যস্ত হওয়া চাই। রসূল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমলে মদীনা শরীফে পরবর্তী সময়ে মোসলমানগণ নিজ গৃহে পায়খানা তৈরী করিয়া নিতেন ; হযরতের গৃহে তৈরী পায়খানা ছিল। কিন্তু প্রথম দিকে অন্ধকার যুগের ব্যবস্থাই চলিত যে, বাড়ীতে মল ত্যাগের ব্যবস্থা থাকিত না।

১১৬। হাদীছ :-আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক কালে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবিগণও মদীনার একটি বৃহৎ প্রান্তরে মল ত্যাগের জ্ঞান যাইয়া থাকিতেন ; তাহারা শুধু কেবল রাত্রেই বাহির হইতেন ; সাধারণভাবে তাহারা অভ্যাস করিয়া নিয়া ছিলেন—রাত্রের পর আবার রাত্রেই মল ত্যাগে বাহির হইতেন। ওমর (রাঃ) হযরতের বিবিগণের (পর্দার সহিতও) বাহিরে যাওয়া বন্ধ করার জ্ঞান পীড়াপীড়ি করিতেন, কিন্তু রসূল্লাহ (দঃ) সেইরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রবর্তন করিতেন না। একদা হযরতের বিবি সওদা (রাঃ)

শরীয়তী পর্দার বিধান প্রবর্তিত হওয়ার পর গভীর রাত্রে পর্দার সহিতই মল ত্যাগে বাহির হইলেন। ওমর (রাঃ) কোথাও বসিয়াছিলেন তথা হইতে তিনি সওদা (রাঃ)কে যাইতে দেখিলেন। সওদা (রাঃ) মোটা ও দীর্ঘ কায়া-বিশিষ্টা ছিলেন, তিনি পরিচিত লোকদের ঠাহরে আসিয়া যাইতেন; তাই ওমর (রাঃ) তাঁহাকে ঠাহর করিয়া নিতে পারিলেন। ওমর (রাঃ) উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন, সতর্ক হউন—হে সওদা! আপনি আমাদের জন্ত অপরিচিত থাকিতে পারেন না, সওদা আপনাকে চিনিয়া ফেলিলাম। স্মরণ্য চিন্তা করুন! কি ভাবে আপনি বাহির হইতে পারেন? ওমর (রাঃ) এই অভীলাসই প্রকাশ করিতেছিলেন যে, হযরতের বিবিদের জন্ত ঘরের বাহিরে যাওয়া সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করা হউক।

সওদা (রাঃ) ফেরার পথে নবী ছালাম্মাহু আলাইহে অসাল্লামের কিট আসিয়া উক্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলেন যে, ওমর আমাকে এই এই বলিয়াছেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তখন আমার গৃহে রাত্রে আহার গ্রহণ করিতেছিলেন। হযরতের হাতে তখন একখানা আহাৰ্য্য গোশতের হাড় ছিল; এমতাবস্থায়ই হযরতের প্রতি আল্লাহ তায়ালা অহী অবতীর্ণ করিলেন। কিছু সময়ের মধ্যে অহী অবতরণের সমাপ্তি হইল—তখনও এই হাড়খানা হযরতের হাতেই ছিল। হযরত (দঃ) তখন বলিতেছিলেন, তোমাদের জন্ত আল্লাহ তায়ালা অনুমতি দিয়াছেন; তোমরা প্রয়োজনে (বিশেষ পর্দার সহিত) বাহির হইতে পারিবে। এই ব্যাপারে বিশেষ পর্দার বিষয় সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে একটি আয়াতও নাযেল হইয়াছে।*

ব্যাখ্যাঃ—এখানে উদ্দেশ্য বিশেষ পর্দার আয়াতটি এই—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِئِبِهِنَّ -

“হে নবী! আপনার বিবিগণকে, আপনার কন্যাদেরকে এবং মোমেনগণের বউ-বিনারীদেরকে বলিয়া দিন, তাহারা যেন (প্রয়োজনে পর্দার সহিত বাহির হইলে অতিরিক্ত পর্দারূপে) ঘোমটা অধিক নীচ তথা লম্বা করিয়া দিয়া নেয়। (যাহাতে মাথার সহিত চেহারাও পূর্ণ পর্দায় থাকে।) (২২ পাঃ ৫ রঃ)

পানি দ্বারা এস্তেজা করা

১১৭। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছালাম্মাহু আলাইহে অসাল্লাম যখনই মল-মুত্র ত্যাগের জন্ত বাহির হইতেন, আমি এবং আমার সঙ্গী আর

* হাদীছখানা ২৮, ৭০৮, ৭৮৮, এবং ৯২২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে; অনুবাদে সমষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

একটি ছেলে হযরতের এস্তেঞ্জার জন্ত পানি লইয়া আসিতাম এবং সরু মাথার লোহা লাগান একখানা লাঠিও নিয়া আসিতাম।

(কারণ, রসুল্লাহ (দ:) সাধারণতঃ মল-মুত্র ত্যাগের পর অজু করিয়া থাকিতেন এবং অজু করার পরে তিনি নামাযও পড়িতেন, এবং বাহিরে নামায পড়াকালীন তিনি ঐ লাঠিখানাকে সম্মুখে ছোতরা বা আড়াল স্বরূপ গাড়িয়া লইতেন।)

ডান হাতে এস্তেঞ্জা করা নিষিদ্ধ

১১৮। হাদীছ :— আবু কাতাদাহ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন কিছু পান করিবার সময় পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলিবে না, মল-মুত্র ত্যাগের সময় ডান হাতে পুরুষাঙ্গ ছুইবে না এবং ডান হাত দিয়া এস্তেঞ্জা করিবে না।

কুলুথ ব্যবহার করা কর্তব্য

১১৯। হাদীছ :—আবু হোরাযরা (রা:) বলেন একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মল ত্যাগের জন্ত বাহির হইলেন, আমি তাঁহার সঙ্গে রওয়ানা হইলাম। নবী (দ:) পথ চলাকালীন এদিক ওদিক দেখিতেন, কাজেই আমি তাঁহার অত্যন্ত নিকটবর্তী হইলাম (যেন আমাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি দরকারী কোন ফরমামেশ দিতে পারে।) নবী (দ:) আমাকে বলিলেন, এস্তেঞ্জার জন্ত কয়েকটি পাথরের টুকরা আন। হাড়ি বা লিদ্ (পশুর শুক মল) আনিও না। আমি আমার কাপড়ের কিনারায় করিয়া কয়েকটি পাথরের টুকরা তাঁহার নিকটবর্তী রাখিয়া দূরে সরিয়া পড়িলাম। তিনি মল ত্যাগের পর উহা ব্যবহার করিলেন।

লিদ্ দ্বারা কুলুথ ব্যবহার নিষিদ্ধ

১২০। হাদীছ :— আবু হুলাইহ ইবনে মসউদ (রা:) বলেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মল-ত্যাগের জন্ত বাহির হইলেন এবং আমাকে তিনটি প্রস্তরখণ্ড আনিতে বলিলেন। আমি প্রস্তরখণ্ড দুইটি পাইলাম; আর না পাইয়া একটি শুক গোবরখণ্ড লইয়া আসিলাম। নবী (দ:) প্রস্তরখণ্ড দুইটি গ্রহণ করিলেন, গোবরখণ্ডটি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, এইটা নাপাক বস্তু।

প্রত্যেক অঙ্গ এক, দুই বা তিনবার ধুইয়া অজু করা

১২১। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (দরকার বশতঃ) এক একবার অঙ্গ ধোত করিয়া অজু করিয়াছেন।

১২২। হাদীছ :— আবু হুলাইহ ইবনে য়ায়েদ (রা:) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (কোন সময়) দুই দুইবার অঙ্গ ধোত করিয়া অজু করিয়াছেন।

১২৩। হাদীছ :— একদিন ছাহাবী ওসমান (রা:) পানির পাত্র আনাইলেন এবং দুই হাতের উপর তিনবার পানি ঢালিয়া ধোত করিলেন, তারপর ডান হাত দ্বারা পাত্র

হইতে পানি উঠাইয়া কুল্লি করিলেন ও নাকে পানি দিলেন, তারপর মুখমণ্ডলকে তিনবার ধোত করিলেন এবং দুই হাত কবুই পর্যন্ত তিনবার ধোত করিলেন, তারপর মছেহ করিলেন, তারপর দুই পা টাখনার উপর পর্যন্ত তিন তিনবার ধোত করিলেন। তারপর বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি এরূপ অজু করিয়া দুই রাকাত নামায পূর্ণ একাগ্রতার সহিত পড়িবে। অর্থাৎ—নামায পড়া কালীন ছুনিয়ার কোন বিষয়ের প্রতি ধ্যান না করিবে তাহার পূর্বের সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

আর এক হাদীছে বর্ণিত আছে, ওসমান (রাঃ) অজু করার পর বলিলেন, আমি একটি হাদীছ বয়ান করিব ; যদি কোরআন শরীফের একটি আয়াত না থাকিত তবে আমি উহা বয়ান করিতাম না। আমি :বী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—যে কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করিয়া দুই রাকাত নামায পড়িবে ; নামায শেষ করা পর্যন্ত তাহার পূর্বের সব গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা :—ওসমান (রাঃ) উল্লেখিত হাদীছটি বয়ান করিতে দ্বিধা বোধ করিয়াছেন এই জন্য যে, সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করিয়া হাদীছটির পূর্ণ তথ্য অনুধাবন করিতে না পারিলে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির আশঙ্কা আছে যে, শুধু অজু ও দুই রাকাত নামায দ্বারা সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে ; অথচ কবিরা গোনাহ খাটি তওবা ছাড়া মাফ হয় না—ইহাই শরীয়তের বিধান।

প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত হাদীছের মর্ম ইহা নয় যে, কবিরা গোনাহও তওবা ব্যতিরেকেই মাফ হইয়া যাইবে। কারণ হাদীছটির মধ্যে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বাক্য রহিয়াছে যে, “উত্তমরূপে অজু করিয়া”; অজু উত্তম হওয়ার জন্য ইহাও আবশ্যক যে, কবিরা গোনাহ সংঘটিত হইয়া থাকিলে উহা হইতে তওবা করিয়া অজু করিবে। উত্তমরূপে অজু করার অর্থে বাহ্যিক অপনিত্রতা পানি দ্বারা ধুইয়া দূর করার ছায়া আত্মিক অপবিত্রতা তওবা দ্বারা ধুইয়া দূর করাও নিহিত রহিয়াছে। এই জন্যই অজুর শেষে এইরূপ দোয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

“হে আল্লাহ! আমার তওবা কবুল কর এবং আমার পবিত্রতা কবুল কর।” তদুপরি পানি দ্বারা অঙ্গসমূহ ধোয়া শেষে তওবার পুনরোক্তি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে—

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

“স্বায় আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসার গুণগান করি। তুমি ভিন্ন কোন মাবুদ নাই। তুমি এক—তোমার শরীক নাই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাই। এবং সমস্ত গোনাহ হইতে তওবা করিতেছি।” এই দোয়াটি অজু সমাপ্তে পড়িতে হয়।

ওসমান (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত প্রথমোক্ত হাদীছেও একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা আছে যে, “নিয়মিত অজু করিয়া আল্লার প্রতি এরূপ একাগ্রতার সহিত দুই রাকাত নামায পড়িবে যে, নামায পড়াকালীন ছুনিয়ার কোন খেয়াল যেন অন্তরে স্থান না পায়।” এই অবস্থা হাসিল করার চেষ্টা করিলেই বুঝে আসিবে, ইহা হাসিল করা কত কঠিন এবং কত সাধনা সাপেক্ষ। আর সাধনার আরম্ভই হইল—কবির গোনাহ হইতে সম্পূর্ণ বাঁচিয়া থাকা এবং কবির গোনাহ হইয়া থাকিলে উহা হইতে খাটি তওবা করা। কবির গোনাহের আবিল-তাময় অন্তর কখনও আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঐরূপে নিবেদিত হইতে পারে না।

এস্থলে রসুলুল্লাহ ছালামাহু আলাইহে অসাল্লামের শিক্ষা পদ্ধতির নৈপুণ্য উপলব্ধি করা যায়। নবী (দঃ) মানুষকে কোন আমলের প্রতি আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে আমলের করণীয় বিষয়ের সর্বোচ্চ পর্যায়টা উহা রাখিয়া শুধু প্রাথমিক পর্যায়ের বাহ্যিক আকৃতি উল্লেখ করিতেন; আর উক্ত আমলের ফজিলতটা বর্ণনা করিতেন উহার সর্বোচ্চ পর্যায়ের। ইহাতে মানুষের মনোবল ও সাহস অক্ষুণ্ণ থাকে এবং আশার আলোতে সে অগ্রসর হওয়ায় আকৃষ্ট হয়; অধিকন্তু সে আশায় বুক বাঁধিয়া ধাপে ধাপে সর্বোচ্চ পর্যায়ের পৌঁছিতেও সক্ষম হইবে। অবশ্য বর্ণনার মধ্যে করণীয় বিষয়ের সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রতিও ইঙ্গিত থাকে যেন কুটিল স্বভাবের লোকেরা ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইবার অবকাশ না পায়।

এখানে উক্ত পদ্ধতিতেই কথা বলা হইয়াছে। ফজিলত বর্ণনায় অতি উচ্চ মানের অজু ও নামাযের ফজিলত বর্ণিত হইয়াছে, অথচ আমলের বর্ণনায় শুধু অজু নামাযের নাম আছে—যাহা উহার প্রাথমিক পর্যায়কেও বলা যায়। কিন্তু অজু-নামাযের প্রাথমিক পর্যায়ের জন্ত উক্ত ফজিলত নহে; উক্ত ফজিলত একমাত্র উচ্চ পর্যায়ের অজু ও নামাযের—যাহার ইঙ্গিত উল্লেখ করা হইয়াছে।

● যেই আয়াতটির দরুন ওসমান (রাঃ) আলোচ্য হাদীছ বর্ণনায় বাধ্য হইয়াছেন; হাদীছ বর্ণনাকারী বিশিষ্ট ভাবেয়ী ওরওয়া (রঃ) ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন—

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ.....

“কর্তা যাহারা আল্লাহ ও রসুলের বর্ণিত হেদায়েতবাণী গোপন রাখে তাহাদের প্রতি আল্লার লানৎ ও অভিশাপ.....” (২ পারা ২ রুকু)

ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়াল আনহুর দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা শিক্ষা ক্ষেত্রে কতিপয় জরুরী উপদেশ লাভ হয়। যথা—

১। কোরআন হাদীছের জ্ঞান ও এলুম আল্লাহ তায়াল যাহাকে দান করিয়াছেন তাহার কর্তব্য হইবে নিজ দায়িত্ব বোধে উহা অপরকে শিক্ষা দেওয়া।

২। কোরআন হাদীছ শিক্ষাদানে নিজকে শিক্ষার্থীদের প্রতি উপকারক গণ্য করিবে না, বরং স্বীয় কাঁধের বোঝা নামাইবার সুযোগস্থল গণ্য করিবে।

৩। আল্লাহ তায়ালায় লানং ও অভিশাপগ্রস্ত হওয়ার ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া নিজ হইতেই কোরআন-হাদীছ শিক্ষা দানে উদ্যোগ হইয়া উঠিতে হইবে।

অজুর মধ্যে নাকে পানি দেওয়া

১২৪। হাদীছ :—আবু হোরাযরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন— অজু করিলে নাকে পানি দিবে এবং কুলুথ বা টিলা বেজোড় সংখ্যায় ব্যবহার করিবে।

১২৫। হাদীছ :— আবু হোরাযরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—অজুর মধ্যে নাকে পানি দিয়া নাক ঝাড়িবে; টিলা বেজোড় সংখ্যায় ব্যবহার করিবে, নিদ্রা হইতে উঠিয়া পানি পাত্রে হাত দেওয়ার পূর্বে হাত ধোত করিয়া লইবে। কারণ, নিদ্রাবস্থায় হাত কোথায় লাগিয়াছে তাহা জানা নাই।

তৃতীয় খণ্ডে ইবলিসের বয়ানে একটি হাদীছে নবী (দঃ) বলিয়াছেন, নিদ্রা হইতে উঠিয়া অজু করা কালে বিশেষভাবে তিনবার নাকে পানি দিয়া নাক ঝাড়িবে; মানুষের নিদ্রা-সময়ে তাহার নাসিকা-নালীর উর্দ্ধস্থানে শয়তান অবস্থান করিয়া থাকে।

বিশেষ দৃষ্টব্য :—অজুর মধ্যে কুল্লিও করিতে হয়; ১২৩নং হাদীছে উহার প্রমাণ রহিয়াছে।

অজুর সময় পায়ের গোড়ালী ভালরূপে ধোত করিবে

১২৬। হাদীছ :— একদা আবু হোরাযরা (রাঃ) কোথাও যাইতেছিলেন; কয়েকজন লোক একটি পাত্র হইতে অজু করিতেছিল; তিনি তাহাদিগকে বলিলেন—পূর্ণ ও উত্তম-রূপে অজু কর। রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যে সমস্ত গোড়ালী শুক থাকিবে ঐগুলি দোষে পড়িবে।

(৫৪ নম্বর হাদীছ দ্বারা এখানে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, অজুর মধ্যে উভয় পা পূর্ণরূপে ধোত করা আবশ্যক। ভিজা হাতে শুধু মুছিয়া নিলে চলিবে না।)

ইবনে ছীরীন (রঃ) আংটির স্থানও ভালরূপে ধোত করিতেন।

চাম্পলে পা রাখিয়া পা ধোত করা যায় কিন্তু মছেহ করা যায় না

১২৭। হাদীছ :—এক ব্যক্তি আবুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে বলিল, আপনি চারিটি কাজ করেন যাহা আপনার অণু কোন সঙ্গীকে করিতে দেখি না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন উহা কি কি? সে বলিল—(১) হজ্জের তাওয়াফ করার সময় কাবা শরীফের শুধু দক্ষিণ পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব কোণ দুইটিকেই আলিঙ্গন করিয়া থাকেন, অণু কোণকে নয়। (২) পশমহীন চামড়ার চাম্পল পায়ে দিয়া থাকেন। (৩) আপনি জরদ (কমলা) রং ব্যবহার করিয়া থাকেন। (৪) মকায় থাকাকালীন আপনি চাই জিলহজ্জ হজ্জের এহরাম বাধিয়া থাকেন, অথচ সকলে প্রথম তারিখেই এহরাম বাধে। তিনি উত্তর করিলেন, আমি রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ঐ দুই কোণ ব্যতীত অণু কোণকে আলিঙ্গন করিতে দেখি নাই। পশমহীন চামড়ার চাম্পল রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম

ব্যবহার করিতেন এবং উহা পায়ে রাখিয়া অজু করিতেন, তাই আমি উহাকে পছন্দ করি। রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জরদ রং ব্যাধার করিতে দেখিয়াছি; সে জন্ত আমিও উহা ব্যবহার করি। রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে (মিকাৎ-স্থান হইতে) যাত্রা আরম্ভের পূর্বে এহরাম বাঁধিতে দেখি নাই। (মক্কায় অবস্থান কালে হজ্জ করিলে হজ্জের জন্ত যাত্রা ৮ তারিখেই আরম্ভ হয়—মিনার দিকে; তাই ৮ তারিখের পূর্বে আমি এহরাম বাঁধি না।)

অজু ও গোসলে ডান দিকের কাজ প্রথম করিবে

১২৮। হাদীছ :—উম্মে আতিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবীকৃষ্ণা জয়নাব (রাঃ) মারা গেলে পর তাঁহার গোসলদানকারীগণকে নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আদেশ করিলেন—ডান পার্শ্ব এবং অজুর অঙ্গ সমূহ হইতে গোসল দেওয়া আরম্ভ করিও।

১২৯। হাদীছ :— আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সাধ্যানুযায়ী প্রত্যেক কার্যেই ডান দিক হইতে আরম্ভ করা ভালবাসিতেন—জুতা প.য়ে দেওয়া, মাথা ঝাঁটান, অজু করা গোসল করা ইত্যাদি।

নামাযের সময় হইলে পানি তালাশ করিবে

১৩০। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বলেন, আমি রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি ঘটনা দেখিয়াছি। একদা আছরের নামায উপস্থিত হইল, সকলেই পানি তালাশ করিয়া হয়রাং, কিন্তু কোথাও পানি পাওয়া গেল না। রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে সামান্য একটু অজুর পানি হাজির করা হইল; তিনি স্বীয় হস্ত ঐ পাত্রে রাখিয়া দিলেন এবং সকলকে অজু করিতে আদেশ করিলেন। আনাছ (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাতের তালুর নীচ হইতে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া পানি উথলিয়া উঠিতেছিল এবং উপস্থিত সকলে উহা দ্বারা অজু করিতে সমর্থ হইল।

মানুষের চুল ভিজান পানি পাক

১৩১। হাদীছ :—ইবনে ছীরীন (রঃ) আবীদাহ নামক অতি প্রাচীন একজন তাবেয়ীকে বলিলেন, আমার নিকট নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি চুল মোবারক আছে, আমি উহা আনাছ (রাঃ) ছাহাবীর নিকট হইতে পাইয়াছি। আবীদাহ বলিলেন, আমি নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি চুল মোবারক হাসিল করিতে পারিলে সমস্ত ছনিয়া ও উহার ধন-দৌলত পাওয়ার চেয়েও অধিক সন্তুষ্ট হইতাম।

১৩২। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (হজ্জের সময়) রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন মাথা কামাইয়াছিলেন, তখন আবু তাল্হা (রাঃ) (আনাছের মাতার ২য় স্বামী) সর্বাঙ্গে হযরতের চুল মোবারক হাসিল করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা :—ইমাম বোখারী (র:) এই ছইটি হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহেন যে, মানুষের চুল পাক, স্ততরাং উহা পানিতে পড়িলে পানি নাপাক হয় না।

যে পাত্রে কুকুর মুখ দিবে উহা সাত বার ধুইবে

১৩৩। হাদীছ :—আবু হোরায়া (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন, কুকুর যদি কোন পাত্রে মুখ দেয় তবে উহাকে সাতবার ধুইবে।*

ইমাম যুহরী বলিয়াছেন, কুকুরের মুখ দেওয়া পানি ব্যতীত অণ্ড আর কোনও পানি না পাইলে ঐ পানি দ্বারাই অঙ্ক করিবে।

ইমাম ইফইয়ান বলেন, এই মছআলাটি ঠিক, বারণ পানি থাকাকালীন অঙ্ক করিতেই হইবে। কিন্তু কুকুরে মুখ দেওয়া পানি পাক হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ হয় বলিয়া ঐ পানি দ্বারা অঙ্ক করিয়া পরে তায়াম্মুগও করিলে।+

১৩৪। হাদীছ :—আবু হোরায়া (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পূর্বকালের এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন—সে কোথাও যাইতেছিল; পথিমধ্যে সে পিপাসার তাড়নায় অস্থির হইয়া পড়িল। একটি কূপ দেখিতে পাইল; (কিন্তু তথায় পানি উঠাইবার কোন ব্যবস্থা ছিল না:) সে কূপে অবতরণ করিয়া পানি পান করিল। কূপ হইতে উঠিয়া দেখিতে পাইল, একটি কুকুর পিপাসায় হাঁপাইতেছে এবং কাঁদা চাটিতেছে। ঐ ব্যক্তি ভাবিল, কুকুরটিরও ঐরূপ কষ্ট হইতেছে যেহেতু আমার হইতেছিল। এই ভাবিয়া সে পুনরায় কূপে অবতরণ করিল এবং তাহার চামড়ার মোজা ভরিয়া পানি লইল। কূপ হইতে উঠিবার কোন ব্যবস্থা ছিল না; উভয় হাতের সাহায্যে উঠিতে হয়; তাই পানি ভরা মোজা মুখে কামড় দিয়া উঠাইতে হইল। ঐরূপ কষ্টে পানি কূপ হইতে উঠাইয়া তৃষ্ণাতুর কুকুরকে পান করাইল। আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির এই পরিশ্রম ও কার্য্যকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং তাহার সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিলেন।

ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, পশুর প্রতি সদ্ব্যবহারেও ছওয়াব হইবে? হযরত (দ:) বলিলেন, **“فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ”** “প্রত্যেক জীবের উপকার করায়ই ছওয়াব আছে।”

ব্যাখ্যা :—শরীয়ত দৃষ্টে কুকুর অতিশয় ঘণিত জীব, উহার সংশ্রব দূষণীয় ও ক্ষতিকারক। বোখারী ও মোসলেম শরীফে আছে, রসুলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন—“যে ঘরে কুকুর থাকে সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা যায় না।” আরও আছে, “যে ব্যক্তি কুকুর পালিয়া রাখে সে প্রত্যহ তাহার নেকীর এক বিরাট অংশ বরবাদ হইতে থাকিবে।” কিন্তু সে জন্ত কুকুরের প্রতি দয়া পরবশ হইয়া উহাকে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করাতে ছওয়াব না

* মোসলেম শরীফে আরও আছে—অষ্টমবার মাটি দ্বারা মর্দন করিয়া ধুইবে।

+ ইমাম আবু হানিফা এবং অধিকাংশ ইমামগণের মতে কুকুরের মুখ দেওয়া পানি বড় নাপাক। উহা দ্বারা অঙ্ক কি হইবে? ঐ পানি যথায় লাগিবে তাহাও নাপাক হইয়া যাইবে।

হইবার কোন কারণ নাই। দয়াল প্রভু আল্লাহ তায়ালা পরোপকার এবং দয়া ও করুণাকে অতি ভালবাসেন; এমনকি ঘৃণার পাত্রও উহার বিকাশ পছন্দ করিয়া থাকেন।

বুদ্ধিহীন জীব কুকুর কোন ক্রতি করিয়া ফেলিলেও উহার উপর নির্দয়ভাবে অত্যাচার করা চাই না, যদিও উহা ঘৃণিত বস্তু। নিম্নের হাদীছের প্রতি লক্ষ্য করুন।

১৩৫। হাদীছ :- আবু হুলাইহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় (প্রথম অবস্থায় যখন মোসলমানদের দারিদ্রের দরুন মসজিদ সমূহে দরওয়াজা ইত্যাদি লাগাইয়া হেফাজত করার সামর্থ্য ছিল না; তখন) মসজিদের ভিতর কুকুর আসা-যাওয়া করিত এবং সে জন্তু মসজিদ ধোত করার কোন ব্যবস্থা করা হইত না। (কারণ, মসজিদের জমি পাকা-পোক্তা ছিল না, উহাতে কোন বিছানাপত্রের ব্যবস্থা ছিল না; উহাতে ছিল শুধু মরুভূমির বালু বা কঁকর যাহা শুষ্ক হইলেই পাক গণ্য হয়।)

মল-মূত্রের দ্বার দিয়া কিছু বাহির হইলে?

আ'তা (রাঃ) তাবেয়ী বলিয়াছেন—মল বা মূত্র দ্বার দিয়া পোকা ইত্যাদি বাহির হইলে পুনঃ অজু করিতে হইবে। জাবের (রাঃ) ছাহাবী বলিয়াছেন—নামাযের মধ্যে হাসিলে নামায পুনরায় পড়িতে হইবে, অজু পুনঃ করিতে হইবে না।*

হাসান বছরী (রাঃ) বলিয়াছেন, চুল অথবা নখ কাটিলে অজু নষ্ট হইবে না। তিনি আরও বলিয়াছেন, মুসলমানগণ সব সময়ই (যুদ্ধের ময়দানে) যখন ইত্যাদি নিয়া নামায পড়িতেন। বহু আলেমগণ বলিয়া থাকেন, রক্ত বাহির হইলে অজু নষ্ট হয় না।† একজন আলেম, তাহার খুশর সহিত রক্ত দেখা গেল, তিনি নামায পড়িয়া লইলেন।× শিশু লাগাইলে ক্ষতস্থান ধুইলেই চলিবে, (গোসল করিতে হইবে না)।

১৩৬। হাদীছ :- আবু হোরাযরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মসজিদে বসিয়া নামাযের অপেক্ষা করিতে থাকে ঐ সময়টুকু তাহার জন্তু নামাযের মধ্যেই গণ্য করা হয়, যাবৎ সে অজু ভঙ্গ না করে। এক ব্যক্তি আবু হোরাযরা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, অজু ভঙ্গকারী কি জিনিস? তিনি বলিলেন, (যেমন) বায়ু বাহির হওয়া।

* কিন্তু সশব্দে জ্বোরে হাসিলে ইমাম আবু হানিফার মতে অজুও ভঙ্গ হইবে।

† যদি শুধু রক্ত দেখা যায় এবং উহা ক্ষতস্থান হইতে বহিয়া পড়ার মত না হয় তবে উহা দ্বারা অজু নষ্ট হইবে না, নতুবা ইমাম আবু হানিফার মতে অজু ভঙ্গ হইবে।

× খুশর সহিত অতি সামান্য রক্ত মিশ্রিত হইয়াছে, কিন্তু খুশু লালবর্ণ ধারণ করে নাই তবে অজু নষ্ট হইবে না, নচেৎ ইমাম আবু হানিফার মতে অজু ভঙ্গ হইবে।

অজুর সময় অন্তে পানি ঢালিয়া দেওয়া

১৩৭। হাদীছ :—মুগীরা (রাঃ) এক ছফরে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন ; রসুলুল্লাহ (দঃ) মল ত্যাগ করিয়া আসিয়া অজু করিলেন, মুগীরা (রাঃ) তাহাকে পানি ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। তিনি মুখ ও দুই হাত ধুইলেন, মাথা মছেহ করিলেন এবং চামড়ার মোজা পায়ে ছিল, উহার উপর মছেহ করিলেন।

অজু ছাড়া কোরআন শরীফ পড়া যায়

ইব্রাহিম নাখযী নামক বিশিষ্ট তাবেয়ী বলিয়াছেন, গোসলখানায় কোরআনের আয়াত পড়া যায় এবং বিনা অজুতে কোরআন শরীফের আয়াত সম্মিলিত বিষয় লিখিতে পারা যায়। তিনি আরও বলিয়াছেন, গোসলখানায় ভিতর কেহ উলঙ্গ অবস্থায় না থাকিলে তাহাকে সালাম করা যায়। অজুথায় সালাম করা চাই না।

উল্লিখিত পরিচ্ছেদের মূল মহআলাটি ১০৯ নং হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে। উক্ত হাদীছে আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিজা হইতে গভীর রাত্রে উঠিয়া দশটি আয়াত তেলাওত করিতেন।

বেহুশ না হইয়া মাথায় চক্র আসায় অজু নষ্ট হইবে না

১৩৮। হাদীছ :—আবু বকর রাডিয়াল্লাহু আনহুর মেয়ে আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এবদা সূর্য্যগ্রহণ হইল, আমি আমার ভগ্নি আয়েশার নিকট আসিয়া দেখিলাম—সকলেই নামায পড়িতেছেন। ঐ সঙ্গে আয়েশা (রাঃ)ও শরীক হইয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ব্যাপার? তিনি سبحان الله পড়িলেন এবং হাত দ্বারা আকাশের প্রতি ইশারা করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লার কুদরতের বড় নিদর্শন (প্রকাশের কারণে এই নামায)? তিনি ইশারায় বলিলেন, হাঁ। রসুলুল্লাহ (দঃ) নামায পড়াইতে ছিলেন; আমিও নামাযে শরীক হইলাম। হযরত (দঃ) অত্যধিক লম্বা নামায পড়াইলেন। (দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে) আমার মাথায় চক্র আসিয়া গেল, এমন কি আমি আমার পার্শ্ব একটি মশক হইতে মাথায় পানি দিতে লাগিলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) যখন নামায শেষ করিলেন তখন সূর্য্যগ্রহণ ছাড়িয়া গিয়াছিল। নামাযান্তে তিনি ওয়াজ করিলেন—আল্লার প্রশংসা ইত্যাদি করার পর বলিলেন, আল্লার সৃষ্টি যত কিছু আছে এই সময়ে সব কিছু আমাকে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এমনকি বেহেশত-দোখখও দেখান হইয়াছে এবং আমাকে অহী দ্বারা খবর দেওয়া হইয়াছে যে, তোমাদের প্রত্যেককে কবরের মধ্যে ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে—প্রত্যেককে কবরের মধ্যে (আমার প্রতি ইশারা করিয়া) প্রশ্নও করা হইবে—এই ব্যক্তির বিষয় কি জান? মোমেন ব্যক্তি বলিবে, তিনি

আল্লামার রসূল, তিনি মোহাম্মদ (দঃ) ; ছনিয়াতে আমাদের নিকট আল্লামার হুকুম-আহকাম ও হেদায়েত নিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছিলাম, তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলাম, তাঁহার আব্রুগত্য স্বীকার করিয়াছিলাম, তাঁহাকে সত্যবাদী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। তখন ঐ মৃত ব্যক্তিকে বলা হইবে, আরামে শুইয়া থাকুন ; প্রকৃত পক্ষেই আপনি তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছিলেন। আর যে মৃত ব্যক্তি মোনাফেক হইবে তাহাকে ঐরূপ প্রশ্ন করা হইলে সে বলিবে, আমি কিছুই বুঝি নাই, অস্বাভাবিক লোকদিগকে যাহা বলিতে শুনিয়াছিলাম, আমিও সেরূপ বলিয়াছিলাম। তখন ঐ মোনাফেকের উপর ভীষণ আক্রমণ আরম্ভ হইয়া যাইবে।

অজুর মধ্যে পূর্ণ মাথা একবার মছেহ করা এবং টাখনা পর্য্যন্ত পা ধোয়া

বিশিষ্ট তাবেয়ী সায়ীদ আবুল-মোছাইয়েব (রঃ) বলিয়াছেন, মেয়েলোকও পুরুষের স্থায় মাথা (একবারই) মছেহ করিবে !

১৩৯। হাদীছ :- এক ব্যক্তি আবুল্লাহ ইবনে যায়েদকে বলিল, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অজু ক্রীপে করিতেন তাহা আপনি দেখাইতে পারেন কি ? তিনি বলিলেন হাঁ, এই বলিয়া পানি আনাইলেন এবং হাতের উপর পানি ঢালিয়া দুইবার হাত ধোত করিলেন, তারপর তিনি কুল্লি করিলেন ও নাকে পানি দিলেন, তারপর মুখ ধুইলেন, দুই হাত দুইবার কনুই পর্য্যন্ত ধুইলেন, তারপর দুই হাত দ্বারা একবার মছেহ করিলেন—সম্মুখের দিক হইতে আরম্ভ করিয়া পেছনের দিকে গর্দান পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন এবং পিছন হইতে সম্মুখ দিকে ঐস্থান পর্য্যন্ত আনিলেন যেস্থান হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তারপর দুই পা টাখনা পর্য্যন্ত ধোত করিলেন।

মহআলাহ :- নারী-পুরুষ সকলের জন্যই অজুর মধ্যে মাথা মছেহ শুধু একবারই করা চাই ; বিভিন্ন হাদীছে শুধু একবার মছেহ করাই উল্লেখ আছে। সুতরাং একবারের বেশী করিবে না।

● জরীর ইবনে আবুল্লাহ (রাঃ) তাঁহার মেছওয়ারা ভিজান পানি দ্বারা অজু করিতে দিতেন।

অজুর ব্যবহৃত পানি অন্য কাজে ব্যবহার করা

১৪০। হাদীছ :- আবু জোহায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ছফরে একদা দ্বিপ্রহরে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদের সম্মুখে তশরীফ আনিলেন। তাঁহার জন্য অজুর পানি আনা হইল ; তিনি অজু আরম্ভ করিলেন। সকলে তাঁহার ব্যবহৃত পানি লইয়া শরীরে মলিতে লাগিল। নবী (দঃ) জোহরের নামায দুই রাকাত পড়িলেন,

আছরের নামাযও (কছর) ছই রাকাত পড়িলেন; নামাযের সময় তাঁহার সম্মুখে একটি লাঠি খাড়া করা হইয়াছিল।

১৪১। হাদীছ :- আবু মুছা (রা:) বলেন, য়েয়েররানা নামক স্থানে আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম, বেলাল (রা:)ও সঙ্গে ছিলেন। এক গ্রাম্য ব্যক্তি হযরতের (দ:) নিকট আসিয়া বলিল, আপনি আমাকে দান করিবার ওয়াদা করিয়া ছিলেন, এখনই উহা পূরণ করুন। নবী (দ:) বলিলেন, (সত্তরই উহা পাইবার) “সুসংবাদ গ্রহণ কর”, সে উত্তর করিল, “সুসংবাদ গ্রহণ কর” একথা আপনি বহুবার বলিয়াছেন। এই উত্তরে নবী (দ:) রাগান্বিত অবস্থায় আবু মুছা ও বেলালের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, সে সুসংবাদ ফেরত দিল, তোমরা গ্রহণ কর। আমরা আরজ করিলাম, নিশ্চয় আমরা গ্রহণ করিলাম। তারপর তিনি একটি পাত্র ভরিয়া পানি আনিতে বলিলেন; আমরা তৎক্ষণাৎ আনিলাম। তিনি (অজু করিতে) ঐ পাত্রের মধ্যেই হু-হাত ও মুখ ধুইলেন এবং উহার মধ্যেই কুল্লিও ফেলিলেন, (পানি বেশী ছিল না।) তারপর বলিলেন, তোমরা ছইজন এই পানি পান কর এবং মুখ ও সীনার উপর ঢাল; আর (ইহ-পরকালের সুখ শান্তির) সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমরা ঐরূপ করিলাম। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্ত্রী উম্মে-ছালমা (রা:) পর্দার আড়াল হইতে বলিলেন, তোমাদের মাতার (তথা আমার) জন্ত এই পানি একটু রাখিও; আমরা রাখিয়া দিলাম।

ঐরূপ ঘটনা অনেক দেখা গিয়াছে যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অজু করাকালে ছাহাবীগণ তাঁহার ব্যবহৃত পানি লইবার জন্ত ভীষণ ভীড় করিতেন।

১৪২। হাদীছ :- ছায়েব ইবনে এযীদ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার খালা আমাকে নিয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ (দ:)। এ আমার ভাগিনা, অসুস্থ। নবী (দ:) আমার মথার উপর হাত বুলাইলেন এবং বরকতের দোয়া করিলেন। তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া রহিলাম; এমতাবস্থায় তাঁহার ছই কাঁধের মধ্যস্থলে মোহরে-নবুওত দেখিতে পাইলাম—পাখীর ডিম্বের সমান।

স্ত্রীর সঙ্গে এক পাত্রে বা কোন মহিলার ব্যবহারের অবশিষ্ট পানি দ্বারা অজু করা

ওমর ফারুক (রা:) গরম পানির দ্বারা অজু করিয়াছেন এবং তিনি দরকার বশতঃ এক নাহরানী মেয়েলোকের ঘর হইতে পানি লইয়া অজু করিয়াছিলেন।

১৪৩। হাদীছ :- ইবনে ওমর (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায স্বামী-স্ত্রী এক পাত্রে অজু করিয়া থাকিত। (অথাৎ স্ত্রীলোক কোন পাত্রের পানি দ্বারা অজু করিলে অবশিষ্ট পানি পুরুষের জন্ত অজুর অন্ত্রপযোগী বিবেচিত হইবে না।)

অজুর ব্যবহৃত পানি নাপাক নহে

১৪৪। হাদীছ :— জাবের (রাঃ) বলেন আমি অশুষ্ক হইয়া বেহুশ অবস্থায় ছিলাম রসুলুল্লাহ ছালামুল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম আমাকে দেখিতে আসিলেন এবং অজু করিয়া ব্যবহৃত পানি আমার উপর ঢালিয়া দিলেন আমার হুশ ফিরিয়া আসিল। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আমার মীরাস কে পাইবে? আমার মাতা-পিতা বা কোন ছেলে-মেয়ে নাই। রসুলুল্লাহ ছালামুল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম কোন উত্তর দিলেন না। এই সময়ই মীরাসের আয়াত নাযিল হইল।

পাথরের, কাঠের বা পিতলের পাত্রে অজু করা

১৪৫। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা (হযরতের মজলিস সময়) নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইল; যাহাদের বাড়ী নিকটবর্তী ছিল তাহারা অজু করার জন্য বাড়ীতে চলিয়া গেল। কিছু লোক বাকী থাকিল, তাহাদের অজুর ব্যবস্থা ছিল না। রসুলুল্লাহ ছালামুল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে পাথরের একটি ছোট পাত্রে পানি হাজির করা হইল। পাত্রটি এতই ছোট ছিল যে, রসুলুল্লাহ ছালামুল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম উহার ভিতরে হাত ঢুকাইলেন, কিন্তু হাত মেলিতে পারিলেন না। তাহার অঙ্গুলির নীচ হইতে পানি উথলাইয়া উঠিতে লাগিল; সকলেই এই পানি দ্বারা অজু করিল। আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বলিলেন, আমরা আশি জন কিংবা আরও অধিক ছিলাম।

১৪৬। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে যারের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছালামুল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম আমাদের বাড়ীতে তশদীক আনিলেন, আমরা একটি পিতলের পাত্রে পানি হাজির করিলাম। হযরত (রাঃ) এই পানি দ্বারা অজু করিলেন। মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করিলেন এবং উভয় হাত কনুই পর্য্যন্ত দুই দুইবার ধুইলেন এবং মাথা সম্মুখ হইতে পিছনের দিক, পিছন হইতে সম্মুখের দিক মছেহ করিলেন, তারপর পা ধৌত করিলেন।

এক সের পরিমাণ পানি দ্বারা অজু করা

১৪৭। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালামুল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম প্রায় চারি সের পরিমাণ পানি দ্বারা গোসল করিতেন এবং প্রায় এক সের পানি দ্বারা অজু করিতেন।

১৪৮। হাদীছ :—সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালামুল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম চামড়ার মোজার উপর মছেহ করিতেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ওমর (রাঃ)কে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন, নিশ্চয়ই; সায়াদ (রাঃ) যাহা বর্ণনা করেন তাহা অন্য কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করিবার দরকার হয় না।

চামড়ার মোজার উপর মছেহ করা*

১৪৯। হাদীছ :— আমর ইবনে উমাইয়া (রাঃ) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে চামড়ার মোজার উপর এবং পাগড়ীর উপর মছেহ করিতে দেখিয়াছি †

১৫০। হাদীছ :—মুগীরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এক ছফরে ছিলাম, তাঁহাকে অজু করা ইবার সময় আমি তাঁহার চামড়ার মোজা খুলিবার জন্ত উত্তত হইলাম। তিনি বলিলেন, মোজা খুলিতে হইবে না, আমি অজু অবস্থায় ইহা পায়ে দিয়াছিলাম, এই বলিয়া হযরত (দঃ) মোজার উপর মছেহ করিলেন।

গোশত ইত্যাদি খাইলে অজু নষ্ট হয় না

আবু বকর (রাঃ), ওমর (রাঃ) এবং ওসমান (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ গোশত খাইয়া নূতন অজু করিতেন না। (গোশত খাওয়ার পূর্বের অজুতেই নামায পড়িতেন।)

১৫১। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রশূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদিন বকরীর গোশত খাইলেন এবং নূতন অজু না করিয়াই নামায পড়িলেন।

১৫২। হাদীছ :—আমর ইবনে উমাইয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—তিনি দেখিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বকরীর একটি ভুনা করা আন্তা রান হইতে ছুরি দ্বারা কাটিয়া খাইতেছিলেন, তাঁহাকে নামাযের জন্ত খবর দেওয়া হইলে তিনি উহা ফেলিয়া নামাযের জন্ত চলিয়া গেলেন, নূতন অজু করিলেন না।

১৫৩। হাদীছ :—মায়মুনা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা বকরীর রানের গোশত খাইয়া নামায পড়িলেন, নূতন অজু করেন নাই।

ছাতু, দুধ ইত্যাদি খাইয়া কুল্লি করা আবশ্যক,

পুনরায় অজু করিতে হইবে না+

১৫৪। হাদীছ :—সোয়ায়েদ ইবনে নোমান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রশূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খায়ববের যুদ্ধে যাইবার সময় উহার নিকটবর্তী ছাহাবা নামক স্থানে পৌছিয়া আছরের নামায পড়িলেন। নামাযান্তে প্রত্যেকেই নিজ নিজ

* আমাদের দেশীয় সূতি, নাইলন বা পশমী মোজার উপর মছেহ করা কোন প্রকারেই জায়েয নহে; তাহা করা হইলে অজু শুদ্ধ হইবে না এবং নামাযও হইবে না। চামড়ার মোজার উপর মছেহ করাও অনেকগুলি শর্ত সাপেক্ষে জায়েয হয়।

† মাথার যে এক চতুর্থাংশ মছেহ করা ফরজ তাহা মাথার উপর অবশ্যই করিতে হইবে, বাকী সম্পূর্ণ মাথা মছেহ করা যাহা মোস্তাহাব তাহা পাগড়ীর উপর হইতে পারে।

+ উক্ত দুইটি শিরোনাম এই জন্ত দেওয়া হইয়াছে যে, কোন কোন হাদীছে বর্ণিত আছে, অগ্নিস্পর্শিত বস্তু খাইলে বা পান করিলে অজু ভঙ্গ হইয়া যায়; সুতরাং এইখানে দেখানো হইল যে, প্রকৃত পক্ষে অজু ভঙ্গ হয় না। হাঁ—পুনরায় অজু করিয়া লওয়া মোস্তাহাব।

খাবার বস্তু বাহির করিতে বলিলেন। সকলেই ছাত্তু আনিল এবং সব এক সঙ্গে পানি দ্বারা গোলা হইল; রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খাইলেন এবং সকলেই খাইল। তারপর হযরত (দঃ) মাগরিবের নামাযের জন্ত তৈয়ার হইলেন এবং শুধু কুল্লি করিয়া নামায পড়িলেন, নূতন অজু করিলেন না।

১৫৫। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দুই পান করিয়া কুল্লি করিলেন, অতঃপর বলিলেন, ইহা তৈলাক্ত বস্তু। (সেই জন্ত উহা পান করিয়া কুল্লি করা আবশ্যক)।

নিজ্রায় অজু ভঙ্গ হয়, তন্দ্রায় অজু নষ্ট হয় না

১৫৬। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কাহারও যদি নামাযের মধ্যে তন্দ্রা আসে তবে নামায স্থগিত রাখিয়া নিজ্রা যাওয়া উচিত। কারণ, তন্দ্রাবস্থায় নামায পড়িলে কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিবে না, এমনকি এস্তেগফার করিতে অর্থাৎ গোনাহ মাফ চাহিতে যাইয়া হয় তো বদ-দোয়ার শব্দ মুখে আসিয়া যাইবে। (কারণ তন্দ্রাবস্থায় পূর্ণ হুশ-জ্ঞান বহাল থাকে না।)

১৫৭। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কাহারও তন্দ্রা আসিলে শুইয়া পড়া উচিত। (পূর্ণ হুশ ফিরিয়া আসে এবং কি বলিতেছে তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারে—এইরূপ অবস্থা লইয়া নামায পড়া চাই।

মছআলাহ :—যদি বসা বা দাঁড়ান অবস্থায় তন্দ্রা আসিয়া শুধু মাথা নড়াচড়া করে কিম্বা নামাযে রুকু সেজদা অবস্থায় তন্দ্রা আসে, কিন্তু হাত-পা টিলা হইয়া রুকু সেজদার ছন্নত আকার ভাঙ্গিয়া না পড়ে তবে অজু নষ্ট হইবে না।

শোয়া অবস্থায় তন্দ্রা আসিলে অজু ভঙ্গ হইবে। অবশ্য যদি এত হালকা তন্দ্রা হয় যে, নিকটের কথাবার্তা অধিকাংশই শুনিয়া ও বুঝিয়া থাকে, তবে অজু নষ্ট হইবে না। কিন্তু অনেক সময় শোয়া অবস্থায় মাহুয তাহার তন্দ্রাকে হালকা মনে করে, অথচ তাহার উপর এমন মুহূর্তও গিয়াছে যখন তাহার তন্দ্রা গাঢ় হইয়াছিল, কিন্তু অল্প সময় ঐরূপ ছিল বলিয়া উহা তাহার লক্ষ্যে আসে নাই—এরূপ ক্ষেত্রে অজু ভঙ্গ হইবে; সুতরাং সতর্কতা অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। (শামী, ১—১৩২)

অজু ভঙ্গ না হইলেও পুনঃ নূতন অজু করা*

১৫৮। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের সময়ই অজু করিতেন। আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনারা (ছাহাবীগণ) কিরূপ করিতেন? তিনি বলিলেন, আমরা সাধারণতঃ এক অজু ভঙ্গ হইলেই নূতন অজু করিতাম।

প্রশ্রাবের ছিটা-ফেঁটা হইতে সতর্ক না থাকা কবীরা গোনাহ

১৫৯। হাদীছ :- ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি বাগানের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তথায় তিনি দুইটি কবরের মধ্য হইতে কবরবাসীদের বিকট চীৎকারের শব্দ শুনিতে পাইলেন; তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইতেছিল। তিনি বলিলেন, ঐ কবরবাসীদেরকে আজাব করা হইতেছে; তাহা যদিও কোন কঠিন কাজের জন্ত নয়, তবে গোনাহ অতি বড় ছিল। এক ব্যক্তি প্রশ্রাব হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিত না।+ দ্বিতীয় ব্যক্তি চোগলখোরী (গোপনে কাহারও বিরুদ্ধে লাগানো-কাজ) করিত। এই বলিয়া তিনি একটি খেজুর ডালা দুই খণ্ড করিয়া দুই কবরে গাড়িয়া দিলেন। এক ব্যক্তি আরজ করিল, এরূপ কেন করিলেন? হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি আশা করি ডালা দুইটি শুক না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের আজাব আল্লাহ তরফ হইতে লাঘব করা হইবে।

মছআলাহ :- প্রশ্রাবের পরে পানি ব্যবহার করা আবশ্যিক। (৩৫ পৃ: ১১৭ হাঃ)

মধ্যভাগে কাহারও প্রশ্রাব বন্ধ করাইবে না

১৬০। হাদীছ :- আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক বেহুইনকে দেখিলেন, মসজিদের কিনারায় প্রশ্রাব করিতেছে; আর লোকেরা তাহাকে তিরস্কার করিতেছে এবং তাহার প্রতি ছুটিয়া যাইতেছে। নবী (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, তাহার প্রশ্রাব বন্ধ করিও না, তাহাকে তাহার অবস্থার উপর ছাড়। সে প্রশ্রাব শেষ করিলে পর নবী (দঃ) এক ডোল পানি আনাইয়া ঐ প্রশ্রাবের উপর বহাইয়া দিলেন।

ব্যাখ্যা :- হঠাৎ মধ্যভাগে প্রশ্রাব বন্ধ করাইলে অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্রাব বন্ধের রোগ হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন সে ঐ অবস্থায় উঠিয়া দৌড়িলে মসজিদের অধিক স্থান নাপাক হইবে।

মসজিদের খালি মাটিতে প্রশ্রাব করা হইলে

১৬১। হাদীছ :- আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক বদু (বেহুইন) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে আসিয়া এক কোণে প্রশ্রাব করিতে লাগিল; ইহাতে সকলেই তাহাকে ধমক দিতে আরম্ভ করিল। নবী (দঃ) তাহাদিগকে এরূপ করা

* এক অজু দ্বারা কোনও এবাদত না করিয়া নূতন অজু করায় বাধা আছে, তবে ইহা—কোন এবাদত করার পর ঐ অজু নষ্ট না হইলেও নূতন অজু করা যার, বরং নূতন নূতন অজু দ্বারা প্রত্যেক ওয়াক্তের নামায পড়া উত্তম। তবে নূতন অজু না করিয়া পুরাতন অজু দ্বারাও নামায পড়া যায়; ১৫৪নং হাদীছে উহার বর্ণনা রহিয়াছে।

+ প্রশ্রাবের পর টিলা-কুলুখ ব্যবহার সরাসরিক্রমে যদিও কোন ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত না হয়, তথাপি বর্তমানে নানাপ্রকার দৈহিক ও স্নায়বিক দুর্বলতার যুগে এই হাদীছের সতর্কবাণীর দ্বারাই উহা ব্যবহারের আবশ্যিকতা প্রমাণিত হয়।

হইতে বিরত রাখিলেন এবং বলিলেন, এই অবস্থায় তাহাকে বাধা দিও না। প্রস্রাব শেষ করার পর তিনি বেছাইনটিকে নিকটে ডাকিয়া আনিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, মসজিদ-সমূহ আল্লার জেকের, নামায ও কোরআন তেলাওয়াতের স্থান; ইহাতে মল-মুত্রাদি ত্যাগ করার অবকাশ নাই। অতঃপর ছাহাবীগণকে আদেশ করিলেন, এক ডোল পানি আনিয়া এই স্থানে ঢালিয়া দাও। তোমরা (মুসলিম জাতি) জগৎবাসীর প্রতি উদারতার আদর্শরূপে আবির্ভূত হইয়াছ; কর্কশ ব্যবহারের জ্ঞান নয়। তারপর এক ডোল পানি এই স্থানে বহাইয়া দেওয়া হইল।

শিশুর প্রস্রাবও ধোত করিতে হইবে

১৬২। হাদীছ :-আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে এক ব্যক্তি একটি কচি শিশু লইয়া হাজির হইল। (হযরত (দঃ) শিশুটিকে কোলে লইলেন) সে হযরতের কাপড়ে প্রস্রাব করিয়া দিল। হযরত (দঃ) পানি আনাইলেন এবং প্রস্রাবের স্থানটুকুতে পানি ঢালিয়া দিলেন।

১৬৩। হাদীছ :-উম্মে-কায়স নাম্নী মহিলা দুধপোষ্য ছেলেকে লইয়া নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিল। নবী (দঃ) শিশুটিকে কোলে বসাইলেন, সে তাঁহার কাপড়ে প্রস্রাব করিল। তিনি পানি আনাইয়া মামুলীভাবে উহা ধুইলেন। অধিক তৎপরতার সহিত ধুইলেন না।

প্রয়োজনে কোন ব্যক্তিকে নিকটে রাখিয়া প্রস্রাব করা

১৬৪। হাদীছ :-হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমি একদিন হযরত রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে চলিতেছিলাম। তিনি মহল্লার আবর্জনা ফেলিবার স্থানের নিকটে আসিয়া একটি দেওয়ালমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিলেন। আমি দূরে সরিয়া যাইতেছিলাম, তিনি আমাকে ইশারা করিয়া ডাকিলেন; আমি নিকটে হাজির হইয়া তাঁহার (পিঠের প্রতি পিঠ দিয়া বিপরীতমুখী) পায়ের নিকটবর্তী দাঁড়াইয়া রহিলাম। (সম্মুখ দিকের পর্দা ছিল দেওয়াল এবং পিছন দিকে হোযায়ফা (রাঃ)কে দাঁড় করাইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) পর্দার ব্যবস্থা করিলেন; দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করার দরুণ কাপড় একটু বেশী উঠিলে।)

(ওজর বশতঃ) দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করা

১৬৫। হাদীছ :-আবু যুহা (রাঃ) প্রস্রাবের সময় অতি মাত্রায় সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। (এমনকি প্রস্রাবের সূক্ষ্ম ছিটা হইতে বাঁচিবার জ্ঞান তিনি বোতলে প্রস্রাব করিতেন।) হোযায়ফা (রাঃ) বলিলেন, সতর্কতা অবলম্বনের সীমা অতিক্রম না করাই উত্তম। আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে দেখিয়াছি, লোকদের আবর্জনা ফেলিবার স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিলেন।

(উপরের হাদীছ এবং এই হাদীছ উভয় হাদীছে হযরতের একই ঘটনা।)

ব্যাখ্যা :—এ একবারই মাত্র হযরত রশূল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন বিশেষ ওজর বশতঃ দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিয়াছিলেন ; নতুবা তিনি সর্বদাই বসিয়া প্রস্রাব করিতেন। তিরমিযি ও নাছায়ী শরীফের হাদীছে আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি কেহ এরূপ বলে যে, রশূল্লাহ (দঃ) দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিতেন, তবে সে মিথ্যাবাদী। রশূল্লাহ (দঃ) সর্বদাই বসিয়া প্রস্রাব করিতেন। তিরমিযি ও ইবনে মাজা শরীফের আর একটি হাদীছে আছে—ওমর (রাঃ) বলেন, আমি একদিন দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিতেছিলাম, হযরত রশূল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইহা দেখিয়া আমাকে সতর্ক করিয়া দিলেন—হে ওমর! দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিও না। অতঃপর আমি আর দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করি নাই। ছাহাবী ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন—দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করা ইসলামী রীতি ও শভ্যতার পরিপন্থী।

ইমাম বোখারী (রঃ) এই ১৬৫নং হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, অশ্বের জায়গায় বিনা অনুমতিতে প্রস্রাব বরা যায় যদি এরূপ জায়গা হয় যেখানে প্রস্রাব করায় সাধারণতঃ আপত্তি হয় না।

কোন স্থানে রক্ত লাগিলে উহা ধুইতে হইবে

১৬৬। হাদীছ :—আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একটি নারী হযরত নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হায়েজের রক্ত কাপড়ে লাগিলে কি করিতে হইবে? নবী (দঃ) বলিলেন, প্রথমে উহাকে নখ দ্বারা আঁচড়াইয়া ফেলিবে; তারপর ঐ স্থানটি পানি দ্বারা মর্দন করিয়া ধোত করিবে; এরূপ করিলে ঐ কাপড় দ্বারা নামায পড়িতে পারিবে।

কাপড়ে বীৰ্য্য লাগার স্থান ধুইয়া শুষ্ক

হওয়ার পূর্বে নামায পড়া

১৬৭। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কাপড় হইতে বীৰ্য্য ধুইয়া ফেলিতাম এবং ঐ ভিজা স্থান শুষ্ক হইবার পূর্বেই নবী (দঃ) ঐ কাপড় পরিধান করিয়া নামায পড়িতে যাইতেন।

উট, বকরী ইত্যাদি হালাল জানোয়ারের প্রস্রাব*

মছআলাহ :—অধিকাংশ ইমামগণের মতে হালাল পশুর মূত্র ও উহার মলের স্থায় নাপাকই বটে, অতএব উহা হারাম পরিগণিত; যাতে বা পানীয়ে উহার কিঞ্চিৎও যদি

* এই পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হাদীছ সমূহের দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হয় না যে, হালাল জানোয়ারের মল-মূত্র পাক। এতদ্ভিন্ন হাদীছে এরূপ বিবরণও আছে, যদ্বারা হালাল ও হারাম সমস্ত জানোয়ারেরই মল ও মূত্র উভয়ই নাপাক বলিয়া প্রমাণিত হয়।

মিশ্রিত হয় তবে সেই খাণ্ড ও পানীয় হারাম নাপাক হইয়া যাইবে। অবশ্য উহা ঔষধরূপে ব্যবহার সম্পর্কে বিধান উহাই যাহা হারাম বস্তু ঔষধরূপে ব্যবহারের জন্ত শরীয়তে বিজ্ঞমান রহিয়াছে।

ঐ মল-মূত্র যদি মাটিতে পড়ে এবং সেই মল-মূত্রের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া মাটি শুক হইয়া যায়, মল-মূত্রের রং বা গন্ধ মাটির মধ্যে মোটেই না থাকে তবে সেই মাটির উপর কোন বিছানা ছাড়াও নামায শুদ্ধ হইবে। আর যদি মল-মূত্রের অস্তিত্ব বা রং-গন্ধ মাটিতে বিজ্ঞমান থাকে তবে সেই মাটি নাপাক; উহার উপর বিছানা ছাড়া নামায শুদ্ধ হইবে না। অবশ্য উহার উপর পাক বিছানা বিছাইয়া নিলে বিছানার উপর নামায শুদ্ধ হইবে। কিন্তু নাপাক সমাবেশিত স্থানে নামায পড়া মকরুহ (শামী, ১—৩৫৩ দ্রষ্টব্য)। অতএব অতি বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে এইরূপ স্থানে নামায না পড়িয়া অন্যস্থানে নামায পড়াই শ্রেয় ও কর্তব্য।

উট-বকরি ইত্যাদি হালাল পশুর মল-মূত্র এবং ঘোড়ার শুষ্ক মূত্র সম্পর্কে এবং তাহাও কেবল কাপড়ে বা শরীরে লাগিবার ব্যাপারে একটি বিশেষ বিবরণ আছে যে—উহা এমন নাপাক যাহাকে শরীয়তের পরিভাষায় নাজাছাত-খফিফা বলা হয়। এই নাপাক শরীরের যেই অঙ্গে লাগে; যেমন—হাতে, পায়ে, মাথায় বা পিঠে। কিম্বা কাপড়ের যেই অংশে লাগে; যেমন—হাতায় বা সম্মুখের বা পেছনের অংশে; সেই অঙ্গের বা অংশের চতুর্থাংশের কম পরিমাণের হইলে উহা না ধুইয়া নামায শুদ্ধ হইবে। অবশ্য উহাকে না ধুইয়া নামায পড়িতে থাকিলে নামায মকরুহ হইবে (বেহেশতী জেওর, ২—২)। উহা ধুইয়া ফেলা উত্তম (শামী, ১—২৯১)।

ছাহাবী আবু মুছা (রাঃ) একবার ছফরের সময় রাস্তায় ডাক বিভাগের বাংলায় নামায পড়িলেন; তথায় ডাকবাহী ঘোড়া বাঁধা হইত; (সেখানে উহার মল-মূত্র থাকা সম্ভব ছিল; এতদসত্ত্বেও তিনি ঐস্থানে নামায পড়িলেন।) নিকটেই খোলা ময়দান ছিল, তথায় যাওয়া আবশ্যক মনে করিলেন না; বলিলেন, এখানে কিম্বা ওখানে নামায পড়া একই বরাবর।

১৬৮। হাদীছ :— আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনায় আসিয়া প্রথম প্রথম—মসজিদ তৈয়ারীর পূর্বে (দরকার বশতঃ সময় সময়) বকরী রাবিবার ঘরেও নামায পড়িতেন।

ব্যাখ্যা :—এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, আজকাল রেলগাড়ী ও জাহাজ ইত্যাদিতে ভ্রমণ করার সময় অনেক লোককে দেখা যায় যে, কোনও উত্তম উপযুক্ত স্থান না পাওয়ার অজুহাতে নামায কাজা করিয়া ফেলে; ইহা শয়তানী খোকা মাত্র। কারণ, উক্ত হাদীছ ও ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অবস্থা ভেদে যখন যেকোন

স্থান পাওয়া সম্ভব হয় তখন সেখানেই নামায পড়িতে দ্বিধা করা উচিত নহে, যাবৎ স্থানটি নাপাক প্রমাণিত না হয়।

পানি, মৃত ইত্যাদিতে নাপাক পড়িলে ?

ইমাম যুহরী বলিয়াছেন, নাপাক বস্তুর দ্বারা পানির স্বাদ, গন্ধ বা রং পরিবর্তিত না হইলে পানি নাপাক হইবে না। তিনি আরও বলিয়াছেন, আমি বহু আলেমকে দেখিয়াছি—তাহারা মৃত হাতী প্রভৃতির হাড়ি দ্বারা চিকুণী, তৈলের বাটি ইত্যাদি তৈয়ার করিয়া ব্যবহার করিতেন।

ইবনে ছীরীন (রাঃ) বলিয়াছেন, মৃত হাতীর দাঁড়ের ব্যবসা করা দুঃখীয় নয়। ইমাম হাম্মাদ বলিয়াছেন, মৃত জানোয়ারের পশম পাক।

১৬৯। হাদীছ :—মায়মূনা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছালালাহ আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, ঘূতের মধ্যে ইতর পড়িলে কি করিতে হইবে ? হযরত (রাঃ) বলিলেন, ইতরটি ফেলিয়া দিয়া উহার চতুর্পার্শ্বের ঘূত ফেলিয়া দাও, বাকী ঘূত খাইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা :— ইহা জমাট ঘূতের মছমালাহ; উক্ত মছমালা কেবলমাত্র জমাট ঘূতের বেলায়ই প্রযোজ্য। কেননা, তরল ঘূতের চারি পার্শ্ব হইতে ঘূত ফেলিবার উপায় নাই।

অপ্রবাহিত বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করা

১৭০। হাদীছ :— আবু হোরায়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছালালাহ আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বদ্ধ পানিতে কেহ প্রস্রাব করিও না কেননা, উহাতে গোসল ইত্যাদি করিতে হইবে।

নামাযরত অবস্থায় শরীরে নাপাক বস্তু পতিত হইলে *

১৭১। হাদীছ :— আবু হুলাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছালালাহ আলাইহে অসাল্লাম কাবা শরীফের নিকট নামায পড়িতেছিলেন। হুট্ট আবু জাহল

এ বিষয়ে অধিকাংশ ইমামগণের মত এই যে, পানি কম হইলে সামান্ততম নাপাকির দরুনও উহা নাপাক হইয়া যাইবে, যদিও নাপাক বস্তুর কোন নিদর্শন পানির মধ্যে প্রকাশিত না হইয়া থাকে। অবশ্য পানি বেশী বা প্রবাহমান হইলে সে স্থলে নাপাক বস্তুর নিদর্শন পানির মধ্যে প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত পানি নাপাক হইবে না।

• আবু হানিফা, শাফেয়ী, আহমদ, মালেক প্রমুখ ইমামগণের সকলের মতই এই যে, নামাযের সময় নাপাকির সংস্পর্শ ঘটিলেই নামায ফাছেদ হইয়া যাইবে, ঐ নাপাকি দূর করিয়া পুনরায় নামায পড়িতে হইবে। কারণ হাদীছের মধ্যে স্পষ্ট উল্লেখ করা হইয়াছে—“পাক হওয়া ব্যতীত নামায হইতে পারে না।” কিন্তু এখানে উল্লেখিত হাদীছে যে ঘটনাটি বর্ণনা করা হইয়াছে উহা ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনা। ইহার পর শরীয়তের হুকুম-আহকামে অনেক রদ-বদল হইয়াছে, যেমন—প্রথমে নামাযের মধ্যে কথা বলা জায়েয ছিল, পরে উহা মনুখ (রহিত) হইয়াছে।

ও তাহার সান্নিপাত্তরা নিকটেই বসিয়া ছিল। হঠাৎ তাহাদের মধ্য হইতে কেহ বলিয়া উঠিল, অমুক মহল্লায় আজ উট জবেহ করা হইয়াছে; ঐ উটের নাড়িভূঁড়িগুলি আনিয়া মোহাম্মদ যখন সেজদায় যায়, তখন তাহার পিঠের উপর কে রাখিয়া দিতে পারিবে? তাহাদের মধ্যে সব চাইতে বড় হতভাগা ও দুষ্ট প্রকৃতির যে লোকটি ছিল, সে ঐ অপকর্মের জন্য অগণী ও উত্তম হইয়া অবিলম্বে উটের নাড়িভূঁড়ি লইয়া আসিল এবং যখন দেখিল, রশুলুল্লাহ (দঃ) সেজদায় গিয়াছেন, তখন উহা তাঁহার পিঠের উপর রাখিয়া দিল। আবুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আমি সমস্ত ঘটনা স্বক্ষে দেখিতেছিলাম, কিন্তু উহাতে বাধা দানের কোন শক্তি ও সুযোগ আমার ছিল না। হতভাগারা ঐ দ্বন্দ্ব করিয়া হাসিয়া একে অশ্বের উপর লুটোপুটি খাইয়া পড়িতেছিল। রশুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তখনও সেজদাতেই ছিলেন, (জুলুমের দৃশ্য এত বড় ভারী বোঝা হইতে তিনি) মাথা উঠাইতে ছিলেন না। ফাতেমা যোহরা (রাঃ) এই সংবাদ পাইয়া দৌড়িয়া আসিলেন এবং আতুড়ীটা হযরতের পিঠের উপর হইতে ফেলিয়া দিলেন। রশুলুল্লাহ (দঃ) তখন সেজদা হইতে মাথা উঠাইয়া বলিলেন, “হে আল্লাহ। কোরায়েশদিগকে ধ্বংস কর; এইরূপে তিনবার অভিশাপ দিয়া কয়েকজন লোকের নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন, “হে আল্লাহ। আবু জাহলকে ধ্বংস কর, ওংবা ইবনে রবিয়াকে ধ্বংস কর, শায়বা ইবনে রবিয়াকে ধ্বংস কর, ওলীদ ইবনে ওংবাকে ধ্বংস কর, উমাইয়া ইবনে খালাফকে ধ্বংস কর, ওংবা ইবনে আবি মোয়াইতকে ধ্বংস কর, (ওমারাহ ইবনে ওলীদকে ধ্বংস কর। এই) সপ্তম ব্যক্তির নামও উল্লেখ করিয়াছেন।” আবুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) শপথ করিয়া বলিতেছেন, রশুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাদের নামে অভিশাপ করিয়াছেন, বদরের যুদ্ধে তাহাদের প্রত্যেককেই আমি ধ্বংসাবস্থায় একটি গর্তে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি, যেখানে অগ্ন্যস্ত্র কাকেরদেরও লাশ স্তম্ভীকৃত ছিল।

থুথু ও কফ লাগিলে কাপড় নাপাক হইবে না

১৭২। হাদীছ :- আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদিন হযরত রশুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মসজিদের সম্মুখস্থ দেওয়ালের মধ্যে কফ দেখিতে পাইয়া অত্যধিক রাগান্বিত হইলেন এবং স্বয়ং উঠিয়া যাইয়া নিজ হাতে উহা পরিষ্কার করিলেন এবং বলিলেন, প্রত্যেক নামাযী ব্যক্তি নামায অবস্থায় স্বীয় পালনকর্তার সহিত মোনাজাত ও কথাবার্তায় রত হয় এবং তাহার প্রভু-পওয়ারদেগার যেন সম্মুখে রহিয়াছেন। অতএব

† ঐ সকল ব্যক্তি ইসলামের প্রধান শত্রু ও উক্ত ঘটনার সহিত বিশেষভাবে জড়িত ছিল। রশুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে তাহার অতি প্রিয় বস্ত্র নামাযের মধ্যে বাধাদান ও বিরক্ত করায় তিনি প্রাণে ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হন এবং এই জঘন্যই তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। নতুবা সর্বদাই তাহাকে উৎপীড়ন করা হইত; কিন্তু তিনি এত কঠোর আর কখনও হন নাই।

কেবলার দিকে কখনও থুথু ফেলিবে না। থুথু ফেলার বিশেষ প্রয়োজন হইলে বাম দিকে বা বাম পায়ের নীচে ফেলিবে ঐ কিসা (চাদর ইত্যাদি) কাপড়ের কিনারায় থুথু ফেলিয়া মলিয়া দিবে। (৫৮ পৃঃ)

কোন প্রকার মাদকীয় বস্তু দ্বারা অজ্ঞ হইবে না

১৭৩। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে সমস্ত পানীয় বস্তুর মধ্যে মাদকতা থাকিবে উহা সবই হারাম।

প্রয়োজনে নারী স্বীয় পিতার শরীর স্পর্শ করিতে পারে

আবুল আলীয়া নামক বিশিষ্ট তাবেয়ী উহার পায়ে ব্যথা হইলে তিনি স্বীয় পুত্র-কঙ্কাগণকে আদেশ করিলেন, আমার পা মালিশ কর, ব্যথা হইতেছে।

১৭৪। হাদীছ :—ছাহাবী ছাহল (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল—(ওহোদ বর্ণাঙ্গণে) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আহত হইবার পর উহাকে কি বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা হইয়াছিল? তিনি বলিলেন, এবিষয়ে আমার চাইতে অধিক জ্ঞাত এখন আর কেহ নাই। আলী (রাঃ) ঢালের মধ্যে করিয়া পানি আনিতেছিলেন এবং ফাতেমা যোহরা (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখমণ্ডল হইতে রক্ত ধুইয়া ফেলিতেছিলেন। যখন দেখিলেন, রক্ত বন্ধ হইতেছে না, তখন চাটাই পোড়াইয়া উহার ভস্ম ক্ষতস্থানে ভরিয়া দেওয়া হইল।

মেছওয়াক করা

১৭৫। হাদীছ :—আবু মুছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম, তিনি মেছওয়াক করিতেছিলেন এবং (জিহ্বা পরিষ্কার করিতে মেছওয়াক জিহ্বার উপর চালানোর দরুণ) “ওঃ ওঃ”—শব্দ করিতেছিলেন।

১৭৬। হাদীছ :—হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রাতে তাহাজ্জুদের জন্ত উঠিয়া মেছওয়াক দ্বারা মুখ ভালরূপে পরিষ্কার করিতেন।

১৭৭। হাদীছ :—আবু হুলাইলা ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আমি মেছওয়াক করিতেছি; এমন সময় দুই ব্যক্তি আমার নিকট উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে একজন অধিক বয়স্ক ও অপর জন অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক। আমি আমার মেছওয়াকখানা অল্প বয়স্ক ব্যক্তিকে দিলাম। আমাকে আদেশ করা হইল মেছওয়াকটি অধিক বয়স্ক ব্যক্তিকে দান করুন। (সে দুইরকি, তাই মেছওয়াকের ত্রায় সম্মানিত বস্তু তাহারই প্রাপ্য। নবীর স্বপ্ন অহী; যদ্বারা মেছওয়াক সম্মানিত বস্তু বলিয়া প্রমাণিত হইল।)

ও যেই মসজিদের জমিন পাকা নয় এবং বিছনা ইত্যাদির ব্যবস্থা নাই সেইরূপ স্থানেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব।

অজ্ঞ অবস্থায় শয়ন করার ফজিলত

১৭৮। হাদ্দী :—বরা ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যখন তুমি শয়নের জন্য প্রস্তুত হইবে, তখন নামাযের অজ্ঞ হায অজ্ঞ করিয়া লও, তারপর ডান পার্শ্বের উপর শুইয়া পড় এবং এই দোয়া পাঠ কর—

اَللّٰهُمَّ اَسَلْتُكَ نَفْسِيْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِيْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ
وَالْجَاثُ ظَهَرِيْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجَا وَلَا مُنْجَا مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ
اَللّٰهُمَّ اَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ *

এইরূপ শয়ন অবস্থায় মৃত্যু হইলে, তাহার জন্য সুসংবাদ যে, পরগাম্বরগণের সুমত ভরীকার উপর তাহার মৃত্যু হইল, কিন্তু শর্ত এই যে, উক্ত দোয়াটি নিদ্রা-পূর্বের শেষ বাক্য হওয়া চাই। (অর্থাৎ এই দোয়া পড়ার পর ছনিয়াদারীর কোন কথা নিদ্রার পূর্বে বলিবে না।) বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন—এই দোয়াটি দিফা করিয়া আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে শুনাইতেছিলাম এবং بِنَبِيِّكَ এর স্থলে আমি بِرَسُولِكَ পড়িলাম। নবী (দঃ) বাধা দিয়া বলিলেন—بِنَبِيِّكَ বল (১৩৪ পৃঃ)।

দোয়াটির অর্থ :—হে আল্লাহ! আমার জীবনকে তোমার নিকট সমর্পণ করিলাম, আমার গতি ও লক্ষ্য তোমারই প্রতি নিবদ্ধ করিলাম, আমার সর্বস্ব তোমার নিকট সোপর্দ করিলাম এবং তোমার নেয়ামতের প্রতি আকাঙ্ক্ষিত ও তোমার আজাবের ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া তোমারই উপর ভরসা স্থাপন করিলাম; তোমার আজাব হইতে নাজাত ও রক্ষা পাইবার আশ্রয়স্থল তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রেরিত কিতাব এবং তোমার নিয়োজিত নবীর প্রতি ঈমান আনিয়াছি।

* দোয়াটির উচ্চারণ এই :—আল্লাহুমা আছলান্নু নফ্‌সী ইলাইকা ওয়া ওয়াজ্জাহু ওয়াজ্‌হী ইলাইকা, ওয়া-ফাওয়াযু আম্রী ইলাইকা, ওয়া আল্‌জা'তু জাহরী ইলাইকা, রাগবাতাও ওয়া রাহবাতান ইলাইকা; লা-মাল্‌জাআ ওয়ালা-মান্‌জাআ মিন্‌কা ইল্লা ইলাইকা, আল্লাহুমা আমান্নু বে-কিতাবেকাল্লাহী আনযাল্‌তা ওয়া বেনাযিয়ে কাল্লাহী আরহাল্‌তা।

চতুর্থ অধ্যায়

গোসল

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে দুই স্থানে জানাবাতের গোসলের আদেশ বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—ছুরা নেছায় এবং ছুরা মায়েদায়। বোখারী (র:) প্রথমে ছুরা মায়েদার (৬ পারা ৬ রুক) আয়াতটির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন—

وَأَنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا.....

(নিম্নস্তরের অপবিত্রতা দূর করার জন্য মুখমণ্ডল, উভয় হাত কনুই পর্য্যন্ত ও পা ধৌত করা এবং মাথা মছেহ করা, এইরূপে অজুর্ বর্ণনা করিয়া আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে মোমেনগণ!) “হার যদি তোমরা জানাবাত (শুক্লঅলনে অপবিত্রতা) যুক্ত হইয়া পড় তবে তোমরা (সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করতঃ গোসল করিয়া) বিশেষরূপে তাহারাত ও পবিত্রতা হাসিল কর। অবশ্য যদি তোমরা রুগ্ন হও বা পথিক হও এবং তদবস্থায় অজু বা গোসলের আবশ্যকতার সম্মুখীন হও—মখচ পানি ব্যবহারে বা সংগ্রহে অক্ষম হইয়া পড়, তবে মুখ ও হাত মছেহ করতঃ তায়াম্মুম করার জন্য মাটি ব্যবহার কর।” উক্ত আদেশাবলী দেওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা বলেন—

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ -

অর্থঃ—(এ সমস্ত—অজু, গোসল ও তায়াম্মুম ইত্যাদির আদেশ জারি করিয়া) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর কষ্ট-ক্লেশের বোঝা চাপাইতে চান না, বরং তোমাদিগকে পাক-পবিত্র করার ইচ্ছা করেন এবং (ছুরিয়া ও আখেরাতের সর্বশ্রেষ্ঠ) নেয়ামত (তথা দ্বীন-ইসলাম)কে পূর্ণ করিতে চান, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাক। ছুরা নেছার (৫ পারা ৪ রুক) আয়াতটি এই—

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا -

“জানাবাত অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তীও হইবে না যাবৎ গোসল না করা।”

গোসলের পূর্বে অজু করা

১৭৯। হাদীছ : আয়েশা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরজ গোসল করিতে প্রথমে দুই হাত ধৌত করিতেন, তারপর নামাযের অজু হায়ে অজু

১৯২

করিতেন, তারপর হাত পানিতে ভিজাইয়া উহা দ্বারা চুলের গোড়া খেলাল করিতেন। যখন মনে করিতেন যে, চুলের নীচের চামড়া ভালরূপে ভিজিয়াছে তখন তিন কোশ পানি মাথায় ঢালিতেন, তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালিতেন।

এখানে ১৮৬ নং হাদীছখানাও ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন।

স্বামী-স্ত্রী একত্রে গোসল করা

১৮০। হাদীছ :— উম্মুল-মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এবং হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একত্রে এক পাত্র হইতে গোসল করিতাম; আমরা একের পর অণ্ডে উহাতে হাত প্রবেশ করিয়া পানি উঠাইতাম। পাত্রটি কাঠের তৈরী ছিল যাহার মধ্যে প্রায় ১২ সের পানি সঙ্কুলান হইত।

১৮১। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং উম্মুল-মোমেনীন মাগুনুনা (রাঃ) এক সঙ্গে একই পাত্র হইতে গোসল করিতেন।

গোসলের পানির পরিমাণ

১৮২। হাদীছ :— আবু সালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমি এবং আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার এক হুধ-ভাই, আয়েশার (রাঃ) নিকট উপস্থিত হইলাম। হুধ-ভাই আয়েশা (রাঃ)কে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গোসলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। আয়েশা (রাঃ) প্রায় চার সের পরিমাণের একটি পাত্র আনিলেন এবং পর্দার আড়ালে থাকিয়া গোসল করিলেন। মাথার উপর হইতে পানি ঢালিলেন।

১৮৩। হাদীছ :— জাবের (রাঃ)কে গোসলের বিষয় জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি বলিলেন, প্রায় চার সের পানি প্রত্যেকের জন্য যথেষ্ট। এক ব্যক্তি বলিল, আমার জন্য যথেষ্ট নয়। তিনি বলিলেন, অতি মহান ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট ছিল যিনি তোমার চেয়ে বহু উর্ধ্বে ছিলেন, তাঁহার মাথার চুলও তোমার চেয়ে বেশী ছিল (অর্থাৎ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম)। অতঃপর জাবের (রাঃ) একটি চাদরে আবৃত হইয়া আমাদেরকে নামায পড়াইলেন।

গোসলের সময় তিনবার মাথায় পানি ঢালা

১৮৪। হাদীছ :— জোবায়ের ইবনে মোতয়েম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দুই হাত দ্বারা ইশারা করিয়া দেখাইতেন; “আমি এইভাবে মাথার উপর পানি ঢালিয়া থাকি।”

১৮৫। হাদীছ :—জাবের (রাঃ) বলেন, হাসান নামক ব্যক্তি তাঁহাকে করজ গোসলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, রসুলুল্লাহ (সঃ) তিন কোশ পানি মাথায় ঢালিতেন, তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালিতেন। ঐ ব্যক্তি বলিল, আমার মাথায় চুল অধিক। তিনি বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু অসাল্লামের চুল তোমার চেয়েও বেশী ছিল।

সমস্ত শরীরে একবার পানি ঢালিয়া গোসল করা

১৮৬। হাদীছ :— মায়মুন (রাঃ) বলেন—একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অশ্রু পানি রাখিলাম এবং পর্দার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম ; নবী (দঃ) ফরজ গোসল করিলেন। প্রথমে তিনি উভয় হাতে পানি ঢালিয়া দুই বা তিনবার উভয় হাত ধুইলেন, তারপর ডান হাতে পানি উঠাইয়া উহা বাম হাতে লইয়া গুণ্ডস্থান এবং যে স্থানে নাপাকি লাগিয়াছে উহা পরিষ্কার করিলেন। তারপর ঐ হাত মাটির সঙ্গে ঘষিয়া ধৌত করিলেন, তারপর কুলি করিলেন ও নাকে পানি দিলেন এবং মুখমণ্ডল ও দুই হাত ধৌত করিলেন—তথা নামাযের অভ্যুত্থায় অজু করিলেন ; পা ধোয়া বাকী রাখিলেন।† অতঃপর তিন বার মাথা ধৌত করিলেন, তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালিয়া দিলেন এবং ঐ স্থান হইতে সরিয়া দুই পা ধুইলেন। তাঁহাকে একটি রুমাল দেওয়া হইল, কিন্তু উহার দ্বারা তিনি শরীর মুছিলেন না, হাত ঝাড়িতে ঝাড়িতে চলিয়া গেলেন। (৩৯ ও ৪২ পৃঃ)

হৃৎকের হাঁড়ি ইত্যাদি পাত্রে পানি লইয়া গোসল করা

অর্থাৎ—যদি কোন পাত্র পাক জিনিষের গন্ধযুক্ত হয়, যেমন হৃৎকের হাঁড়ি ; উহাতে পানি লইয়া গোসল করা যায়।

১৮৭। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন জানাবাতের গোসল করিতেন তখন হৃৎকের হাঁড়ি ইত্যাদির স্থায় কোন পাত্রে পানি লইয়া ঐ পানি হাতে উঠাইয় প্রথমে মাথার ডান পার্শ্বে, দ্বিতীয়বার মাথার বাম পার্শ্বে, তৃতীয়বার দুই হাতে পানি উঠাইয়া মাথার মধ্যভাগে ঢালিতেন।

হাতে নাপাকী না থাকিলে হাত ধুইবার পূর্বে পানির পাত্রে

হাত দেওয়া যায় ; সন্দেহ হইলে হাত ধুইবে

ইবনে ওমর (রাঃ) ও বরা (রাঃ) নামক ছাহাবীদ্বয় হাত ধোয়া ব্যতিরেকে পানির পাত্রের ভিতরে হাত দিয়া পানি উঠাইয়া অজু করিয়াছেন।

ইবনে-আব্বাস (রাঃ) ফরজ গোসলের পানির ছিটাকে দৃশ্যীয় মনে করিতেন না।

১৮৮। হাদীছ :— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রশূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরজ গোসলের সময় (হাত নাপাকির সন্দেহ হইলে পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করার পূর্বে) ভালরূপে হাত ধৌত করিয়া লইতেন।

১৮৯। হাদীছ :— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জীর সঙ্গে একত্রে একই পাত্র হইতে (হাত দ্বারা পানি উঠাইয়া) জানাবাতের গোসল করিতেন।

† গোসলের স্থানটি সুব্যবস্থার ছিল না, তাই গোসল শেষে সেখান হইতে সরিয়া পা ধুইলেন।

একাধিকবার বা একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গমের পর গোসল করা

১৯০। হাদীছ :—কাতাদাহ (রাঃ) আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) (সময়ে) একই রাত্রে বা দিনে পর পর (মধ্য বর্তী গোসল ব্যতিরেকে) এগার বিরি সহিত সঙ্গম করিতেন (নয় জন বিবাহ সূত্রের, দুই জন শরীয়তী স্বহাধিকার সূত্রের)।

কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, আমি আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হযরতের কি এতই শক্তি ছিল? তিনি বলিলেন, আমাদের মধ্যে এই কথা প্রসিদ্ধ ছিল যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ত্রিশ জন পুরুষের শক্তি আল্লাহ তায়ালায় তৎকাল হইতে প্রাপ্ত ছিলেন।

ফরজ গোসলের পূর্বকার সুগন্ধির নিদর্শন বাকি থাকায় ক্ষতি নাই

১৯১। হাদীছ :— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (হজ্জের সফরে) রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে সুগন্ধি লাগাইয়া দিয়াছি; তিনি স্ত্রীগণের সহবাসে গোসল করিয়া এহরাম বাধিয়াছেন—এ সময় শরীর হইতে সুগন্ধি নির্গত হইতেছিল।

১৯২। হাদীছ :— আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, (গোসলের পূর্বে ব্যবহৃত) সুগন্ধির নিদর্শন (গোসলের পর) এহরাম অবস্থায় নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মাথায় এখনও আমার নজরে ভাসে।

ফরজ গোসল ভুলিয়া মসজিদে প্রবেশ করিলে অরুণ

হওয়া মাত্রই বাহির হইয়া আসিবে

১৯৩। হাদীছ :—আবু হোরায়ারা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নামাযের একামত বলা হইল, সকলে দাঁড়াইয়া কাতার সোজা করিয়া বাধিল, হযরত রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামায পড়িবার জন্ত আসিলেন। তিনি যখন মোছাল্লায় (জায়নামাযের) উপর দাঁড়াইলেন (নামায আরম্ভের পূর্বক্ষণে) হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল, তিনি ফরজ গোসল করেন নাই। তিনি সকলকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন এবং তৎক্ষণাৎ গোসল করিয়া আসিলেন। তাঁহার মাথার পানি তখনও ফোটায় ঝরিতেছিল। এমতাবস্থায়ই তিনি নামায আরম্ভ করিলেন এবং আমরা সকলেই তাঁহার সহিত নামায পড়িলাম।

প্রথমে মাথার ডান পার্শ্ব ধৌত করিবে

১৯৪। হাদীছ :— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা ফরজ গোসল করিতে মাথায় তিনবার পানি ঢালিয়া প্রথমে ডান হাত দ্বারা মাথার ডান পার্শ্ব এবং তারপর বাম হাত দ্বারা বাম পার্শ্ব ধৌত করিতাম।

নিজের গোসলে উলঙ্গ হওয়া যায়; তাহা না করাই শ্রেয়ঃ

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, মানবের জন্ত আল্লাহ প্রতি লজ্জা শরমে তৎপর হওয়া লোকদের হইতে লজ্জা শরম করা অপেক্ষা অধিক বড় কর্তব্য।

১৯৫। হাদীছ :—আবু হোরাযরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, বনী-ইস্রাঈলরা একে অন্নের সম্মুখে উলঙ্গ হইয়া গোসল করিত, মুছা (আঃ) কখনও ঐরূপ করিতেন না। তিনি গোপনে নির্জনে গোসল করিতেন। বনী ইস্রাঈলরা কুংসা রটাইল যে, মুছা (আঃ) অণ্ডকোষ বুদ্ধির Hybrocel রোগী, তাই তিনি আমাদের সহিত উলঙ্গ হইয়া গোসল করেন না।

একদা মুছা (আঃ) নির্জনে কাপড় খুলিয়া একটি পাথরের উপর রাখিয়া গোসল করিতে ছিলেন, হঠাৎ ঐ পাথর আশ্চর্য জনক ভাবে কাপড় লইয়া দৌড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া মুছা (আঃ) হে পাথর! আমার কাপড়; হে পাথর! আমার কাপড়; বলিতে বলিতে (বিবস্ত্র হওয়ার খেয়াল-শৃঙ্খল অবস্থায়) উহার পিছু দৌড়াইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে পাথরটি একদল বনী-ইস্রাঈলের জনসমাবেশে আসিয় পৌঁছিল; তখন সকলেই মুছা (আঃ)কে নিরোগ দেখিতে পাইল এবং তাঁহার প্রতি আরোপিত মিথ্যা অভিযোগের খণ্ডন হইয়া গেল। মুছা (আঃ) তাড়াতাড়ি পাথর হইতে কাপড় উঠাইয়া পরিধান করিলেন এবং পাথরে আঘাত করিতে লাগিলেন; পাথরের উপর ছয় বা সাতটি বেত্রাঘাতের রেখা পড়িয়া গেল।

১৯৬। হাদীছ :—আবু হোরাযরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছালাম্লাহ্ আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, একদা আইয়ুব (রাঃ) কাপড় খুলিয়া গোসল করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার উপর স্বর্ণ-পতঙ্গসমূহ বর্ণিত হইতে লাগিল; তিনি ঐগুলিকে কুড়াইয়া রাখিতে লাগিলেন! আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হ আইয়ুব! আমি কি তোমাকে (বিপুল ধন-দৌলত দান পূর্বক) এ সমস্ত হইতে পরিতৃপ্ত করি নাই? তিনি আরজ করিলেন, হে খোদা; তোমার তরফ হইতে বর্ণিত বরকতের বস্তু হইতে আমি কখনই অপ্রত্যাশী বা পরিতৃপ্ত হইতে পারি না।

নির্জন না হইলে অবশুই পর্দাবস্থায় গোসল করিবে

১৯৭। হাদীছ :— উম্মে-হানী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি হযরত রশূলুল্লাহ্ ছালাম্লাহ্ আলাইহে অসাল্লামের নিকট হাজির হইলাম। তিনি গোসল করিতেছিলেন, ফাতেমা (রাঃ) তাঁহাকে কাপড় দ্বারা পর্দা করিয়া রাখিয়াছিলেন। হযরত (দঃ)কে আমি সালাম করিলাম; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে আসিয়াছে? আমি উত্তর করিলাম, উম্মে-হানী। হযরত (দঃ) আমাকে “মারহাবা” বলিলেন এবং গোসলাতে একটি চাদরে আবৃত হইয়া আট রাকাত নামায পড়িলেন। নামাযের পর আমি বলিলাম, এক ব্যক্তিকে আমি আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিয়াছি; আমার ভাই আলী তাহাকে হত্যা করিতে চায়। হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমি যাহাকে নিরাপত্তা দিয়াছ আমরাও তাহাকে নিরাপত্তা দিলাম। ষটনাটি বেলা পূর্বাফে ছিল।

(মায়মুনা (রাঃ) বর্ণিত ১৮৬ নং হাদীছও এই পরিচ্ছেদে উল্লেখ হইয়াছে।)

নাপাক অবস্থার ঘাম এবং ঐ অবস্থায় চলাফেরা করা

১৯৮। হাদীছ :—আবু হোরাযরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রাস্তার মধ্যে নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইলে তিনি আমার হাত ধরিলেন ; আমি নাপাক অবস্থায় ছিলাম। কিছু দূর এক সঙ্গে চলার পর তিনি এক স্থানে বসিলেন, আমি গোপনভাবে পেছন হইতে সরিয়া পড়িলাম এবং বাড়ী হইতে গোসল করিয়া আসিলাম। নবী (দঃ) সে স্থানেই বসিয়াছিলেন। আমি ফিরিয়া আসিলে পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় গিয়াছিলে ? আমি আরজ করিলাম, আমি নাপাক অবস্থায় ছিলাম ; ঐ অবস্থায় আপানার সঙ্গে উঠা-বসা ভাল নয় মনে করিয়া গোসল করিয়া আসিলাম। নবী (দঃ) বলিলেন, মোমেন ব্যক্তি (ঐরূপ) নাপাক হয় না। (যে, তাহার সঙ্গে উঠাবসা করা বা তাহাকে ছোঁয়া যায় না।)

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আ'তা বলিয়াছেন, নাপাক অবস্থায় নখ কাটা ও চুল কাটা যায়।

নাপাক অবস্থায় গৃহে অবস্থান বা শয়ন করিতে অজু করিবে

১৯৯। হাদীছ :— আবু সালামাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আরেশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম—নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কি কোন সময় ফরজ গোসলের পূর্বে ঘুমাইতেন ? তিনি বলিলেন, হাঁ—কোন সময় ঐরূপ ঘুমাইতেন, কিন্তু অজু করিয়া ঘুমাইতেন।

২০০। হাদীছ :—আরেশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরজ গোসল না করিয়া নিদ্রা যাইতে ইচ্ছা করিলে গুপ্তস্থান ধৌত করিয়া নামাযের জন্য অজুর ছায়া অজু করিয়া লইতেন।

২০১। হাদীছ :— ওমর (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমীপে জিজ্ঞাসা করিলেন, নাপাক অবস্থায় নিদ্রা যাওয়া যায় কি ? নবী (দঃ) বলিলেন হাঁ, যদি অজু করিয়া নেয়।

২০২। হাদীছ :—আবুহুলাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ওমর (রাঃ) এই আলোচনা করিলেন যে, রাত্রে গোসল ফরজ হইলে (যখন গোসল না করিয়া) শয়ন করিতে ইচ্ছা করিলে কি করিতে হইবে ? হযরত (দঃ) বলিলেন, গুপ্তস্থান ধৌত করিয়া অজু কর, তারপর ঘুমাইতে পার।

স্ত্রী-পুরুষের লিঙ্গ গ্রথনেই গোসল ফরজ হইবে

২০৩। হাদীছ :—আবু হোরাযরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, পুরুষ স্ত্রীর মুখোমুখী হইয়া লিঙ্গবয়ের গ্রথনেই গোসল ফরজ হইয়া যাইবে।

ইমাম বোখারী (রঃ) বলেন, এই হাদীছে বর্ণিত বিধানই অগ্রগণ্য।

২০৪। হাদীছ :- উবাই-ইবনে-কা'আব (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—স্বামী জীর সহিত সহবাস করিল, কিন্তু বীর্ঘ্য বাহির হইল না তখন কি করিতে হইবে ? রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, স্বামীর গুপ্ত অঙ্গে যাহা লাগিয়াছে উহা ধৌত করতঃ অজু করিয়া নামায পড়িতে পারে।

২০৫। হাদীছ :- যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রাঃ) ওসমান (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি কেহ জী-সহবাস করে কিন্তু বীর্ঘ্য বাহির হয় নাই ; এমতাবস্থায় গোসল করিতে হইবে কি ? তিনি বলিলেন, গুপ্তস্থান দুইয়া ফেলিবে এবং নামাযের ত্রায় অজু করিবে ; আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এরূপ শুনিয়াছি। জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তি বলেন, আমি এই মছআলাহ আলী (রাঃ), জোবায়ের (রাঃ), তালহা (রাঃ) এবং উবাই-ইবনে কা'আব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকটও জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারাও এরূপ বলিলেন।

২০৬। হাদীছ :- আবু সারীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক আনছারী ব্যক্তিকে লোক পাঠাইয়া ডাকিলেন। (ঐ ব্যক্তি তখন জী-সহবাসে লিপ্ত ছিল, তখনও বীর্ঘ্য বাহির হইয়া তাহার চরম পুলক-লাভ ঘটে নাই, কিন্তু রসুলুল্লাহ (দঃ) ডাকিতেছেন শুনা মাত্রই এত বড় কঠিন মত্ততা পরিত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি গোসল করিল এবং) তৎক্ষণাৎ সে রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল। তাহার মাথার পানি ঝরিতেছিল ; হযরত (দঃ) (তাহার অবস্থা অনুভব করিতে পারিয়া) বলিলেন, বোধ হয়—আমি তোমাকে তাড়াহুড়ার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিলাম ? সে আরজ করিল—ইঁ, হুজুর। হযরত (দঃ) বলিলেন, যখন (জী-সহবাস জিয়া) অসম্পূর্ণতার মধ্যে পরিত্যক্ত হয় তখন অজু করিলেই চলে। (৩০ পৃঃ)

ব্যাখ্যা :- উল্লিখিত হাদীছ ত্রয়ে বীর্ঘ্য বাহির না হওয়া অবস্থায় অজুর আদেশ রহিয়াছে, গোসলের উল্লেখ নাই। ২০৩নং হাদীছে এবং আরও হাদীছে নির্দেশ আছে যে, পুরুষদের শুধু অগ্রভাগ জীলিঙ্গের ভিতরে প্রবেশ করিলেই বীর্ঘ্য বাহির না হইলেও গোছল ফরজ হইবে।

খলীফা ওমর (রাঃ) তাহার খেলাফতকালে ছাহাবীগণকে ডাকিয়া সকলের সম্মুখে এই মছআলাহ পর্যালোচনান্তে সর্ব-সম্মতি ক্রমে স্থির করিলেন যে, এমতাবস্থায় স্বামী-জী উভয়ের গোছল ফরজ হইবে ; এই সিদ্ধান্তের উপর ছাহাবীগণের “এজমা” হইয়া গেল। এমনকি খলীফা ওমর (রাঃ) এই সিদ্ধান্তের বিপরীত মতামত প্রকাশের উপর শাস্তির ঘোষণা করিলেন। অতএব এমতাবস্থায় গোছল করা ফরজ হইবেই এবং উহার বিরোধী হাদীছ সমূহ মনহুখ বা রহিত পরিগণিত।

ইমাম বোখারী (রাঃ)ও ২০৩নং হাদীছ বর্ণনা করতঃ ইহা বলিয়া দিয়াছেন।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● ফরজ গোসলের মধ্যে কুল্লি করা এবং নাকে পানি দেওয়া ফরজ (৪০ পৃ: ১০৬ হা:) ।
 নাপাকী ও গুপ্ত অঙ্গ পরিষ্কার করার পর হাত মাটি বা দেওয়ালে ঘষিয়া ধোয়া উত্তম (ঐ) ।
 ● নাপাকী পরিষ্কার করিতে বাম হাতে পানি লইবে (ঐ) । ● অজু এবং গোসলে
 বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার মধ্যে লাগালাগি না হইয়া বিলম্বতা ঘটিলেও অজু-গোসল শুদ্ধ হইবে ;
 একদা ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) অজু করিতে বিভিন্ন অঙ্গ ধোয়ার পর পা
 ধুইতে এত বিলম্ব করিলেন যে, তাঁহার ধোয়া অঙ্গগুলি শুষ্ক হইয়া গেল (ঐ) । ● মজ্বি
 বাহির হইলে গোসল করিতে হইবে না, কিন্তু অজু তঙ্গ হইবে এবং শরীর হইতে মজ্বি
 ধৌত করিতে হইবে (৪১ পৃ: ১৩০ হা:) । ● ফরজ গোসল করিতে মাথায় পানি ঢালিবার
 পূর্বে হুলের নীচের চামড়া ভালরূপে ভিজাইয়া লইবে (৪১ পৃ: ১৭২ হা:) ● ফরজ
 গোসলের জন্ত প্রথমে অজু করিয়াছে ; পূর্ণ গোসলের সময় অজুর অঙ্গ সমূহে পুনরায় পানি
 ব্যবহার না করিলেও চলে (ঐ) । ● ফরজ গোসলের পর হাত ঝাড়া জায়েয ।
 অর্থাৎ হাত ঝাড়ার পানি নাপাক নহে । ফরজ গোসলের সময় যেই অঙ্গে নাপাকী নাই
 সেই অঙ্গ-ধৌত পানির ছিটা নাপাক নহে । ● মহিলাদের স্বপ্নদোষে বীৰ্য্য নির্গত হইলে
 তাহাদের জন্তও গোসল করা ফরজ (৪২ পৃ:) ।

পঞ্চম অধ্যায়

হায়েজ বা ঋতু

হায়েজের আরম্ভ কিরূপে হইয়াছে

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يَسْأَلُونَكَ مِنَ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ - فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ - إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ -

অর্থ—তাহারা আপনার নিকট জিজ্ঞাসা কবে ঋতুকালীন (স্ত্রী-সহবাসের) বিষয়। আপনি বলিয়া দিন, ঋতু অতিশয় ঘৃণিত ও অপবিত্র বস্তু, সুতরাং ঐ সময় স্ত্রী সহবাসে বিরত থাক, যাবৎ স্ত্রী পবিত্র না হয়। পবিত্র হওয়ার পর আল্লাহর আদেশ-নির্দেশ অনুযায়ী স্ত্রীকে ব্যবহার কর। আল্লাহ তওবাকারী এবং পবিত্রতা রক্ষাকারীকে পছন্দ করেন। (২পাঃ ১২৮ঃ)

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম করমাইয়াছেন, হায়েজ একটি এমন বস্তু যাহা আল্লাহ তায়ালা আদমজাত মহিলাদের উপর চাপাইয়া দিয়াছেন।

কেহ কেহ বলে, ইহা প্রথমে বনী-ইসরাঈলীদের উপর চাপান হইয়াছিল। বোখারী (রাঃ) বলেন, এই দুই মতবাদের মধ্যে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্ণিত মতবাদই অগ্রগণ্য ও গ্রহণীয় যে, হায়েজ আদম জাতের প্রথম হইতেই আরম্ভ।

● যেই হাদীছের ইঙ্গিত এখানে দেওয়া হইল- উহা আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত। তিনি বলিয়াছেন, বিদায়-হজ্জের আমিও হযরতের সঙ্গে ছিলাম। মিকাত তথা এহরাম বাঁধার নির্দ্ধারিত স্থান হইতে আমি ওমরার এহরাম বাঁধিয়াছিলাম। মক্কার অতি নিকটবর্তী আসিয়া আমার হায়েজ আরম্ভ হইয়া গেল। মক্কায় পৌঁছিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসান্তে কাঁদার কারণ জানিতে পারিয়া সাস্বনা দানে আমাকে বলিলেন—
 “إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَىٰ بَنَاتِ آدَمَ” ইহা এমন বস্তু যাহা আল্লাহ তায়ালা আদমজাত নারীদের উপর চাপাইয়া দিয়াছেন, (ইহাতে কুষ্ঠিত হইও না)। হাদীছটির অনুবাদ দ্বিতীয় খণ্ডে হজ্জের অধ্যায় “হায়েজ ও নেকাহ অবস্থায় এহরাম বাধা” পরিচ্ছেদে আসিবে।

ঋতুবতী স্ত্রী স্বামীর মাথা ধুইয়া ও আঁচড়াইয়া দিতে পারে

২০৭। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হায়েজ অবস্থায় থাকাকালে রমুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মাথা আঁচড়াইয়া দিয়াছি।

২০৮। হাদীছ :—ওয়েয়া (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, হায়েজ অবস্থায় নারী আমার খেদমত কিতে পারিবে কি? কিংবা নাপাক অবস্থায় স্ত্রী আমার নিকট আসিতে পারিবে কি? তিনি উত্তর করিলেন—এর প্রত্যেকটিকেই আমি সহজ মনে করি, প্রত্যেকেই আমার খেদমত করিতে পারিবে; এজ্ঞত্ব কাহারও উপর দোষারোপ করা চলিবে না। আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রমুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এ'তেকাফে থাকিয়া স্বীয় মাথা মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দিতেন, আয়েশা (রাঃ) হায়েজ অবস্থায় উহা আঁচড়াইয়া দিতেন।

হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীর সংস্পর্শনে কোরআন তেলাওয়াত করা

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আবু ওয়ায়েল (ঃ) স্বীয় ক্রীতদাসীকে হায়েজ অবস্থায় কোরআন শরীফ নিয়া আসার জন্ত পাঠাতেন, কোরআন শরীফের গেলাফের রশি ধরিয়া সে উহা নিয়া আসিত।

২০৯। হাদীছ :— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার হায়েজ অবস্থায়ও নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার কোলে হেলান দিয়া কোরআন তেলাওয়াত করিতেন।

ঋতু অবস্থায় নারীদের সঙ্গে একত্রে শয়ন করা

২১০। হাদীছ :—উম্মুল-মো'মেনীন উম্মে-ছালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এক চাদরের ভিতর শায়িত ছিলাম, হঠাৎ আমার ঋতুস্রাব আরম্ভ হইল। আমি নিঃশব্দে চাদরের ভিতর হইতে সরিয়া পড়িলাম এবং ঋতুকালীন বিশেষ কাপড় পরিধান করিলাম। রমুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হায়েজ আরম্ভ হইয়াছে? আমি আরজ করিলাম, হাঁ। তিনি আমাকে ডাকিয়া আনিলেন, আমি তাঁহার সহিত এক চাদরের নীচে শয়ন করিলাম।

২১১। হাদীছ :— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এবং রমুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একত্রে এক পাত্র হইতে পানি লইয়া জানাবাতের গোসল করিতাম। এতদ্ভিন্ন হযরত (দঃ) আমাকে হায়েজ অবস্থায় রীতিমত ইজ্রার পরিধানের আদেশ করিতেন ও আমার সঙ্গে এক বিছানায় শয়ন করিতেন এবং তিনি এ'তেকাফে থাকিয়া মসজিদ হইতে মাথা বাহির করিয়া দিতেন; আমি হায়েজ অবস্থায় তাঁহার মাথা ধুইয়া দিতাম।

ব্যাপ্তা :— এখানে “মোবাশারাহ” শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, ইহা একটি আরবী শব্দ। আরবী ভাষায় ইহার অর্থ—একত্রে আহা-নিদ্রা করা, খাওয়া দাওয়া, চলা-ফেরা, উঠা-বসা ও শয়ন ইত্যাদি একত্রে এক সঙ্গে করা। ইহুদীদের মধ্যে এরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কোন নারীর হায়েজ আরম্ভ হইলে বাড়ীর অন্তঃস্থ সকলে তাহাকে ভিন্ন কুঁড়ে ঘরে, ভিন্ন পেয়ালা-বাসনে, ভিন্ন থালা-একেবারে অস্পৃশ্য ভাবে রাখিয়া দিত। কেহই তাহার সঙ্গে একত্রে আহা-বিহার ও উঠা-বসা করিত না, এমনকি স্বামীকেও এক

বিছানায় শয়ন করিতে দিত না। পক্ষান্তরে নাছারাদের প্রচলিত প্রথা ছিল, ইহুদীদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি গ্রাহ্য কিম্বা বাছ-বিচার করিত না, এমনকি ঋতু অবস্থায় স্ত্রীসংবাস করিতেও বিরত থাকিত না। অথচ ঋতু অবস্থায় নিদিষ্ট ব্যবহার-স্থানটি ঘৃণা উদ্বেককারী অপবিত্র ও নাপাকির স্থান হইয়া থাকে। এই অবস্থায় সঙ্গম করাতে নানা প্রকার কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধি জন্মিয়া উভয়েরই স্বাস্থ্যের অপকার ও ক্ষতি সাধিত হওয়ার সম্ভাবনাও অনেক বেশী।

ইসলাম সনাতন ধর্ম। উহার বিধি-ব্যবস্থাদি মধ্য পন্থীয়। নির্ভুরতা, অসহিষ্ণুতা বর্ষরতা এবং কুৎসিত, ঘৃণার্ততা ও কদর্যতা—এ সবকেই ইসলাম এড়াইয়া চলে। তাই এক দিকে ইহুদীদের অভিশপ্ত ব্যবস্থা ও অত্যাচারের প্রথা হইতে নারী জাতিকে রক্ষা করিতে ইসলামের বিধানে এরূপ ব্যবস্থা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে, ঋতু অবস্থায় একত্রে বসবাস, একত্রে আহার-নিদ্রা এমনকি রীতিমত ইজার পরিধানে স্বামীর সহিত এক বিছানায় শয়ন করা যাইবে; কোন প্রকার অস্পৃশ্যতার ভাব মনে আনিবে না। অতীতকালে নাছারাবাদের কুৎসিত ঘৃণিত সীমা লঙ্ঘনকারী নীতির বিপরীত—ঋতু অবস্থায় সঙ্গম করা পরিষ্কাররূপে হারাম করিয়া দিয়াছে।

২১২। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবিদের বাহারও ঋতু আরম্ভ হইলে ঋতুর প্রারম্ভিক তীব্রতার মুখে বিশেষভাবে ইজার পরিধান করার জন্ত তিনি আদেশ করিতেন এবং ইজার পরিধান অবস্থায় এক বিছানায় শয়ন করিতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছায় দৃঢ় সংযমী আর কেহ হইতে পারে না, (তাই সর্বসাধারণকে বিশেষরূপে সতর্ক থাকিতে হইবে।)

২১৩। হাদীছ :—মায়মুনা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন স্ত্রীর ঋতু অবস্থায় তাহার সঙ্গে এক বিছানায় শয়নের ইচ্ছা করিলে তাহার আদেশ অনুযায়ী তিনি রীতিমত ইজার পরিধান করিয়া লইতেন।

ঋতু অবস্থায় রোজা রাখা নিষিদ্ধ

২১৪। হাদীছ :—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রোযার বা কোরবানীর ঈদের দিন রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঈদগাহে উপস্থিত হইলেন। নামাযান্তে হযরত (রাঃ) মহিলাদের স্থানে যাইয়া তাহাদিগকে বিশেষভাবে বলিলেন—হে মহিলাগণ! তোমরা দান-খয়রাত কর, কারণ দোষখবাসীদের মধ্যে অধিকাংশ তোমাদেরকে দেখিয়াছি। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, কি কারণে ইয়া রসুলুল্লাহ? তিনি বলিলেন, তোমরা লান-তান অভিশাপ অত্যধিক করিয়া থাক এবং স্বামীর না-শোকরি ও নিমকহারামি

করিয়া থাক। নারী জাতির স্বভাব এই যে, তাহাদের প্রতি আজীবন এতদুচ্ছান ও সন্মানস্বরূপ করার পর একটি ক্রটি দেখা মাত্র বলিয়া ফেলিবে, তোমার নিকট হইতে কখনও আমি ভাল ব্যবহার পাই নাই। এ ছাড়া তাহাদের মধ্যে আরও একটি দোষ এই যে, নারী জাতি অত্যধিক ছলনাময়ী হইয়া থাকে। স্বল্প বুদ্ধি ও স্বল্প নেক আমল লইয়া চালাক চতুর ছণ্ডিয়ার পুরুষের বুদ্ধি-বিবেকের উপর তোমরা যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পার এরূপ অল্প কেহ করিতে পারে তাহা দেখি না।

তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের নেক আমল ও বুদ্ধি স্বল্প ক্ষিপ্রে ইয়া রহুল্লাহ! তিনি বলিলেন—নারীর সাক্ষ্য পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধ নয় কি? (হুইজন নারীর সাক্ষ্য একটি পুরুষের সাক্ষ্যের সমান।) তাহারা বলিল, হাঁ; তিনি বলিলেন, ইহাই স্বল্প বুদ্ধির প্রমাণ। হযরত (দ:) প্রশ্ন করিলেন, তোমাদের কাহারও ঋতু আরম্ভ হইলে নামায-রোযা হইতে বিরত থাক না কি? তাহারা স্বীকার করিল—হাঁ; তিনি বলিলেন, ইহাই নেক আমল কম হওয়ার প্রমাণ। (ঋতু অবস্থায় নামায পড়িতে ও রমযানের রোযা রাখিতে না পারায় গোনাহ না হইলেও এই সব কার্য সম্পাদনকারীগণ যে অসংখ্য ছওয়াব হাসিল করে উহা হইতে তাহারা বঞ্চিত নিশ্চয়ই থাকিবে অল্প উপায়ে ফজিলত হাসিলের ব্যবস্থা থাকিলেও নারী জাতি এই পরিমাণ নামায ও রমযানের মর্তব্য তা পাইল না।)

ঋতুবতী তওয়াফ ভিন্ন হজ্জের সব কিছুই করিতে পারে

এখানে আয়েশা (রা:) বর্ণিত হাদীছ উল্লেখ হইয়াছে যাহার আলোচনা “হায়েজের আরম্ভ” পরিচ্ছেদে আছে। অত্র পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য এই যে, ঋতু অবস্থায় সব রকম এবাদৎ নিষিদ্ধ নহে।

ইব্রাহীম নাখ্বী (র:) বলেন—হায়েজ অবস্থায় কোরআন শরীফের এক আয়াত পরিমাণ পড়া যায় তার চেয়ে বেশী নয়। ইবনে আব্বাস (রা:) জানাবাত অবস্থায় মুখে মুখে কোরআন তেলাওয়াত করা জায়েয বলিয়াছেন। রহুল্লাহ (দ:) সর্বাবস্থায় আল্লার জেক্ব করিতেন (সর্বাবস্থার মধ্যে জানাবাতের অবস্থাও আসিয়া যায়।)

রহুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় (সর্ববিধ নিরাপদ অবস্থা বর্তমান থাকায় এবং রহুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বক্তব্য শ্রবণ করা নর-নারী প্রত্যেকের অবশ্য কর্তব্যবোধে) হায়েজ অবস্থার সময়েও নারীদিগকে ঈদগাহে যাইবার আদেশ করা হইত। তথায় তাহারা আল্লাহ আকবার ইত্যাদি জেক্ব করিত এবং দোয়ার সময় দোয়ার মধ্যে शामिल হইত।

হাকাম নামক প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেহ বলেন, আমি জানাবাত অবস্থায়ও দরকার বশতঃ পক্ষী জবেহ করিয়া থাকি, জবেহ করার সময় বিছমিল্লাহ বলিতে হয়।

রসুল (সঃ) রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন (৬নং হাদীছের বিবরণ) তাহাতে **قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا** এই আয়াতটি লিখিয়াছিলেন, অথচ সে কাকের ছিল। কাকের সর্বদাই নাপাক থাকে, এমনকি ফরজ গোসল পূর্ণরূপে করিতে তাহাদের মধ্যে বাধ্যবাধকতা নাই।

ব্যাখ্যা :—হায়েজ, নেফাছ, জানাবাত অবস্থায় তছবীহ, তাহলীল, দোয়া, হুকুম পড়া নিঃসন্দেহে জায়েয আছে। এমনকি কোরআন শরীফের কোন আয়াত স্বেচ্ছা ও দোয়া হিসাবে পড়া; যেমন কার্য্যারম্ভে **بسم الله الرحمن الرحيم**, ইতি দিয়া আলহাম্মুলিল্লাহ, সওয়ার হওয়ার সময় **الذي سخر لنا هذا** ইত্যাদি পড়াতে কোন প্রকার আপত্তি নাই। তেমনি ভাবে আরবী ভাষায় কথা বলিতে বা পত্র লিখিতে নিজের পক্ষেরই কোন বাক্য যদি কোরআনের আয়াতের সঙ্গে মিল খাইয়া যায় উহা লেখাতেও দোষ নাই। তেলাওয়াতরূপে কোরআনের আয়াত পাঠ করা বা কোরআন শরীফ ছেঁয়া জায়েয নয়। যদি কেহ শিক্ষয়িত্রী হয় ও অন্য ব্যবস্থা না থাকে সে ক্ষেত্রে শব্দ আলাদা পড়াইয়া যাইতে পারে।

এন্তেহাজ্জার (রোগজনিত রক্তস্রাবের) বয়ান

২১৫। **হাদীছ :**— ফাতেমা নাম্নী একজন মহিলা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হাজির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমি সর্বদাই এন্তেহাজ্জায় লিপ্ত থাকি সে জন্য কি আমি নামায ছাড়িয়া দিব? হযরত (দঃ) বলিলেন, এন্তেহাজ্জার স্রাব কোন একটি রোগ বা শিরা হইতে আসিয়া থাকে (অতএব ইহা একটি রোগ ও ব্যাধিবিশেষ, এই স্রাব জরায়ু হইতে আসে না, সেজন্য ইহা হায়েজ নয়; (নামায ছাড়িতে পারিবে না।) এমতাবস্থায় তোমার হায়েজের নিদিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে তখন নিদিষ্ট হায়েজের দিন কয়টিতে নামায ছাড়িয়া দিবে; ঐ নিদিষ্ট দিনগুলি অতীত হইলে গোসল করিয়া নামায পড়িও।

ব্যাখ্যা :—এন্তেহাজ্জা হায়েজের মতই একটি অবস্থাবিশেষ, কিন্তু হায়েজ একটি স্থগিত প্রাকৃতিক রহস্যময় অবস্থা এবং উহার স্রাব জরায়ু হইতে আসিয়া থাকে। এন্তেহাজ্জা একটি ব্যাধিবিশেষ, ইহার স্রাব রোগ হইতে আসিয়া থাকে, যেমন ক্ষতস্থান হইতে রক্ত নির্গত হয়। হায়েজের দরুন যে সমস্ত কার্য্য হারাম হইয়া থাকে এন্তেহাজ্জার দরুন ঐ সব কার্য্যে বাধার স্থিতি হয় না। হায়েজ ও এন্তেহাজ্জার সঙ্গে অকাট্য হারাম ও হালালের মছআলাহ জড়িত। বাহ্যিক ভাবে এই দুই এর পার্থক্য অনেক সময় জটিল হয়। দাঁড়ায়। মেয়েদের কর্তব্য—যখন যাহার সম্মুখে যে অবস্থার উদ্ভব হয় সে অনুযায়ী বিজ্ঞ আলেম হইতে মছআলাহ জানিয়া লওয়া।

হায়েজের রক্ত পরিষ্কার প্রণালী

২১৬। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা কাপড়ের মধ্যে হায়েজের রক্তমাখা স্থানটুকুকে আঁচড়াইয়া বাড়িয়া ফেলিয়া বিশেষভাবে ধৌত করার পর সম্পূর্ণ কাপড়টাকেই মামুলীভাবে ধৌত করিতাম, তারপর উহা দ্বারা নামায পড়িতাম।

এন্তেহাজ্জা অবস্থায় এ'তেকাফ করা

২১৭। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কোন এক বিবি তাঁহার সঙ্গে এন্তেহাজ্জা অবস্থায় এ'তেকাফ করিয়াছিলেন। (এ অবস্থায় তিনি মসজিদে অতি সতর্কতার সহিত থাকিতেন, এমনকি) এক প্রকার বিশেষ পাত্রের উপর বসিতেন। (যেন মসজিদে কোন রকম নাপাকি লাগিতে না পারে।)

হায়েজ অবস্থায় পরিহিত কাপড়ে নামায পড়া

২১৮। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময় (মোসলমানদের আর্থিক অবস্থা দুর্বল ছিল, তখন) আমাদের প্রত্যেকেরই একটি মাত্র কাপড় থাকিত, হায়েজের সময় উহাই পরা হইত; কোন স্থানে হায়েজের রক্ত লাগিলে থুথুর সাহায্যে নখ দ্বারা আঁচড়াইয়া ঐ স্থানকে পানি দ্বারা ধুইয়া নামায পড়িতাম।

হায়েজের পবিত্রতার গোসলে সুগন্ধি ব্যবহার ও শরীর মর্দন করা

২১৯। হাদীছ :—উম্মে আ'তিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তরফ হইতে) আমাদেরকে নিষেধ করা হইত—আমরা যেন স্বামী ব্যতীত অন্য কোন মৃতের জন্ত তিন দিনের বেশী শোকাবশ ধারণ না করি। স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোকাবশ অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে। এই সময়ের মধ্যে সুরমা ও সুগন্ধি ব্যবহার বা (আকর্ষণীয়) রঙ্গীন কাপড় পরিধান জায়েয নহে, কিন্তু এরূপ রঙ্গীন কাপড় যাহার সূতা পূর্ণ রঙ্গীন নহে, স্থানে স্থানে রং লাগান হইয়াছে (অর্থাৎ কোন প্রকার আকর্ষণীয় ধরণের রঙ্গীন নহে) উহা ব্যবহার করা জায়েয। এতদ্বিত্ত ঐ সময় হায়েজ হইতে পাক-ছাক হওয়া কালীন গোসলের সময় কোন প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করাও জায়েয করা হইয়াছে।[†] আমাদের অর্থাৎ নারী জাতিকে জানাযার সঙ্গে যাওয়াও নিষেধ করা হইয়াছে।

২২০। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা একজন মহিলা নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হায়েজের গোসলের নিয়মাবলী জিজ্ঞাসা করিল।

† এখানে, كست اظنا শব্দ আছে, ইহা এক প্রকার সুগন্ধির নাম। এরূপ সুগন্ধি হায়েজের গোসলে বিশেষতঃ স্নান স্থানে ব্যবহার করা চাই। কারণ, হায়েজের রক্ত দুর্গন্ধময় হয়, সুগন্ধির দ্বারা উহা পূর্ণরূপে দূরীভূত হইবে। সেট ইত্যাদি নাপাক সুগন্ধি ব্যবহার করিবে না।

নবী (দঃ) নিয়মাবলী বর্ণনা করিলেন ও বলিলেন, মেশক (অথবা তজ্জপ কোন সুগন্ধি) যুক্ত তুলা (কিন্ধা কাপড় ইত্যাদি) দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া পরিচ্ছন্নতা হাসিল করিবে। নবী (দঃ) লজ্জায় এই বিষয়টি পরিকারভাবে বলিতে ছিলেন না; কিন্তু সেও ইহা বুঝিতে ছিল না। তখন আয়েশা (রাঃ) ঐ মহিলার হাত ধরিয়া টানিয়া নিয়া গেলেন এবং পরিকার-ভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে, ঐ সুগন্ধিময় তুলা বা কাপড় দিয়া আব-স্থানকে মাজিত করিয়া পরিচ্ছন্নতা হাসিল করিবে।

হায়েজ আরম্ভ ও শেষ হওয়ার নিদর্শন

ছাহাবীযুগের নারীরা হায়েজকালে আব-স্থানে ব্যবহৃত তুলা হলুদ রং অবস্থায় কোটার মধ্যে ভরিয়া আয়েশা রাক্বিয়াল্লাহ্ তায়ালা আনহার নিকট পাঠাইয়া দিত। (তাহাদের ধারণা হইত যে, রক্তের রং লাল হয়, তাই হলুদ বর্ণের পদার্থটি হায়েজের রক্ত হইবে না, এই সন্দেহে মহম্মদ আল্লাহ্ জ্ঞানার জন্ত প্রকৃত বর্ণের নমুনা পাঠাইয়া দিত।) আয়েশা (রাঃ) বলিয়া পাঠাইতেন, তাড়াহুড়া করিও না; যাবৎ না সাদা চুণের স্থায় বস্তু দেখা যায়, হায়েজ হইতে পাক হওয়া যাইবে না।

যায়েদ ইবনে সাবেত রাক্বিয়াল্লাহ্ তায়ালা আনহুর মেয়ে শুনিতে পাইলেন, মহিলারা রাক্বিকালে বারংবার আলো ছালাইয়া দেখিতে থাকে—হায়েজ হইতে পাক হইয়াছে কিনা, (এরূপ করিতে অত্যধিক কষ্ট হইত যাহার জন্ত শরীয়ত বাধ্য করে নাই, তাই) তিনি বলিলেন, হযরত রশূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় নারীগণ এরূপ করিত না।

ব্যাখ্যা :—হায়েজ শেষ হওয়া না হওয়ার সঙ্গে নামায রোযা ফরজ হওয়া এবং হারাম-হালাল ইত্যাদি বহু বিষয় জড়িত, তাই হায়েজ শেষ হওয়ার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্তব্য। ছাহাবা ও তাবেরীগণের উত্তম যুগের নারীগণ কত সতর্ক থাকিতেন, উপরের দুইটি ঘটনায় উহা লক্ষ্যণীয়। এখানে ২১৫নং হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে যে, যে নারী সর্বদা এস্তেহাজা তথা রক্তস্রাব ব্যাধিতে আক্রান্ত থাকে তাহার হায়েজ আরম্ভ ও শেষ হওয়ার নিদর্শন এই যে, এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে তাহার হায়েজের দিন ও সময় পূর্ণ নিদিষ্ট থাকিলে ব্যাধির সময় ঐ নিদিষ্ট ও সময় হায়েজ গণ্য হইবে তত্বকের আব এস্তেহাজা হইবে।

হায়েজ অবস্থায় পরিত্যক্ত নামায পড়িতে হইবে না

২২১। হাদীছ :—একটি নারী আয়েশা (রাঃ)কে প্রশ্ন করিল, হায়েজের পরবর্তী পবিত্রাবস্থার নামায আদায় করিলেই যথেষ্ট হয় (হায়েজ অবস্থায় পরিত্যক্ত নামাযের কাযা পড়িতে হয় না, অথচ হায়েজ অবস্থায় পরিত্যক্ত রোযার কাযা করিতে হয়) কেন? আয়েশা (রাঃ) তাহার উত্তরে রাগতভাবে বলিলেন, তুমি কি খারেকী ফের্কার লোক? আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্তমানে হায়েজ অবস্থায় নামায কাযা পড়িতাম

না; তিনি আমাদিগকে ঐ নামায কাযা পড়ার হুকুমও দিতেন না (রোযা কাযা করার হুকুম দিতেন।)*

ব্যাখ্যা :- অনেক সময় কোন বিষয়ে কোরআন বা হাদীছের স্পষ্ট নির্দেশ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সেখানে যুক্তির অবতারণা করা হইয়া থাকে। এমনকি যুক্তিকে কোরআন ও ছুন্নাহর সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার সংসাহস না করিয়া বরং উলটা কোরআন ও ছুন্নাহকেই যুক্তির সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার চেষ্টা সাহস ও অপচেষ্টা করা হয়। অতিশয় পরিতাপের বিষয় যে, ঐ অপচেষ্টা ব্যর্থ হইলে যুক্তিকে মাথায় নিয়াই অগ্রসর হইতে দেখা যায়— যেমন, কুফাস্থিত “হাক্কিয়া” এলাকায় আবির্ভূত খারেজী ফের্কার লোকগণ ছিল; তাহারা উল্লিখিত যুক্তি দ্বারা এই মত পোষণ করিত যে, হায়েজ অবস্থার নামাযও রোযার হায কাযা পড়িতে হইবে। এই যুক্তি খণ্ডন করার জন্য এর চেয়ে সরল যুক্তি বিদ্যমান আছে। × কিন্তু আয়েশা (রাঃ) সেই যুক্তির আশ্রয় না নিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করতঃ প্রশ্নকারীগণকে তিরস্কার করিলেন এবং বলিলেন, রসুলুল্লাহ (সঃ) আদেশ একরূপই ছিল যে, হায়েজ অবস্থার রোযা কাযা করিতে হইবে, নামায কাযা পড়িতে হইবে না। একজন মোসলমানের জন্য এতটুকু যথেষ্ট। কারণ দীন ও ঈমানের ভিত্তি একমাত্র কোরআন ও ছুন্নাহ অবশ্য চ্যালেঞ্জ করা যায় যে, কোরআন ও ছুন্নাহ যুক্তিহীন নয়, কিন্তু একই বিষয়ের বিভিন্নমুখী যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায়। অতএব ঈমানদারগণের কর্তব্য কোরআন ও ছুন্নাহ মোতাবেক যুক্তি তালাশ করিয়া লওয়া এবং সেরূপ যুক্তি খুঁজিয়া বাহির করার জ্ঞান ও সামর্থ্য না থাকিলে উহার জন্য বুঝা মাথা না ঘামাইয়া কোরআন-ছুন্নাহ প্রতি পূর্ণ অনুগত থাকা।

স্বাভাবিক জন্ম ঈদগাহে বা দোয়ার সমাবেশে উপস্থিত হওয়া

২২২। হাদীছ :- হাক্কিয়া-বেনতে-ছীরীন (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদেরকে ঈদ-নামাযের ময়দানে যাইতে নিষেধ করিতাম। একদা এক মহিলা বসরা শহরে আসিয়া বর্ণনা করিল, তাহার ভগ্নিপতি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে বারটি জেহাদ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ছয়টিতে তাহার ভগ্নিও সঙ্গে ছিলেন। তাহার ঐ ভগ্নি বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা জেহাদের সময় আহতদের চিকিৎসা-ব্যবস্থা, তত্ত্বাবধান

* মোসলেম শরীফে হাদীছটির বর্ণনা মতে বন্ধনীর মধ্যবর্তী বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে।

× সেই যুক্তি এই যে, হায়েজের সর্বোচ্চ সময় দশ দিন এবং দুই হায়েজের মধ্যবর্তী সর্বনিম্ন সময় পনের দিন। প্রতি মাসে দশ দিন হায়েজ থাকিলে পকাশ ওয়াক্ত নামায কাযা হয়। পনের দিনে পকাশ ওয়াক্ত নামায অতিরিক্ত পড়িতে থাকা একরূপ অসাধ্য ব্যাপার বিধায় নামাযের কাযা ফরজ হয় নাই। কিন্তু দশটি মাত্র রোযা এগার মাসের মধ্যে কাযা অতীব সহজ, তাই উহার কাযা করার নিয়ম রাখা হইয়াছে।

ও রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করিতাম। সেই ভগ্নি একদিন রসুলুল্লাহ ছালাম্লাহ্ আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের মধ্যে যদি কাহারও ওড়না না থাকে, তাহার জন্ত (ঈদ ইত্যাদির জমাতে) না যাওয়াতে কি দোষ আছে? হযরত (দঃ) বলিলেন, অথ কাহারও ওড়নার সাহায্যে এছতেছকা, ঈদ ইত্যাদি দোয়ার সমাবেশে তাহারও শরীক হওয়া চাই। (হাফছাহ বর্ণনা করেন যে, অতঃপর বিশিষ্ট মহিলা ছাহাবী উম্মে-আ'তীয়া (রাঃ) আমাদের এখানে আসিলেন, আমি নিজে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি কি নবী ছালাম্লাহ্ আলাইহে অসাল্লামের নিকট এই বিষয়ে কিছু শুনিয়াছেন? তিনি তাঁহার চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী হযরতের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও আজমত প্রদর্শন করতঃ বলিলেন, প্রাপ্তবয়স্কা পর্দানশীন নারীগণ, এমনকি হায়েজ অবস্থায় হইলেও দোয়া উপলক্ষে বা নেক কাজের জমাতে শরীক হইবে। অবশ্য ঋতুবতী মহিলারা নামাযের স্থল হইতে পৃথক থাকিবে। হাফছাহ বলেন, আমি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ঋতুবতী নারীগণও কি উপস্থিত হইবে? তিনি বলিলেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? আরফার ময়দানে, মোজদালেফায়, মিনা ইত্যাদি স্থানে ঋতুবতী নারীরা (হজ উপলক্ষে) উপস্থিত হইয়া থাকে না?

ব্যাখ্যা :— রসুলুল্লাহ ছালাম্লাহ্ আলাইহে অসাল্লামের যমানায় নারীগণ পর্দার সহিত চাদরে আবৃত হইয়া ঈদ, এছতেছকা ইত্যাদি, এমনকি পাঁচ ওয়াক্তী নামাযের জমাতেও উপস্থিত হইতেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই বিষয়ে আদেশও করিয়াছেন। রসুলুল্লাহ ছালাম্লাহ্ আলাইহে অসাল্লামের যমানায় অনেক রকম বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমতঃ—নর-নারী সকলের মধ্যেই সততা অতি মাত্রায় বিদ্যমান ছিল, কোন প্রকার ফেতনার আশঙ্কা হইত না। দ্বিতীয়তঃ—ঐ সময় অহীর দরওয়াজা খোলা ছিল, নূতন নূতন হুকুম-আহুকাম নাযেল হইতে থাকিত। ঐ সময় শরীয়তের হুকুম-আহুকামের বহুল প্রচার ও ঘরে বসিয়া শিক্ষা লাভের সুযোগ ছিল না। সে সময় শিক্ষা প্রাপ্তির একমাত্র কেন্দ্র ছিলেন রসুলুল্লাহ (দঃ); তাঁহার প্রতিটি কথা কাজ ইত্যাদি শরীয়ত ছিল। তিনি আপাদমস্তক শরীয়তের নমুনা ছিলেন, বিশেষতঃ ছোট বড় জনসমাবেশে ও অল্পষ্ঠানাদিতে তাঁহার প্রতিটি বাক্যই শিক্ষা ও শরীয়ত হইত। প্রত্যেক নর-নারী ঐ সুযোগেই দ্বীন শিক্ষা করিত; এজ্জাই ঈদ, এছতেছকা ইত্যাদি অল্পষ্ঠানাদিতে নারীদের উপস্থিতির আদেশ ছিল। সেই আদেশ নামাযের জমাতে শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে হইলে হায়েজ অবস্থার নারীদিগকেও উপস্থিত হওয়া হইত না, অথচ তাহাদের প্রতিও ঈদগাহে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ ছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) পরে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য যাহা এ বিষয়ের আসল হেতু ছিল উহা বাকী থাকে নাই। প্রথম বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়াও দিন দিন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইতে থাকে। এই কারণেই ছাহাবীগণের যুগের ঈদ বা পাঞ্জেরগানা নামাযের জমাতে মহিলাদের যাওয়ার আদেশ ও অবকাশ রহিত পরিগণিত হইয়াছে। ওমর (রাঃ) উহাতে ভীষণ ক্ষুব্ধ হইতেন বলিয়া বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে। বিবি আয়েশার (রাঃ) উক্তি সম্মুখে আসিতেছে।

অধিকন্তু রশূল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানার নারীগণ সততার প্রতীক ও সাদাসিধা জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও নারীদের বাহির হওয়ার জন্ত এত কড়াকড়ি ছিল যে, রশূল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন—যখন কোন নারী মসজিদে উপস্থিত হইবে সে সুগন্ধি ছুঁইবে না। (মোসলেম শরীফ)

অন্য এক হাদীছে আছে—যে নারী মসজিদে আসার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করিবে তাহার নামায কবুল হইবে না—যাবৎ সে ফরজ গোসলের তায় বিশেষরূপে উহা ধৌত করতঃ গোসল না করিবে (নাছায়ী শরীফ)। আরও এক হাদীছে আছে—যে নারী সুগন্ধি ব্যবহার করিয়া কোন ঞন-সমাবেশের নিকটবর্তী হইবে সে ভ্রষ্টা নারী। (আবু দাউদ, নাছায়ী, তিরমিজ শরীফ)।

এ সমস্ত বিষয়ে নারীদের মধ্যে পরিবর্তনের প্রবল স্রোত যেরূপে দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে উহার প্রতি লক্ষ্য করিলে এ বিষয়ে রশূল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানার বিধি-ব্যবস্থা বর্তমান কদর্য যমানার বহু পূর্বেই স্বয়ং রশূল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশ-নিষেধ অনুসারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিতে হইবে। উম্মুল-মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) উহারই উল্লেখ করিয়াছেন ও বলিয়াছেন যে, হযরত রশূল্লাহ (দঃ) পর নারীগণের মধ্যে যে প্রকার পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে রশূল্লাহ (দঃ) উহা দেখিতে পাইলে নিশ্চয় নারীদিগের মসজিদে যাওয়া কঠোরভাবে নিষেধ করিতেন। (বোখারী ও মোসলেম শরীফ)

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, চৌদ্দ শত বৎসর পূর্বে হযরত রশূল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানার সংলগ্ন উত্তম শতাব্দীর নারীদের অবস্থা অনুপাতেই আয়েশা (রাঃ) উক্ত সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সেই তুলনায় বর্তমান ফেতনার যুগের উল্লেখ কোথায় হইতে পারে তাহা বলা বাহুল্য। সে জন্তই সমস্ত ইমামগণের ও আলেমগণের এজমা ও একমত যে, কিশোরী যুবতীদিগকে কোন ক্রমেই ঈদ, জুমা, জমাত ইত্যাদিতে শরীক হইতে দিবে না, এমনকি ইমামগণের পরের আলেমগণ বৃদ্ধাদের উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়াছেন।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—নারীদিগকে মসজিদে যাইতে নিষেধ করিও না; কিন্তু বাড়ীতে নামায পড়াই তাহাদের জন্ত শ্রেয়ঃ। (আবু দাউদ)

আরও এক হাদীছে আছে, নারীদের জন্ত বারান্দা অপেক্ষা আন্দর বাড়ীর নামায উত্তম। তছপরি খাস কুঠরীর নামায সর্বোত্তম। (আবু দাউদ শরীফ)

ঈদ ইত্যাদি নামাযের জন্ত নারীদের ভিন্ন জমাতের ব্যবস্থা করা শরীয়ত দৃষ্টে একেবারেই ভিত্তিহীন ও ব্যঙ্গ তুল্য। রশূল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম, ছাহাবা, তাবেয়ীন ও ইমামগণের যমানায় এরূপ ব্যবস্থার কল্পনাও কোন সময় করা হয় নাই, অথচ বর্তমান যুগের তুলনায় ঐ যুগে দীনের প্রতি আকৃষ্টতা ও নেক কার্যের প্রতি আগ্রহ কত বেশী ছিল তাহা বলা বাহুল্য। পূর্ববর্তী সকল আলেমই এরূপ ব্যবস্থাকে নিষেধ করিয়াছেন।

হায়েজের সময় ছাড়া জরদ ও মেটে রং-এর আব

২২৩। হাদীছ :— উম্মে-আ'তিয়া (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী (দঃ) এর বর্তমানে তাঁহার সময়েই আমরা জরদ, মেটে বা ধূসর রংয়ের নির্গত পদার্থকে (ঋতু সম্পর্কীয়) কিছুই গণ্য করিতাম না।

ব্যাখ্যা :— হায়েজকালীন বা হায়েজের সম্ভাব্য সময়ের মধ্যে লাল, জরদ, ধূসর ও মেটে যে কোন রং-আব হইবে উহাকে হায়েজ গণ্য করা হইবে। যেমন “হায়েজ আরম্ভ ও শেষ হওয়ার নিদর্শন” পরিচ্ছেদে আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু হায়েজের সম্ভাব্য সময় ভিন্ন অর্থাৎ সর্বদার অভ্যাসগত নির্দিষ্ট হায়েজের দিনগুলি বা হায়েজের সর্বোচ্চ দশদিন শেষ হইবার পর, তদ্রূপ অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের অথবা অধিক বয়সের ঋতুবদ্ধা মহিলাদের সময় সময় নানা রং এর কিছু আব দেখা যায় উহাকে হায়েজ গণ্য করা হইবে না।

এন্তেহাজার আব রূগবিশেষ হইতে নির্গত

২২৪। হাদীছ :— উম্মে-হাবিবা নারী ছাহাবীয়া সাত বৎসর যাবৎ এন্তেহাজার ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন। তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে (চিকিৎসা স্বরূপ) অধিক গোসল করার পরামর্শ দিলেন এবং বলিলেন, ইহা একটি বিশেষ রূগ হইতে নির্গত হইয়া থাকে। অর্থাৎ ইহা হায়েজ নয়; এই আব জরায়ু হইতে নির্গত হয় না। ইহা এন্তেহাজা; তাই তিনি প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করিয়া নামায পড়িতেন।

এন্তেহাজার অবস্থার হায়েজ শেষ হইলে তাহার হুকুম

অর্থাৎ যদি কাহারও সর্বদাই এন্তেহাজার আব হইতে থাকে তাহার জন্ত হুকুম হইল— প্রতি মাসে তাহার পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে সেই পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনগুলি হায়েজ গণ্য হইবে। ঐ দিন কয়টি গত হইয়া গেলে সে হায়েজ হইতে পাক-পবিত্র গণ্য হইবে, যদিও আব বন্ধ না হইয়া থাকে। কারণ এই আব এন্তেহাজা গণ্য হইবে, সুতরাং এখন হায়েজ হইতে পবিত্রতা হালিলের জন্ত গোসল করিয়া নামায আদায় করিতে থাকিবে এবং তাহার স্বামী তাহার সঙ্গে সহবাস করিতে পারিবে।

২২৫। হাদীছ :— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—(এন্তেহাজাভোগী নারী) হায়েজের সময় উপস্থিত হইলে নামায পরিত্যাগ করিবে এবং ঐ সময় গত হইয়া গেলে গোসল করিয়া নামায পড়িবে।

ঋতুবত্তীর সংস্পর্শনে নামাযের ক্ষতি হইবে না

২২৬। হাদীছ :— উম্মুল-মোমেনীন গায়যুনা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হায়েজ অবস্থায়—নামায না পড়াকালীন সময় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামাযের নিকটবর্তী স্থানে গুইয়া থাকিতাম। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) একদা ঐ অবস্থায় চাটাইর উপর নামায পড়িলেন; যখন তিনি সেজদায় যাইতেন তাহার কাণড় আমার শরীর স্পর্শ করিত।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● হায়েজান্তে গোসলের সময় মাথা আচড়াইবে (৪৫ পৃঃ) ; যেন চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছিতে কোন প্রকার বিঘ্নের সৃষ্টি না হয়। ● হায়েজান্তে গোসলের সময় চুলের থোপা বেণী ইত্যাদি ছাড়িয়া লইবে (৫৪ পৃঃ)। ● হায়েজ অবস্থায় হজ্জ এবং ওমরার এহরাম বাধা যায় (৫৬ পৃঃ)। ● বিশেষভাবে কাপড় পরিহিতা ঋতুবতী স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী এক বিছানায় শয়ন করিতে পারে (৫৪ পৃঃ ২১৪ হাঃ)। ● হায়েজ অবস্থার জন্য বিশেষ কাপড় যোগাড় রাখা ভাল (৪৫ পৃঃ ২১৪ হাঃ)। ● হজ্জের সময় তওয়াফে জিয়ারত করার পর হায়েজ আরম্ভ হইলে কোন ক্ষতি হইবে না (৪৭ পৃঃ)। (অর্থাৎ বিদায় তওয়াফ ছাড়াই হজ্জ পূর্ণ হইবে)। ● নেফাছ অবস্থায় যত্ন হইলে তাহার জানাযা নামায পড়িতে হইবে (৪৭ পৃঃ)। এখানে আরও একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করা হইয়াছে যে, “এক মাসে তিন হায়েজ অতিবাহিত হওয়ার দাবী গ্রহণযোগ্য।”

উহার ব্যাখ্যা এই যে, কোন নারী স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্ত হইলে তালাকের ইদত অতিবাহিত করা ঐ নারীর উপর ফরজ ; তালাকের ইদত তিন হায়েজ। সর্বনিম্ন কত দিনে তিন হায়েজ অতিবাহিত হইতে পারে সে বিষয় ইমাম যোখারীর (রঃ) মতে এই যে, এক মাসে তিন হায়েজ অতিবাহিত হওয়া সম্ভব। এই মতের সপক্ষে তিনি আলী (রাঃ) ও কাজী শোরায়হের একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন—তাঁহাদের সম্মুখে একটি মহিলা দাবী করিল, এ ৮ মাস পূর্বে স্বামী আমাকে তালাক দিয়াছিল, ইতিমধ্যেই তাহার তিন হায়েজ অতিবাহিত হইয়া ইদত শেষ হইয়া গিয়াছে। কাজী শোরায়হ বলিলেন, যদি নিকটবর্তী আত্মীয় দ্বীনদার পরহেজগার লোক সাক্ষ্য দেয় যে, আমরা তাহার তিন হায়েজ গত হওয়া লক্ষ্য করিয়াছি, সে প্রত্যেক হায়েজের সময় নামায ত্যাগ করতঃ হায়েজান্তে পবিত্র হইয়া নামায পড়িয়াছে, একরূপ সাক্ষী পাইলে দাবী গ্রহণীয় হইবে। আলী (রাঃ)ও এই রায়ে একমত হইলেন।

অথ কোন ইমামের মজহাবেই মাত্র এক মাসে তিন হায়েজ অতিবাহিত হইতে পারে না। ইমাম শাফেয়ীর মতে অন্ততঃ ৩৩ (তেত্রিশ) দিনে হইতে পারে। কারণ তাঁহার মতে হায়েজের সর্বনিম্ন সময় একদিন একরাত্র এবং দুই হায়েজের মধ্যবর্তী সময় সর্বনিম্ন পনের দিন। হানাফী মজহাব মতে কমপক্ষে ৩৯ (উনচল্লিশ) দিনে তিন হায়েজ গত হওয়া সম্ভব। কারণ হানাফী মজহাবে হায়েজের সর্বনিম্ন সময় তিন দিন, দুই হায়েজের মধ্যবর্তী সময় পনের দিন। (ফতুল্ল-কাদীর)

এস্থলে একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদি ঐ নারী তালাকের পূর্বে হায়েজের এবং হায়েজের মধ্যবর্তী সময়ের নির্ধারিত সংখ্যক দিনের অভ্যস্তা থাকে তবে তালাকের ইদত তিন হায়েজ অতিবাহিত হওয়ার দাবী অবশ্যই অভ্যস্ত সংখ্যার সামঞ্জস্যে হইতে হইবে এই সম্পর্কে সকলেই একমত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

তায়ানুম

আল্লাহ তায়াল্লা বলিয়াছেন—

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

“তোমরা যদি পানি সংগ্রহ বা ব্যবহার করিতে অক্ষম হও তবে পাক মাটির দ্বারা তায়ানুম কর—মুখমণ্ডল ও দুই হাত ঐ মাটি স্পর্শনে মছেহ কর।” (৬ পাঃ ৬ রূঃ)

২৭। হাদীছঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে কোন এক জেহাদের সফরে গিয়াছিলাম। বায়দা বা জাতুল-জায়শ নামক স্থানে পৌঁছিয়া আমার গলার মালাটি ছিন্ন হইয়া কোথাও পড়িয়া যায়; ঐ মালার তালাশে রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অপেক্ষা কঠিতে হয় এবং সকলেই অপেক্ষা করিতে বাধ্য হয়। সেখানে পানির কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাই সকলে (আমার পিতা আবুবকর ছিদ্দিকের (রাঃ) নিকট যাইয়া) অভিযোগ করিতে লাগিল যে, আপনি দেখেন না—আয়েশা কি কর্ম করিয়াছে? রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং সমস্ত লোকজনকে এমন এক মরুভূমিতে দাঁড় করিয়া রাখিয়াছে যেখানে পানির নাম নিশানা পর্য্যন্ত নাই এবং কাহারও সঙ্গেও পানি নাই। ইহা শুনিয়া আবুবকর (রাঃ) আমার নিকট আসিলেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তখন আমার উরুর উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছিলেন; আমার পিতা আমাকে তিরস্কার ও ভৎসনা কঠিতে লাগিলেন এবং আমার ভাগ্যে যাহা ছিল সব কিছু শুনাইলেন, এমনকি রাগান্বিত হইয়া আমাকে মুঠাঘাতও করিলেন। রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিজার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমি কোন প্রকার নড়াচড়াও করিতে পারিলাম না। এমনতাবস্থায় রাত্রি প্রভাত হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) ঘুম হইতে উঠিলেন, (ফজরের নামায সম্মুখে) পানির কোন ব্যবস্থা নাই, পানি তালাশ করা হইল, কিন্তু পাওয়া গেল না। তখনই আল্লাহ তায়াল্লা তায়ানুমের হুকুম বর্ণিত আয়াত নাযেল করিলেন। সকলেই তায়ানুম করিল। উছায়দ-ইবনে হুজায়ের নামক ছাহাবী (যাহাকে ঐ মালার তালাশে নিযুক্ত করা হইয়াছিল) এই খবর শুনিতে পাইয়া আনন্দ মুখর হইয়া বলিলেন, হে আবুবকর পরিবার! ইহা আপনাদের প্রথম বরকত নয়; আল্লাহ তায়াল্লা আপনার মঙ্গল করুন। খোদার কছম-যখনই আপনার উপর কোন প্রকার বিপদের আগমন হয় তখনই আল্লাহ তায়াল্লা আপনার জন্ত পথ প্রশস্ত করিয়া দেন এবং মোসলেম সমাজকে উপকৃত করেন। (হাদীছখানা বোখারী শরীফের দশ জায়গায় আছে।)

আয়েশা (রাঃ) বলেন—আমি যেই উটটির উপর সওয়ার ছিলাম ঐ উটটিকে বসা অবস্থা হইতে দাঁড় করান হইলে দেখা গেল, মালাটি ঐ উটের নীচে পড়িয়া আছে।

২২৮। হাদীছ :—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালামাহ্ আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (আল্লাহ তায়ালায় তরফ হইতে) আমাকে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দান করা হইয়াছে, আমার পূর্বে কেহই উহা লাভ করিতে পারে নাই। (১) সুদূর এক মাসের পথ হইতে শত্রু পক্ষকে ভীত ও ত্রাসিত করার শক্তিশালী প্রভাব দান করা হইয়াছে*। (২) সমস্ত ভূপৃষ্ঠকে আমার জন্ত নামাযের ও পবিত্রতা সাধনের উপযোগী সাব্যস্ত করা হইয়াছে। + যে স্থানে নামাযের সময় উপস্থিত হয় সেখানেই আমার উম্মত নামায আদায় করিতে পারিবে। (৩) গণীমতের মাল আমার জন্ত হালাল করা হইয়াছে, আমার পূর্বে কোন পয়গাম্বরের উম্মতের জন্ত উহা হালাল ছিল না। † (৪) শাফা'হাতের সুযোগ আমাকে বিশেষভাবে দান করা হইয়াছে ‡ (৫) আমি বিশ্ব মানবের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি, আমার পূর্বে প্রত্যেক নবী বিশেষ কোন জাতি ও সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হইতেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— আল্লাহ তায়ালায় তরফ হইতে রসুল্লাহ (দঃ)কে প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা পর পর বৃদ্ধিত হইতেছিল; নূতন নূতন বৈশিষ্ট্য হযরত (দঃ)কে পর পর দেওয়া হইয়াছিল। যখন যাহা দান করা হইয়াছে হযরত (দঃ) তাহা জ্ঞাত করিয়াছেন। কারণ, এই সব বৈশিষ্ট্য জ্ঞাত হওয়ার মাধ্যমে দীন-ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ঘাটিত হয় এবং জটিল সমস্যার সমাধান হয়। যেরূপ মুখবন্ধের মধ্যে “রসুল্লাহ আদর্শ সকল দেশ ও পরিবেশ এবং সকল যুগ ও কালের জন্ত” প্রবন্ধে ইসলামের উক্ত মৌলিক তথ্যটি হযরতের তিনটি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে এবং সেই বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই উহার জটিলতা খণ্ডন করা হইয়াছে। অনেক সময় হযরতের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা শরীয়তের

* খন্দকের জেহাদের পর আল্লাহ তায়ালা হযরত রসুল্লাহ (দঃ)কে এই বৈশিষ্ট্য দান করেন। এর পর আর কখনও তাহার উপর মদীনায় আসিয়া আক্রমণ করার সাহস কাফেরদের হয় নাই। রসুল্লাহ ছালামাহ্ আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, “এখন হইতে আমরা তাহাদের তথা কাফেরদের উপর আক্রমণ করিব, তাহারা আমাদের দেশে আসিয়া আমাদের উপর আক্রমণে সাহসী হইবে না।”

+ পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্ত মসজিদ ভিন্ন অন্য কোথাও নামায শুদ্ধ হইত না এবং তাগ্মাম্মের সুযোগ তাহাদের জন্ত ছিল না।

‡ পূর্বের উম্মতদের জন্ত এই বিধান ছিল যে, গণীমতের মাল একত্রিত করিবে; আসমান হইতে অগ্নিশিখা আসিয়া উহা ভস্ম করিয়া যাইবে, ঐ মাল কাহারও ব্যবহার করা হারাম ছিল।

† শাফা'হাতে-কোবরা—বড় শাফা'হাৎ অর্থাৎ কঠিন হাশর-মাঠে যখন তথাকার সমস্ত লোক ভীষণ দুঃখ-যাতনায় থাকিবে এবং সমূহ কষ্ট-যাতনা হইতে অব্যাহতি লাভ উদ্দেশ্যে হিসাব আরম্ভের জন্ত সুপারিশ চাহিয়া লোকগণ বড় বড় নবীগণের স্মরণাপন্ন হইবে। কিন্তু কোন নবীই সেই সুপারিশের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না। সেই মুহূর্তের ঐ সুপারিশকেই “শাফা'হাতে-কোবরা” বলা হয়—যাহা দ্বারা পূর্বাগত সমগ্র বিশ্বের উম্মতগণ উপকৃত হইবে। নবী (দঃ) ঐ শাফা'হাৎ বা সুপারিশের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন এবং কৃতকার্য হইবেন—ইহা তাহারই বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া অতি সামান্ত দৈমানধারী বড় বড় গোনাহগারের জন্ত শাফা'হাত করাও হযরত রসুল্লাহ (দঃ)এর বৈশিষ্ট্য।

মুহাম্মাদ হা দী ছ হওয়া যায়। যেমন, আলোচ্য হাদীছ দ্বারা তায়ান্মুমের বিধান, মসজিদ ভিন্ন অন্ত্র নামায শুদ্ধ হওয়া, গণীমতের মালামাল হালাল হওয়া জানা গেল। এতদ্বিধ দুইটি বিশেষ তথ্য জ্ঞাত হওয়া গেল—একটি উপস্থিত সুসংবাদ, অপরটি কেয়ামত পর্যন্ত ঈমানের অংশ। উন্নতকে এই শ্রেণীর জ্ঞান দানের জন্যই হযরত (ঃ) আল্লাহ-প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ উন্নতকে জ্ঞাত করিতেন।

আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ছাড়াও মোসলেম শরীকের বিভিন্ন হাদীছের সমষ্টিতে আরও তিনটি বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা পাওয়া যায়—উহার দুইটির বর্ণনা মুখবন্ধে উল্লেখিত প্রবন্ধে আছে। তৃতীয়টি হইল—পূর্ব উন্নতগণের নামাযে মোক্তাদীদের ছক তথা শূশ্বল কাতার-বন্দির বিধান ছিল না; ফেরেশতাদের মধ্যে এই নিয়ম রহিয়াছে। হযরতের উন্নতের জন্য আল্লাহ সেই নিয়মকে উহার মর্যাদা সহ প্রবর্তিত করিয়াছেন তথা এই উন্নতের নামাযের কাতারকে আল্লাহ তায়াল। ফেরেশতাদের কাতাররূপ মর্যাদাবান সাব্যস্ত করিয়াছেন।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বৈশিষ্ট্যের সর্বমোট সংখ্যা ষাট পর্যন্ত পৌঁছে বলিয়া একজন আলেম উল্লেখ করিয়াছেন। (ফতহুল-মোলহেম ২—১১৩)

অক্ষমতা ও আশঙ্কার ক্ষেত্রে বাড়ীতেও তায়ান্মুম করা যায়

হাসান বছরী (রাঃ) বলেন, রুগ্ন ব্যক্তি—যে নড়াচড়া করিতে অক্ষম; পানি উপস্থিতকারী কাহাকেও না পাইলে তায়ান্মুম করিতে পারিবে। আবুহুলাহ ইবনে ওমর (রাঃ) অনেক দূরের এক জায়গা হইতে প্রত্যাবর্তনকালে মদীনা হইতে মাত্র এক মাইল ব্যবধানের এক স্থানে পৌঁছিলে আছরের ওয়াক্ত হইল; পানির ব্যবস্থা ছিল না, তায়ান্মুম করিয়া নামায পড়িলেন। সূর্য্যাস্তের পূর্বেই মদীনায় পৌঁছিলেন, কিন্তু সেই নামায পুনঃ দোহরাইলেন না।†

২২৯। হাদীছঃ— আবুজোহায়ম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বীরে জামাল নামক স্থান হইতে আসিতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হইল। সে নবী (দঃ)কে সালাম করিল, তিনি সালামের উত্তর না দিয়া এক দেয়ালের নিকটবর্তী যাইয়া দুই হাতের তালুর দ্বারা উহার সংস্পর্শনে মুখমণ্ডল ও দুই হাত মছেহ (তথা তায়ান্মুম) করিলেন, তারপর ঐ ব্যক্তির সালামের উত্তর দিলেন।

ফুঁক দিয়া হাতের অতিরিক্ত মাটি ফেলিয়া তায়ান্মুম করিবে

২৩০। হাদীছঃ— এক ব্যক্তি ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, যদি আমার উপর গোসল ফরজ হয়, কিন্তু পানি পাওয়া না যায় তখন কি করিতে হইবে? আশ্চর্য ইবনে ইয়াজের নামক ছাহাবী সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি ওমর (রাঃ)কে বলিলেন—আপনার কি স্মরণ নাই যে, আমি ও আপনি একবার সফরে ছিলাম, সে অবস্থার আমাদের

† পশ্চিমধ্যে আছরের নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইলে তখন তাঁহার জানা ছিল না যে, তিনি পূর্ণ ওয়াক্ত থাকিতে মদীনায় পৌঁছিতে পারিবেন, নচেৎ মদীনায় পৌঁছিয়া অল্প করিয়াই নামায পড়িতেন।

উভয়েরই গোসল ফরজ হয়; পানির ব্যবস্থা ছিল না। আপনি নামায পড়িলেন না, ‡ কিন্তু আমি মাটির উপর শুইয়া গড়াগড়ি করিয়া সমস্ত শরীরে ধুলা মাখিয়া লইলাম+ এবং নামায পড়িলাম। তারপর নবী ছালাম্লাহ্ আলাইহে অসাল্লামের নিকট ঘটনা বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন, তোমার জন্ত মাত্র এতটুকুই যথেষ্ট ছিল—এই বলিয়া তাঁহার দুই হাত মাটির উপর মারিলেন এবং হাত উঠাইয়া উহাতে ফুক দিলেন, অতঃপর হস্তদ্বয় দ্বারা মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মছেহ করিলেন।

পাক মাটি পানির পরিবর্তে পবিত্রতা লাভের বস্তু

হাসান বছরী (রাঃ) বলেন, তায়ান্মুম ভঙ্গের কারণ না পাওয়া পর্য্যন্ত এক বারের তায়ান্মুমই একাধিক নামাযের জন্ত যথেষ্ট।* ইবনে আব্বাস (রাঃ) তায়ান্মুম অবস্থায় ইমামতী করিয়াছেন। ইয়াহুইয়া ইবনে সায়ীদ (রাঃ) বলিয়াছেন, লোনা মাটিতে নামায পড়া যায় এবং তদ্বারা তায়ান্মুমও করা যায়।

২৩১। হাদীছ :-এমরান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবী ছালাম্লাহ্ আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে কোন সফরে ছিলাম; আমরা সমস্ত রাত্রি চলিয়া (ক্লাস্ত হইয়া) শেষ রাত্রে নিদ্রামগ্ন হইলাম; পথিকের জন্ত ঐ নিদ্রা বড়ই মধুর হয়। (ফজরের সময় আমাদের ঘুম ভাঙ্গিল না;) একমাত্র সূর্য্যোতাপই আমাদের নিদ্রা ভঙ্গ করিল। প্রথমে আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এবং পর পর আরও দুই ব্যক্তি জাগ্রত হইলেন। নবী (দঃ) স্বয়ং নিদ্রোখিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিতাম না, কারণ সময় সময় হযরতের উপর নিদ্রাবস্থায় অহী নাযেল হইত, আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতাম না।

ওমর (রাঃ) নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া সকলের এই অবস্থা দেখিলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহ্ আকবার বলিতে লাগিলেন। তাঁহার তকবীরের আওয়াজে হযরতের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সকলেই হযরতের নিকট নিজেদের এই অবস্থার উপর আক্ষেপ ও অনুতাপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি সকলকে সাবুনা দিয়া বলিলেন, বিচলিত হইও না, এখান হইতে চল। এই বলিয়া সকলকে নিয়া রওয়ানা হইলেন; কিছু দূর যাইয়াই অবতরণ করিলেন এবং অজুর পানি আনিতে বলিলেন ও অজু করিলেন। তারপর (ঐ ফজরের কাজ) নামাযের জন্ত আজান দেওয়া হইল। সকলকে লইয়া তিনি নামায পড়িলেন; নামাযান্তে দেখিলেন, এক ব্যক্তি নামাযে শরীক না হইয়া পৃথকভাবে বসিয়া আছে। নবী (দঃ) তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি সকলের সঙ্গে নামাযে শরীক হইলে না কেন?

‡ কারণ গোসলের পরিবর্তে তায়ান্মুম করার হুকুম তখন তাঁহার জানা ছিল না।

+ গোসলের পরিবর্তে তায়ান্মুমের হুকুম জানা ছিল না, কিন্তু অজুর তায়ান্মুমে হাত ও মুখ মছেহ করা হয়। এই তুলনায় গোসলের পরিবর্তে সমস্ত শরীরে মাটির সংস্পর্শ করিলেন।

* অর্থাৎ প্রত্যেক নামাযের জন্ত নূতনভাবে তায়ান্মুম করিতে হইবে না, অজুর দ্বারা এক তায়ান্মুম দ্বারা নামায পড়া যায় যাবৎ তায়ান্মুম ভঙ্গের কোন কারণ উপস্থিত না হয়।

সে আরজ করিল, আমার উপর গোসল করজ হইয়াছিল, কিন্তু পানির ব্যবস্থা নাই। নবী (দঃ) বলিলেন, তুমি মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করিয়া লও ; উহাই তোমার জন্ত যথেষ্ট। তারপর তিনি ওখান হইতে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে সকলেই তাঁহার নিকট পিপাসার অভিযোগ করিতে লাগিল। তিনি এক স্থানে অবতরণ করিয়া আলী (রাঃ) ও এমরান (রাঃ)কে পানির তালাশে বাহিরে পাঠাইলেন। তাঁহারা পানির তালাশে বাহির হইলেন এবং দেখিতে পাইলেন, জনৈকা মহিলা উটের উপর দুই মশক পানি লইয়া যাইতেছে। তাঁহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পানি কোথায় ? সে বলিল, পানি এখান হইতে পূর্ণ একদিন এক রাত্রির পথ দূরে। আনাদের পুরুষগণ সকলেই বিদেশ গমন করিয়াছে ; (সেই জন্তই আমি পানির জন্ত বাহির হইয়াছি।) তাঁহারা বলিলেন, তুমি আমাদের সঙ্গে চল ; সে বলিল, কোথায় ? তাঁহারা বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট। সে বলিল—এ ব্যক্তি, যাহাকে স্বীয় পূর্ব-পুরুষদের ধর্মত্যাগী বলা হয় ? তাঁহারা বলিলেন, তুমি যাহাকে চিনিতে পারিয়াছ তিনিই ; তুমি চল। তাঁহারা তাহাকে সঙ্গে লইয়া রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং সমস্ত ঘটনা শুনাইলেন। মহিলাটিকে উট হইতে নামানো হইল ; রসুলুল্লাহ (দঃ) একটি পাত্র আনাইলেন এবং মশক দুইটি হইতে সামান্য পানি ঢালিয়া (উহার মধ্যে কুল্লি করিলেন এবং ঐ কুল্লিযুক্ত পানি বাটির মধ্যে পুনরায় ঢালিয়া দিয়া) উহার ঐ যুথ বাঁধিয়া দিলেন এবং পানি বাহির করার জন্ত তলদেশের ছোট মুখ খুলিয়া দিলেন এবং সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, সকলেই ইচ্ছানুযায়ী পানি পান কর, নিজের যানবাহন পশুগুলিকেও পান করাও। সকলে তাহাই করিল এবং ঐ ফরজ গোসল গোলা ব্যক্তিকেও একটি পাত্র ভরিয়া পানি দেওয়া হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে বলিয়া দিলেন, যাও এই পানি শরীয়ে ঢালিয়া গোসল কর। ঐ মহিলাটি দাঁড়াইয়া করণ দৃষ্টে তাকাইতেছিল এবং তাহার পানি কি করা হইতেছে তাহা দেখিতে ছিল। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এমরান (রাঃ) শপথ করিয়া বলিতেছেন, সকলেই পানি ব্যবহার করিয়া কান্ত হইলে পর মশক দুইটি পূর্বের চেয়ে অধিক পরিপূর্ণ দেখা যাইতেছিল। তারপর রসুলুল্লাহ (দঃ) সকলকে বলিলেন, মহিলাটির জন্ত পারিতোষিক ও বখশীশ স্বরূপ কিছু সংগ্রহ কর। তখন খেজুর, আটা ও ছাতু ইত্যাদি খাতবস্ত্র তাহার জন্ত সংগ্রহ করিয়া একটি কাপড়ে বাঁধিয়া দেওয়া হইল এবং তাহাকে উটের পিঠে বসাইয়া খাতবস্ত্র পটুলিটি তাহার সম্মুখে রাখিয়া দেওয়া হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে বলিলেন, তুমি দেখিতেছ ও উপলব্ধি করিতেছ যে, আমরা তোমার পানি কম করি নাই, (তোমার মশকদ্বয় এখনও পরিপূর্ণ আছে,) তবে (আমরা যাহা খরচ করিয়াছি উহা) আল্লাহ তায়ালা আমাদের পান করাইয়াছেন। তারপর সে যখন নিজ বাড়ীতে পৌঁছিল, বাড়ী ফিরিতে গৌণ হওয়ায় বাড়ীর সকলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় আবদ্ধ ছিলে যে কারণে তোমার ফিরিতে এত গৌণ হইল ? সে উত্তর করিল, আশ্চর্য্য এক ঘটনা ! রাস্তায় দুই

ব্যক্তির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইলে তাহারা আমাকে ঐ ব্যক্তির নিকট লইয়া গেল যাহাকে পূর্ব-পুরুষদের ধর্মত্যাগী বলা হয়। এইরূপে পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করিয়া সে শপথ করিয়া বলিল, আসমান-জমীনের মধ্যে তাঁহার তুল্য অলৌকিক ঘটনা কেহ দেখাইতে পারিবে না; নিশ্চয় তিনি আল্লাহর প্রেরিত সত্য রসূল। তারপর হইতে মোসলমানগণ ঐ মহিলাটির গ্রামের চতুর্পার্শ্বে মোশরেকদের আক্রমণ করিত, কিন্তু তাহার গোত্রকে কিছুই বলিত না। এই ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ মহিলা একদিন তাহার গোত্রীয় সকলকে ডাকিয়া বলিল, আমার ধারণা এই যে, মোসলমানগণ (ঐ পানির ঘটনার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ) ইচ্ছা করিয়াই তোমাদের উপর কোন প্রকার আক্রমণ করেন না; (এরূপ অমায়িক ধর্ম) ইসলামের প্রতি কি তোমাদের আগ্রহ হয়? সকলেই তাহার ডাকে সাড়া দিল এবং ইসলাম গ্রহণ করিল।

জানাবাতের গোসলে মৃত্যু বা রোগের আশঙ্কা হইলে কিম্বা পানি ব্যয় করার
পানীয় পানির অভাব হইলে তায়াম্মুম করিবে

ছাহাবী আমর-ইবনে-আছ (রাঃ) ভীষণ শীতের প্রকোপময় এক রাত্রে জানাবাতের সম্মুখীন হইলেন। তখন তিনি গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করিলেন এবং এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ দেখাইলেন—

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“তোমরা নিজকে মৃত্যুপথে টানিয়া নিও না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি অতি মেহেরবান; (তিনি সুযোগ-সুবিধা দিয়াছেন; উহা উপেক্ষা করিয়া বিপদ টানিয়া আনিও না।)”

আমর-ইবনে-আছ (রাঃ) ছাহাবীর উক্ত ঘটনা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জ্ঞাত হইয়াও তাঁহাকে বিপরীত কিছুই বলেন নাই।

২৩২। হাদীছ :—একদা আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) আবু হুলাইহ ইবনে মসউদ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন ব্যক্তি জানাবাতের সম্মুখীন হইয়া দীর্ঘ এক মাস পর্য্যন্তও পানির ব্যবস্থা করিতে না পারিলে সে কি তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়িবে? (অর্থাৎ অভ্যুত্থানের পরিবর্তে তায়াম্মুমের স্থায় করজ গোসলের পরিবর্তেও তায়াম্মুম হয় কি?) আবু হুলাইহ (রাঃ) বলিলেন, তাহার জন্ত তায়াম্মুম করা যথেষ্ট হইবে না। যে পর্য্যন্ত পানির ব্যবস্থা করিতে না পারে নামায কাযা করিবে। দীর্ঘ এক মাস পর্য্যন্ত পানির ব্যবস্থা না হইলেও তাহাই করিবে। আবু মুসা (রাঃ) আবু হুলাইহ (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি জানেন না যে, আম্মার (রাঃ) তাঁহার প্রতি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তোমার জন্ত (জানাবাত অবস্থায়) এরূপ (তায়াম্মুম) করিয়া লওয়া যথেষ্ট।* এই বলিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) দুই হাত মাটিতে মারিলেন এবং একটু ঝাড়া দিয়া ডান হাতের দ্বারা বাম হাত ও বাম হাতের দ্বারা ডান হাত এবং মুখমণ্ডল মছেহ করিলেন। আবু হুলাইহ (রাঃ) বলিলেন, আপনি

দেখেন না যে, ঘটনার বর্ণনা শুনিয়া ওমর (রাঃ) উহার প্রতি মনোযোগ দেন নাই+। তখন আবু মুসা (রাঃ) বলিলেন, আচ্ছা—আম্মারের ঘটনা বর্ণনা না ই হউক, কিন্তু কোরআন শরীফে ছুরা মায়েরদার আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করুন—**فلم تجدوا ماء فتيمموا - رءيدا طيبا**

অর্থাৎ অজু ভঙ্গ বা জানাবাত অবস্থায় “পানির ব্যবস্থা না হইলে তায়াম্মুম করিয়া লও।” আবু হুলাইহ (রাঃ) এই আয়াতের কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, কিন্তু তিনি বলিলেন, জানাবাত অবস্থায় গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুমের সুযোগ প্রদান করা হইলে শীতের দিনে পানি ঠাণ্ডা লাগায় তায়াম্মুমের সুযোগ নেওয়া হইবে। তখন আবু মুসা (রাঃ) আবু হুলাইহ (রাঃ)কে বলিলেন, আচ্ছা। আপনি শুধু কেবল এই আশঙ্কায় জানাবাতের জন্য তায়াম্মুমের ফতওয়া দিতে চান না? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ।↑

ব্যাখ্যা :—ছুরা মায়েরদার আয়াতের অনুরূপ ছুরা নেছাতে যেই আয়াত রহিয়াছে উহাতেও জানাবাত তথা করজ গোসলের জন্য প্রয়োজনে তায়াম্মুম করিবে বলিয়া উল্লেখ আছে। ২৩০নং হাদীছেও বর্ণিত আছে যে, প্রয়োজনে করজ গোসলের জন্য তায়াম্মুম করিবে। সমস্ত ইমামগণের মতাবলম্ব ইহাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—এই হাদীছ দ্বারা ইমাম বোখারী (রঃ) আরও একটি পরিচ্ছেদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, “তায়াম্মুমে হাত ও মুখ উভয়কে মছেহ করিতে মাত্র একবার মাটি স্পর্শন যথেষ্ট।” দুইটি অঙ্গের জন্য দুইবার হাত মাটিতে মাটিতে হইবে না। ইহা কোন কোন ইমামের মত, কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী এবং অধিকাংশ আলেমগণের মত এই যে, প্রত্যেক অঙ্গের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ দুইবার হাত মাটিতে মারিবে। এ সম্পর্কে একাধিক হাদীছ বিদ্যমান আছে।

ইমাম বোখারী (রঃ) আরও দুইটি পরিচ্ছেদ এই অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—
(১) “যদি কেহ পানি ও মাটি কোনটিরই ব্যবস্থা করিতে না পারে।” এমতাবস্থায় অজু ব্যতিরেকেই নামায পড়িবে। অবশ্য অধিকাংশ ইমামগণের মতে তাহাকে সুযোগ অনুযায়ী অজু বা তায়াম্মুম করিয়া পুনরায় ঐ নামায কাযাও পড়িতে হইবে।

(২) “তায়াম্মুম মুখমণ্ডল ও শুধু দুই হাতের কজা মছেহ করা”। ইহা কোন কোন ইমামের মত। কিন্তু একাধিক হাদীছ দৃষ্টে ইমাম আবু হানীফা (রঃ), ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এবং অধিকাংশ ওলামাগণ বলেন, দুই হাত কনুই পর্য্যন্ত মছেহ করিবে—যে পরিমাণ অজুতে ধৌত করিতে হয়।

+ ওমর (রাঃ) স্বয়ং ঐ ঘটনার জড়িত ছিলেন বলিয়া আম্মার (রাঃ) নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু ওমর (রাঃ) পূর্ণ ঘটনাই ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাই তিনি ইহার গুরুত্ব দেন নাই, কিন্তু আম্মার (রাঃ)কে এই ঘটনার দ্বারা প্রমাণ করিয়া মহাআলাহ বয়ান করিতে বাধ্যও দান করেন নাই, বরং তাহার উপরই এই ঘটনার দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

↑ এই হাদীছখানা পর পর তিনবার উল্লেখ হইয়াছে; সমষ্টির অনুবাদ হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়

নামায

নামায ফরজ হওয়ার বিবরণ

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনায হিজরত করার পূর্বে মক্কায অবস্থানকালেই নামায ফরজ হইয়াছিল। ৬নং হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে, মক্কাবাসী আবু সুফিয়ান সত্ৰাট হেরাক্লিয়াসের এক প্রশ্নের উত্তরে এই উক্তি করিয়াছিল যে, (এই নবী) আমাদিগকে নামায, সত্যবাদিতা ও সংযমশীলতার আদেশ করিয়া থাকেন।

এখানে ইমাম বোখারী (র:) মে'রাজ শরীফের ঘটনার হাদীছ উল্লেখ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, মে'রাজের রাতে নামায ফরজ হয়। প্রথমতঃ দিবারাত্রে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়। রসুলুল্লাহ (স:) পূর্ণ আনুগত্যের সহিত উহা গ্রহণে আল্লাহর দরবার হইতে ফিরিলেন। পশ্চিমধ্যে মুসা (আ:)—এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল; তিনি তাহাকে পরামর্শ দিলেন যে, ইহা আপনার উদ্ভূতের জন্ত কঠিন হইবে, ইহা হাস করার জন্ত আপনি আল্লাহর নিকট আবেদন করুন। রসুলুল্লাহ (স:) তাহাই করিলেন; এইবার পাঁচ ওয়াক্ত কম করিয়া দেওয়া হইল। মুসা (আ:)—এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে পর তিনি পুনরায় ঐ পরামর্শই দিলেন। রসুলুল্লাহ (স:) পুনরায় গেলেন, এইভাবে পুনঃ পুনঃ যাইতে লাগিলেন এবং পাঁচ পাঁচ ওয়াক্ত কম হইতে লাগিল। শেষবার যখন পাঁচ ওয়াক্ত থাকিয়া গেল, তখন আল্লাহ তায়ালা বলিয়া দিলেন, এই পাঁচ ওয়াক্তকে পূর্ণভাবে দাদায় করিলে ইহাই পঞ্চাশ ওয়াক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। আমি প্রথমে যাহা বলিয়াছি—“পঞ্চাশ ওয়াক্ত” আমার নিকট (ছওয়াবের ক্ষেত্রে) তাহাই ঠিক রহিল। এইবারও মুসা (আ:) আরও কম করার জন্ত পুনরায় যাইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত হওয়ার পরও পুনরায় আল্লাহ তায়ালা নিকট আরও কম করার আবেদন করিতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম লজ্জা বোধ করিলেন।

মে'রাজ শরীফের ঘটনার হাদীছ পূর্ণভাবে বিষদ ব্যাখ্যার সহিত ইনশা-আল্লাহ তায়ালা পঞ্চম খণ্ডে মে'রাজ শরীফের পরিচ্ছেদে অনূদিত হইবে।

২৩৩। হাদীছ :—আয়েশা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, প্রথমতঃ আল্লাহ তায়ালা নামায ফরজ করেন মুসাফির অবস্থায় ও বাড়ীতে থাকাকালীন—সর্বাবস্থায়ই (মগরেব ভিন্ন) প্রত্যেক ওয়াক্ত নামায দুই রাকাত। পরে সফর অবস্থায় জন্ত দুই রাকাত ঠিকই রহিল, কিন্তু বাড়ী থাকাকালীন অবস্থায় (তিন ওয়াক্ত) নামায চার চার রাকাত করিয়া দেওয়া হইল।

নামায পড়িতে কাপড় পরা ফরজ

অর্থাৎ নামায অবস্থায় ছতর (তথা বিশেষ অঙ্গসমূহ) ঢাকিতে হইবে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—**خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ** “প্রত্যেক নামাযেই কাপড় পরিবে।”

ছালামা ইবনে তাকওয়া (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি শিকারে অভ্যস্ত। কোন সময় শুধু চম্বা একটি জামা পরিধান করিয়া থাকি, ঐ অবস্থায় নামায পড়িতে পারিব কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ—কিন্তু বুতামের প্রতি লক্ষ্য রাখিও। বুতাম না থাকিলে কাটা দ্বারা হইলেও বুতাম পড়ি গাঁথিয়া লও, যেন বুকের উপর জামা উন্মুক্ত না থাকে। নতুবা রুকু করার সময় খীয় দৃষ্টি গুপ্তস্থানের উপর পড়িতে পারে।

উল্লিখিত হাদীছের সনদ তথা ক্রমিক সাক্ষীসমূহের এবজন সাক্ষী দুর্বল, তাই ইহা দ্বারা কঠোর আদেশ প্রমাণিত হইবে না এবং নিজের দৃষ্টি নিজের ছতরের উপর পড়িলে তাহাতে নামায বাতিল হইবে না। অবশ্য মকরুহ হইবে।

একটি মাত্র চাদরে আবৃত হইয়া নামায পড়িলে উহা ষাড়ের সঙ্গে গিরা দিয়া লইবে

ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এক চাদর পরিধান করিয়া নামায পড়িলে ঐরূপভাবেই পড়িতেন। কারণ, সমস্ত শরীর আবৃত করার উদ্দেশ্যে চাদরটিকে সীনার উপর বাঁধিলে চাদর খুলিয়া পড়িয়া যাওয়ার আশঙ্ক থাকে এবং ঐ আশঙ্কায় নামাযী ব্যক্তি সন্তুষ্ট থাকিবে—তাহার লক্ষ্য ও ধ্যান আল্লার প্রতি নিক্ষেপ করিতে বাধাপ্রাপ্ত হইবে। তাই রাসূলুল্লাহ (দঃ) ঐরূপ খুটিনাটি বিষয়ে এমন আদর্শের শিক্ষা দান করিয়াছেন যাহাতে নামায অবস্থায় একাগ্রচিত্তে, কাফমনোবাক্য এক আল্লার প্রতি ধ্যানে মগ্ন হওয়ার পক্ষে বিন্দুমাত্র বাধার সৃষ্টি না হইতে পারে। যেমন পায়খান প্রস্রাবের বেগ লইয়া বা ক্ষুধার্ত অবস্থায় আহারের প্রতি আগ্রহ লইয়া নামাযে দাঁড়াইতে নিষেধ করা হইয়াছে।

২৩৪। হাদীছ :— ছাহাবী জাবের (রাঃ) একটা একটি মাত্র চাদরে আবৃত হইয়া ষাড়ের সঙ্গে গিরা লাগাইয়া নামায পড়িলেন; অথচ তাঁহার অজান্তে কাপড় সম্মুখে আলনার উপর রাখা ছিল। এক ব্যক্তি তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, আপনি মাত্র এক কাপড়ে নামায পড়েন? তিনি বলিলেন হাঁ—আমি ইচ্ছা করিয়াই ঐরূপ করিয়াছি; যেন তোমার মত বোকা মানুষ আমাকে দেখিয়া শিক্ষা লাভ করিতে পারে। হযরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ে আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির দুই কাপড় ছিল?

ব্যাখ্যা :— শয়তান অতিশয় ধূর্ত; সে মানুষকে বাহ্যিকভাবে ভাল পথ দেখাইয়াও প্রকৃতপক্ষে তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে চায়। সাধারণতঃ দেখা যায়, অনেক লোক নামায পড়ে না; জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া থাকে, নামাযের জন্য কাপড়ের সূ-ব্যবস্থা নাই। সেই জন্য নামায পড়ি না। সামর্থ অনুযায়ী নামাযের জন্য কাপড়ের সূ ব্যবস্থা রাখা ভাল কথা, কিন্তু শয়তান তাহাকে এই পথ দেখাইয়া কিরূপ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত করিল, য, কাপড়ের ছুতা দিয়া তাহাকে নামায ছাড়াইয়া দিল, অথচ কাপড় একেবারে না থাকিলেও নামায

মাফ হয় না; উলঙ্গ অবস্থায়ই নামায পড়িতে হইবে। শয়তান মানুষকে সাধুতার সহিতও ধোকা দিয়া থাকে, সে জন্যই অনুকরণযোগ্য আদর্শ শ্রেণীর ব্যক্তিদের উচিত সব-সাধারণকে দেখাইবার জন্য সময় সময় একরূপ কার্য করা যাহা শরীয়ত অনুযায়ী জায়েযের গতিভুক্ত। যদিও উহা উত্তমের বিপরীত হয়। ছাহাবী জাবের (রাঃ) উল্লেখিত ঘটনায় এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

২৩৫। হাদীছ :—মোহাম্মদ ইবনে মোনকাদের (রাঃ) বলেন, আমি ছাহাবী জাবের (রাঃ)কে এক কাপড়ে নামায পড়িতে দেখিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এক কাপড়ে নামায পড়িতে দেখিয়াছি।

লম্বা চাদরে আবৃত হইয়া নামায পড়িলে চাদরের উভয় দিক
দুই কাঁধের উপর পিছনের দিকে ঝুলাইয়া দিবে

অর্থাৎ—এক চাদর দ্বারা আবৃত হইয়া নামায পড়িতে হইলে যদি চাদরটি বিশেষ লম্বা না হয় তবে উহার দুই মাথা বাড়ের উপর দিয়া গিরা লাগাইয়া দিবে। লম্বা হইলে চাদরের ডান বাম কাঁধে ও বাম দিক ডান কাঁধে পেছনের দিকে ঝুলাইয়া দিবে, গিরা দিতে হইবে না।

২৩৬। হাদীছ :—ওমর ইবনে আবু ছালামা (রাঃ) বলেন, আমি দেখিয়াছি উম্মুল-মোমেনীন মায়মুনা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহারু গৃহে রশ্বলুলাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি চাদর উভয় দিক কাঁধের উপর ঝুলাইয়া পরিধান করতঃ নামায পড়িয়াছেন।

২৩৭। হাদীছ :— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রশ্বলুলাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, এক কাপড়ে নামায পড়া কিরূপ? হযরত (রাঃ) বলিলেন, তোমাদের প্রত্যেকের কি দুইটি কাপড় থাকে? অর্থাৎ—এক কাপড়ে নামায পড়া জায়েয না হইলে অনেকের জন্য অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। অবশ্য সামর্থ থাকিলে পূর্ণ পোশাকে নামায পড়া উচিত।

২৩৮। হাদীছ :— আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি সক্ষ্য দিতেছি, রশ্বলুলাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে আমি এই কথা বলিতে শুনিয়াছি—যে ব্যক্তি এক কাপড়ে নামায পড়িবে আশুই চাদরের ডানদিক বাম কাঁধে বামদিক ডান কাঁধে ঝুলাইয়া লইবে।

অপ্রশস্ত কাপড়ে কিরূপে নামায পড়িবে?

২৩৯। হাদীছ :— ছায়ীদ ইবনে হারেছ বলেন, আমরা জাবের (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম এক কাপড়ে নামায পড়া যায় কি? তিনি বর্ণনা করিলেন, আমরা কোন এক জেহাদের ছফরে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। রাত্রিকালে আমি নিশ্বের কোন প্রয়োজনে হযরতের নিকট আসিলাম; দেখিলাম, তিনি নামাযে মশগুল আছেন। আমার পরিধানে একটি মাত্র কাপড় ছিল, (কাপড়টি অপ্রশস্ত ও খাট ছিল,

তাই কুঁজোর ছায় হইয়া কোন প্রকারে) ঐ কাপড়টি পেঁচাইয়া পূর্ণ শরীর আবৃত করিলাম এবং হযরতের এক পার্শে দাঁড়াইয়া নামাযে শরীক হইলাম। নামাযান্তে হযরত (দ:) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এত রাতে কেন আসিয়াছ? আমি আমার প্রয়োজন ব্যক্ত করিলাম। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এভাবে কাপড় পরিয়াছিলে কেন? আরজ করিলাম, একটি মাত্র কাপড় (তাও খাট, পূর্ণ শরীর আবৃত করার জন্য বাধ্য হইয়াই এরূপ করিতে হইয়াছে)। হযরত (দ:) বলিলেন, এক কাপড়ে নামায পড়িতে হইলে, যদি প্রশস্ত হয় তবে উহার দ্বারা পূর্ণ শরীর আবৃত করিবে, অপ্রশস্ত (খাট) হইলে উহাকে লুঙ্গির ছায় পরিবে।

২৪০। হাদীছ :—হুহুল (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে অনেক পুরুষ এসমতাবস্থায় নামায পড়িত যে, একটি মাত্র চাদর দ্বারা পূর্ণ শরীর আবৃত করিয়া চাদরের দুই মাথা ঘাড়ের উপর গিরা দিয়া রাখিত—যেমন শিশুদেরকে চাদর পরান হইয়া থাকে। (এ অবস্থায় সেজদার সময় চাদরটি শরীরের নিম্ন অংশ হইতে ফাঁক হইয় থাকার দরুন পেছনের দিকে বুলন্ত চাদরের তলদেশে ছতর দৃষ্টিগোচর হওয়ার আশঙ্কা থাকায়,) নামাযরত পেছনে উপবিষ্ট নারীদিগকে বলা হইত, যাবৎ পুরুষগণ সেজদা হইতে সোজা হইয়া বসিয়া না যায় তাবৎ তোমরা সেজদা হইতে মাথা উঠাইও না।

বিধর্মীদের তৈরী কাপড়ে নামায পড়া

হাছান বছরী (র:) বলিয়াছেন, অগ্নি পুঙ্কদের তৈরী কাপড়কে দূষণীয় মনে করা হইত না, (উহার উপর নামায ইত্যাদি পড়া জায়েয আছে)।

আলী (রা:) নূতন কাপড় ধৌত না করিয়া উহা পরিধানে নামায পড়িয়াছেন।

ব্যাখ্যা :—বিধর্মীদের তৈরী কাপড় বা নূতন কাপড় কোন প্রকার নাপাকি থাকিলে বা নাপাকির লক্ষণ দৃষ্ট না হইলে উহা ধৌত না করিয়া উহাতে নামায পড়া যায়। এরূপ সাধারণ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ দেওয়া হইলে অছওয়াছা ব্যাধির প্রাদূর্ভাব হইবে। আর যদি উহাতে নাপাকি থাকে তবে উহা ধৌত করার শরীয়ত নির্দ্ধারিত প্রণালীতে ধোয়ার পর উহা ব্যবহার করা এবং উহাতে নামায পড়া জায়েয আছে ইয়ামন দেশের তৈরী এক প্রকার রঙ্গিন কাপড় যাহা রং করিতে প্রস্রাব ব্যবহৃত হইত; ইমাম যুহরী (র:) উহা পরিধান করিতেন এবং উহাতে নামাযও পড়িতেন। (কিন্তু শরীয়তী প্রণালীতে পাক করিবার পর।)

২৪১ হাদীছ :—মুগিরা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ছফরে আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, পানির পাত্র লও, আমি উহা লইলাম, রসুলুল্লাহ (দ:) নির্জন স্থানের দিকে যাইতে লাগিলেন এবং আমার অদৃশ্যে চলিয়া গেলেন। তারপর তিনি হাজত পূরা করিয়া কিরিয়া আসিলেন এবং অজু করিতে লাগিলেন। আমি অজুর পানি ঢালিয়া দিতে ছিলাম। উহার পরিধানে সিরিয়া দেশের

তৈরী একটি জুবা ছিল। উহার আস্ত্রিমের মুহরী সৰু ছিল, তাই উহা টানিয়া কনুই-এর উপর উঠানো সম্ভব হইল না, সে জন্ত হস্তদয় ভিতর দিক হইতে টানিয় উহা হইতে বাহির করিয়া লইলেন এবং পূর্ণ অঙ্গ করিয়া পাখোয়ার পরিবর্তে চামড়ার মোজার উপর মছেহ করিলেন, তারপর নামায পড়িলেন। হযরত (দঃ) শাম দেশের তৈরী জুবা পরিহিত ছিলেন; সে কালে শাম দেশের অধিবাসী অমোসলেম ছিল।

নামায এবং অগ্ন অবস্থায়ও উলঙ্গ হওয়া নিষিদ্ধ

২৪২। হাদীছ :—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (নবুয়তের পূর্বের ঘটনা—) রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কা'বা ঘর মেরামতের জন্ত সকলের সঙ্গে কাঁধে বহন করিয়া পাথর আনিতে ছিলেন, তাঁহার পরনে লুঙ্গি ছিল। তাঁহার চাচা আব্বাস (সেই অন্ধকার যুগের রীতি অনুসারে) বলিলেন, হে ভ্রাতৃপুত্র! লুঙ্গি খুলিয়া কাঁধের উপর রাখিলে পাথর আনিতে কষ্ট হইত না। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গেলেন; এই ঘটনার পর তিনি সর্বদা এ বিষয়ে সতর্ক থাকিতেন।

জামা, পায়জামা, জাজিয়া বা জুবা পরিধানে নামায পড়া

২৪৩। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এক কাপড়ে নামায পড়ার বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই কি ছই কাপড়ের সামর্থ্য রাখে? আর এক ব্যক্তি ওমর (রাঃ)কে ঐ বিষয়ই জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, এখন আল্লাহ তায়ালা মোসলমানদিগকে সামর্থ্য দিয়াছেন, তাই তোমাদের কর্তব্য সেই সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করা। প্রত্যেকের উচিত একাধিক কাপড়ে নামায পড়া। লুঙ্গি ও চাদর, ও লুঙ্গি ও জুবা, পায়জামা ও চাদর, পায়জামা ও জামা, পায়জামা ও জুবা, জাজিয়া ও জুবা, জাজিয়া ও (লম্বা) জামা বা জাজিয়া ও চাদর পরিধান করিয়া নামায পড়িবে।

ব্যাখ্যা :—ছতর আবৃত করা পরিমাণ একটি মাত্র কাপড় পরিধানে নামায পড়া যায়, কিন্তু সামর্থ্য থাকিলে অন্তত দুইখানা কাপড়ে নামায পড়া ভাল, যেমন—ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন। একদা উবাই (রাঃ) ও আবু হুলাই ইবনে মসউদ (রাঃ) ছাহাবীদ্বয়ের মতানৈক্য হইল—উবাই (রাঃ) বলিলেন, এক কাপড়ে নামায পড়া মকরুহ নহে। আবু হুলাই ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিলেন, এই মাছআলাহ ঐ সময়ের যখন একাধিক কাপড়ের সামর্থ্য মোসলমানদের ছিল না। খলীফা ওমর (রাঃ) ঐ মতানৈক্যের ফয়ছালা করিলেন যে, উবাই (রাঃ) মাছআলাহ ঠিকই বলিয়াছেন; তবে আবু হুলাই ইবনে মসউদ (রাঃ)ও ভুল বলেন নাই।

ছতর আবৃত রাখা ফরজ

২৪৪। হাদীছ :—আবু ছারীদ খুদরী (রাঃ) বলিয়াছেন, একটি মাত্র চাদর দ্বারা শরীর আবৃত করিয়া উহার এক দিক কাঁধের উপর উঠাইয়া রাখা (যাহাতে ঐ পার্শ্ব দিয়া ছতর

খোলা থাকিয়া যায়) বা একটি মাত্র কাপড় (যেমন চাদর কিম্বা জামা বা লুঙ্গি) পরিধান করতঃ দুই হাঁটু খাড়া করিয়া এইরূপে বস। যেন তলদেশ উন্মুক্ত থাকিয়া যায় এবং লজ্জাস্থানের উপর আবরণ না থাকে, রসুলুল্লাহ দঃ) এই উভয় অবস্থাকে নিষিদ্ধ (হারাম) বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা :—এইভাবে কাপড় পরিধান করা যাহাতে ছতর উন্মুক্ত থাকিয়া যায় বা উন্মুক্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে ইহা শরীয়তে নিষিদ্ধ। সেকালের আরবগণ উল্লিখিত দুই ধরনের কাপড় পরিত যাহাতে ছতর উন্মুক্ত হইত, সে জন্মই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিশেষভাবে ঐ দুইটি অভ্যাসের উল্লেখ করিয়াছেন।

২৪৭। হাদীছ :—আবু হোশায়রা (রাঃ) বলেন, (নবম হিজরীতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কতৃক) যখন আবু বকর (রাঃ) আমীরুল হাজ্জ নিযুক্ত হইলেন; সেই হজ্জের সময় মিনার মধ্যে কোরবাণীর দিন তিনি আমাকে এই ঘোষণা জারীর আদেশ করিলেন, কোন মোশরেক এই বৎসরের পরে আর হজ্জ শরীক হইতে পারিবে না এবং কোন ব্যক্তি উলঙ্গাবস্থায় কা'বা ঘরের তওয়াফ করিতে পারিবে না। এদিকে রসুলুল্লাহ দঃ) আবু বকরের পিছনে পিছনে আলী (রাঃ)কে পাঠাইয়া দিলেন, বিশেষভাবে এই ঘোষণা জারী করার জন্ম যে, কাকেরদের সঙ্গে সন্ধির বাধ্যবাধকতা তুলিয়া লওয়া হইল * আলী (রাঃ) মিনার মধ্যে কোরবাণীর দিন এই ঘোষণাও জারী করিলেন যে, কোন মোশরেক এই বৎসরের পর হজ্জ করিতে পারিবে না এবং কেহ উলঙ্গ হইয়া কা'বা ঘরের তওয়াফ করিতে পারিবে না।

উরু (জানুর উর্দ্ধভাগ) ছতরের অন্তর্ভুক্ত কি-না?

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, জাবহাদ এবং মোহাম্মদ ইবনে জাহ্শ (রাঃ) হইতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছ বর্ণিত আছে, উরু ছতরের অন্তর্ভুক্ত।

কোন কোন হাদীছ দ্বারা ধারণার সৃষ্টি হয় যে, উরু ছতরের অন্তর্ভুক্ত নয়, ইমাম বোখারী (রাঃ) এরূপ হাদীছের ইঙ্গিত দানে বলেন যে, উল্লিখিত ছাহাবীত্রয়ের বর্ণিত হাদীছ অনুযায়ী আমল করাই অবশ্য কর্তব্য। কেননা তাহা হইলে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

২৪৬। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খয়বরের জেহাদে রওয়ানা হইলেন। খয়বরের নিকটে পৌঁছিয়া ফজরের নামায আউয়াল ওয়াক্ত অন্ধকার থাকিতেই পড়িলেন। তারপর শহরে প্রবেশ করিবার জন্ম উঠে আরোহণ করিলেন। আমি (আমার মাতার স্বামী—) আবু তালহার সঙ্গে এক উষ্ট্রে আরোহণ করিলাম। নবী দঃ) খয়বর শহরে প্রবেশ করিয়া শহরের পথসমূহ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। (সরু রাস্তায় যানবাহনের অত্যন্ত ভীড়, যানবাহনগুলি ঘেঁষা-ঘেঁষি করিয়া চলিতেছিল,

* সন্ধির বাধ্য-বাধকতা তুলিয়া লওয়ার ঘোষণা জারির বিষয়টি কোরআন শরীফে ছুরা বরাআতের আরম্ভে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ ঘোষণা প্রচারের জন্ম রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আলী (রাঃ)কে নিজের ব্যক্তিগত প্রতিনিধিরূপে পাঠাইয়াছিলেন।

তাই) আমার হাঁটু নবী ছালামাহ আলাইহে অসাল্লামের উরুতে স্পর্শ করিতেছিল; এতদ্বিধা কোন এক মুহূর্ত হযরতের লুঙ্গি তাঁহার উরু হইতে একটু সরিয়া গিয়াছিল, এমনকি তাঁহার উরুর শুভ্রতা আমার দৃষ্টিগোচর হইল। +

ব্যাখ্যা :— যে সমস্ত হাদীছ দ্বারা উরু ছতরের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার ধারণা জন্মিয়া থাকে তন্মধ্যে এই হাদীছখানাই অশ্রুতম। ইহার দুইটি বাক্যের দ্বারা ঐ ধারণার সূত্রপাত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন বাক্যের দ্বারাই উরু ছতর নয় বলিয়া প্রমাণিত বাক্যটি—
 رَكِبْتُ لِلنَّاسِ فَخَذَ نَبِيُّ اللَّهِ (ভীড়ের কারণে যানবাহনের ঘেঁষা-ঘেঁষিতে) আমার হাঁটু নবী ছালামাহ আলাইহে অসাল্লামের উরু স্পর্শ করিতেছিল। এখানে উরু উন্মুক্ত হওয়ার কোনই উল্লেখ নাই; পরিধেয় কাপড়ের উপর উরু স্পর্শিত হওয়াকেও একরূপ বাক্যে ব্যক্ত করা যায়, তদুপরি ইমাম বোখারী (র:) এই হাদীছখানাকেই ৮৬পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন—সেখানে
 ان قد مى للناس قدم النبى “উরু” শব্দের স্থানে قدم “পা” শব্দ উল্লেখ হইয়াছে—
 “আমার পা নবী ছালামাহ আলাইহে অসাল্লামের পা-কে স্পর্শ করিতেছিল।” সাধারণতঃ যানবাহনের ঘেঁষা-ঘেঁষিতে আরোহীদের পায়ের স্পর্শনই পরিলক্ষিত হয়।

দ্বিতীয় বাক্যটি حَسْرَ الْأَزَارِ عَنْ فَخَذٍ আরবী ভাষায় حَسْرَ শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে—“খোলা বা উন্মুক্ত করা” এবং “খুলিয়া যাওয়া বা উন্মুক্ত হওয়া”। অধিকন্তু মোসলেম শরীফে এই হাদীছখানার মধ্যেই حَسْرَ শব্দের পরিবর্তে انْحَسَرَ উল্লেখ হইয়াছে; যাহার একমাত্র অর্থ হইতেছে, “খুলিয়া যাওয়া বা উন্মুক্ত হইয়া যাওয়া”। সেই অনুসারে উক্ত বাক্যের অর্থ এই হয় যে, হযরত রশূলুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লামের উরু হইতে লুঙ্গি সরিয়া পড়িল, উরু উন্মুক্ত হইল। ভীড়ের কারণে বা বাতাসের দরুন অনিচ্ছাকৃত একরূপ হওয়া বিচিত্র নয়, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, বস্ত্রতঃ উরু ছতরের অন্তর্ভুক্ত নয়।

নারীগণ কিরূপ বস্ত্রে নামায পড়িবে?

ইবনে আব্বাসের বিশিষ্ট শাগের্দ একরেকমা (র:) বলেন, সমস্ত শরীরকে আবৃত করার মত একটি কাপড় পরিধান করিয়া নামায পড়া নারীদের জন্ত জায়েয আছে।

২৪৭। হাদীছ :—আয়েশা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রশূলুল্লাহ (দ:) জমাতে ফজরের নামায পড়িতেন, মোসলমান নারীগণ প্রশস্ত চাদরে আবৃত হইয়া জমাতে উপস্থিত হইতে এবং নামাযান্তে বাড়ী ফিরিবার সময়* তাহাদেরকে চেনা যাইত না।

+ এই হাদীছখানার মধ্যে আরও অনেক বিষয়ের উল্লেখ আছে, বোখারী (র:) ইহাকে ৩৬ স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা এখানে শুধু এই স্থান সম্পর্কীয় অংশটুকু অনুবাদ করিলাম।

* এই রেওয়ায়েতে ৮২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, من الناس অর্থাৎ অন্ধকার থাকার দরুন নারীদিগকে চেনা যাইত না। কিন্তু ইবনে মাজা শরীফের রেওয়ায়েতে পত্রিকার প্রতীয়মান হয় যে, ইহা বিবি আয়েশার উক্তি নহে। পক্ষান্তরে এক হাদীছে আছে যে, ফজরের নামায হযরত (দ:) শেষ করিলে প্রত্যেকে তাহার নিকটবর্তী মানুষকে চিনিতে পারিত।

নক্ষত্রী বস্ত্রে নামায পড়িলে নক্ষত্র প্রাতি ধ্যান করিবে না

২৪৮। হাদীছঃ আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি ডোরা-শিশিষ্ট চাদর পরিধানে নামায পড়িতে ছিলেন; হঠাৎ তাহার দৃষ্টি ঐ ডোরার প্রতি আকৃষ্ট হইল। নামাযান্তে ঐ চাদরটিকে যুগিতরূপে খুলিয়া ফেলিলেন ও বলিলেন, এই চাদরটি আবু জাহমকে ফেরৎ দাও এবং এর বদলে তাহার এক রঙ্গের মোটা পশমী চাদরটি নিয়া আস। এই ডোরাগুলি নামাযে আমার পূর্ণ ধ্যান ও মগ্নতার প্রতিবন্ধক হইতে ছিল।

নামাযের মধ্যে আমার দৃষ্টি ঐ ডোরাগুলির উপর পতিত হয়, তাই আমার আশঙ্কা হয়, চাদরটি এইরূপে আমাকে নামাযের মগ্নতা হইতে বিরত না করিয়া ফেলে X

ব্যাখ্যাঃ—নামাযে আল্লার প্রতি একাগ্রচিত্তে ধ্যান ও মগ্নতা হাসিল করা একান্ত কর্তব্য যে কোন বস্ত্র ইহাতে প্রতিবন্ধক হয় বা সেরূপ আশঙ্কা হয় উহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ক্রুশ-চিত্রের বা অন্য কোন বিশেষ আকর্ষণীয় ছাপের কাপড়

সম্পূর্ণে নামায পড়িবে না

জীবের ছবিযুক্ত কাপড় ব্যবহার বরাই নিষিদ্ধ। নামায অবস্থায় উহার ব্যবহার বিশেষরূপে নিষিদ্ধ, এমনকি কোন কোন আলেম বলেন, এরূপ কাপড় পরিধান করিয়া নামায হইবে না।

২৪৯। হাদীছঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নক্ষত্রী ছাপার একটি পর্দা ছিল যাহাকে তিনি ঘরর এক কোণে লটকাইয়া (উহার আড়ালে আসবাবপত্র রাখিতেন। একদিন নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইলেন, পর্দাটিকে সরাইয়া ফেল ইহার নক্ষত্রগুলি নামাযের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

পাঠকবৃন্দ! আলোচ্য পরিচ্ছেদের শিরোনামে ইমাম বোখারী (রঃ) ক্রুশের আকৃতিতে নিষিদ্ধরূপে উল্লেখ করিয়া একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। ক্রুশের ছবি কোন জীবের ছবি নয় বলিয়া শরীয়তের সাধারণ নীতি অনুসারে কেহ ইহাকে জাহের মনে করিতে পারে। সে জগতই উহা নিষিদ্ধ হওয়া বিশেষরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ক্রুশ-চিত্র একটি বিধর্মী প্রতীক এবং উহা ব্যবহারে বিজাতীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিধর্মী প্রতীক ও বিজাতীয় প্রভাব অবলম্বন করিয়াই মোসলেম জাতি চরম অধঃপতনে পড়িয়াছে। এই ক্রুশের প্রতীকধারী খৃষ্টানগণ এক সময়ে স্পেন, তারাবলস ইত্যাদি সমস্ত

X এখানে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ঐ ডোরাগুলি রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একাগ্রতায় প্রতিবন্ধক হইতে পারে নাই; রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শান ও মর্তব্য দৃষ্টে উহা সম্ভবও নয়, কিন্তু সাধারণতঃ এরূপ হইয়া থাকে বলিয়া প্রিয় উদ্ভাতকে সতর্ক করার জগ্গীয় কাণ্ডে ক্রটির বোকা নিয়া বুঝাইয়াছেন; স্নেহপূর্ণ সুরকি এইরূপই করিয়া থাকেন।

ইউরোপ হইতে মোসলেম জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্ত এই ক্রুশের দোহাই দিয়া আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল। এমনকি “জঙ্গলীব” বা ক্রুশের যুদ্ধ নাম দিয়া তাহারা অগণিত মোসলেম নর-নারীর রক্তের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল। সে সব কাহিনী ভুলিয়া যাওয়া কোন মোসলমানের জন্ত জাতীয়তাবোধের পরিচায়ক হইবে না। আজও খৃষ্টানগণ আমাদের দেশে মোসলমানদের মন-মগজে সেই নরখাদক মনহস অশুভ ক্রুশের প্রভাব বিস্তার করার হাজার হাজার ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছে। খৃষ্টান পরিচালিত স্কুল, কলেজ ইত্যাদি শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহে আজও সেই মোসলেম হৃদয়ে বর্ষাঘাতকারী ক্রুশ মাথা উঁচু করিয়া আছে। সেখানেই আমাদের সমাজের বিশিষ্ট বিশিষ্ট বাছা বাছা বালক-বালিকা হইতে যুবক-যুবতী পর্য্যন্ত লালিত-পালিত হইয়া শিক্ষা লাভ করিতেছে এবং সর্বদা তাহারা ঐ ক্রুশের মাথা উঁচু দেখিয়া প্রতিদিন উহার প্রতি ভক্তির প্রণাম দিয়া আসিতেছে। শুধু তাহাই নয় বরং এই বিষয়কে ব্যাপকভাবে মোসলেম সমাজে ঢুকাইবার জন্ত শান্তি ও সাহায্যের প্রতিষ্ঠান সমূহের নাম ও প্রতীক “রেডক্রস” (Redcross)-এর ভিতর দিয়াও ক্রুশের প্রভাব বিস্তারের ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। মোসলেম জ্ঞানীগণ ঐ বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিয়াই উহার পরিবর্তে তাহারা “রেডক্রসেন্ট” (Redcrescent) নিজস্ব প্রতীক প্রচলিত করিয়াছিলেন।

প্রতিটি মোসলমানের ভিতর বিজ্ঞাতীয় প্রতীকের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করা যে কিরূপ প্রয়োজন, তাহা জ্ঞানী মাত্রই উপলব্ধি করিতে পারে। বোখারী শরীফের ৮৮০ পৃষ্ঠায় একটি হাদীছে আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহার ঘরে ক্রুশ-চিহ্নযুক্ত কোন বস্তু দেখিলে উহাকে ভাঙ্গিয়া চূরমার করিয়া ফেলিতেন।

রেশমী বস্ত্র পরিধান করিয়া নামায পড়া

২৫০। হাদীছ :—ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে একটি রেশমী জুব্বা হাদিয়া দেওয়া হইয়াছিল (তখন রেশমী বস্ত্র ব্যবহার পুরুষের জন্ত হারাম ছিল না)। তিনি উহা পরিধান করিয়া নামায পড়িলেন। কিন্তু নামায শেষে উহাকে ঘৃণিত বস্ত্রের স্থায় তাড়াতাড়ি খুলিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, ইহা মোস্তাকীনদের জন্ত সমীচীন নয়।

ব্যাখ্যা :—রেশমী বস্ত্র পুরুষের জন্ত হারাম হওয়ার ইহা প্রথম পদক্ষেপ। এরপর রসুলুল্লাহ (সঃ) পরিষ্কার বলিয়াছেন—ছনিয়াতে রেশমী বস্ত্র ঐ পুরুষই ব্যবহার করিতে পারে, আখেরাতে যাহার সুখ লাভের আদৌ কোন আশা নাই। “খলীফা ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (সঃ) রেশমী বস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়াছেন।” (বোখারী শরীফ ৮৬৭ পৃঃ)

লাল রক্তের কাপড় পরিধান নামায পড়া

২৫১। হাদীছ :—আবু জোহায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি একদিন দেখিলাম, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি চামড়ার তাঁবুতে উপবিষ্ট এবং বেলাল (রাঃ)

তাঁহার অজুর পানি আনিয়াছেন, সকলেই তাঁহার অজুর ব্যবহৃত পানির প্রতি ছুটিয়া আসিয়াছে। কেহ ঐ পানির কিছু অংশ লাভ করিয়া শরীরে মলিতেছে, কেহবা উহা লাভ করিতে না পারিয়া স্বীয় সঙ্গী হইতে শুধু আর্দ্রতা গ্রহণ করিতেছে। তারপর বেলাল (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের লাঠিখানা গাড়িয়া দিলেন; নবী (দঃ) তাঁবু হইতে বাহিরে আসিলেন। তিনি এক জোড়া লাল রং-এর বস্ত্র[†] পরিহিত ছিলেন; তাঁহার লুঙ্গি পায়ে গিরা হইতে অনেক উপরে ছিল। নবী (দঃ) ঐ লাঠিকে সম্মুখে রাখিয়া জমাতে দুই রাকাত নামায পড়িলেন। নামাযের সময় মানুষ ও জীব জন্তু ঐ লাঠির সম্মুখ দিয়া চলাচল করিতেছিল।

ছাদের উপর বা মিস্বর ও চৌকি ইত্যাদির উপর নামায পড়া

হাসান বাছরী (রাঃ) বলেন, পুলের উপর দাঁড়াইয়া নামায পড়া দুযণীয় নয়। যদিও ঐ পুলের তলদেশে বা সম্মুখভাগে নাপাক বস্তু প্রবাহিত হইতে থাকে।

আবু হোরাযরা (রাঃ) একবার জমাতে শামিল হইয়া ছাদের উপর নামায পড়িয়াছেন। আবুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বরফের উপর দাঁড়াইয়া নামায পড়িয়াছেন।

ব্যাখ্যা :—এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য, মাটি ভিন্ন অস্ত্র বস্তুর উপর নামায পড়া যায়। এক হাদীছে উল্লেখ হইবে, রসুলুল্লাহ (দঃ) চাটাই-এর উপরে নামায পড়িয়াছেন।

২৫২। হাদীছ :—ছাহল ইবনে ছায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মিস্বর গাবা নামক বনের ঝাউ গাছের কাঠ দ্বারা নির্মিত ছিল। ঐ মিস্বরটি যখন তৈরী হইয়া আসিল তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) উহার উপর কেবলামুখী হইয়া দাঁড়াইলেন এবং তফবীর বলিয়া নামায আরম্ভ করিলেন। উপস্থিত সকলেই তাঁহার সঙ্গে নামাযে শামিল হইল। হযরত (দঃ) ঐ মিস্বরের উপর দাঁড়াইয়া কেরাত পড়িলেন ও রুকু করিলেন পেছনের সন্ধেই রুকু করিল। তারপর তিনি রুকু হইতে উঠিয়া পশ্চাদপায়ে নামিয়া আসিলেন (কারণ মিস্বরের উপর সেজদা করা সম্ভব নয়, তাই) নীচে নামিয়া সেজদা করিলেন।

● ইমাম বোখারী (রাঃ) একজন বিশিষ্ট মোহাদ্দেছের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়াছেন যে, উক্ত ঘটনায় প্রমাণিত হয়—ইমাম মোক্তাদীদের অপেক্ষা উচ্চ স্থানে দাঁড়াইতে পারে।

এ সম্পর্কে সাধারণ মহুআলা এই যে, এক হাত পরিমাণ উচা বা যাহাতে ইমাম সুম্পষ্টতঃ সকল হইতে উচ্চ দেখায় এরূপ উচা জায়গায় একা ইমাম দাঁড়ান বিশেষ কোন কারণ ছাড়া হইলে তাহা মাকরুহ। এ সম্পর্কে সুম্পষ্ট হাদীছ আছে (শামী, ১-৬০৪)।

† নবীজীর বস্ত্র জোড়া প্লেস লাল ছিল না, ঘন লাল ডোরাবিশিষ্ট ছিল। অনেকের মতে প্লেস লাল বস্ত্র পরা নিষিদ্ধ। হাদীছে আছে—এক ব্যক্তি এক জোড়া লাল বস্ত্র পরিধান করিয়া চলাকালে নবী (দঃ)কে সালাম করিল। নবী (দঃ) তাহার সালামের উত্তর দিলেন না। (মেশকাত ৩৭৫)

ব্যাখ্যা :—রসুলুল্লাহ (দ:) ব্যবহারিক হস্তকে সর্বপ্রথম নামাযের দ্বারা ব্যবহার আরম্ভ করা ভালবাসিতেন। মিস্বরটি তৈয়ার হইয়া আসিলে সেই উদ্দেশ্যে এবং নামাযের আদর্শ শিক্ষা দান উদ্দেশ্যে তিনি উহার উপর নামায পড়িয়াছিলেন। সামান্য উঠা-নামার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সম্ভাব্য আমলসমূহ মিস্বরের উপর আদায় করতঃ ঐ মহৎ উদ্দেশ্যদ্বয় পূর্ণ করিলেন।

২৫৩। হাদীছ :— আনাছ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক সময় ঘাড়া হইতে পতিত হইয়া তাঁহার ডান পার্শ্ব আঁচড়াইয়া (এবং পা মচকাইয়া) গিয়াছিল। ঐ সময় তিনি স্বীয় স্ত্রীদের প্রতি (বিভিন্ন কারণে) রাগ হইয়া এক মাস তাঁহাদের হইতে পৃথক থাকার প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিলেন এবং একটি দ্বিতল কক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ কক্ষের দি'ড়িটি খেজুর গাছের ছিল। একদা ছাহাবীগণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য ঐ কক্ষে উপস্থিত হইলে তিনি সেখানেই সকলকে নিয়া জমতে নামায পড়িলেন। হযরত (দ:) বসিয়া এবং মোস্তাদিগণ দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছিলেন

রসুলুল্লাহ (দ:) উনত্রিশ দিন ঐ কক্ষে অবস্থান করার পর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া ঐ কক্ষ হইতে নামিয়া আসিলেন। তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল যে, আপনি এক মাস পৃথক থাকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; হযরত (দ:) বলিলেন, এই মাস উনত্রিশ দিনে হইয়াছে।

ব্যাখ্যা :—এখানে প্রমাণ করা হইল যে, মাটি হইতে এত উচ্চস্থান সেখানে দি'ড়ির সাহায্যে উঠিতে হয় সেখানেও রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামায পড়িয়াছেন।

চাটাইয়ের উপর নামায পড়া

জাবের (রা:) এবং আবু সায়ীদ (রা:) নোকায দাঁড়াইয়া নামায পড়িয়াছেন। হাসান বহরী (রা:) বলিয়াছেন, সাধ্যানুযায়ী নোকায দাঁড়াইয়া নামায পড়িবে। তাহা সম্ভব না হইলে বসিয়া পড়িবে এবং নোকায কেবলামুখ হইতে ঘূর্ণমান হইয়া গেলে নামায অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে ঘূর্ণমান হইয়া কেবলামুখী থাকিবে, নতুবা নামায হইবে না।

২৫৪। হাদীছ :—আনাছ (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, তাঁহার দাদী একদা রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য খানা তৈয়ার করিয়া তাঁহাকে দাওয়াত করিলেন। খাওয়া শেষে রসুলুল্লাহ (দ:) বলিলেন, দাঁড়াও তোমাদের (বরকতের) জন্য (তোমাদের ঘরে) নামায পড়িবে। আনাছ (রা:) বলেন, আমি একটি পুরাতন চাটাই আনিলাম, বহু দিন ব্যবহৃত হইয়া উহা কাল হইয়া গিয়াছিল আমি উহাকে পানি দ্বারা ধোত করিয়া দিলাম। রসুলুল্লাহ (দ:) উহার উপর দাঁড়াইলেন, আমি ও আর একটি ছোট ছেলে তাঁহার পিছনে সারি বাঁধিলাম এবং আমার বৃদ্ধা দাদীও আমাদের পিছনে দাঁড়াইলেন—এইভাবে দুই রাকাত নফল নামায পড়িয়া রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম চলিয়া গেলেন।

২৫৫। হাদীছ :—মায়াবী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম চাটাই-এর উপর নামায পড়িতেন। (২২৬নং হাদীছও এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে।)

করাস ইত্যাদি বিছানার উপর নামায পড়া

২৫৬। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, অনেক সময় (রসুলুল্লাহ (দঃ) শয়র-এর বিছানার উপর তাহাজ্জুদ নামায আরম্ভ করিতেন।) আমি হযরতের সম্মুখ ভাগে শায়িত থাকিতাম। সেইকালে ঘরে চেরাগ আলাইবার কোন ব্যবস্থা ছিল না, তাই আমার পা তাঁহার সেজদাস্থানে চলিয়া যাইত ; তিনি সেজদা করার সময় আমার পায়ের উপর হাত দ্বারা চাপ দিতেন। তখন আমি পা গুটাইয়া লইতাম। হযরত (দঃ) সেজদা হইতে উঠিলে আমার পা আবার লম্বা হইয়া যাইত।

২৫৭। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যেই বিছানায় তিনি এবং নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শয়ন করিতেন—অনেক সময় হযরত (দঃ) সেই বিছানার উপর (তাহাজ্জুদ) নামায পড়িতেন। হযরতের নামায অবস্থায় আয়েশা (রাঃ) হযরতের সম্মুখে জানাযার স্থায় আড়াআড়ি গুইয়া থাকিতেন ; (হযরতের কক্ষ প্রশস্ত ছিল না। আয়েশা (রাঃ) বলেন,) অতঃপর যখন হযরত (দঃ) বেতের নামায পড়িতেন তখন তিনি আমাকে জাগাইয়া দিতেন ; আমি উঠিয়া বেতের নামায পড়িতাম।

অধিক উত্তাপে (পরিহিত) বস্ত্রাংশের উপর সেজদা করা

হাসান বছরী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোসলমানগণ অত্যধিক উত্তাপের সময় পাগড়ীর কাপড়ের উপর ও টুপির উপর সেজদা করিতেন এবং আস্তিনের ভিতরে হাত প্রবেশ করাইয়া উহা মাটির উপর রাখিতেন। (সাধারণতঃ পাগড়ীর বা মোটা টুপির উপর সেজদা করা নিষেধ।)

২৫৮। হাদীছ :— আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আমরা রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়িতাম ; মাটি উত্তপ্ত হওয়ার দরুণ আমাদের অনেকে সেজদাস্থানে (পরিহিত) কাপড়ের অংশবিশেষ রাখিয়া উহার উপর সেজদা করিত।

চপ্পল পায়ে রাখিয়া নামায পড়া

অপবিত্রতার সন্দেহ না হইলে এবং পায়ের অঙ্গুলী মাটিতে লাগায় বিশ্বের সৃষ্টি না করিলে এক্ষণ চপ্পল পায়ে রাখিয়া নামায পড়া জায়েয, নতুবা জায়েয নয়।

২৫৯। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কি চপ্পল পায়ে রাখিয়া নামায পড়িতেন ? তিনি বলিলেন, হাঁ।

চামড়ার মোজা পায়ে রাখিয়া নামায পড়া

২৬০। হাদীছ :—হাসান ইবনে হারেস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি জরীর ইবনে আবহুলাহ (রাঃ)কে দেখিলাম, তিনি প্রস্তাব করিলেন, তারপর অঙ্গু করিতে চামড়ার

মোজার উপর মছেহ করিলেন, তারপর নামাযে দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, আমি নবী (দ:)কে এরূপ করিতে দেখিয়াছি। জরীর ইবনে আবছল্লাহ এই হাদীছ সকলের নিকট অতি পছন্দনীয় ছিল, কারণ তাহার ইসলাম গ্রহণ অনেক বিলম্বে ছিল।

ব্যাখ্যা :—কোরআন শরীফে ছুরা মায়েরদার যে আয়াতে অজুর বর্ণনা হইয়াছে সেখানে পা খোঁত করার আদেশ রহিয়াছে, মছেহ করার উল্লেখ নাই। জরীর (রা:) চামড়ার মোজার উপর মছেহ করার উল্লেখ করিলে এরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকিল যে, মছেহ করার ঘটনা হয় ত ছুরা মায়েরদার আয়াত নাজেল হওয়ার পূর্বে হইবে, তাই উহা মনচুখ ও রহিত। এরূপ সন্দেহে জরীর ইবনে আবছল্লাহকে প্রশ্ন করা হইত, আপনি যে ঘটনা বর্ণনা করেন তাহা ঐ আয়াতের পূর্বে না পরে? তিনি বলিতেন, আমি মোসলমান হইয়াছি ঐ আয়াত অবতরণের বহু পরে। ইহা দ্বারা ঐ সন্দেহ খণ্ডন হইয়া যাওয়ায় এই হাদীছ-খানাকে বিশেষভাবে পছন্দ করা হইত।

কা'বা দিককে কেবলারূপে গ্রহণ করা ইসলামের জন্ত অপরিহার্য

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণিত আছে যে, নামাযের মধ্যে সেন্দদার সময় এবং বসার সময় পায়ের অঙ্গুলীসমূহকে কেবলামুখী রাখিবে।

২৬১। হাদীছ :—আনাছ (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আমাদের জায় নামায পড়িবে, আমাদের কেবলাকে কেবলারূপে গ্রহণ করিবে এবং আমাদের জবেহকৃতকে খাইবে, তাহাকে মোসলমান গণ্য করা হইবে। তাহার জন্ত আল্লাহ ও রসুলের তরফ হইতে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে, সেই প্রতিশ্রুতিকে তোমরা ভঙ্গ করিও না।

২৬২। হাদীছ :— আনাছ (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, হয়ত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি আদেশপ্রাপ্ত হইয়াছি, বিশ্বাসীর বিরুদ্ধে জেহাদ ও সংগ্রাম চালাইয়া যাইব যাবৎ তাহারা এই স্বীকারোক্তি না করিবে যে, এক আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই। তাহারা এই স্বীকারোক্তি করিবে, নামায পড়িবে, আমাদের কেবলামুখী হইবে এবং আমাদের জবেহকৃত খাইবে তাহাদের জান-মালের ক্ষতি সাধন আমাদের জন্ত হারাম। হাঁ—শরীয়ত অনুযায়ী যদি সে কোন শান্তির উপযোগী হয় উহা প্রবর্তন করা হইবে। আন্তরিক অবস্থার জন্ত সে আল্লাহর নিকট দায়ী থাকিবে এবং সেই অনুসারেই তাহার হিসাব হইবে।

● আনাছ (রা:)কে একদা জিজ্ঞাসা করা হইল, কিসের দ্বারা জান-মালের নিরাপত্তার অধিকার লাভ হয়? তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি স্বীকার করিয়া লইবে—একমাত্র আল্লাহই মাবুদ, আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই এবং সে আমাদের কেবলামুখী হইবে, আমাদের

শ্রায় নামায পড়িবে, আমাদের জবেহকৃতকে খাইবে—তাহাকে মোসলমান গণ্য করা হইবে। সে মোসলমানের শ্রায় সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবে, মোসলমানদের আইন-কানুনই তাহার উপর প্রবর্তিত হইবে*

যেখানেই নামায পড়া হউক কেবলামুখী হইতে হইবে

২৬৩। হাদীছ :- বরা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হিজরত করতঃ মদীনায আসিয়া প্রথম অবস্থায় ষোল বা সত্তর মাসকাল বাইতুল-মোকাদ্দসমুখী নামায পড়িলেন, কিন্তু সর্বদাই তাহার আকাঙ্ক্ষা ছিল, কা'বা শরীফমুখী নামায পড়া। আল্লাহ তায়ালা তাহার আকাঙ্ক্ষাবস্থা ব্যক্ত করিয়া উহা পূর্ণ করতঃ আয়াত নাযেল করিলেন—

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ -

“আমি এক্ষা করিতেছি, আপনি (কা'বামুখী নামায পড়ায় আকাঙ্ক্ষিত হইয়া উহার জন্ত জন্ত অহীর প্রতীকার) পুনঃ পুনঃ আসমানের দিকে তাকাইতেছেন। আমি নিশ্চয় আপনার ভালবাসার কেবলামুখী হওয়ার আদেশ প্রবর্তন করিব। (এখনই করিয়া দিলাম—) আপনি মসজিদে-হারামের (তথা কা'বার) প্রতি মুখ করুন। (হে মোসলমানগণ!) তোমরা যে স্থানেই থাক স্বীয় মুখ ঐ মসজিদে-হারাম বা কা'বার প্রতি করিয়া নামায পড়িবে।”

(২ পাঃ ১ রঃ)

এই আয়াত নাযেল হইলে রসুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কা'বা শরীফমুখী নামায পড়িতে লাগিলেন। ইহাতে ইহুদীরা মোসলমানদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ এবং অযথা প্রশ্রাবলী নিশ্চয় করিবে, তাই ভবিষ্যদ্বাণীরূপে এই আয়াতও নাযেল হইল—(২ পাঃ ১ রঃ)

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْتُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا -

قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ -

“একদল জ্ঞান বুদ্ধিশূন্য লোক এরূপ প্রশ্ন করিবে যে, মোসলমানগণ কি কারণে পূর্বা-বলম্বিত কেবলা (বাইতুল-মোকাদ্দস) ছাড়িয়া দিল? আপনি তাহাদিগকে বলিয়া দিন, (এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার নাই। কারণ,) একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই পূর্ব, পশ্চিম,

* ২২নং হাদীছখানাও এই বিষয়েই বর্ণিত হইয়াছে, সেমতে মোসলমানদের প্রতীক ও পরিচয় হিসাবে মোট পাঁচটি বিষয় হইল। (১) তৌহিদ ও রেহালতের স্বীকারোক্তি। (২) নামায। (৩) যাকাত। (৪) কা'বা শরীফকে কেবলারূপে গ্রহণ করা। (৫) মোসলমানদের জবেহ করা জীব খাওয়া।

উত্তর ও দক্ষিণ সবদিকের মালিক; (মুখ করার আদেশ একমাত্র তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী প্রবর্তিত হইবে। আল্লাহর আদেশাবলীর অমুগত হওয়া, ইহাই সংপথ;) আল্লাহ যাকে চান সংপথে পরিচালিত করেন।”

২৬৪। হাদীছ :—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভ্রমণ অবস্থায় তাঁহার যানবাহন যে দিকে চলিত সে দিক হইয়াই নফল নামায পড়িতেন। (কারণ, যানবাহনের পৃষ্ঠে অষ্টদিক হইয়া নামায পড়া সম্ভব নয়,) কিন্তু ফরজ নামায পড়ার সময় যানবাহন হইতে অবতরণ করতঃ নির্দিষ্ট কেবলামুখী হইয়া নামায পড়িতেন।

কেবলা নয় এমন দিকে ভুলবশতঃ নামায শুদ্ধ হইবে †

২৬৫। হাদীছ :— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, (মদীনার নিকটবর্তী) কোবা নামক স্থানের লোকগণ (অজ্ঞাত অবস্থায় পূর্ব বিধান অনুযায়ী বাইতুল-মোকাদ্দাসের প্রতি মুখ করিয়া) ফজরের নামায পড়িতে ছিল। কোন একজন আগন্তুক তাহাদিগকে বলিল, গত রাত্রেই (শুনিয়াছি ও দেখিয়াছি—) রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি কোরআনের আয়াত নাযেল হইয়াছে; যাহাতে তিনি কা'বামুখী হওয়ার জ্ঞান আদিষ্ট হইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া তাহারা কা'বামুখী করিয়া গেল।

ব্যাখ্যা :—ঐ ব্যক্তিগণ ফজরের নামায যে দিকে পড়িতেছিল ঐ সময় সে দিকে কেবলা ছিল না, কিন্তু অজ্ঞাতভাবে এরূপ হওয়ার নামায পুনরারম্ভ করিতে হইল না, বরং জ্ঞাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাকী নামায কেবলার দিক হইয়া পড়িয়া নিল এবং তাহাদের নামায দ্রুত হইল।

মসজিদে থুখু ইত্যাদি দেখিলে নিজেই পরিষ্কার করা

২৬৬। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইমাম হইয়া নামায পড়া অবস্থায় মসজিদের কেবলামুখী দেওয়ালে থুখু দেখিতে পাইলেন। নামাযান্তে হযরত (দঃ) মসজিদে হাজিরানদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ পূর্বক (মিষরের উপর) লোকদের মুখী দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, তোমাদের কেহ নামায অবস্থায় সম্মুখ দিকে থুখু ফেলিবে না; নামাযী ব্যক্তির সম্মুখ দিক আল্লাহ (বিশেষ রহমতের) দিক। অতঃপর হযরত (দঃ) মিষর হইতে অবতরণ করিয়া নিজ হাতে উহা পরিষ্কার করিয়া দিলেন।

† ভুলবশতঃ কেবলাহীন দিকে নামায ছহীহ হয়, কিন্তু শর্ত এই যে, সঠিক কেবলা জানিবার জ্ঞান আশ্রয় ত্যাগ করিতে হইবে, এমনকি যদি কেবলা নির্ধারণের কোন ব্যবস্থা না হয় তবে স্বীয় বুদ্ধি-রিবেক খাটাইয়া খুব ভালভাবে চিন্তা করতঃ যে দিক কেবলা হওয়ার ধারণা প্রবল হইবে সেই দিকে নামায পড়িবে। পরে ভুল প্রকাশ হইলেও নামায দোহরাইতে হইবে না, কিন্তু চেষ্টা বা চিন্তা না করিয়া যে কোন এক দিকে নামায পড়িলে নামায ছহীহ হইবে না।

২৬৭। হাদীছ :—আব্দুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মসজিদের সম্মুখ দেয়ালে থুথু বা কফ দেখিতে পাইয়া উহাকে নিজে পরিষ্কার করিয়া দিলেন।

মহআলাহ :—নাকের স্রাব ও কফ ইত্যাদি কোন ঘৃণ্য বস্তু মসজিদে দেখা গেলে উহা কোন বস্তুর সহায়ো পরিষ্কার করিবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, অশুক কোন ঘৃণ্য বস্তুর উপর দিয়া হাটিয়া আসিলে (মসজিদে প্রবেশ করিতে) পা অবশ্যই ধুইয়া লইবে। আর যদি উহা শুক হয় বাহা পায়ে লাগিয়া থাকার সম্ভাবনা নাই, সে ক্ষেত্রে পা ধোয়া আবশ্যকীয় নহে।

নামাযে থুথু ফেলার আবশ্যক হইলে

২৬৮। হাদীছ :— আবু হোরায়া (রাঃ) ও আবু সারীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মসজিদের দেওয়ালে কফ দেখিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি একটি পাথরের টুকরা হাতে নিয়া উহা ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, (নামায অবস্থায়) থুথু ও কফ ফেলা হইতে গতাস্তর না হইলে সম্মুখ দিকে বা ডান দিকে ফেলিবে না। বাম পার্শে (যদি কোন লোক না থাকে) বা বাম পার্শের নীচে ফেলিবে।

এই বিষয়ে আনাছ (রাঃ) বর্ণিত ১২নং হাদীছ বিশেষ লক্ষণীয়; নামাযে থুথু ফেলার যে নিয়ম ২৬৮নং ও ২৭০নং হাদীছে বর্ণিত আছে, উহা ছাড়া তৃতীয় আর একটি সুন্দর ব্যবস্থা উক্ত হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে যে—ঈয় কাপড়ের কিনারায় থুথু ফেলিয়া উহা মর্দন করিয়া দিবে।

মসজিদে থুথু মাটির নীচে পুঁতিয়া না দিলে গুনাহ : ফ হইবে না +

২৬৯। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মসজিদে থুথু ফেলা গোনাহ; এই গোনাহ মাফ হওয়ার শর্ত উহাকে মাটিতে পুঁতিয়া দেওয়া।

২৭০। হাদীছ :—আবু হোরায়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যখন কোন ব্যক্তি নামাযে দাঁড়ায় সে যেন সম্মুখ দিকে কখনও থুথু

ক বামদিকে বা পার্শের নীচে থুথু ফেলিবার সুযোগ একমাত্র মসজিদ ভিন্ন অন্য স্থানে বা এরূপ মসজিদে হইতে পারিবে বাহা আরবদেশের স্থায় মরুভূমির গ্রামাঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে যে, উহার জমিন কেবলমাত্র মরুভূমির বালু; উহা পাকা-পোতা নয়, উহার উপর বিছানাও নাই। কেবল বালুর উপর নামায পড়া হইয়া থাকে, পূর্বকালে সাধারণতঃ মসজিদ এরূপই হইত।

+ এই মহআলার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, যে মসজিদের জামিন পাকা বা বিছানায়ুক্ত উহাতে থুথু ইত্যাদি ফেলা কোন মতেই জায়েয নয়। কারণ, সে ক্ষেত্রে মাটির নীচে পুঁতিয়া দেওয়া অসম্ভব। এই ক্ষেত্রে একমাত্র তৃতীয় ব্যবস্থাই অবলম্বনীয়।

না ফেলে, কেননা নামাযরত থাকাকালীন সে আল্লাহ তায়ালার নিকট মোনাজাত করিতেছে। ডান দিকেও ফেলিবে না, কারণ (নামাযের সময় বিশেষ সাহায্যকারী) ফেরেশতা ডান দিকে উপবিষ্ট থাকেন। আবশ্যক হইলে) বাম দিকে বা পায়ের নীচে ফেলিবে এবং উহাকে মাটির নীচে পুঁতিয়া দিবে।

ক্রটিগোচর মোক্তাদীদের নামাযান্তে সতর্ক করা ইমামের কর্তব্য

২৭১। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে নামায পড়াইলেন। তারপর মিশরে যাইয়া দাঁড়াইলেন এবং নামায ও রুকু-সেজদা সম্পর্কে নহীহত করিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমরা রুকু-সেজদা সুন্দর ও পূর্ণরূপে করিও; নামাযের মধ্যে এবং যখন তোমরা রুকু-সেজদা কর তখন আমি তোমাদিগকে পিছন দিকে ঐরূপই দেখিতে পাই যেমন সম্মুখে থাকাকালীন দেখিতে পাই।†

কোন গোত্র-বিশেষের মসজিদ বলা যায় কি ?

২৭২। হাদীছ :—আবুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (জেহাদের যোগ্যতা অর্জনে অভ্যস্ত বা উৎসাহিত করার জন্ত) ঘোড়দৌড়ের অনুষ্ঠান করিতেন। বিশেষভাবে গঠিত ঘোড়াগুলির দৌড়ের জন্ত “হাক্‌ইয়া” নামক স্থান হইতে “ছানিয়াতুল-বেদা” স্থান পর্য্যন্ত (প্রায় সাত মাইল) নির্দিষ্ট করিতেন। আর সাধারণ ঘোড়ার জন্ত (তদপেক্ষ কম) ছানিয়াতুল-বেদা হইতে মসজিদে বনী-জোরাইক+ পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট করিতেন।

মসজিদে কোন বস্তু বণ্টন করা বা লোকদের জন্ত খেজুর ছড়া রাখা

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশছিল, প্রত্যেক বাগান হইতে যেন গরীব-ছঃবীদের জন্ত কিছু খেজুর ছড়া মসজিদে লটকাইয়া রাখা হয়।

২৭৩। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, বাহরাইন দেশ হইতে আগত বাইতুল-মালের ধন-দৌলত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে পৌঁছিলে তিনি ঐসব মালকে মসজিদের ভিতরে রাখিতে আদেশ করিলেন। উহা এত প্রচুর ছিল যে, এত প্রচুর মাল ইতিপূর্বে আর কখনও আসে নাই। তারপর রসূলুল্লাহ (দঃ) নামাযের জন্ত মসজিদে আসিলেন, কিন্তু ঐ ধন-দৌলতের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। নামাযান্তে

† অনেক ইহার রূপক অর্থ বলিয়াছেন। অর্থাৎ জ্ঞাত হইয়া থাকি। আর অনেকে বলিয়াছেন, প্রকৃত প্রস্তাবেই হযরত (দঃ) ইচ্ছা করিলে স্বীয় চোখে পেছন দিকেও দেখিতে পাইতেন, ইহা তাহার খোদা প্রদত্ত বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন সাধারণতঃ কানের দ্বারা পেছনের শব্দও শুনা যায়।

+ এখানেই প্রমাণ হইল যে, কোন গোত্র বা ব্যক্তি অথবা কোন স্থান বিশেষের প্রতি নির্দিষ্ট করিয়া কোন মসজিদের নাম করা জায়েয, যেমন—বনী-জোরাইক গোত্রের ব্যক্তির মসজিদকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যামানার সাধারণ্যে মসজিদে বনী-জোরাইক বলা হইত।

ঐ মালের নিকট আসিয়া বসিলেন এবং বাহাকেই দেখিতে পাইলেন তাহাকেই দান করিতে লাগিলেন। এমনতবস্থায় হযরতের চাচা আব্বাস (রাঃ) আসিয়া বলিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ। আমাকে দান করুন; আমি বদরের যুদ্ধের ঘটনায় নিজের এবং আমার ভাতাপুত্র আকীলের মুক্তিপণ পরিশোধ করিয়া একেবারে রিক্ত হস্ত হইয়া পড়িয়াছি। নবী (দঃ) বলিলেন, নিজ হস্তে ইচ্ছানুযায়ী লউন। তিনি কাপড় বিছাইয়া তন্মধ্যে অঞ্জলি ভরিয়া ভরিয়া লইলেন, তারপর উহা কাঁধে উঠাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অপারগ হইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলিলেন, হয় কোনও ব্যক্তিকে আমার বোঝা উঠাইয়া দিতে বলুন অথবা আপনি নিজে উঠাইয়া দিন। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তাহা হইবে না; (স্বীয় বহন-কমতা অনুযায়ী লইবেন।) তাই তিনি বোঝা কিছু কম করিয়া লইলেন এবং পুনরায় উঠাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এবারও উঠাইতে পরিলেন না; রসুলুল্লাহ (দঃ) এবারও ঐরূপে বলিলেন। সুতরাং তিনি পুনরায় বোঝা কম করিলেন এবং অতি কষ্টে কাঁধে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। যে পর্য্যন্ত তিনি দৃষ্টিগোচর ছিলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) মালের প্রতি তাঁহার স্পৃহা দেখিতে আশ্চর্য্যাব্বিতভাবে তাঁহার প্রতি তাকাইয়া ছিলেন। আনাহ (রাঃ) বলেন, যাবৎ সেখানে একটি দেবহাম (এক সিকি) অবশিষ্ট ছিল রসুলুল্লাহ (দঃ) তথা হইতে উঠেন নাই; সমস্ত ধন সাধারণ্যে বিলাইয়া দিয়াছিলেন।

মসজিদে দাওয়াত করা এবং উহা কবুল করা

২৭৪। হাদীছ :- আনাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (আমাকে আবু তালহা (রাঃ) হযরতের নিকট পাঠাইলেন; আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া দেখিলাম, তিনি অশ্রুযুক্ত অনেকের সহিত মসজিদে রহিয়াছেন; আমি সেখানে দাঁড়াইলাম। নবী (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে আবু তালহা পাঠাইয়াছে কি? আমি বলিলাম হাঁ। জিজ্ঞাসা করিলেন, খাওয়ার জন্ত? বলিলাম হাঁ। তিনি উপস্থিত সকলকে বলিলেন, সকলেই চল—এই বলিয়া তিনি রওয়ানা হইলেন। আমি (পথ প্রদর্শকরূপে) সম্মুখে চলিতে লাগিলাম।*

মসজিদে বিচার বিভাগীয় কাজ করা

২৭৫। হাদীছ :- সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, কোন ব্যক্তি তাহার জ্বীর সঙ্গে অশ্রু পুরুষকে দেখিতে পাইলে সে কি করিবে? তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পারিবে কি? (তারপর ঐ ব্যক্তির জ্বীর সঙ্গেই এরূপ ঘটনা ঘটিল এবং সে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট স্বীয় জ্বী সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করিল। অশ্রু সাক্ষী ছিল না, তাই

* এই হাদীছটি রসুলুল্লাহ (দঃ) মো'জেযা সম্পর্কীয় ঘটনায় বর্ণিত বড় একটি হাদীছের এক অংশমাত্র। পূর্ণ হাদীছটি যেখানে হযরতের বিভিন্ন মো'জেযা পরিচ্ছেদে অনূদিত হইবে।

শরীয়ত মতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লেয়া'নের ছকুম দেওয়া হইল) তাহার উভয়ে মসজিদের মধ্যে “লেয়া'ন” করিল।

আবাস গৃহে নামাযের স্থান রাখা চাই

বর ইবনে আযেব (রাঃ) স্বীয় গৃহে নামাযের জন্য নির্দিষ্টকৃত স্থানে জমাতের সহিত নামায পড়িয়াছেন।

২৭৬। হাদীছ :—এত্বান ইবনে মালেক (রাঃ) যিনি বদরের জাহাৎ শরীক ছিলেন একদা রসুলুল্লাহ ছালামুল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)। আমার দৃষ্টিগতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আমি আমাদের মসজিদের ইমাম, কিন্তু যখন বৃষ্টি হইয়া রাস্তায় পানির স্রোত বহিতে থাকে তখন আমি মসজিদে উপস্থিত হইতে পারি না; (নিজ গৃহেই আমার নামায পড়িতে হয়।) আমার বাসনা, আপনি আমার গৃহে যাইয়া কোন একস্থানে নামায পড়িয়া আসুন; আমি ঐ স্থানটিকেই সর্বদার জ্ঞান নামাযের স্থানরূপে নির্দিষ্ট করিয়া লইব। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করিব। এত্বান (রাঃ) বলেন, পরদিন একটু বেলা হওয়ার পর রসুলুল্লাহ (দঃ) আবু বকর (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া আমার গৃহে তشرীফ আনিলেন এবং ঘরে প্রবেশ করিবার অনুমতি চাহিলেন। আমি তাঁহাকে সাদঃ আহ্বান জানাইলাম; তিনি ঘরে প্রবেশ করিয়া বনিবার পূর্বেই জি'াস করিলেন, তোমার ঘরের কোন্ স্থানে নামায পড়িব? আমি ঘরের এক কোণ দেখাইয়া দিলাম। তিনি তকবীর বলিয়া নামায আরম্ভ করিলেন। আমরা তাঁহার পেছনে দাঁড়াইলাম। তিনি হুই রাকাত নামায পড়িলেন। নামাযান্তে আমরা তাঁহাকে কিঞ্চিৎ নাস্তার জ্ঞান অপেক্ষা করিতে বাধ্য করিলাম। হযরত রসুলুল্লাহ ছালামুল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আগমনের খবর শুনিয়া আমার বাড়ীতে বহু লোকের সমাগম হইল। আগন্তুকদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলিল, মালেক ইবনে দোখায়শেন কোথায়, সে কি এখানে উপস্থিত হয় নাই? অতঃপর একজন বলিয়া উঠিল, সে মোনাফেক—আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের প্রতি সে অমুরাগী নয়। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার এই উক্তি প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, এক্ষণ বলও না। তুমি জ্ঞাত নও যে, সে একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জ্ঞান ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর স্বীকারোক্তি করিয়াছে। ঐ ব্যক্তি আরজ করিল, হুজুর! আমরা তাহাকে মোনাফেকদের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষী দেখিয়া থাকি। রসুলুল্লাহ (দঃ)

ঐ কাহারও প্রতি যেনার তোহ্মত লাগাইয়া শরীয়ত নির্দ্ধারিত প্রমাণ পেশ করিতে না পারিলে তাহাকে চঃ বেত্রাঘাত করা হয়। কিন্তু যদি স্বামী কত্বক স্ত্রীর প্রতি যেনার তোহ্মত লাগান হয় এবং স্বামী প্রমাণ দিতে না পারে সে স্থানে উভয়ে পাঁচবার করিয়া লানত তথা অভিশাপযুক্ত কসম খাইলে ঐ বেত্রাঘাত হইতে রেহাই দিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদে বাধ্য করা হয়। এই বিশেষ ব্যবস্থাকে “লেয়ান” বলে, ইহার বিস্তারিত বিবরণ কোনমতে-হাদীছে এবং ফেকার কিতাবে বিস্তারিত আছে; বস্তুতঃ ইনশা-আল্লাহ পাইতে পারেন।

বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লার সন্তুটির জন্য লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর স্বীকারোক্তি করিয়াছে আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর দোজখ হারাম করিয়া দিয়াছেন।

ইমাম বোখারী (রঃ) এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, কাহারও ঘরে যাইয়া বাহ্যিক পবিত্রতা দৃষ্টে বা মালিকের নির্দেশিত স্থানে নামায পড়িবে; অহেতুক সন্দেহ করিবে না।

মসজিদে প্রবেশকালে ডান পা প্রথমে রাখিবে

আবহুলাহ ইবনে ওমর (রাঃ) মসজিদে প্রবেশকালে ডান পা প্রথমে রাখিতেন এবং বাহির হইবার সময় বাম পা প্রথমে বাহির করিতেন। (এখানে ১২২নং হাদীছ উল্লেখ আছে।)

যে স্থানে কবর আছে তথায় নামায পড়া। এবং কাফেরদের কবর

উচ্ছেদ পূর্বক সেই স্থানে মসজিদ তৈয়ার করা

এখানে দুইটি মছালার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে—(১) কবরযুক্ত স্থানে অর্থাৎ কবরের উপর, কবরের নিকটে বা কবরমুখী দাঁড়াইয়া নামায পড়া জায়েয নয়। কারণ, কবরের তাজিম ও শ্রদ্ধা বা উহার কোন বিশেষত্বের উদ্দেশ্যে ঐ স্থানে নামায পড়িলে উহা কবর পূজারূপে গণ্য হইয়া কুফরী ও শেরেকী গোনাহ হইবে। এবং যদি কবরের তাজিম ও বিশেষত্বের প্রতি আদৌ কোন দৃষ্টি না থাকে তবুও ঐরূপ স্থানে নামায পড়া দূষণীয়। কারণ ইহাতে ইহুদী ও নাছারাদের রীতির অনুসরণ দেখা যায়। তাহাদের এই রীতি ছিল না, পীর-পয়গাম্বরের কবরের উপর মসজিদ বানাইয়া নামাযে উহার তাজিম ও সম্মানের নিয়্যত রাখিত। রশূলুল্লাহ (সঃ) তাহাদের প্রতি লা'ন ও অভিশাপ করিয়াছেন। তহপরি যদিও নিজ মনে কোন প্রকার কু-নিয়্যত না থাকে তবুও ইহা দ্বারা দর্শকের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইবে। অতএব নিয়্যত ঠিক রাখিয়াও কবরের নিকটবর্তী নামায পড়া নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ কবর যদি কেবলা দিকে দৃষ্টিগোচর অবস্থায় থাকে তবে সে ক্ষেত্রে অনেক বড় গোনাহ হইবে; যদিও নামায শুদ্ধ হইবে পুনঃ পড়িতে হইবে না। এন্না আনাছ (রাঃ) অজ্ঞাতে কবরের নিকটে নামায পড়িলেন। ওমর (রাঃ) তাহাকে কবর বলিয়া সতর্ক করিলেন, কিন্তু নামাযকে পুনঃ পড়িবার আদেশ করিলেন না।

(২) কবর উচ্ছেদ করিয়া সে স্থানে মসজিদ তৈরী করা জায়েয কি না? ইহার উত্তর এই যে, ঐ কবর যদি কাফেরদের হয় তবে ঐরূপ করা জায়েয। রশূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনায পদার্পণ করিয়া ঐরূপেই স্বীয় মসজিদ তৈয়ার করিয়াছিলেন। আর ঐ কবর যদি মোসলমানের হয় তবে ঐরূপ করা জায়েয নয়; কারণ কোন মোসলমানের কবর উচ্ছেদ করা জায়েয নয়। হাঁ—কবর যদি বহু প্রাচীন হয় বাহাতে মৃতদেহের হাড়ি মাংস বর্তমান না থাকে, তবে সে স্থানে কবরের কোন চিহ্ন না রাখিয়া মসজিদ বানাইতে পারে এবং উহাতে নামায পড়ায় দোষ নাই

২৭৭। হাদীছ :—উম্মে হাবিব (রাঃ) এবং উম্মে ছালামাহ (রাঃ) আবিসিনিয়ার “মারিয়া” নামক গির্জা ঘর দেখিয়াছিলেন, যাহার মধ্যে বহু রকমের ছবি ছিল। তাহারা নবী ছালাল্লাহ্ আলাইহে অসাল্লামের রোগ-শয্যায় তাহার নিকট উহার উল্লেখ করিলেন। নবী (দঃ) শোয়া অবস্থায়ই মাথা উঠাইয়া বলিলেন, ইহুদী ও নাছারাদের রীতি ছিল, তাহাদের কোন নেক্কার পরহেজগার ব্যক্তি মারা গেলে তাহার কবরের উপর মসজিদ তৈয়ার করিয়া উহাতে ঐরূপ নেক্কার আওয়ালিয়া-দরবেশ, পীর-পয়গাম্বরগণের ছবি রাখিয়া দিত। এ সমস্ত অপকর্মকারী কেশ্যামতের দিন আল্লাহ তায়ালায় নিকট জঘন্য পাপী বলিয়া পরিগণিত হইবে।

২৭৮। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) ও আবুছল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহ্ আলাইহে অসাল্লাম শেষ নিশ্বাস ত্যাগকালীন যখন সূত্বা-যতনায় অস্থির ছিলেন সেই মুহূর্তে বলিয়াছেন, ইহুদী ও নাছারাদের উপর আল্লাহ লা'নৎ বধিত হউক ; তাহারা পয়গাম্বরগণের কবরকে মসজিদ (সেজদার স্থান) রূপে ব্যবহার করিয়াছে। এই বলিয়া হসরত দঃ) স্বীয় উম্মতকে ঐরূপ অপকর্ম হইতে সতর্ক করিয়াছিলেন। (৬২ পৃঃ)

২৭৯। হাদীছ :—আবু হোরাযরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহ্ আলাইহে অসাল্লাম অভিষাপ ও বদ-দোয়া করতঃ বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদিগকে ধ্বংস করুন ; তাহারা পয়গাম্বরগণের কবরকে মসজিদে পরিণত করিয়াছিল। (৬১ পৃঃ)

২৮০। হাদীছ :—আবুছল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছালাল্লাহ্ আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা স্বীয় আবাস গৃহে (নফল) নামায (ইত্যাদি) পড়িও ; (আল্লাহর জেকরের দ্বারা গৃহ আবাদ থাকিবে ;) গৃহকে কবরস্থানে পরিণত করিও না।

ব্যাখ্যা :—উক্ত বাক্যের আসল উদ্দেশ্য এই যে, যে গৃহে নামায ইত্যাদি আল্লাহর জেকর নাই, সেই গৃহবাসী মৃত এবং সেই গৃহ কবরস্থান তুল্য। তাই তোমরা স্বীয় আবাস গৃহকে আল্লাহর জেকর হইতে খালি রাখিয়া কবরস্থানে পরিণত করিও না। বাহ্য দৃষ্টিতে এই বাক্যের অর্থে ইহাও অন্তর্ভুক্ত আছে যে, আবাস গৃহে মৃতদেহ দাফন করিও না, কারণ পূর্বে বলা হইয়াছে, আবাস গৃহে নামায পড়িও ; অথচ কবরযুক্ত স্থানে নামায পড়া নিষিদ্ধ। (৬২ পৃঃ)

২৮১। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—নবী ছালাল্লাহ্ আলাইহে অসাল্লাম হিজরত করতঃ মদীনায় অবস্থান করিয়া প্রথমে “বনু আমের ইবনে আউফ” নামক গোত্রের বস্তিতে চৌদ্দ দিন অতিবাহিত করিলেন। তারপর তাহার পিতামহের মাতুল বংশ—বনী নাজ্জার বংশীয় লোকদিগকে তিনি খবর দিলে পর (তাহারা তাঁহাকে জাকজমক পূর্ণ পরিবেশে অভ্যর্থনা করিয়া নেওয়ার জন্ত) প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বন্ধে তলওয়ার লটকাইয়া হাজির হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) আবু বকর (রাঃ)কে পেছনে বসাইয়া উষ্ট্রে আরোহণ পূর্বক আসিতেছিলেন এবং বনী-নাজ্জার গোত্রীয় লোকগণ তাহার চতুর্পার্শ্বে ছিল। এইভাবে পথ চলিয়া আসিয়া (মদীনা শহরে) আবু আইউব আনছারী (রাঃ) ছাহাবীর বাড়ীর নিকটবর্তী

হইলে হযরতের যানবাহন উটটি বন্দিয়া পড়িল। (অবশেষে তথায়ই তিনি অবস্থান করিলেন এবং তথায়ই তাঁহার আবাস গৃহ তৈরীর ব্যবস্থা হইল।)

রসুলুল্লাহ (দঃ) সাধারণতঃ যেখানে নামাযের ওয়াক্ত হইত সেখানেই নামায পড়িয়া লইতেন, এমনকি বকরী রাখার স্থানেও নামায পড়িতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। কিন্তু মদীনায যখন বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়া গেল তখন তিনি সেখানে মসজিদ তৈরীর আদেশ দিলেন। বনী-নাজ্জার বংশীয় একদল লোককে ডাকাইয়া বলিলেন, তোমাদের এই বাগানটি আমার নিকট বিক্রয় কর, তাহার বিশেষ আগ্রহের সহিত আরজ করিল, আমরা ইহা বিক্রি করিব না, বরং দান করিয়া আল্লাহর নিকট ইহার মূল্যপ্রাপ্ত হইব। (অবশেষে তিনি উহা মূল্য দিয়াই ক্রয় করিলেন।) আনাছ (রাঃ) বলেন, ঐ বাগানের মধ্যে ছিল—মোশরেকদের কৎকগুলি (পুরানো কবর, পুরাতন ঘর বাড়ীর ভাঙ্গা-চুরা অবশিষ্ট এবং খেজুর গাছ। রসুলুল্লাহ ছালালাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশানুযায়ী ঐ কবরগুলি উচ্ছেদ করা হইল, ভাঙ্গা-চুরা সমতল করা হইল এবং খেজুরের গাছগুলি কাটিয়া মসজিদের আবরণ ও বেষ্টনী রূপে কেবলার দিকে সারিবদ্ধভাবে গাড়িয়া দেওয়া হইল। মসজিদের দরওয়াজার চৌকাঠ পাথরের তৈয়ার করা হইল। সকলেই মসজিদ তৈরীর জন্য পাথর আনিতেছিল এবং আনন্দ-মুখে এই তারানা গাহিতেছিল—

اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ - فَاغْفِرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ .

“হে খোদা! পরকালের জেন্দেগীই একমাত্র জেন্দেগী; ঐ জেন্দেগীর সুখ-শান্তির ব্যবস্থা স্বরূপ সমস্ত আনন্দের ও মোহাজেরের গোনাহ-খাতা মাক করিয়া দাও।”

বকরী, উট (ইত্যাদি) জন্তুর নিকটবর্তী নামায পড়া

২৮২। হাদীছঃ—নাকের নামক বিশিষ্ট তাগেয়ী বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ইবনে ওমর (রাঃ)কে দেখিলাম, তিনি স্বীয় উটকে (ছোতরা স্বরূপ) সম্মুখে বসাইয়া নামায পড়িলেন এবং বলিলেন—আমি নবী ছালালাহু আলাইহে অসাল্লামকে এরূপ করিতে দেখিয়াছি।

(২৮:নং হাদীছে উল্লেখ আছে, নবী (দঃ) বকরী রাখার স্থানে নামায পড়িতেন।)

ব্যাখ্যাঃ—নামাযে “খুস্ত খুস্ত” অর্থাৎ নিবেদিত আত্মার সহিত আল্লাহর প্রতি পূর্ণ একাগ্রতা আবশ্যক, তাই এমন পরিবেশে নামায আরম্ভ করা কর্তব্য যে স্থানে পূর্ণ একাগ্রতা হাসিলে বিঘ্নের সৃষ্টি না হয়। সে অনুযায়ী কোন কোন হাদীছে আছে, “বকরী রাখার স্থানে নামায পড়িও না”। অর্থাৎ বকরী ছোট জন্তু; উহার প্রতি কোন প্রকার ভয়-ভীতির কারণ নাই, উহার নড়াচড়ায় নামাযী ব্যক্তির ধ্যান ঐ দিকে ধাবিত হইবে না। কিন্তু উষ্ট্র অতি বিরাট জন্তু, অনেক সময় কামড় দেয়, অনেক সময় লাথি মারে; তাই উহার নড়াচড়ায় নামাযী ব্যক্তি সন্ত্রস্ত হইবে এবং তাহার একাগ্রতা নষ্ট হইবে—সে জন্তু

এই পার্থক্য করা হইয়াছে এবং অনাবশ্যকে বড় জন্তুর নিকটবর্তী নামায আরম্ভ করা হইতে নিষেধ করা হইয়াছে।

ইমাম বোখারী (রাঃ) বুঝাইতে চাহেন যে, উষ্ট্রের নিকটবর্তী নামায নিষিদ্ধ হওয়ার অর্থ কোন বিশেষত্ব নাই, আসল কারণ হইল একাগ্রতা হাসিল করিতে বাধার সৃষ্টি হওয়া। অতএব যদি কোন স্থানবিশেষে সেই ভয় না হয় তবে উষ্ট্রের নিকটবর্তীও নামায পড়া নিষিদ্ধ নয়। যেমন—কাহারও পালা-পোষা স্বীয় ব্যবহারের উষ্ট্র উহার প্রতি কোন প্রকার ভয়-ভীতির আশঙ্কা নাই, তাই উহার নিকটবর্তী নামায পড়া জায়েয।

আল্লামার গজবে ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থান এড়াইয়া নামায পড়িবে

আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বাবেল এলাকার বস্তীতে নামায পড়া মকরুহ বলিতেন; ঐ এলাকার অধিবাসীকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংসাইয়া দিয়াছিলেন।

২৮৩। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, (তবুকের জেহাদে যাইবার পথে “হজর” নামক বস্তী—যেখানে ছামুদ বংশীয় কাকেরদিগকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করিয়াছিলেন, উহার নিকটবর্তী হইলে পর) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় সঙ্গীদিগকে বলিলেন—ধ্বংসপ্রাপ্ত বৈরাচারী লোকদের বস্তীর ভিতর (আল্লামার আজাবকে স্মরণ করতঃ ও) ক্রন্দনরত অবস্থায় প্রবেশ করিবে। (এমন স্থানের নিকটবর্তী হইয়াও) যদি ক্রন্দনের সৃষ্টি না হয় তবে (এরূপ কঠিন হৃদয় লইয়া) ঐ স্থানে প্রবেশ করিবে না। নচেৎ আশঙ্কা আছে—তোমাদের উপরও সেইরূপ আজাব আসিয়া পড়িতে পারে যাহা ঐ বস্তীবাসীদের উপর আসিয়াছিল।

আশ্রয়হীন নারীকে মসজিদে আশ্রয় দেওয়া যায়

২৮৪। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আরবদেশেই কোন গোত্রে জনৈক হাবসী ক্রীতদাসী ছিল। তাহারা উহাকে আজাদ করিয়া দিলেও সে তাহাদের সঙ্গেই থাকিত। একদা তাহাদের একটি অলঙ্কার পরিহিতা মেয়ে বাহিরে চলাফেরা কালে তাহার অলঙ্কারটি খসিয়া পড়িয়া গেল বা সে নিজেই কোথাও খুজিয়া রাখিল। এদিকে হঠাৎ একটি চিল আসিয়া ঐ অলঙ্কারটিকে মাংস খণ্ড ভরিয়া ছো মারিয়া লইয়া গেল। ঐ ক্রীতদাসীর বর্ণনা যে—তারপর উহার অনুসন্ধান হইল, কিন্তু কোথাও কোন খোজ না পাইয়া তাহারা আমাকেই দোষী মনে করিয়া তল্লাশী লইল, এমনকি আমার লজ্জাস্থানে পর্যন্ত অনুসন্ধান চালাইল। আমি তাহাদের সঙ্গেই ছিলাম, হঠাৎ ঐ চিল অলঙ্কারটিকে আমাদের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। তখন আমি বলিলাম, তোমরা আমাকে যে বস্তুর জন্ত সন্দেহ করিতেছিলে এই দেখ সেই বস্তু। এই ঘটনায় ঐ ক্রীতদাসী তাহাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হইয়া সে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে চলিয়া আসিল এবং ইসলাম গ্রহণ করিল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, মসজিদের ভিতর একটি তাঁবুর স্থায় করিয়া

উহাতে তাহাকে আশ্রয় দেওয়া হইল। সে যখনই আমার নিকট আনিত কথাবার্তার মধ্যে এই ছন্দটি বলিত—

ويوم الوشاح مى تعاجيب ربنا- ولكنها من دارة الكفر نجت-

“অলংকার হারাইবার ঘটনা আল্লাহর কুদরতের একটি আশ্চর্যজনক লীলা। উহার অছিলায়ই আমি কুফরস্থান হইতে পরিভ্রাণ পাইয়াছি।” সর্বদা তাহার মুখে এই বাক্য শুনিয়া আমি একদিন এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে সে পূর্ণ ঘটনাটি আমার নিকট ব্যক্ত করিল।

প্ররোজনে পুরুষ মসজিদে নিজা যাইতে পারে

রসুলুল্লাহ ছালামুল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীদের মধ্যে একদল নিরুপায় নিরাশ্রয় সর্বহার্য লোক ছিলেন। নিজস্ব বলিতে তাহাদের কিছুই ছিল না; তাহাদিগকে আছহাবে-ছোফ্ফা বলা হইত। ছোফ্ফা অর্থ চবুতরা (বারান্দা)। তাহারা রসুলুল্লাহ ছালামুল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদের চবুতরায় দিবারাত্র কাটাইতেন এবং এলেম শিকায় রত থাকিতেন।

২৮৫। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি সন্তরজন আছহাবে-ছোফ্ফাকে একরূপ দরিদ্রাবস্থায় দেখিয়াছি যে, তাহাদের মধ্যে কাহারও পরিধানে দুইটি কাপড় ছিল না। এতদ্যেকেই শুধু একটি লুঙ্গি পরিহিত বা একটি কঞ্চল দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃতাবস্থায় থাকিতেন। ঐ কঞ্চল কাহারও শুধু হাঁটুর নীচে, কাহারও পায়ের গিরায় নিকটবর্তী হইত এবং কঞ্চল ছোট হওয়ায় উহার উভয় কিনারা হাতে ধরিয়া রাখিতে হইত খেন ছতর খুলিয়া না যায়।

২৮৬। হাদীছঃ—আবুহুসাইফ ইবনে ওমর (রাঃ) যৌবন বয়সেও যখন তাহার নিজস্ব ঘর-বাড়ী ছিল না, বিবাহও করেন নাই—তিনি রসুলুল্লাহ (দঃ) মসজিদে ঘুমািতেন।

২৮৭। হাদীছঃ—সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছালামুল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কথা ফাতেমার গৃহে আসিলেন; জামাতা আলী (রাঃ)কে না পাইয়া কোথায় গিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলেন। ফাতেমা উত্তর করিলেন, আমার সঙ্গে তাহার কথা কাটাকাটি হওয়ায় রাগান্বিত হইয়া আমার নিকট কিছু না বলিয়াই তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) এক ব্যক্তিকে আদেশ করিলেন, আলী কোথায় গিয়াছে তালাশ কর। সে খোজ করিয়া আসিয়া আনয়ন করিল, তিনি মসজিদে শুইয়া আছেন; রসুলুল্লাহ (দঃ) মসজিদে আসিয়া দেখিলেন, তাহার শরীরের এক অংশ খালি মাটির উপর রহিয়াছে। মাটি মাখা অবস্থায় তিনি নিজামগ্ন আছেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় হস্তে তাহার শরীর ঝাড়িয়া বলিলেন, উঠ হে—আবু তোরাব। (“আবু তোরাব” অর্থ মাটি-মাখা। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া স্নেহভরে একরূপ সম্বোধন করিলেন।)

বিদেশ হইতে বাড়ী ফিরিয়া সর্বপ্রথম নামায পড়া

কা'য়াব ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছালাম্মাহ্ আলাইহে অসাল্লাম যখনই কোন সফর হইতে বাড়ী আসিতেন সর্বপ্রথম মসজিদে উপস্থিত হইয়া নামায পড়িতেন।

২৮৮। হাদীছ :—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি (নবী ছালাম্মাহ্ আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এক সফরে ছিলাম ; তিনি আমার এক দিন পরে বাড়ী পৌঁছিলেন। এবং প্রথমে মসজিদে আসিলেন।) আমি বেলা পূর্বাহ্নে হযরতের নিকট উপস্থিত হইলাম ; তিনি মসজিদেই ছিলেন। তিনি আমাকে দুই রাকাত নামায পড়ার আদেশ করিলেন। তাহার নিকট আমার একটি উটের মূল্য পাওনা ছিল, তিনি সেই আসল পাওনা প্রদান করিয়া আরও বেশী দিলেন।

মসজিদে বসিবার পূর্বে দুই রাকাত নামায পড়িবে*

২৮৯। হাদীছ :—আবু কাতাদাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছালাম্মাহ্ আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে কেহ মসজিদে প্রবেশ করিবে, বসিবার পূর্বে সর্বপ্রথম দুই রাকাত নামায পড়িয়া লইবে।

মসজিদের ভিতর অজু ভঙ্গ করা দৃশ্যীয়

২৯০। হাদীছ :—আবু হোরাযরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছালাম্মাহ্ আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—নামাযী ব্যক্তি তাহার নামায স্থানে বসিয়া থাকাকালীন ফেরেশতাগণ তাহার জন্ত এই বলিয়া দোয়া করিতে থাকেন—হে আল্লাহ ! তাহার গোনাহ মাফ করিয়া দাও, তাহার উপর রহমত নাযেল কর—যাবৎ না সে মসজিদে অজু ভঙ্গ করে।

মসজিদ তৈরী করিয়া হওয়া ভাল

আবু সায়ীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছালাম্মাহ্ আলাইহে অসাল্লামের মসজিদের ছাদ খেজুর গাছের পাতায় তৈরী ছিল। খলীফা ওমর (রাঃ) মসজিদে নববীকে প্রশস্ত করার আদেশ দিলেন। (মসজিদে সঙ্কলান হয় না লোকেরা বাহিরে দাঁড়াইয়া রোদ-বৃষ্টিতে কষ্ট পায়, তাই) তিনি বলিলেন, লোকদিগকে বৃষ্টি ইত্যাদি হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা করিয়া দাও। খবরদার। লাল, হলুদ ইত্যাদি রঙ্গীন নজা করিও না ; উহাতে নামাযীদের মন আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের মগ্নতা ও একাগ্রতা নষ্ট হইবে।

আনাছ (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছালাম্মাহ্ আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন—আমার উম্মতের উপর এমন এক যমানা আসিবে যে, তাহারা পরস্পর প্রতিযোগিতামূলক ভাবে (বড় বড়, সুন্দর সুন্দর) মসজিদ তৈরী করিবে, কিন্তু ঐ মসজিদসমূহ অতি সামান্যই শাৰাদ হইবে।

* এই নামাযকে তাহিয়াতুল-মসজিদ বলা হয়। এই নামাজ মসজিদে বাইয়া বসিবার পূর্বে পড়িতে হয়, নতুবা ছওয়াব কম হইবে। অনেকে মসজিদে বাইয়া প্রথমে বসিয়া নৈয়—ইহা ভুল।

অর্থাৎ—মসজিদ আবাদ হয় নামায ও আল্লামার জেকরের দ্বারা। যেসময়ের নিকটবর্তী মোসলমান সম্প্রদায় শুধু বাহ্যিক ঢাকচিক্যে মত্ত হইবে—তাহাদের মসজিদসমূহ সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইবে, কিন্তু নামাযীর সংখ্যা অতি নগণ্য হইতে থাকিবে। মোসলমানদের এই দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই ছাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, হে মুসলমানগণ! তোমরাও মসজিদসমূহের শুধু বাহ্যিক ঢাকচিক্যে মত্ত হইবে যেমন ইছদী, নাছারাগণ করিত।”

২৯১। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় তাঁহার মসজিদ পাথর দ্বারা দেওয়াল ও খেজুরের ডালা দ্বারা ছাদ তৈরী ছিল এবং খেজুর গাছ দ্বারা উহার খুঁটি দেওয়া হইয়াছিল। (প্রথম দফায় খলীফা) ওমর (রাঃ) উহাকে সম্প্রসারণ করিয়াছেন, কিন্তু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগের আয় পাথর, খেজুর পাতা ও খেজুরের গাছ দ্বারাই তৈরী করিয়াছিলেন। (তৃতীয় খলীফা) ওসমান (রাঃ) উহাকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করেন এবং উহার দেওয়াল নক্সা করা পাথর দ্বারা চুণা ও শুরকির গাঁথনীর সাহায্যে তৈয়ার করেন এবং থামগুলিও নক্সী পাথর দ্বারা করেন এবং ছাদের মধ্যে শাল কাঠ লাগাইয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা :—মসজিদকে চিত্রাঙ্কিত নক্সী ও রঙ্গিন না করিয়া সাদা-সিঁদাভাবে তৈরী করা আবশ্যিক। বিশেষতঃ সম্মুখ দেওয়ালে চিত্তাকর্ষক নক্সা-নমুনা করা চাই না; ইহাতে নামাযী ব্যক্তির ধ্যান ঐ সবেগে প্রতি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। হাঁ, আড়ম্বরহীন সাদা-সিঁদাভাবে পাকা-পোক্তা ও মজবুত করা বিশেষতঃ বর্তমান যমানায় দৃশ্যীয় নহে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় মসজিদ খেজুর গাছের ও উহার পাতায় তৈরী ছিল বটে, কিন্তু সেই যমানায় মানুষের আবাস গৃহ সাধারণতঃ এর চেয়েও নিম্নস্তরের হইত। বর্তমান যমানায় যখন সাধারণ মানুষের আবাস গৃহও খেজুর গাছের নয়, অগণিত আলীশান ইমারতে পরিপূর্ণ; এই অবস্থায় মসজিদকে নিম্নস্তরের বানাইলে উহার মর্যাদাহানি হইবে। বোখারী শরীফের শরাহ ফতুল্লাবারী নামক কিতাবে একজন প্রসিদ্ধ আলেমের ফৎওয়া উদ্ধৃত হইয়াছে—

لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها فاحب ان يصنع ذلك بالمساجد
مونا لها من الاستهانة -

“যেহেতু মানুষের আবাস গৃহ ভাকজমকপূর্ণ আলীশান হইয়াছে, তাই মসজিদসমূহ সেই তুলনায় তৈরী হওয়াই বাঞ্ছনীয়; যেন মসজিদের মর্যাদাহানি না হয়।”

তৃতীয় খলীফা ওসমান (রাঃ) এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদের রূপকে পরিবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মসজিদ তৈরী করিতে সহযোগিতা ও সাহায্য গ্রহণ করা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—(১০ পারা ৯ রুকু)

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ

অর্থ—“মোশরেকরা আল্লাহর ঘরসমূহকে আবাদ করার সুযোগ পাইতে পারে না।”
এই আয়াত উক্তির উদ্দেশ্য, মসজিদ তৈরীতে কাফেরের সাহায্য গ্রহণ করিবে না।
মসজিদ তৈরীতে কাফেরের সাহায্য গ্রহণ জায়েয নহে। (ফয়জুল-বারী ২—৫২)

২৯২। হাদীছ :—আবু সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (রসুলুল্লাহ (দঃ) মসজিদ তৈরীর সময়) আমরা এক একটি ইট আনিতেছিলাম, আশ্মার (রাঃ) দুই দুইটি ইট আনিতে ছিলেন। নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে দেখিয়া স্নেহভরে তাঁহার গায়ের মাটি ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ বলিলেন, পরিতাপের বিষয়—বিদ্রোহী দলের লোক আশ্মারকে হত্যা করিবে ; সে তাহাদেরে আহ্বান করিবে বেহেশতের দিকে ; আর তাহারা তাঁহাকে আহ্বান করিবে দোষখের দিকে। আশ্মার (রাঃ) ইহা শুনিয়া এই দোয়া করিতে লাগিলেন, “আমি পথভ্রষ্টতা হইতে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করি।”
অর্থ—আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই, আমার যেন আত্মিক পরিবর্তন না ঘটে ; বিপদের কারণে যেন আমি ভ্রষ্টতায় পতিত না হই।

ব্যাখ্যা :—আলী (রাঃ) ও মোয়াবিয়া (রাঃ) উভয়ের মধ্যে রাজনৈতিক মতবিরোধ ছিল। কিন্তু ইহার বহু পূর্বেই ইহুদীদের যড়যন্ত্রে একটি সুসঙ্গবদ্ধ মোনাক্কেফ দল রাফেজী ফের্কা নামের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং গা-ঢাকা দিয়া মোসলমানদের মধ্যে शामिल ছিল। অতঃপর যড়যন্ত্র মূলকভাবে মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে মোসলেম জাতির সুপ্রতিষ্ঠিত শাসনকর্তা খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি করিতে তাহারা প্রয়াস পাইয়াছিল। সেই বিদ্রোহী দলের সক্রিয় যড়যন্ত্রেই তৃতীয় খলীফা ওসমান (রাঃ) শহীদ হন। এই বিদ্রোহী দলের মূল—মোনাক্কেফদের সুপরিকল্পিত গোপন যড়যন্ত্রে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সমর্থক এবং আয়েশা (রাঃ), তাল্হা (রাঃ) ও যোযায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সমর্থকদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী “জামালের যুদ্ধ” অনুষ্ঠিত হয়, যাহাতে উভয় পক্ষে দশ হাজার লোক শহীদ হয়। অতঃপর এই বিদ্রোহী দলটাই আলী (রাঃ) এবং মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত করে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে “সিফফীনের যুদ্ধ” সংঘটিত হয়। আলোচ্য আশ্মার (রাঃ) সব সময়ই আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষে ছিলেন ; তিনি সেই সিফফীনের যুদ্ধে শহীদ হন। আশ্মার (রাঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীতে রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহাও বলিয়াছিলেন—

يَا مَعَارُ لَا يَقْتُلُكَ أَصْحَابِي تَقْتُلُكَ الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَّةُ

“হে আম্মার। আমার ছাহাবী দল তোমাকে হত্যা করিবে না; তোমাকে হত্যা করিবে বিদ্রোহী দলের লোক” (মোসনাদে-বজ্জার হইতে “ওফাউল-উফা”)।

এই তথ্য দৃষ্টে মনে হয়, ঐ মোনাফেকদের সৃষ্ট বিদ্রোহী দলের লোক পরিকল্পিত গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সিক্‌ফীনের যুদ্ধে আলী (রাঃ) ও মোয়াবিয়া (রাঃ) তাহাদের উভয়ের দলেই গা-ঢাকা দিয়া পক্ষম বাহিনীরূপে शामिल থাকে এবং মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষকে লোক-চোখে দোষী করার উদ্দেশ্যে আম্মার (রাঃ)কে শহীদ করে। কিম্বা তাহারা বাহৃত: ছিল আলীর (রাঃ) পক্ষেই যে পক্ষে আম্মার (রাঃ)ও ছিলেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা আলী ও মোয়াবিয়া (রাঃ) উভয়ের কাহারও পক্ষে ছিল না; তাহারা ছিল পক্ষম বাহিনী দল। তাহারা সুযোগপ্রাপ্তে আলী ও মোয়াবিয়া উভয় পক্ষের মোসলমানকেই হত্যা করিতেছিল—যে রূপ তাহারা জামাল যুদ্ধে করিয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে প্রমাণ রহিয়াছে। তাহাদেরই কোন লোকের হাতে আম্মার (রাঃ) শহীদ হন। এইভাবে আম্মার (রাঃ) সিক্‌ফীনের যুদ্ধে বিদ্রোহী দল তথা মোনাফেকদের সৃষ্ট গোপন ষড়যন্ত্রকারী বিদ্রোহী দলের কোন সদস্যের হাতে নিহত হন এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আলোচ্য ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়।

মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং তাহার প্রকৃত সমর্থক পক্ষ যে, আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত “বিদ্রোহী দল”-এর উদ্দেশ্য নহে, তাহা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উল্লিখিত উক্তিতেই প্রকাশিত হয়। কারণ, মোয়াবিয়া (রাঃ) নিশ্চয় ছাহাবী—অহী লিখক বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন।

আম্মার (রাঃ) শহীদ হওয়ার ঘটনা ঘটিলে স্বয়ং মোয়াবিয়া (রাঃ) এই তথ্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন যে, আমি বা আমার কোন লোক আম্মার (রাঃ)কে হত্যা করে নাই। (মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানীর (র:) পুস্তিকা হইতে গৃহীত।)

সার কথা—আলোচ্য হাদীছে উল্লিখিত বিদ্রোহী দল বলিতে ঐ দল উদ্দেশ্য যাহারা মোসলমানদের শাস্তি খর্ব করার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রকারীরূপে সৃষ্টি হইয়া খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত: তাহাকে অবরুদ্ধ করিয়া শহীদ করিয়াছিল। তারপরেও তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া চলিতে থাকে এবং মোসলমানদের মধ্যে লড়াই-যুদ্ধ সৃষ্টি করিতে থাকে। অবশেষে তাহারা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করিয়াছিল এবং তাহাদের লোকের হাতেই আলী (রাঃ) শহীদ হইয়াছিলেন। তাহাদের দলের এবং তাহাদের বিদ্রোহের ইতিহাস সপ্তম খণ্ডের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। এই দলের যে প্রচেষ্টা ছিল তাহা যে দোষের পথ এবং আম্মার (রাঃ)-এর প্রচেষ্টা যে বেহেশতের পথ তাহা সুস্পষ্ট।

মসজিদ বা উহার জিনিস তৈরী করিতে কারিগরের সাহায্য

২৯৩। হাদীছ :— জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একটি স্ত্রীলোক রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিল, (মসজিদে খোৎবা ইত্যাদির সময়) বসিবার উদ্দেশ্যে আপনার জম্ব কাঠের দ্বারা একটি আসন তৈরী করিতে ইচ্ছা করি; আমার একটি ক্রীতদাস আছে, সে মিস্ত্রী কাজ জানে। রসুলুল্লাহ (স:) বলিলেন, ইচ্ছা

হইলে তাহা করিতে পারে। তারপর যথাসম্ভব উহার কাজ সম্পন্ন করার জন্য হযরত (দঃ) নিজেরও খবর পাঠাইলেন। সে একটি মিস্ত্র তৈরী করিল। ২৫২নং হাদীছেও উল্লেখ আছে।)

মসজিদ তৈরী করার ফজিলত

২৯৪। হাদীছ :— ওসমান (রাঃ) যখন রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদের (উন্নয়ন) পরিবর্তন সাধিত করিলেন, তখন সাধারণ্যে উহার সমালোচনা হইতে লাগিল। এই সমালোচনার উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি শুনিয়াছি—রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ তৈরী কাজে শরীক হইবে আল্লাহ তায়ালা সে অনুপাতে বেহেশতের মধ্যে তাহার জন্য ইমারত তৈরী করিবেন।

মসজিদের মধ্যে সতর্কতার সহিত চলিবে

২৯৫। হাদীছ :—আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মসজিদে বা বাজারে চলাফেরার সময় হাতে তীর ইত্যাদি থাকিলে উহার ফলক মুষ্টির ভিতরে রাখিবে, যেন কোন মোসলমান ব্যক্তি উহার দ্বারা আঘাত না পায়।

২৯৬। হাদীছ :—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে তীর হাতে লইয়া আসিতেছিল। হযরত রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে আদেশ করিলেন, ইহার ফলক মুষ্টির ভিতরে রাখ।

মসজিদের ভিতরে ভাল কবিতা পাঠ করা

২৯৭। হাদীছ :—রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হাছ্‌ছান (রাঃ)কে বলিতেন, হে হাছ্‌ছান! তুমি আল্লামার রসুলের পক্ষ হইতে (কবিতার দ্বারা কাফেরদের উক্তি) উত্তর দান কর। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার জন্য দোয়া করিতেন—হে খোদা! জিব্রাঈল ফেরেশতা দ্বারা হাছ্‌ছানকে সাহায্য কর।

ব্যাখ্যা :—আরবদেশে কবিতার খুবই প্রচলন এবং জন-সমাজে উহার অত্যন্ত প্রভাব ছিল। কাফের কবিরা হযরত রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সুখ্যাতি নষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রতি নানাপ্রকার কু-উক্তি করিয়া মিথ্যা কুৎসা রটাইয়া কবিতা প্রকাশ করিত। মোসলমানদের মধ্যে ছাহাবী হাছ্‌ছান (রাঃ) সুপ্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে কাফেরদের উত্তরে কবিতা রচনা করিতে বলিতেন, এমনকি অনেক সময় মসজিদের মিস্ত্রের দাঁড়াইয়া ঐ কবিতা পাঠের আদেশ করিতেন এবং তাঁহার জন্য দোয়া করিতেন, হে খোদা! তুমি জিব্রাঈল ফেরেশতা দ্বারা হাছ্‌ছানকে (এই কবিতা রচনায়) সাহায্য কর।

মসজিদে (জেহাদ শিক্ষার) অস্ত্র চালনা

২৯৮। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে আমার ঘরের দরওয়াজায় দণ্ডায়মান দেখিলাম। কয়েকজন হাবসী লোক মসজিদের

মধ্যে অস্ত্র চালনার খেলা করিতেছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে তাহার চাদর দ্বারা পর্দা করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি তাহাদের ঐ খেলা দেখিতেছিলাম।

মসজিদে ঋণ আদায়ের তাগিদ করা

২৯৯। হাদীছ :- কা'য়াব (রাঃ) নামক ছাহাবী ইবনে হাদরাদ (রাঃ) নামক ছাহাবীর নিকট পাওনাদার ছিলেন। একদিন মসজিদের মধ্যে উহা আদায়ের তাকিদ দিলে পর উভয়ের মধ্যে উল্লেখ্যের কথা কাটাকাটি হইল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহার ঘরের ভিতর হইতে উহা গুলিয়া উঠিয়া আসিলেন এবং দরওয়াজার পর্দা উঠাইয়া কা'য়াবকে ডাকিলেন। তিনি হাজির হইলে রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে সুপারিশ করিয়া বলিলেন, তোমার প্রাপ্যের অর্দ্ধাংশ ফমা করিয়া ছাড়িয়া দাও। তিনি তাহাতে সন্মত হইলেন। তখন হযরত (দঃ) ইবনে হাদরাদ (রাঃ)কে আদেশ করিলেন—যাও এখনই ইহা আদায় করিয়া দাও।

মসজিদ ঝাড়ু দেওয়া ও পরিষ্কার করার ফজিলত

৩০০। হাদীছ :- আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একটি কৃষ্ণ বর্ণের পুরুষ বা স্ত্রীলোক মসজিদ ঝাড়ু দিয়া থাকিত। তাহার মৃত্যু হইলে পর একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন; সকলেই বলিল, সে মারা গিয়াছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, আমাকে খবর দেওয়া হয় নাই কেন? উত্তরে সকলেই ঐ লোকটির প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করিল। নবী (দঃ) বলিলেন, আমাকে তাহার কবর দেখাইয়া দাও। হযরত (দঃ) তাহার কবরের নিকট আসিয়া জানাঘার নামায পড়িলেন ও দোয়া করিলেন।

মসজিদের জন্ত খাদেম রাখা

পবিত্র কোরআন ৩ পারা ৪ রুকুতে ঈসা আলাইহেছালামের মাতা বিবি মরয়্যামের জন্ম-বৃত্তান্তের বর্ণনায় উল্লেখ আছে, তিনি মাতৃগর্ভে থাকাকালে তাহার মাতা বলিয়াছিলেন—

رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي

“হে পরওয়ারদেগার। তোমার জন্ত মান্নত মান্লাম, আমার গর্ভস্থ সন্তান মুক্ত হইবে।” অর্থাৎ তোমার সন্তুষ্টির কাজে উৎসর্গিত হওয়ার জন্ত হুনিয়ার কাজ-কর্ম হইতে সে মুক্ত হইবে।

আবুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) উক্ত আয়াতের তফছীরে বলিয়াছেন, ঐ মান্নতের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, বাইতুল-মোকাদ্দাস মসজিদের খেদমতের জন্ত মুক্ত হইবে।

সেকালে সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে এইরূপ মান্নতের রীতি শরীয়ত সন্মত ছিল। আমাদের শরীয়তে এইরূপ মান্নত ওয়াজেব হয় না। অবশ্য মসজিদের খেদমত করা বড় ছোয়াবেবের কাজ।

কয়েদীকে মসজিদের খুঁটির সহিত বাঁধা

ইসলামের সোনালী যুগে বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ইত্যাদি অনেক কার্যবিধির কেন্দ্র ছিল মসজিদ। কারণ, তখন মোসলেম সমাজের কোন ক্ষেত্রেই ধীন ও হুনিয়া ভিন্ন

ভিন্নভাবে পরিচালিত হইত না, উভয়ই এক সঙ্গে চলিত এবং ইহাই ছিল মোসলমানদের উন্নতির উৎস। এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই ইমাম বোখারী (রঃ) কয়েকটি পরিচ্ছেদ লিখিয়াছেন। যেমন, পূর্বের একটি পরিচ্ছেদে আছে “মসজিদে বিচার বিভাগীয় কার্য পরিচালনা করা”। রসুলুল্লাহ (দঃ) সময় খানকাহ, মাদ্রাসা, বিচারালয় এমনকি হাজত কেন্দ্রও মসজিদই ছিল। কারণ, আসামী ও কয়েদীদিগকে শুধু শাস্তি দান করিয়া তাহাদের নৈতিক চরিত্রের পরিবর্তন সাধন করা যায় না, বাৎসরিক তাহাদের জন্ত সংপরিবেশের ব্যবস্থা করা না হইবে। এখানে মসজিদকে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হইল—সং পরিবেশের ব্যবস্থা করা; যার দ্বারা কয়েদীগণের চরিত্র সংশোধন হইয়া তাহারা দোষমুক্ত হইতে পারিবে। যেমন—নিম্নের হাদীছে বর্ণিত ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাজতখানা আসামীকে কত উর্দে উঠিত করিত এবং তাহার ভাব-ধারণায় পরিবর্তন আনিয়া তাহার চরিত্রের কত সংশোধন করিত।

খলীফা ওমরের (রাঃ) সুপ্রসিদ্ধ বিচারক কাজি শোরায়েহ (রঃ) অভিযুক্তকে মসজিদের খুঁটির সহিত আবদ্ধ রাখার নির্দেশ দিতেন।

৩০১। হাদীছ :- আবু হোরায়েরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নজদ দেশের প্রতি একদল সৈন্য পাঠাইলেন। তাহারা ছুমায়া ইবনে উছাল নামক তথাকার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া আসিল এবং (নবীজীর আদেশে) তাহাকে মসজিদে নববীর খুঁটির সহিত বাঁধিয়া রাখিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ছুমায়া! তোমার ধারণা কি? সে উত্তর করিল আমার ধারণা ভালই (যে, আপনি কোন প্রকার জুলুম-অত্যাচার করিবেন না)। যদি আপনি আমাকে মারিয়া ফেলেন তবে স্মরণ রাখিবেন, ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করা হইবে, আর যদি আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন তবে আমাকে কৃতজ্ঞ পাইবেন। আর যদি আমার নিকট হইতে ধন আদায়ের ইচ্ছা করিয়া থাকেন তবে যত ইচ্ছা আপনি বলুন; আমি উহা দিয়া দিব। ঐ দিন তাহাকে বাঁধা অবস্থায়ই রাখিয়া দেওয়া হইল। পরদিন রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে পুনরায় ঐ প্রশ্নই করিলেন। সে উত্তর করিল, আমি পূর্বে যাহা বলিয়াছি আজও তাহাই বলিতেছি। অর্থাৎ যদি আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন তবে আমাকে কৃতজ্ঞ পাইবেন। এই দিনও তাহাকে পূর্বাবস্থায়ই রাখা হইল। তৃতীয় দিনও রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে ঐ প্রশ্নই করিলেন। এবারও সে পূর্বের জায়গায়ই উত্তর দিল। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়ার আদেশ করিলেন। ছাড়িয়া দেওয়া হইলে পর সে মসজিদের নিকটবর্তী একটি খেজুর বাগানে চলিয়া গেল এবং সেখানে গোসল করিয়া মসজিদে ফিরিয়া আসিল ও ইসলামের কলেমা পড়িল—

“أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله”

এবং বলিল, হে মোহাম্মদ (দ:) আমার নিকট ছনিয়ার কোন বস্তু আপনার চেয়ে অধিক ঘৃণিত ছিল না, কিন্তু এখন একমাত্র আপনিই সর্বাধিক প্রিয়পাত্র। কোন ধর্ম আপনার ধর্ম হইতে অধিক ঘৃণিত ছিল না, কিন্তু এখন আপনার ধর্মের তুল্য প্রিয় ধর্ম আর নাই। আপনার দেশের চেয়ে অধিক ঘৃণিত দেশ আর ছিল না, কিন্তু এখন আপনার দেশের চেয়ে প্রিয় দেশ আর নাই।

আমি ওমরা করার জন্ত মক্কা যাইতেছিলাম, এমতবশ্যে আপনার সৈন্যদল আমাকে লইয়া আসিয়াছিল। সেই ওমরার বিষয় আপনার আদেশ কি? রসুলুল্লাহ (দ:) তাহার জন্ত ছনিয়া ও আখেরাতের সুসংবাদ ঘোষণা পূর্বক তাহাকে ওমরা করার পরামর্শ দিলেন। সে মক্কা আসিলে পর কোন ব্যক্তি তাহাকে বলিল—তুমি ধর্মত্যাগী হইয়াছ? উত্তর করিল, না না।—আমি মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ছালাম্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাতে মুসলমান হইয়াছি। আমি শপথ করিয়া ঘোষণা দিতেছি, মক্কাবাসীগণ (আমার দেশ) “ইয়ামামা” হইতে এক দানা খাও ও আর রসুলুল্লাহ ছালাম্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অনুমতি ব্যতিরেকে পাইবে না।

(নিরাশ্রয়) রুগ্নকে মসজিদে আশ্রয় দেওয়া

৩০২। হাদীছ :-আয়েশা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে—খন্দকের জেহাদে সায়াদ (রা:) শিরারূপে আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন। নবী ছালাম্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মসজিদে তাহার জন্ত তাঁবুর স্থায় আশ্রয়স্থল তৈরী করিয়া দিলেন; যেন তিনি নিকট হইতে তাহাকে দেখা-শুনা করিতে পারেন।

মসজিদে বাড়ীর দরওয়াজা কাটা বা যাতায়াতের রাস্তা করা

অর্থাৎ কাহারও আবাস-গৃহ মসজিদ সংলগ্ন, তাই সে ইচ্ছা করে যে, তাহার বাড়ী বরাবর মসজিদের দেওয়ালে ছোট-খাট দরওয়াজা করিয়া নেয়, যেন সোজামুজি উহা দ্বারা মসজিদে প্রবেশ করিতে পারে—এরূপ করা জায়েয নয়। তা-ছাড়া খীর গৃহে যাতায়াতের জন্ত মসজিদের ভিতর দিয়া কোনপ্রকার রাস্তা করিয়া লওয়াও জায়েয নহে।

৩০৩। হাদীছ :-আবু সারীদ খুদরী (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, অস্তিম-রোগ অবস্থায় একদা নবী ছালাম্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মাথায় পট্টি বাঁধিয়া মসজিদের মিন্বরের উপর আসিয়া বসিলেন এবং আল্লার ছানা-ছিকত দ্বারা বস্তব্য আরম্ভ করিয়া বলিলেন, আল্লাহ ছোবহানাহু তায়াল্লা এক বন্দাকে তাহার নিজ ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন যে, সে ছনিয়াতে থাকিয়া দীর্ঘায়ু ভোগ করিতে পারে অথবা আল্লার নিকটও চলিয়া যাইতে পারে। সেই বন্দা আল্লার নিকট চলিয়া যাওয়াকেই পছন্দ করিয়াছে। (আবু সারীদ (রা:) বলেন,) ইহা শুনিয়া আবু বকর (রা:) কাঁদিতে লাগিলেন। আমি মনে মনে ভাবিলাম, এই বুড়া কাঁদে কেন? আল্লাহ তায়াল্লা এক বন্দাকে ছনিয়া ও আখেরাত তাহার নিজ ইচ্ছার উপর

সকলে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং কিছু সময় ভিতরে রহিলেন, তারপর সকলে বাহির হইয়া আসিলেন। আবছল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি হযরতের প্রতি দৌড়িয়া অগ্রসর হইলাম এবং বেলালকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, নবী (দঃ) ভিতরে নামায পড়িয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন স্থানে নামায পড়িয়াছেন, বেলাল বলিলেন, পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া ঐ দিকের দেওয়াল হইতে

প্রায় তিন হাত ব্যবধানে, ডান দিকে দুইটি খুঁটি ও বাম দিকে একটি খুঁটি এবং পিছনে তিনটি খুঁটির সারি রাখিয়া দাঁড়াইয়া নামায পড়িয়াছেন। ঐ সময় কাঁবা ঘরের ছাদ মোট ছয়টি খুঁটির উপরই স্থাপিত ছিল; (তিন তিনটি খুঁটি দুই সারিতে ছিল, প্রথম সারিতে দক্ষিণ দিকের খুঁটিদ্বয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া হযরত (দ:) নামায পড়িয়াছিলেন। আবছল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) বলেন,) হযরত (দ:) কত রাকাত নামায পড়িয়াছিলেন তাহা জিজ্ঞাসা করিতে আমার স্মরণ ছিল না।

মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা

৩০৫। হাদীছ :— ছায়েব ইবনে ইয়াযিদ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা আমি মসজিদের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিলাম, এক ব্যক্তি আমার উপর কঙ্কর নিক্ষেপ করিল, আমি তাকাইয়া দেখিলাম, খলীফা ওমর (রা:)। তিনি আমাকে আদেশ করিলেন, ঐ দুই ব্যক্তিকে ডাকিয়া আন। আমি তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিলাম। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন. তোমরা কোন্ দেশের লোক? তাহারা বলিল, আমরা তায়েফবাসী। ওমর (রা:) বলিলেন, তোমরা মদীনাবাসী হইলে আমি তোমাদিগকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দিতাম; তোমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কথা বল।

মসজিদে উর্কমুখী হইয়া শোয়া

৩০৬। হাদীছ :—আব্বাস ইবনে তামীমের চাচা আবছল্লাহ (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে মসজিদে উর্কমুখী শায়িত অবস্থায় দেখিয়াছেন। তখন হযরতের এক পা অপর পায়ের উপর রাখা ছিল।

ব্যাখ্যা :—এই শয়ন নিদ্রার শয়ন নয়, বরং হাত-পা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও দেহের শান্তি ও অবসাদ দূর করণার্থে আরাম লাভের উদ্দেশ্যে শরীর লম্বা করা। যেমন—কেহ দীর্ঘ সময় মসজিদে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া এবাদত-বন্দেগী করিয়া দেহে অবসাদ ও শান্তি অনুভব করিয়াছে, আরও অধিক সময় মসজিদে অবস্থান করা তাহার ইচ্ছা। এমতাবস্থায় মধ্যভাগে অবসাদ দূর করণার্থে ঐরূপ শয়ন করিতে পারে এবং সেই শয়ন অবস্থায়ও মসজিদে অবস্থানের হওয়াব তাহার লাভ হইবে (ফতহুল-বারী ১—৪৪৬)। ঐরূপ শয়নে দুইটি বিষয় লক্ষ্য রাখা আবশ্যক—লোকদের সমাবেশে না হয় এবং পূর্ণরূপে ছতর আবৃত রাখায় যত্ববান হয়। ছতর আবৃত রাখায় শালীনতাময় সতর্কতা অবলম্বন স্বরূপই হযরত (দ:) ঐ অবস্থায় পাদদ্বয় লম্বা করিয়া এক পা অপর পায়ের উপর স্থাপন করিয়াছিলেন। ওমর (রা:) এবং ওসমান (রা:)ও ঐরূপ করিতেন বলিয়া বোখারী (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন।

উর্কমুখী শয়নে উক্তরূপে সতর্কতা অবলম্বন করা শুধু মসজিদের জন্তই নির্দিষ্ট নহে। সাধারণভাবেও উর্কমুখী শয়নে উহা আবশ্যক; বোখারী (রা:) ১৩০ পৃষ্ঠায় আলোচ্য হাদীছ দ্বারা ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

অপর এক হাদীছে উর্দ্ধমুখী শায়িত হইয়া এক পা অপর পায়ের উপর রাখা নিষিদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। উহার উদ্দেশ্য উর্দ্ধমুখী শয়নে এক পা খাড়া করিয়া উহার উপর অপর পা উঠাইয়া রাখা। মুজি পরিধান অবস্থায় এইরূপ করিলে ছতর খুলিয়া যাওয়ার আশঙ্কায় নিষিদ্ধ করা হইয়াছে; পায়জামা পরিধান অবস্থায়ও ইহা খুবই অসুন্দর দেখায়।

মসজিদে বা অন্যত্র তশ্বীক করা

“তশ্বীক” অর্থ পরস্পর এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অপর হাতের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে প্রবেশ করান। হাদীছে আছে, রসুলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন—নামাযের জন্ত অঙ্গু করিয়া মসজিদে আনিতে হস্তদ্বয়ে তশ্বীক করিবে না। কারণ, ঐ সময়টি নামাযের মধ্যেই শামিল।

আর এক হাদীছে আছে, রসুলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন—“নামায পড়াকালে কেহ তশ্বীক করিবে না; উহা শয়তানী কাজ। আরও স্মরণ রাখিবে, কোন মানুষ (নামাযের অপেক্ষায় বা নামাযান্তে আল্লার জেকর ও তছবীহ ইত্যাদির জন্ত) যাবৎ মসজিদে থাকে; মসজিদ হইতে বাহির হওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত সে নামাযে গণ্য হয়।” (ফতহুল-বারী ১—৩৪৯)

নামায পড়াকালে তশ্বীক করা বস্তুতঃই শয়তানী কাজ তথা শরীয়ত নিষিদ্ধ কাজ। নামায পূর্ণ একাগ্রতার সহিত আদায় করা শরীয়তের বিশেষ কাম্য। উহাতে সাকল্যের জন্ত প্রয়োজন হয় নামাযের প্রস্তুতির আরম্ভ হইতেই নিজকে নামাযীরূপে রূপান্তরিত করা এবং নামাযে শোভণীয় নয় এইরূপ অনাবশ্যক কার্যাবলী হইতে সংযত থাকা। তদ্রূপ নামাযান্তে নামাযে লব্ধ একাগ্রতা ও ধ্যান-ধারণার সহিত কিছু সময় জিকর ও তছবীহ পাঠ করা উত্তম এবং উহা নামাযের মধ্যে শামিল। এতদ্বিত্ত এক নামায পড়িয়া অপর নামাযের অপেক্ষায় মসজিদে অবস্থান করিলে মসজিদ হইতে বাহির হওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সময় নামাযের মধ্যেই গণ্য বলিয়া হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। সেমতে ঐ সময়ও নামাযে শোভণীয় নয় এই শ্রেণীর অনাবশ্যক কার্য হইতে বিরত থাকা প্রয়োজন। এই দৃষ্টিতে নামাযের পূর্বে ও পরে উক্ত সময়দ্বয়েও তশ্বীক করা অপছন্দনীয়ই বটে। উপরোল্লিখিত হাদীছদ্বয়ের সমষ্টিতে এই তিন সময়ে তশ্বীক করাকেই নিষেধ করা হইয়াছে—(১) নামায পড়াকালে; ইহাত মকরুহ তাহরীমী (শামী ১—৬০১)। (২) নামাযের পূর্বে—নামাযের জন্ত অঙ্গু করার পর হইতে। (৩) নামাযের পরে অপর নামাযের অপেক্ষায় বা জিকর ও তছবীহ পাঠে মসজিদে বসি থাকা পর্য্যন্ত; এই দুই সময়েও তশ্বীক হইতে বিরত থাকা চাই—অবশ্য ইহা শুধু নামায সম্প্রক্ষে তশ্বীকের মছআলাহ।

ইমাম বোখারী (র:) আলোচ্য পরিচ্ছেদে তশ্বীক সম্পর্কে এই বলিতে চাহেন যে, সাধারণভাবে অর্থাৎ উক্ত তিন অবস্থা ও তিন সময় ব্যতিরেকে অন্য সময়ে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে তশ্বীক করা নিষিদ্ধ নহে। এমনকি মসজিদের মধ্যেও উহা করিতে পারে। যেমন, বিজ্ঞান লাভ উদ্দেশ্যে যদি কেহ তশ্বীক করিয়া বসে তবে তাহা জায়েয হইবে।

এ সম্পর্কে বোখারী (২:) এস্থলে একটি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন ; উহার অনুবাদ যথাস্থানে আনিবে। উক্ত হাদীছে বর্ণিত ঘটনায় উল্লেখ আছে, রসূলুল্লাহ (দ:) নামাযান্তে উঠিয়া যাইয়া মসজিদের এক পার্শ্বে বসিলেন ; তিনি তাঁহার বাম হাতের উপর ডান হাতকে তশবীকরূপে একত্রিত করিয়া ডান হাত দণ্ডায়মান করতঃ বাম হাতের কজ্জিকে ডান কজ্জির উপরে স্থাপন পূর্বক উহার পৃষ্ঠে মুখনওলের ডানপার্শ্ব রাখিয়া অস্বস্তিবোধকের দ্বায় বসিলেন।

এতদ্বিত্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বা আঙ্গুল সমূহের অবসাদ দূর করনার্থে তশবীক করিলে তাহাও জায়েয আছে, মকরুহ নহে (শামী ১—৬০১)।

তদ্রূপ কোন একটি বিষয় বুঝাইবার জন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইতে তশবীক করিলে তাহাও মকরুহ হইবে না ; এ সম্পর্কেও ইমাম বোখারী (৩:) দুইটি হাদীছে বর্ণনা করিয়াছেন। একটি হাদীছ যাহার অনুবাদ যথাস্থানে হইবে—উহাতে উল্লেখ আছে, মোসলমানদের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা এরূপ হওয়া চাই যে রূপ হয় একটি দেওয়ালের ইট সমূহের মধ্যে। ইহা উল্লেখের সময় হযরত (দ:) তশবীক তথা এক হাতের আঙ্গুল সমূহের মধ্যে অপর হস্তের আঙ্গুলসমূহ প্রবেশ করাইয়া দেওয়ালের ইটসমূহের গাথুনির দৃষ্টান্তও দেখাইলেন। দ্বিতীয় হাদীছটি এই—

৩০৭। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালাত্নাহ আলাইহে অসালাম আমাদের বলিলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ! কি নীতি অবলম্বন করিবে যখন তুমি খোসা-শ্রোণীর লোকদের মধ্যে বর্তমান থাকিবে ? এই হাদীছ বর্ণনার সময় হযরত (দ:) স্বীয় হস্তের আঙ্গুলসমূহে তশবীক করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা :—হাদীছটির পূর্ণ বিবরণ এই—একদা রসূলুল্লাহ (দ:) ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা:)কে সন্বেদন করিয়া বলিলেন, (চালনী দ্বারা আটা ইত্যাদি চালিলে উহার ভাল অংশ নীচে পড়িয়া যায়, খোসা বা তুষ জাতীর অংশই উপরে থাকে। তদ্রূপ কালক্রমে ভূপৃষ্ঠ হইতে ভাল মানুষ নিঃশেষ হইয়া শুধু তুষ ও খোসা-শ্রোণীর মানুষ থাকিয়া যাইবে।) হে আবদুল্লাহ ! তুমি কি নীতি অবলম্বন করিবে ? যদি তুমি ঐ খোসা-জাতির লোকদের যুগে বর্তমান থাক—যাহাদের ওয়াদা অঙ্গীকার ও আমানতদারী বিনষ্ট হইয়া যাইবে। (তথা অঙ্গীকার রক্ষা করিবে না, আমানতে খেয়ানত করিবে) এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিরোধে লিপ্ত হইয়া এইরূপে পরস্পর বিপরীতমুখী হইয়া পড়িবে। (এই বাক্য বলার সময়) ঐ লোকদের পরস্পর বিপরীতমুখী হওয়ার দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে হযরত (দ:) তশবীক তথা এক হাতের আঙ্গুলগুলি অপর হাতের আঙ্গুলগুলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন (—যে অবস্থায় উভয় হস্তের আঙ্গুলসমূহ পরস্পর বিপরীতমুখী হইয়া থাকে।)

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) আরজ করিলেন, এ সম্পর্কে আমার প্রতি আপনার আদেশ কি ? হযরত (দঃ) বলিলেন (ঐরূপ সময়ে) তুমি তোমার নিজের দীন-ঈমানকে রক্ষা করায় দৃঢ় থাকিবে; যুগের লোকদের ব্যাপারে মাথা ঘামাইবে না।

অল্প রেওয়াজেতে আছে—হযরত (দঃ) বলিলেন, যুগের লোকদের হইতে ভালটা গ্রহণ করিবে, খারাবটা বর্জন করিবে। শুধু নিজের দীন-ঈমান রক্ষায়ই লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিবে; যুগের লোকদের জন্ত মাথা ঘামাইবে না। (কুতুবুল-বারী ২৩—৩২)

জন-সাধারণের দীন-ঈমান রক্ষায় যথাসাধ্য চেষ্টা করা একটি বিশেষ ফরজ কাজ। কিন্তু হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) উপগোক্ত হাদীছে যেই অবস্থার যুগের উল্লেখ করিয়াছেন সেইরূপ যুগের আবির্ভাব হইলে তখন উক্ত ফরজ রহিত হইয়া যায়।

প্রকাশ থাকে যে—তশবীকের মছআলাহ সম্পর্কে যে বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে আব্দুল ফুটাইবার মছআলাহ সম্পর্কেও সেই বিবরণ প্রযোজ্য। (শামী ১—৬০১)

মক্কা-মদীনার রাস্তায় মসজিদসমূহ ও রসুলুল্লাহ (দঃ)

নামায স্থান সমূহের বর্ণনা

৩০৮। হাদীছ :—মুছা ইবনে ওক্বাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমি ছালেম ইবনে আবদুল্লাহকে দেখিয়াছি, তিনি মক্কা-মদীনা যাতায়াতে রাস্তায় কতগুলি স্থানের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন ও ঐ স্থান সমূহে নামায পড়িয়া থাকেন এবং বর্ণনা করেন যে, তাঁহার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এই স্থানসমূহে নামায পড়িতেন। কারণ, তিনি রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই স্থান সমূহে নামায পড়িতে দেখিয়াছেন।

৩০৯। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হজ্জ বা ওমরার জন্ত মদীনা হইতে মক্কা পানে যাওয়া কালে (মদীনার অনধিক দূরে অগতিত) জুল হোলায়ফা নামক স্থানে অবতরণ করিতেন। হযরতের অবতরণ স্থলটি বাবুল গাছের নীচে—পরবর্তী সময় যে স্থানে মসজিদ হইয়াছে তথায়ই অবস্থিত।.....

পাঠক বৃন্দ। ইহা একটি সুদীর্ঘ হাদীছ। এই হাদীছে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) মক্কা-মদীনার তৎকালীন রাস্তায় কতকগুলি স্থানের নিদর্শন বর্ণনা করিয়া নিদিষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) এই পথ অতিক্রম করাকালে এই স্থানসমূহে নামায পড়িয়াছেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আজীবন এই রাস্তায় যাতায়াত-কালীন এই স্থানসমূহ বিশেষভাবে নামায পড়িতেন। এমনকি উহার কোন কোন স্থানের নিকটবর্তী পরে মসজিদও তৈরী হইয়াছিল, তবুও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) সেই মসজিদে নামায না পড়িয়া রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামায পড়ার স্থানে নামায পড়িতেন।

রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি ছাহাবীদের এশক-মহব্বত এতই বিস্তীর্ণ ও সুগভীর ছিল যে, হযরতের সামান্যতম স্পর্শপ্রাপ্ত বস্তুসমূহের প্রতিও ছাহাবীগণ অতি আসক্ত ও আকৃষ্ট হইতেন যে, ছুনিয়াতে কোন বস্তুক্ষুই উহার সমতুল্য গণ্য করিতে না। রসুলুল্লাহ (দ:) যেরূপ জুতা ব্যবহার করিয়াছেন আবুহুলাহ ইবনে ওমর (রা:) আজীবন ঐরূপ জুতা ব্যবহার করিতেন। রসুলুল্লাহ (দ:) যেই রং পছন্দ করিতেন আবুহুলাহ ইবনে ওমর (রা:) আজীবন ঐ রং পছন্দ করিতেন। এইভাবে রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতিটি বস্তু ও কার্যের প্রতি ছাহাবীগণ জীবনের তরে আশেক হইয়া যাইতেন। কেহ কাহারও প্রতি খাটি আশেক হইলে স্বেচ্ছায়ই সে এই অবস্থায় পৌছে। যেমন কবি বলিয়াছেন—

پائے سگ ہو سیدہ مجنوں خلق گفتند این چه بود -

گفت این سگ گاه گاه کوئے لیلی رفتہ بود -

“একদা মজনুন একটি কুকুরের পা চুম্বন করিল। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এ-কি করিতেছ? সে বলিল, এই কুকুর সময় সময় লায়লার গলিতে যাতায়াত করিত।”

লায়লায় প্রতি মজনুনের কেবলমাত্র পাখিব এশক বা প্রেম ছিল। সেই এশকের দরুন সে লায়লার বাসস্থানের গলির প্রতি আসক্ত হইয়া ঐ গলিতে যাতায়াতকারী কুকুরের প্রতিও অনুরাগী হইয়া পড়ে। এমনকি সকলের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও ঘৃণার প্রতি ক্রক্ষেপ না করিয়া ঐ কুকুরের পা চুম্বন করে; ইহাকেই বলে এশক ও মহব্বত বা প্রেম। অতএব এক কবি বলেন—

امر علی الدیار دیار لیلی - اقبل ذا الجدار وذا الجدار -

وما حب الدیار شغف قلبی - ولكن حب من سكن الدیار -

“আমি আমার প্রেমাস্পদের বস্তী দিয়া যাতায়াতকালে উহার গৃহগুলিকে চুম্বন করি। আমি গৃহগুলির অনুরাগী নই, ঐ গৃহবাসীর ভালবাসা আমাকে আকৃষ্ট করে।”

ওমর ফারুক (রা:) তাঁহার খেলাকতের সময় সিরিয়া দেশ নূতন জয় হইলে পর তিনি ঐ দেশ পরিদর্শনে যাইয়া সেস্থানের বড় বড় লোকদের এক ভোজ সভায় যোগদান করিলেন। তিনি দস্তরখানার উপর একটি রুটির টুকরা দেখিতে পাইয়া স্মরণত তরীকা অনুযায়ী ঐ টুকরাটি উঠাইয়া খাইলেন। সঙ্গীদের মধ্যে একজন তাঁহাকে উপস্থিত লোকদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এরূপ নগণ্য কাজ হইতে বিরত থাকার জন্য ইঙ্গিত করিলে তিনি গর্ভভরে বলিলেন—

أترك سنة حبيبي لأجل هذه الحمقاء -

“এ সমস্ত আহমক লোকদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমি কি আমার মাহবুবের স্মরণত ছাড়িয়া দিতে পারি? কখনও নয়। আশেকের চোখে মানুষ ও মাহবুবের বিরুদ্ধাচরণকারী

সমস্ত দুনিয়া আহমক বলিয়া পরিগণিত হয়। বর্তমান যুগে আমাদের মধ্যে রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি সেই এশক ও মহব্বত নাই বলিয়াই আমরা তাঁহার স্মরণের প্রতি আগ্রহহীন হইয়া পড়িয়াছি।

ইমামের সম্মুখে ছোতরা মোক্তাদীদের জন্য যথেষ্ট

নামাযী ব্যক্তির সম্মুখে দিয়া যাতায়াত করা বড় গোনাহ। হাদীছ শরীফে এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কবাণী রহিয়াছে; তাই খোলা জায়গায় নামায পড়িতে হইলে অন্ততঃ এক হাত উচু কোন বস্তু আড়াল স্বরূপ সম্মুখে রাখা আবশ্যক, যেন যাতায়াতকারীদের অনুবিধার সৃষ্টি না হয়; উহাকেই ছোতরা বলা হয়। ছোতরার বাহির দিয়া গমন করিলে গোনাহ নাই।

৩১০। হাদীছ :— আবহুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায় হজ্জের সময় রসুলুল্লাহ (দঃ) মিনার মধ্যে (খোলা জায়গায় জামাতের সহিত দাঁড়াইয়া) নামায পড়িতেছিলেন; তাঁহার সম্মুখে কোন দেওয়াল ছিল না, (কোন বস্তু দাঁড় করা ছিল।) ঐ সময় আমি একটি গাধীর উপর আরোহিত তথায় উপস্থিত হইলাম। আমি প্রথম কাতারের সম্মুখ দিয়া কিছু অংশ অতিক্রম করতঃ গাধী হইতে অবতরণ করিয়া গাধীকে ঘাস খাইতে ছাড়িয়া দিলাম এবং আমি হযরতের পেছনে লোকদের সহিত নামাযে শরীক হইলাম। আমি তখন বয়ঃপ্রাপ্তির কাছাকাছি; কিন্তু উক্ত কার্যে আমাকে কেহ মন্দ বলেন নাই।

ব্যাখ্যা :—আবহুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বৃদ্ধমান হওয়ার বয়সে নামাযীদের সম্মুখে দিয়া চলিয়াছেন; বস্তুতঃ ইহা বাধা প্রদানের ও মন্দ বলার কাজ ছিল। কিন্তু রসুলুল্লাহ (দঃ) ইমাম ছিলেন, তাঁহার সম্মুখে কোন ছোতরা ছিল; খোলা জায়গায় নামায পড়িতে ইমামের সম্মুখে ছোতরা থাকিলে মোক্তাদীদের পক্ষেও উহা ছোতরা গণ্য হয়, তাই আবহুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে কেহ মন্দ বলেন নাই।

৩১১। হাদীছ :— ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঈদের দিন ময়দানে আসিয়া, ছোট বর্ষার জায় এক প্রকার অস্ত্র (ছিল; উহাকে) সম্মুখে গাড়িয়া দিতে আদেশ করিতেন। তিনি উহাকে সম্মুখে রাখিয়া নামায পড়িতেন এবং সকলে তাঁহার পিছনে শরীক হইত। তিনি ভ্রমণ অবস্থায়ও নামাযের সময় ঐরূপ করিতেন।

ছোতরা কতটুকু ব্যবধান রাখিবে?

৩১২। হাদীছ :—হাফস ইবনে ছায়াদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামায-স্থান ও মসজিদের কেবলা-দিকের দেওয়ালের মধ্যে এতটুকু ব্যবধান থাকিত যে, মধ্য দিয়া একটি বকরি যাতায়াত করিতে পারে।

ব্যাখ্যাঃ—নামায-স্থানে অর্থ সেজদার স্থান। ছোতরা এত নিকটেও রাখিবে না যে, সেজদার সময় মাথার লাগে; এত দূরেও রাখিবে না যে, পথ সঙ্গীর্ণ হয়।

৩১৩। হাদীছঃ—সালামাহ ইবনে আকওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে মিন্বর এবং সম্মুখস্থ দেয়াল—উভয়ের মধ্যে এতটুকু ফাঁক ছিল যে, উহাতে একটি বকরি পথ অতিক্রম করিতে পারে।

ব্যাখ্যাঃ—রহুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মিন্বর কাঠের তৈরী ছিল। হযরতের মসজিদে মেহরাব বা সোলতানখান ছিল না। হযরতের ডান পার্শ্বে তাহার নামাযের পদদ্বয়ের স্থান বরাবরে মিন্বর স্থাপিত ছিল এবং হযরত (দঃ) নামাযে দাঁড়াইতে এমন স্থানে দাঁড়াইতেন যে, স্বীয় অঙ্গসমূহের স্বাভাবিক প্রশস্ততার সহিত সেজদা করায় দেয়াল যেন মাথায় না লাগে—একটু ব্যবধানে থাকে। সুতরাং উক্ত মিন্বর ও সম্মুখস্থ দেয়ালের মধ্যে যে ফাঁক ও ব্যবধান ছিল—সেই ফাঁকেরই পরিমাণ আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। এতটুকু ফাঁকই হযরতের সেজদার স্থান এবং দেয়ালের মধ্যেও থাকিত। সেজদার স্থান ও ছোতরার মধ্যেও সাধারণতঃ এই পরিমাণ ফাঁকই থাকা চাই।

মসজিদের খুঁটি সম্মুখীন হইয়া নামায পড়া

ওমর ফারুক (রাঃ) বলিয়াছেন—“যে ব্যক্তি নামায পড়িতে ইচ্ছা করিবে সে ব্যক্তি মসজিদের খুঁটি ও থাম সমূহের বরাবর স্থানের অধিকারী। যাহারা নামাযরত নর তাহাদের উচিত এই স্থান হইতে সরিয়া পড়া, যেন নামাযী ব্যক্তি এই স্থানে নামায আরম্ভ করিতে পারে। নামাযীদের জন্য ছোতরা আবশ্যক, মসজিদের খুঁটি ও থাম উহার জন্য যথেষ্ট।

ছাহাবী ইবনে ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখিলেন, সে দুই খুঁটির মধ্যস্থলে নামায আরম্ভ করিতেছে, তিনি তাহাকে খুঁটি-সম্মুখে আনিয়া বলেন, এখানে নামায পড়া।

৩১৪। হাদীছঃ—ইয়াসিদ ইবনে ওবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ছাহাবী সালামাহ ইবনে আকওয়ার সঙ্গে মসজিদে আসিতাম। তাহাকে দেখিতাম, তিনি এই থামের নিকট নামায পড়েন, যে থামের নিকট (হযরতের পরে) সিল্লুকে কোরআন শরীফ রক্ষিত ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি বিশেষভাবে এই থামের নিকটবর্তী নামায পড়েন কেন। তিনি বলিলেন, রহুল্লাহ (দঃ)কে এই থামের নিকট নামায পাড়তে দেখিয়াছি।

আরোহণের পশু বা ব্রহ্ম ইত্যাদি সম্মুখী নামায পড়া

যদি গাড়িবার কোন বস্তু না থাকে তবে যানবাহন বা এক হাত উঁচু কোন বস্তু সম্মুখে রাখিয়া কিম্বা বৃক্ষের সম্মুখী দাঁড়াইয়া নামায পড়িবে, উহাই ছোতরা হইবে।

৩১৫। হাদীছঃ—ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) স্বীয় আরোহণের উষ্টকে সম্মুখে রাখিয়া উহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেন। যদি উষ্ট উপস্থিত না

থাকিত, কোথাও চলিয়া যাইত, তবে উহার উপর বসিবার গদিকে সম্মুখে রাখিয়া উহার দিকে নামায পড়িতেন। (গদির সঙ্গে পিছন দিকে এক বা সোয়া হাত উচু একটি খুঁটি থাকে।)

খাট, চৌকি ইত্যাদি সম্মুখী নামায পড়া

৩১৬। হাদীছ :—(এক হাদীছে আছে—“ত্রীলোক, কুকুর ও গাধা এর কোন একটি নামাযের সম্মুখ দিয়া গমন করিলে নামায নষ্ট হয়।”^৬ এই হাদীছ দৃষ্টে এরূপ মত পোষণ করা হইত যে, উক্ত কারণে নামায ফাছেদ হইবে। এই মতবাদের লোকদের প্রতি তিরস্কার করিয়া) উম্মুল-মোমেনীন আয়েশা (রা:) বলিয়াছেন—তামরা আমাদের (নারী সম্প্রদায়কে) কুকুর ও গাধার সমতুল্য বানাইয়াছ। অথচ অনেক সময় এরূপ হইত যে, আমি খাটের উপর শুইয়া থাকিতাম; নবী ছালাম্মাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ খাটের মধ্যস্থল বরাবর মাটিতে দাঁড়াইয়া নামায আরম্ভ করিতেন। এমতাবস্থায় আমার কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইত এবং আমি ওখান হইতে সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিতাম; নামায অবস্থায় রসূলুল্লাহ ছালাম্মাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে বিব্রত করা ভাল মনে করিতাম না বিধায় আমি শোয়া অবস্থায়ই পায়ের দিকের পথে সরিয়া পড়িতাম।×

নামাযী ব্যক্তির সম্মুখ দিয়া গমনে বাধা দিবে

ইবনে ওমর (রা:) নামাযের শেষ অবস্থায় যখন আস্তাহিয়াত পড়িতে বসিতেন, তখনও যদি কেহ তাঁহার সম্মুখ দিয়া যাইতে উদ্ভত হইত তাহাকে বাধা দান করিতেন এবং

৬ অধিকাংশ ইমামগণের মতে এক্ষেত্রে নামায নষ্ট হওয়ার অর্থ নামায বাতিল হওয়া নহে, বরং নামাযে একাগ্রতা বিনষ্ট হওয়া উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এই বস্তুত্রয়ের কোন একটি নামায অবস্থায় সম্মুখ দিয়া গেলে নামাযের একাগ্রতা ব্যাহত হয়। কারণ, নারীর ব্যাপারে পুরুষের মধ্যে সাধারণতঃ মানবীয় দুর্বলতা স্বাভাবিক ভাবেই রহিয়াছে; সম্মুখ দিয়া নারীর গমন হইলে পুরুষের উপর চকলতার প্রতিক্রিয়া হয়; আর হাদীছ দৃষ্টে দেখা যায়, গাধা ও কুকুরের সহিত শয়তানের বিশেষ সংশ্লব আছে, অতএব সম্মুখ দিয়া উহার গমনে বিচলতার আদিক্য হইবে। সুতরাং নামায আরম্ভ করিতে এই বস্তুত্রয়ের গমন আশঙ্কা এড়াইবার ব্যবস্থায় বিশেষ তৎপর হইবে।

বিবি আয়েশার ঘটনা হযরতের ব্যক্তিগত ঘটনা; নামাযে হযরতের স্পৃহ এতাদৃশতার সহিত অন্তের তুলনা হইতে পারে না; এতদসত্ত্বেও আয়েশা (রা:) অতি প্রয়োজন ক্ষেত্রেও যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করিতেন যে, শোয়া অবস্থায় সম্মুখ হইতে এমন ভাবে সরিয়া পড়িতেন যাহাতে পূর্ণ পরিদৃষ্ট না হন এবং হযরতের একাগ্রতায় ব্যাঘাত ঘটায় হযরত বিব্রত না হন। অবশ্য যদি নারীদের অতিক্রমে মূল নামাযই বাতিল সাব্যস্ত হইত তবে নিশ্চয় বিবি আয়েশা এরূপও করিতেন না এবং হযরত (দ:) বিবি আয়েশার এরূপ ভাবে সরিয়া পড়াকেও নিষিদ্ধ বলিতেন।

× নামাযীর সম্মুখ অতিক্রম করা গোনাহ ও নিষিদ্ধ; সম্মুখ হইতে সরিয়া যাওয়া এরূপ গোনাহ নহে। অবশ্য ইহাকেও সতর্কতামূলক মকরুহ বলা হয়।

কাঁবা ঘরের ভিতরেও যদি কেহ একরূপ করিতে উদ্যত হইত তাহাকে বাধা দিতেন।* তিনি ইহাও বলিতেন যে, যদি সাধারণ বাধায় বিরত না থাকে, তবে সজোরে আঘাত করিবে।

৩১৭। হাদীছ :— আবু সায়ীদ (রাঃ) জুমার দিন মসজিদের খাম ইত্যাদি কোন একটি বস্তুর বরাবর দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছিলেন; হঠাৎ এক যুবক উহার ভিতর দিয়া তাহার সম্মুখ কাটিয়া যাইতে উদ্যত হইলে তিনি তাহার বুকের উপর ধাক্কা দিলেন। সে এদিক ওদিক তাকাইয়া কোন স্রোযোগ না দেখিয়া পুনরায় একরূপ করিলে তিনি আরও জোরে ধাক্কা দিলেন। যুবক ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রতি কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ করিল এবং পরে শাসনকর্তা মারওয়ানের নিকট নালিশ দায়ের করিল; এমন সময় আবু সায়ীদ (রাঃ) সেখানে পৌঁছিলেন। মারওয়ান তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আপনাই এক মোসলমান ভাই-এর ছেলেকে কি দোষে একরূপ করিয়াছেন? আবু সায়ীদ (রাঃ) এক হাদীছ বর্ণনা করিলেন যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যখন তোমাদের কেহ ছোত্রা সম্মুখীন নামায পড়ে তখন যদি কোন ব্যক্তি উহার ভিতর দিয়া সম্মুখ কাটিয়া যাইতে উদ্যত হয় তবে তাহাকে বাধা দিবে। বাধা না মানিলে তাহার প্রতিরোধে লড়াই অর্থাৎ কঠোর ব্যবস্থা প্রয়োগ করিবে; সে নিশ্চয়ই শয়তান।

ব্যাখ্যা :— এই হাদীছের অর্থ এই নয় যে, উভয়ে মারামারি আরম্ভ করিয়া দিবে এবং ইহাতে নামায ফাছেদ হইবে না। এখানে উদ্দেশ্য এই যে, একরূপ কার্য্য অত্যন্ত দুষণীয় এবং ঐ ব্যক্তি কঠোর শাস্তির উপযুক্ত। তবে বাধাদানের নিয়ম এই যে, শুধু এক হাত দ্বারা তাহার বুকে ধাক্কা দিয়া তাহাকে সতর্ক করিবে, পুনরায় আবশ্যক হইলে জোরে ধাক্কা দিবে, এর চেয়ে বেশী কিছু করিতে যাইয়া ছই হাত ব্যাহার করিলে বা অধিক নড়াচড়া করিলে বা কেবলা দিক ব্যতিক্রম হইলে নামায ফাছেদ হইয়া যাইবে।

নামাযী ব্যক্তির সম্মুখ দিগ্না গমন করা বড় গোনাহ

৩১৮। হাদীছ :— আবু জোহায়ম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—নামাযরত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়া যাতায়াতকারী যদি উপস্থিতি করিতে পারিত যে, একরূপ করা কত বড় গোনাহ; তবে চল্লিশ (দিন বা মাস বা বৎসর) দাঁড়াইয়া থাকিতে হইলেও সে নামাযের সম্মুখ কাটিয়া কখনও যাইত না।

ছোট শিশুকে কাঁধে লইয়া নামায পড়া

৩১৯। হাদীছ :— আবু কাতাদাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় দৌহিত্রী (জয়নবের মেয়েকে) কাঁধে লইয়া নামায পড়িতেন। সেজদার সময় তাহাকে নামাইয়া রাখিতেন এবং দাঁড়াইবার সময় পুনঃ উঠাইয়া লইতেন।

ব্যাখ্যা :- এই সমস্ত নড়াচড়া ইত্যাদি যদি শুধু এক হাতের সাহায্যে সামান্য ক্রিয়া দ্বারা সম্পন্ন করা হয় তবে ইহাতে নামায ফাছেদ হইবে না। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাই করিতেন, নতুবা নামায ফাছেদ হইয়া যাইবে। আর একটি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) নামাযের মধ্যে তাঁহার মন ও ধ্যানকে এত দৃঢ়তার সহিত মগ্ন রাখিতেন যে, কোন বিষয়ই তাঁহার মন ও ধ্যানকে এদিক ওদিক খাণ্ডিত করিতে পারিত না। সেরূপ অবস্থার অধিকারী না হইয়া শুধু এতটুকু দেখিলে চলিবে না যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) নামাযের মধ্যে একরূপ ঝামেলার সংশয় রাখিয়াছেন। সর্বসাধারণের জন্য বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে একরূপ করা মকরুহ সাব্যস্ত করা হইয়াছে। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য রাখিবে যে, শিশুর শরীর বা কাপড় যেন তাহার মল-মূত্র ইত্যাদির দ্বারা দূষিত না হয়, নতুবা নামায ফাছেদ হইয়া যাইবে।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● শুধু লুঙ্গি পরিধান করিয়া শরীর আবৃত করার অল্প কোন কাপড় ব্যবহার ব্যতিরেকেই নামায শুদ্ধ হইবে (৫৩ পৃঃ)। ● নামায অবস্থায় স্বীয় কাপড় জীকে স্পর্শ করিলে নামাযের ক্ষতি হইবে না (৫৫ পৃঃ ১২৬ হাঃ)। ● অমোসলেমরা যে সব বস্তুর পূজা করিয়া থাকে, যেমন—আগুন; অগ্নিপূজক কাকেররা উহার পূজা করে। কিম্বা অমোসলেমরা কোন বিশেষ বস্তুকে পূজনীয় বানাইয়া নিরাছে; যেমন—কোন বৃক্ষ ইত্যাদি—এইরূপ কোন বস্তু নামাযী ব্যক্তির সম্মুখে আছে; সে ক্ষেত্রে নামাযী ব্যক্তির ধ্যান-ধারণা ও নিয়্যাত পূর্ণ একাগ্রতার সহিত একমাত্র আল্লাহ তায়ালার প্রতি নিবদ্ধ থাকিলে তাহার নামায শুদ্ধ হইয়া যাইবে, কিন্তু ঐরূপ বস্তু প্রকাশভাবে সম্মুখে রাখিয়া নামায পড়া নিষিদ্ধ। অবশ্য আকৃতিবিশিষ্ট নয় এমন বস্তু—যেমন, পূজনীয় বট-বৃক্ষ বা অগ্নি ইত্যাদি সম্মুখে থাকিলে (অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণী পধ্যায়ের) মকরুহ সাব্যস্ত হইবে। এমনকি বাতি-প্রদীপ, তন্দুর-চুলা ইত্যাদি কেবলা স্থলে রাখিয়া সোজামুজ্জি তদযুযী হইয়া নামায পড়াকেও মকরুহ বলা হইয়াছে। কিন্তু ঐরূপ কোন বস্তু সম্মুখে অপ্রকাশ থাকিলে দুষণীয় হইবে না (৬১ পৃঃ)। আর আকৃতিবিশিষ্ট মূর্তি ইত্যাদি সম্মুখে থাকিলে সেস্থলে নামায পড়া হারাম হইবে। ● গির্জা ইত্যাদি ইহুদ নাছারাদের এবাদৎ-খানায় নামায পড়াকে সাধারণভাবে মকরুহ বলা হইয়াছে এবং মকরুহ তাহরীমী সাব্যস্ত করা হইয়াছে। অবশ্য গির্জার মধ্যে কোন ছবি বা মূর্তি, যেমন—বিবি মরয়ামের বা ঈসা আলাইহেছালামেরও মূর্তি বা ছবি থাকিলে সেখানে নামায পড়া, বরং সাধারণভাবে প্রবেশ করাও নিষিদ্ধ।

খলীফা ওমর (রাঃ) একবার সিরিয়া পরিদর্শনে আসিলে তথাকার এক বিশিষ্ট নাছারানী খঠান তাঁহার জন্য (গির্জা ঘরে) ভোজ-সভা অহুষ্ঠানের ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তিনি

বলিলেন, তোমাদের গির্জা সমূহে (পীর-পরগাশ্বরগণের) বিভিন্ন ছবি থাকে; ছবি থাকার কারণে আমি তথায় যাইব না।

ইবনে আব্বাস (রা:) প্রয়োজনে গির্জায় নামায পড়িতেন, কিন্তু ছবি থাকিলে তথায় নামায পড়িতেন না—বৃষ্টি হইলেও বাহিরে নামায পড়িতেন (৬২ পৃ: ২৮৯ হা:)।

হিন্দুদের পূজার দর ভিন্ন জিনিষ; উহা ত এবাদতখানা মোটেই নহে, বরং উহা ত প্রকাশ্য শেরেক ও মূর্তি পূজার ঘর। তথায় কোন অবস্থায়ই নামায পড়িবে না।

● মসজিদের মধ্যেও ছনিয়াদারীর কথাবার্তা ত নিষিদ্ধ, কিন্তু কোন ছনিয়াদারী বিষয় সম্পর্কে শরীয়তে মছালাহ বর্ণনা করা এবং সেই উপলক্ষে উহার আলোচনা করা দৃশ্যীয় নহে। হযরত রহমুল্লাহ (দ:) তাহার মসজিদের মিম্বরে বসিয়া ক্রয়-বিক্রয়ের মছালাহ বর্ণনা করিয়াছেন। অপর এক ঘটনায় হযরত (দ:) মদের ব্যবস্থা হারাম হওয়ার মছালাহ মসজিদের মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন (৬০ পৃ:)।

● কোন পণ্ডকে মসজিদে প্রবেশ করান নিষিদ্ধ; অবশ্য যদি বিশেষ প্রয়োজন হয় তবে প্রবেশ করাইতে পারিবে, কিন্তু উহার মল-মূত্রে মসজিদ অপবিত্র না হয় উহার সর্ব-প্রকার ব্যবস্থা সম্পন্ন রাখিবে (৬৬ পৃ:)। ● অমোসলেমকে মসজিদে প্রবেশ করিতে দেওয়া ইমাম মালেক রহমতুল্লাহে আলাইহেহর মজহাবে নিষিদ্ধ। হানফী মজহাব মতে শুধু মোসলমান না হওয়ার কারণে মসজিদে প্রবেশ করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ নহে (৬৭ পৃ:)। কিন্তু মসজিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ার বিভিন্ন কারণ অমোসলেমের মধ্যে সাধারণত: বিদ্যমান থাকে; যেমন, অপবিত্র শরীর বা কাপড় বহনকারীর মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ। অমোসলেমরা জানাবাতের গোসলে শরীয়ত সম্মতরূপে মোটেই তৎপর নহে, পাখানা-প্রস্রাবে সৌচকার্য সম্পর্কেও তাহাদের যে রীতি তাহাদের শরীর ও কাপড় অপবিত্র থাকেই। এই দৃষ্টিতেই ফংওয়ার মধ্যে মসজিদে অমোসলেমদের প্রবেশ নিষিদ্ধ দেখা যায় (এমদাহুল ফংওয়া ২য় খণ্ড)। ● মসজিদের মধ্যে গোলাকারে একত্রিত হইয়া বসা—ইহা যদি দ্বীনের শিক্ষা এবং ওয়াজ-নছিহত শুনিবার জন্ত হয় এবং সাধারণ নামাযীদের চলাচলে ব্যাধাত না ঘটায় তবে জায়েয; অন্যথায় জায়েয নহে (৬৮ পৃ:)।

● জন-সাধারণের চলাচলের পথে মসজিদ তৈরী করা? অর্থাৎ চলাচলের সাধারণ যাহা কাহারও ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্ত নহে, এইরূপ পথ যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রশস্ত হয় তবে জনগণের চলাচল ব্যাধাত না ঘটাইয়া ঐ পথের কিছু অংশে মসজিদ তৈরী করা জায়েয (ঐ)

বিশেষ দৃষ্টব্য:— কাহারও ব্যক্তিগত স্বমালিকানে নয় এবং সরকার কর্তৃক জনগণের প্রয়োজনে সংরক্ষিত এলাকাও নয় এইরূপ জায়গায় জনগণের প্রয়োজনে মসজিদ তৈরী করা জায়েয আছে এবং সেই মসজিদ বৈধ মসজিদ গণ্য হইবে। অবশ্য এইরূপ স্থানে

মসজিদ তৈরী করিতে যদি কোন ক্ষেত্রে জনগণের মতবিরোধ দেখা যায় তবে সে ক্ষেত্রে সরকারের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে (ফতহুল-বারী ১—৪৪৮, ফয়জুল বারী ৩—৭১ দ্রষ্টব্য)।

● বাজার শরীয়তের দৃষ্টিতে নিকৃষ্টতম স্থান, কিন্তু বাজারের কোন স্থানে বা বাজারে নামাযের জন্য নির্ধারিত স্থানে নামায পড়িলে নামায শুদ্ধ হইবে। তদ্রূপ মসজিদে নামায পড়া আবশ্যক, কিন্তু নিজ গৃহে নামায পড়িলে শুদ্ধ হইবে (৬৯ পৃঃ)।

মসজিদ ভিন্ন অন্য স্থানে জমাতে নামায পড়িলে জমাতের ছওয়াব হানিল হইবে, কিন্তু মসজিদের ফজিলত ও ছওয়াব হইতে বঞ্চিত থাকিবে। (ফয়জুল-বারী ২—৭১)

● সম্মুখ দিয়া লোক যাতায়াতের প্রয়োজন বা সম্ভাবনা রহিয়াছে এরূপ স্থানে নামায পড়িলে সেজদাহুলের সংলগ্নে কোন বস্তু দাঁড় করিয়া বা উঁচু বস্তু রাখিয়া নামাযে দাঁড়াইতে হয়—সেইরূপ বস্তুকে ছোতরা বলা হয়। ছোতরা অস্তিত্ব: এক হাত উঁচু যে কোন বস্তুই হইতে পারে, যেমন লাঠি বা বর্শা—যদি উহাকে গাড়িয়া লওয়া হয় (৭১ পৃঃ)।

● সব জায়গায়ই ছোতরা প্রয়োজন। নামাযী ব্যক্তির সম্মুখে ছোতরা না থাকিলে তাহার সম্মুখ দিয়া যাইবে না (৭২ পৃঃ)।

● মসজিদের খুঁটি বা থাম সমূহের মধ্যস্থলে একাকী নামায পড়া জায়েয, কিন্তু অন্য মুছল্লিদের চলাচলে বিঘ্নের কারণ না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখিবে।

জমাতের সময় খুঁটি বা থাম সমূহের মধ্যস্থলে এইভাবে কাতার বানান যে, খুঁটি ও থাম কাতার কর্তনকারী হয় তাহা দৃশ্যীয়, যদি বিশেষ প্রয়োজন না হয়। আর যদি জায়গার অভাবে এরূপ কাতার বাঁধার প্রয়োজন বোধ হয় তবে দৃশ্যীয় নহে (৭২)।

● কাহারও মুখামুখী হইয়া নামায পড়া মকরুহ তাহরিমী। যদি নামাযী ব্যক্তিই কাহারও মুখামুখী নামাযে দাঁড়ায় তবে উহার গোনাহ নামাযী ব্যক্তির হইবে, আর নামায আরম্ভ করার পর কেহ তাঁহার মুখামুখী হইলে গোনাহ সেই ব্যক্তির হইবে (শামী ১—৬০২)।

ইমাম বোখারী (র:) উল্লেখ করিয়াছেন যে, মুখামুখী হওয়ার দরুন যদি নামাযী ব্যক্তি নিব্রত হয় তবে উহা মকরুহ হইবে, অতথায় নহে (৭৩ পৃঃ)। কিন্তু ফেকাবিদগণ সর্বাবস্থায়ই উহাকে মকরুহ তাহরিমী বলিয়াছেন।

● ঘুমন্ত ব্যক্তিকে সম্মুখে রাখিয়া নামায পড়া জায়েয আছে (৭৩ পৃঃ ২৫৭ হাদীছ)।

● নামাযের সময় সম্মুখে কোন মেয়েলোক ঋতুবতি থাকিলেও নামায নষ্ট হইবে না (৬৩ পৃঃ ২৫৬ হাঃ)।

● নামাযের সম্মুখ দিয়া যে কোন বস্তুর (কুকুর, গাধা বা কোন মেয়েলোকের) গমনে নামায নষ্ট হইবে না (৭৩ পৃঃ ৩১৭ হাদীছ) অবশ্য সেইরূপ সম্ভাবনার স্থলে সতর্কতা অবলম্বন না করার এরূপ ঘটিলে মকরুহ গণ্য হইবে।

● নামায অবস্থায় স্ত্রী বা কোন মহরম নারীর স্পর্শনে নামাযের ক্ষতি হইবে না (৭৪ পৃঃ)।

নামাযের ওয়াস্তে নির্দ্ধারণ

আল্লাহ তায়াল্লা করমাইয়াছেন—

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا -

“নির্দ্ধারিত সময়ে নামায পড়াকে মোমেনদের উপর করজ করা হইয়াছে।

অর্থাৎ নামায যে কোন সময় পড়িয়া লইলেই করজ আদায় হইবে না, বরং নামাযের জন্ত যে সময় নির্দ্ধারিত আছে সেই সময় মত নামায আদায় করিতে হইবে। (৫ পাঃ ১২ কঃ)

৩২০। হাদীছ :—ওমর ইবনে আবহুল আজিছ (রঃ) যখন বাদশাহ অলীদ ইবনে আবহুল মালেকের পক্ষ হইতে মদীনার শাসনকর্তা তখন) একদা (তিনি) আছরের নামায আদায় করিতে বিলম্ব করিয়া কেলিলেন। তৎক্ষণাৎ ওরাওয়াহ্ ইবনে জোবায়ের (রঃ) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মুগিরা ইবনে শো'বা (রাঃ) ইরাকের শাসনকর্তা থাকাকালীন একরূপ একদিন নামায পড়িতে বিলম্ব করিলে ছাহাবী আবু মসউদ আনছারী (রাঃ) তাঁহার প্রতি অভিযোগ করিলেন এবং রাগান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুগিরা! এ কি ব্যাপার? আপনি জ্ঞাত নহেন যে, (নামাযের নির্দ্ধারিত সময় অবহেলার বস্ত্র নয়, উহা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলিয়াই উহার জন্ত আল্লাহ তায়াল্লা বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সময় নির্দ্ধারণ শুধু বর্ণনার দ্বারাও হইতে পারিত, কিন্তু) আল্লাহ তায়াল্লা (তাহা না করিয়া উহার জন্ত এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে প্রত্যেকটি নামাযের সময় নির্দ্ধারিত করিয়া কার্যতঃ দেখাইয়া দিবার জন্ত) স্বয়ং জিব্রীল ফেরেশতাকে পাঠাইলেন। তিনি প্রত্যেক নামায উহার ওয়াস্ত মত পড়িলেন এবং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)ও তাঁহার সঙ্গে নামায পড়িলেন। অতঃপর জিব্রীল (আঃ) রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিলেন—আপনার প্রতি আল্লার আদেশ এই যে, আপনি এই নির্দ্ধারিত সময় সমূহে নামায আদায় করিবেন।

ওমর ইবনে আবহুল আজিছ (রঃ) এই বয়ান শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন, হে ওরাওয়াহ্! চিন্তা করিয়া কথা বলুন। স্বয়ং জিব্রীল (আঃ) রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া নামাযের সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন কি? ওরাওয়াহ্ (রঃ) বলিলেন—হাঁ, নিশ্চয়। এই ঘটনা বর্ণনাকারী আবু মসউদ (রাঃ) ছাহাবীর ছেলে বশীর তাঁহার পিতা হইতে এই ঘটনা আমাকে শুনাইয়াছেন; (ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।)

অতঃপর ওরাওয় (রঃ) আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আরও একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যাহাতে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) আছর নামায একরূপ বিলম্বে পড়িতেন

না যেরূপ বিলম্বে ওমর ইবনে আবদুল আজিজ এই দিন পড়িয়াছিলেন। উক্ত হাদীছটির অনুবাদ ৩৩২ নম্বরে আসিবে।

ব্যাখ্যা :—অন্যত্র হাদীছে বিস্তারিত বিবরণ আসিয়াছে যে, মে'রাজের রাজে রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করা হইল। তিনি মে'রাজ হইতে প্রত্যাহর্জন করার পর দিনের বেলা সূর্য্য আকাশের ঠিক মধ্য রেখা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে জিব্রীল ফেরেশতা হযরতের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কা'বা গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)কে সঙ্গে লইয়া জোহরের নামায পড়িলেন। এইরূপে পর পর আছর, মগরেব, এশা ও ফজর প্রত্যেকটি নামাযের জম্মই জিব্রীল ফেরেশতা অবতরণ করিলেন এবং এই দিন প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযই উহার সময়ের সর্বাংশে আদায় করিলেন। দ্বিতীয় দিন আবার জোহর, আছর, মগরেব, এশা ও ফজর প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযই উহার সর্বশেষ ওয়াক্তে আদায় করিলেন এবং রসুলুল্লাহ (দঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রত্যেকটি নামায এই দুই দিন যে দুই সময় আরম্ভ ও শেষ করা হইল এই সময়দ্বয়ের মধ্যবর্তী সময়কে এই নামাযের জম্ম নির্ধারিত করা হইল। পূর্বের নবীগণের জম্মও এইরূপই করা হইয়াছিল।

নামাযের দ্বারা গোনাহ মাফ হইয়া থাকে

৩২১। হাদীছ :—হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা খলীফা ওমরের নিকট (তাঁহার খেলাফত কালে) বসিয়াছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই সমস্ত বয়ান শ্রবণ রাখিয়াছে কি যাহা তিনি “ফেৎনা” সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন? হোযায়ফা (রাঃ) বলিলেন, আমি। ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমাকে তা এ বিষয়ে বড় সাহসী দেখা যায়; আচ্ছা, বল। হোযায়ফা (রাঃ) বলিলেন, (রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন—) পরিবারবর্গ, ছেলেমেয়ে, পাড়া-পড়শী (তথা পরিবেশ) ও ধন-দৌলত দ্বারা (আকৃষ্ট হইয়া বা এই সব জিনিষের ব্যাপারে শরীয়তের যে নীতি রহিয়াছে ইহাতে) মানুষ যে, ফেৎনার পতিত হয় অর্থাৎ ক্রটি-বিচ্ছাতি করিয়া ফেলে এবং নানারকম গোনাহ করে (যাহা সাধারণতঃ ছগিরা গোনাহ হয়) উহা নামায, রোযা, ছদকা, সংকার্য্যে আকৃষ্ট করন ও অসং কার্য্যে বাধাদান (ইত্যাদি নেক কার্য্যে) সমূহের দ্বারা মাফ হয়।

ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি এই অর্থের ফেৎনার কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, আমার জিজ্ঞাসা এই ফেৎনা তথা বিপর্য্যয় বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে যাহা (কালক্রমে) উৎপলিত সমুদ্রের তরঙ্গমালার স্থায় প্রচণ্ড ও ব্যাপক আকারে একের পর এক ছ ছ করিয়া সমাজে প্রবেশ করিবে এবং সমাজকে ধ্বংস করিবে। হোযায়ফা (রাঃ) বলিলেন—হে আমিরুল-মোমেনীন! সে বিষয় আপনার চিন্তা করিতে হইবে না; এই ফেৎনা আপনাকে স্পর্শও করিতে পারিবে

না। আপনার (সময়কালের) মধ্যে এবং এসব ফেনার মধ্যে লৌহ নিমিত্ত বন্ধ দ্বার প্রতিবন্ধকরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। খলীফা ওমর (রা:) জিজ্ঞাসা করিলেন (মোসলেম সমাজের দুর্ভাগ্যের সময় যখন ঘনাইয়া আসিবে তখন) এই বন্ধ দ্বার খোলা হইবে—না, ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে? হোযায়ফা (রা:) বলিলেন, ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে। ওমর (রা:) বলিলেন, তবে ও উহা বন্ধ করার ব্যবস্থা কেয়ামত পর্যন্ত আর হইবে না।

(হোযায়ফা (রা:) বলেন—) মোসলেম সমাজে ফেনা তথা বিপর্যয় এবং হাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রতিবন্ধক দরওয়াজা স্বয়ং ওমর (রা:) নিজেই ছিলেন—যাহা তিনি নিজেও সন্দেহাতীতরূপে জানিতেন। (তিনি যে এক পারসীক মোনাফেক—ছদ্মবান রাজার বড়বয়ে দৃষ্ট বাতকের হাতে শহীদ হইবেন, তাহাই ব্যক্ত করা হইয়াছিল “দরওয়াজা ভাঙ্গা হইবে” বলিয়া। আর সেই সময় হইতেই ফেনার পত্তন হইল।)

ব্যাখ্যা :— “ফেনা” শব্দের দুইটি অর্থ আছে। প্রথম—ক্রটি-বিচ্ছাতি ও বিপথগামী হওয়া। দ্বিতীয়—বিপর্যয়, হাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলা। হোযায়ফা (রা:) প্রথমে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যে ফরমান বয়ান করিলেন উহাতে ফেনা শব্দ প্রথম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ ছনিয়ার বিভিন্ন ব্যাপারে বা বিভিন্ন মোহ ইত্যাদিতে বেষ্টিত হইয়া খোদাকে ভুলিয়া মানুষ পদে পদে যে অসংখ্য ছোটখাট গোনাহ করিতে থাকে যদিও উহার এক একটি ছোট ছোট হয়, কিন্তু উহা এত অগণিত পরিমাণে অন্তর্ভুক্ত হইতে থাকে যে, আপাদ-মস্তক গোটা মানুষটি তাহাতে ডুবিয়া জাহান্নামী হইবার সম্ভব যথেষ্ট হয় এবং একরূপ হইলে অতি নগণ্য সংখ্যক মানবই জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাইতে পারিবে। তাই মানবের প্রতি আল্লাহ তায়ালা মেহেরবান হইয়া আশা দিয়াছেন যে, সতর্ক থাকিয়া যথাসাধ্য সচেতন হওয়া সত্ত্বেও উল্লিখিত রকমের যত ছোটখাট ক্রটি-বিচ্ছাতি হইবে, উহা নেক আমল যথা—নামাজ, রোযা ইত্যাদির দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে মাক হইতে থাকিবে।

হোযায়ফা (রা:) “ফেনা” শব্দের যে অর্থে হাদীছ শুনাইলেন সেই অর্থের ফেনার হাদীছ খলীফা ওমরের জিজ্ঞাস্য ছিল না, বরং তিনি এই শব্দের দ্বিতীয় অর্থের হাদীছ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরে কালক্রমে মোসলেম সমাজে নানা কারণে যে বিপর্যয় এবং বিশৃঙ্খলা ও হাঙ্গামা আরম্ভ হইবে, এমনকি পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ, মারামারি, কাটাকাটি তুফান আকার ধারণ করিবে উহার বিষয় খলীফা ওমর অবগত হইতে ইচ্ছুক ছিলেন। এ সমস্ত বিষয় রসুলুল্লাহ (দ:) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন, এমনকি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের নাম ও পরিচয় সহ তাহাদের আত্মপ্রকাশের সময় ও স্থান নির্দিষ্ট করিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। অনেক হাদীছ একরূপ তথ্য কিছু কিছু বর্ণিত আছে। যথা—

হাদীছ—আবু বকরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় অচিরেই বিপর্যায়-বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। সতর্ক থাকিও—তারপর আরও অধিক বিপর্যায়-বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে; উহাতে বসা ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি হইতে উত্তম, যে হাঁটিয়া চলিবে সে ধাবমান হইতে উত্তম। (অর্থাৎ সেই বিপর্যায়-বিশৃঙ্খলা হইতে যে যতটুকু সংযত ও বিরাগী হইবে সে ততটুকুই উত্তম গণ্য হইবে।) সেই বিপর্যায়-বিশৃঙ্খলা যখন আরম্ভ হইবে তখন যাহার উট আছে সে নিজের উট লইয়া, যাহার বকরী আছে, সে বকরী লইয়া এবং যাহার জায়গা আছে সে উহা লইয়া লিপ্ত থাকাই তাহার কর্তব্য হইবে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, যাহার ঐ সব কিছুই নাই? হযরত (দঃ) বলিলেন, সে পাথর দ্বারা স্বীয় তরবারির ধার ভাঙ্গিয়া দিবে এবং সুযোগ থাকিলে দ্রুত ছুটিয়া পলাইবে। এই পর্যায়ে হযরত নবী (দঃ) হুইবার আল্লাহকে সাক্ষী করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ! আমি আমার কথা পৌছাইয়া দিলাম। এই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, যদি আমি কোন দলের বল প্রয়োগে বাধ্য হই সেই দলে शामिल হইতে এবং কাহারও তরবারি বা তীরের আঘাতে আগার মৃত্যু হয়? হযরত (দঃ) বলিলেন, সে ক্ষেত্রে হত্যাকারী (কেয়ামতের দিন) যে ভাবে নিজের গোনাহের বোঝা উঠাইবে তদ্রূপ তোমার গোনাহের বোঝাও তাহার উপর পতিত হইবে এবং সে দোষেই থাকিবে। (মোসলেম)

হাদীছ—আবু হোরাযরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন অচিরেই বিভিন্ন রকম বিপর্যায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে; উহাতে শোয়া ব্যক্তি বসা ব্যক্তি হইতে, বসা ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তি হইতে, দণ্ডায়মান চলমান হইতে, চলমান ব্যক্তি ধাবমান হইতে উত্তম গণ্য হইবে। সেই বিপর্যায়-বিশৃঙ্খলার প্রতি যে কেহ তাকাইয়া দেখিবে তাহাকেই উহা জড়াইয়া লইবে, অতএব উহা হইতে দূরে থাকিবার আশ্রয়স্থল পাইলে আশ্রয় নিবে। (ঐ)

হাদীছ—আবু হোরাযরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, সুযোগ থাকিতে নেক আমল করিতে বস্তুমান হও বিপর্যায়-বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার পূর্বে—যাহা অমাবস্তা রাত্রির অন্ধকারের স্তর পুঞ্জীভূত হইয়া আসিবে। উহাতে সকাল বেলায় মোমেন ব্যক্তি বিকাল বেলায় কাকের হইয়া যাইবে, বিকাল বেলায় মোমেন ব্যক্তি সকাল বেলায় কাকের হইয়া যাইবে—সে হুনিয়ার লোভে নিজের স্বীকৃতি বিক্রয় করিবে।

(মোসলেম—মেশকাত শরীফ)

হাদীছ—আবু হোরাযরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, হুনিয়া শেষ হইবে না—এইরূপ যুগ না আস পর্য্যন্ত যখন হত্যাকারী নিজেও জানিবে না, কেন সে হত্যা করিল, নিহত ব্যক্তিও জানিবে না কেন তাহাকে হত্যা করা হইল। জিজ্ঞাসা করা হইল, ইহা কিরূপে হইবে? হযরত (দঃ) বলিলেন, অত্যধিক রক্তাক্তির কারণে। (তখন অনেক ক্ষেত্রে ঝগড়া-বিবাদ করায় উভয়ই বাতেলের উপর হইবে, ফলে) হত্যাকারী ও নিহত উভয়ই দোষী হইবে।

হাদীছ—আবু হোরায়ারা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন, অচিরেই একরূপ বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইবে বাহা সম্পূর্ণ বধির, বোবা ও অন্ধ হইবে। যে কেহ উহার প্রতি তাকাইবে তাহাকেই উহা জড়াইয়া ধরিবে; উহাতে মুখের অংশগ্রহণ ভয়বানির অংশগ্রহণের ন্যায়ই গণ্য হইবে। (আবু দাউদ—মেশকাত)

পাঠকবৃন্দ। মোসলেম সমাজে বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলার আগমনের আরও অনেক ভবিষ্যদ্বাণীর হাদীছ রসুলুল্লাহ (দ:) হইতে বর্ণিত আছে—সপ্তম খণ্ড “ফেংনা-ফছাদ বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা” পরিচ্ছেদে একরূপ বহু হাদীছের সমুদায় রহিয়াছে। সেই বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী দল ও দলপতিদের পরিচয় হযরত (দ:) বয়ান করিয়া গিয়াছেন। হাদীছে উহারও প্রমাণ আছে। যথা—

হাদীছ—আবু হোরায়ারা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী যত দলপতি হুনিয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত হইবে—বাহার দলে মাত্র তিনশত বা কিছু বেশী লোকও হইবে একরূপ একজন দলপতিকেও রসুলুল্লাহ (দ:) বাদ দেন নাই; একরূপ প্রত্যেক জনের নাম, তাহার পিতার নাম এবং তাহার গোত্রের নামও রসুলুল্লাহ (দ:) বয়ান করিয়া গিয়াছেন। (আবু দাউদ—মেশকাত শরীফ)

উল্লিখিত বয়ান-বর্ণনা বিক্ষিপ্ত আকারে ত হইতই; এতদ্ভিন্ন এই বিষয়ে এক আনুষ্ঠানিক সুদীর্ঘ ভাষণও হযরত (দ:) দিয়াছেন। হোযায়কা (রা:)ই উহার খোজ দানে বলিয়াছেন— একদা রসুলুল্লাহ (দ:) আমাদের সমাবেশে ভাষণ দানে দাঁড়াইলেন। কেয়ামত পর্যন্ত যত (বিশেষ বিশেষ এবং বিপর্যয়ের) ঘটনা ঘটবে সবই সেই ভাষণে বয়ান করিলেন। যে স্মরণ রাখিতে পারিয়াছে স্মরণ রাখিয়াছে, আর যে স্মরণ রাখিতে পারে নাই সে ভুলিয়া গিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে সেই বর্ণনার ঘটনা ঘটে যাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু ঘটনা দেখিয়া হযরতের সেই বর্ণনা স্মরণ হয়। যেরূপ এক ব্যক্তি কাহারও আকৃতি দেখিয়া পরিচয় লাভ করিয়াছে, সে অন্ত্র চলিয়া গেলে ঐ ব্যক্তি তাহাকে ভুলিয়া যায়, কিন্তু পুনরায় দেখিলেই পূর্বের পরিচয় স্মরণ আসে। (বোখারী শরীফ—মোসলেম শরীফ)

রসুলুল্লাহ ছান্নাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সেই ভাষণ যে কত দীর্ঘ ছিল তাহার স্পষ্ট উল্লেখও মোসলেম শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে। আবু য়ায়েদ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ (দ:) আমাদেরকে নিয়া ফজর নামায পড়িলেন। নামাযান্তে হযরত (দ:) মিস্বরে আরোহণ করিলেন এবং ভাষণ দিতে আরম্ভ করিলেন। জোহরের নামাযের ওয়াক্ত হইল, হযরত (দ:) মিস্বর হইতে নামিয়া জোহরের নামায পড়িলেন এবং পুনঃ মিস্বরে চড়িলেন ও ভাষণ দিতে আরম্ভ করিলেন। আছরের ওয়াক্ত হইল; হযরত (দ:) মিস্বর হইতে নামিয়া আছরের নামায পড়িলেন; আবার মিস্বরে চড়িয়া ভাষণ আরম্ভ করিলেন এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত ভাষণ দিলেন। যত কিছু ঘটয়াছে এবং ঘটবে সব বয়ান করিলেন।

খলীফা ওমর (রাঃ) সকল ফেৎনা—বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধের লোহ-বার ছিলেন বলিয়া এখানে যাহা উল্লেখ হইয়াছে তাহা স্বয়ং রসূলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক বর্ণিত। এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছ রহিয়াছে; যেমন—ওসমান ইবনে মাফুউন (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি একদা ওমর (রাঃ)কে “হে ফেৎনার তালা” বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ওমর (রাঃ) ইহার ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বর্ণনা করিলেন, একদা আমরা নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ছিলাম, আপনি সেই পথে গমন করিলেন; নবী (দঃ) আপনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এই ব্যক্তি ফেৎনার জন্ত তালা—যাবৎ জীবিত থাকিবে তোমাদের এবং ফেৎনার মধ্যে অতি মজবুত বন্ধ দরওয়াজা বিদ্যমান থাকিবে। ওমর রাহিমাল্লাহু তাহালা আনহুর এই বৈশিষ্ট্য তৌরাত কেতাবেও উল্লেখ ছিল। (ফতহুল-মোলহেম, ১—২৮৮। ৮৯)

৩২২। হাদীছ :— ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি কোন এক নারীকে চুম্বন করিল; অতঃপর সে ভীষণ অনুতপ্ত হইল এবং নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া ঘটনা ব্যক্ত করিল। (যেন তিনি শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তাহাকে এই কর্মের শাস্তি দান করেন বাহাতে তাহার এই গোনাহ মাক হইয়া যায়।) ঐ সময় কোরআন শাফের এই আয়াত নাযেল হয়—

أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ -

অর্থ—“দিনের উভয় অর্ধে (ফজর, জোহর ও আছর) এবং রাতের কিছু অংশে (মগবের ও এশা) নামায আদায় কর। নিশ্চয় জানিও, নেক আমল গোনাহকে বিলীন করিয়া দেয়।” ঐ ব্যক্তি এই আয়াতের দ্বারা তাহার ঘটনার সমাধান পাইল; তখন সে আরজ করিল, ইয়া রসূলুল্লাহ (দঃ)। এই সুযোগ কি শুধু আমার জন্য! হযরত (দঃ) বলিলেন, না—আমার সমস্ত উম্মতের জন্যই এই সুযোগ প্রবর্তিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা :— ছগীরা গোনাহসমূহে এই নিয়ম প্রযোজ্য যে, খাঁটি নেক আমলের দ্বারা উহা মাক হইয়া যায়। কবীরা গোনাহ মাক হইবার জন্য বিশেষভাবে তওবা করিতে হইবে। তওবার মূল হাকিকত এই যে, কোন গোনাহ সমুষ্ঠিত হইলে পর উহার জন্য অনুতপ্ত হইয়া আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং ভবিষ্যতের জন্য অন্তরের অন্ত্যস্থল হইতে ঐ গোনাহ না করার স্থির প্রতিজ্ঞা করা; যেমন উক্ত হাদীছে উল্লিখিত ব্যক্তির অবস্থা ছিল। সে স্বীয় গোনাহের উপর কত অনুতপ্তই না হইয়াছিল! এমন কি, সে অস্থির হইয়া নিজেকে মুংকির নিকট সমর্পণ করিয়াছিল, যেন তিনি শাস্তির বিধান করিয়াও গোনাহ মাক হওয়ার ব্যবস্থা করেন। মানুষ মাত্রই গোনাহ করিয়া থাকে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একরূপ অনুতপ্ত ও অস্থির হওয়ার অর্থই তওবা এবং ইহাই মোমেনের নিদর্শন। যেমন, এক হাদীছে আছে—মোমেনের নিদর্শন এই যে, যখন কোন গোনাহ করিয়া ফলে তখন সে ভয়ে একরূপ ভীত ও আতঙ্কিত হইয়া পড়ে যেন তাহার মাথার উপর পাহাড় ভাঙ্গিয়া

পড়িতেছে। আর মোশাফেকের অবস্থা ঐ যে, সে গোনাহের প্রতি এরূপ তাক্ষিল্য ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করে যেন তাহার নাকের উপর একটি মাছি বসিয়াছে, হাত নাড়িলেই উড়িয়া যাইবে।

ওয়াস্তমত নামায আদায় করার ফজিলত

৩২৩। হাদীছ :— ইবনে মসউদ (রা:) বলেন, আমি নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলাম—কোন্ আমল আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দীয়? হযরত (দ:) ফরমাইলেন, ওয়াস্ত অমুযায়ী নামায আদায় করা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তারপর? তিনি বলিলেন, মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তারপর? তিনি বলিলেন, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা। এই পর্যন্ত কাস্ত করা হইল; আমি আরও জিজ্ঞাসা করিলে হযরত (দ:) আরও উত্তর দিতেন।

৩২৪। হাদীছ :—আবু হোরাযরা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রশুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকলকে সন্ধান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বলত। কাহারও ঘরের দরওয়াজা সংলগ্ন যদি একটি প্রবাহিত নদী থাকে এবং ঐ ব্যক্তি দৈনিক পাঁচবার ঐ নদীতে গোসল করে, তাহার শরীরে কি ময়লা থাকিতে পারে? সকলে উত্তর করিল—না, না, কোন প্রকার ময়লাই থাকিতে পারে না। তখন হযরত (দ:) ফরমাইলেন, পাঁচ ওয়াস্ত নামাযের অবস্থা তজ্রপই; উহার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা গোনাহ মুছিয়া দেন।

ওয়াস্তমত নামায না পড়া নামাযকে নষ্ট করা

৩২৫। হাদীছ :—একদা আনাছ (রা:) অনুতাপ ও আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় (মোসলমানদের মধ্যে) যে সমস্ত (নেক আমল) দেখিয়াছিলাম এখন তাহার একটিও দেখিতে পাই না। এক ব্যক্তি বলিল, নামায এখনও বাকি আছে। আনাছ (রা:) বলিলেন, দেখনা! তোমরা নামাযকে ত্রিরূপ নষ্ট করিয়াছ।

৩২৬। হাদীছ :—ইমাম যুহরী (র:) বর্ণনা করিয়াছেন—দামেস্ক শহরে একদা আমি ছাহাবী আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট গিয়া দেখিলাম, তিনি কাঁদিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, আগনি কাঁদেন কেন? তিনি অপেক্ষা করিয়া বলিলেন, হায়! (হযরত রশুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায়) যাহা কিছু দেখিয়াছিলাম এখন উহার কিছুই দেখি না। এমনকি, এই নামাযকেও নষ্ট করা হইতেছে। (ইহার প্রতিও মুসলমানদের লক্ষ্য ও আগ্রহ কম হইয়া যাইতেছে, যাহারা নামায পড়িয়া থাকে তাহারাও সময় ইত্যাদির কোনই পাবন্দি করে না)।

গ্রীষ্মকালে দ্বিপ্রহরের তাপ কমিলে জোহর নামায পড়িবে

৩২৭। হাদীছ :— আবু হোরাযরা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—তাপমাত্র বৃদ্ধিকালে (জোহরের) নামায (বিলম্বে) ঠাণ্ডা সময়ে পড়িবে। কারণ, অত্যধিক তাপমাত্রা জাহান্নামের অগ্নিশিখার উত্তাপ।

দোষখের অগ্নি একবার আল্লার দরবারে অভিযোগ করিল, হে পরওয়ারদেগার! (আমরা সর্বদা জাহান্নামে আবদ্ধ আছি, তোমার অনুমতি ব্যতীত বাহিরের দিকে আমরা নিশ্বাসও ফেলিতে পারি না। সুতরাং উত্তাপ বেষ্টনীর ভিতরই আবদ্ধ, তাই) আমরা একে অগ্নের দ্বারা ভষ্ম হইতেছি। তখন আল্লাহ তায়াল্লা দোষখকে দুই রকম দুইটি নিঃশ্বাস বাহিরের দিকে ফেলিবার অনুমতি দিলেন—একটি গ্রীষ্মকালে, একটি শীতকালে। গ্রীষ্মকালের অত্যধিক উত্তাপ এই জাহান্নামের গরম নিঃশ্বাস হইতে সৃষ্ট এবং শীতকালের অধিক ঠাণ্ডার প্রকোপ এই জাহান্নামের ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস হইতে সৃষ্ট।

ব্যাখ্যা :—জাহান্নাম আল্লার অভিযাপ কেন্দ্র, সেই অভিযাপ কেন্দ্রের উদ্ভেজনা যখন বাহিরে ছড়াইতে থাকে তখন নামায আদায় না করিয়া সেই উদ্ভেজনার উপশম হইলে পর নামায আদায় করাই বিবেচ্য ও বাঞ্ছনীয়। সাধারণতঃ হুনিয়ার কোন বড় লোকের নিকট দরখাস্ত পেশ করিতে হইলেও তাহার মেজাজ, মতি-গতি লক্ষ্য করিয়াই পেশ করা হয়, রাগ বা উদ্ভেজনার সময় উহা পেশ করা হয় না। নামায আল্লার দরবারে পেশকৃত দরখাস্ত; উহা পেশ করিতেও আল্লার ছেফতে-রহমত ও ছেফতে-গজবের বিকাশ-নিদর্শন দেখিয়া পেশ করা বাঞ্ছনীয়।

এই হাণীছের উপর প্রশ্ন হয় যে, অগ্নি একটি নির্জীব নির্বাক বস্তু। উহা কিরূপে অভিযোগ পেশ করিতে বা এরূপ আরজ করিতে পারে? উত্তর এই যে, অগ্নি আমাদের পক্ষে নির্জীব বটে। কিন্তু আল্লাহ তায়াল্লার পক্ষে (Animate) বোদ্ধা, সচেতন জীব বিশেষ এমনকি যখনই আল্লার কোন আদেশ তাহার প্রতি আসে, সঙ্গে সঙ্গে সে উহাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি ও অনুধাবন করিয়া ঐ আদেশ অনুযায়ী কার্য সাধা করিয়া থাকে। যেমন—কোরআন শরীফে ইহার জলন্ত প্রমাণ রহিয়াছে—ইব্রাহীম আলাইহেছালামের ঘটনা। যখন নমরুদ তাহাকে মারিবার জন্ত ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল তখন সেই অগ্নির প্রতি আল্লার আদেশ পৌছিল—

يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ -

“হে অগ্নি। তুমি ইব্রাহীমের জন্ত শান্তিদায়ক ঠাণ্ডা হইয়া যাও।” (৭ পাঃ ৫ কঃ) অগ্নি আল্লার এই আদেশকে অকরে অকরে প্রকাশে পালন করিয়া দেখাইয়াছে।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, “দজ্জাল যখন আত্মপ্রকাশ করিবে তখন তাহার সঙ্গে বেহেশত নামধারী সুখ-শান্তির ব্যবস্থার একটি বস্তু এবং দোষখ নামধারী একটি অগ্নিকুণ্ড থাকিবে। দজ্জালকে যে খোদা বলিয়া স্বীকার করিবে সে তাহাকে ঐ বেহেশতে স্থান দিবে এবং যে তাহাকে খোদা বলিয়া স্বীকার করিবে না তাহাকে ঐ দোষখে নিক্ষেপ করিবে। রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম করমাইয়াছেন—স্মরণ রাখিও, তাহার ঐ বেহেশতে প্রকৃতপক্ষে দোষখের স্থায় বস্তু ও আচ্ছাদন হইবে এবং যাহারা ঐ অগ্নিকুণ্ডে

নিকিষ্ট হইবে পক্ষান্তরে তাহারা ঐ স্থানে বেহেশতের ছায় শান্তি ও আরাম উপভোগ করিতে থাকিবে।” দেখুন—অগ্নি কত বিচক্ষণ। সে আল্লার দোস্ত হুশমন সকলকেই চিনিতে পারে; আল্লার আদেশ অনুযায়ী সে কার্য সমাধা করিয়া থাকে। মাওলানা রুমী এ বিষয়ে কি সুন্দর বলিয়াছেন—

خاک و باد و آب و آتش بنده اند — بامن و تو مرده باحق زنده اند

মাটি, বায়ু, পানি, অগ্নি ইহারা সকলেই আল্লার বন্দা; তোমার ও আমার পক্ষে ইহারা নির্জীব, কিন্তু আল্লার পক্ষে ইহারা সকলেই সজীব।

এই হাদীছের উপর আর একটি প্রশ্ন হয় যে, এখানে অধিক তাপমাত্রা ও শীতের প্রকোপের সম্বন্ধ দোষের সঙ্গে বলা হইয়াছে, অথচ বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমরা উহার সম্বন্ধ সূর্যের সঙ্গে দেখিয়া থাকি। সে জন্তই সূর্যের গতি পথের দূরত্ব অনুপাতে ভূখণ্ডের বিভিন্ন স্থানের তাপমানে ও সময়ে বেশকম হইয়া থাকে। ইহার উত্তর এই যে, এখানে লক্ষ্য করা দরকার যে, সূর্য্য হইতেই যদি উত্তাপের বিস্তার ধরিয়া লওয়া হয় তবুও দেখিতে হইবে, সূর্যের মধ্যে সেই উত্তাপ কোথা হইতে আসিল? একরূপ হইতে পারে যে, জাহান্নামের সঙ্গে সূর্যের কোন সম্পর্ক আছে, বহারা জাহান্নামের নিঃশ্বাস ছনিয়ার বৃকে একমাত্র সূর্যের পথে ছড়াইতে থাকে। যেমন কাহাও ঘরে যদি ইলেক্ট্রিক হিটার থাকে তবে ঐ ঘরের মধ্যে উত্তাপ একমাত্র ঐ হিটার হইতে ছড়াইতে থাকিবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উত্তাপের কেন্দ্র পাওয়ার হাউসের সঙ্গে ঐ ঘরের হিটারের সঙ্গে একটি তারের যোগাযোগ ও সম্পর্ক রহিয়াছে, যাহার সাহায্যে ঐ পাওয়ার-হাউসের উত্তাপ ঐ ঘরের হিটার হইতেই বিস্তীর্ণ হয়; সুতরাং ঐ ঘরের বিভিন্ন অংশের তাপমাত্রা হিটারের দূরত্বের অনুপাতেই হইবে।

আর একটি বিষয় এই যে, জাহান্নামের মধ্যে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দুই প্রকার শক্তির ব্যবস্থা রাখা আছে। একটি তব্কায়ে-নার—অগ্নিদগ্ধের শক্তি-কেন্দ্র; আর একটি তব্কায়ে-যমহরীর—ভীষণ ঠাণ্ডার শক্তি-কেন্দ্র। উভয়টি একত্রিত নয় বরং ভিন্ন ভিন্ন। উভয়ের পরিমাণ এত বেশী যে, উহার লক্ষ্যাংশের এক অংশও সহ করার ক্ষমতা মানুষের হইতে পারে না, কিন্তু সেখানে মৃত্যু নাই, তাই শুধু বাতনাই হইতে থাকিবে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শক্তি হইতে থাকিবে।

أَمَّا زَنَا اللَّهُ تَعَالَى مِنَ النَّارِ

“আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে দোষিত হইতে রক্ষা করুন।

পাঠকবৃন্দ। এই হাদীছের ব্যাখ্যায় কয়েকটি প্রশ্নোত্তরের আলোচনা করা হইল বর্তমান যুগের রুচির প্রতি লক্ষ্য করিয়া। নতুবা আল্লার ও আল্লার রসুলের বর্ণিত বিষয়সমূহের

জ্ঞান প্রস্রোতর ও বিতর্কের পথ মঙ্গলজনক নয় এবং তর্কের দ্বারা সর্বক্ষেত্রে পূর্ণ সুরাহাও সম্ভব হয় না। আল্লাহ তায়াল্লা দুনিয়া-আখেরাতের সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্তা; প্রতিটি বস্তুর সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক অবস্থা একমাত্র তিনিই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত। তিনি যখন স্বয়ং বা স্বীয় রসুলের মারফৎ কোন বস্তুর কোন অবস্থার খবর দেন, তখন উহা নিশ্চয় নিশ্চয় পূর্ণ সঠিক হইবে, বিন্দুমাত্রও নড়বড় হইবে না। কিন্তু উহা আমাদের বুদ্ধি-বিবেকের আওতার বাহিরেও হইতে পারে; আমাদের বুদ্ধি-বিবেকের মাত্রা যে কি তাহা বলা বাহুল্য। আল্লাহর সৃষ্ট সামুলী কোন বস্তু এমনকি আমরা নিজের সৃষ্টিরই কি রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারিয়াছি। এ অবস্থায় আল্লাহর বর্ণিত সংবাদের উপর প্রশ্রোতর ও বিতর্ক সৃষ্টির অনধিকার চর্চা করা ঐ নির্বোধ কাকের সমতুল্য নয় কি যে কাক তাহার নগণ্য ঠোট দ্বারা মহাসাগরের গভীরতা পরিমাপ করিতে চেষ্টা করে? পক্ষান্তরে খাটি ভাবে চিন্তা করিলে আল্লাহর সৃষ্টি রহস্যের মহাসাগরের সম্মুখ আমাদের বিবেক বুদ্ধি ঐ পাতি কাকের ঠোট হইতেও নগণ্য। তাই একরূপ বিষয়সমূহে আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের খবরের বিশ্লেষণের প্রতি মাধা ঘামান উচিন নয়। হাঁ, এখানে শুধু একটি বিষয় ভালভাবে দেখিয়া লইতে হইবে যে, এই খবরটি আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের বলিয়া সঠিক ও প্রামাণিক-রূপে সাব্যস্ত আছে কি না? এ বিষয় নিশ্চিত হইলে পর আর কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করা চলিবে না। যেমন, আবু হোরায়রা (রা:) রসুলুল্লাহ (দ:) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিলেন, চন্দ্র ও সূর্যকে আলোহীন সাদা বস্তুর ছায় করিয়া দোষখে নিক্ষেপ করা হইবে। হাসান বহরী (র:) প্রশ্ন করিলেন, চন্দ্র-সূর্য কি পাপ করিয়াছে যে কারণে উহাদিগকে দোষখে নিক্ষেপ করা হইবে? আবু হোরায়রা (রা:) উত্তর করিলেন—

أَحَدُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

“আমি তোমাকে রসুলুল্লাহ ছালাম্লাহ আল্লাইহে অসাল্লামের হাদীছ শুনাইলাম” অর্থাৎ হাদীছ শুনাইবার পর প্রশ্নের অবকাশ কি আছে? তখন হাছান বহরী (র:) আর কোন শব্দ করিলেন না। (মেশকাত)

زبان تازه کردن باقرارتو — نه انکیختنی علت از کارتو-

কোন এক কবি বলিয়াছেন—তোমার কথা গিরোধার্য্য করিয়া লওয়াই আমাদের একমাত্র কর্তব্য। কারণ বা হেতু জিজ্ঞাসা করার কোন অধিকার আমাদের নাই।

৩২৮। হাদীছ :- আবু জর গেকারী (রা:) বলেন, আমরা কোন এক সফরে হযরত রসুলুল্লাহ ছালাম্লাহ আল্লাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। মোয়াজ্জেন জোহরের আজান দিতে চাহিলে হযরত রসুলুল্লাহ (দ:) বলিলেন, দ্বিপ্রহরের উত্তাপ কম হওয়ার অপেক্ষা কর। কিছু সময় পর পুনরায় মোয়াজ্জেন আজান দিতে চাহিলে তিনি ঐরূপেই অপেক্ষা

করিতে বলিলেন, এমনকি এত বিলম্ব করিলেন যে, টিলাসমূহের ছায়া দেখা যাইতে লাগিলে। হযরত (দঃ) বলিলেন—অধিক তাপমাত্রা জাহান্নামের অগ্নিশিখার উত্তাপ, ঐ সময় নামায না পড়িয়া বিলম্ব করা চাই।

ব্যাখ্যা :—অপ্রশস্ত দাঁড়ান বস্তু, যেমন—লাঠি, ককি, বাঁশ, থাম ইত্যাদির ছায়া সূর্য্য আকাশের মধ্যস্থল অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যাইতে থাকে, কিন্তু এরূপ উচু বস্তু বাহার গোড়া তথা নীচের অংশ সুপ্রশস্ত, যেমন—টিলা ইত্যাদি, উহার ছায়া সূর্য্য অধিক পরিমাণ নীচে না আসা পর্য্যন্ত দেখা যায় না; উহার উপরি ভাগের ছায়া নিম্নের প্রশস্ত গোড়া ছাড়াইয়া যাইতে যথেষ্ট সময় লাগে। এবং গোড়া অতিক্রমের পূর্বে ছায়া দেখা যাইবে না। তাই এখানে উদ্দেশ্য এই যে, জোহরের নামায অপেক্ষা করিতে করিতে বিলম্ব পড়িলেন।

৩২৯। **হাদীছ :**—আবু বর্ধা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম করজ নামাযসমূহ কোন্ কোন্ সময়ে আদায় করিতেন? তিনি বলিলেন, জোহরের নামায পড়িতেন সূর্য্য আকাশের মধ্যস্থল অতিক্রম করিয়া যাওয়ার পর। আছরের নামায পড়িতেন এমন সময় যে, মদীনার শেষ প্রান্তের অধিবাসীগণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাথে আছরের নামায পড়িয়া সূর্য্য সন্তোজ থাকিতে বাড়ী ফিরিত। এশার নামায রাত্রে এক তৃতীয়াংশের পর পড়িতে ভালবাসিতেন এবং তিনি এশার নামাযের পূর্বে নিদ্রা যাওয়া বা এশার নামাযান্তে কথাবার্তায় লিপ্ত হইয়া ঘুম নষ্ট করা খুবই নাপছন্দ করিতেন। (কারণ, প্রথম অবস্থায় এশার নামায ও দ্বিতীয় অবস্থায় ফজরের নামায কাজা হওয়ার আশঙ্কা থাকে।) ফজরের নামায এতটুকু আলো হওয়া অবস্থায় শেষ করিতেন যখন নিকটস্থ লোক চিনিতে পারা যাইত। হযরত (দঃ) এই নামাযে ষাট হইতে একশত পর্য্যন্ত কোরআনের আয়াত পাঠ করিতেন। (৭৮ পৃঃ)

৩৩০। **হাদীছ :**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে জোহরের নামায এতটুকু উত্তাপ বাকী থাকিতে পড়িতাম যে, মাটির উপর কাপড় রাখিয়া সেজদা করিতে হইত।

ওজর বশতঃ জোহরের নামায বিলম্ব পড়া

৩৩১। **হাদীছ :**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা মদীনায থাকা অবস্থায়ই জোহর ও আছর এবং মাগরেব ও এশার নামায এক সাথে পড়িয়াছেন। সম্ভবতঃ সেদিন শহরে অত্যধিক বৃষ্টিপাত হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা :—অত্যধিক বৃষ্টিপাতের সময় বার বার মসজিদে উপস্থিত হওয়া সকলের জন্য খুবই অনুবিধাজনক হইবে সন্দেহ নাই। আবার মসজিদের ভ্রমাত ছাড়িয়া দেওয়াও ভাল নয়, তাই বোধ হয় হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এই ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, জোহরের শেষ সময়

মসজিদে উপস্থিত হইয়াছিলেন—যেমন জোহরের নামায আদায় করিলে পর সঙ্গে সঙ্গেই আছরের ওয়াক্ত আসিয়া যায় এবং ঐ সময় আছরের নামায পড়িলে প্রত্যেক নামাযই উহার নির্ধারিত সময়ের ভিতরেই আদায় হইল। জোহরের নামায উহার শেষ ওয়াক্তে এবং আছরের নামায উহার আউয়াল ওয়াক্তে, অথচ ছই নামায একত্রে হইয়া গেল, বার বার মসজিদে আসিতে হইল না। মাগরেব ও এশার নামাযের ব্যবস্থাও তদ্রূপই করিলেন। এই নামাযসমূহের উভয়ের নির্ধারিত ওয়াক্ত যেহেতু পরস্পর সংলগ্ন তাই একরূপ করিতে কোন বাধা নাই। সফরের সময়ও বার বার ভ্রমণ স্থগিত করায় অসুবিধা হইলে বা অথ কোন সাময়িক ওজর বশতঃ ঐরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা বিধেয়।

আছরের নামায পড়ার সময়

৩৩২। হাদীছ :—ওরুয়া (রা:) হইতে বর্ণিত আছে—আয়েশা (রা:) বলিয়াছেন, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যে সময়ে আছর নামায পড়িয়া থাকিতেন তখন আমার ঘরের মেঝে রৌদ্র বিद्यমান থাকিত অর্থাৎ রৌদ্র তথা হইতে উঠিয়া যাওয়ার পূর্বে—তখন তথায় ছায়া আসে নাই।*

ব্যাখ্যা :—মদীনা শরীফে কেবলা দক্ষিণ দিকে। আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ঘর মসজিদের পূর্ব পার্শ্বে ছিল; ঘর মসজিদের সহিত সংযুক্ত ছিল না, অবশ্য সন্নিকটেই ছিল। ঘরটি পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ছিল এবং ঘরের দরওয়াজা ঘরের পশ্চিম পার্শ্বে ছিল। সূর্য্য পশ্চিম দিকে চলিয়া গেলে ঘর ও মসজিদের মধ্যস্থ উন্মুক্ত জায়গা-পথে ঘরের দরওয়াজা দিয়া ঘরে রৌদ্র প্রবেশ করিত এবং সেই রৌদ্র ঘরের মেঝে পতিত হইত। সূর্য্য অধিক নীচে নামিয়া গেলে রৌদ্র মেঝে হইতে উপরে উঠিয়া যাইত এবং মেঝে ঘরের দরওয়াজার সন্মুখস্থ আঙ্গিনায় কোন প্রকার বেঠনী থাকিয়া থাকিলে উহার কিম্বা সন্মুখস্থ মসজিদের ছায়া আসিয়া যাইত। আয়েশা (রা:) এখানে বুঝাইতে চাহেন যে, আমার ঘরের মেঝে হইতে রৌদ্র চলিয়া গিয়া তথায় ছায়া আসিয়া যায়—সূর্য্য এতদূর নীচে যাওয়ার পূর্বেই হযরত (দ:) আছরের নামায পড়িয়া থাকিতেন।

একত্রে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে—বয়ো:প্রাপ্তির কাছাকাছি বয়সের বালকের হাত ছাদ পর্য্যন্ত পৌছে—আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহ শুধু এতটুকুই উচু ছিল বলিয়া প্রমাণিত। আর হযরতের মসজিদের ছাদ খেজুর পাতা বিছানো ছিল—উহাও বেশী উচু ছিল না, সুতরাং উক্ত ঘরের মেঝে রৌদ্র থাকার জন্য সূর্য্য অধিক উপরে হওয়ার প্রয়োজন হইত না।

৩৩৩। হাদীছ :—আনাছ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রুতুল্লাহ (দ:) আছরের নামায অগন সময় পড়িতেন যখন সূর্য্যের কিরণ ও উহার তীক্ষ্ণতা পুরাপুরিই বজায় থাকিত এবং

* হাদীছের তরজমা কতহল-বারী ২—৩০ কেতাবের ব্যাখ্যা অনুপাতে করা হইল।

সূর্য্য এতটুকু উপরে থাকিত যে, মদীনার উর্দ্ধপ্রান্তবাসীগণ হযরতের সহিত আছরের নামায পড়িয়া সূর্য্য আকাশের নিম্নস্তরে আসিবার পূর্বেই বাড়ী ফিরিতে পারিত। আনাছ (রাঃ) বলেন, উর্দ্ধপ্রান্তের কোন কোন বস্তী খাস মদীনা হইতে চার মাইল ব্যবধানে অবস্থিত।

৩৩৪। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা (রসূলুল্লাহ ছালামাহ আল্লাইহে অসাল্লামের সঙ্গে) আছরের নামায পড়িয়া আমাদের কেহ কেহ সূর্য্য নিম্নস্তরে আসার পূর্বেই কোবা পৌছিতে পারিত। (কোবা নগরীর ব্যবধান মদীনা হইতে প্রায় তিন মাইল)।

৩৩৫। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা (নবী ছালামাহ আল্লাইহে অসাল্লামের সঙ্গে তাহার মসজিদে) আছরের নামায পড়ার পর কোন কোন ব্যক্তি আমর-বিন-আউফের বস্তীতে পৌছিয়া দেখিত তাহারা আছরের নামায পড়িতেছেন। (ঐ বস্তীই কোবা নগরী)।

ব্যাখ্যা :—উক্ত তিনটি হাদীছ দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সাধারণতঃ রসূলুল্লাহ ছালামাহ আল্লাইহে অসাল্লামের মসজিদে আছরের নামায সকাল সকাল—প্রথম ওয়াক্তেই পড়া হইত; কিন্তু হযরতের সময়ই মদীনার অন্যান্য মসজিদে, যেমন—মসজিদে বনী-হারেছা, মসজিদে বনী-আমর ইত্যাদিতে একটু বিলম্বে—মধ্য ওয়াক্তে পড়া হইত। ইহার কারণ এরূপ উল্লেখ করা হয় যে, হযরতের সঙ্গে দূর প্রান্তের বস্তীসমূহের লোকজন নামায পড়িত এবং সূর্য্যাস্তের পূর্বে তাহাদের বাড়ী ফিরার আবশ্যক হইত। তাছাড়া মহল্লা ও বস্তীসমূহের লোকগণ কাজ কর্মে ব্যস্ত থাকিত তাই তাহারা নিজ নিজ বস্তীর মসজিদে আছরের নামায একটু দেরীতে পড়িত। যেহেতু ইহার প্রতিও রসূলুল্লাহ ছালামাহ আল্লাইহে অসাল্লামের পূর্ণ সমর্থনই ছিল, তাই সাধারণ লোকদের অবস্থানুপাতে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ইহাই অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু আছর নামায এরূপ বিলম্ব কিছুতেই করিবে না যে, সূর্য্য এতটুকু নিম্নস্তরে হইয়া আসে যে, উহার উপর দৃষ্টি স্থাপন করা সহজ হয়।

৩৩৬। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছালামাহ আল্লাইহে অসাল্লাম স্বীয় উম্মতকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, তোমাদের জিন্দেগী ও বয়স পূর্ব্বর্তী উম্মত ইহুদ ও নাছারাদের বয়সের তুলনায়—যেমন আছরের ওয়াক্ত হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত। (কিন্তু পরকালে তোমরা তাহাদের অপেক্ষা অধিক মর্ত্বা লাভ করিবে।) রসূলুল্লাহ (সঃ) উক্ত দৃষ্টান্তটির ব্যাখ্যা দানপূর্বক বলেন—তোমাদের এবং ইহুদী নাছারাদের তুলনামূলক অবস্থা এমন, যেমন কোন ব্যক্তি একদল মজুরকে নির্দিষ্ট মজুরী “এক কীরাত” (যেমন—এক টাকা) ধার্য্য করিল; তাহারা ভোর হইতে দুপুর পর্য্যন্ত কাজ করিল। তারপর অন্য আর একদল মজুর ডাকিল, তাহাদের জ্ঞাতও ঐ পরিমাণ মজুরী ধার্য্য করিল, তাহারা দুপুর হইতে আছরের ওয়াক্ত পর্য্যন্ত কাজ করিল। তারপর তৃতীয় আর একদল মজুর ডাকিয়া তাহাদের জ্ঞাত প্রথম ও দ্বিতীয় দলের দ্বিগুণ মজুরী ধার্য্য করিয়া বলিল,

তোমরা আছরের সময় হইতে সূর্যাস্ত পর্য্যন্ত কাজ করিবে। প্রথম দল ইহুদীদের দৃষ্টান্ত, যাহাদিগকে ভোঁরাত কেতাব দান করতঃ উহার আমল করিয়া যাইতে বলা হইয়াছিল। (ইহুদীগণ তাহাদের পরবর্তী সকলের চেয়ে বয়স বেশী পাইয়াছিল, কিন্তু কেয়ামতের দিন অশ্বের তুলনায় তাহারা কোন প্রকার অগ্রগামী হইবে না)। দ্বিতীয় দল নাছারাদের দৃষ্টান্ত; যাহাদিগকে ইঞ্জিল কেতাব দিয়া সেই অনুযায়ী আমল করিতে বলা হইয়াছিল, কিন্তু কেয়ামতের দিন অগ্রগামী হইতে পারিবে না)। তৃতীয় দল তোমাদের (তথা হযরত মোহাম্মদ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উম্মতের) দৃষ্টান্ত; তাহাদিগকে কোরআন দেওয়া হইয়াছে এবং সে অনুযায়ী কাজ করিতে বলা হইয়াছে। (পূর্ববর্তী সকল উম্মতের চেয়ে এই উম্মতের বয়স কম, কিন্তু) কেয়ামতের দিন এই উম্মতগণ অশ্ব সকল উম্মত হইতে অগ্রগামী হইবে। অশ্বাত্ত উম্মত হইতে আমল করার সময় কম পাইয়াও অধিক ছওয়াব ও বড় বড় মর্তবার অধিকারী হইবে। তখন ইহুদ ও নাছারগণ আল্লার দরবারে অভিযোগ করিবে, হে প্রভু! আমরা (অধিক বয়স পাওয়ার) কাজ বেশী করিয়াছি, মজুরী কম পাইয়াছি, ইহার কাজ কম করিয়াছে, মজুরী বেশী পাইয়াছে—আমাদের দ্বিগুণ, ইহার কারণ কি? আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তোমাদের নির্দ্ধারিত মজুরী হইতে কি তোমাদিগকে এক-টুকুও কম দিয়াছি? তাহারা উত্তর করিবে—না। তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, এই তৃতীয় দলকে বেশী দেওয়া, আমার মেহেরবানী—অতিরিক্ত দান; যাহাকে আমার ইচ্ছা হয় দিয়া থাকি। (ইহাতে অভিযোগের অধিকার নাই)।

ব্যাখ্যা :— এই হাদীছের উদ্দেশ্য হযরত রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উম্মতের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এখানে একটি অশ্ব বিষয়েরও মীমাংসা হয়। সেই হিসাবেই এই হাদীছটি এখানে নামাযের সময় নির্দ্ধারণ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইহুদীগণ যাহারা ভোর হইতে দুপুর পর্য্যন্ত কাজ করিয়াছে তাহাদের কার্য সময় তৃতীয় দলকে দেওয়া কার্য-সময় (আছর হইতে সূর্যাস্ত পর্য্যন্ত) হইতে স্পষ্টতঃই বেশী, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু দ্বিতীয় দল নাছারা, তাহাদের কার্য-সময় (জোহর হইতে আছর পর্য্যন্ত) তৃতীয় দলের কার্য সময় হইতে বেশী। এই অভিযোগ সত্য ও সঠিক হওয়া নির্ভর করে জোহরের ওয়াক্ত আছরের ওয়াক্ত অপেক্ষা স্পষ্টরূপে বড় হওয়ার উপর—এমন বড় বাহা সাধারণের চোখে ধরা পড়ে এবং একেবারে নগণ্য না হয়, নতুবা একটা অভিযোগ খাড়া করা যাইতে পারে না। তাই এই হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে জোহরের ওয়াক্ত আছরের ওয়াক্ত হইতে বড়, আছরের ওয়াক্ত জোহরের ওয়াক্ত হইতে ছোট। এতদৃষ্টে আবু হানিফা (রঃ) ওয়াক্তদ্বয়ের সীমা এরূপ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, যাহাতে আছরের ওয়াক্ত সর্বদা ছোট বলিয়াই স্পষ্টরূপে বোধগম্য হয়।

৩৩৭। হাদীছ :—আবু উমামাহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা মদীনার গভর্ণর ওমর ইবনে আবদুল আজিজের সহিত জোহরের নামায পড়িলাম। তারপর আমরা ছাহাবী

আনাহ রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর সাক্ষাতে পৌছিলাম। আমরা তাঁহাকে আছর নামায পড়িতে পাইলাম; আমি ভিজ্বাসা করিলাম, চাচা মিঞা। আপনি এইটা কোন নামায পড়িলেন? তিনি বলিলেন, আছর নামায; রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সহিত যে আমরা আছরের নামায পড়িতাম তাহা এইরূপ সময়েই ছিল।

ব্যাখ্যা :— ওমর ইবনে আবহুঃ আদ্বিজ (রাঃ) তখন খলীফা হন নাই, বরং তিনি উমাইয়া গোত্রীয় শাসকের গভর্ণর ছিলেন এবং সময় সময় নামাযের জমাত পড়াইতে বিলম্ব করিতেন। যেমন, ৩২০নং হাদীছের ঘটনায় তিনি একদিন আছরের নামায বিলম্ব পড়ায় অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। আলোচ্য হাদীছের ঘটনায় তিনি জোহরের নামায তদ্রূপ বিলম্বে পড়িয়াছিলেন, ফলে আছর নামাযের ওয়াক্তের ব্যবধান খুব কমই ছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই আছর নামাযের উত্তম সময় উপস্থিত হইয়া গেল, তাই আনাহ (রাঃ) নিজ গৃহে আছর নামায পড়িয়া নিলেন। কারণ, মসজিদের ইমাম শাসনকর্তা জমাত পড়াইতে বিলম্ব করিতেন।

আছরের নামায ছুটিয়া যাওয়ার ক্ষতি কত বড়!

৩৩৮। হাদীছ :— عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال—

الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَا لَهُ

অর্থ—আবহুঃ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম করমাইয়াছেন, যে ব্যক্তির আছরের নামায (কোন কারণ বশতঃ) কাজা হইয়া গিয়াছে তাহার এত বড় ক্ষতি হইয়াছে যেন তাহার পরিবারবর্গ ও ধন-সম্পত্তি সব ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

আছরের নামায ছাড়িয়া দেওয়ার গোনাহ কত বড়।

৩৩৯। হাদীছ :— عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم

..... قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلُهُ -

অর্থ—আবুল মলীহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছে, আমরা বোরাযদা রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর সঙ্গে এক জোহাদে ছিলাম। মেঘাচ্ছন্ন দিন ছিল; তিনি বলিলেন, সতর্কতামূলকভাবে আছরের নামায শীঘ্র পড়িয়া নেও। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম করমাইয়াছেন—যে ব্যক্তি আছরের নামায ছাড়িয়া দিয়াছে তাহার সমস্ত নেক আমল বরবাদ হইয়া গিয়াছে।

আছরের নামাযের ফজিলত

৩৪০। হাদীছ :—জরীর ইবনে আবহুঃ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ছিলাম। একদা পুণিমার রাত্রে চাঁদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া হযরত (দঃ) উপস্থিত ছাহাবীগণকে বলিলেন, তোমরা (বেহেশতে যাইয়া) আল্লাহ

তায়ালাকে এইরূপে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইবে যেমন এই পুণিমার চাঁদকে দেখিতেছে—কোন প্রকার ভীড় ও কোলাহল ছাড়াই দেখিতে পাইবে। কিন্তু এই নেয়ামত হাসিলের জন্য সূর্য্য উদয়ের ও অস্তের পূর্ববর্তী (ফজর ও আছর) নামাযদ্বয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৩৪১। হাদীছ :— আবু হোরায়রা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছান্নান্নাহ আলাইহে অসাল্লাম ফঃমাইয়াছেন—তুনিয়ার কার্য পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের দুইটি দল—রাত্রিকালের জন্য ও দিনের জন্য একের পর এক আসিয়া থাকেন। উভয় দলই ফজর ও আছরের সময় তুনিয়ার বৃকে একত্রিত হন। নূতন দল তুনিয়ার উপর থাকেন, পুরাতন দল আল্লাহ তায়ালার নিকট চলিয়া যান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ তাহা সত্ত্বেও তিনি ঐ ফেরেশতা দলকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার বন্দাদিগকে কি অবস্থায় ছাড়িয়া আসিয়াছ? তাহারা উত্তর করিয়া থাকেন—আমরা যাইয়া তাহাদিগকে নামাযরত পাইয়াছিলাম, ফিরিয়া আসার সময় নামাযরতই দেখিয়া আসিয়াছি। (কারণ একদল ফজরের সময় আসিয়াছেন এবং আছরের সময় ফিরিয়াছেন। দ্বিতীয় দল আছরের সময় আসিয়াছেন, ফজরের সময় ফিরিয়াছেন।)

সূর্য্যাস্তের পূর্বে আছর নামাযের ওয়াক্ত অল্প পাইলে ?

৩৪২। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছান্নান্নাহ আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সূর্য্যাস্তের পূর্বে আছরের নামাযের এক রাকাতের সময় পায়, সে পূর্ণ নামায পড়িবে এবং যে ব্যক্তি সূর্য্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামাযের এক রাকাতের সময় পায়, সে পূর্ণ ফজরের নামায আদায় করিবে।

ব্যাখ্যা :—এই হাদীছটি দ্বারা দুইটি মহআলাহ প্রতীয়মান হয়। প্রথম মহআলাহ—যে ব্যক্তির উপর নামায ফরজ ছিল না; সে নামায ফরজ হওয়ার উপযোগী এমন সময় হইয়াছে যখন বালগ হইয়াছে বা ঋতুবর্তী এমন সময় পবিত্র হইয়াছে, পাগল এমন সময় ভাল হইয়াছে, ফাফের এই সময় মোসলমান হইয়াছে এমতাবস্থায় তাহার উপর ঐ ওয়াক্তের নামায ফরজ হইবে কি না? এই হাদীছে প্রমাণ হইল যে ফরজ হইবে। দ্বিতীয় মহআলাহ—যে ব্যক্তির আছর ও ফজর নামায কোন কারণে এত দিলক্ষ হইয়া গিয়াছে যে, এখন সূর্য্যাস্ত বা উদয়ের মাত্র সামান্য সময় বাকি আছে, যেমন—কাহারও এই সময় নিদ্রা ভঙ্গ হইল বা নামাযের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল, সে নামায আরম্ভ করিয়া দিবে, না সূর্য্যাস্ত বা উদয়ের পরে কাজা পড়িবে? এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তখনই নামায আরম্ভ করিয়া পূর্ণ নামায আদায় করিবে। অবশ্য যেহেতু মশহুর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়ের সময় নামায ছহীহ হয় না সে জন্য সতর্কতামূলকরূপে সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়ের পর ঐ নামায পুনরায় কাযাও পড়িয়া লইবে। (এ'লাউছ ছুনান)

মাগরেবের নামাযের ওয়াক্ত

আ'তা (রাঃ) বলিয়াছেন, রুগ্ন ব্যক্তি মাগরের এবং এশার নামায একত্রে পড়িতে পারে।

ব্যাখ্যা :—জোহর ও আছর এবং মাগরের ও এশা এই দুই জোড়া নামাযের ওয়াক্ত পরস্পর লাগালাগি; কোন কোন ইমামের মতে ছফর, রোগ ইত্যাক্তি বিভিন্ন কারণে উক্ত চার ওয়াক্তের প্রতি দুই ওয়াক্ত নামায এক ওয়াক্তে একত্রে পড়িয়া নেওয়া জায়েয। আ'তা রহমতুল্লাহে আলাইহে মজহাব সেইরূপ। হানফী মজহাব মতে উভয় নামাযকে একত্রিত করিবে, কিন্তু এক ওয়াক্তে নয়, প্রত্যেক নামাযকে বস্তুতঃ উহার ওয়াক্তের গণ্ডির ভিতরই পড়িবে—এক নামায উহার ওয়াক্তের সর্বশেষ অংশে এবং দ্বিতীয় নামায উহার ওয়াক্তের সর্ব প্রথম অংশে। যেমন কোন রুগ্ন ব্যক্তি নামাযের প্রস্তুতি নিতে তাহার অত্যন্ত কষ্ট হয়; এমতাবস্থায় দুই দুই বার যাতনা ভোগ না করিয়া সে একরূপ করিতে পারে যে, জোহর বা মাগরেব উহার সর্বশেষ ওয়াক্তে পড়িবে যেন নামায শেষ করিলে অনতিবিলম্বেই আছর বা এশার ওয়াক্ত হয় এবং উহা পড়িয়া নেয়। এইভাবে এক প্রস্তুতিতেই দুই নামায একত্রে পড়িবে, কিন্তু প্রত্যেক নামায উহার ওয়াক্তে; যদিও সাধারণ অবস্থায় উহা উত্তম ওয়াক্ত নহে।

৩৪৩। হাদীছ :—রাফে ইবনে খাদিজ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে মাগরেবের নামায পড়িয়া ফিরিবার সময়ও চতুর্দিক এতটুকু আলোকিত থাকিত যে, কেহ তীর নিক্ষেপ করিলে লক্ষ্যস্থল স্পষ্টই দেখা যাইত।

৩৪৪। হাদীছ :—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জোহরের নামায হুপুরের সময় পড়িতেন, আছরের নামায সূর্য্য নিস্তেজ হইবার পূর্বে পড়িতেন, মাগরেবের নামায সূর্য্য অস্ত যাইবার সঙ্গে সঙ্গে পড়িতেন, এশার নামায কখনও একটু বিলম্বে পড়িতেন, কখনও সন্ধ্যাই পড়িয়া লইতেন; যখন দেখিতেন, মুছল্লিগণ সকলেই একত্রিত হইয়াছে তখন বিলম্ব না করিয়া এশার নামায পড়িয়া লইতেন; যখন তাহারা বিলম্বে আসিত তখন দেৱীতেই পড়িতেন। ফজরের নামায একটু অন্ধকার থাকিতেই পড়িতেন।

৩৪৫। হাদীছ :—ছালামাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সহিত মাগরেবের নামায আরম্ভ করিতাম সূর্য্যাস্তের সঙ্গেই।

মাগরেবের নামাযকে এশার নামায বলিবে না

৩৪৬। হাদীছ :—আবহুলাহ মুযানী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সতর্ক করিয়াছেন, মাগরেবের নামাযের নামে গ্রাম্য কাকেরদের ভাষা যেন তোমাদের উপর প্রবল না হইতে পারে, তাহারা মাগরেবকে এশা বলে।

ব্যাখ্যা :—এই হাদীছে বর্ণিত বিষয়টি স্থূল দৃষ্টিতে সাধারণ মনে হইতে পারে, কিন্তু পকাস্তরে এখানে একটি ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। মোসলমান জাতি একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ জাতি হিসাবে তাহাদের নিজস্ব তামাদুন, তাহাজীব বৈশিষ্ট্য সব কিছু আছে। তাহাদের চলাফেরা, খাওয়া দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি ব্যক্তিগত ও সমাজগত সব বিষয়সমূহই স্বতন্ত্র, এমনকি কথাবার্তার ভাষা পর্যন্ত স্বতন্ত্র। মোসলমানদের নামসমূহ অল্প জাতি হইতে ভিন্ন, এমনকি শুধু মানুষের নামই নয়, বস্তুসমূহের নামেও ঐ স্বাভাব্য অতি স্পষ্ট ও ব্যাপক। প্রত্যেকটি মোসলমানের পক্ষে জাতিস্ববোধ অপরিহার্য এবং এই জাতিস্ববোধের প্রথম সিঁড়ি হইল এই যে, মোসলমানদের মধ্যে (বিশেষতঃ কোরআন হাদীছের ইঙ্গিত) যে নাম, শব্দ বা প্রথা প্রচলিত আছে উহা যত সাধারণই মনে হউক না কেন, কখনও উহা পরিত্যাগ করিয়া বিজাতীয় বস্তু অবলম্বন করিবে না। যেমন, এই হাদীছে এবং মোসলেম শরীফে উল্লিখিত এই হাদীছেরই দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করুন—মোসলমানগণ সূর্য্যাস্তের পরের নামাযকে মাগবের ও তার পরের নামাযকে এশা বলিয়া থাকে। কোরআন শরীফেও এই দ্বিতীয় নামাযটি “এশা” নামেই উল্লেখ আছে, কিন্তু আরবের গ্রাম্য কাকেরদের ভাষায় মাগবেরকে এশা এবং এশাকে “আতামাহ” বলা হইত (মোসলেম শরীফ)। হযরত রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মোসলমানদিগকে সতর্ক করিয়াছেন—শব্দদার। বিজাতীয়দের ঐ নাম যেন তোমাদের মধ্যে প্রচলিত না হইতে পারে।*

শরীরত সামান্য বিষয়েও জাতিস্ববোধের শিক্ষা দেয় এবং আমাদেরই এই সমস্ত অমূল্য আদর্শসমূহ দ্বারা বিজাতীয়গণ কত উন্নতি করিতেছে, আর আমরা নিজেদের আদর্শ হারাওয়া বিজাতীয়দের প্রতি তাকাইয়া আছি। বর্তমান যমানায় “জল, লবণ” ইত্যাদি বহু বিজাতীয় শব্দ ব্যবহার করা এই হাদীছ অনুযায়ী অবাঞ্ছনীয় গণ্য হইবে।

এশার নামাযের ফজিলত

৩৪৭। হাদীছ :—আয়েশা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এশার নামায পড়িতে বিলম্ব করিলেন। রাত্রি অধিক হইয়া গেল, এখনও তিনি মসজিদে যান না, তাই ওমর (রা:) আসিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ (দ:)। শিশু ও নারীগণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে (অর্থাৎ এশার নামাযে আর কত বিলম্ব করিবেন?) তখন রসুলুল্লাহ (দ:) মসজিদে আসিলেন এবং (এত রাত্রি পর্যন্ত নামাযের জন্য অপেক্ষারত মুছল্লিগণকে ধন্যবাদ স্বরূপ বলিলেন, তোমরা (মুষ্টিমেয় কয়েকজন) ব্যতীত ছনিয়ার বৃকে এই সময় নামাযের অপেক্ষাকারী আর কেহ নাই; এই ফজিলতের

* পরবর্তী পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (র:) এশার নামাযকে “আতামাহ” বলার অবকাশ দেখাইয়াছেন। উহার উদ্দেশ্য শুধু এই যে, উহা হারাম পর্যায়ের নিবন্ধ নহে।

অধিকারী শুধু তোমরাই। কারণ, (একমাত্র মোসলমানই নামায পড়িবে এবং) তখন মদীনার বাহিরে ইসলাম প্রসারিত হয় নাই (আর মদীনার অল্প সব মসজিদে পূর্বেই নামায শেষ হইয়াছে।)

৩৪৮। হাদীছ :—আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এবং আমার সঙ্গীগণ যাহারা আবিসিনিয়া হইতে জাহাজ যোগে মদীনায় আসিয়াছিলাম নবী ছালামাহু আলাইহে অসাল্লামের বাসস্থান হইতে দূরে অবস্থান করিতাম। তাই আমরা দুই একজন করিয়া পালাক্রমে রসুল্লাহ ছালামাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির থাকিতাম। একদা আমি ও আমার কয়েকজন সঙ্গী তাঁহার খেদমতে পৌঁছিলাম, নবী (দঃ) কোন কাজে আবদ্ধ ছিলেন, তাই এশার নামায পড়িতে বিলম্ব হইল। নবী (দঃ) রাত্রি অধিক হইলে পর মসজিদে আসিলেন এবং নামাযান্তে সকলকে অপেক্ষা করিতে আদেশ করিয়া বলিলেন, তোমরা ধন্ববাদ ও মোবারাকবাদ গ্রহণ কর; তোমাদের উপর আল্লাহ অতি বড় নেয়ামত যে, তোমরা ব্যতীত অল্প কোন উম্মত এই সময় নামায পড়ে নাই। (এখনও ছনিয়ার বৃক্ষে এই সময় কেহ কোথাও নামায পড়িতেছে না)। আবু মুছা (রাঃ) বলেন, আমরা রসুল্লাহ ছালামাহু আলাইহে অসাল্লামের এই উক্তি শুনিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরিলাম।

বাখ্যা :—সেখ সা'দী (রঃ) খুবই সুন্দর পরামর্শ দিয়া বলিয়াছেন—

منك منه كذا خدمت سلطان همى كنى -

منك شناس كذا بخدمت او بداشت

“গর্ব করিও না যে, তুমি বাদশার খেদমতের সুযোগ পাইয়াছ। ইহা তাঁহারই দয়া ও মেহেরবানী যে, তিনি তোমাকে তাঁহার খেদমতের সুযোগ দান করিয়াছেন।”

বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এশার পূর্বে নিদ্রা যাইবে না

৩৪৯। হাদীছ :—আবু বরজা (রাঃ) বলিয়াছেন, রসুল্লাহ (দঃ) এশার নামাযের পূর্বে নিদ্রা যাওয়া ও পরে কথাবার্তায় লিপ্ত হওয়া অতিশয় নাপছন্দ করিতেন।

ঘুমের ভাবে বাধ্য হইলে এশার পূর্বে ঘুমাইতে পারে

একরূপ অবস্থায় এশার নামাযের পূর্বে ঘুমাইতে পারে, কিন্তু নামাযের ওয়াক্তের ভিতরে নিদ্রা ভঙ্গের সুব্যবস্থা অবশ্যই করিবে। ছাহাবী আবুহুলাহ ইবনে ওমর (রাঃ) একরূপ অবস্থায় এশার পূর্বে নিদ্রা যাইতেন, কিন্তু নামাযের ওয়াক্তের মধ্যে জাগ্রত করার জন্য লোক নিয়োগ করিতেন—এই ব্যবস্থা করিয়া প্রয়োজনে এশার পূর্বে নিদ্রা যাইতে তিনি দ্বিধা করিতেন না।

৩৫০। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ (দঃ) বিশেষ প্রয়োজনে লিপ্ত থাকায় এশার নামাযে অনেক বিলম্ব করিলেন। এমনকি আমরা বসা অবস্থায় মসজিদে ঘুমাইয়া পড়িলাম, একবার জাগিয়া পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িলাম। তারপর জাগ্রত হইলে হযরত নবী (দঃ) নামাযের জন্ত আসিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন এই সময় তোমরা ভিন্ন কেহ তুপুর্থে নামাযের অপেক্ষারত নাই। (অর্থাৎ যদিও তোমাদের কষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তোমরা এমন একটি ফজিলত পাইয়াছ যাহার একক অধিকারী তোমরাই।)

৩৫১। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) একদা এশার নামাযে অধিক বিলম্ব করিলেন, (মসজিদে উপস্থিত) লোকেরা (বসা অবস্থায়) বার বার ঘুমাইতে ও জাগ্রত হইতে লাগিল। তখন ওমর (রাঃ) যাইয়া হযরত (দঃ)কে নামাযের কথা বলিলেন। হযরত (দঃ) নামাযের জন্ত বাহির হইয়া আসিলেন। হযরত (দঃ) তখন গোছল করিয়া আসিভেছিলেন; তাঁহার মাথা হইতে পানি বাড়িতেছিল। তিনি বলিলেন, আমার উম্মতের কষ্ট হইবে এই আশঙ্কা না হইলে এশার নামায এই সময়েই পড়ার আদেশ করিতাম।

ব্যাখ্যা :—এশার নামাযের উত্তম সময় বিলম্বে তথা রাত্রির প্রথম তৃতীয়াংশের পরে হইত, যদি নবী (দঃ) সেই আদেশ করিতেন। কিন্তু হযরত (দঃ) উম্মতের কষ্টের লক্ষ্য করিয়া সেই আদেশ করেন নাই। হযরতের এবং ছাহাবীগণের আমল ও নীতি ইহাই ছিল যে, তাঁহারা রাত্রে তৃতীয়াংশের মধ্যে এশার নামায পড়িতেন।

৩৪৭ নং হাদীছ বর্ণনান্তে আয়েশা রাজিরাল্লাহু আনহা বলিয়াছেন—

وكانوا يملكون فيما ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول

“নবী (দঃ) এবং ছাহাবীগণ পশ্চিম আকাশের শুভ্রতা বিদূরিত হওয়ার পর রাত্রে প্রথম তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে এশার নামায পড়িয়া থাকিতেন।” সুতরাং এশার নামাযের উত্তম ওয়াক্ত তৃতীয়াংশের মধ্যেই থাকিবে। উহার পরের সময় এশার নামায পড়া নবী (দঃ) কর্তৃকই পরিত্যক্ত। (৮১ পৃঃ)

নেছায়ী শরীফে আছে, হযরত নবী (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, তোমরা রাত্রে তৃতীয়াংশের মধ্যে এশার নামায পড়িবে।

এশার নামাযের ওয়াক্ত মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত থাকে*

৩৫২। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে সসাল্লাম এশার নামায মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত বিলম্ব করিয়া পড়িলেন এবং নামাযান্তে বলিলেন, অজ্ঞাত বস্তীর লোকজন নামায পড়িয়াছে, তোমরা নামাযের অপেক্ষায় বসিয়া আছ।

* মধ্যরাত্রের পর ছোবহে-ছাদেক পর্য্যন্ত এশার ওয়াক্ত থাকে, কিন্তু উহা মকরুহ ওয়াক্ত।

স্মরণ রাখিও, যে পর্য্যন্ত তোমরা নামাযের অপেক্ষায় বসিয়া আছ সে পর্য্যন্ত তোমাংগকে নামাযরত গণ্য করা হইবে।

কজরের নামাযের কজিলত

৩৫৩। হাদীছ :—আবু মুছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যে ব্যক্তি ঠাণ্ডা সময়ের (আছর ও কজর) নামাযদ্বয় আদায়ে অভ্যস্ত হইবে, সে বেহেশতী হইবে।

ব্যাখ্যা :— হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ফরমান শিরোধার্য্য। কারণ, সাধারণতঃ দেখিবেন, যে ব্যক্তি এই নামাযদ্বয়ে অভ্যস্ত হয়, সে অল্প তিন ওয়াক্ত নামাযে অভ্যস্ত নিশ্চয় হয় এবং যে ব্যক্তি খাটিভাবে নামাযে অভ্যস্ত হয়, সে অগ্ন্যস্ত দিক দিয়াও শরীয়ত অনুসারী হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

“নামায মানুষকে অপকর্ম ও কুকর্ম হইতে বিরত রাখার সহায়ক। (২১ পাঃ ২ রঃ)

কজরের নামাযের ওয়াক্ত

৩৫৪। হাদীছ :—যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে সেহুরী খাওয়ার একটু পরেই কজরের নামাযে দাঁড়াইয়া গেলাম ; সেহুরী ও নামাযের মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ বা ষাট আয়াত পড়ার মত সময়ের ব্যবধান ছিল।

৩৫৫। হাদীছ :—ছাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার বাড়ী হইতে সেহুরী খাইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে কজরের নামায পড়িতে হইলে অতি দ্রুতবেগে আসিতে হইত।

(এখানে আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি ২৪৭ নম্বরে দেখুন)

যে কোন নামাযের এক রাকাত পড়ার মত সময় পাইলেই

ঐ নামায পূর্ণরূপে ফরজ হইয়া যাইবে

৩৫৬। হাদীছ :—আবু হোরাযরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—কোন ব্যক্তি যে কোন নামাযের মাত্র এক রাকাত পড়ার সময় পাইলেই ঐ নামায তাহার উপর ফরজ হইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা :—এই হাদীছের ব্যাখ্যার জন্ম ৪৩২ নম্বর হাদীছের ব্যাখ্যা দেখুন।

ফজরের নামায পড়ার পর সূর্য্য পূর্ণ উদিত হওয়ার পূর্বে

নফল নামায পড়া নিষেধ

৩৫৭। হাদীছ :—ওমর (রা:) বলিয়াছেন, নবী ছালামাহ আলাইহে অসাল্লাম দুই সময়ে নফল নামায পড়া নিষেধ করিয়াছেন—ফজরের নামাযের পরে, যাবৎ সূর্য্য পূর্ণ উদিত না হয় এবং আছরের নামাযের পরে, যাবৎ সূর্য্য পূর্ণ অস্ত না যায়।

৩৫৮। হাদীছ :—ইবনে ওমর (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছালামাহ আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যখন সূর্য্যের কিনারা উদিত হওয়া আরম্ভ হয় তখন নামায হইতে বিরত থাক, যাবৎ পূর্ণ উদিত না হয় এবং যখন সূর্য্যের কিনারা অস্ত যাইতে আরম্ভ করে তখন নামায হইতে বিরত থাক, যাবৎ সূর্য্য পূর্ণ অস্তমিত না হইয়া যায়।

৩৫৯। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লাম দুই প্রকার ক্রয়-বিক্রয় এবং দুই প্রকার পরিধান এবং দুই সময়ের নামায নিষিদ্ধ করিয়াছেন। ফজরের নামাযের পর সূর্য্য উদয় পর্য্যন্ত এবং আছরের নামাযের পর সূর্য্য অস্ত যাওয়া পর্য্যন্ত নামায পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। দুই হাত আবদ্ধ করিয়া চাদরে আবৃত করা হইতে এবং লুঙ্গি ইত্যাদি পরিধান করিয়া হাঁটুধরকে খাড়া করিয়া একরূপ অসাবধানভাবে বসা যে, তলদেশের কাপড় নীচে পড়িয়া ছতর উন্মুক্ত হইয়া যায়, একরূপ করিতেও নিষেধ করিয়াছেন। একে অন্তের প্রতি বিক্রয় দ্রব্য নিক্ষেপ করা অথবা একে অন্তকে ছোঁয়ার দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করিতে নিষেধ করিয়াছেন (ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ে ইহার বিবরণ আসিবে)।

আছরের নামায পড়ার পর নফল পড়া নিষিদ্ধ

৩৬০। হাদীছ :—মোয়াবিয়া (রা:) সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, তোমরা এমন একটি নামায পড়িয়া থাক যাহা আমরা রসূলুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লামকে পড়িতে দেখি নাই, বরং তিনি উহা পড়িতে নিষেধ করিতেন—আছরের পরে দুই রাকাত নফল নামায।

সূর্য্য উদয় ও অস্তের সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ

৩৬১। হাদীছ :—আবু সায়ীদ খুদরী (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—ফজর নামাযের পর সূর্য্য উপরে উঠিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত নামায পড়া নিষিদ্ধ এবং আছর নামাযের পর সূর্য্য অস্ত না যাওয়া পর্য্যন্ত নামায পড়া নিষিদ্ধ।

৩৬২। হাদীছ :—আবু হুলাইহ ইবনে ওমর (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, সূর্য্য উদয়ের সময় তোমরা নামাযের জন্ত উজ্জত হইও না এবং অস্তের সময়ও নামাযের জন্ত উজ্জত হইও না।

আছরের নামাযের পর কাযা নামায পড়া জায়েয

৩৬৩। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লাম দুইটি নামায কখনও ছাড়িতেন না। প্রকাশে বা গোপনে অবশ্যই উহা পড়িতেন—ফজরের পূর্বে দুই রাকাত ও আছরের পরে দুই রাকাত।*

৩৬৪। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী ছালামাহ আলাইহে অসাল্লাম যে দিনই আছরের পর আমার নিকট আসিতেন ২ রাকাত নামায পড়িতেন।

ব্যাখ্যা :— আছরের নামায পড়ার পরে নফল নামায পড়া নিষিদ্ধ বলিয়া হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে স্পষ্ট বর্ণনা আছে—যেমন পূর্বের পরিচ্ছেদে উল্লেখ হইয়াছে। কিন্তু আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত উল্লিখিত হাদীছদ্বয় হইতে বুঝা যায়, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আছরের পরে দুই রাকাত নামায পড়িতেন। ইমাম বোখারী (রঃ) ইহার মীমাংসা করিবার জন্য দুইটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। প্রথমতঃ আছরের পর দুই রাকাত নামায হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কাজা স্বরূপ পড়িতেন—জোহরের ফরজ পড়ার পর দুই রাকাত ছুন্নত পড়া হয়, একদিন হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এক বিশেষ কর্মব্যস্ততার দরুন ঐ ছুন্নত পড়িতে পারেন নাই তাই উহা আছরের পর কাজা স্বরূপ পড়িয়াছেন। তারপর অবশ্য তিনি উহা সর্বদাই পড়িতে থাকেন, কিন্তু উহার প্রথম সূচনা সূন্নতের কাজা স্বরূপই হইয়াছিল।† দ্বিতীয়তঃ—যে কোন কারণেই হউক আছরের পর সর্বদা এই দুই রাকাত নামায পড়াকে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজের জন্যই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন, অথচ কেহ ইহা অবলম্বন করুক তাহা তিনি চাহিতেন না, বরং নিষেধ করিয়াছেন। নিজের হাদীছদ্বয়ে উক্ত বিষয় দুইটির বয়ান রহিয়াছে।

৩৬৫। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ), মেছওয়ার (রাঃ) এবং আবছর রহমান (রাঃ) ছাহাবীত্রয় কোরায়েব নামক খাদেমকে এই বলিয়া আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট পাঠাইলেন যে, তাঁহার নিকট আমাদের সালাম বলিবে এবং আছরের পর দুই রাকাত নামামের বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে যে, শুনিতে পাইলাম আপনি ঐ নামায পড়িয়া থাকেন, অথচ আমাদের নিকট এরূপ প্রমাণ পৌঁছিয়াছে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ নামায পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, খলীফা ওমরের সহিত একমত হইয়া আমিও লোকদিগকে এই নামায হইতে বিরত রাখার জন্য শাস্তি দিয়া থাকিতাম।

* অবশ্য আছরের পরের দুই রাকাত সর্বদা গোপনেই পড়িতেন; যেমন ৩৬৬ নং হাদীছে আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন। উহা সকলে দেখিত না—যে রূপ ৩৬০ নং হাদীছে উল্লেখ আছে।

† আছরের নামাযের পর এরূপ সূন্নতের কাজা অথচ কেহ পড়িবে তাহা এক হাদীছে হযরত (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন। যেমন ছৌমে-বেছাল তথা দিবারাত্র মিলাইয়া একটানা একাধিক দিনের রোযা স্বয়ং হযরত (দঃ) রাখিতেন, অন্তের জন্য উহা নিষেধ করিয়াছেন, রাখিলে জুজ্ব হইয়াছেন। ফরজ কাজা নামায আছরের নামাযের পর সকলেই পড়িতে পারে।

(তাই এবিষয় পূর্ণ অনুসন্ধান চালান দরকার মনে করিলাম।) কোরায়েব বলেন—আমি আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং ছাহাবীত্রয়ের কথার পূর্ণ বিবরণ তাঁহাকে পৌঁছাইলাম। আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, এই বিষয়টি বিবি উম্মে-ছালামার নিকট জিজ্ঞাসা কর; (তিনিই উহার বিস্তারিত বিবরণ অবগত আছেন।) কোরায়েব ছাহাবী-ত্রয়ের অনুমতি লইয়া উম্মে-ছালামাহ রাজিয়াল্লাহু আনহার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই নামায (আছরের পর) হইতে নিষেধ করিতে শুনিতাম, একদা তাঁহাকে আছরের পর এই নামায পড়িতে দেখিলাম। তখন আমি কর্মব্যস্ত থাকায় আমার গৃহকমিনীর মারফত জিজ্ঞাসা করাইলাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ (দঃ)! আপনাকে এই নামায হইতে নিষেধ করিতে শুনিয়াছি, এখন আপনাকে উহা পড়িতে দেখি। নামাযান্তে হযরত (দঃ) আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি আছরের পর দুই রাকাত নামাযের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ? ঘটনা এই যে, আবদুল-কায়েছ গোত্রের একদল লোক আমার নিকট আসিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে লিপ্ততার পরিস্থিতি এমনই হইয়াছিল যে, জোহরের ফরজান্তে দুই রাকাত স্তব্ধ পড়িতে পারি নাই; ইহা সেই দুই রাকাত নামায।

৩৬৬। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (আছরের পর) দুই রাকাত নামায নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যত্নে পর্য্যন্ত কখনও ছাড়েন নাই, সর্বদাই তিনি উহা পড়িতেন; কিন্তু মসজিদে কখনও পড়িতেন না—এই আশঙ্কায় যে তাঁহার উন্নত একটি অতিরিক্ত কষ্টে পড়িয়া যাইবে। তিনি সর্বদাই খ্যৈ উন্নতের কষ্ট লাঘব করার প্রতি তৎপর থাকিতেন।

একদল লোকের নামায কাজা হইলে আজান ও জমাতে

সহিত ঐ কাজা নামায পড়িতে পারে

৩৬৭। হাদীছ :—আবু কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে কোন এক ছফরে ছিলাম। একদা সমস্ত রাত্রি ভ্রমণ করতঃ ক্রান্ত হইয়া শেষ রাত্রে কোন কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট বিশ্রামের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। হযরত বলিলেন, এখন আরাম করিলে ফজরের নামায কাজা হওয়ার আশঙ্কা আছে। বেলাল (রাঃ) আরজ করিলেন, (নামায কাজা হওয়ার আশঙ্কায় সকলে নিদ্রা ভঙ্গ করার প্রয়োজন নাই;) আপনারা আরাম করুন, (আমি বসিয়া থাকি;) নামাযের সময় আপনাদিগকে জাগাইয়া দিব। তখন সকলে ঘুমাইয়া পড়িলেন। বেলাল (রাঃ) ছোবহে-সাদেকের অপেক্ষায় পূর্বদিকে তাকাইয়া হেলান দিয়া বসিয়া রহিলেন। এ অবস্থায় তাঁহার চক্ষু বুজিয়া গেল, তিনিও নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়িলেন। (সকলেই নিদ্রামগ্ন, নামাযের সময় চলিয়া গেল।) যখন সূর্য উদিত হইতেছিল, তখন সর্বপ্রথম রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু

আলাইহে অসাল্লামের নিজা ভাঙ্গিলে তিনি বেলালকে ডাকিয়া বলিলেন—তোমার কর্তব্য তুমি কি করিলে? বেলাল (রাঃ) আরজ করিলেন, এমন অপ্রত্যাশিতরূপে নিজা আমার উপর জীবনে কখনও চাপে নাই। আমাদের সকলের আত্মাই নিজাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার হাতে চলিয়া গিয়াছিল। যখন তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে পুনরায় উহাকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। (অর্থাৎ—নামাযের জন্ত পূর্ণ সতর্কতা ও সর্বপ্রকার ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হইয়াছিল, এমনভাবে অপ্রত্যাশিত ও অনিচ্ছাকৃত নিজা “ওজর” রূপেই গণ্য হইবে।) তারপর রসুলুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লাম সকলকে বলিলেন, এইস্থানে শয়তানের আছর আছে, যদ্বন্ধন আমরা নামাযের ওয়াক্ত হইতে মাহরুম হইয়াছি। এখান হইতে সত্তর অস্ত্র যাইয়া সকলে অজু করিলে পর হযরত (দঃ) বলিলেন, হে বেলাল! লোকদিগকে একত্র করার জন্ত আজান দাও। তারপর যখন সূর্য্য সম্পূর্ণরূপে উদিত হইয়া লাল বর্ণ চলিয়া গেল তখন ঐ কাজা নামায সকলে জামাতে পড়িলেন।

৩৬৮। হাদীছ :- জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর (রাঃ) খন্দকের জেহাদরত অবস্থায় একদিন বিষম মনে রসুলুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া কাকেরদের প্রতি ভৎসনা আরম্ভ করিলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)। অস্ত্র (কাকের শত্রুদলের প্রতিরোধে লিপ্ত থাকার) আমি সূর্য্যাস্তের পূর্বে আছরের নামায পড়ার সুযোগ করিতে পারি নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমরাও পড়িতে পারি নাই। সেমতে সূর্য্যাস্তের পরে আমরা সকলে ময়দানে একত্রিত হইয়া অজু করিলাম এবং প্রথমে (কাজা) আছরের পড়িলাম, তারপর মাগরেবের নামায আদায় করিলাম।

মছআলাহ :- কোন ব্যক্তির ছয় ওয়াক্তের কম নামায কাজা হইলে ঐ কাজা নামায যথাক্রমে প্রথমে পড়িয়া তারপর উপস্থিত ওয়াক্তের নামায পড়িতে হইবে; অস্থায়ী উপস্থিত ওয়াক্তের নামায শুদ্ধ হইবে না। অবশ্য যদি কারণ বশতঃ উপস্থিত নামায এমন সময় পড়িতে উত্তম হয় যখন কাজা নামায পড়িতে গেলে উপস্থিত নামামের ওয়াক্ত চলিয়া যাইবে তবে সে ক্ষেত্রে উপস্থিত নামাযই প্রথমে পড়িবে। কাজা নামাযের কথা ভুলিয়া উপস্থিত নামায পড়িলে তাহাও শুদ্ধ হইবে। ছয় ওয়াক্ত বা ততোধিক নামায কাজা হইলে সে ক্ষেত্রে এই বাধ্য-ব্যধকতা নাই। উক্ত হাদীছের উপরই বোখারী (রঃ) এই মছআলাহটিও উল্লেখ করিয়াছেন।

মছআলাহ :- কতিপয় নামায কাজা হইলে সেই নামায আদায় করিতে উহাদের মধ্যেও তরতীব তথা আগ-পাছের লক্ষ্য রাধিতে হইবে। আগের ওয়াক্ত আগে এবং পরের ওয়াক্ত পরে পড়িতে হইবে অস্থায়ী সেই আদায় শুদ্ধ হইবে না।

† মানুষের দেহের সঙ্গে তাহার রূহের দুই প্রকার সংযোগ আছে—একটি দ্বারা মানুষ জীবিত থাকে, যত্নের সময় উহা বিচ্ছিন্ন হয়; অপরটি দ্বারা মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয় পরিচালিত হইয়া থাকে, নিজাবস্থায় উহাই ছিন্ন হয় এবং ক্ষান্ত হইলে উহা পুনঃ স্থাপিত হয়।

সে পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ জনকে লইয়া যাও। রসুলুল্লাহ (স:) একাই দশজনকে লইয়া গেলেন। (আবু হুর রহমান বলেন,) আমাদের ঘরে আমি, আমার স্ত্রী, আমার মা এবং বাবা আবু বকর ছিলেন, এবং সকলের জন্ত একটি মাত্র চাকর ছিল। (রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আহ্বানে সাড়া দিয়া) আমার পিতাও কয়েকজন মেহমান আমাদের বাড়ীতে লইয়া আসিলেন এবং আমাকে হুকুম করিলেন—তুমি এই মেহমানদের খেদমত-গোজারী করিও, আমি রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট যাইতেছি। আমার জন্ত কোনরূপ অপেক্ষা না করিয়া মেহমানদের খাওয়া শেষ করিয়া ফেলিও। এই বলিয়া আবু বকর (রা:) চলিয়া গেলেন এবং রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অনেক সময় কাটাইলেন, এমনকি সেখানেই তিনি খাওয়া-দাওয়া করিয়া এশার নামায পড়িলেন। তারপর যখন নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ঘুমের সময় হইল তখন আবু বকর (রা:) বাড়ী ফিরিলেন। এদিকে আমি পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী মেহমানদের থানা উপস্থিত করিয়া তাঁহাদিগকে খাওয়ার জন্ত অহরোধ জানাইলে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়ীওয়ালা—মেজবান কোথায়? আমি অহরোধ করিলাম আপনারা খাওয়া-দাওয়া করিয়া লউন। তাঁহারা বলিলেন, তিনি না আসা পর্যন্ত আমরা থাইব না। আমি বলিলাম, তিনি আসিয়া যদি দেখেন আপনাদের খাওয়া হয় নাই তবে তিনি আমার প্রতি অভ্যর্থিক রাগান্বিত হইবেন। এত করিয়া বলা সত্ত্বেও তাঁহারা থাইতে স্বীকৃত হইলেন না। আমার পিতা আবু বকর (রা:) যখন বাড়ী আসিলেন তখন আমি ভয়ে দালাইয়া রহিলাম। আমার মাতা তাঁহাকে বলিলেন, মেহমানদিগকে ছাড়িয়া এত রাত্রি কিরূপে কাটাইলেন? তিনি আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এখনও কি মেহমানদের খাওয়া-দাওয়া হয় নাই? না বলিলেন, আমরা খাবার দিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি না আসা পর্যন্ত তাঁহারা থাইতে সম্মত হন নাই। তিনি ভীষণ রাগান্বিত হইয়া আমাকে পাছী বলিয়া ডাকিলেন এবং নানারূপ ভৎসনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি চুপ করিয়া পলাইয়া রহিলাম। তিনি আমাকে কয়েকবার ডাকিয়া অবশেষে বলিলেন—নতুন উপস্থিত হও, নতুবা ভাল হইবে না। তখন আমি উপস্থিত হইলাম এবং বলিলাম, আপনি মেহমানদিগকে জিজ্ঞাসা করুন! তাঁহারা বলিলেন, এই বেচারী ঠিকই বলিতেছে—ইহার কোন দোষ নাই; আমাদের জন্ত খাবার উপস্থিত করিয়াছিল, কিন্তু আমরা থাইতে স্বীকার করি নাই। তখন আমার পিতা বলিলেন, আপনারা থাইয়া লউন, কসম খোদার—আমি এই রাত্রি থাইব না। তখন মেহমানগণও শপথ করিয়া বসিলেন যে, আপনি না থাইলে আমরাও থাইব না। তখন আবু বকর একটু স্থিরতার মধ্যে আসিয়া বলিলেন, আজ রাত্রের স্থায় একরূপ ছর্ঘটনা আর ঘটে নাই; আপনারা কেন খাবার গ্রহণ করিবেন না? এই বলিয়া খাবার উপস্থিত করিবার আদেশ করিলেন এবং বলিলেন,

হাল-অবস্থা এই ধরনের হওয়া চাই। ● এশার নামাযের জমাত অনুষ্ঠানে মুছল্লীদের সমাগমের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্র-পশ্চাৎ করা সুন্নত (৭৪৪ হাদীছ)। মেঘাচ্ছন্ন দিনে সতর্কতামূলকভাবে নামায অপেক্ষাকৃত নীচ পড়িবে (৩৩৯ হাদীছ)। যাহাতে অজ্ঞাতে নামাযের ওয়াক্ত ছুটিয়া না যায়।

আজানের বিবরণ

মোসলমানদের মধ্যে আজানের প্রচলন

আজানের আলোচনা পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে। যথা, আল্লাহ বলেন—

إِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا تَذْكَرًا وَلَعِبًا.....

“(হে মোসলমানগণ। দেখ—কাকেররা তোমাদের কত বড় ঘোর শত্রু;) যখন তোমরা নামাযের প্রতি আহ্বান জানাও (অর্থাৎ আজান দাও) তখন তাহারা উহাকে লইয়া ঠাট্টা-বিজ্ঞপ ও হাসি-তামাশা করিয়া থাকে। কারণ, তাহারা জ্ঞানশূন্য সম্প্রদায়। (নতুবা স্বীয় পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, জীবনদাতা আল্লাহর দিকে আহ্বানকে লইয়া কখনও এরূপ করিত না।) (৬ পারা ১৩ রুকু)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ

“জুমার দিন যখন তোমাদিগকে জুমার নামাযের জম্বা ডাকা (অর্থাৎ আজান দেওয়া) হয় তখন তোমরা সমস্ত কাজ-কর্ম ছাড়িয়া আল্লাহর জেকর অর্থাৎ নামাযের দিকে ধাবিত হও।” (২৮ পারা ছুরা জুনা)

৩৭১। হাদীছ :—আনাছ (রা:) হইতে বর্ণিত আছে—মদীনায মোসলমানদের সংখ্যা বর্ধিত হইলে নামাযের সময় জ্ঞাত করার আলোচনা হইল; তখন ছাহাবীগণ উচ্চস্থানে অগ্নি জ্বালাইবার বা “নাকুস”^৫ বাজাইবার প্রস্তাব করিলেন। কেহ কেহ এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিলেন যে, এই সব ত ইহুদ-নাছারাদের প্রথা। তাই এই সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইল। তারপর (আজান একামতের প্রথা সাব্যস্ত হইলে) রসুলুল্লাহ (স:) বেলাল (রা:)কে

৫ স্কুল, কলেজে কাঁশার তৈরী গোল আকারের ঘণ্টা হাতুড়ী দ্বারা পিটাইয়া বাজান হয়। প্রাচীনকালে লম্বা আকারের কাঠ দ্বারা ঘণ্টা তৈরী হইত। ছোট আর একটি কাঠ দ্বারা পিটাইলে তাহাতে শব্দ হইত উহাই “নাকুস” : নাছারারা গির্জায় উহা ব্যবহার করিত।

আদেশ করিলেন—আজ্ঞানের বাক্যগুলি দুই দুই বারে এবং একামতের বাক্যগুলি এক এক বার বলিবার জ্ঞাত। কিন্তু কাদকানাতিচ্ছালাহ বাক্যটি একামতের মধ্যে দুই বারেই বলিবে।

ব্যাখ্যা :—হানকী মজহান মতে একামতের বাক্যগুলি সংখ্যায় আজ্ঞানের সমানই থাকিবে, তত্পতি “কাদকানাতিচ্ছালাহ বাক্যটি হইবে, কিন্তু যে সব বাক্য দুই দুই বার রহিয়াছে আজ্ঞানের মধ্যে উহার প্রত্যেকবার পৃথক পৃথক খাশে বলিতে হইবে এবং একামতের মধ্যে উহার দুই দুই বারকে মিলাইয়া এক সঙ্গে বলিতে হইবে। ফেকাহ শাস্ত্রে প্রথম পদ্ধতিকে “তারাজ্জোল” বলা হয় যাহা আজ্ঞানের মধ্যে স্মরণ। এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিকে “হদর” বলা হয় যাহা একামতের মধ্যে স্মরণ।

৩৭২। **হাদীছ :**— ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোসলমানগণ (মকায় থাকাকালে প্রকাশে ও জমাতে নামায পড়ার কোনরূপ ব্যবস্থাই করিতে পারিত না।) মদীনায় আসার পর তাঁহারা পূর্ণ উচ্চমে জমাতের সহিত মসজিদে নামায পড়ার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তখন নামাযের প্রতি আহ্বান জানাইবার কোনও সুনিদিষ্ট ব্যবস্থা ছিল না; প্রত্যেকেই নিজ নিজ আন্দাজ মত মসজিদে উপস্থিত হইতেন। এইরূপে সকলে একত্রিত হইলে পর কোন সময় নামায আরম্ভ করা হইবে তাহা পরামর্শ করিতেন; প্রত্যেক ওয়াক্তের জ্ঞানই এরূপ করিতে হইত। একদা তাঁহারা এ বিষয়ে আলোচনা করিলেন যে, সর্বসাধারণকে নামাযের সময় জ্ঞাত করাইবার জন্ত কোনও বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক, নতুবা ইহাতে সকলেরই অসুবিধা হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলিলেন, নাছারাদের ছায় নাকুস বাজান হউক; কাহারও মত হইল, ইহুদীদের ছায় শিঙ্গা বাজান হউক। ওমর (রাঃ) এই পরামর্শ দিলেন যে, কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করা হউক, সে নামাযের সময় হইলে লোকদিগকে নামাযের জ্ঞাত আহ্বান করিবে। এই পরামর্শই সাময়িকভাবে গৃহীত হইল। রসূলুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লাম বেলাল (রাঃ)কে এই কার্যের আদেশ করিলেন।

ব্যাখ্যা :—নামাযের সময় সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করাইবার কোনও নির্দিষ্ট পন্থা বা ব্যবস্থা পূর্ণরূপে তখনও গৃহীত হইয়াছিল না; ঠিক এমনই সময়ে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে আজ্ঞান ও একামতের প্রতি একটি আশাতীত ইঙ্গিত আসিল, তাহার নিস্তারিত বিবরণ আবু দাউদ শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

আবুহুলাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) ছাহাবী বর্ণনা করেন—যখন নামাযের প্রতি লোকদিগকে একত্রিত করার জন্ত কোন পন্থা অবলম্বনের আলোচনা হইতেছিল এবং এই প্রস্তাবও উপস্থাপিত হইয়াছিল যে, একটি নাকুস তৈরী করা হউক, উহা বাজাইয়া লোকদিগকে সমবেত করা হইবে। তখনকার এক রাত্রে ঘটনা এই যে, আমি নিদ্রিত অবস্থায় ছিলাম। স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম—এক ব্যক্তি আমার নিকট ঘুরাফেরা করিতেছে, তাহার হাতে একটি নাকুস আছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ বন্দা! তুমি কি এ

নাকুসটি বিক্রি করিবে? সে আমাকে প্রশ্ন করিল, আপনি ইহা দ্বারা কি করিবেন? আমি বলিলাম, ইহা বাজাইয়া লোকদিগকে নামাযের জন্ত আহ্বান জানাইব। সে বলিল, এই কাজের জন্য আমি নাকুস বাজানো অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট একটি ব্যবস্থা শিক্ষা দিব কি? আমি বলিলাম—হাঁ, নিশ্চয়। সে বলিল, আপনি উচ্চৈঃস্বরে বলিবেন—

الله اكبر وكذا الاقامة আজাহ আকবার আজাহ আকবার এইরূপে আমাকে আজানের সমস্ত বাক্যগুলি পূর্ণরূপে শুধাইল এবং তারপর একামতও তদ্রূপই শিক্ষা দিল। সকাল বেলা নিজা হইতে উঠিয়া আমি রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং আমার স্বপ্নের ঘটনা পূর্ণ ব্যক্ত করিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, ইনশা-আল্লাহ ইহা নিশ্চয়ই খাতি সত্য স্বপ্ন; তুমি বেলালের সঙ্গে দাঁড়াইয়া তাহাকে এই বাক্যগুলি শিক্ষা দাও, সে এইরূপে আজান দিবে। কারণ, বেলালের স্বর তোমার চেয়ে উচ্চ। তখন আমি তাহাই করিলাম; বেলাল আজান দিতে লাগিল। এদিকে ওমর (রাঃ) তাহার বাসস্থান হইতে দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, অবিকল এই স্বপ্ন আমিও দেখিয়াছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) তখন আল্লার শোক্‌রিয়া আদায় করিলেন (যে, আল্লাহ তাহালা অতি সহজে একটি জরুরী বিষয়ে মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন এবং সুন্দর ব্যবস্থা শিক্ষাদান করিয়াছেন।)

আজানের কজিলত

৩৭৩। হাদীছঃ—আবু হোরায়ারা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছালাল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন নামাযের আজান দেওয়া হয় তখন শয়তান বায়ু ছাড়িতে ছাড়িতে দৌড়িয়া বহু দূরে চলিয়া যায়, যেন আজানের আওয়াজ তাহার কানে প্রবেশ না করে। আজান শেষ হইলে লোকালয়ে ফিরিয়া আসে। যখন একামত বলা হয় তখনও ঐরূপে দৌড়িয়া পালায়। একামত শেষ হইলে পুনরায় আসিয়া নামাযরত ব্যক্তিদের মনে নানা অছওয়াছাহ সৃষ্টি করে। তাহাদের দেলে এদিক-সেদিক হইতে নানা কথা টানিয়া আনিতে থাকে—যে সমস্ত কথা তাহাদের স্মরণেও ছিল না। এইরূপে শয়তান নামাযী ব্যক্তিকে নানা কথার ফেলিয়া তাহার নামায ভুলাইয়া ফেলে। এমনকি কত রাকাত পড়িয়াছে তাহাও স্মরণ থাকে না।

উচ্চৈঃস্বরে আজান দেওয়া উচিত

খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) মোয়াজ্জেনদিগকে বলিতেন, সাদাসিধা আজান দিবে, নতুবা এই পদ ছাড়িয়া চলিয়া যাও। অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে আজান দিবে; কিন্তু আজান হইবে অতি সাদা ভাবের, উহাতে কোন প্রকার কৃত্রিম সুন্দর স্বর বানাইবার প্রয়োজন নাই।

৩৭৪। হাদীছ :—আবু সায়ীদ খুদরী (রা:) একজন লোককে বলিলেন, তোমাকে দেখি—তুমি বন-জঙ্গলে বকরি চরাইয়া বেড়াইতে ভালবাস। যখন তুমি এ অবস্থায় বন-জঙ্গলে থাক এবং আজান দেও (যদিও লোকালয় হইতে বহু দূরে, তথাপি) তখন সাধ্যানুযায়ী উচ্চৈঃস্বরে আজান দিবে। কেননা, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে শুনিয়াছি, মোয়াজ্জেনের সাগাশ আওয়াজও যে কোন মানুষ, যিনি, পুত্র-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, গাছ-পালা তরুলতা ইত্যাদি শুনিবে, সকলেই কেসামতের ভীষণ দিনে আজানদাতার পক্ষে (আজানের বাক্যাবলীর কর্ম অনুযায়ী ঈমানদার হওয়ার) সাক্ষ্য দান করিবে।

বস্তী হইতে আজান শুনা গেলে তথায় আক্রমণ করিবে না

৩৭৫। হাদীছ :—আনাছ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী (স:) যখন আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া কোন বস্তীর দিকে জেহাদ করিতে যাইতেন, ভোর না হওয়া পর্য্যন্ত উহার উপর আক্রমণ চালাইতেন না। ভোর হইলে লক্ষ্য করিতেন—যদি ঐ বস্তী হইতে আজানের শব্দ শুনিতে পাইতেন তবে আর আক্রমণ করিতেন না। যদি আজানের শব্দ না পাইতেন তবে আক্রমণ চালাইতেন। যেমন, আমরা খয়বরের জেহাদের জন্য রওয়ানা হইলাম; রাত্রিকালে উহার নিকটবর্তী পৌঁছিলাম; ভোরে যখন সেখান হইতে আজানের শব্দ শুনা গেল না, তখন আক্রমণ চালাইবার জন্য রসুলুল্লাহ (স:) যানবাহনে আরোহণ করিলেন। আমি আমার মাতার স্বামী আবু তাবুহা ছাহাবীর সঙ্গে একই বাহনে আরোহণ করিলাম। আমরা খয়বর নগরীতে ঢুকিয়া পড়িলাম। নগরবাসীরা প্রভাতে কৃষিকার্যের যন্ত্রপাতি লইয়া বাহির হইল, তাহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে দেখিয়া চীৎকার করিতে লাগিল—“মোহাম্মদ ও তাহার সৈন্যদল আসিয়া পড়িয়াছে।” রসুলুল্লাহ (স:) তাহাদিগকে দেখা মাত্রই না’রায়ে তরবীর ও “খয়বর ধ্বংস হউক” ধ্বনি দিলেন এবং কোরআন শরীফের এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ نَسَاءً مَّبَاحٍ الْمُنْذَرِينَ -

“আমরা—মোসলমানগণ কোন বস্তী আক্রমণে উপস্থিত হইলে ঐ বস্তিবাসীর পরাজয় অনিবার্য।”

আজানের শব্দ শুনিয়া কি বলিবে

৩৭৬। হাদীছ :— আবু সায়ীদ (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম করমাইয়াছেন—আজানের শব্দ যখন তোমরা শুনিতে পাও তখন মোয়াজ্জেনের সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও ঐ শব্দগুলি উচ্চারণ কর।

৩৭৭। হাদীছ :— একজন ছাহাবী আজানের “হাইয়া আলাহুছালাহ” শুনিয়া “লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ” বলিলেন এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে এরূপ শুনিয়াছেন বলিয়া উক্তি করিলেন।

আজান শুনিয়া কি দোয়া পড়িবে ?

৩৭৮। হাদীছ :—বাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন—

أَلَهُمْ رَبُّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الدَّائِمَةِ وَالْمَلَوَةِ الْقَائِمَةِ أَتِ مُحَمَّدٌ الْوَسِيلَةَ
وَالْفَهْلَةَ (وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ) وَابْعَثْهُ مَقَامًا مُمْتَوَدًا بِالنَّبِيِّ
وَمَدَنِيَّةٍ (إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ) +

যে ব্যক্তি আজনে শুনিয়া এই দোয়া পড়িবে, সে কেয়ামতে আমার শাফায়াতের
অধিকারী হইবে।

আজান দেওয়ার ফজিলত

৩৭৯। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ইল্লাল্লাহ
আলাইহে অসালাম ফরমাইয়াছেন, মানুষ যদি জানিত আজান দেওয়ার মাহাত্ম্য ও ফজিলত
কি তবে লটারি করিয়া হইলেও আজান দেওয়ার সুযোগ সন্ধানী হইত। জোহরের
নামায জমাতে পড়ার ফজিলত জানিতে পারিলে উহার প্রতি ছুটিয়া আসিত এবং এশা
ও ফজরের নামাযের জম্ম মসজিদে আসিবার মর্তবা জানিতে পারিলে হামাগুড়ি দিয়া
হইলোও এই সময় মসজিদে উপস্থিত হইত।

ছাহাবীদের যুগে একবার ঘটনা ঘটয়াছিল যে, আজান দেওয়ার প্রার্থী অনেক হইল।
এমনকি, উপস্থিত ছাহাবী সাযাদ (রাঃ) তাঁহাদের মধ্যে লটারি করিতে বাধ্য হইলেন।

আজানের মধ্যে কথা বলা

বোখারী (রাঃ) উল্লেখ করিয়াছেন, সোলয়মান ইবনে ছোরাদ তাবেরী (রাঃ) একদা
আজানের মধ্যে কথা বলিয়াছেন। (হয় ত বিশেষ প্রয়োজনে সামান্য কথা হইবে।)

হাসান বছরী (রাঃ) বলিয়াছেন, হাসিলে আজান বা একামত ভঙ্গ হইবে না।

মহুআলাহ :— আজান বা একামতের মধ্যে সামান্য কথা বলাও মকরুহ, এমনকি
যদিও উহা উত্তম কথা হয়। যেমন, সালাম করা বা আলহামছ-লিল্লাহ ইত্যাদি। আর

১* এই দোয়ার বক্তার মধ্যবর্তী শব্দগুলি বোখারী শরীফ ভিন্ন অল্প হাদীছে উল্লেখ আছে,
দোয়াটির অর্থ এই :—হে খোদা ! এই চরনোৎকর্ষ পরিপূর্ণ আহ্বানের ও তৎপরবর্তী নামাযের
মালিক—তুমি (আমাদের প্রিয় নবী) মোহাম্মদ (সঃ)কে বেহেশতের এই বিশিষ্ট স্থানটি দান কর
যাহা একমাত্র তাঁহারই অঙ্গ বিশেষ ভাবে তৈরী হইয়াছে এবং তাঁহাকে শীর্ষস্থানের অধিকারী কর
এবং এই মর্যাদাপূর্ণ পদ দান কর, যেই পদের অধিকারী সমস্ত মখলুকার প্রাণসমভাজন হইবে,
এ বিষয়ে তুমি নিজেই অঙ্গীকারবদ্ধ। তুমি কখনও অঙ্গীকার ভঙ্গ কর না।

কথার পরিমাণ বেশী হইলে আজান ও একামত ফাছেদ হইয়া যায়! ঐরূপ আজান বা একামত দোহরাইতে হইবে (ফয়জুল-বারী ২—১৬৯)।

কেহ সগর বলিয়া দিলে অন্ধ ব্যক্তি আজান দিতে পারে

৩৮০। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রশূলুল্লাহ (সঃ) ছাহাবীগণকে বলিতেন—বেলাল শেষ রাতে (তাহাজ্জুদের নামাযের আজান দিয়া থাকে, তাই রোযার সময় বেলালের আজান শুনিয়া পানাহার বন্ধ করিও না, যাবৎ ইবনে-উম্মে-মাকতুমের আজান না হয়। ইবনে-উম্মে-মাকতুম একজন অন্ধ ছাহাবী ছিলেন, তিনি ফজরের আজান দিয়া থাকিতেন। কোন ব্যক্তি যখন তাহাকে পবর দিত, ভোর হইয়াছে তখন তিনি আজান দিতেন।

ব্যাখ্যা :—রশূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় তাহার মসজিদে ফজরের পূর্বে রাত্রির শেষ ভাগে তাহাজ্জুদ নামাযের আজান দেওয়া হইত; এই উদ্দেশ্যে যে, যাহারা এখনও শুইয়া আছেন তাহারা সত্বর উঠিয়া কিছু তাহাজ্জুদ পড়িয়া লউন, ভোর হইতেছে। তাহাজ্জুদের এই আজান সাধারণতঃ বেলাল (রাঃ) দিয়া থাকিতেন। রোযার সময় ছেহুরী খাইতে তাহাজ্জুদের আজান দ্বারা যেন বিভ্রান্তি না হয়, সেই জঙ্গ-রশূলুল্লাহ (সঃ) সকলকে সতর্ক করিয়াছেন।

ইমান বোখারী (রাঃ) এই হাদীছ দ্বারা আর একটি মহআলাহ প্রমাণ করিয়াছেন যে, ফজরের আজান ছোবহে-সাদেকের পূর্বে দেওয়া যায় না। কারণ, এই হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ছোবহে-সাদেকের পূর্বের আজান তাহাজ্জুদের আজান হইয়া থাকে। ঐ আজান ফজরের জঙ্গ যথেষ্ট নহে, ফজরের জঙ্গ পুনরায় ছোবহে-সাদেকের পর আজান দিতে হইবে।

আজান ও একামতের ব্যবধানের পরিমাণ

আজান ও একামতের মধ্যে কি পরিমাণ সময়ের ব্যবধান হওয়া চাই সে সম্পর্কে শরীয়তে পূর্ণ নির্দ্ধারিত কোন পরিমাণের বাধ্যবাধকতা নাই। বোখারী (রাঃ)ও কোন নির্দ্ধারিত পরিমাণ উল্লেখ করেন নাই। আজান ও একামতের মধ্যে নামায পড়ার আদেশ বর্ণিত ৩৮২ নং হাদীছটি বর্ণনা করিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, আজান ও একামতের মধ্যে ব্যবধান হওয়া চাই।

তিরমিজী শরীফে জায়ের (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীছে আছে, নবী (সঃ) বেলাল (রাঃ)কে আদেশ করিয়াছিলেন—আজান ও একামতের মধ্যবর্তী এই পরিমাণ সময়ের ব্যবধান রাখিও যাহাতে পানাহারে লিপ্ত ব্যক্তি পানাহার হইতে এবং মলমূত্র ত্যাগকারী তাহার প্রয়োজন হইতে অবসর হইয়া নামাযের জামাতে শামিল হইতে পারে।

অবশ্য মগরেবের আজ্ঞান ও একামতের বিষয়টি উল্লিখিত হাদীছের মর্ম হইতে ভিন্ন। কারণ, আনাছ (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীছ যাহা ইমাম বোখারী (রঃ) এই পরিচ্ছেদেও উল্লেখ করিয়াছেন, হাদীছটির অনুবাদ “অচ্ছাত সুন্নত নামায” পরিচ্ছেদে হইবে, উক্ত হাদীছে উল্লেখ আছে, “মগরেবের নামাযের আজ্ঞান ও একামতের মধ্যে অতি সামান্য ব্যবধান হইত।”

উক্ত হাদীছে যে উল্লেখ আছে—“কিছু সংখ্যক ছাহাবী মগরেব নামাযের ফরজের পূর্বে দুই রাকাত নফল নামায পড়িতেন” সে সম্পর্কে বলা হয়, আজ্ঞান আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে তাহারা উহা আরম্ভ করিতেন। (ফতুল্ল-বারী, ২—৮৫)

এ সম্পর্কে ফেকাহশাজের বিবরণ এইরূপ—আজ্ঞান ও একামতের মধ্যে ব্যবধান না রাখিয়া লাগালাগি আদায় করা সর্বসম্মতরূপে মকরুহ। উভয়ের মধ্যে এই পরিমাণ ব্যবধান বাঞ্ছনীয় যাহাতে সর্বদার মোক্তাদীগণ উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু মগরেবের নামাযে আজ্ঞান ও একামতের মধ্যে শুধু এতটুকু ব্যবধান রাখিবে যাহাতে কোরআন শরীফের ছোট ছোট তিনটি আয়াত তেলাওয়াত করা যায়। (শামী, ১—৩৬২)

আজ্ঞানের পর ঘরে থাকিয়া একামতের অপেক্ষা করা যায়

৩৮১। হাদীছ :— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অভ্যাস ছিল—ফজর নামাযের ওরাক্তে মোয়াজ্জেন আজ্ঞান দিয়া কাস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়াইতেন এবং ছোবহে-সাদেকের পরে ফজরের পূর্বেকার সংক্ষিপ্ত দুই রাকাত (সুন্নত) নামায পড়িতেন। তারপর মোয়াজ্জেন কর্তৃক একামতের জ্ঞাত তাহার নিকট না আসা পর্যন্ত তিনি ডান কাতের উপর আরাম করিয়া থাকিতেন।

ব্যাখ্যা :—হযরত (দঃ) ফজরের আজ্ঞানের পর পরই দুই রাকাত সুন্নত পড়িয়া নিতেন। অতঃপর ডান কাতে শুইতেন, কিন্তু এই শোয়া তাহার নির্ধারিত অভ্যাস ছিল না। “ফজরের সুন্নতের পরে কথাবার্তা বলা বা আরাম করা” পরিচ্ছেদের হাদীছে আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত (দঃ) ফজরের সুন্নত পড়ার পর যদি আমি জাগ্রত থাকিতাম তবে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেন, আমি জাগ্রত না থাকিলে ডান কাতের উপর আরাম করিতেন। তত্বে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই শরন মসজিদের মধ্যে কখনও হয় নাই।

প্রত্যেক আজ্ঞান ও একামতের মধ্যে নফল পড়া ভাল

যে সমস্ত নামাযে ফরজের পূর্বে সুন্নত-মোয়াকাদা আছে—যেমন ফজর, জোহর ও জমা এই কেত্রে ত আজ্ঞান ও একামতের মধ্যে নামায নির্ধারিত আছে। এতদ্বিষয় যে মোয়াজ্জের পূর্বে কোন সুন্নত-মোয়াকাদা নাই : যেমন আছর ও এশা এই নামাযেও

ক্ষমার পূর্বে কিছু নফল নামায পড়া ভাল। মগরেবের ওয়াস্তে এই হুকুম পালনে কয়েকটি বাধাবিধ আছে বলিয়া ইমানগণের একটু মতভেদ আছে, ইহার বিবরণ “অফ্রায মুন্নত নামায” পরিচ্ছেদে আসিবে।

৩৮২। হাদীছ :— আবুল্লাহ ইবনে মোগাক্কাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক আজান ও একামতের মধ্যবর্তী কিছু নামায পড়া উচিত। এই কথাটি পুনঃ পুনঃ তিনবার বলিয়া তৃতীয়বার বলিলেন, ইহা ইচ্ছাধীন। (অর্থাৎ মুন্নত-মোয়াক্কাদা নয়, কিন্তু পড়া ভাল।)

ছফরেও আজান দিয়া জামাতে নামায পড়া উচিত

৩৮৩। হাদীছ :—মালেক ইবনে হোয়াইরেছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা এক গোত্রের কতিপয় লোক নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলাম, তথায় আগরা বিশ দিন কাটাইলাম। নবী (দঃ) বড়ই দয়ালু ও কোমল হৃদয়ের ছিলেন। তিনি অনুভব করিতে পারিলেন যে, আমরা পরিবার-পরিজনদের প্রতি আগ্রহাঘিত হইয়া পড়িয়াছি; তখন তিনি নিজেই বলিলেন, তোমরা বাড়ী ফিরিয়া যাও। সেখানে লোক-দিগকে দীন শিক্ষা দিও, নামাযের পাবন্দি করিও এবং আমাকে যেরূপ নামায পড়িতে দেখিয়াছ সেইভাবে নামায পড়িও। সর্বাবস্থায় নামাযের সময় উপস্থিত হইলেই একজনে আজান দিও এবং সর্বাধিক উপযুক্ত বা বয়স্ক ব্যক্তিকে ইমাম বানাইয়া নামায আদায় করিও।

৩৮৪। হাদীছ :— মালেক ইবনে হোয়াইরেছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, দুই ব্যক্তি সফরে যাওয়ার জন্ত প্রস্তুত হইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল। হযরত (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন—তোমরা সফরে বাহির হইলে পর যখন নামাযের ওয়াস্ত হইবে তখন যে কোন একজন আজান ও একামত বলিবে এবং যে বেশী উপযুক্ত বা বেশী বয়স্ক তাহাকে ইমাম বানাইয়া জামাতে নামায আদায় করিবে।

৩৮৫। হাদীছ :—ইবনে ওমর (রাঃ) এফদা তুফান ও ভয়ঙ্কর শীতের রাত্রে নামাযের আজান দিলেন; আজান শেষে ইহাও বলিলেন যে, সকলে নিজ নিজ স্থানেই নামায পড়ুন। অতঃপর তিনি বর্ণনা করিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছফর অবস্থায় ভীষণ শীত বা বৃষ্টিপাতের রাত্রেও মোয়াজ্জেনকে আদেশ করিতেন, আজান দিতে এবং (সকলে একত্র হওয়া কষ্টকর, তাই) আজানের পর ইহাও বলিতে আদেশ করিতেন যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে নামায পড়িয়া নেও।

ব্যাখ্যা :—আজানের মধ্যে “হাইয়া-আলাহুছালাহ” —নামাযের প্রতি আস; “হাইয়া-আলাল্ফালাহ”—(দীন-হুনিয়ার) মঙ্গল ও কল্যাণের (তথা) নামাযের প্রতি আস; বিশেষ আদেশ রহিয়াছে। এই আদেশ মোয়াজ্জেনের মুখ হইতে নিসৃত, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে বিধোযিত। আল্লাহ বান্দাগণ এই আহ্বান ও আদেশ

শুনিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, ছাহাবীদের যানানার মোসলমানদের অবস্থা এইরূপই ছিল। উহার পরিপ্রেক্ষিতে ভীষণ শীত ও বৃষ্টিপাতের দ্বারা উক্ত আদেশ ও আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে তৎপরত (দঃ) জনগণের অধিক কষ্ট লাঘবের জন্য আল্লার আদেশ ও আহ্বানের ঘোষণাকারী ঐ মোয়াজ্জেনের মুখে আদেশ করিতেন যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানেই নামায পড়িয়া নেও।

আজান দিবার সময় মুখ উত্তর দিকে ঘুরাইবে

বেলাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি আজান দেওয়ার সময় কানে আব্দুল দিতেন। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এরূপ করিতেন না।

তাবেয়ী আ'তা (রাঃ) বলেন, আজান অল্প অবস্থায় দেওয়া স্মরণ ও আবশ্যক। তাবেয়ী ইব্রাহীম (রাঃ) বলেন, বিনা অঙ্কুতে আজান দিলে ঐ আজান পুনঃ দিতে হইবে না; হাদীছে প্রমাণিত আছে, আল্লার জেরক সর্বাবস্থাই করা যায়, অজুহীন অবস্থায়ও করা যায়।

৩৮৬। হাদীছ :— (নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মোয়াজ্জেন—) বেলাল রাজিয়াল্লাতু তায়ালা আনহুকে আজান দিবার সময় মুখ এদিক ওদিক করিতে দেখা যাইত।

নামাযে শরীক হইবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া আসিবে না

৩৮৭। হাদীছ :—আবু কাতাদাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা আমরা নবী ছাল্লাল্লাতু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়িতেছিলাম; নামাযেরত অবস্থায় তিনি কিছু লোকের ছুটাছুটির শব্দ শুনিয়া করিলেন। নামাযান্তে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি করিতে ছিলে? তাহারা আরজ করিল, আমরা নামাযের জন্য তাড়াতাড়ি আসিতেছিলাম। নবী (দঃ) বলিলেন, এরূপ কখনও করিও না। শাস্তি, শৃঙ্খলা ও ধীরস্থিরভাবে নামাযের জন্য আসিবে, তাহাতে যে কয় বাকাত ইমামের সঙ্গে পাওয়া যায় পড়িয়া লইবে, আর যাহা ছুটিয়া যায় উহা ইমামের নামাযের পরে পূরা করিয়া লইবে।

৩৮৮। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, একামত শুনিয়া ছুটাছুটি করিয়া আসিবে না; শাস্তি শৃঙ্খলা ও গান্ধীরের সহিত নামাযে আসিবে। (ইমামের সঙ্গে নামায) যতটুকু পাইবে পড়িবে, আর যাহা ছুটিয়া গিয়াছে উহা পরে পূরণ করিবে। (অবশ্য একামতের পূর্বেই জমাত স্থলে উপস্থিত থাকা চাই।)

মুছআলাহ :—বিশিষ্ট তাবেয়ী হাসান বহরী (রাঃ) বলিয়াছেন, এইরূপ বলা মকরুহ যে—“আমার নামায ছুটিয়া গিয়াছে” বরং এইরূপ বলিবে “আমি নামায ধরিতে পারি নাই।”

ব্যাখ্যা :—উক্ত মুছআলার উদ্দেশ্য বাক্য আওড়ানো নহে, বরং ইহার উদ্দেশ্য প্রথমতঃ এই যে, নামাযের প্রতি প্রত্যেক মোসলমানের সর্বদা তৎপর ও সচেতন থাকা চাই, মুহুর্তের জন্যও নামাযের প্রতি বিন্দুমাত্র শৈথিল্য আসা চাই না। “ছুটিয়া গিয়াছে” বাক্যের

মধ্যে এইভাবে প্রকাশ পায় যে, পূর্ণ মাত্রায় লক্ষ্য না রাখায় বা অসাধনভায়ে নামায হাত ছাড়া হইয়াছে। নামাযের প্রতি এইভাবে বড়ই জঘন্য। “খয়িতে পারি নাই” বাক্যে প্রকাশ পায় যে, সচেষ্ট থাকা সত্ত্বেও কৃতকার্য হইতে পারি নাই। কোন মোসলমানের কোন নামায কাজা হইলে তাহা এই পর্যায়েরই হইতে পারে ; প্রথম পর্যায়ের কখনও হওয়া চাই না।

আলোচ্য মহআলার উদ্দেশ্য দ্বিতীয়তঃ এই যে, নামাযের প্রতি কার্যতঃ শৈথিল্য ও অবহেলা হওয়াই চাই না, কথায়ও ঐক্য ভাব থাকা চাই না। কোন নামায কাজা হইলে উহার উক্তিও এমন বাক্যে করিবে যাহাতে নামাযের প্রতি শৈথিল্য ও অবহেলা-ভাবের আঁচও না থাকে।

ইমাম বোখারী (রঃ) আলোচ্য মহআলাহুটি উল্লেখ পূর্বক বলিয়াছেন, কোন প্রকার অবাহিত ভাব প্রকাশ পাইতে পারে এরূপ ক্ষেত্রে তিন সাধারণভাবে ঐক্য-বাক্য ব্যবহৃত হইতে পারে। যেমন আলোচ্য পরিচ্ছেদে জমাতের সহিত রাকাত দুটিয়া যাওয়ার মহআলাহ বর্ণনা করা ক্ষেত্রে বলা হইয়াছে।

মোক্তাদি নামায আরম্ভের জন্ত কোন সময় দাঁড়াইবে?

৩৮৯। হাদীছ :—আবু কাতাদাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (সঃ) ছাহাবীগণকে বলিতেন, একামত বলা হইলেও যাবৎ আমাকে হজরাখানা হইতে বাহির হইয়া আসিতে না দেখ তোমরা নামাযের জন্ত দাঁড়াইয়া থাকিও না, শাস্তভাবে অপেক্ষা করিতে থাক।

মহআলাহ :— ইমাম যদি একামতের পূর্বে মসজিদের বাহিরে থাকেন এবং নামায আরম্ভের সময় হইলে মসজিদে প্রবেশ করেন তবে ইমাম মসজিদে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই মোক্তাদীগণ দাঁড়াইয়া যাইবে। আর যদি ইমাম প্রথম হইতেই নিজ গোছান্নায় বিজ্ঞান থাকেন তবে ইমাম দাঁড়াইবার সঙ্গেই মোক্তাদীগণ দাঁড়াইবে। ইহা উত্তম নিয়ম বটে, কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম করিলে গোনাহ হইবে না (ফয়জুলবারী ২—১৭৮)। অবশ্য ইমাম নামায আরম্ভ করিলে সঙ্গে সঙ্গেই মোক্তাদীগণের নামায আরম্ভ করিতে হইবে এবং নামাযের কাতার ইহার পূর্বেই পূর্ণ ও সোজা করিতে হইবে, অতএব এই সব কাজের পরিমাণ সময় লইয়াই মোক্তাদীগণকে দাঁড়াইতে হইবে। স্মরণ রাখিবে—ইমাম নামায আরম্ভ করিলে তথায় কোন প্রকার শব্দ করা নাজায়েয, অথচ কাতার পূর্ণ ও সোজা করিতে পরস্পর কথা বলা স্বাভাবিক।

মহআলাহ :— ইমাম যদি মোক্তাদীগণকে তাহার অপেক্ষা করার জন্ত বলেন তবে মোক্তাদীগণ অপেক্ষা করিবে (৮৯ পৃঃ ১১৩ হাঃ)। অর্থাৎ ইমামের এতটুকু মর্যাদা ও প্রাধান্য থাকা চাই; এরূপ ক্ষেত্রে ইমামের প্রতি কটাক্ষ বা বিরূপ ভাব প্রকাশ করা চাই না।

মুহাম্মাদ :— মসজিদে আসিয়া বিশেষ প্রয়োজনে নামাযের পূর্বে মসজিদ হইতে বাহিরে যাওয়া জায়েয আছে (৮৯ পৃ: ১২৩ হা:)।

একামত হওয়ার পর ইমাম দরকারী কাজ করিতে ও দরকারী কথা বলিতে পারেন

৩৯০। **হাদীছ :**—আনাছ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এশার নামাযের একামত বলা হইল, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামাযে আসিতেছিলেন, এক ব্যক্তি আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল; তিনি তাহার সহিত মসজিদের এক কিনারায় জরুরী আলাপে মশগুল হইলেন। নামায আরম্ভে এত বিলম্ব হইল যে, মোক্তাদীগণের তল্লা আসিয়া গেল।

মুহাম্মাদ :— একামতের পরে নামায আরম্ভ করিতে বিলম্ব যদি সামান্য হয় তবে একামত পুনঃ বলিতে হইবে না। আর যদি বিলম্ব বেশী হয় তবে নামায আরম্ভের পূর্বে পুনঃ একামত বলিতে হইবে (ফয়যুলবারী ২—১৮৯)।

জমাতের সহিত নামায পড়া ওরাজেব

হাছান বহরী (রা:) বলিয়াছেন, কাহারও মাতা আদর করিয়া তাকে এশার জমাতে আসিতে নিষেধ করিলে ঐ নিষেধ তাহার অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

৩৯১। **হাদীছ :**— আবু হোরায়রা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শপথ করিয়া বলেন, আমার এরূপ ইচ্ছা হয় যে, আজানের পর কাহাকেও ইমান বানাইয়া নামায আরম্ভ করিবার আদেশ দেই এবং আমি ঐ সমস্ত লোকদের বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করি যাহারা নামাযের জমাতে শরীক হয় নাই এবং কাহারও দ্বারা আলানি কাঠ আনাইয়া ঐ ব্যক্তিগণ ঘরে থাকাবস্থায় তাহাদের বাড়ী-ঘরে আগুন লাগাইয়া দেই। হযরত রসূলুল্লাহ (স:) কোভ প্রকাশ করিয়া বলেন, খোদার কসম—বহুলোক এমনও আছে যে, সামান্য কিছু শীতলী পাওয়ার আশা থাকিলে তাহারা রাতিকালে এশার সময়ও মসজিদে আসিতে কুণ্ঠিত হয় না। (কিন্তু জমাতের প্রতি ততটুকু আকর্ষণ হয় না)।

জমাতের সহিত নামাযের ফজিলত

আছওয়াদ (রা:) নামক তাবেরী এক মসজিদে জমাত না পাইলে অন্য মসজিদে যাইয়া জমাত পাইবার চেষ্টা করিতেন।

আনাছ (রা:) একদা এক মসজিদে আসিয়া দেখিলেন, জমাত হইয়া গিয়াছে (তাহার সঙ্গে একদল লোক ছিল) তিনি আজান দিয়া, একামত বলিয়া জমাতে নামায আদায় করিলেন।

মুহাম্মাদ :— যে মসজিদ কোন বস্তিতে অবস্থিত নহে—সেমন, বস্তি হইতে পৃথক কোন পথের ধারে অবস্থিত মসজিদ কিংবা সাপ্তাহিক হাট বা সাময়িক বাজারে অবস্থিত মসজিদ—যাহার সংলগ্নে মদুরীগণ বসবাসকারী বা অবস্থানকারী হয় না, বরং যাতায়াত

পথে বা সমাবেশ সময়ে লোকেরা পর পর আসিতে থাকে এবং নামায পড়িতে থাকে। এইরূপ মসজিদে যখনই একদল লোক নামাযের জ্ঞাত উপস্থিত হইবে তাহাদের পক্ষে আজান ও একামতের সহিত জমাতে নামায পড়া উত্তম হইবে (শামী, ১—১১৬)।

৩৯২। হাদীছ:— **عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم**

مَلَاؤُةَ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرَيْنِ دَرَجَةً

অর্থ:—আবুহুসাইফ ইবনে ওমর (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছালামাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, জমাতে নামায একাকী নামায অপেক্ষা সাতাশ গুণ বেশী ছওয়াব রাখে।

৩৯৩। হাদীছ:— **عن أبي صالح سمعت أبا هريرة رضى الله تعالى عنه**

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَاؤُةَ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ

عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سَوْتِهِ خَمْسَةٌ وَعِشْرَيْنِ ضِعْفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ

إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ التَّوَضُّؤَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ

لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ فَإِذَا صَلَّى

لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَمْشِي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مَلَاةٍ - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ

ارْحَمَهُ وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ مَا انْظَرَ الصَّلَاةَ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছালামাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যবে বা দোকানে নামায পড়া হইতে (মসজিদে) জমাতে নামায পড়া (অতিরিক্ত) পঁচিশ গুণ বেশী ছওয়াবের পাত্র। কারণ, যখন কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে অঙ্কুরিয়া অথবা কোন উদ্দেশ্যে নয়, একমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া মসজিদে দিকে চলিতে থাকে তখন তাহার প্রত্যেকটি পদক্ষেপে এক একটি গোনাহ মাক হইয়া যায় এবং এক একটি মর্তবা বাড়ান হয়। তারপর সে যখন নামায পড়ে, (এমনকি নামাযান্তে যাবৎ নামায স্থানে বলিয়া থাকে,) ফেরেশতাগণ তাহার জ্ঞাত দোয়া করিতে থাকেন—“হে খোদা! তাহার গোনাহ মাক কর, হে খোদা! তাহার উপর রহমত নাযেল কর” এবং সেই ব্যক্তি নামাযের জ্ঞাত যত সময় অপেক্ষায় থাকে—একমাত্র নামাযই তাহাকে বাড়ী চলিয়া আসা হইতে বাধা দিয়া রাখিয়াছে; তাহার জ্ঞাত ঐ সম্পূর্ণ সময় নামাযের মধ্যে গণ্য করা হয়।

৩৯৪। হাদীছ :- আবু সায়াদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, জমাতের নামাযের ছওয়াব একাকী নামায অপেক্ষা (অতিরিক্ত) পঁচিশ গুণ বেশী।

৩৯৫। হাদীছ :- আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, জমাতের নামাযে একাকী নামাযের তুলনায় (অতিরিক্ত) পঁচিশ গুণ বেশী ছওয়াব হয়। তিনি আরও বলিয়াছেন, জাগতিক কার্য পরিচালনার জন্য আল্লাহ তায়ালা একদল ফেরেশতা দিনের বেলা ও অন্য একদল রাত্রি বেলা পাঠাইয়া থাকেন। উভয় দলই ফজরের সময় ভূ-পৃষ্ঠে একত্রিত হইয়া থাকেন।

কোরআন শরীফে আছে—“ان قرآن الفجر كان مشهودا” “ফজর নামাযের সময় ফেরেশতাগণ (উভয় দল ভূপৃষ্ঠে) একত্র হইয়া থাকেন।” (অতএব ফজরের নামায জমাতে পড়ায় বিশেষভাবে তৎপর হওয়া চাই)।

৩৯৬। হাদীছ :- عن ابي موسى قال الذبي على الله عليه وسلم اعظم الناس أجرا في الصلوة أبعدهم فابعدهم ممشي والذي ينتظر الصلوة حتى يصلّيها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يمتلي ثم ينام۔

অর্থ—আবু মুছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে যত বেশী দূর হইতে মসজিদে আসিবে, সে তত বেশী ছওয়াবের অধিকারী হইবে। মসজিদে আসিয়া যে ব্যক্তি ইমামের সহিত নামায পড়ার অপেক্ষায় থাকে, সে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক ছওয়াবের অধিকারী যে (মসজিদে) একাকী নামায পড়িয়া বাড়ী যাইয়া শুইয়া থাকে।

প্রথম রোজে জোহরের নামাযের জন্য

মসজিদে যাওয়ার কজিলত

৩৯৭। হাদীছ :- আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—একদা এক ব্যক্তি রাস্তা অতিক্রম করিয়া যাইতেছিল। সে দেখিল, কাঁটাযুক্ত গাছের একটি ডাল রাস্তার উপর পড়িয়া আছে, সে উহা অপসারিত করিয়া দিল। আল্লাহ তায়ালা তাহার এই কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে প্রতিফল দান করিলেন যে, তাহার সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) আরও বলিয়াছেন—

الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم

والشهيد في سبيل الله

“শহীদ পাঁচ প্রকার। (১) শ্লেগ—মহামারীতে মৃত। (২) কলেরা—উদরাময়ে মৃত। (৩) পানিতে ডুবিয়া মৃত। (৪) চাপা পড়িয়া মৃত। (৫) আল্লার রাস্তায় জীবন উৎসর্গকারী নিহত।*

রহুল্লাহ হাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আরও বলিয়াছেন, মানুষ যদি জানিত, আজান দেওয়ার ও জমাতের প্রথম সারিতে দাঁড়ান কত ছওয়াব, তবে লটারি করিয়া হইলেও উহার সুযোগ হাসিল করিত। আরও যদি জানিত, প্রথম রৌদ্রে জোহরের নামাযের জন্ত মসজিদে আসায় কি ছওয়াব, তবে নিশ্চয় উহার জন্ত তৎপর হইত। আরও যদি জানিত, এশা ও ফজরের জন্ত মসজিদে আসায় কি ছওয়াব, তবে সকলেই হামাগুড়ি দিয়া হইলেও মসজিদে আসিত।

মসজিদে আসিতে প্রতি পদে ছওয়াব লেখা হয়

অর্থাৎ—বাসস্থান মসজিদ হইতে দূরে হইলেও মসজিদে উপস্থিত হওয়া চাই, মসজিদের প্রতি যত বেশী পদক্ষেপ হইবে তত বেশী ছওয়াব লেখা হইবে।

৩৯৮। হাদীছ :— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী-ছালেমা নামক গোত্রের বাসস্থান মদীনার শহরতলীতে ছিল। তাহারা সেখান হইতে উঠিয়া নবী হাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটবর্তী বাসস্থান তৈরী করার ইচ্ছা করিল। নবী (সঃ) মদীনার শহরতলী জনশূন্য থাকা অপছন্দ করিলেন; তাই তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা যে, শহরতলী হইতে আল্লার মসজিদে নামায পড়িতে আসিয়া থাক এই দূরত্ব অতিক্রম করার জন্ত পদে পদে ছওয়াব লেখা হয়, ইহার প্রতি লক্ষ্য কর। (মসজিদের সংলগ্ন বসবাস করিলে এই পর্যায়ে ছওয়াব হারাইতে হইবে)। তখন তাহারা তাহাদের বস্তিতেই থাকিয়া গেল।

এশা ও ফজরের জমাতে হাজির হওয়ার তাকিদ

৩৯৯। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী হাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোনাফেকদের উপরই ফজর এবং এশা (নামাযের জমাতে উপস্থিত হওয়া) সর্বাপেক্ষা ভারী। (কারণ, ইহা অধিক কষ্ট সাপেক্ষ; আর ছওয়াবের উদ্দেশ্য ত তাহাদের নাই)। লোকেরা যদি ফজর ও এশার জমাতের ফজিলত জানিত তবে হামাগুড়ি দিয়া হইলেও এই নামাযদ্বয়ের জমাতে হাজির হইত।

ইমামের সঙ্গে একজন মোক্তাদী হইলেই জমাত গণ্য হইবে

অর্থাৎ একজন ইমাম ও একজন মোক্তাদী—এই দুই জনের সমষ্টিই জমাত গণ্য হইবে এবং ইহাদের জমাতের অতিরিক্ত ছওয়াব হাসিল হইবে। এই প্রসঙ্গে ইমাম বোখারী (রঃ) ৩৮৪ নং হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্বিধা এই মর্মে একখানা স্পষ্ট হাদীছও বর্ণিত

* তৃতীয় খণ্ডে “জৈহাদ ব্যতিরেকে শাহাদতের সওয়াব” পরিচ্ছেদে আল্লার রাস্তায় জীবন উৎসর্গকারী ছড়া ২১ প্রকার শহীদের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

আছে। নবী (দ:) দেখিলেন, এক ব্যক্তি একা নামায আরম্ভ করিয়াছে। তখন নবী (দ:) বলিলেন, কেহ আছে যে এই ব্যক্তির উপকার করে, তথা তাহার সঙ্গে নামায পড়ে? সেমতে এক ব্যক্তি দাঁড়াইল এবং ঐ লোকটির সহিত নামায পড়িল। হযরত (দ:) বলিলেন, এই দুই জনে জমাত হইয়াছে। (ফতহুল বারী ২—১১২)

মসজিদে নামায পড়া এবং নামাযের অপেক্ষায়

মসজিদে বিলম্ব করা

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 800। هَادِيحٌ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْأَمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلِّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَبَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتٌ مِنْ صِبْيَانٍ وَجَمَالٌ فَقَالَ أَنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ إِخْفَاءً حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَلَيْهِ

অর্থ—আবু হোরাইরা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ হাদীছ আল্লাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, কেয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে যখন আল্লার (রহমতের) ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়ার ব্যবস্থা থাকিবে না তখন সাত প্রকার মানুষকে আল্লাহ তায়ালা ছায়া দান করিবেন—(১) ছায় পরায়ণ শাসনকর্তা। (২) যে যুবক যৌবনের (টেউ-এর) মধ্যেও আল্লার বন্দেগী ও গোলাগীতে উন্নতি করিয়া চলিয়াছে। (৩) ঐ ব্যক্তি যাহার মন মসজিদের সঙ্গে বা নামাযের ওয়াক্তের সঙ্গে লটকানো থাকে—তাহার মন ব্যস্ত থাকে যে, কখন নামাযের সময় উপস্থিত হইবে এবং সে মসজিদে যাইয়া নামায পড়িবে। (৪) ঐ দুই ব্যক্তি যাহাদের মধ্যে ভালবাসার সৃষ্টি হইয়াছে একমাত্র আল্লার ভালবাসার দরুন, অর্থাৎ তাহারা প্রত্যেকেই আল্লাহকে ভালবাসে বলিয়া তাহাদের উভয়ের মধ্যেও ভালবাসার সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—এমন খাচী ভালবাসা যে, সাক্ষাতে ও অসাক্ষাতে সর্বদাই সেই ভালবাসা স্থায়ীভাবে থাকে। (৫) ঐ ব্যক্তি যাহাকে কোন একটি উচ্চবংশীয়া পরমা সুন্দরী যুবতী স্বয়ং আকৃষ্ট করিয়াছে ও ডাকিয়াছে, কিন্তু সে উত্তরে বলিয়াছে, আমি খোদাকে ভয় করি। (৬) ঐ ব্যক্তি যে আল্লার রাস্তায় দান-খয়রাত গোপনভাবে করে—তাহার

ডান হাত বাহা করিয়াছে, বাম হাত উহা জানিতে পারে নাই। ও ব্যক্তি যে একাকী খোদাকে স্মরণ করে এবং (ভয় বা মহাবতে) তাহার চক্ষুয় অশ্রু বহায়।

পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় বিষয়টির অঙ্ক ৩৯৩ নং হাদীছ উল্লেখ হইয়াছে।

সকালে-বিকালে মসজিদে যাওয়ার ফজিলত

৪০১। হাদীছ :—

عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح -

অর্থ—আবু হোরাইরা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছালামাহ আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলা বা বিকাল বেলা মসজিদে যায় আল্লাহ তায়ালা তাহার অঙ্ক প্রতি সকাল-বিকালের এই পরিশ্রমের প্রতিফলে বেহেশতের মধ্যে নিমন্ত্রণ-সামগ্রী তৈরী করিয়া রাখেন।

ফরজ নামাযের একামত হইলে সুন্নত বা নফল আরম্ভ করিবে না।

৪০২। হাদীছ :—আবু হুমায ইবনে বোহায়না (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা

রসুলুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লাম ফজরের নামাযের একামত হইলে এক ব্যক্তিকে ভিন্ন নামায পড়িতে দেখিলেন। (এ ব্যক্তি ফজরের দুই রাকাত সুন্নত পড়িতেছিল)। নামাযান্তে যখন সকলে রসুলুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লামের নিকটবর্তী বিয়িয়া বসিল তখন হযরত (দ:) এ ব্যক্তিকে বলিলেন, ফজরের (ফরজ) নামায কি চারি রাকাত হয়?

অর্থাৎ একামতের পর ফরজ ভিন্ন অঙ্ক নামায পড়া যায় না, তুমি ভিন্নভাবে দুই রাকাত ও জমাতে দুই রাকাত পড়িয়াছ; তুমি কি ফজরের ফরজ চার রাকাত পড়িলে?

ব্যাখ্যা :—হযরত রসুলুল্লাহ (দ:) ভালরূপেই জানিতেন যে, সে ভিন্নভাবে যে নামায পড়িয়াছে উহা ফজরের ফরজ নহে, কিন্তু ফরজ নামাযের একামত হইবার পর জমাতে সংলগ্ন স্থানে অঙ্ক কোন প্রকার নফল বা সুন্নত নামায পড়া নিষিদ্ধ। এ ব্যক্তি এই মহআলার ব্যতিক্রম করিয়া একামতের পর জমাতে সংলগ্ন স্থানে সুন্নত আরম্ভ করায় কোভ প্রকাশ স্বরূপ রসুলুল্লাহ (দ:) উহার প্রতি এই উক্তি করিয়াছিলেন।

মহআলাহ :—ফজর ভিন্ন অঙ্ক কোন নামাযের সুন্নত, এমনকি জোহরের পূর্বে যে চার রাকাত সুন্নতে-মোয়াকাদা আছে উহাও জমাতে আরম্ভ হওয়ার পূর্বে শেষ করার মত সময় না থাকিলে আরম্ভ করিবে না। তদ্রূপ জুয়ার ফরজের পূর্বে চার রাকাত সুন্নতে-মোয়াকাদাও খোৎবার আজানের পূর্বে শেষ করার মত সময় না থাকিলে আরম্ভ করিবে না।

জমাতের সহিত ফরজ নামায আদায় করিয়া ঐ সূন্নত পড়িবে। কিন্তু ফজরের ফরজের পূর্বে দুই রাকাত সূন্নত অতি উচ্চ পর্যায়ের সূন্নতে-মোয়াক্কাদা। কোন কোন ইমাম উহাকে ওয়াজেব বলিয়াছেন। সেমতে ইমাম আবু হানিফা (র:) শুধু ফজরের সূন্নতের জন্য এতটুকু স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রাখিয়াছেন যে, ফজরের জমাত আরম্ভ হওয়ার পরও যদি আশা করা যায় যে, সূন্নত পড়িয়া জমাতে শরীক হওয়া বাইবে তবে সূন্নত পড়িয়া লইবে। কিন্তু জমাতের সংলগ্ন স্থান হইতে যথাসম্ভব দূরে সূন্নত পড়িবে, নতুবা রসুলুল্লাহ ছালামালাহ আলাইহে অসাল্লামের ক্ষোভের পাত্র সাব্যস্ত হইবে। যদি দেখা যায় যে, সূন্নত পড়িলে জমাত শেষ হইয়া বাইবে তবে সূন্নত না পড়িয়া জমাতে শরীক হইবে এবং সূর্য্য উদয়ের পর ঐ সূন্নত পড়িবে।

কিরূপ অনুস্থ হওয়া সত্বেও জমাতে शामिल হওয়া উচিত

৪০৩। হাদীছ :- বিশিষ্ট তাবয়ী আহুওয়াদ (র:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা'র নিকট বসিয়া নামাযের গুরুত্ব ও উহার প্রতি তৎপরতার বিষয় আলোচনা করিতেছিলাম। তখন তিনি বলিলেন, নবী ছালামালাহ আলাইহে অসাল্লাম অস্তিম রোগে আক্রান্ত হইবার পর একদিন যখন নামাযের সময় উপস্থিত হইল এবং আহ্বান দেওয়া হইল তখন বেলাল (রা:) আসিয়া তাঁহাকে নামাযের খবর দিলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা আবু বকরকে জমাতে নামায পড়াইয়া দিবার জন্য বল।

আয়েশা (রা:) বলেন, আমি আরজ করিলাম, তিনি (আবু বকর) অত্যন্ত কোমল হৃদয় মানুষ; যখনই তিনি আপনার স্থলে ইমামতির জায়গায় দাঁড়াইবেন, তখনই তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে অস্থির হইয়া পড়িবেন; মোক্তাদীদিগকে ছুঁরা-কেঁরাতে কিছুই শুনাইতে পারিবেন না। যদি আপনি ওমর (রা:)কে নামায পড়াইবার আদেশ করেন তবে ভাল হয়। রসুলুল্লাহ (স:) এ সমস্ত ওজর-আপত্তি না শুনিয়া পুনরায় ঐ আদেশই করিলেন যে, তোমরা আবু বকরকে নামায পড়াইবার জন্য বল। আয়েশা (রা:) বলেন, আমি হাকসাহ (রা:)কে বলিলাম, আপনি রসুলুল্লাহ (স:)কে বলুন যে, আবু বকর অতি নরম দেল মানুষ, তিনি রসুলুল্লাহ ছালামালাহ আলাইহে অসাল্লামের স্থানে দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া অস্থির হইবেন; যদি ওমরকে নামায পড়াইবার আদেশ করেন তবে ভাল হয়। হাকসাহ (রা:) রসুলুল্লাহ ছালামালাহ আলাইহে অসাল্লামের নিকট ঐ অনুরোধ জানাইলেন। রসুলুল্লাহ (স:) স্বীয় আদেশের বিপরীত পুনঃ পুনঃ ঐ উক্তি শুনিয়া বিরক্তি প্রকাশ পূর্বক পুনরায় ঐ কথাই বলিলেন, আবু বকরকে বল, জমাত পড়াইবার জন্য। (আবু বকর জমাত আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং কয়েক ওয়াক্ত নামায তাঁহার ইমামতিতে পড়া হইল।) অতঃপর একদা আবু বকরের ইমামতিতে নামায আরম্ভ হওয়ার পর হযরত (স:) একটু সুস্থতা অনুভব করিলেন এবং

• উম্মুল-মোমেনীন হাকসাহ (রা:) ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা'র কথা; হযরত রসুলুল্লাহ ছালামালাহ আলাইহে অসাল্লামের একজন বিশিষ্টা পত্নী ছিলেন।

হই ব্যক্তির কাঁধে ভর করিয়া জমাতে শরীক হওয়ার জন্য মসজিদের দিকে অগ্রসর হইলেন। (তিনি এতই দুর্বল ছিলেন যে, পা উঠাইয়া চলার শক্তি ছিল না,) তাঁহার পা দুইটি মাটির উপর হেঁচড়াইয়া বাইতেছিল। এই অবস্থায় তিনি মসজিদে উপনীত হইলেন। আবু বকর (রাঃ) ইমামতী করা অবস্থায়ই হযরত রসুলুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লামের আগমনের আভাস পাইয়া ইমামের স্থান ছাড়িয়া গেহনের দিকে সরিয়া আসিতে লাগিলেন। × রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে পূর্বাবস্থায় থাকিবার ইশারা করিলেন এবং তিনি আবু বকরের বাম পার্শ্বে আসিয়া নামায আরম্ভ করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) ইমাম হইলেন, আবু বকর তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া মোকাবেল হইলেন, এইরূপে সকলে নামায আদায় করিলেন।

ব্যাখ্যা :—এই হাদীছের আরও বিস্তারিত বিবরণ মোসলেম শরীকের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে—হযরত রসুলুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লামের মৃত্যু শয্যায় যখন তাঁহার অসুস্থতা চরমে পৌঁছিয়া গেল, তখন একদা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, জমাত শেষ হইয়া গিয়াছে কি? আমরা বলিলাম, এখনও জমাত হয় নাই। সকলেই আপনার অপেক্ষায় আছে। তখন তিনি বলিলেন, আমার জন্ত টবের মধ্যে পানি রাখ। পানি রাখা হইলে তিনি একটু সুস্থিরতা হাসিলের আশায় গোসল করিলেন এবং জমাতে যাওয়ার জন্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহার মাথায় চক্র আসিয়া বেহঁশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার হঁশ ফিরিয়া আসিলে তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, জমাত হইয়া গিয়াছে কি? আমরা বলিলাম, সকলেই আপনার অপেক্ষায় আছে। তিনি পুনরায় একরূপ গোসলের ব্যবস্থা করিলেন এবং গোসল করিয়া জমাতে যাওয়ার জন্ত দাঁড়াইবা-
গাত্ত বেহঁশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। এইরূপে তিনি পুনঃ পুনঃ তিন বার জমাতে যাওয়ার চেষ্টা করিলেন। প্রত্যেকবারেই তিনি বেহঁশ হইয়া পড়িয়া গেলেন, তাই চতুর্থবার তিনি আবু বকরকে নামায পড়াইবার আদেশ দিয়া পাঠাইলেন।

খাবার উপস্থিত, জমাতও আরম্ভ তখন কি করিবে?

এই বিষয়ে মোটামুটি মহালাহ এই যে, যদি বিশেষ ক্ষুধা না থাকে এবং যাওয়ার প্রতি একরূপ আকর্ষণ না থাকে যাহাতে নামাযের অবস্থায় মন উঠার প্রতি ধাবিত হয় তবে খাওয়ার লিপ্ত না হইয়া জমাতে শরীক হইবে। নতুবা প্রথমে খাবার গ্রহণ করিলে তারপর একাগ্রচিত্তে নামায পড়িবে। আবুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) একরূপ অবস্থায় প্রথমে খাবার গ্রহণ করিতেন।

× আবু বকর (রাঃ) ইমাম হইয়া নামায আরম্ভ করার পর রসুলুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লাম আসিয়া ঐ নামাযের ইমাম হইলেন, আবু বকর মোক্তাদী হইয়া গেলেন। একরূপ করা একমাত্র রসুলুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লামের জন্তই খাচ ছিল।

আবুদুদা (রাঃ) নামক বিশিষ্ট ছাহাবী বলেন—মাহুশের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এই যে, নামাযের পূর্বে তাহার সমস্ত প্রয়োজন হইতে অবসর হইয়া মনকে সমস্ত ধ্যান ও আকর্ষণ হইতে মুক্ত করতঃ একাগ্রচিত্তে নামাযে মগ্ন হয়।

৪০৪। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন রাতিকালে খাবার উপস্থিত হয় এবং এদিকে নামাযের একান্ত বলা হয়, তখন প্রথমে খাবার গ্রহণ কর। (এই হাদীছের তাৎপর্য উপরে বর্ণিত হইয়াছে)।

৪০৫। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যদি কোন সময় রাত্রে আহার উপস্থিত করা হয় (এবং ক্ষুধার কারণে উহার প্রতি মন আকৃষ্ট হয়) তবে প্রথমে আহার গ্রহণ কর; যদিও (একরূপ ঘটনা) মগরেবের নামায পড়ার পূর্বে হয়। আহারের পূর্বে তাড়াছড়া (করিয়া নামায আদায়) করিও না।

৪০৬। হাদীছঃ—আবুহুলাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যদি কাহারও রাত্রে আহার সম্মুখে রাখা হয় এবং ঐ সময় নামাযের জমাত আরম্ভ হয় তবে সে প্রথমে রাত্রে আহার গ্রহণ করিবে। আহার গ্রহণ না করিয়া নামাযের জ্ঞাত তাড়াছড়া করিবে না, যাবৎ না আহার গ্রহণ হইতে অবসর হয়। আবুহুলাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবীর একরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে যে, তাহার জ্ঞাত থানা উপস্থিত করা হইয়াছে, ঐ সময় নামাযের জমাতও দাঁড়াইয়াছে—এমতাবস্থায় আবুহুলাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আহার গ্রহণ হইতে অবসর না হইয়া জমাতে আসেন নাই, অথচ (নামাযের জমাত এত নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল যে,) তিনি ইমামের কেরাত-শব্দ শুনিতেছিলেন।

এখানে ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত এই হাদীছও আছে যে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, কেহ খাওয়া আরম্ভ করিলে আবশ্যিক পরিমাণ পূর্ণ না হইয়া উঠিবে না, যদিও নামাযের জমাত আরম্ভ হয়।

সাংসারিক কাজের জ্ঞাত জমাত ছাড়িবে না

৪০৭। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় ঘরের কাজ কর্মে লিপ্ত হইতেন, যখনই নামাযের সময় উপস্থিত হইত, তখন তিনি সমস্ত কাজ-কর্ম ছাড়িয়া নামাযের জ্ঞাত চলিয়া যাইতেন।

বিশেষ দৃষ্টব্যঃ—উল্লিখিত পরিচ্ছেদদ্বয়ের বিভিন্ন হাদীছসমূহের সমষ্টি দৃষ্টে মছআলাহ এই সাব্যস্ত হয় যে, মানবীয় প্রয়োজন কোন বিষয়ের তাকিদে মনের আকর্ষণ অস্ত্র দিকে ধাবমান হইলে নামাযের পূর্বে সেই প্রয়োজন মিটাইয়া নেওয়া চাই; যদিও তাহাতে জমাত ছুটিয়া যায়। যেমন পেটে ক্ষুধা রহিয়াছে এবং খাদ্য উপস্থিত আছে। এমতাবস্থায় জমাত আরম্ভ হইয়া গেলেও প্রথমে ক্ষুধা নিবারণ করা চাই। পক্ষান্তরে যদি মনকে বিচলিতকারী ক্ষুধা না থাকে তবে উপস্থিত খাদ্য ছাড়িয়া জমাতের প্রতি ধাবিত হইবে।

এমনকি খাও আরম্ভ করিলে উহা অসম্পূর্ণ ফেলিয়া চলিয়া যাইবে যেহেতু ১৫২ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। মানবীয় প্রয়োজন ভিন্ন জাগতিক বা সাংসারিক কাজের জন্য জমাতের প্রতি মোটেই অবহেলা করিবে না। সব কিছু ছাড়িয়া জমাতের জন্য ছুটিয়া যাইবে, যেহেতু ৪০৭ নং হাদীছে বর্ণিত আছে।

বিশিষ্ট তাবেরী যুরা। ইবনে আবু আওফা (র:) তিনি একজন কর্মকার ছিলেন। তিনি তাঁহার হাতুড়ী উঠাইয়া মারিবার পূর্বে আজান শুনিলে ঐ অবস্থায়ও হাতুড়ী ফেলিয়া নামাযে চলিয়া যাইতেন। (ফয়জুলবারী ২—২০৭)

এক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ক্ষুধার তাড়নায় জমাতের উপর আহার গ্রহণকে অগ্রগণ্য করার অসম্মতি শুধু ক্ষুধার তীব্রতা নিবারণ পরিমাণের জন্য; পেট পুরিয়া খাওয়ার জন্য নহে। সুতরাং কয়েক গ্রাস গ্রহণের পর জমাত পাওয়ার অবকাশ থাকিলে সেই চেষ্টা অবশ্যই করিবে; সেই সুযোগ ছাড়িবে না।

আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় এই যে, ক্ষুধার তাড়নায় আহারের জন্য শুধু জমাত ছাড়া যায়, নামায কাজা করা জায়েয নহে। যদি নামাযের ওয়াক্ত সন্ধীর্ণ থাকে যে, আহারে লিপ্ত হইলে নামায কাজা হইয়া যাইবে; তবে প্রাণ বাঁচিয়া থাকার অবকাশে শত কঠোর ক্ষুধার কারণেও আহার করিতে নামায কাজা করা জায়েয নহে।

এলুম ও মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিই ইমাম হইবার জন্য অগ্রগণ্য

৪০৮। হাদীছ :—আবু মুহা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালামাহ আল্লাইহে অসাল্লাম যখন তাঁহার অন্তিমকালের রোগ শয্যায় পতিত হইলেন এবং তাঁহার রোগের প্রকোপ বাড়িয়া গেল তখন তিনি বলিলেন, তোমরা আবু বকরকে লোকদের নামায পড়াইয়া দিবার জন্য বল। আরেশা (রা:) বলিলেন, আবু বকর নরম-দিল মানুষ; তিনি আপনার জায়গায় দাঁড়াইয়া লোকদের নামায পড়াইতে সক্ষম হইবেন না। নবী (দ:) পুনঃ বলিলেন, আবু বকরকে লোকদের নামায পড়াইতে বল। আরেশা (রা:) তাঁহার কথা পুনরোক্তি করিলেন। নবী (দ:) ঐ কথাই বলিলেন—আবু বকরকে লোকদের নামায পড়াইতে বল, ইউসুফ আল্লাইহেচ্ছালামের ঘটনার নারীদের হায় তোমরাও আমাকে প্রভাবিত করিতে চাহিতেছ। অতঃপর আবু বকরের নিকট সংবাদদাতা পৌঁছিল। তখন হইতে আবু বকর (রা:) নবী ছালামাহ আল্লাইহে অসাল্লামের জীবদ্দশায়ই নামায পড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

৪০৯। হাদীছ :—আবুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রশুলামাহ ছালামাহ আল্লাইহে অসাল্লামের অন্তিম রোগ যখন বাড়িয়া গেল, তখন তাঁহাকে নামাযের জমাত সম্পর্কে বলা হইলে তিনি বলিলেন, আবু বকরকে বল লোকদের নামায পড়াইয়া দিতে। আরেশা (রা:) বলিলেন, আবু বকর নরম দিলের মানুষ; তিনি (আপনার স্থানে দাঁড়াইয়া) ক্রন্দনের দ্বারা কেবল পড়িতে পারিবেন না। হযরত (দ:) পুনঃ বলিলেন, আবু বকরকে

বল, নামায পড়াইতে । আয়েশা (রাঃ) তাঁহার কথার পুনরাবৃত্তি করিলেন (এবং হাকছাহ (রাঃ)কেও তাঁহার সমর্থনকারিণী বানাইলেন) । হযরত (দঃ) আবার বলিলেন, আবু বকরকে নামায পড়াইতে বল ; তোমরা ত (হযরত) ইউসুফের ঘটনার নারীদের স্থায় অর্থাৎ তাহার যেরূপ ইউসুফ (আঃ)কে তাঁহার অভিক্রটির বিপরীত জ্বোলেখার অভিপ্রায়ের কাজ করিতে বলিতেছিল, তদ্রূপ তোমরাও আমাকে আমার অভিক্রটির বিপরীত কথা বলিতেছ ।

মহুআলাহ :—এলুম, মর্যাদা ও কোরআন শরীফ পড়ার কতিপয় ব্যক্তি সমপর্দায়ের উপস্থিত : সে ক্ষেত্রে বয়সে যিনি বড় তিনিই ইমাম হওয়ার অগ্রগণ্য । (৯৪ পৃ: ৩৮৩ হাঃ)

নিযুক্ত ইমাম উপস্থিত না থাকায় অন্য ইমাম জমাত আরম্ভ করার পর প্রথম ইমাম আসিয়া পৌঁছিলে ?

৪১০। হাদীছ :— ছাহল-ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমর-ইবনে আউফ গোত্রের একটি বিবাদ মিটাইবার জন্ত তাহাদের বস্তিতে তশরীফ লইয়া গেলেন । তাঁহার প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব হইল, এদিকে আছরের নামাযের ওয়াক্ত হইয়া গেল, হযরতের মসজিদে ইমাম নাই । তখন মোয়াজ্জেন আবু বকর (রাঃ)কে অবস্থা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, আপনি জমাত পড়াইয়া দেন । তিনি ইহাতে সম্মত হইয়া নামায আরাধ্য করিলেন । জমাত আরম্ভ হইয়াছে এমন সময় রসুল্লাহ (দঃ) আসিয়া পৌঁছিলেন এবং তিনি পেছনের সারিসমূহ ভেদ করিয়া প্রথম সারিতে আসিয়া দাঁড়াইলেন । (তিনি পেছনে থাকিলে তাঁহার সন্মুখের লোক বিচলিত হইত ।) রসুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আগমন আবু বকর (রাঃ)কে অবগত করাইবার জন্ত মোক্তাদীগণ হাতের উপর হাত মারিয়া শব্দ করিল । আবু বকর (রাঃ) নানাধে এত মগ্ন থাকিতেন যে, নামায অবস্থায় কোন কিছুই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিত না, কিন্তু এই ঘটনার যখন অত্যধিক শব্দ হইতে লাগিল, তখন তিনি আড়-চোখে একটু লক্ষ্য করিয়া রসুল্লাহ (দঃ)কে দেখিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তিনি পিছনের দিকে সরিয়া পড়িতে লাগিলেন । হযরত (দঃ) তাঁহাকে এরূপ না করার প্রতি ইশারা করিলেন । আবু বকর (রাঃ) হযরতের এই আদেশে সন্তুষ্ট হইয়া আল্লাহর শোকর করিলেন, কিন্তু ইমামতের স্থান ত্যাগ করিয়া মোক্তাদীর সারিতে সরিয়া আসিলেন । রসুল্লাহ (দঃ) সন্মুখে অগ্রসর হইয়া ইমাম হইলেন ; তাঁহারই ইমামতিতে নামায সমাপ্ত হইল । নামাযান্তে হযরত (দঃ) আবু বকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার আদেশ রক্ষা করিয়া ইমাম থাকিলেন না কেন ? আবু বকর (রাঃ) আরজ করিলেন, আবু কোহাফার পুত্র তথা (আবু বকরের) পক্ষে উচিত নহে, সে আল্লাহর রসুলের সন্মুখে ইমামতি করে ।

এই উপলক্ষে হযরত (দঃ) মোক্তাদীগণকে বলিলেন, তোমরা হাত মারিয়া শব্দ করিলে কেন ? নামাযের মধ্যে কোন প্রয়োজন দেখা দিলে পুরুষগণ—**سبحان الله** (মোব্বাহানাল্লাহ)

বলিবে—উহাতেই হামামের লক্ষ্য আকৃষ্ট হইবে। অবশ্য 'মহিলাগণ' এরূপ ক্ষেত্রে ডান হাত বাম হাতের পৃষ্ঠে নারিয়া শব্দ করিবে! (কারণ, মহিলাদের কণ্ঠস্বর বেগানা পুরুষকে শুনান চাই না।)

ব্যাখ্যা :—এরূপ ঘটনার প্রকৃত মহাআলাহ এই যে, যে ইমাম নামায আরম্ভ করিয়াছেন তিনিই নামায সমাপ্ত করিবেন, নির্ধারিত ইমাম মোক্তাদী হইয়া নামায পড়িবেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এরূপই করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে আবু বকর (রাঃ) যাহা করিয়াছিলেন উহা একমাত্র হযরত রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিশেষত্ব ছিল; অথবা যে কোন ব্যক্তির জন্ত এরূপ করা হইলে সকলের নানান ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

৪১১। **হাদীছ :**—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঘোড়ার উপর হইতে পতিত হইয়া তাঁহার দেহের ডান পার্শ্ব কত হইয়া যায় এবং পা মচকিয়া যায়, তাই তিনি মসজিদে না যাইয়া স্বীয় অবস্থান গৃহেই নামায আদায় করিতেন। এমনতাবস্থায় একদিন ছাবাবীগণ তাঁহার সাক্ষাতের জন্ত উপস্থিত হইলেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) নামায আরম্ভ করিলেন, অসুস্থতার দরুন তিনি বসিয়া নামায আরম্ভ করিলেন। ছাবাবীগণ তাঁহার পেছনে নামাযে শরীক হইলেন, কিন্তু তাঁহার দাঁড়াইয়া নামায আরম্ভ করিলেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাদের প্রতি ইশারা করিলেন যে, তোমরাও আমার অনুসরণে বসিয়া নামায পড় এবং নামাযান্তে বলিলেন, মোক্তাদীগণ ইমামের অনুসরণ করিবে—এই উদ্দেশ্যেই ইমাম নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। যখন ইমাম রুকু করিবে তখন তোমরাও রুকু করিবে, যখন রুকু হইতে মাথা উঠাইবে তখন তোমরাও মাথা উঠাইবে, যখন ইমাম বলিবে “হামিআল্লাহু লেমান হামিদাহ” তখন তোমরা বলিবে “রাব্বানা লাকাল হাম্দ” যখন ইমাম ওজর বশতঃ বসিয়া নামায পড়িবে, তোমরাও বসিয়া নামায পড়িবে।

ব্যাখ্যা :—ইমামের অনুসরণ মোক্তাদীদের জন্য অপরিহার্য, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই একটি বিষয়ে নয়, অর্থাৎ ইমাম ওজর বশতঃ বসিয়া নামায পড়িলে মোক্তাদীগণ বিনা ওজরে বসিয়া নামায পড়িতে পারিবে না, তাহাদের দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে হইবে যেরূপ ৪০৩নং হাদীছে আছে। অবশ্য ৪১১নং হাদীছখানা ইহার বিপরীত দেখা যায়, তাই এখানে ইমাম বোখারী (রঃ) ৪০৩নং হাদীছ খানা পুনরায় বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ঐ হাদীছ খানাদ্বারা এই হাদীছ খানার হুকুম মনচুখ (রহিত) হইয়া গিয়াছে। কারণ, ৪১১নং হাদীছের ঘটনা বহু পূর্বের এবং ৪০৩নং হাদীছের ঘটনা নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শেষ জীবনের। এই ঘটনাতে যখন আবু বকরের স্থলে রসুলুল্লাহ (দঃ) ইমাম হইলেন, তখন তিনি অসুস্থতার দরুন বসিয়া নামায পড়িতেছিলেন; আর মোক্তাদীগণ সকলেই হযরতের পেছনে নামাযে দাঁড়াইয়াছিলেন। পরবর্তী হাদীছ পূর্বের হাদীছের বিপরীত হইলে পূর্ববর্তী হাদীছ মনচুখ (রহিত) পরিগণিত হয়।

মছআলাহ :—মোক্তাদী রুকু-সেজদার মধ্যে ইমামের পূর্বে মাথা উঠাইয়া যদি দেখে যে, এখনও ইমাম মাথা উঠায় নাই তবে মোক্তাদী অবশ্যই পুনঃ রুকুতে ও সেজদায় চলিয়া যাইবে (৯৫ পৃঃ আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) ছাহাবীর কতওয়া)।

মছআলাহ :—এক ব্যক্তি ইমামের সহিত দুই রাকাত নামায পড়িতেছে, যেমন—ফজর নামায। ভিড়ের কারণে সে প্রথম রাকাতের সেজদা করার অবকাশ পায় নাই, এমনকি সম্মুখ কাতারের মুছল্লীদের পিঠের উপর সেজদা করারও সুযোগ পায় নাই এবং দ্বিতীয় রাকাতের সেজদাও ইমামের সহিত করিতে সুযোগ পায় নাই। ঐ ব্যক্তি যখনই সুযোগ পাইবে, এমনকি ইমামের সালাম ফেরার পরে হইলেও প্রথমে দুইটি সেজদা করিবে; ইহা তাহার দ্বিতীয় রাকাতের সেজদা গণ্য হইয়া দ্বিতীয় রাকাত পূর্ণ হইবে। অতঃপর প্রথম রাকাত পূর্ণ হইবে। অতঃপর প্রথম রাকাত পূর্ণরূপে রুকু-সেজদা ইত্যাদির সহিত একা একা মাজ্বকের স্থায় আদায় করিবে।

মছআলাহ :—ইমামের সহিত নামায পড়া অবস্থায় মধ্যভাগে (অজ্ঞাতে বা তন্দ্রা ইত্যাদি কোন কারণে) রুকু বা সেজদা পূর্ণই ইমামের সহিত ছুটিয়া গেলে উহা আদায় করিয়া তারপর ইমামের সহিত পুনঃ দাঁড়াইবে। (৯৫ পৃঃ হাসান বহরী (রঃ) তাবেয়ীর কতওয়া)

সাধন! নামাযের মধ্যভাগে নয়, বরং নামায আরম্ভ করার সময় ইমাম রুকু হইতে উঠিয়া গিয়াছে তখন অনেকে নিজে নিজে রুকু করিয়া ইমামের সহিত সেজদায় মিলিত হয় এবং নবন করে, সে ঐ রাকাত ইমামের সহিত পাইয়াছে—ইহা ভুল। ঐ রাকাত ইমামের সহিত গণ্য নহে, সুতরাং ইমামের ছালামের পর ঐ রাকাত পূর্ণ আদায় না করিলে নামায হইবে না।

মোক্তাদীগণ কোন্ সময় সেজদার জন্য নত হইবে?

৪১২। হাদীছ :—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছালামাহ্ আলাইহে অসাল্লাম রুকু হইতে দাঁড়াইবার পর যাবৎ তিনি সেজদায় চলিয়া না যাইতেন তাবৎ আমরা সেজদার জন্য নত হইতাম না।

ব্যাখ্যা :—সাধারণতঃ মছআলাহ এই যে, রুকু সেজদা ইত্যাদি ইমামের সঙ্গে সঙ্গেই করিতে হইবে। যেমন অল হাদীছের দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত আছে। কিন্তু যদি এরূপ আশঙ্কা হয় যে, ইমামের সঙ্গে সঙ্গে রুকু, সেজদা করার কালে মোক্তাদীগণ ইমামের অগ্রগামী হইয়া যাইবে, যেমন ইমাম যদি বয়ঃপ্রাপ্ত বা ভারী শরীরের হয় বা অল কোন কারণ বশতঃ রুকু, সেজদায় ধীরে ধীরে যাইয়া থাকেন, যদ্বন্ধন মোক্তাদীগণ সাধারণভাবে রুকু, সেজদা করিতে গেলে ইমামের অগ্রগামী হইয়া যাইবে; এমনতাবস্থায় উপরোক্ত হাদীছ অনুযায়ী আমল করিবে, এই হাদীছের তাৎপর্য ইহাই। ইহা হযরতের বয়ঃপ্রাপ্তিকালের ঘটনা।

রুকু সেজদা হইতে ইমামের পূর্বে উঠিবার পরিণতি

৪১৩। হাদীছ :—আবু হোরাযরা (রাঃ) নবী ছালামাহ আল্লাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রুকু বা সেজদা হইতে ইমামের পূর্বে মাথা উঠায়, সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার মাথা বা তাহার আকৃতি গাধার জায় করিয়া দিতে পারেন ?

ক্রীতদাস গোলামও ইমামতি করিতে পারে

৪১৪। হাদীছ :— আবুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, প্রথম দিকে মোহাজিরীনদের যে দলটি মদীনায় আসেন তাহারা কোবা নগরীতে অবস্থান করিলেন। এবং রসুলুল্লাহ ছালামাহ আল্লাইহে অসাল্লামের হিজরত করিয়া আসার পূর্ব পর্যন্ত সেখানে ইমামতি করিতেন আবু হোযায়ফা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ক্রীতদাস ছালেম (রাঃ)। কারণ, তাহাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন কোরআনের অধিক অভিজ্ঞ।

মহাআলাহ :—ক্রীতদাস, অবৈধ গর্ভজাত সন্তান এবং নিম্ন শ্রেণী (Uncivilized) লোক যদি শিক্ষা ও পরহেজগারীতে উন্নত হয় এবং এইগুণে তাহার সমকক্ষ অন্য লোক উপস্থিত না থাকে তবে তাহাদের ইমামতিতে কোন দোষ নাই (২৬ পৃঃ)।

নাবালক ছেলের ইমামতি কোন কোন মজহাবে জায়েয আছে, কিন্তু হানকী মজহাব মতে সাবালকদের ফরজ নামায নাবালকের ইমামতিতে শুদ্ধ হয় না।

ইমাম নামায পূর্ণাঙ্গ করে নাই, মোক্তাদী পূর্ণাঙ্গ করিয়াছে :

৪১৫। হাদীছ :—আবু হোরাযরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছালামাহ আল্লাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এক শ্রেণীর লোক (জবরদস্তিমূলক) ইমাম হইয়া তোমাদের নামায পড়াইবে। তাহারা যদি পূর্ণাঙ্গ সুন্দররূপে নামায পড়ায় তবে ত (তাহাদের এবং) তোমাদের (উভয়েরই) পূর্ণ ছওয়াব হইবে। আর যদি তাহারা ক্রটিযুক্ত নামায পড়ায় (কিন্তু তোমরা নিজেরা ক্রটি না কর) তবে তোমাদের ছওয়াব পূর্ণই থাকিবে, ক্রটির কতি শুধু তাহাদের উপর পড়িবে। (বন্ধনীর মধ্যবর্তী বাক্যাবলী কতছল বারী ২—১৪৯)।

ব্যাখ্যা :— হাদীছের বাক্য “যদি তাহারা ক্রটিযুক্ত নামায পড়ায়” এই বাক্যে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই হাদীছের উদ্দেশ্য মূল নামায ফাছেদ ও বিনষ্টকারী বিষয়াবলী নহে, বরং যাহা নামাযে শুধু ক্রটি অর্থাৎ নামাযের সৌন্দর্য্য বিনষ্টকারী পরিগণিত। যেমন, নামাযে ‘খুণ্ড-খুণ্ড’—আল্লাহ তায়ালা প্রতি এক ধ্যানে একাগ্রচিত্তে ধীর-স্থিরতার সহিত নামায পড়া, প্রয়োজনের অধিক শুদ্ধরূপে দোয়া তছবীহ ও কেব্রাত পড়া ইত্যাদি বহু রকমের মহাআলাহ রহিয়াছে। এই সব সম্পর্কে ইমাম এবং মোক্তাদী প্রত্যেকে নিজ নিজ চেষ্টা ও যত্ন পরিমাণ ছওয়াব লাভ করিবে। পক্ষান্তরে নামায ফাছেদ ও বিনষ্টকারী

কোন কাজ শুধু ইমাম একা করিলে মোক্তাদীদের সকলের নামাযও ফাছেদ হইয়া যাইবে। এমনকি যদি ইমাম উহা পুনঃ আদায় না করে তবুও মোক্তাদীদের উহা পুনরায় পড়া ফরজ থাকিয়া যাইবে। অবশ্য যদি মোক্তাদী ইমামের ঐ কার্য জানিতে না পারে তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা।

বিজোহীদের নিযুক্ত ইমামের মোক্তাদী হওয়া

৪১৬। হাদীছ :—আ'দী ইবনে খেয়ার (রাঃ) খলীফা ওসমানের (রাঃ) নিকট গেলেন, যখন তিনি বিজোহীদের দ্বারা গৃহে আবদ্ধ ছিলেন এবং মদীনার মসজিদে বিজোহীদের নিযুক্ত ইমাম ছিল। সেই বিষয়েই আ'দী ইবনে খেয়ার ওসমান (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন—মোসলমানদের প্রকৃত শাসনকর্তা আপনি ; কিন্তু আপনার ত এই অবস্থা এবং বিজোহীদের নিযুক্ত ইমাম আমাদের নামায পড়াইয়া থাকে ; এই ইমামের পেছনে নামায পড়া আমরা গোনাহ মনে করি। ওসমান (রাঃ) বলিলেন, বিজোহীরা প্রবল হইয়া গিয়াছে ; এখন তাহাদের ভাল কাজে যোগদান কর, মন্দ কাজে শরীক হইও না। সেমতে নামায মোসলমানদের সর্বোত্তম আমল, যখন সকলে এই আমলটি আদায় করে তখন তুমিও উহাতে যোগদান কর।

মহুআলাহ :—বেদাতী ব্যক্তির পেছনে নামায শুদ্ধ হয়। হাসান বহরী (রঃ)কে এই মহুআলাহ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছেন, বেদাতী ব্যক্তির পেছনে নামায পড় (জমাত ছাড়িও না) ; তাহার বেদাতের গোনাহ তাহার উপর থাকিবে।

এক্ষেত্রে দুইটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। একটি এই যে—কোন ক্ষেত্রে কাহাকেও ইমাম বানাইতে অবশ্যই লক্ষ্য রাখিবে যে, সে যেন বেদাতী না হয়। বেদাতী ব্যক্তিকে ইমাম বানান জায়েয নয় ; যাহারা বেদাতী ব্যক্তিকে ইমাম বানাইবে তাহারা গোনাহগার হইবে। কিন্তু কোন মসজিদে বা কোন ক্ষেত্রে এমন এক ব্যক্তি ইমাম হইয়াছে যে বেদাতী এবং ঐ বেদাতী ইমামের জমাতে शामिल না হইলে জমাতহীন একা নামায পড়া ছাড়া গতাস্তর নাই, এরূপ ক্ষেত্রে জমাত না ছাড়িয়া বেদাতী ইমামের জমাতে शामिल হইবে ; হাসান বহরী রহমতুল্লাহে আলাইহের কতওয়ার মর্ম ইহাই।

আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এস্থলে “বেদাত” বলিতে শুধু এরূপ গহিত কাজ উদ্দেশ্য যাহা ফাছেকী, কুফুরী বা শেরেকী গোনাহের কাজ বা এরূপ আকিদা ও মতবাদ ভিত্তিক কাজ নহে। ফাছেকী-বেদাতে লিপ্ত ব্যক্তির পেছনে নামায পড়িবে না ; কুফুরী ও শেরেকী-বেদাতে লিপ্ত ব্যক্তির পেছনে নামায শুদ্ধ হইবে না।

মহুআলাহ :—ইমাম যুহরী (রঃ) বলিয়াছেন, মেয়েলী স্বভাব চরিত্র, মেয়েলী বেশ-ভূষা মেয়েলী চালচলন অবলম্বনকারীর পেছনে নামায পড়া শক্ত মকরুহ ; গতাস্তরহীন অনিবার্য প্রয়োজন ছাড়া এরূপ লোকের পেছনে নামায পড়িবে না।

এরূপ দীর্ঘ কেরাত পড়িবে না বাহাতে কর্মব্যস্ত ব্যক্তিগণ জমাতে যোগদানে বিরত থাকে

৪১৭। হাদীছ :—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোয়াজ্জ ইবনে জাবাল (রাঃ) স্বীয় মহল্লার মসজিদে ইমাম ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অভ্যাস এই ছিল যে, তিনি সন্ধ্যার পর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইতেন এবং এশার নামায পর্য্যন্ত তাঁহার খেদমতেই থাকিতেন। এমনকি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এশার জমাতে নামায পড়িয়া তারপর স্বীয় মহল্লার মসজিদে গাইয়া এশার নামাযের ইমামতী করিতেন। ইহাতে স্বভাবতঃই এই মসজিদে এশার নামায পড়িতে অধিক রাত্র হইয়া গাইত। একদা এই মহল্লাবাসী একজন শ্রমিক শ্রেণীর লোক সারাদিন পরিশ্রম করিয়া বাড়ী ফিরিয়া সেও এই মসজিদে এশার নামাযের জমাতে আসিল। জমাতের ইমাম মোয়াজ্জ ইবনে জাবাল একে ত মসজিদে উপস্থিত হইতেই বিলম্ব করিয়া থাকেন, তত্পরি অত্ন তিনি (আড়াই ছিপায়া ব্যাপী সুদীর্ঘ) ছুরা বাকারার আরম্ভ করিয়া দিলেন। শ্রমিক ব্যক্তি ইহা দেখিয়া জমাত ছাড়িয়া দিল এবং একাকী নামায পড়িয়া বাড়ী চলিয়া গেল। মসজিদের ইমাম মোয়াজ্জ ইবনে জাবাল (রাঃ) নামাযান্তে এই খবর শুনিয়া ঐ ব্যক্তির প্রতি ভৎসনা করিলেন। ঐ ব্যক্তি উহা শুনিতে পাইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল এবং মোয়াজ্জ এশার নামায পড়াইতে অত্যন্ত বিলম্বে আসিয়া থাকেন, তত্পরি তিনি ছুরা বাকারার ত্রায় সুদীর্ঘ ছুরা আরম্ভ করেন; এই বলিয়া সে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) মোয়াজ্জ ইবনে জাবালের প্রতি রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, হে মোয়াজ্জ! তুমি কি লোকদিগকে নামায হইতে তাড়াইতে চাও? এই ভাবে তিনি তাঁহার প্রতি তিনবার কটাক্ষ করিলেন এবং সর্বদার জন্ত সতর্ক করতঃ **والليل اذا - سبع اسم ربك الاعلى - والشمس وضحاها** কয়েকটি মধ্য আকারের ছুরার নাম বলিয়া এই সমস্ত ছুরা দ্বারা নামায পড়াইবার আদেশ দিলেন। (ইহাও বলিয়া দিলেন যে, আমার সঙ্গে নামায পড়িয়া তারপর দীর্ঘ ইমামতী করিতে পারিবে না। হয় ত শুধু আগার সঙ্গেই নামায পড়িবে, না হয় শুধু ইমামতীই করিবে, কিন্তু দীর্ঘতা অলম্বন করিবে না) এবং বলিলেন, তোমার লক্ষ্য রাখিতে হইবে, জমাতের মধ্যে বৃদ্ধ, দুর্বল ও কর্মব্যস্তগণও থাকিতে পারে। (৭৬নং হাদীছও এখানে উল্লেখ আছে।)

মহুআলাহ :—কোন নামায একবার পড়ার পর দ্বিতীয়বার ঐ নামাযেরই ইমামতী করা জায়েয আছে (৮৯ পৃ: ৪১৭ হাঃ)। ইহা কোন কোন ইমামের মত; হানফী মজহাব মতে এরূপ করা জায়েয নহে; এরূপ করিলে মোক্তাদীদের ফরজ নামায আদায় হইবে না। অবশ্য কোন নামাযের জমাত হইতেছে, এক ব্যক্তি অন্তত মোকারর ইমাম; সে ঐ জমাতে शामिल হইয়াছে, কিন্তু নফলের নিম্নাত করিয়া शामिल হইয়াছে, অতঃপর

নিজ মসজিদে যাইয়া ফরজের নিয়াতে ঐ নামাযের ইমামতী করিয়াছে—ইহা হানকী মজহাব মতেও জায়েয আছে এবং এই অবস্থায় মোক্তাদীদের ফরজ আদায় হইয়া যাইবে।

মছআলাহ :—কোন ব্যক্তি তাহার বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে বা ইমামের লম্বা নামায কারণ-বিশেষে তাহার পক্ষে অসহণীয়; সেই ব্যক্তি ইমামের লম্বা নামায ত্যাগ করতঃ একা নামায পড়িলে তাহার গোনাহ হইবে না। অবশ্য জমাতের স্থান হইতে যথাসম্ভব দূরে বা নিজ গৃহে আসিয়া পড়িবে (২৭ পৃঃ)।

মছআলাহ :—ইমাম (নিয়মিত স্মরণ তরিকা অপেক্ষা) অধিক লম্বা নামায পড়াইলে সে সম্পর্কে অভিযোগ করা এবং উৎকর্ষা প্রকাশ করা যায় (ঐ)।

একাকী নামায পড়িলে দীর্ঘ নামায পড়িতে পারে

৪১৮। **হাদীছ :**—আবু হোরাযরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম করমাইয়াছেন, যখন তুমি অন্ত লোকদের ইমাম হও, তখন নামাযকে অধিক দীর্ঘ করিও না। কারণ, তাহাদের মধ্যে দুর্বল, রুগ্ন এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিও থাকে। আর যখন তুমি একাকী নামায পড় তখন যতদূর ইচ্ছা দীর্ঘ নামায পড়।

কম সময় নামায পড়িলেও আরকান-আহকাম

সুষ্ঠু রূপে আদায় করিবে

৪১৯। **হাদীছ :**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (জমাতের) নামায অল্প সময়ে শেষ করিতেন। কিন্তু অতি সুন্দর ও সুষ্ঠু রূপে আদায় করিতেন।

কোন কারণে অল্প সময়ে নামায শেষ করিয়া দেওয়া জায়েয

৪২০। **হাদীছ :**—আবু কাতাদাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন কোন সময় এরূপ হয় যে, আমি নামায আরম্ভ করি এবং উহা দীর্ঘরূপে পড়িতে ইচ্ছা করি, কিন্তু আশ-পাশের শিশুদের জন্মন শুনিয়া ঐ নামায অল্প সময়ে শেষ করিয়া দেই। কারণ, হয় ত ঐ শিশুদের মাতা জমাতে যোগদান করিয়াছে, সে বিচলিত হইবে।

৪২১। **হাদীছ :**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অল্প সময়ে নামায পড়িলেও যেরূপ সুন্দর ও সুষ্ঠু রূপে নামায আদায় করিতেন, এরূপ আর কাহাকেও দেখি নাই। তিনি জমাতে নামায পড়ার সময় যদি আশ-পাশে শিশুদের জন্মন শুনিতে পাইতেন, তবে অল্প সময়েই নামায শেষ করিয়া দিতেন। জমাতে যোগদান কারিণী ঐ শিশুর মাতা যেন বিচলিত না হয়।

নামাযে কাঁদিলে

আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (রাঃ) বিশিষ্ট তাবেয়ী, তিনি বলেন—আমি জন্মতে নামায পড়িতেছিলাম, খলীফা ওমর (রাঃ) ইমাম ছিলেন। আমি পেছনের সারিতে দাঁড়াইয়াছিলাম। ওমর (রাঃ) নামায অবস্থায় (খোদার ভয়ে) উদ্গত ক্রন্দন চাপিয়া রাখার দরুন তাঁহার সীনা ও কণ্ঠনালীর ভিতরে যে শব্দ হইতেছিল, আমি পেছনে থাকিয়াও তাহা শুনিতেছিলাম।

মহুআলাহ :- আল্লাহ তায়ালার প্রতি কাতরতা অনুরক্তি বা ভয়ের প্রভাবে যে কোন প্রকারে কাঁদিলে নামায নষ্ট হইবে না। অন্য কারণে সশব্দে কাঁদিলে নামায ফাসেদ হইবে।

একামত আরশুই কাতার সোজা করিবে, প্রয়োজন হইলে

পরেও উহার জন্য তৎপর হইবে

৪২২। হাদীছ :- عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتُسَوَّنَ مَقُوفُكُمْ أَوْ لَيُخَا لَفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ

অর্থ :- নো'মান ইবনে বশীর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালাল্লাছ আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, খবরদার হুশিয়ার! তোমরা নামাযের মধ্যে সোজাভাবে সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবে। অন্যথায় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি করিয়া দিবেন।

ব্যাখ্যা :- নামাযের মধ্যে কাতার বাঁকা করিয়া দাঁড়ান একটি সাধারণ বিষয় মনে করা হইয়া থাকে, কিন্তু উহার কুকল বড়ই মারাত্মক। ইহার দরুন আল্লাহ তায়ালা পরস্পরের বিরোধ, বিভেদ ও বিবাদ সৃষ্টি করিয়া দেন। বর্তমান মোসলমানদের অবস্থা দেখিলেই রসূলুল্লাহ ছালাল্লাছ আলাইহে অসাল্লামের উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইয়া যাইবে। পরস্পর বিভেদ ও বিবাদ বড় শাস্তি যাহা জ্ঞানী মাত্রই উপলব্ধি করিতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফের বহু স্থানে ইহুদ ও নাছারাদের উপর শ্রীয় গজব ও আজাবের উল্লেখপূর্বক বলিয়াছেন—“আমি তাহাদের মধ্যে পরস্পর হিংসা, বিদ্বেষ, বিভেদ ও বিবাদের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি।”

মূল হাদীছটির অর্থ একরূপও বলা হয়, “তোমরা নামাযের মধ্যে সোজাভাবে সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবে। নতুবা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের আকৃতি বিকৃত করিয়া দিতে পারেন।”

কাতার সোজা করিতে ইমাম তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে

৪২৩। হাদীছ :- আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা নামাযের একামত শেষ হইয়া গেলে পর, রসূলুল্লাহ ছালাল্লাছ আলাইহে অসাল্লাম আমাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, সোজা সারিবদ্ধভাবে পরস্পর মিলিত হইয়া দাঁড়াও। স্মরণ রাখিও, আমি পেছনের দিকেও তোমাদিগকে দেখি। (২৭১ নং হাদীছের নোট দ্রষ্টব্য।)

কাতার সোজা করা নামাযের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ

৪২৪। হাদীছ :- আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম করমাইয়াছেন, কাতার সোজা কর। কাতার সোজা করা নামাযের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

৪২৫। হাদীছ :- আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, নামাযের মধ্যে কাতার সোজা করিয়া দাঁড়াও। কারণ, উহার উপর নামাযের সৌন্দর্য নির্ভর করে।

কাতার সোজা এবং পূর্ণ না করা গোনাহ

৪২৬। হাদীছ :- (রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের বহু দিন পর) ছাহাবী আনাছ (রাঃ) বছরা হইতে মদীনায় আদিলেন। কোন এক ব্যক্তি তাঁহাকে দ্বিজ্ঞাসা করিল, আপনি রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের বমানার অগ্রগাতে আমাদের মধ্যে কি কি দোষ-ত্রুটি দেখিতে পান? তিনি বলিলেন অত্র কোন দোষ বিশেষরূপে ব্যক্ত করিতে চাই না, কিন্তু এই একটি দোষ যে, তোমরা নামাযের মধ্যে কাতার ঠিক ও হুরস্ত কর না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :- এখানে ৩৯৭ নং হাদীছ উল্লেখ করিয়া ইমাম বোখারী (রঃ) প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রথম কাতারের কজিলত অনেক বেশী।

পরস্পর লাগালাগি হইয়া সারি বাঁধিবে কীক রাখিবে না

ছাহাবী নোমান ইবনে বশীর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমাদের (তথা ছাহাবীমের প্রত্যেকেই দেখিয়াছি, নিজ সঙ্গীর কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া এবং পরস্পর পায়ের গিঁঠ মিলাইয়া নামাযে দাঁড়াইতেন।

আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, (জমাতে নামায পড়িতে) আমাদের প্রত্যেকেই নিজ সঙ্গীর কাঁধে কাঁধ ও পায়ের পা মিলাইয়া দাঁড়াইতেন।

পাঠকবৃন্দ! একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, পরস্পর পা মিলাইয়া দাঁড়ানোর উদ্দেশ্য এই নয় যে, বস্তুতঃ একে অঙ্গের পায়ের সহিত পা মিলাইয়া দাঁড়াইতে হইবে। সে জুহুই এখানে কাঁধের এবং পায়ের গিঁঠেরও উল্লেখ আছে; অথচ সারি বাঁধিতে পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলানো সহজ ব্যাপার নহে এবং পায়ের গিঁঠে গিঁঠ মিলানো ত সম্ভবই নহে। এখানে এই সমস্ত বাক্যের দ্বারা বস্তুতঃ দুইটি বিষয়ে তৎপর হওয়ার আদেশ করাই আসল উদ্দেশ্য। প্রথম—এই যে, খুব সোজাভাবে সারি বাঁধিবে; যেসকল কাঁধে কাঁধ ও পায়ের পা মিলাইয়া দাঁড়াইলে স্বভাবতঃই উহা হইয়া থাকে এবং কাতার সোজা করার ইহা অগ্রতম উপায়। দ্বিতীয়—এই যে, যথাসাধ্য লাগালাগি দাঁড়াইবে; মধ্যভাগে কীক ছাড়িবে না।

অনেক হাদীছে এরূপ উল্লেখ আছে যে, মধ্যভাগে একটু কঁক থাকিলে শয়তান সেখানে আদিয়া প্রবেশ করে (নামাযীদের অন্তরে ওঙ্-ওয়াছার সৃষ্টি করে)।

আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উক্তি কাঁধে কাঁধ এবং পায়ে পা মিলানর একমাত্র উদ্দেশ্য যে ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণও বিদ্যমান রহিয়াছে যে, আনাছ (রাঃ) তাহার উক্তির ভিত্তি নিয়ে বর্ণিত হাদীছটির উপর স্থাপন করিয়াছেন।

৪২৭। হাদীছ:—

مِنْ اَنْسِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَيْتُمُوْا مَغُوْزُكُمْ فَاِنِّيْ اَرَاكُمْ مِنْ وَّرَآءِ ظَهْرِيْ.....

অর্থ:—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা কাতার খুব সোজা করিয়া দাঁড়াইবে; আমি আমার পেছন দিকেও দেখিয়া থাকি+। আনাছ (রাঃ) বলেন—সেমতে আগাদের প্রত্যেকেই কাঁধে কাঁধ এবং পায়ে পা মিলাইয়া থাকিত।

মহিলা একজন হইলেও একাই সকলের পেছনে দাঁড়াইবে

৪২৮। হাদীছ:—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদের গৃহে (নফল) নাগায় পড়িলেন। আমি এবং অল্প একটি বালক—হয়রতের পেছনে দাঁড়াইলাম, আর আমার মাতা উম্মে-ছোলায়ম আমাদের পেছনে দাঁড়াইলেন।

ইমাম ও মোক্তাদীদের মধ্যে আড়াল থাকিলে?

হাসান বহরী (রঃ) বলেন, ইমাম ও মোক্তাদীদের মধ্যে (ছোট) নালা থাকিলে দোষ নাই। আবু মেজ্‌লায (রঃ) বলেন, মধ্যভাগে (ছোট) রাস্তা বা দেওয়াল থাকিলেও ইমামের সঙ্গে একত্রে গুচ্ছ হইবে যদি ইমামের রুকু-সেজদা জানিবার ব্যবস্থা করা হয়।

ব্যাখ্যা:—মধ্যস্থলে বড় রাস্তা বা খাল ইত্যাদির কঁক রাখিয়া উহার অপর পারে দাঁড়াইয়া একত্রে করিলে সেই একত্রে গুচ্ছ হইবে না। এবং ইমামের আড়ালে এমন স্থানে একত্রে গুচ্ছ নহে যে স্থান হইতে ইমামের রুকু-সেজদা, উঠা-বসা ইত্যাদি জ্ঞাত হইবার ব্যবস্থা নাই। যদি সেই ব্যবস্থা করা হয় বা ইমামের তকবীরের আওয়াজ শুনা যায় তবে একত্রে গুচ্ছ হইবে।

+ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পেছন দিকে দেখা সম্পর্কে ২৭১ নং হাদীছের নোট দেখুন।

৪২৯। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গৃহ সংলগ্ন যে ছাদহীন ঘেরাও করা স্থানটি ছিল, সেখানে দাঁড়াইয়া তিনি তাহাজ্জুদের নামায পড়িতেন। ঐ ঘেরাও-এর দেওয়ালটি নীচ ছিল; তাই একদা কয়েকজন লোক তাঁহাকে নামায পড়িতে দেখিয়া (দেয়ালের অপর পার্শ্ব হইতে) তাঁহার সহিত একত্বেদা করিয়া তাহাজ্জুদ পড়িল। সকাল বেলা তাহারা বলাবলি করিলে দ্বিতীয় রাত্রে আরও কয়েক জন লোক জুটিয়া গেল, তাহারাও এইভাবে তাহাজ্জুদ পড়িল। দুই-তিন রাত্র তাহারা এইরূপে রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সহিত তাহাজ্জুদ পড়িল। তারপরের রাত্রিতে রসুলুল্লাহ (দঃ) ঘর হইতে বাহির হইলেন না। সকালবেলা সকলেই তাঁহার নিকট এ বিষয়ে আলোচনা করিলে হযরত (দঃ) ফরমাইলেন, আমার আশঙ্কা হইতেছিল, এরূপে সমবেতভাবে তামরা তাহাজ্জুদ পড়িতে থাকিলে আল্লাহ তায়ালা তাহাজ্জুদকে তোমাদের উপর ফরজ করিয়া দিতে পারেন। (তাহাতে উম্মতের উপর ফরজের চাপ বাড়িয়া যাইত। হযরত (দঃ) সর্বদা উম্মতের জন্য সহজ পন্থা কামনা করিতেন।)

৪৩০। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি চাটাই ছিল; (মসজিদে এ'তেকাফ কালে) দিনের বেলা তিনি উহা বিছাইতেন এবং রাত্রিকালে উহা দ্বারা ঘেরাও করিয়া ভিতরে তাহাজ্জুদের নামায পড়িতেন। কয়েকজন লোক খোঁজ পাইয়া ঐ ঘেরাও-এর পেছন হইতে একত্বেদা করিয়া তাহাজ্জুদ পড়িল।

৪৩১। হাদীছ :—যায়েদ ইবনে হাবেস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমজান মাসে মসজিদে এ'তেকাফ করিলেন এবং মসজিদের ভিতরেই চাটাই দ্বারা ঘেরাও করিয়া উহাতে তিনি (রাত্রে তাহাজ্জুদ) নামায পড়িতেন; ছাহাবী-গণও ঐ ঘেরাওয়ের বাহির হইতে তাঁহার সঙ্গে একত্বেদা করিয়া ঐ নামাযে শরীক হইতে লাগিলেন। হযরত (দঃ) যখন ইহা জানিতে পারিলেন, তখন তিনি পূর্ব দিনের স্নায় লোকগণ তাঁহার সঙ্গে शामिल হওয়ার সুযোগ পায় সেইরূপে তাহাজ্জুদ নামায পড়া হইতে বিরত থাকিলেন; (এমনকি ছাহাবীগণ যখন দেখিলেন যে, তিনি আজ পূর্বের স্নায় নামায আরম্ভ করিতেছেন না,) তাঁহারা ভাবিলেন—বোধ হয় তিনি আজ নিজামগ্ন রহিয়াছেন বা অশু কাঙ্ক্ষে লিপ্ত আছেন ইত্যাদি। তাই তাঁহারা হযরতের নিকটবর্তী স্থান হইতে গলা থাকরান আরম্ভ করিলেন। (কিন্তু হযরত (দঃ) কিছুতেই সাড়া দিলেন না।) পরদিন হযরত (দঃ) সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, রাত্রিকালে তোমরা যাহা করিয়াছ আমি সব উপলব্ধি করিয়াছি; (আমি যাহা করিয়াছি ইচ্ছা করিয়াই করিয়াছি। ফরজ ভিন্ন অন্য নামাযের জন্য জমা'তের এরূপ পাবলি আমি করি না। তাহাজ্জুদ ইত্যাদি নফল) নামায তোমরা নিজ ঘরে পড়িবে করছ ভিন্ন অন্য নামায নিজ নিজ ঘরে পড়াই শ্রেয়ঃ।

নামাযের মধ্যে কোন্ কোন্ স্থানে হাত উঠাইবে এবং হাত কতদূর উঠাইবে

৪৩২। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছালামাহ আলাইহে অসাল্লামকে দেখিয়াছি—যখন নামায আরম্ভ করার জন্য তকবীর বলিতেন তখন তিনি উভয় হাত উপরের দিকে উঠাইতেন; এত দূর যে, (হাতের তালু কাঁধ বরাবর উঠিত)। × রুকুতে যাইবার জন্য তকবীর বলার সময়ও ঐরূপ হাত উঠাইতেন এবং রুকু হইতে উঠিয়া “ছামিয়াল্লাহু লেমান-হামিদাহ” বলার সময়ও হাত উঠাইতেন এবং “রাব্বানা ওয়া-লাকাল-হামদু” বলিতেন। কিন্তু সেজদায় যাইবার সময় বা সেজদা হইতে উঠিবার সময় হাত উঠাইতেন না।

৪৩৩। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) যখন নামায আরম্ভ করিতেন তখন হাত উঠাইতেন এবং যখন রুকুতে যাইতেন ও রুকু হইতে উঠিতেন এবং দুই রাকাতের পর অর্থাৎ প্রথম আত্মাহিয্যাতের জন্য বসা হইতে যখন দাঁড়াইতেন তখনও হাত উঠাইতেন। তিনি ইহাও বলিতেন যে, আমি নবী ছালামাহ আলাইহে অসাল্লামকে ঐরূপ করিতে দেখিয়াছি।

৪৩৪। হাদীছ :—মালেক ইবনে হোয়াইরেছ (রাঃ) যখন তকবীর বলিয়া নামায আরম্ভ করিতেন তখন হাত উঠাইতেন, আর রুকুতে যাইবার পূর্বে এবং রুকু হইতে উঠিয়াও হাত উঠাইতেন। তিনি ইহাও বলিতেন যে, আমি হযরত রশূল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লামকে ঐরূপ করিতে দেখিয়াছি।

(এই হাদীছটি “নাছারী শরীফে” ছহীহরূপে বর্ণিত আছে। সেখানে ইহাও উল্লেখ আছে, সেজদায় যাওয়ার পূর্বে এবং সেজদা হইতে উঠিয়াও হাত উঠাইতেন)।

ব্যাখ্যা :—নামায আরম্ভ করার তকবীরের সময় হাত উঠাইতে হইবে ইহাতে দ্বিমত নাই। অল্প কোন স্থানে হাত উঠাইবার বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ভিন্ন অল্পাংশ ইমামগণ ৪৩২নং হাদীছ অনুযায়ী আরও দুই স্থানে হাত উঠাইবার মত প্রকাশ করেন। আবু হানিফা (রঃ) প্রথম স্থান ব্যতীত অল্প কোন স্থানে হাত উঠাইতে বলেন না। তাহার দলীল এই যে—বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) এই বিষয়ে রশূল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লামের রীতি স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন ও কার্যে দেখাইয়াছেন যে, রশূল্লাহ (সঃ) নামায আরম্ভের তকবীরের সময় ব্যতীত অল্প কোনও স্থানে হাত উঠাইতেন না। †

× নামাযের মধ্যে হাত কি পর্যন্ত উঠাইবে সে বিষয়ে তিনটি হাদীছ বর্ণিত আছে—কানের উপরি ভাগ পর্যন্ত, কানের লতি পর্যন্ত এবং কাঁধ পর্যন্ত। উক্ত হাদীছ সমূহ দৃষ্টে সর্বোত্তম পন্থা এই যে, হাত এতদূর উঠাইবে যে, হাতের বড় আঙ্গুলগুলি কানের উপরি ভাগ পর্যন্ত ও বৃদ্ধাঙ্গুলী কানের লতি পর্যন্ত এবং হাতের তালুর অংশ কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে।

† আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এই হাদীছখানা নাছারী শরীফে বর্ণিত আছে এবং হাদীছটি নিঃসন্দেহে ছহীহ প্রমাণিত হইয়াছে।

পাঠকবৃন্দ। স্মরণ রাখিবেন, এখানে ইমামগণের যে মতভেদ আছে ইহা অতি সামান্য। ইমাম আবু হানিফার বক্তব্য এই যে, প্রথমে রশুন্নাহ ছালাল্লাহ্ আলাইহে অসাল্লামের রীতি ছিল—ককু, সেজদা ইত্যাদি প্রত্যেক উঠা-দসার ক্ষেত্রে হাত উঠান। যেমন—৪৩২, ৪৩৩ ও ৪৩৬নং হাদীছসমূহকে সমষ্টিগতভাবে লক্ষ্য করিলেই প্রমাণিত হয়। কিন্তু পরে ৪৩২ নং হাদীছ দ্বারা ৪৩৩, ৪৩৪ নং হাদীছে বর্ণিত রীতিকে শিথিল করা হয়। লক্ষ্য করুন—৪৩৪ নং হাদীছে সেজদার সময় হাত উঠাইবার বিষয় উল্লেখ আছে, কিন্তু ৪৩২নং হাদীছে উহার বিপরীত উল্লেখ হইয়াছে এবং ৪৩৩ নং হাদীছে দুই রাকাত হইতে দাঁড়াইয়া হাত উঠাইবার কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু ৪৩২ নং হাদীছে তাহা নাই। অতঃপর ৪৩২ নং হাদীছে বর্ণিত রীতিও পরিবর্তিত হয়, যেমন—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদের হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। এই কারণেই ৪৩২ নং হাদীছ বর্ণনকারী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) নিজেই শেষ পর্য্যন্ত ককু ইত্যাদিতে হাত উঠান ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তাহার পিতা ওমর (রাঃ)ও তজ্রপই করিতেন, আরও অসংখ্য ছাহাবী এইরূপই করিতেন। তাই ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) বলেন, সর্বপ্রথম স্থান ব্যতীত অন্য স্থানসমূহে হাত উঠাইবার রীতি রশুন্নাহ (দঃ) ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; উহা স্মৃতি রূপে পরিগণিত থাকে নাই, তবে এখনও কেহ ঐরূপ করিলে তাহার নামায নষ্ট হইবে না।

অত্যাশ্চর্য ইমামগণ ঐ একমাত্র ৪৩২ নং হাদীছের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, উক্ত হাদীছে বর্ণিত দুই স্থানে হাত উঠানও স্মৃতিরূপে প্রচলিত আছে ও থাকিবে। তবে তাহারও বলেন যে, কেহ এইরূপ না করিলে তাহার নামায নষ্ট হইবে না। সুতরাং এত সামান্য বিষয় লইয়া বিবাদ-বিদ্বেষ সৃষ্টি করা অজ্ঞানের পরিচায়ক হইবে।

নামাযে দাঁড়ান অবস্থায় ডান হাত বাম হাতের উপর রাখিবে

৪৩৫। হাদীছ :—সাহল ইবনে সায়া'দ (রাঃ) নবী ছালাল্লাহ্ আলাইহে অসাল্লাম হইতে এই আদেশ বর্ণনা করিয়াছেন যে, নামাযের মধ্যে (দাঁড়ান অবস্থায়) লোকেরা ডান হাত বাম হাতের উপর রাখিবে।

নামাযে আল্লার প্রতি ধ্যান ও একাগ্রতা বজায় রাখা কর্তব্য

৪৩৬। হাদীছ :—আবু হোরাযরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রশুন্নাহ ছালাল্লাহ্ আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তোমরা কি ধারণা করিয়া থাক যে, আমার দৃষ্টি একমাত্র কেবলার দিকে; (আমি পেছন দিকের খবর রাখি না?) আমি শপথ করিয়া বলিতেছি—তোমরা কিরূপ ককু কর, আল্লার প্রতি কতটুকু ধ্যান ও মগ্নতা রাখ তাহা সবই আমি জ্ঞাত থাকি। আমি আমার পেছনেও দেখিতে পাই। তোমরা ককু সেজদা ভালরূপে আদায় করিও। (২৭১ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।)

নাগায আরম্ভ করিতে তকবীর বলার পর কি পড়িবে ?

৪৩৭। হাদীছ :- আবু হোরায়ারা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তকবীরে-তাহরীমা ও কেরাত আরম্ভ করার মধ্যে অল্প সময় চুপে চুপে কিছু পড়িতেন। আমি আরম্ভ করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) ! আমার মাতাপিতা আপনার চরণে উৎসর্গ। আপনি চুপ থাকাবস্থায় কি পড়েন ? তিনি বলিলেন, এই দোয়া পড়িয়া থাকি—

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ

تَقْنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُتَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ

أَسْأَلُ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ *

অর্থ :- হে খোদা ! আমাকে সর্বপ্রকার পাপ ও কুর্কর্ম হইতে এত অধিক দূরে রাখ যেরূপ ছরহ সূর্য্য উদয় ও অস্তের স্থানদ্বয়ের মধ্যে আছে। (অর্থাৎ আমাকে পাপ ও গোনাহ হইতে বাঁচাইয়া রাখ। আর যদি আমারই ক্রটির দরুন কোন পাপ আমার দ্বারা সংগঠিত হইয়া যায়, তবে) হে খোদা ! (আমার গোনাহসমূহকে মাফ করিয়া) আমাকে এরূপ পরিচ্ছন্ন ও পরিতৃপ্ত করিয়া দাও যেমন সাদা কাপড়ের ময়লা দূর করিয়া পরিকার করা হয়। (যাবৎ একটুকুও ময়লা বা দাগ থাকে উহার ধৌত কার্য্য দ্বন্দ্ব হয় না।) হে খোদা ! আমার গোনাহসমূহকে ঠাণ্ডা পানি, বরফের পানি ও শিলের পানি দ্বারা ধৌত করিয়া দাও।

প্রশ্ন—ধৌত কার্য্যের জন্য ত গরম পানি শ্রেয় ; ঠাণ্ডা ও বরফের পানি নয়।

উত্তর—লক্ষ্য করুন। আপনি একটি আনের আঁটি মাটিতে পুঁতিয়া রাখিলে কিছুদিন পর ঐ আনের আঁটিই আপনার সম্মুখে মাটির উপর আম গাছ রূপে আত্মপ্রকাশ করিবে। তেমনিভাবে ইহজগতে আমরা যে পাপ কার্য্য ও গোনাহ করিতেছি, পরকালে এ সমস্ত পাপ ও গোনাহসমূহই দোষখের আশুভরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে। তাই গোনাহের পরিণতি ও আকৃতি হইল আশুভ ; আশুভকে সমূলে নির্বাপিত করিতে বরফ ও শিলার পানির জায় ঠাণ্ডা পানিই শ্রেয়। অতএব গোনাহ ধৌতের ক্ষেত্রে শিলা ও বরফের পানির উল্লেখ সামঞ্জস্যপূর্ণই বটে।

* এখানে অত্যাশ্চর্য্য দোয়াও হুহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে ; একাকী নামায পড়াকালে বিভিন্ন দোয়া পড়া চাই, অবশ্য জমাতের নামাযে যেহেতু দীর্ঘতা অবলম্বন না করা উত্তম, তাই জমাতের সময় এখানে হানাফীগণ “ছানা” অবলম্বন করেন যাহা তিরমিজী শরীফের হাদীছে বর্ণিত আছে।

৪৩৮। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) নামাযের মধ্যে আল্‌হামদু লিল্লাহে রাব্বিল আ'লামীন হইতে কেরাত পড়া আরম্ভ করিতেন।

ব্যাখ্যা :—কেরাত অর্থ সশব্দে পড়া। নামাযের মধ্যে “আল্‌হামদু” হইতে সশব্দে পড়া আরম্ভ হয়। এর পূর্বে ছানা, তাআউজ, বিহ্মিল্লাহ নিঃশব্দে পড়া হইয়া থাকে। উপরোক্ত হাদীছের তাৎপর্য এই যে, আল্‌হামদু পূর্বে বিহ্মিল্লাহ ইত্যাদি সশব্দে পড়িতেন না। কিন্তু বিহ্মিল্লাহ ইত্যাদি চুপে চুপে পড়িতে হইলে তাহা অস্বাভাবিক হাদীছে উল্লেখ আছে।

নামাযের মধ্যে উপরের দিকে তাকান জায়েয নহে

৪৩৯। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা ভীষণ রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, যাহারা নামাযের মধ্যে উপরের দিকে তাকায়, তাহারা অনর্থক একরূপ কেন করে? নবী (সঃ) আরও বলিলেন, তাহারা যদি তাহাদের এই অভ্যাস হইতে বিরত না থাকে, তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে অন্ধ করিয়া দিতে পারেন।

নামাযের মধ্যে এদিক-ওদিক দেখা জায়েয নহে

৪৪০। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে নামাযের মধ্যে এদিক-ওদিক দেখার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। হযরত (সঃ) বলিলেন, ইহার দ্বারা শয়তান মানুষের নামায হইতে ছোঁ মারিয়া কিছু অংশ লইয়া যায় (অর্থাৎ নামাযকে পঙ্গু করে)।

মছআলাহ :—ইমাম বোখারী (সঃ) বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, মোক্তাদী তাহার ইমামের প্রতি তাকাইলে নামায নষ্ট হয় না (১০৩)।

মছআলাহ :—নামাযের মধ্যে কোন বিশেষ কারণ উপস্থিত হইলে শুধুমাত্র কোণ-চোখে উহার দিকে লক্ষ্য করা বা নামাযান্তে কর্তব্য বিষয়ক সম্মুখস্থ কোন বস্তুর প্রতি শুধু চোখের দৃষ্টিতে তাকান—সেমন, মসজিদের দেওয়ালে থু ইত্যাদি থাকিলে নামাযান্তে উহা পরিদ্রাঘ করিতে হইবে, তাই উহার প্রতি তাকান জায়েয আছে।

(১০৪ পৃঃ ২৬৬, ৪১০ হাঃ)

বিশেষ জ্ঞেয় :—ইমাম বোখারী (সঃ) এই পরিচ্ছেদে ২৪৮ নং হাদীছ উল্লেখ করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, দূরের কোন বস্তু নয়, স্বয়ং নামাযী ব্যক্তির শরীরের কোন কিছুই প্রতি লক্ষ্য করা যাহাতে নামাযের একাগ্রতার ত্রুটি আসে তাহাও বিশেষভাবে বর্জনীয়।

নামাযে প্রত্যেক ব্যক্তির উপরই কেরাত পড়া ওয়াজিব

৪৪১। হাদীছ :—ওবাদাহ ইবনে ছামে (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে আল্‌হামদু ছুরা না পড়িলে তাহার নামায হইবে না।

ব্যাখ্যা :—ইমাম আবু হানিফা (র:) ব্যতীত অন্যান্য অনেকই ইমাম মোক্তাদী উভয়কেই এই হাদীছের আওতাভুক্ত করিয়া বলেন যে, ইমাম এবং ইমামের পেছনে প্রত্যেক মোক্তাদিকেই আলহামছ ছুরা পড়িতে হইবে; ইমাম বোখারী (র:)ও তাহাই বলিয়াছেন। কিন্তু অল্প বড় বড় মোহাদেছগণ বলিয়াছেন, এই হাদীছের মূল উদ্দেশ্য ঐ নামাযী ব্যক্তি যে কোন ইমামের সঙ্গে মোক্তাদি না হয়। কারণ, মোক্তাদীদের জন্য ভিন্ন দুইটি বিশেষ হাদীছ বর্ণিত আছে। প্রথম হাদীছটির মর্ম এই যে রসূলুল্লাহ (স:) ফরমাইয়াছেন, ইমামের সঙ্গে একত্বদা করিলে কতকগুলি নিয়মের অনুসরণ করিতে হয়, যেমন—ইমাম “ছাগিয়াল্লাছ লিমান হামিদাহু” বলিলে মোক্তাদি উহা না বলিয়া তৎপরিবর্তে “রাব্বানা লাকাল হামদ” বলিবে। তেমনিভাবে **وَأَنْزَلُوا** ইমাম যখন পড়িবে তখন মোক্তাদিগণ (পড়ায় লিপ্ত না হইয়া) চুপ থাকিবে (মোসলেম শরীফ)। দ্বিতীয় হাদীছটি—রসূলুল্লাহ (স:) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন ইমামের একত্বদা করিবে, ইমামের কেরাতই তাহার পক্ষে কেরাত বলিয়া গণ্য হইবে (সে নিজে কেরাত পড়িবে না)। [ইবনে মাজাহ শরীফ]

এই বক্তব্য অনুসারে ইমাম আবু হানিফা (র:) বলেন, মোক্তাদি ইমামের সাথে যেরূপ অন্য ছুরা পড়ে না তজ্রপ আলহামছ ছুরাও পড়িবে না।

পাঠ্যকবন্দ। এখানেও ইমামগণের মতভেদ অতি সামান্য বিনয়ে। ইহা শুধু নিয়ম ও পদ্ধতির বিভিন্নতাঃ উভয় নিয়মেই মূল নামায শুদ্ধ হইবে, ইহাতে দ্বিমত নাই।

* তত্ত্বাত্ত ইমামগণ যে নিয়ম অবর্তন করিতে চাহেন উহা মুকলপ্রমুই বটে, কারণ মোক্তাদীগণ চুপ করিয়া দাড়াইয়া থাকিলে তাহাদের মন নানা চিন্তা ও খেয়ালে মত্ত হইবে, তাহাদের অন্তরে নানা অছওয়াছা উদয় হওয়ার সুযোগ পাইবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার বর্ণিত নিয়মের তাৎপর্য অতি গভীর যে—আলহামছ ছুরাটি হইল আল্লার দরবারে আরজী ও দরখাস্ত পেশ করা। আলহামছ ছুরার অর্থ ইহাই প্রমাণ করে, তা ছাড়া ইহার দ্বিতীয় নাম হইল “তা’লিমুল-মছআলাহ” অর্থাৎ দরখাস্তের মুসাবিহা। বাদশার দরবারে যখন একদল লোক কোন দরখাস্ত পেশ করিতে উপস্থিত হয় তখন অবশ্য দরবারের আদব-কায়দা সকলেরই আদায় করিতে হয়, কিন্তু আরজী ও দরখাস্ত পেশ করা বা যাহা কিছু বলার দরকার হয় তাহা একমাত্র তাহাদের নেতাই বলিয়া থাকেন। সকলে এক সঙ্গে বলা আরম্ভ করে না, বরং তাহারা চুপ করিয়া বাদশার শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাহার দরবারের মাহাত্ম্য ও প্রভাবের গান্ধীর্ঘ্যপূর্ণ ধ্যানে মগ্ন থাকে এবং আরজ সমাপ্তে সম্বর্জনসূচক কোন একটি শব্দ বলিয়া দেয় মাত্র। এখানেও তজ্রপ—তক্বীর, তছবীহ এবং ককু-সেজদা ইত্যাদি সম্ভাষণ ও আদব-কায়দা সকলেরই তামীল করিতে হইবে। আলহামছ ছুরার দ্বারা আরজী ও দরখাস্ত শুধু নেতাই (ইমাম) পেশ করিবেন। মোক্তাদিগণ সকলে আল্লার দরবারের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য ও প্রভাবের গান্ধীর্ঘ্যপূর্ণ ধ্যানে মগ্ন থাকিবে এবং ইমাম কর্তৃক দরখাস্ত পড়ায় শব্দ শুনা গেলে উহার প্রতিটি অক্ষরের প্রতি একাগ্রচিত্তে লক্ষ্য রাখিবে ও দরখাস্ত সমাপ্তে সম্ভাতিসূচক শব্দ ‘আমীন’ বলিবে। “আমীন” অর্থ—আমিও ইহাই চাই বা হে আল্লাহ কবুল করুন।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিভিন্ন নামাযের মধ্যে কেব্রাতের বিবরণ

৪৪২। হাদীছ :- আবু কাতাদাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জোহরের নামাযের প্রথম দুই রাকাতে আলহামদু ছুরার সঙ্গে অল্প ছুরাও পড়িতেন ; সময়ে কোন আয়াত সশব্দে পড়িতেন (যদ্বারা আমরা উহা উপলব্ধি করিতাম)। শেষের দুই রাকাতে শুধু আলহামদু ছুরা পড়িতেন এবং দ্বিতীয় রাকাত অপেক্ষা প্রথম রাকাতে দীর্ঘ কেব্রাত পড়িতেন। আছরের নামাযেও তদ্রূপই করিতেন। বজ্রের নামাযের প্রথম রাকাতে দীর্ঘ কেব্রাত পড়িতেন।

৪৪৩। হাদীছ :- আবু মামার (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা খাব্বাব (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রসুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কি জোহর ও আছরের নামাযে কিছু পড়িতেন ? তিনি বলিলেন, হাঁ। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহা আপনারা কিরূপে জ্ঞাত হইলেন ? (উক্ত দুই ওয়াক্তের নামাযে উচ্চৈশ্বরে কিছু পড়া হয় না।) তিনি বলিলেন, রসুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দাড়ি মোবারক যে নড়াচড়া করিত তাহা লক্ষ্য করিয়া আমরা উহা উপলব্ধি করিতাম।

৪৪৪। হাদীছ :- একদা ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছুরা “ওয়াল-মোরসালাত” তেলাওয়াত করিলেন। তাহার মাতা উহা শুনিয়া বলিলেন, হে প্রিয় পুত্র ! তুমি আমাকে একটি স্নদয় বিদারক ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিয়াছ। এই ছুরাটি শুনিয়া রসুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অন্তিমকালের কথা আমার মনে পড়িল। রসুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে

পাঠকগণ ! লক্ষ্য করিবেন ; এখানে ইমাম আবু হানিফার বক্তব্য দুইটি বিষয়ের সমষ্টি। প্রথম—মোক্তাদি হুপ করিয়া থাকিবে ; আলহামদু ছুরা পড়িবে না। দ্বিতীয়—তাহার অন্তর আল্লাহ ভয়-ভক্তি, সর্বশ্রেষ্ঠত্ব ও আল্লাহ দরবারের নানান প্রভাবে পরিপূর্ণ রাখিবে, অহওয়াহ বা অল্প খেয়াল তাহার অন্তরে যেন বিন্দুমাত্রও স্থান না পায়। সে যেন আল্লাহ দরবারে হাজির হইয়াছে, সে যেন আল্লাহকে দেখিতেছে ; আল্লাহও তাকে দেখিতেছেন ; এই অবস্থা তাহার উপর প্রযুক্তি করিতে হইবে। সে জন্তই হাদীছে বলা হইয়াছে—**الصلوة معراج المؤمن**। “প্রত্যেক মোমেনকে তাহার নামায মেরাজ (আল্লাহ দরবারে উপস্থিতি) রূপে পরিগণিত করিতে হইবে। বস্তুতঃ দ্বিতীয় বিষয়টি ইমাম আবু হানিফার আসল উদ্দেশ্য। ইহারই প্রতি বিশিষ্ট হাদীছ আছে। ইবনে মসউদ (রাঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাহাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আমি ইমামের পেছনে থাকাকালীন আলহামদু ছুরা পড়ি কি ? তিনি বলিলেন—**ان لك في الصلوة لشغلا**—“তোমার উপর নামাযের মধ্যে একটি অতি বড় বিশাল মগ্নতা ও ধ্যানের চাপ রহিয়াছে, তুমি উহাতেই নিয়োজিত থাক।”

আফছুহ। বর্তমান হানফী মজহাবের নামধারীরা প্রথম বিষয়টির প্রতি খুবই আগ্রহাষিত ; কারণ উহা সহজ আরামদায়ক। কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়টির জন্ত আদৌ কোন চেষ্টা করে না, ইহাতে ইমাম আবু হানিফার মজহাবের অনুসরণ হয় না, বরং অবমাননা করা হয়।

অসান্নামের সঙ্গে আমি যে নাযায পড়িয়াছিলাম উহা মগরেবের নাযায, সেই নামাযে তিনি এই ছুরাটি পাঠ করিয়াছিলেন।

৪৪৫। হাদীছ :- জোবারের ইবনে বোত্য়েম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি বশুলাম হালামাহ আলাইহে অসান্নামের সঙ্গে মগরেবের নাযায পড়িতেছিলাম, সেই নামাযে তিনি (২৭ পারার) ছুরা “ওয়াত-তুর” পড়িলেন। ঐ ছুরার নিম্নে বর্ণিত আয়াতটির বিষয়বস্তু এইরূপভাবে আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল যে, উহা শুনিয়া আমার মনে হইতেছিল, যেন আমার প্রাণ পানী উড়িয়া চলিয়া যাইবে।

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ - أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
بَلْ لَا يُوقِنُونَ - أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصِيطِرُونَ

অর্থ—(আল্লাহ তায়ালা এখানে নাস্তিকতার মতবাদ খণ্ডন পূর্বক তিরস্কার স্বরূপ বলিতেছেন—) জগদ্বাসী কি কোন স্রষ্টা ব্যতিরেকেই সৃষ্টি হইয়াছে? বা তাহারাই কি পরস্পর একে অগ্নকে সৃষ্টি করিয়াছে? এই সমস্ত আসমান, জমিনকেও তাহারাই সৃষ্টি করিয়াছে কি? (এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর তাহাদেরও মনে-প্রাণে জাগিয়া উঠে,) কিন্তু তাহার উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না। তাহদের আরও একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করুন যে—যে সমস্ত শক্তি ও সম্পদ তাহার ভোগ করিতেছে তাহা কি তাহার তাহাদের পালনকর্তার ভাণ্ডার হইতে পাইতেছে, না সক্রিয় ভাবে তাহারাই উহার উৎস?

অর্থাৎ তাহার নাস্তিক—তাহারা আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করিতে চায় না তাহাদিগকে তিনটি প্রশ্নের মীমাংসা করিতে বলুন। প্রথম প্রশ্ন—তাহারা কি সৃষ্ট না স্রষ্টা? যদি সৃষ্ট হয় তবে নিশ্চয় কোন সৃষ্টিকর্তা আছেন; কারণ, কর্তা ব্যতিরেকে ক্রিয়া ও কর্ম হইতে পারে না। আর যদি তাহার নিজেই (পরস্পর একে অগ্নের) স্রষ্টা বলিয়া ধারণা করে তবে প্রশ্ন করুন যে, এই সপ্ত আকাশ ও বিশাল ভূমণ্ডলের স্রষ্টাও কি তাহারাই। আরও প্রশ্ন করুন, তাহার জীবন ধারণের জন্ত যে সমস্ত সম্পদ উপভোগ করিয়া থাকে; যেমন—অগ্নি, বায়ু, পানি, মাটি, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি। এবং জীবিকা নির্বাহের জন্ত যে সমস্ত দৈহিক ও ইন্দ্রিয়-শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকে; যেমন—হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ইত্যাদির শক্তি এবং অর্থ সামর্থ্য। এদন্তির কৃষি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদিতে উন্নতি করার জন্ত ভিতরের বা বাহিরের যে সমস্ত শক্তি ও পদার্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে; যেমন—বুদ্ধি-ববেক, মস্তিষ্ক ও (Raw materials) উপাদান পদার্থ সমূহ। এসব সম্পদ, শক্তি ও পদার্থ সমূহের উৎস কোথায়? তোমরা কি নিজে নিজেই সক্রিয় ভাবে এ সবের অধিকারী? না তোমাদের কোন পালনকর্তা আছেন যিনি তোমাদিগকে এসব যোগাইতেছেন এবং স্বীয় কৃপাবলে দান করিতেছেন?

এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এমন নয় যে, তাহাদের মনে উহা জাগে না। নিশ্চয় এ সবার সঠিক সঠিক উত্তর তাহাদেরও মনে-প্রাণে জাগিয়া উঠে, কিন্তু তাহারা ঐ জাগ্রত ভাবকে অবহেলারূপে অবজ্ঞা করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়। উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আপনারাও নির্জনে বসিয়া একাগ্রচিত্তে এই সকল প্রশ্নের উত্তর চিন্তা করিয়া দেখুন; আপনার মন আপনাকে যেই সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তার প্রতি ধাবিত করে তাহার কি হক ও স্বত্ব আপনার উপর প্রবর্তিত হইতে পারে, তাহাও চিন্তা করুন। দেখিবেন আপনার হৃদয়-পাক্ষীও যেন উড়িয়া যাইতে চাহিবে। যেমন উক্ত ছাহাবীর অবস্থা হইয়াছিল।

৪৪৬। হাদীছ :- ছাহাবী যাসেদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) তাহাদের দেশের শাসনকর্তা মারওয়ানকে বলিলেন, আপনি মগরেবের নামাযের মধ্যে শুধু ছোট ছোট ছুরাই পড়িয়া থাকেন। অথচ আগি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে মগরেবের নামাযে অতি দীর্ঘ ছুরা (আ'রাফ)ও পড়িতে শুনিয়াছি।

৪৪৭। হাদীছ :- ছাহাবী বরা (রাঃ) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ছফরে ছিলেন। আগি তাঁহাকে নামাযের মধ্যে ছুরা “ওয়াস্তীন” পড়িতে শুনিয়াছি। তিনি যেক্রপ তুক কেরাত ও খোশ-এলহানে পড়িয়াছিলেন, ঐরূপ আর কাহারও মুখে শুনি নাই।

৪৪৮। হাদীছ :- আবু হোরাযরা (রাঃ) বলেন, নামাযের সব রাকাতেই কোরআনের অংশবিশেষ পড়িতে হয়—যে সব নামাযে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সশব্দে কেরাত পড়িতেন আমরাও সেই নামাযে ঐরূপই পড়ি। যে সব নামাযে তিনি নিঃশব্দে পড়িতেন সেই নামাযে আমরাও ঐরূপই পড়ি। (তিনি আরও বলেন—) তুমি যদি (অন্ত ছুরা না জানার দরুন) শুধু আলহামছ ছুরা দ্বারা নামায পড় তবুও তোমার নামায হইয়া যাইবে। কিন্তু (যথা সম্ভব) অন্ত ছুরা (শিক্ষা করিয়া উহা) আলহামছ সহিত মিলাইয়া নামায আদায় করাই তোমার জন্ত শ্রেষ্ঠ কর্তব্য।

৪৪৯। হাদীছ :- ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম প্রত্যেকটি কাজ আল্লার হুকুম অনুসারেই করিতেন—যে স্থানে যাহা পড়িতেন (যেমন নামাযের প্রথম দুই রাকাতে আলহামছ ছুরার সঙ্গে অন্ত ছুরাও পড়িতেন) আল্লার আদেশেই তাহা পড়িতেন এবং যে স্থানে যাহা না পড়িতেন (যেমন—ফরজ নামাযে শেষ দুই বা এক রাকাতে শুধু আলহামছ পড়িতেন, অন্ত ছুরা পড়িতেন না) তাহাও আল্লার আদেশেই করিতেন। (ইহা সর্বজন বিদিত সত্য যে,) আল্লার কোন কার্যেই ভুল-ভ্রান্তির বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। তাই জগদ্বাসীর জন্ত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদর্শের হায় (কুটিহীন) উত্তম আদর্শ আর হইতে পারে না।

ছুরার অংশবিশেষ বা এক রাকাতে দুই ছুরা পড়া

● একদা নবী (দ:) কজরের নামাযের ছুরা “মুসেহুন” পড়া আরম্ভ করিলেন। উক্ত ছুরায় হযরত মুহা ও হারুনেনর কিম্বা হযরত ঈসার আলোচনার আয়াতে পৌঁছিলে হযরতের ঠাঁটি আসিল। হযরত (দ:) ওখানেই কেরাত ফাস্ত করিয়া রুকুতে চলিয়া গেলেন।

● একদা ওমর (রা:) কজরের প্রথম রাকাতে ছুরা বাকারা হইতে একশত বিশ আয়াত পড়িলেন এবং দ্বিতীয় রাকাতে একশত আয়াত হইতে কম পরিমাণের অল্প একটি ছুরা পড়িলেন।

● একদা ইবনে মসউদ (রা:) প্রথম রাকাতে ছুরা আনফালের চল্লিশ আয়াত পড়িলেন এবং দ্বিতীয় রাকাতে শেষ ৪৫ পারার মধ্য হইতে একটি ছুরা পড়িলেন।

● একটি ছুরা ভাল করিয়া উভয় রাকাতে পড়া বা প্রথম রাকাতে যেই ছুরা পড়িয়াছে দ্বিতীয় রাকাতে পুনরায় ঐ ছুরাই পড়া সম্পর্কে তাবেয়ী কাতাদাহ (র:) বলিয়াছেন, ইহাতে কোন দোষ নাই; সবই আল্লাহ তারালার কেতাবের অংশ।

● বিশিষ্ট তাবেয়ী আহনাক ইবনে কায়স (র:) প্রথম রাকাতে ছুরা কাহাক, দ্বিতীয় রাকাতে ছুরা ইউমুক বা ছুরা ইউনুস পড়িয়াছেন ও বলিয়াছেন, তিনি খলীফা ওমরের পেছনে এইভাবে কজরের নামায পড়িয়াছেন।

● কেরাত লম্বা করার জন্য এক রাকাতে একাধিক ছুরা পড়া জায়েয আছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :-কোন ছুরার অংশ বিশেষ পড়ায় দোষ নাই বটে, কিন্তু এক্ষেত্রে অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন আছে। কারণ এরূপ আয়াত হইতে আরম্ভ করা যাহার বিষয়বস্তুর জরুরী অংশ পূর্বের আয়াতে থাকিয়া গিয়াছে বা এরূপ আয়াতের উপর ফাস্ত করা যাহার বিষয়বস্তু নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়—ইহা মকরুহ এবং স্থান বিশেষে তা এইরূপ অসম্পূর্ণতা অত্যন্ত তিক্ত ও অপ্রিয় হয়; এরূপ ক্ষেত্রে কঠিন মকরুহ সাব্যস্ত হইবে (ফতহুল বারী, ২-২০০)। সুতরাং অর্থ বুঝা ব্যতিরেকে যথেষ্টাভাবে ছুরার অংশ কাটিয়া পড়া সমীচীন নহে।

প্রথম রাকাতে পরের ছুরা এবং দ্বিতীয় রাকাতে আগের ছুরা পড়া জায়েয আছে, কিন্তু মকরুহ। অবশ্য ছুরা সমূহের বিচ্ছাসে ছাহাবীগণের মতভেদ ছিল। পরবর্তী যুগে খলীফা ওসমানের বিচ্ছাসই প্রচলিত রহিয়াছে, তাই উহারই অনুসরণ করিতে হইবে।

৪৫০। হাদীছ :-আনাছ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একজন আনছারী ছাহাবী কোবা নগরীর মসজিদের ইমাম ছিলেন। তিনি যে কোন রাকাতে আলহামদুর ছুরার পর অন্য ছুরা পড়িতেন সেই অন্য ছুরার পূর্বে ছুরা ইখলাছ অবশ্যই পড়িয়া লইতেন, তারপর ঐ অন্য ছুরা পড়িতেন। এতি রাকাতেই তিনি এরূপ করিতেন। মোক্তাদীগণ তাঁহার এই অভ্যাসের সমালোচনা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—আপনি ছুরা এখলাছ পড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে অন্য ছুরাও পড়েন কেন? হয় শুধু ছুরা এখলাছ পড়ুন, নতুবা শুধু অন্য ছুরাটিই পড়ুন। ঐ ব্যক্তি বলিলেন, আমি আমার এই নিয়ম ত্যাগ করিব না। তোমরা যদি ইহা

ভালবাস তবে আমি তোমাদের ইমামতী করিব, নচেৎ ইমামতী করিব না। কিন্তু তাঁহারা জানিতেন যে, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই সর্বোত্তম—ইমামতীর উপযুক্ত, তাই তাঁহারা অন্য কাহাকেও ইমাম বানাইতে রাজী ছিলেন না। অতঃপর সকলে নবী ছালামাহ আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করতঃ অভিযোগ পেশ করিলেন। নবী (দঃ) ঐ ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি তোমার সাথীদের পরামর্শ গ্রহণ কর না কেন? তুমি ছুরা এখলাহকে এরূপ ঠাকড়াইয়া ধরিয়াছ কেন? তিনি আরজ করিলেন, আমি এই ছুরাটিকে আমার প্রাণ দিয়। ভালবাসি। (কারণ, এই ছুরাটি আমার মা'বুদের ছানা-ছিফৎ ও গুণগানে পরিপূর্ণ।) রসুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, এই ছুরার প্রতি গভীর ভালবাসা তোমাকে বেহেশতের অধিকারী বানাইয়া দিয়াছে।

৪৫১। হাদীছ :—এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহুর নিকট আসিয়া বলিল, আমি গত রাতে তাহাজ্জুদ-নামাযের মধ্যে এক রাকাতেই “ছুরা কাফ” হইতে আরও করিয়া শেষ পর্যন্ত ছুরাগুলি পড়িয়াছি। তিনি বলিলেন, কবিতার ছায় ফর ফর করিয়া পড়িয়া শেষ করিয়া থাকিবে। (মানে-মতলবের প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই শুধু পড়িয়া গিয়াছ, কিন্তু এরূপ না করিয়া প্রতিটি বাক্যের মানে-মতলবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অল্প পড়াও ভাল।) নবী ছালামাহ আলাইহে অসাল্লাম যেই যেই ছুরাগুলি একত্রে এক রাকাতে পড়িতেন আমি সেই ছুরাগুলি জানি। তিনি একত্রে (অর্থের দিক দিয়া) সমতুল্য দুইটি ছুরা পড়িতেন। (বেশী পড়িতেন না, কারণ তিনি মানে-মতলবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পড়িতেন।)

মছআলাহ :—জোহর, আছর ও এশার শেষ রাকাতদ্বয়ে এবং মগরেবের তৃতীয় রাকাতে শুধু আলহামদু ছুরা পড়িবে; উহার সঙ্গে আর কোন ছুরা বা আয়াত পড়িবে না। সুতরাং প্রথম রাকাতদ্বয় অপেক্ষাকৃত লম্বা হইবে। ফজরেও প্রথম রাকাত অধিক লম্বা করিলে।

মছআলাহ :—জোহর ও আছরে সম্পূর্ণ কেয়াতই নিঃশব্দে পড়িবে। (১০১ পৃঃ)

মছআলাহ :—ইমাম যদি নিঃশব্দের নামাযে (স্বেচ্ছায় কোন উদ্দেশ্য বশতঃ ছোট) এক আয়াত পরিমাণ শব্দে পড়ে তবে তাহাতে দোষ নাই; (উহাতে সেজদা-ছুছ দিতে হইবে না (১০৭ পৃঃ ৪৬১ হাঃ))। কিন্তু যদি বড় এক আয়াত বা ছোট তিন আয়াত পরিমাণ নিঃশব্দের স্থানে শব্দে কিম্বা শব্দের স্থানে নিঃশব্দে পড়ে; ইচ্ছাকৃত কিম্বা ভুলে তবে সে ক্ষেত্রে অবশ্যই সেজদা-ছুছ দিতে হইবে। আর যদি উক্ত পরিমাণ হইতে কম ঐরূপ করে ভুলবশতঃ অথবা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া ইচ্ছাকৃত তবে সেজদা-ছুছ দেওয়া ওয়াজিব নহে, কিন্তু উত্তম। (শামী, ১—৬৯৫)

“আমীন” বলার ফজিলত ও নিয়ম

৪৫২। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লাম করমাইয়াছেন, ইমাম আলহামদু ছুরা শেষ করিয়া আমীন বলিবে, তুমিও

৪৫৫। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রা:) এর শাগের্দ একরেমা (র:) বলেন—আমি মক্কা শরীফে এক বৃদ্ধের পিছনে জমাতে নামায পড়িলাম। তিনি (চার রাকাত নামাযে) বাইশটি তকবীর বলিলেন। নামাযান্তে আমি ইবনে আব্বাস (রা:)কে বলিলাম, এই বৃদ্ধ জ্ঞানশূন্য বলিয়া মনে হয়। (কারণ এতগুলি তকবীর বলার দরকার দেখা যায় না—রুকু হইতে উঠিয়া সেজদায় যাইতে এবং প্রথম সেজদা হইতে উঠিয়া দ্বিতীয় সেজদায় যাইতে তকবীর না বলিলেও চলে।) ইবনে আব্বাস (রা:) আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, তুই ছুনিয়া হইতে উঠিয়া যা; এই বৃদ্ধ যাহা করিয়াছেন তাহাই রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্মরণ। (এ বৃদ্ধ ব্যক্তি ছাহাবী আবু হোরাযরা (রা:) ছিলেন, একরেমা (র:) তাঁহাকে চিনিতেন না। সেই কালে উমাইয়া বংশের আমীর-ওমরার ইমামতি করিতে তকবীরের সংখ্যা কম করার প্রথা প্রচলিত করিয়াছিল।)

৪৫৬। হাদীছ :— আবু হোরাযরা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন—রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন নামায আরম্ভ করিতেন তখন তকবীর বলিতেন। যখন রুকুতে যাইতেন তখন তকবীর বলিতেন এবং রুকু হইতে উঠিতে “ছামিয়াল্লাহু লেমান হামিদাহ” বলিতেন এবং সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া “রাব্বানা ওয়া লাকালহামছ” বলিতেন। তারপর প্রথম সেজদায় যাইতে এবং সেজদা হইতে উঠিতে, তারপর দ্বিতীয় সেজদায় যাইতে এবং সেজদা হইতে উঠিতে তকবীর বলিতেন। নামাযের শেষ পর্য্যন্ত একরূপ করিতেন এবং দুই রাকাতের পর বসা হইতে উঠিবার সময় তকবীর বলিতেন।

রুকু অবস্থায় হাঁটুর উপর হাতদ্বয়ের ভর করিবে

৪৫৭। হাদীছ :—মোছায়া'ব ইবনে সায়া'দ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আমার পিতার পার্শ্বে নামায পড়িতেছিলাম। আমি রুকু অবস্থায় আমার দুই হাত ছোড় করিয়া হাঁটুরয়ের মধ্যস্থলে লটকাইয়া রাখিলাম। নামাযান্তে পিতা আমাকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন—হযরত রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানার প্রথমে ঐরূপ নিয়মই ছিল, কিন্তু (ইহাতে অত্যন্ত কষ্ট হয় বলিয়া স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দ:) কর্তৃক) এই নিয়ম পরিবর্তন করিয়া দুই হাত হাঁটুর উপর রাখিতে আদেশ করা হইয়াছে

রুকু ও সেজদা ভালরূপে না করার পরিণতি

রুকু ভালরূপে করার অর্থ এই যে—এরূপ শাস্তভাবে রুকু করিবে যেন কোমর, পিঠ মাথা সমান বরাবর হয়, এই অবস্থায় অন্ততঃ তিনবার “সোব্‌হানা রাব্বিয়াল আজীম” বলিয়া পূর্ণ সোজা হইয়া দাঁড়াইলে যেন প্রতিটি হাড় নিজ নিজ স্থানে যাইয়া পৌঁছে।

সেজদা ভালরূপে করার অর্থও তদ্রূপই যে, নিয়ম অনুযায়ী সেজদায় যাইয়া নাক ও কপাল মাটিতে লাগাইয়া রাখা অবস্থায় অন্ততঃ তিনবার “সোব্‌হানা রাব্বিয়াল-আলা” বলিয়া সোজা হইয়া বসিবে, তারপর পুনরায় সেজদায় যাইবে।

• “আল্লাহ আকবার” এর তাৎপর্য এই যে—এক আল্লাহই বড়, আর কেহই বড় নাই। আমি সেই আল্লাহই দাসামুদাস। এই বিষয়টি মনে মনে চিন্তা করতঃ মুখে প্রকাশ করিবে এবং উভয় হাত উপরের দিকে উঠাইয়া ঐ আল্লাহর মহাশ্রী ও নিজের দাসত্বের স্বীকারোক্তিকে প্রমাণ করিবে এবং উহাকেই বাস্তবে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে উভয় হাত বাঁধিয়া দাঁড়াইবে এবং “ছানা” পড়িয়া আল্লাহর প্রশংসা করিবে। তারপর “আউজু” পড়িয়া আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করতঃ “বিছমিল্লাহ” পড়িয়া “আলহামদু” ছাড়া পড়িবে।

সহজ ও সম্ভব হয় তাহা পড়িবে। তারপর আল্লাহ-আকবার বলিয়া মাথা বুকাইবে এবং দীর্ঘস্থিরভাবে রুকু করিবে।[†] তারপর “ছামিয়াল্লাহু লেমান হামিদাহ”[‡] বলিয়া পূর্ণ মাত্রায় সোজা হইয়া দাঁড়াইবে—যেন প্রতিটি হাড় নিজ নিজ স্থানে পৌঁছিতে পারে। অতঃপর আল্লাহ-আকবার বলিয়া দীর্ঘস্থিরভাবে উত্তমরূপে সেজদা করিবে।[×] তারপর মাথা উঠাইয়া স্থিরভাবে বসিবে। পুনরায় ঐরূপে সেজদা করিবে এবং সেজদা হইতে উঠিবে। এইরূপে (দীর্ঘস্থিরভাবে ভক্তি ও মহাব্যতের সহিত) প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নামায আদায় করিবে।

রুকু ও সেজদার মধ্যে দোয়া করা

৪৬১। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (শেষ বরসে অনেক সময়) রুকু এবং সেজদার মধ্যে এই দোয়া পড়িতেন—

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي -

“হে খোদা—আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই পবিত্রতার গুণগান করিতেছি এবং তোমারই প্রশংসা গাহিতেছি। তুমি আমার গোনাহ ক্ষমা করিয়া দাও।”

প্রকৃত প্রস্তাবে হযরত রশূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই দোয়া করিয়া কোরআনের একটি আয়াতের অনুসরণ করিতেন।

ব্যাখ্যা :— ছুরা নছরের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা মোসলমানদের মক্কা বিজয়ের বিরাট সাকল্যের এবং ব্যাপক আকারে ইসলাম বিস্তারের সুসংবাদ প্রদান ও ভবিষ্যদ্বাণী করতঃ রশূলুল্লাহ (দঃ)কে তিনটি বিষয়ের আদেশ দান করেন—

“আপনি স্বীয় পালনকর্তার প্রশংসা করতঃ তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন।”

রশূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার জীবনের শেষ দিকে ঐ সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত দেখিয়া উক্ত আয়াতের আদেশদ্বয়ের অনুসরণে ঐ দোয়া করিতেন।

† উত্তমরূপে রুকু, সেজদা করার অর্থ ও নিয়ম ৪৫৮ নং হাদীছের পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হইয়াছে। রুকু, সেজদার رَبِّي سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ও سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى পড়া হয়। উহার অর্থ—আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতার স্বীকারোক্তি এবং তাঁহার প্রশংসা করিতেছি।

‡ ইহার অর্থ—“আল্লাহর প্রশংসা যে কেহই করুক, আল্লাহ তাহা শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়া থাকেন”। ইহা বলার পর اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলিবে। অর্থ—“হে আল্লাহ, হে আমাদের পালনকর্তা; সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তোমারই”।

× সেজদা আটটি অঙ্গ দ্বারা করিবে। আটটি অঙ্গ এই—দুই পা, দুই হাঁটু, পা হাত ও নাক এবং কপাল। এই অঙ্গগুলি জমীনের সহিত স্পর্শিত রাখিবে।

রুকু হইতে উঠাকালে ইমাম কি বলিবে এবং মোক্তাদী কি বলিবে?

৪৬২। হাদীছ :—আবু হোরাযরা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লাম রুকু হইতে উঠিবার সময় “ছামিয়াল্লাহ-লিমান-হামিদাহ” বলিতেন এবং সোজা হইয়া “আল্লাহুমা-রাব্বানা-ওয়া-লাকাল-হামদু” বলিতেন।

৪৬৩। হাদীছ :—আবু হোরাযরা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লাম করমাইয়াছেন—যখন ইমাম “ছামিয়াল্লাহ-লিমান-হামিদাহ” বলিবেন তখন তোমরা (মোক্তাদীগণ) “আল্লাহুমা রাব্বানা লাকাল হামদু” বলিও। কারণ, ঐ সময় ফেরেশতাগণও উহা বলিয়া থাকেন। যাহার ঐ বাক্য ফেরেশতাদের ঐ বাক্যের সঙ্গে সঙ্গেই বলা হইবে তাহার পূর্বের সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

৪৬৪। হাদীছ :—রেফাআহ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা রসুলুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লামের পেছনে নামায পড়িতেছিলাম। হযরত যখন ছামিয়াল্লাহ-লিমান-হামিদাহ বলিয়া রুকু হইতে উঠিলেন, তাহার পেছনে একজন মোক্তাদী বলিল—

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا نَبِيًّا -

অর্থাৎ—হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি যে, আমাকে তোমার দরবারে হাজির হইবার সুযোগ দান করিয়াছ উহার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমার প্রাণে তোমার প্রতি বহু বহু আবেগ আছে যাহা প্রকাশ করিয়া শেষ করার মত নয় এবং আমার অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে খাঁটিভাবে আমি তোমার বহু বহু প্রশংসা করিতেছি; সেই পবিত্র প্রশংসা অকুরস্ত যাহার অন্ত নাই।

নামাযান্তে হযরত রসুলুল্লাহ (দ:) জিজ্ঞাসা করিলেন, (নামাযের মধ্যে পেছন দিক হইতে কতগুলি শব্দ উচ্চারণ ঐত হইয়াছে; ঐ) শব্দগুলির উচ্চারণকারী কে? ঐ ব্যক্তি আরজ করিল, আমি ঐ শব্দগুলি বলিয়াছি। রসুলুল্লাহ (দ:) বলিলেন—ঐ শব্দগুলি এত বড় উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ এবং আল্লাহর নিকট এত মধুর ও পছন্দনীয় ছিল যে, আমি ত্রিশ জনেরও অধিক ফেরেশতাকে দেখিয়াছি তাহারা ছুটাছুটি করিয়া আসিতেছেন যে, কে ঐ শব্দগুলিকে সকলের আগে (আল্লাহ তায়ালা দরবারে পৌছাইবার জন্য) লিখিয়া লইতে পারেন।

রুকু হইতে উঠিয়া সোজা ও স্থিরভাবে দাঁড়াইবে

উভয় সেজদার মধ্যেও তজ্রাপে বসিবে

৪৬৫। হাদীছ :—আনাছ (রা:) নবী ছালামাহ আলাইহে অসাল্লামের নামায পদ্ধতি শিক্ষা দিবার ক্ষণ সময় সময় নামায পড়িতেন এবং বলিতেন, নবী (দ:)কে যেইরূপ নামায

পড়িতে দেখিয়াছি, সেইরূপ নামাষ দেখাইতে চেষ্টার ক্রটি করিব না। হাদীছ বর্ণনাকারী বলেন, আনাছ (রাঃ)কে সেইরূপ ক্ষেত্রে এমন একটি কাজ করিতে দেখিয়াছি যাহা তোমাদিগকে করিতে দেখি না। তিনি যখন রুকু হইতে মাথা উঠাইয়া দাঁড়াইতেন তখন একরূপ স্থিরভাবে দাঁড়াইতেন যে, আমরা মনে করিতাম যেন তিনি সেজদায় যাইতে ভুলিয়া গিয়াছেন এবং দুই সেজদার মধ্যেও একরূপ স্থিরভাবে বসিতেন—মনে হইত যেন দ্বিতীয় সেজদায় যাইতে ভুলিয়া গিয়াছেন। (১২০ পৃঃ)

৪৬৬। হাদীছ :—বিশিষ্ট তাবেয়ী আবুকেলাবা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ছাহাবী মালেক ইবনে হোয়াইরেছ (রাঃ) আমাদিগকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামায বিরূপ ছিল তাহা দেখাইবার জন্য ফরজ নামাযের জমা'তের সময় ছাড়া অন্য সময় (নফলরূপে) নামায পড়িয়া দেখাইয়াছেন।

একদা তিনি আমাদের মসজিদে আসিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমাদের সম্মুখে নামায পড়িব ; এখন আমার শুধু নামায পড়াই উদ্দেশ্য নহে ; নবী (দঃ)কে বিরূপ নামায পড়িতে দেখিয়াছি তাহা শিক্ষা দেওয়ার জন্য নামায পড়িব।

আবুকেলাবা (রাঃ) সেই নামাযের বর্ণনা দানে বলেন, যখন তিনি দাঁড়াইলেন তখন ধীর-স্থিরতার সহিত সুন্দররূপে দাঁড়াইলেন এবং তকবীর বলিয়া নামায আরম্ভ করিলেন। তারপর রুকু ধীর-স্থিরতার সহিত সুন্দরভাবে করিলেন, রুকু হইতে উঠিয়া কিছু সময় স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন, তারপর সেজদা করিলেন, অতঃপর সেজদা হইতে উঠিয়া কিছু সময় স্থিরভাবে বসিলেন তারপর পুনঃ সেজদা করিলেন। (২৩, ১১১, ১১৬ পৃঃ)

তকবীর বলার সঙ্গেই রুকু-সেজদার জন্য অবনত হইবে

৪৬৭। হাদীছ :—আবু ছালামাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবু হোরায়ারা (রাঃ) ফরজ এবং অন্য নামায, রমজান শরীফে এবং অন্য সময়ে সব রকম নামাযেই এই নিয়মে তকবীর বলিতেন—প্রথম দাঁড়াইয়া তকবীর বলিতেন, রুকুতে যাওয়ারকালে তকবীর বলিতেন, তারপর ছামিয়াল্লাহু লিমান-হামিদাহু এবং তৎপর রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদু বলিতেন—সেজদায় যাইবার পূর্বে। অতঃপর সেজদার জন্য নত হইয়া যাইতে আল্লাহ আকবার বলিতেন, তারপর সেজদা হইতে উঠিতে তকবীর বলিতেন, দ্বিতীয় সেজদায় যাইতেও তকবীর বলিতেন এবং উহা হইতে উঠিতেও তকবীর বলিতেন। নামাযের প্রতি রাকাতেই এইরূপ করিতেন এবং দুই রাকাতের বসা হইতে উঠিতেও তকবীর বলিতেন। আবু হোরায়ারা (রাঃ) এইরূপে নামায শেষ করিয়া বলিতেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ছনিয়া ত্যাগ করা পর্যন্ত এই আকারেই নামায পড়িতেন। (এই হাদীছে বর্ণিত আর একটি বিষয় ৫৪৭ নম্বরে অনূদিত হইবে।)

সেজদার মহত্ব ও কজ্জিলত

এই পরিচ্ছেদে একটি সুদীর্ঘ হাদীছের উল্লেখ আছে; সেই হাদীছখানার পূর্ণ অনুবাদ সপ্তম খণ্ডে প্রথম অধ্যায়ে আসিবে। হাদীছখানার বিষয়-বস্তু হইল হাশর-ময়দান, পুলছেরাৎ, দোযখ ও আখেরাতের নানা অবস্থার বর্ণনা। উক্ত হাদীছের বর্ণনায় রহিয়াছে যে, হাশর-ময়দানের হিসাব-নিকাশের পর প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক মোমেন-মোসলমানও বিভিন্ন গোনাহের পরিণামে দোযখে যাইবে। তারপর শাফায়াত ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে এই সব পাপী মোমেন-মোসলমানদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা দয়া হইবে। তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের দ্বারা এই পাপী মোমেন-মোসলমানদিগকে দোযখ হইতে বাহির করিতে থাকিবেন।

দোযখের মধ্যে চিরজাহান্নামী কাফেররা অগণিত সংখ্যায় হইবে। হুনিয়ায় কাফেরের অনুপাতে মোসলমান-সংখ্যা হাজারে একজন মাত্র; এই নগণ্য সংখ্যক মোসলমানও ভাগ হইয়া এক ভাগ বেহেশতে, এক ভাগ দোযখে গিয়াছে। কাফেররা ত সবই দোযখে গিয়াছে। দোযখে এই অসংখ্য কাফেরদের মধ্য হইতে অতি নগণ্য সংখ্যক পাপী মোমেন-মোসলমানকে ফেরেশতাগণ কর্তৃক বাছিয়া বাছিয়া বাহির করার যে ব্যবস্থা হইবে উহার বর্ণনায় উক্ত হাদীছে আছে—

وَيَعْرِفُونَهُمْ بِأَثَارِ السُّجُودِ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ
السُّجُودِ فَيُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ كُلَّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ
السُّجُودِ فَيُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ قَدْ امْتَحَشُوا فَيَسْبُ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ

“ফেরেশতাগণ দোযখের মধ্যে এই সব পাপী মোমেন মোসলমানদিগকে তাহাদের চেহারায় সেজদার নিশান বা চিহ্ন দেখিয়া চিনিবেন। আল্লাহ তায়ালা দোযখের আগুনের জ্বল অসাধ্য করিয়া দিবেন সেজদার নিশান ভস্ম করা। এই পরিচিতির দ্বারাই পাপী মোমেন-মোসলমানদিগকে বাহির করা হইবে। দোযখের আগুন মানুষের সবই ভস্ম করিবে, কিন্তু সেজদার নিশান ভস্ম ও বিকৃত হইবে না। তাহাদিগকে দোযখ হইতে এক্রপে বাহির করা হইবে যে, আগুনে পুড়িয়া তাহারা কয়লা হইয়া গিয়াছে। তাহাদের উপর জীবনী-শক্তির পানি বহাইয়া দেওয়া হইবে; ফলে তাহারা সোনালী রঙ্গের রূপ ধারণ করিয়া উঠিবে।”

মোমেন মোসলমান যাহারা নামাযী তাহাদের চেহারায় সেজদার নিশান থাকা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে— **سَيَمَّا هُمْ فِي وَجْهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ**—“মোমেনের চেহারায় সেজদার নিশান হইল তাহাদের পরিচয়।” (২৬ পাঃ ১২ কঃ)

চেহারায় সেজদার নিশান বলিতে চেহারার উপর নূরের আভাই প্রকৃত উদ্দেশ্য। সেজদার পরিমাণ হিসাবে এই আভার পরিমাণও কম-বেশী হয়, এমনকি যাহারা সর্বদা নামাযে অভ্যস্ত তাহাদের এবং বিশেষতঃ যাহারা তাহাজ্জুদ নামাযেও অভ্যস্ত তাহাদের চেহারার সেই আভা ত সচরাচর দৃষ্ট। সেজদার এই আভা আখেরাতের জীবনে অধিক দীপ্ত ও অক্ষয় রেখাপাতকারী হইবে। এমনকি হাশরের মাঠে মোমেনদের সেজদার আভায় তাহাদের সম্পূর্ণ মাথা সূর্যের জ্বায় চমকিত হইবে (তফছীর মোজেহুল-কোরআন)। এই আভার বিন্দুও যাহার চেহারায় আছে সে খোদা-নাথাস্তা দোষখের আগুনে পুড়িয়া কয়লা হইয়া গেলেও তাহার সেই আভাবিন্দু অক্ষয় হইয়া থাকিবে যাহার উল্লেখ আলোচ্য হাদীছে রহিয়াছে। এই আভাবিন্দুর পরিমাণের তারতম্যে পরিচিতির মধ্যে অবশ্যই আগ-পাছ হইবে। এই তথ্য দৃষ্টে সেজদার সহজ সহজেই অন্বমেয়। সেজদার নিশান বলিতে বস্তুতঃ নূরের আভা বটে, কিন্তু সেজদার আধিক্যে সৃষ্ট কপালের দাগও সোভাগোর বস্তুই; বিজ্ঞপ বা উপেক্ষার বস্তু নহে।

সেজদাবস্থায় উভয় বাহু পাঁজরা হইতে ব্যবধানে রাখিবে

৪৬৮। হাদীছ :—আবুহুলাহ ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছালামুল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সেজদাবস্থায় বাহুদ্বয়কে পাঁজরা হইতে এত দূর ব্যবধানে রাখিতেন যে, তাহার নূরানী বগল দেখা যাইত।

সাতটি অঙ্গে সেজদা করিতে হইবে

৪৬৯। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছালামুল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ পাক সাতটি অঙ্গের উপর সেজদা করিতে আদেশ করিয়াছেন। (চেহারা, অর্থাৎ) কপালের সঙ্গেই নাককেও বিশেষভাবে ইশারা করিয়া দেখাইয়াছেন, দুই হাত, দুই হাঁটু, দুই পায়ের সম্মুখ ভাগ। আরও আদেশ করিয়াছেন যে—কাপড় ও মাথার চুল (সেজদার সময় এলোমেলো হইতে বা ধূলা-বালি হইতে রক্ষা করার জন্য) টানিয়া রাখিবে না।

ব্যাখ্যা :—এই হাদীছ দ্বারা কয়েকটি মহআলাহ প্রমাণিত হইল—(১) সেজদার মধ্যে কপালের সঙ্গে নাককেও মাটিতে লাগাইতে হইবে এবং উভয় পাও মাটিতে লাগাইয়া রাখিতে হইবে। ৪৭৫নং হাদীছে আছে যে সেজদাবস্থায় উভয় পা মাটির সঙ্গে একরূপে লাগাইয়া রাখিবে যেন পা-দ্বয়ের আঙ্গুলগুলি কেবলামুখী হইয়া থাকে। (২) সর্বাস্ত্র ও সর্বশ্ব দ্বারা আল্লাহর হজুরে সেজদা করিবে—সেই সময় কাপড়, মাথার চুল ইত্যাদির পারিপাট্যের প্রতি কোনই লক্ষ্য রাখিবে না। নতুবা মনে হইবে যেন সেজদার চেয়ে কাপড় ও চুলের পারিপাট্যের মূল্য বেশী।

অবশ্য বোধারী (রা:) ১১৩ পৃষ্ঠায় একটি মহাআলাহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ছতর খুলিবার আশঙ্কায় কাপড় টানিয়া রাখা বা গিরা ইত্যাদি দিয়া রাখা জায়েয আছে।

৪৭০। হাদীছ :- আবু ছালামাহ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আবু সায়ীদ খুদরী (রা:) ছাহাবীর নিকট যাইয়া বলিলাম, চলুন; খেজুর বাগানে যাইয়া আমরা নবীজীর (দ:) হাদীছ আলোচনা করি; সেমতে তিনি চলিলেন। আলোচনায় আমি তাঁহাকে লাইলাতুল-কদর সম্পর্কে হাদীছ বর্ণনা করিতে বলিলাম। তিনি বলিলেন, একবার হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমজানের প্রথম দশ দিন এ'তেকাফ করিলেন, আমরাও তাঁহার অনুকরণে এ'তেকাফ করিলাম। (দশ দিন গত হইলে পর) জিব্রাঈল (আ:) আসিয়া রসুলুল্লাহ (দ:)কে বলিলেন, আপনি যে রক্তের উদ্দেশ্যে এ'তেকাফ করিয়াছেন (অর্থাৎ লাইলাতুল-কদর) উহা আরও সম্মুখে। তাই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মধ্যাবর্তী দশ দিনেরও এ'তেকাফ করিলেন, আমরাও তজ্রপ করিলাম। এবারও জিব্রাঈল (আ:) ঐরূপ বলিলেন। তাই হযরত রসুলুল্লাহ (দ:) রমযানের বিশ তারিখের সকাল বেলা আমাদের সন্মোদন করিয়া বলিলেন—যাহারা আমার সঙ্গে এ'তেকাফরত ছিল তাহারা আরও কিছু দিন এ'তেকাফরত থাকিবে, কারণ লাইলাতুল-কদর শেষ দশ দিনের বে-জোড় রাত্রি সমূহের মধ্যে হইবে। আমাকে আল্লাহ তায়ালা উহা নিদিষ্ট করিয়া (স্বপ্নে) জানাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু আমি ভুলিয়া গিয়াছি; স্বপ্নের কথা এতটুকু আমার স্মরণ আছে যে, আমি যেন লাইলাতুল-কদরের সকাল বেলা কাদার উপর সেজদা করিতেছি। হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন—বিশ তারিখে সকাল বেলায় রসুলুল্লাহ (দ:) আমাদের একরূপ বলিলেন। ঐ দিনটি খুবই পরীক্ষার দিন ছিল, কোন প্রকার বৃষ্টি-বাদলের চিহ্ন দেখা যাইতে ছিল না। কিন্তু হঠাৎ আকাশে মেঘ দেখা গেল এবং একুশ তারিখে সারারাত্রি বৃষ্টিপাত হইল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে খেজুর পাতার চাল ছিল; তাঁহার নামায স্থানে পানি পড়ায় ঐ স্থান ভিজিয়া গেল। রসুলুল্লাহ (দ:) ফজরের নামায শেষ করিলে আমি চাক্ষুষ দেখিলাম, তাঁহার কপাল ও নাকের উপর স্পষ্টতঃ কাদা লাগিয়া রহিয়াছে। (তখন চাক্ষুষরূপে আমরা তাঁহার স্বপ্নকে সপ্রমাণিত বুঝিয়া নিলাম)।

পাঠকবর্গ! লক্ষ্য করুন, হযরত রসুলুল্লাহ (দ:) ভিজা জায়গার উপর পূর্ণ ও উত্তমরূপে সেজদা করিয়া কপাল ও নাককে কব্ধমাক্ত করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই।

সেজদা করার নিয়ম

৪৭১। হাদীছ :- আয়েশা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—তোমরা সুন্দররূপে গিরতায় সহিত সেজদা করিও। সেজদার সময় হই হাত কুবুরের হাতের ন্যায় জমিনের উপর বিছাইয়া দিও না। (১১৩ পৃ:)

৪৭২। হাদীছ :—মালেক ইবনুল হোয়াইরেছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এইরূপ নামায পড়িতে দেখিয়াছেন যে, তিনি প্রথম রাকাতে ও তৃতীয় রাকাতে দ্বিতীয় সেজদা হইতে উঠিবার পর বসিয়া তারপর দাঁড়াইতেন ; সরাসরি দাঁড়াইতেন না। (১১৩ পৃঃ)

প্রথম ও তৃতীয় রাকাতে সেজদা হইতে দাঁড়াইবার নিয়ম

ব্যাখ্যা :—বয়োপ্রাপ্তি বা অন্য কোন দুর্বলতার অবস্থায় এইরূপ করা স্মৃতি তরীকার মধ্যে शामिल। সাধারণ অবস্থাতেও এরূপ করিলে কোন দোষ নাই, কিন্তু না বসিয়া সোজা দাঁড়াইয়া যাওয়াই শ্রেয়। ইহার স্পষ্ট প্রমাণ বোখারী শরীফের ৯৮৬ পৃষ্ঠার একটি হাদীছে উল্লেখ আছে এবং এতদ্বিধা ছেহাহ ছেস্তার অন্যান্য কেতাবেও অনেক হাদীছ আছে। ছাহাবী ও তাবয়ীদের যুগে সচরাচর সাধারণ অবস্থায় তৃতীয় রাকাতে দ্বিতীয় সেজদা হইতে উঠিয়া বসা হইত না বলিয়া বোখারী শরীফের এই ১১৩ পৃষ্ঠারই মধ্যভাগে স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে।

দুই রাকাতের বৈঠক হইতে উঠিতে তকবীর বলিবে

৪৭৩। হাদীছ :—সায়ীদ ইবনুল হারেছ (রাঃ) একদা ইমাম হইয়া নামায পড়াইলেন। সেজদায় যাঁহে, সেজদা হইতে উঠিতে, দুই রাকাতের বসা হইতে দাঁড়াইতে সশব্দে তকবীর বলিলেন এবং বলিলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এরূপ করিতে দেখিয়াছি।

নামাযের মধ্যে বসিবার নিয়ম

৪৭৪। হাদীছ :—আবুহুলাহ ইবনে ওমরের পুত্র আবুহুলাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আমার পিতাকে দেখিলাম, তিনি নামাযের মধ্যে আসন করিয়া বসেন। তাঁহাকে এরূপ করিতে দেখিয়া আমিও এরূপ করিলাম ; তখন আমি যুবক বয়সের। আমার পিতা আমাকে এরূপ করিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন—নামাযের মধ্যে স্মৃতি তরীকায় বসা এই যে, ডান পা খাড়া রাখিয়া বাম পা মোড়িয়া বসিবে। আমি বলিলাম, আপনি আসন করিয়া বসিয়া থাকেন। তিনি বলিলেন, আমি ওজ্রবশতঃ এরূপ করিয়া থাকি, কারণ আমার পাদ্বয় মচকিয়া যাওয়ায় উহার উপর স্মৃতি তরীকা অনুযায়ী বসা সম্ভব হয় না।

৪৭৫। হাদীছ :—আবুহোমায়দ সায়েদী (রাঃ) একদা বলিলেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামায কিরূপ ছিল তাহা আমি তোমাদের তুলনায় বেশী জানি আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি, নামায আরম্ভ করার জন্ত যখন তকবীর বলিতেন তখন হস্তদ্বয় কাঁধ পর্যন্ত উঠাইতেন (৪৩২নং হাদীছের নোট দেখুন) রুকুতে যাইয়া হস্তদ্বয় হাঁটুর উপর শক্তভাবে রাখিতেন এবং পিঠকে সমতলরূপে ঝুকাইতেন (অর্থাৎ এরূপে রুকু করিতেন যেন পিঠ, কোমর ও মাথা এক বরাবর থাকে।) যখন রুকু হইতে উঠিতেন তখন সোজা হইয়া দাঁড়াইতেন, যেন মেরুদণ্ডের প্রত্যেকটি গিট নিজ নিজ স্থানে বসিয়া যায়। যখন সেজদা করিতেন তখন উভয় হাত জমিনের উপর বিছাইয়াও দিতেন না বা শরীরের

সঙ্গে চিমটাইয়াও রাখিতেন না এবং পায়ের আঙ্গুলসমূহকে মোড়িয়া কেবলামুখী রাখিতেন। যখন দুই রাকাতের পর বসিতেন তখন ডান পা খাড়া রাখিয়া বাম পা বিছাইয়া দিয়া উহার উপর বসিতেন। যখন শেষ রাকাতে বসিতেন তখন ডান পা খাড়া রাখিয়া বাম পা বাহির করিয়া নিতম্ব জমিনে রাখিয়া বসিতেন।

ব্যাখ্যা :—হানাফী মজহাব মতে নামাযের মধ্যে ডান পা খাড়া রাখিয়া বাম পায়ের উপর বসিবে, নিতম্বকে জমিনের সঙ্গে লাগাইয়া বসিবে না, বরং বাম পা বিছাইয়া উহার উপর নিতম্ব রাখিবে—যে রূপ ৪৭৪নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ; নামাযের সব বসাতেই এই নিয়ম। উক্ত নিয়মে বসাপেক্ষা নিতম্ব জমিনের সঙ্গে লাগাইয়া বসাতে শরীর অপেক্ষাকৃত একটু অধিক গুটানো ও সঙ্কুচিত থাকে বিধায় হানাফী মজহাবেও মহিলাদের জন্ত নিতম্ব জমিনের সঙ্গে লাগাইয়া বসাকে উত্তম বলা হয় এবং উপরোল্লিখিত নিয়মকে শুধু পুরুষের জন্ত উত্তম বলা হইয়াছে। হানাফী মজহাবে নামাযের মধ্যে পুরুষ ও নারীদের জন্ত বসিবার নিয়ম ভিন্ন ভিন্ন।

যেই ইমামগণের মজহাবে পুরুষদের জন্তও নিতম্ব জমিনে লাগাইয়া বসার নিয়মকে উত্তম বলা হইয়াছে, যে রূপ ৪৭৫নং হাদীছে বর্ণিত আছে। তাঁহাদের মজহাব মতে নারী-পুরুষ উভয়ের বসার নিয়ম একই হইবে। যেমন ইমাম বোখারী (রঃ) বিশিষ্ট্য তাবেয়ী উম্মুদ-দরদা সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি নামাযের মধ্যে পুরুষের স্থায়ী বসিতেন এবং তিনি একজন মহলা-মাছায়েল বিশেষজ্ঞা ছিলেন। ফল কথা—প্রত্যেক ইমামের মজহাবেই নারীদের জন্ত নিতম্ব জমিনে ঠেকাইয়া বসার নিয়মকে উত্তম বলা হইয়াছে, অবশ্য পুরুষদের জন্ত উত্তম নিয়ম সম্পর্কে মতভেদ আছে।

নামাযে বসা অবস্থায় কি পড়িবে ?

৪৭৬। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, প্রথম অবস্থায় আমরা নবী ছালাল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে (নামাযের বৈঠকে) এরূপ বলিতাম—আস্‌সালামু আ'লাল্লাহে, আস্‌সালামু আ'লা জিব্রাঈল, আস্‌সালামু আ'লা মিকাদীল ইত্যাদি ইত্যাদি। একদা রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম আমাদের প্রতি তাকাইয়া বলিলেন—আস্‌সালামু আ'লাল্লাহে (আল্লাহর জন্ত শান্তির দোয়া) বলিও না। আল্লাহ তায়ালাই ত শান্তিদাতা। নামাযে তোমরা এরূপ বলিবে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ
وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللّٰهِ السَّالِحِينَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ
اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ۝

অর্থ:—“মৌখিক ও শারীরিক এবং হালাল মাল খরচ করতঃ যে সব এবাদৎ করা হয়—সব রকম এবাদৎ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য। হে প্রিয় নবী! আপনার উপর শান্তি এবং আল্লাহর রহমত ও সব রকমের বরকত বর্ষিত হউক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর সমস্ত নেক ও সং বন্দা—মানুষ, জিন বা ফেরেশতাগণের উপরও শান্তি বর্ষিত হউক। আগি মনে প্রাণে অঙ্গীকার করিতেছি ও ঘোষণা দিতেছি—আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই এবং ইহাও ঘোষণা দিতেছি যে, হযরত মোহাম্মদ (দ:) আল্লাহর বন্দা ও তাঁহার রসূল।” ইহার পর অন্য কোন দোয়া পড়িলে।

এরূপ বলিলে জিব্রীল, মিকাদীল সকলেই (শান্তির দোয়ায়) শরীক হইয়া যাইবেন, নাম লইতে হইবে না, অধিকন্তু অন্যান্য সকল সং বন্দাগণও শরীক হইবেন।

৪৭৭। হাদীছ:—* কায়া'ব ইবনে ওজরা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একবার আমরা আরজ করিলাম—ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনার প্রতি সালাম ত আল্লাহ তায়াল (আপনার মুখে আভাহিয়াত্ব মধ্য) আমাদেরগকে শিক্ষা দিয়াছেন। আপনার প্রতি আপনার আহুলে বাইত সহ ছালাত বা দরুদ কিরূপে পাঠ করিব? হযরত (দ:) বলিলেন, এইরূপ বলিবে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

অর্থ—হে আল্লাহ! বিশেষ বিশেষ রহমত বর্ষণ করুন হযরত মোহাম্মদের উপর এবং হযরত মোহাম্মদের আহুলে-বাইত—পরিবার-পরিজনের উপর যেমন আপনি বিশেষ রহমত বর্ষণ করিয়াছিলেন (তাঁহারই পূর্বপুরুষ) হযরত ইব্রাহীমের উপর এবং হযরত ইব্রাহীমের পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয় আপনার সমুদয় কাজই প্রশংসনীয়, আপনি অতি মহান।

* এই হাদীছে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটি সামান্য একটু শব্দগত বিভিন্নতার সহিত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) আবু হোমায়দ সায়েদী (রা:) হইতেও বর্ণিত আছে এবং ছাহাবীজের হাদীছ তিনটি ইমাম বোখারী (রা:) তিন স্থানে বয়ান করিয়াছেন—(১) নবীদের ইতিহাস অধ্যায়ে—হযরত ইব্রাহীমের বয়ান, (২) তফছীর অধ্যায়ে—ছুরা আহযাবের তফছীর, (৩) দোয়ার অধ্যায়ে—হযরতের প্রতি দরুদের বয়ান।

নামাযের অধ্যায়ে ইমাম বোখারী (রা:) এই হাদীছটি উল্লেখ করেন নাই, আমরাও চতুর্থ সংস্করণ পর্যন্ত এস্থলে এই হাদীছ খানা উল্লেখ করিয়াছিলাম না। ইতিমধ্যে কোন কোন পাঠকের পক্ষে তাহার বিস্তারিত সংবাদে উক্ত প্রথমস্থানে বর্ণিত হাদীছ খানা এস্থানে বয়ান করিয়া দেওয়া হইল।

“হে আল্লাহ! আমি কবরের আজাব হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি, অসং
দজ্জালের ধোকা হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং জীবিতাবস্থায় বা মৃত্যুর সময়
সর্বপ্রকার পথভ্রষ্টতা হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি।

এক ব্যক্তি আরজ করিল, হজুর, আপনি ঋণ হইতে বিশেষ ও অধিকরূপে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া থাকেন। হযরত (দ:) বলিলেন, মানুষ যখন ঋণগ্রস্ত হয় তখন কথা বলিতে মিথ্যা বলে এবং অঙ্গীকার করিয়া উহা ভঙ্গ করে। (অর্থাৎ ঋণ অতি জঘন্য যাহা অনেক গোনাহের কারণ হয়।)

৪৭৯। হাদীছ:—আবু বকর হিদ্দিক (রা:) একদা রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন—আমাকে একটি দোয়া শিখা দেন যাহা আমি নামাযের মধ্যে পাঠ করিব। তখন রসুলুল্লাহ (স:) বলিলেন, বলে—

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ
فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

অর্থ:—হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অত্যধিক অত্যাচার (গোনাহ) করিয়াছি; একমাত্র তুমি ভিন্ন কেহ গোনাহ মাফ করিতে পারে না। তুমি স্বীয় করুণাবলে আমার গোনাহ মাফ করিয়া দাও এবং আমার উপর রহম কর; একমাত্র তুমিই ক্ষমাকারী।

মোক্তাদী ইমামের সঙ্গে সালাম করিবে

৪৮০। হাদীছ:—এত্বান ইবনে মালেক (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, আমরা রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়িয়াছি, হযরত (দ:) যখন সালাম ফিরিয়াছেন আমরাও তখনই সালাম ফিরিয়াছি।

ব্যাখ্যা:—উক্ত হাদীছ দ্বারা বোখারী (র:) এই মহুআলাহ বলিয়াছেন যে, মোক্তাদী ইমামের সঙ্গে সঙ্গেই সালাম ফিরিবে (অতিরিক্ত দোয়া-দরুদে লিপ্ত হইয়া সালাম ফিরিতে বিলম্ব করিবে না।) আবুহুলাহ ইবনে ওমর (রা:) হইতে বোখারী (র:) আরও বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইমামের সঙ্গেই মোক্তাদীদের সালাম ফেরাকে তিনি মোস্তাহাব বলিয়াছেন।

এই হাদীছ দ্বারা ইমাম বোখারী (র:) এই মহুআলাহও বর্ণনা করিয়াছেন যে, মোক্তাদীকে দুই সালামই করিতে হইবে; যেক্ষণ ইমাম দুই সালাম করিয়া থাকেন।

নামাযান্তে আল্লার জিক্র করা

৪৮১। হাদীছ:—ইবনে আব্বাস (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, ফরজ নামাযান্তে সশব্দে “আল্লাহ-আকবার” জিক্র করা নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ে ছিল। ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন—উহা দ্বারা আমি নামায শেষ হওয়া উপলব্ধি করিতাম।

৪৮২। হাদীছ:—আবু হোরায়া (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা দরিদ্র শ্রেণীর লোকগণ রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হাজির হইয়া এই অনুতাপ

প্রকাশ করিল যে, খনাঢ্য ব্যক্তিগণ ধন-দৌলত আল্লাহর রাহে খরচ করিয়া বড় বড় মর্তবা ও অফুরন্ত নেয়ামতসমূহের অধিকারী হইতেছে। কারণ, তাহারা আমাদের স্তায় নামায পড়ে, রোযা রাখে, তাছাড়া তাহাদের বেশী ধন-দৌলত আছে, যদ্বারা তাহারা হজ্জ, ওমরা ও জেহাদ করিয়া থাকে এবং ছদ্মফা-খয়রাত করিয়া থাকে। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমাদিগকে এমন ব্যবস্থা ও আমল শিক্ষা দান করিব যদ্বারা তোমরা অগ্রগামী ব্যক্তিগণের সমান হইতে সক্ষম হইবে এবং তোমরা সর্বোত্তম বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং ঐ ব্যবস্থা ও আমল অবলম্বন ব্যতীত কেহই তোমাদের বরাবর হইতে পারিবে না। (সেই আমলটি হইল—)

প্রতি নামাযের পর ছোবহানাল্লাহ তেজিশবার, আল্‌হামছ-লিল্লাহ তেজিশবার এবং আল্লাহ আকবার চোজিশবার পড়িবে।

ব্যাখ্যা :— মোসলেম শরীফের রেওয়ায়েতে এই হাদীছের সঙ্গে আরও একটু অংশ উল্লেখ হইয়াছে যে, কিছু দিন পর দরিদ্র শ্রেণীর লোকগণ পুনরায় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আসিয়া আরজ করিল, আপনি আমাদেরকে যেই বিশেষ ব্যবস্থা ও আমল শিক্ষা দান করিয়াছিলেন, আমাদের খনাঢ্য ভাইগণ উহার খোঁজ পাইয়া তাহারাও উহা অবলম্বন করিয়াছেন। তখন হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, নেক আমলের তৌফিক ও সামর্থ্য আল্লাহ তায়ালায় একটি বিশেষ মেহেরবানী ও দয়া; আল্লাহ তায়ালা যাহাকে ইচ্ছা করেন উহা দান করিয়া থাকেন। (সে বিষয়ে মানুষের কিছু করার ক্ষমতা নাই; মানবের একমাত্র কর্তব্য হইল—স্বীয় শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী সাধনা করিয়া যাওয়া।)

৪৮৩। হাদীছ :—মুগিরা ইবনে শো'বা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম প্রতি নামাযের পর এই দোয়া পড়িতেন—

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ - لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُنْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ -

অর্থ :—একমাত্র আল্লাহ-ই মা'বুদ, তাহার কোন শরীক নাই, সমস্ত রাজত্ব ও প্রভুত্ব একমাত্র তাহারই, সমস্ত প্রশংসা তাহারই, তিনিই জীবনদাতা, জীবন রক্ষক ও মৃত্যুদাতা এবং সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! তুমি যাহা দান করিবে তাহা কেহ বন্ধ করিতে পারে না, তুমি যাহা না দিবে তাহা কেহ দিতে পারে না। তুমি দান না করিলে ভাগ্যবানের ভাগ্যও তাহার কোন উপকার করিতে পারে না।

নামাযান্তে ইমামের ডান বা বাম দিকে অথবা মোক্তাদীমুখী বস।

৪৮৪। হাদীছ :—সামুয়া ইবনে জুনুব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম নামায শেষে আমাদের প্রতি মুখ করিয়া বসিতেন।

৪৮৫। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তোমাদের কেহ যেন স্বীয় নামাযের এক অংশ শয়তানকে দান না করে ; এইরূপে যে, নামাযের পর ডান দিকে ঘুরিয়া যাওয়া জরুরী মনে করে। আমি রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহ আলাইহে অসাল্লামকে অনেক সময় বাম দিকেও ফিরিতে দেখিয়াছি।

ব্যাখ্যা :—গুণার কাজ ব্যতীত প্রত্যেক কাজেই বাম দিক অবলম্বন অপেক্ষা ডান দিক উত্তম তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই “উত্তম”কে যদি কেহ জরুরী ও অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করে তবে উহা শরীয়তের মধ্যে হস্তক্ষেপের শামিল হইবে। তাই ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) এখানে কঠোর ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। তদুপরি যে বিষয়কে জরুরী বলিয়া ধার্য্য করে নাই যদিও উহা উত্তম হয়, কিন্তু উত্তমকে জরুরী মনে করা শরীয়তের বিধান বহির্ভূত হওয়ায় উহা শয়তানের কারসাজি বলিয়াই গণ্য হইবে।

দুর্গন্ধময় বস্তু খাইয়া মসজিদে যাওয়া নিষেধ

৪৮৬। হাদীছ :—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি পেয়াজ বা রসুন (ইত্যাদি দুর্গন্ধময় বস্তু) ব্যবহার করিয়াছে সে যেন মসজিদের নিকটেও না আসে এবং আমাদের সঙ্গে নামায না পড়ে। সে যেন মসজিদ হইতে দূরে থাকে। জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, মনে হয়—এস্থলে কাঁচা পেয়াজ-রসুনই উদ্দেশ্য এবং নিষেধাজ্ঞা উহার দুর্গন্ধের কারণে। জাবের (রাঃ) আরও বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছালাল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম সমীপে একটি পাতে খাণ্ড উপস্থিত করা হইল যাহাতে (রসুন এবং উহার ছায় গন্ধময় “করুয়াছ” ইত্যাদি) বিভিন্ন তাজা সবজি (কুচিকাটারূপে) মিশ্রিত ছিল। হযরত (দঃ) উহার গন্ধ অনুভব করিলেন। তিনি উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে সবজিগুলির নাম বলা হইল ; তখন হযরত (দঃ) এই খাণ্ড তাঁহার অন্ত এক সঙ্গীর সম্মুখে দেওয়ার জন্য বলিলেন। হযরত (দঃ) উহা গ্রহণ না করায় ঐ ব্যক্তি উহা গ্রহণে অসম্মত হইল। এতদৃষ্টে হযরত (দঃ) তাহাকে বলিলেন, তুমি খাও। আমার কথাবার্তা এমন জনের সঙ্গে হয় যাহার সঙ্গে তোমার কথাবার্তা হয় না (অর্থাৎ ফেরেশতাদের সঙ্গে)।

৪৮৭। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খায়বার যুদ্ধের সময়ে একদা নবী ছালাল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, রসুন জাতীয় সবজি যে ব্যক্তি খাইবে সে যেন আমাদের মসজিদের কাছেও না আসে।

৪৮৮। হাদীছ :—এক ব্যক্তি আনাছ (রা:)কে জিজ্ঞাসা করিল, রসুন সম্পর্কে আপনি নবী ছালাল্লাহ্ আলাইহে অসাল্লামকে কি বলিতে শুনিয়াছেন? তিনি বলিলেন, নবী (দ:) বলিয়াছেন, এই জাতীয় সবজি যে ব্যক্তি খাইয়াছে, সে যেন আমাদের নিকটে না আসে এবং আমাদের সঙ্গে নামায না পড়ে।

ব্যাখ্যা :—৪৮৬নং হাদীছে ছাহাবী জাবের (রা:) স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন, হুর্গন্ধের জন্যই এই নিষেধাজ্ঞা। বিড়ি-সিগারেট ও হোকার হুর্গন্ধ যে কিরূপ তাহা সকলেই জানে, অতএব উহার অভ্যস্ত ব্যক্তিরা মসজিদে আসিবার পূর্বে উহা হইতে অবশ্যই বিরত থাকিবে।

নারীদের মসজিদে যাওয়া

৪৮৯। হাদীছ :—আবুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছালাল্লাহ্ আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—কাহারও জ্ঞী যদি রাজির অঙ্গকারে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায় তবে তাহাকে অনুমতি দেওয়া চাই।

ব্যাখ্যা :—এই হাদীছ দ্বারা ইমাম বোখারী (র:) ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, নারীদের জন্য মসজিদে যাইতেও স্বামীর অনুমতি গ্রহণ আবশ্যক ছিল।

৪৯০। হাদীছ :—উম্মে-ছালামাহ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহ্ আলাইহে অসাল্লামের সময়ে নারীগণ মসজিদে উপস্থিত হইত এবং সালাম ফিরা মাত্র বাহির হইয়া আসিত। রসুলুল্লাহ (দ:) এবং পুরুষগণ বসিয়া থাকিতেন। (মহিলাগণ বাহিরে চলিয়া গিয়াছে একরূপ অনুমান করিয়া) রসুলুল্লাহ (দ:) দাঁড়াইলে পর পুরুষগণ দাঁড়াইতেন; এমনকি রসুলুল্লাহ (দ:) (এবং পুরুষগণ) মসজিদ হইতে বাহির হওয়ার পূর্বেই নারীগণ নিজ নিজ ঘরে প্রবেশ করিয়া সারিত। (১১৭ পৃ:)

ব্যাখ্যা :—এই হাদীছ দৃষ্টে বোখারী (র:) বলিয়াছেন, নারীদের জন্য মসজিদে অবস্থান সংক্ষিপ্ত করার এবং নামায হইতে দ্রুত বাড়ী প্রত্যাবর্তন করার আদেশ ছিল। এই হাদীছে ইহাও সুস্পষ্ট যে, শুধু মাত্র মসজিদ-সংলগ্ন বাড়ী-ঘরের নারীরাই মসজিদে আসিত।

৪৯১। হাদীছ :—আয়েশা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, বর্তমান যুগের নারীরা যে অবস্থা অবলম্বন করিয়াছে তাহা যদি রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহ্ আলাইহে অসাল্লাম জানিতেন তবে খোদার কসম—নিশ্চয় তিনি নারীগণকে মসজিদে যাইতে নিষেধ করিতেন, যেক্রপভাবে বনী ইস্রায়েলের নারীদের জন্য মসজিদে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল।

ব্যাখ্যা :—আয়েশা (রা:) যেই যুগের নারীগণের প্রতি অভিযোগ করিতেছিলেন সেই নারীগণ হইলেন আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহার যুগের নারী, অর্থাৎ রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহ্ আলাইহে অসাল্লামের সংলগ্ন যুগ, সেই যুগের পরেও উক্ত যুগ আরও একটি বা দুইটি বাকি ছিল। সেই যুগ হইতে দীর্ঘ তেরশত বৎসরের অধিক কাল পরের যুগ হইল বর্তমান যুগ। এই যুগের নারীদের অবস্থা আয়েশা (রা:) দেখিলে কি বলিতেন? এবং রসুলুল্লাহ (দ:) তাহা জানিতে পারিলে কি করিতেন? উহা পাঠকগণের বিবেক-বুদ্ধির উপরই ছাড়া হইল।

২৯২। হাদীছ :- আবুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফা ওমরের এক স্ত্রী (রাত্রে অন্ধকারে) ফজর ও এশার নামাযের জমাতে মসজিদে যাইতেন। এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল, আপনি কেন মসজিদে আসেন? অথচ জানেন যে, ওমর (রাঃ) ইহা নাপছন্দ করেন এবং ইহাতে ক্ষুব্ধ হন। স্ত্রী বলিল, ওমর (রাঃ) আমাকে (নিষেধ করেন না কেন?) নিষেধ করিতে বাধা কি? ঐ ব্যক্তি বলিলেন, রসুলুল্লাহ হাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি হাদীছ—“আল্লার বান্দাগণকে আল্লার মসজিদে যাইতে নিষেধ করিও না।” (এই হাদীছের প্রতি সম্মান প্রদর্শন) ওমর (রাঃ)কে প্রকাশ্য নিষেধাজ্ঞায় বাধা দেয়।

ব্যাখ্যা :- হাদীছের প্রতি সম্মান প্রদর্শন উদ্দেশ্যে ছাহাবীগণ নারীদের মসজিদে যাওয়ার উপর সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার আইন প্রয়োগ করিতেন না, কিন্তু যুগের পরিবর্তনে সকলেই উহাকে অবাস্তিত গণ্য করিতেন। নারীদের মসজিদে বা ঈদগাহে যাওয়া সম্পর্কে জরুরী ও অধিক আলোচনা “ঋতুবতীর জন্য ঈদগাহে ও দোয়ার সমাবেশে উপস্থিত হওয়া” পরিচ্ছেদে ২২২নং হাদীছের ব্যাখ্যায় রহিয়াছে।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● ঝড়-তুফান বা প্রবল বৃষ্টিপাত ইত্যাদির সময় মসজিদে বা জমাতে উপস্থিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা নাই। নিম্ন গৃহে নামায পড়িয়া নিবে (২২ পৃ: ৩৮৫ হাদীছ)।

● লোকদেরকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে নামাযের নিয়ম দেখাইবার নামায পড়া জায়েয আছে (২৩ পৃ: ৪৬৬ হাদীছ)। এইরূপ উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে উক্ত নামায প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ তায়ালার জন্যই গণ্য হইবে এবং উহাতে ছওয়াব লাভ হইবে।

● কোন মোক্তাদী যদি বিশেষ প্রয়োজন বশত: ইমামের পার্শ্বে দাঁড়ায়; (মোক্তাদীদের কাতারে शामिल হইলে সেই প্রয়োজন মিটে না,) তাহা জায়েয হইবে (২৪ পৃ: ৪০৩ হাদীছ)।

● রাষ্ট্রপ্রধান যেখানেই যাইবেন তথায়ই তিনি ইমামতী করিবেন (২৫ পৃ)।

ব্যাখ্যা :- মোসলেম শরীফের এক হাদীছ আছে, “কাহারও প্রাধান্যের স্থানে অন্য আগন্তুক ব্যক্তির ইমাম হওয়া চাই না।” উক্ত হাদীছ বর্ণনা করিয়াই বোখারী (রঃ) বলিয়াছেন, রাষ্ট্রপ্রধানের প্রাধান্য যেহেতু সর্বত্র ও সকলের উপর তাই তিনি সর্বাস্থলেই ইমাম হইবেন। সেমতে একস্থানে কাহারও প্রাধান্য রহিয়াছে সেখানে যদি তাঁহার উপর প্রাধান্যের অধিকারী কেহ উপস্থিত হন, তবে ইমামতীর জন্য তাঁহাকে আহ্বান করা উচিত।

● মোক্তাদী শুধু একজন পুরুষ হইলে সে ইমামের ডান পার্শ্বে দাঁড়াইবে। সে ক্ষেত্রে ইমামের বরাবর সমরেক্ষা পর্য্যন্ত অবশ্যই থাকিতে হইবে (২৭ পৃ: ১০৯ হাদীছ)। সামান্য পরিমাণেও ইমাম হইতে অগ্রে হইলে মোক্তাদীর নামায ফাছদ হইয়া যাইবে। অগ্র হওয়ার আশঙ্কামুক্ত থাকার জন্য সামান্য পেছনে থাকা ভাল।

● মোক্তাদী একজন, সে ইমামের বাম দিকে দাঁড়াইলে যদি ইমাম নামাযের মধ্যেই তাহাকে ধরিয়া ডান দিকে নিয়া আসে, তাহাতে ইমাম মোক্তাদী কাহারও নামায নষ্ট হইবে না (৯৭ পৃ:)। কিন্তু লক্ষ্য রাখিবে যে, মোক্তাদীকে ইমামের পেছন দিক দিয়া আনিবে এবং এমনভাবে আনিবে যাহাতে তাহার কেবলামুখী থাকা ভঙ্গ না হয়, অন্যথায় মোক্তাদীর নামায কাছেদ হইয়া হাইবে।

● কোন ব্যক্তি স্বীয় নামায আরম্ভ করিয়াছে ইমামতীর নিয়্যত করে নাই, তাহার সহিত পুরুষলোক একতেনা করিলে ইমাম মোক্তাদী সকলেরই নামায শুদ্ধ হইবে (৯৭ পৃ:)। অবশ্য ইমামতীর যে বিশেষ ছওয়াব আছে তাহা লাভ করার জন্য ইমামতীর নিয়্যত করা আবশ্যক; প্রথম হইতে যদি কোন মোক্তাদী উপস্থিত না থাকে, তবে যখন মোক্তাদী আসে তখন মনে মনে ইমামতীর নিয়্যত তথা ইচ্ছা করিয়া নিবে। (শামী, ১-৩২৫)

পুরুষ ইমামের সহিত মহিলার নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য ভিন্ন মহাআলাহ। সে ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য মতামত ইহাই যে, পুরুষ ইমাম বিশেষরূপে মহিলার ইমামতীর নিয়্যত যদি না করে তবে সেই ইমামের পেছনে মহিলার নামায হইবে না (শামী, ১-৫৩৯)। সেমতে মহিলারা যদি মসজিদে নামায পড়ে তবে এই ব্যাপারে তাহাদের সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

● ইমামতীর সময় কেরাত, রুকু-সেজদা ইত্যাদি অতি দীর্ঘ করিবে না, কিন্তু রুকু-সেজদা পূর্ণরূপে অবশ্যই করিবে (৯৭ পৃ: ৭৬ হাদীছ)।

● (বিভিন্ন নামাযে কেরাতের যে পরিমাণ স্মৃতি নির্দ্ধারিত রহিয়াছে তাহার অধিক পড়িয়া বা প্রয়োজনাতিরিক্ত মশুর ও ধীর গতিতে পড়িয়া) ইমাম নামায লম্বা করিলে মোক্তাদী ইমামের প্রতি অভিযোগ করিতে পারে (৯৭ পৃ:)।

● ইমামের তকবীর সব মোক্তাদী শুনিতে পারিবে না বিধায় কোন মোক্তাদী কতৃক ইমামের সঙ্গে তকবীর উচ্চৈঃস্বরে বলা মোকাবেবর হওয়া জায়েয আছে (৯৮ পৃ: ৪০৩ হা:)।

মহাআলাহ:—যে সব মোক্তাদী এমন স্থানে দাঁড়ায় যেস্থান হইতে তাহারা ইমামের রুকু-সেজদা, উঠা-বসা সরাসরি অবগত হয় না সে ক্ষেত্রে ঐ মোক্তাদীগণ পরস্পর অল্প মোক্তাদীর অনুসরণে নামায আদায় করিবে এবং তাহাদের নামায শুদ্ধ হইয়া যাইবে (৯৯ পৃ: ৪০৩ হাদীছ)।

অবশ্য ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেই হইবে যে, আরকান আহকাম আদায়ে ইমামের সহগমন যেন রক্ষা হয় এবং রুকু-সেজদার ব্যাপারে ইমামই একমাত্র অনুসরণীয়। সুতরাং ঐরূপ দূরের কাতারে কোন মোক্তাদী যদি এমন সময় নামাযে শরীক হইয়া রুকুতে যায় যখন ইমাম রুকু হইতে উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু পেছনের মোক্তাদীগণ হয়ত তখন রুকুতে ছিল; ঐরূপ ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি উক্ত রাকাত পাইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে না। অতএব যে স্থান হইতে ইমামের অবস্থা সরাসরি প্রত্যক্ষ না হয় ঐরূপ স্থানে সন্ধীর্ণ অবস্থায়

রুকুতে শরীক হইয়া উক্ত রাকাত প্রাপ্তি গণ্য করা অত্যন্ত আশঙ্কার বিষয়; ইমামের সঙ্গে রুকু প্রাপ্তির সন্দেহ ক্ষেত্রে রুকুতে शामिल না হওয়া চাই।

● নামায অবস্থায় বা নামায শেষে মোক্তাদী কতৃক ইমামের ভুল ধরা হইলে বা কোন বিষয়ে ইমামের সন্দেহ হইলে সে ক্ষেত্রে ইমাম মোক্তাদীর কথা গ্রহণ করিবে।

● সাধারণতঃ ইমামের ডান দিক এবং মসজিদের ডান দিকের ফজিলত অধিক (১০১ পৃঃ)। আবু দাউদ শরীফে আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কাতার সমূহের ডান অংশের জন্ত আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত হয়, ফেরেশতাদেরও বিশেষ দোয়া হয়।

অবশ্য সম্মুখ কাতারের যে কোন অংশে জায়গা খালি থাকিলে পেছনে দাঁড়ান গোনাহ সুতরাং কাতারে খালি জায়গা দেখিয়া বাম দিকে হওয়া সত্ত্বেও উহা পূর্ণ করার তৎপর হইলে ইহারও বিশেষ ফজিলত রহিয়াছে। ইবনে মাজা শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অভিযোগ করা হইল যে, মসজিদের বাম দিক খালি থাকিয়া যায়। তখন হযরত (রঃ) বলিলেন, মসজিদের বাম দিকই অংশের খালি জায়গা পূরণে যে ব্যক্তি তৎপর হইবে সে দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হইবে (ফতঃ ২-১৬৯)।

● নামায আরম্ভ করিতে হস্তদ্বয় উত্তোলন এবং তকবীর বলা উভয়ই এক সঙ্গে পরিচালিত করিবে (১০২ পৃঃ ৪৩২ হাদীছ)।

● সেজদা অবস্থায় পা এইরূপে খাড়া রাখিবে যেন পায়ের আঙ্গুল মোড়িয়া কেবলামুখী হইয়া থাকে (১১২ পৃঃ ৪৭৫ হাদীছ)।

● নামাযের মধ্যে ছতর খুলিয়া যাওয়ার আশঙ্কা হইলে কাপড় সংযত রাখায় তৎপর হওয়া জায়েয (১১৩ পৃঃ ২৬০ হাদীছ)।

● নামাযের মধ্যে চুলের ভাঙ্গ ভাঙ্গিলে বা এগোমেলা হইলে নামাযের মধ্যেই উহা প্রতিরোধে লিপ্ত হইবে না (১১৩ পৃঃ ৪৬৯ হাদীছ)।

● প্রত্যেক রাকাতে উভয় সেজদার মধ্যেও শাস্তভাবে বসিয়া তারপর দ্বিতীয় সেজদায় যাইবে (১১৩ পৃঃ)।

● কপাল, নাক ইত্যাদিতে ধূলা-বালু লাগিলে নামাযের মধ্যেই উহা পরিস্কার করায় লিপ্ত হইবে না (১১৫ পৃঃ ৪৭০ হাদীছ)।

● নামায পড়িয়াই ইমামকে নামাযের স্থান হইতে সরিয়া পড়িতে হইবে—এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। এমনকি ইমাম এবং যে কোন মুছন্নী তাহার ফরজ নামাযের স্থান হইতে ঘোটেও না সরিয়া সেই স্থানেই সূর্য ও নফল ইত্যাদি নামায পড়িতে পারে; ইহাতে কোন দোষ নাই। বোখারী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ফরজ পড়িয়া ঐ স্থানেই অল্প নামায পড়িতেন। আবু বকর রাজিয়ার্লাহু আনহুর পৌত্র নিশিষ্ট তাবেয়ী কাসেম (রাঃ)ও ঐরূপ করিতেন।

ইমাম বোখারী (র:) ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি হাদীছ আবু হোরায়া (রা:) -এর নামে বর্ণনা করা হইয়া থাকে যে, ইমাম তাহার ফরজ, পড়ার স্থানে সুন্নত-নফল নামায পড়িবে না। এই হাদীছ বিত্ত্বক সনদ দ্বারা প্রমাণিত নহে (১১৭ পৃ:)। তবে এই ব্যাপারে একাধিক হাদীছ রহিয়াছে; অবশ্য উহার প্রত্যেকটি হাদীছেরই সনদ তথা সাক্ষ্য-সূত্র দুর্বল। অতএব উহাকে ভাল বলা যাইতে পারে, কিন্তু উহার বিপরীতটা মকরুহ সাব্যস্ত হইবে না। সুতরাং উহার জন্য অধিক তৎপরতা বা অন্যের উপর চাপ প্রয়োগ নিতান্তই বাড়াবাড়ি গণ্য হইবে।

● অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকার উপর নামায ফরজ নহে, তজুপ অজুও তাহাদের উপর ফরজ নহে, (শামী, ১—৮০)। অবশ্য তাহাদেরও নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য নামায শুদ্ধের সগুদয় শর্ত বজায় থাকিতে হইবে। বালক-বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্বেই তাহা-দিগকে নামাযে অভ্যস্ত করা চাই; তখন নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্ত পালনে এবং নামায নষ্ট হওয়ার কোন কারণ হইলে তদ্রূপ ঐ নামায পুনঃ পড়ায়ও তাহা-দিগকে অভ্যস্ত করিবে (শামী, ১—৩৮৩)। অজু গোসল একমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক হইলেই ফরজ হইবে (ফতহুল-বারী, ২—২৭৫)। বালকদের মসজিদে এবং ঈদগাহে যাওয়ায়ও অভ্যস্ত করিবে। অবশ্য দুইটি বিষয় সতর্ক থাকিবে—পাক-পবিত্র হওয়া এবং মসজিদের ও ঈদগাহের আদব-কায়দা রক্ষা করা তথা খেলা-ধুলা ও হট্টগোল হইতে বিরত রাখার ব্যবস্থা করা (১১৮ পৃ:)।

জুমার দিন ও নামাযের আঙ্কান

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

إِذَا تَوَدَّى لِّلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ.....

অর্থ:—হে মোমেনগণ! জুমার দিন জুমার নামাযের আঙ্কান দেওয়া হইলে তৎক্ষণাৎ তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য (ইত্যাদি লিপ্ততা) ত্যাগ পূর্বক আল্লার জিকর তথা নামাযের প্রতি ধাবিত হও। তোমাদের যদি জ্ঞান বুদ্ধি থাকে তবে উপলব্ধি করিতে পারিবে যে, ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম ও কল্যাণকর। (২৮ পাঃ ১১ রুকু)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, উক্ত সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকা হারাম। আ'তা (রাঃ) বলিয়াছেন, জুমার আঙ্কানের পর শিল্পকার্য্যও হারাম। ইমাম যুহরী বলিয়াছেন, জুমার আঙ্কান হইলে (অবস্থানরত) মুসাফিরও জুমার নামাযে উপস্থিত হইবে। (১০৪ পৃঃ)

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময় একদা জুমার দিন এক দল লোক খোৎবার সময় খাচ্চ ক্রয়ের সুযোগের প্রতি ধাবিত হইলে তাহাদের কটাক্ষ করিয়া পবিত্র কোরআনের আয়াত নাখিল হইয়াছিল। নিম্নের হাদীছে উহারই বিবরণ আছে।

৪৯৩। হাদীছ:—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা জুমার দিন আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সহিত নামাযের জন্য একত্রিত হইয়াছিলাম। ঐ সময় একটি সওদাগরী দল আসিতেছিল; উপস্থিত লোকদের অনেকেই সেই দিকে ধাবিত হইল; নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে শুধু বারজন লোক বাকি থাকিলেন। সেই ব্যাপারেই এই আয়াত নামেল হইল—

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا مُّؤَخَّرًا إِلَيْهَا

“এক শ্রেণীর লোক তাহারা যখন ব্যবসা বা তামাশার সুযোগ দেখিল, উহার প্রতি ধাবমান হইল— (খোৎবা দানে) দণ্ডায়মান অবস্থায় আপনাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলে। তাহাদিগকে বলিয়া দিন, আল্লার নিকট (সন্তুষ্টি ও ছওয়াব) আছে তাহা ব্যবসা-বাণিজ্য ও রং-তামাশা অপেক্ষা অনেক উত্তম এবং আল্লাহ সর্বোত্তম আহর যোগানদাতা। (১২৮ পৃঃ)

ব্যাখ্যা:—জুমার আঙ্কানের সঙ্গে সঙ্গে খরিদ-বিক্রি ইত্যাদি লিপ্ততা নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান এবং পূর্ণ খোৎবার সময় তথায় জমিয়া থাকার বিশেষ আদেশ পূর্বে বিজ্ঞাপিত হয় নাই; সে সম্পর্কের পূর্বোল্লিখিত আয়াতও নামেল হইয়াছিল না। এবং এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে—আলোচ্য ঘটনার সময়কালে জুমার খোৎবা নামাযের পরে হইত—

মোসলমানগণ সপ্তাহে একটি দিনকে বিশেষরূপে এবাদতের জন্ত নির্বাচন করিতে মনস্থ করিলেন। আল্লার মেহেরবানী—তাহাদের পরামর্শে এই জুমার দিনটিই নির্বাচিত হইয়াছিল।

জুমার দিনে গোসল করা

৪৯৫। হাদীছ :— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এত্ব্যেকেরই জুমার নামাযে উপস্থিত হইবার পূর্বে গোসল করা আবশ্যক।

৪৯৬। হাদীছ :—ইবনে ওমর (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা খলীফা ওমর (রা:) জুমার নামাযের খোৎবা দিতেছিলেন, এমনতাবস্থায় তিনি দেখিতে পাইলেন, একজন মোহাজের ছাহাবী জুমার নামাযের জন্ত উপস্থিত হইয়াছেন। খলীফা ওমর (রা:) তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, জুমার উপস্থিত হইবার সময় কি এখন? ছাহাবী উত্তর করিলেন, আমি একটি কাষে লিপ্ত ছিলাম, তাই আজ্ঞানের পূর্বে বাড়ী ফিরিতে পারি নাই; এই মাত্র বাড়ী ফিরিয়া আজ্ঞান ওনিলাম এবং অজু করিয়া উপস্থিত হইলাম। খলীফা ওমর (রা:) আশ্চর্যচিতরূপে বলিয়া উঠিলেন, (গোসল ব্যতিরেকে) শুধু অজু করিয়া আসিলেন? অথচ আপনি জানেন যে, হযরত (দ:) আমাদিগকে (জুমার দিন) গোসল করিতে আদেশ করিতেন।

৪৯৭। হাদীছ :—তাউস (র:) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা:)কে বলিলাম, লোকেরা বর্ণনা করে—রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা জুমার দিন গোসল করিবে, ভালরূপে মাথা ধুইবে যদিও ফরজ গোসলের নাপাক না হও এবং সুগন্ধী ব্যবহার করিবে। ইবনে আব্বাস (রা:) বলিলেন, গোসল সম্পর্কে আমারও এই আদেশ জানা আছে; সুগন্ধী সম্পর্কে আদেশ আমার জানা নাই। (১২১ পৃঃ)

৪৯৮। হাদীছ :—ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ (র:) আম্রাহ (র:)কে জুমার দিনের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বর্ণনা করিলেন, আরেশা (রা:) বলিয়াছেন, (নবী আলাইহেছালামের যুগে) লোকদের (অভাব-অনটনের দরুন চাকর রাখার সামর্থ্য ছিল না, তাই) পরিশ্রমের কাজ-কর্মও নিজেদেরই করিতে হইত। (একদিকে সেই খাটনি, অপরদিকে তাহাদের পরিধের ছিল ছয়া-বকরীর লোমের তৈরী মোটা কম্বল; সুতরাং তাহাদের বর্মাক্ত শরীরে ছর্গজ সৃষ্টি হইত;) সেই অবস্থায়ই তাহারা জুমার নামাযে আসিত; তাই তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল—যদি তোমরা গোসল করিয়া জুমার নামাযে আস তবে ভাল হয়। (১২৩ পৃঃ)

বিশেষ জ্ঞপ্তা :—আবু দাউদ শরীফে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) হইতেও এইরূপ একটি বর্ণনাই বর্ণিত আছে। ইবনে আব্বাস (রা:) এক প্রশ্নের উত্তরে উক্ত বিবরণী দ্বারা ব্যাখ্যা করেন যে, জুমার দিন গোসল করা বিধানগত ওয়াজেব নহে, বরং পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

* প্রায় সকল ইমায়গণই এখানে “ওয়ার্ডেন” শব্দের অর্থ প্রয়োজনীয় উত্তম কাজ বুলিয়াছেন।

ঘটনাক্রমে কিছু দিন পর রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কোথাও হইতে রেশমী কাপড়ের কিছু শোষাক উপস্থিত হইল, রসুলুল্লাহ (দঃ) উহা সর্বসাধারণকে বিতরণ করিলেন, তন্মধ্যে এক জোড়া ওমর (রাঃ)কে দিলেন। ওমর (রাঃ) ঐ কাপড় পাইয়া দুঃখিত মনে হযরত রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন— ইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)। আপনি আমাকে আজ ঐ কাপড় দান করিয়াছেন, অথচ রেশমী কাপড়ের বিষয় আপনি যাহা বলিবার বলিয়াছেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) উত্তর করিলেন, ঐ কাপড় স্বয়ং তোমাকে ব্যবহার করিবার জন্য দেই নাই। সেমতে ওমর (রাঃ) ঐ কাপড় জোড়া তাঁহার এক দূরসম্পর্কীয় ভাতাকে দিয়া দিলেন, সে কাকের ছিল এবং মক্কায় থাকিত।

জুমার দিন ফজরের নামাযে কোন্ ছুরা পড়া উচিত

৫০৩। হাদীছ :- আবু হোরায়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জুমার দিন ফজরের নামাযে ছুরা “আলীফ-লাম-মীম তানজীল” (الم تَنْزِيل) এবং ছুরা হাল-আ’তা আলাল-ইনসানে (هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ) পড়িতেন।

গ্রাম ও শহর উভয়ের মধ্যেই জুমা জায়েয

● ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে জুমা আরস্তের পর অল্প মসজিদে জুমা পড়ার মধ্যে সর্বপ্রথম ‘জুয়াসা’ নামক স্থানে আবহুল কায়েশ গোত্রীয় মসজিদে জুমা হইয়াছিল। ‘জুয়াসা’ এলাকাটি বাহরাইন দেশভুক্ত একটি এলাকা।

● আয়লা এলাকার শাসনকর্তা ‘রোযায়েক’ তথাকার কেন্দ্রীয় শহর হইতে দূরে তাঁহার খামারে একদল শ্রমিক দিয়া কাজ করাইতেছিলেন। তথা হইতে তিনি সুপ্রসিদ্ধ তাবেরী মোহাম্মদ ইবনে শেহাব জুহরী (রঃ)কে পত্র দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলেন, খামার এলাকায় শ্রমিকদেরকে নিয়া জুমার নামায পড়িব কি? ইবনে শেহাব জুহরী (রঃ) লিখিয়াছিলেন, আপনি তথায় অবশ্যই জুমার নামায পড়িবেন।

জুমার নামাযে আদিষ্ট না হইলে সে গোসলের আদিষ্ট হইবে কি?

মহিলাগণ এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক লোকগণ—তাহাদের প্রতি জুমার নামাযের আদেশ নাই; জুমার দিনের গোসলের আদেশ তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য হইবে কি?

ছাহাবী আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, জুমার দিনের গোসলের কর্তব্য শুধু তাহাদের উপরই যাহাদের উপর জুমার নামায ফরজ।

৫০৪। হাদীছ :- আবু হোরায়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক মোসলমানের কর্তব্য প্রতি সাত দিনে এক দিন (জুমার দিন) গোসল করা। (বন্ধনীর মধ্যবর্তী কথাটিও হাদীছেরই অংশ। ফতহুলবারী, ২—৩০৬)

এই হাদীছ মর্মে মহিলা এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরও জুমার দিন গোসল করা কর্তব্য।

জুমার জনাতে উপস্থিতি অসাধ্য হইলে জুমা মাক

৫০৫। হাদীছ :— একদা জুমার দিন ভীষণ বৃষ্টি ও কাদার সৃষ্টি হইল। ইবনে আববাস (রাঃ) উপস্থিত লোকদেরকে নিরা জুমার নামায পড়ার ব্যবস্থা করিলেন এবং মোয়াজ্জেনকে হাইয়া-আলাস্‌সালাহ বলার সময়ে *الصلوة في الرحال* “নিজ নিজ ঘরে নামায পড়িয়া নেও” বলিবার আদেশ করিলেন। ইহাতে লোকদের মধ্যে চাকল্যের সৃষ্টি হইল। ইবনে আববাস (রাঃ) বলিলেন, তোমরা আমার এই ব্যবস্থার চাকল্য দেখাইতেছ। নবী (সঃ) এইরূপ করিয়াছেন। জুমার নামায অবশ্য ফরজ বটে, কিন্তু এই বৃষ্টি ও কাদার অবস্থায় তোমাদিগকে গোনাহের ভাগী করিব যাহাতে তোমরা হাটু পর্য্যন্ত কাদা জড়াইয়া এই বৃষ্টির মধ্যে মসজিদে আসিবে—ইহা আমি ভাল মনে করি নাই।

ব্যাখ্যা :—“হাইয়া আলাস্‌সালাহ” অর্থ নামাযের জন্ত আস—এই আহ্বান ও আদেশ বস্তুতঃ আল্লাহ তারালার—যাহা বাহ্যিক দৃষ্টিতে উপস্থিত মুরব্বির পক্ষ হইতে মোয়াজ্জেনের মুখে উচ্চারিত হয়। উহা লক্ষ্যন করা মামুলী কথা নহে; আজ্ঞানের ঐ বাক্যে মোসলমানদের জমাতে উপস্থিতি কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়, অথচ এইরূপ অবস্থায় জুমার নামাযের জন্ত আসার ফরজ মাক হইয়া গিয়াছে, তাই বাড়ীতে নামায পড়ার কথা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। জুমা মাক হইলে বাড়ীতে নিম্নমিত্ত কোহর নামায পড়িতে হয়।

কতদূর ব্যবধান হইতে জুমায় উপস্থিত হওয়া উচিত

আ'তা (রাঃ) নামক বিশিষ্ট তাবেয়ী বলিয়াছেন—যখন তুমি এমন কোন বস্তিতে উপস্থিত থাক, যেই বস্তিতে জুমা হইয়া থাকে এবং যেখানে জুমার আজ্ঞান দেওয়া হয় তখন জুমার নামাযে শরীক হওয়া তোমার উপর অবশ্য কর্তব্য। আজ্ঞানের আওয়াজ শুনিতে পাও অথবা না পাও।

বহরা শহর হইতে ছয় মাইল দূরে “যাবিয়া” নামক খুব নগণ্য বসতির স্থানে আনাছ (রাঃ) ছাহাবীর একটি নিরালা-নিবাস ছিল; তথায় অবস্থান কালে তিনি কোন দিন ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া বহরা শহরে জুমার নামায পড়িতেন এবং কোন কোন দিন আসিতেন না।

৫০৬। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোসলমানগণ মদীনা হইতে দূর-প্রান্তে অবস্থিত নিজ নিজ বাড়ী হইতে এবং মদীনার উর্দ্ধ প্রান্ত হইতে জুমার নামাযের জন্ত রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে উপস্থিত হইয়া থাকিতেন। তাঁহার খুলা-বালী মাথা অবস্থায় আসিতেন, তত্পরি তাঁহাদের শরীরে ঘর্ম ও নির্গত হইত। একদা রসুলুল্লাহ (সঃ) আমার নিকট ছিলেন তখন ঐরূপ একজন লোক তাঁহার নিকট আসিল। রসুলুল্লাহ (সঃ) তাহাকে বলিলেন—জুমার দিন পরিকার-পরিচ্ছন্ন হইয়া আসিলে ভাল হয়।

জুমার নামাযের ওয়াক্ত

৫০৭। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সূর্য্য আকাশের মধ্যস্থল অতিক্রম করার পর জুমার নামায পড়িতেন।

৫০৮। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা জুমার নামায যথাসম্ভব শীঘ্র পড়িতাম এবং দ্বিপ্রহরের শয়নও জুমার নামাযের পরই হইত।

অর্থাৎ জুমার নামাযের জন্য বিশেষ তৎপরতা অবলম্বন করা হইত ; জুমার নামায না পড়িয়া কোন প্রকার আরামও করা হইত না। অবশ্য জুমার ওয়াক্ত হওয়ার পর তথা সূর্য্য আকাশের মধ্যস্থল অতিক্রম করার পর যথাসম্ভব শীঘ্রই জুমার নামায পড়িয়া লওয়া হইত।

৫০৯। হাদীছ :—ছালামাতুবুল আকওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে জুমা এমন সময় পড়িতাম যে, নামায শেষ করার পরেও দেওয়ালের ছায়া এতটুকুও হইত না যাহাতে রোজ হইতে আশ্রয় নেওয়া যায়। (৫০৯ পৃঃ)

ব্যাখ্যা :—জুমা অপেক্ষাকৃত প্রথম ওয়াক্তে যথানীচ পড়া হইত ; ইহাই এই বর্ণনার মর্ম।

৫১০। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (সঃ) ঠাণ্ডার দিনে জুমার নামায অগ্রভাগে পড়িতেন এবং উত্তাপের দিনে বিলম্বে পড়িতেন।

জুমার জন্য খাবিত হওয়ার আদেশ এবং পদব্রজে উপস্থিত হওয়া

৫১১। হাদীছ :—আবাতা ইবনে রেফাআ (রাঃ) বিশিষ্ট তাবেরী বর্ণনা করিয়াছেন, আমি জুমার নামাযের জন্য হাঁটিয়া যাইতেছিলাম, এমতাবস্থায় আবু আবস (রাঃ) ছাহাবী আগার নিকট আসিয়া বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম করমাইয়াছেন—যাহার পা আল্লার রাস্তার ধূলা মাখিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দোষখের জন্য হারাম করিয়া দিবেন। অর্থাৎ দোষখের আগুন তাহাকে স্পর্শ করিবে না।

জুমার দিন মসজিদে কাহাকেও উঠাইয়া তাহার স্থানে বসিবে না

কাহাকেও তাহার স্থান হইতে উঠাইয়া দিয়া সেই স্থানে বসা কোন সময়ই বাঞ্ছনীয় নহে ; বিশেষতঃ জুমার দিন।

৫১২। হাদীছ :—ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন—কেহ যেন অগ্নি মোসলমান ভাইকে তাহার স্থান হইতে উঠাইয়া দিয়া নিজে ঐ স্থানে না বসে, তাহা জুমার দিন হউক বা অন্য কোন দিন এবং মসজিদে হউক বা অন্য কোন ক্ষেত্রে।

জুমার আজান

৫১৩। হাদীছ :—সায়েব ইবনে ইয়াযিদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম, আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর সময়ে জুমার নামাযের জন্য শুধুমাত্র

এক আজান দেওয়া হইত যাহা খোৎবার পূর্বে ইমাম মিম্বরে বসিলে দেওয়া হয়। খলীফা ওসমান (রাঃ)-এর সময়ে যখন মোসলমানদের সংখ্যা অনেক বেশী হইয়া গেল (এবং মদীনা চতুর্পার্শে বসতি অনেক দূর পর্য্যন্ত বাড়িয়া গেল) তখন ওসমান (রাঃ) “যাওরা” নামক একটি উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া ঐ খোৎবার আজানের পূর্বে আর এক আজান দিবার ব্যবস্থা করিলেন।

বিশেষ দৃষ্টব্য :— প্রত্যেক নামাযের যে আজান দেওয়া হয় তাহা উক্ত নামাযের ওয়াক্ত-উপস্থিতি জ্ঞাত করার জন্ত, তাই সেই আজান জমাত আরম্ভের অনেক পূর্বে হয় এবং হইত। আর জুমার নামাযের আজান যাহা খোৎবা আরম্ভে দেওয়া হইত তাহা অবশ্যই নামাযের ওয়াক্ত-উপস্থিতি জ্ঞাত করার জন্ত ছিল না, নতুবা উহাও জমাত আরম্ভের অনেক পূর্বেই হইত। ঐ আজান জমাত-আরম্ভ জ্ঞাত করার জন্ত ছিল, তাই উহা খোৎবার আরম্ভে দেওয়া হইত। কারণ, জুমার খুৎবা উহার নামাযের বিশেষ অঙ্গরূপে পরিগণিত। প্রথম দিকে মোসলমান কম সংখ্যায় ছিলেন এবং তাঁহারা জুমার দিন বিশেষভাবে অনেক পূর্বে হইতেই নামাযের প্রস্তুতিতে তৎপর হইতেন, তাই ঐ নামাযের ওয়াক্ত জ্ঞাত করার জন্ত আজানের প্রয়োজন তখন ছিল না। যখন মোসলমানদের সংখ্যা বাড়িয়া মদীনা শহরের দূর এলাকা পর্য্যন্ত মোসলমানদের বসতি স্থাপিত হইল তখন জুমার জন্তও নামাযের ওয়াক্ত জ্ঞাত করার আজান দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল এবং খলীফা ওসমান (রাঃ) কতৃক সমস্ত ছাহাবীদের বর্তমানে অস্তিত্ব নামাযের স্থায় জুমার নামাযেরও ওয়াক্ত-উপস্থিতি জ্ঞাত করার আজান খোৎবা আরম্ভের অনেক পূর্বে দেওয়ার নিয়ম প্রবর্তিত হইল (ফতহুল-বারী, ২—৩১৫)।

উক্ত আজানের নিয়ম প্রবর্তিত হইলে খলীফা ওসমানের আমল হইতেই জুমার নামাযের মূল আজান (যাহা নবী (দঃ)-এর সময়ে খোৎবা-আরম্ভে দেওয়ার প্রচলন ছিল—সেই আজান) ইমাম মিম্বরে বসাবস্থায় ইমামের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেওয়ার রীতি প্রচলিত হয় বলিয়া ফতহুল-বারী কেতাবে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

ان عثمان احدثه لاعلام الناس بدخول وقت الصلوة قيبا سا على بقية
الملاوات فالحق الجمعة بها وابقى خصوصيتها بالازان بين يدي
الخطيب - (২-৩১৫)

খলীফা ওসমান (রাঃ) কতৃক এই রীতির প্রবর্তন সমস্ত ছাহাবীগণের বর্তমানেই ছিল। খলীফা ওসমানের রীতি অনুসারেই জুমার একটি আজান বন্ধিত করণ গৃহীত হইয়াছে—যে আজান নবীজীর আমলে ছিল না। তদ্রূপ খোৎবার আজান ইমামের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেওয়ার রীতিও গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ উভয় রীতিই এক সঙ্গে জড়িত ভাবে সমস্ত ছাহাবীগণের বর্তমানে খলীফা ওসমান (রাঃ) কতৃক প্রবর্তিত।

কিন্তু স্মরণ রাখিবে, ইমামের সম্মুখে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, মিস্বর ঘেষিয়া আজান দিবে। সাধারণ মুসল্লিদের প্রথম কাতারে ইমামের সম্মুখ বরাবর দাঁড়াইয়া আজান দিবে—যেই অবস্থাকে সাধারণতঃ ইমামের সম্মুখ বলা যায়।

উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা ইমাম বোখারী (র:) এই মহুআলাহও লিখিয়াছেন যে, খোৎবা আরম্ভের আজানের সময় ইমাম মিস্বরে বসা থাকিবেন। অর্থাৎ আজান আরম্ভের পূর্বেই ইমাম মিস্বরে উঠিয়া বসিবেন এবং খোৎবা আরম্ভ লগ্নে আজান দেওয়া হইবে।

ইমাম মিস্বরের উপর বসিয়া আজানের উত্তর দিবেন

৫১৪। হাদীছ :—আবু উমামাহ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন—আমি শুনিয়াছি, হাযাবী মোয়াবিয়া (রা:) মিস্বরের উপর বসিয়া মোয়াজ্জেনের আজানের সঙ্গে সঙ্গে নিজের আজানের শব্দসমূহকে উচ্চারণ করিলেন এবং আজান শেষে বলিলেন—হে লোক সকল! আমি রসূল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এরূপ বসা অবস্থায় মোয়াজ্জেনের আজান শব্দে এইরূপই বলিতে শুনিয়াছি।

মিস্বরে দাঁড়াইয়া খোৎবা দিবে

৫১৫। হাদীছ :—জাবের (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, মসজিদের মধ্যে একটি খেজুর গাছের থাম ছিল যাহার সংলগ্ন দাঁড়াইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খোৎবা দিয়া থাকিতেন। যখন তাহার জন্ত মিস্বর তৈয়ার করা হইল এবং তিনি ঐ খেজুর গাছের থাম ছাড়িয়া দিয়া মিস্বরের উপর খোৎবা দান আরম্ভ করিলেন, তখন আমরা নিজ কানে ঐ থামের ক্রন্দনের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম, যেরূপ সত্ত প্রসবিতা উট স্বীয় বাচ্চার জন্ত কাদিয়া থাকে। রসূল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মিস্বর হইতে নামিয়া আসিয়া উহার উপর হাত বুলাইলে সে শান্ত হইল।

৫১৬। হাদীছ :—আবু হুলাইলা ইবনে ওমর (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দাঁড়াইয়া খোৎবা দিয়া থাকিতেন এবং মধ্যস্থলে একবার বসিয়া পুনরায় দাঁড়াইয়া দ্বিতীয় খোৎবা প্রদান করিতেন ; যেরূপ বর্তমানেও হইয়া থাকে।

খোৎবা বা ভাষণ আলাদা প্রশংসা দ্বারা আরম্ভ করিবে

৫১৭। হাদীছ :—আমর ইবনে তাগলেব (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কোথাও হইতে কিছু ধন-দৌলত বা অল্প কোন বস্তু আমদানী হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ উহা বিতরণ করিয়া দিলেন। (প্রত্যেকেকে দেওয়ার পরিমাণ মাল ছিল না, তাই সকলকে না দিয়া কোন কোন ব্যক্তিকে দিলেন।) তারপর হযরত (দ:) শুনিতে পাইলেন যে, যাহারা উহার অংশ পায় নাই তাহারা অসন্তুষ্ট হইয়াছে।

তখন তিনি ভাষণ দান করিলেন—প্রথমে আল্লার প্রশংসা ও ছানা-ছিকত বয়ান করিলেন, তারপর বলিলেন, আমি অনেক সময় একজনকে দান করি অথু আর একজনকে দান করি না, অথচ যাহাকে দান করি না সে-ই আমার নিকট বিশেষ সন্তুষ্টিভাজন। এরূপ করার একমাত্র কারণ এই যে, একদল লোক এমন আছে যাহাদের মন এখনও ইসলামের প্রতি কাঁচা—তাহারা চঞ্চল; এখনও তাহাদের মধ্যে ইসলামের প্রতি স্থিরতা আসে নাই, তাই তাহাদিগকে দান করিয়া থাকি। আর একদল লোক এমনও আছে যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা দৃঢ় মনোবল দান করিয়াছেন এবং তাহাদের মনে-প্রাণে ঈমান সুদৃঢ়রূপে পাকা-পোক্ত হইয়াছে; সেই ভরসায় আমি তাহাদিগকে দান করি না। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্য হইতেই একজন আমর ইবনে তাগলেব।

এই হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী আমর ইবনে তাগলেব শপথ করিয়া বলেন—রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শেষ কথাটি আমার নিকট ছনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ধন-দৌলত হইতেও অধিক সন্তুষ্টির বস্তু ছিল। (কারণ, আমর ইবনে তাগলেব (রাঃ) দৃঢ় ঈমানদার ও রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সন্তুষ্টিভাজন হওয়ার উপর এই কথাটি সনদ ও সাক্ষ্য স্বরূপ ছিল।)

দুই খোৎবার মধ্যে বসিতে হইবে

৫১৮। হাদীছ :—আবুহুলাই ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জুমার দিন দুইটি খোৎবা দিতেন এবং খোৎবাবদয়ের মধ্যভাগে বসিতেন।

মনোযোগের সহিত খোৎবা শুনিবে

৫১৯। হাদীছ :—আবু হোরায়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—জুমার দিন একদল ফেরেশতা মসজিদের দরওয়াজায় দাঁড়াইয়া ধারাবাহিকরূপে আগন্তুক মুছল্লিগণের নাম লিখিতে থাকেন। যে ব্যক্তি প্রথম ওয়াক্তে আসিল সে মেন একটি উট ছদকা করিল। তারপরের সময়ের আগন্তুক যেন একটি গরু তারপর যেন একটি ছুয়া, তারপর যেন একটি মোরগ, তারপর যেন একটি আণ্ডা ছদকা করিল। তারপর যখন ইমাম খোৎবার জন্তু অগ্রসর হন তখন ফেরেশতাগণ সব কিছু গুছাইয়া খোৎবার মধ্যে আল্লার জেকুর শুনিবার জন্তু চলিয়া যান।

ব্যাখ্যা :— জুমার ওয়াক্তের সর্বপ্রথম অংশ অর্থাৎ সূর্য আকাশের মধ্যস্থল অতিক্রম করার পর হইতে ইমামের খোৎবার জন্তু অগ্রসর হওয়া পর্য্যন্ত সময়টুকুকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং সে অনুপাতে উল্লিখিত পর্য্যায়ের শ্রেণী স্থির করা হয়।

খোৎবার সময় আগত ব্যক্তির দুই রাকাত নাগাষ পড়া

৫২০। হাদীছ :—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি জুমার দিন এমন সময় মসজিদে উপস্থিত হইল যখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খোৎবা দিতেছিলেন।

তিনি ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কি নামায পড়িয়াছ? সে আরজ করিল, না। রসুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে দাঁড়াইয়া দুই রাকাত নামায পড়িতে আদেশ করিলেন।

ব্যাখ্যা :—একমাত্র এই একটি ঘটনাই পাওয়া যায় যে, খোৎবা দানকালীন ঐ এক ব্যক্তিকে দুই রাকাত নামায পড়ার আদেশ করা হইয়াছিল। রসুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় বা খোলাফায়ে-রাশেদীনগণের যমানায় এইরূপের ঘটনা দ্বিতীয় আর দেখা যায় নাই। অথচ খোৎবা প্রদানকালীন কাহারও উপস্থিত হওয়া একটি মামুলী ও অতি স্বাভাবিক বিষয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে প্রমাণিতও হইয়াছে, কিন্তু আর কখনও ঐরূপে নামায পড়ার আদেশ করা হয় নাই। এতদ্রষ্টে অধিকাংশ ইমামগণের মত এই যে, এই ঘটনাটি কোনও বিশেষ কারণমূলক ছিল। বস্তুতঃ মহাআলাহ এই যে—খোৎবা দানকালে নামায পড়া নিষিদ্ধ।

খোৎবার সময় হাত উঠানো

অনেক বক্তা বক্তৃতার সময় উগ্রমুতি বা ফিপ্ততা প্রকাশার্থে মুহুঃ মুহুঃ হস্ত উত্তোলন করিয়া থাকে। মোসলেম শরীফে এক হাদীছে এই অভ্যাসের প্রতি নিন্দা ও কোভ প্রকাশ করা হইয়াছে। বোখারী (রঃ) অত্র পরিচ্ছেদে একটি হাদীছ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এমন কোন বিষয়ের উপর যদি ভাষণদাতা হাত উঠায় বাহা শরীয়তে অনুমোদিত তবে তাহা নিন্দনীয় নহে। জুমার খোৎবারও এই মহাআলাহ প্রযোজ্য। যেমন—খোৎবার সময় উপস্থিত কোন বিশেষ দোয়া করা ক্ষেত্রে যদি খোৎবার মধ্যে হাত উঠানো হয় তবে তাহা নিন্দনীয় হইবে না। এ সম্পর্কীয় হাদীছখানার অনুবাদ পরবর্তী পরিচ্ছেদে আসিতেছে।

খোৎবার মধ্যে বিশেষ কোন দোয়া করা

৫২১। হাদীছ :— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক সময় মদীনা ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় অনাবৃষ্টির দরূণ দুর্ভিক্ষ পড়িল। ঐ সময় নবী (দঃ) এক জুমার দিন খোৎবারত ছিলেন, এমনতাবস্থায় এক গ্রাম্য ব্যক্তি মসজিদে আসিল এবং হযরতের বরাবরে দাঁড়াইয়া বলিল, ইয়া রসুল্লাহ! অনাবৃষ্টির দরূণ (ঘাসের অভাবে) পশুপাল মৃতপ্রায়, (দুধের অভাবে) বাচ্চা-কাচ্চা অনাহারী এবং মানুষ ধ্বংসের সম্মুখীন। আপনি আল্লাহ নিকট দোয়া করুন, আল্লাহ আমাদিগকে বৃষ্টি দান করেন। তৎক্ষণাৎ হযরত (দঃ) হস্তদ্বয় উত্তোলন করিলেন এবং দোয়া করিলেন—**اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا**—“হে আল্লাহ! আমাদিগকে বৃষ্টি দান করুন, হে আল্লাহ! আমাদিগকে বৃষ্টি দান করুন, হে আল্লাহ! আমাদিগকে বৃষ্টি দান করুন।” উপস্থিত লোকগণও আল্লার রসুলের সঙ্গে হাত উঠাইল এবং দোয়া করিল। ঐ সময় আকাশে মেঘের চিহ্নও ছিল না, কিন্তু রসুল্লাহ (দঃ) এখনও হাত নামান নাই, ইতিমধ্যেই পর্বতাকৃতির মেঘমালা মদীনা এলাকার প্রতি ছুটিয়া আসিতে লাগিল। হযরত (দঃ) মিস্বর হইতে নীচে আসিবার পূর্বেই এমন

বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া গেল যে, মসজিদের খেজুর পাতার ছাদ হইতে পানি পাড়িয়া হযরতের দাড়ি মোবারকের উপর পানি বহিতে লাগিল। বৃষ্টির দরুন আমাদের বাড়ীতে পৌছা কষ্টকর হইয়া পড়িল। পরবর্তী জুমার দিন পর্য্যন্ত অনবরত বৃষ্টি হইল; সাত দিন সূর্য দেখা গেল না। পরবর্তী জুমার দিন খোৎবার সময়েই ঐ ব্যক্তিকে কিম্বা অন্য ব্যক্তি দাড়াইয়া বলিল এবং তাহার সঙ্গে সকলেই চিৎকার করিয়া উঠিল, ইয়া রসুল্লাহ। (অধিক বৃষ্টিপাতে) বাড়ী-ঘর ধসিয়া যাইতেছে, পশুপাল পানিতে ডুবিয়া যাইতেছে, রাস্তা ঘাট বন্ধ হইয়া গিয়াছে, চলাচলের অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে। দোয়া করুন, আল্লাহ তায়াল্লা আমাদের উপর বৃষ্টি বন্ধ করিয়া দেন। হযরত (দঃ) স্মিত হাসিলেন এবং উভয় হাত উত্তোলন পূর্বক দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى رَءُوسِ الْجِبَالِ وَالْاَكَامِ وَبُطُونِ
الْاَوْدِيَةِ وَمَنَايِتِ الشَّجَرِ -

“হে আল্লাহ! আমাদের হইতে দূরের পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে বৃষ্টি বর্ষিত হউক, আমাদের উপরে নয়; বড় বড় পাহার-পর্বতের উপর, ছোট ছোট পাহাড়ে এবং পার্বত্য ও সমতল ভূমিতে এবং বাগ-বাগিচা ও খেত-খামারে বর্ষিত হউক। রসুল্লাহ ছান্নালাহ আলাইহে অসাল্লামের হাতের ইশারার সাথে সাথে মেঘ-খণ্ডগুলি মদীনার আকাশ হইতে পার্শ্ববর্তী দিকে চলিয়া গেল এবং দূরবর্তী এলাকায় বর্ষিল। মদীনার আকাশে মেঘের চিহ্নও থাকিল না এবং এক কোটা বৃষ্টিও আর রহিল না। নামাযান্তে আমরা রৌদ্রের মধ্যে বাড়ী ফিরিলাম। দূরবর্তী এলাকার বৃষ্টিপাতে “কানাত” নামক গিরি-প্রাণী এক মাস পর্য্যন্ত প্রবাহমান থাকিল। দূরবর্তী এলাকার প্রত্যেক আগন্তুকই বৃষ্টিপাতের সংবাদ দিতেছিল। (১২৭, ১৩৭, ১৪৩ পঃ)

খোৎবা দানকালীন সকলকে চূপ থাকিতে হইবে

সালমান ফারসী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুল্লাহ ছান্নালাহ আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যখন ইমাম খোৎবা প্রদান করে তখন সকলের চূপ থাকা উচিত।

৫২২। হাদীছঃ—আবু হারায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুল্লাহ ছান্নালাহ আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—জুমার দিন খোৎবা দানকালীন তুমি যদি কাহাকেও (মুখে শব্দ করিয়া) বল “চূপ কর” তবে তুমিও নিয়ম লঙ্ঘনকারী সাব্যস্ত হইবে (এবং এই কারণে তোমারও জুমার ছওয়াব কম হইয়া যাইবে)।

ব্যাখ্যাঃ—উল্লিখিত বিষয়টি বড়ই যুক্তিপূর্ণ ব্যবস্থা, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়—প্রথমে যে ব্যক্তি বলে তাহাকে বাধাদানের জন্ত অধিক হট্টগোলের সৃষ্টি করা হয়; ইহা বোকানী ছাড়া আর কি হইতে পারে।

জুমার দিনের একটি মূল্যবান সময় আছে

৫২৩। হাদীছ :—যাবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছালালাহু আলাইহে অসাল্লাম জুমার দিনের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—এই দিনের মধ্যে এমন একটি মূল্যবান সময় আছে যে, সেই সময়টুকুর মধ্যে নামাযরত অবস্থায় যে কোন দোয়া করা হউক আল্লাহ তায়ালা উহা কবুল করিয়া থাকেন। অবশ্য ঐ সময়টুকু খুবই অল্প—অধিক প্রশস্ত নয়।

ব্যাখ্যা :—ঐ সময়টুকু জুমার দিনেই অনির্দিষ্টরূপে রহিয়াছে, যেমন লায়লাতুল-কদর রমজান মাসে অনির্দিষ্টরূপে বিद्यমান আছে। যে ব্যক্তি নিশ্চিতরূপে ঐ সময়টুকুর অভিলাষী তাহাকে পূর্ণ দিনটিই তৎপরতার সহিত কাটাইতে হইবে। অবশ্য ইমাম খোৎবার জন্ত অগ্রসর হওয়ার কাল হইতে সূর্যাস্ত সময়ের মধ্যে ঐ মূল্যবান সময়টি পাইবার সম্ভাবনা অধিক।

জুমার নামাযের পূর্বে ও পরে সুন্নত পড়া+

৫২৪। হাদীছ :—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—রসুলুল্লাহ ছালালাহু আলাইহে অসাল্লাম জোহরের পূর্বে দুই রাকাত, পরে দুই রাকাত, মাগরেবের পরে স্বীয় গৃহে দুই রাকাত, এশার পরে দুই রাকাত নামায পড়িতেন এবং জুমার নামাযের পর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া দুই রাকাত নামায পড়িতেন।

মহআলাহ :—জুমার ফরজের পূর্বে চার রাকাত এবং পরে চার রাকাত এক সালামে পড়া ছন্নতে মোয়াক্কাদাহ, যেরূপ জোহরের ফরজের পূর্বে চার রাকাত। (দোয়াক্বল মোখঃ)

জুমার নামায হইতে অবসর হইয়া আমোদ-আনন্দে বিচরণ

জুমার দিন জুমার নামাযের প্রতি তৎপরতায় জন্ত তৎপরতা ও নিপুতা যথাসাধ্য কম করিতে হয়। অবশ্য জুমার নামায হইতে অবসর হইয়া অনুমোদিত নিপুতার অনুমতি রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

“যখন নামায সমাপ্ত হইয়া যায় তখন তোমরা ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিতে পার।” নিম্নে এই শ্রেণীরই একটি হাদীছ উল্লেখ হইতেছে।

৫২৫। হাদীছ :—ছাহাবী সাহল (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধা মহিলা ছিলেন, তাঁহার ক্ষেতের মধ্যে পানি প্রবাহিত হইবার নালীসমূহের কিনারায় তিনি “চুকান্দার” নামক সজ্জী বপন করিতেন। জুমার দিন তিনি ঐ চুকান্দারের মূলগুলি উঠাইয়া আনিতেন এবং উহার সঙ্গে আটা মিশ্রিত করিয়া এক প্রকার খাদ্যবস্তু তৈয়ার করিতেন। আমরা জুমার নামাযান্তে তাঁহার বাড়ী উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সালাম করিতাম, তিনি আমাদেরকে উহা খাইতে দিতেন। আমরা আনন্দের সহিত উহা চাটিয়া চাটিয়া খাইতাম। আমরা তাঁহার ঐ খাদ্যের আগ্রহে জুমার দিনের প্রতীক্ষায় থাকিতাম।

+ জুমার নামাযের পূর্বে সুন্নত পড়া বোখারী (রাঃ) উল্লেখ করিলেন, দলীল উল্লেখ করেন নাই। ফত্বুল-মোলহেম দ্বিতীয় খণ্ড ৩৯৯ পৃষ্ঠায় ইহার দলীল বর্ণিত আছে।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

- জুমার দিন বিশেষভাবে মেছওয়াক করিবে। (১১২ পৃ: ৫০০)
- মসজিদে এক জোড়ের দুইজন একত্রে বসা থাকিলে তাহাদের মধ্যে তৃতীয় পর ব্যক্তির বসা উচিত নহে। (১২৪ পৃ: ৫০২ হাদীছ)
- খুৎবা দানকালে মুছল্লীদের লক্ষ্য ও ধ্যান ইমামের (খুৎবার) প্রতি হওয়া চাই। (১২৫ পৃ:)
- জুমার নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য তিনজনের জমাত শর্ত; ইমামের সঙ্গে তিনজন পুরুষ মোস্তাদী হইলে জুমার নামায হইবে অথবা জুমার নামায হইবে না, সে ক্ষেত্রে বাধ্য হইয়া জোহরের নামায পড়িতে হইবে। কোন ক্ষেত্রে জুমার নামায আরম্ভ করার পর পেছন হইতে মোস্তাদীগণ নামায ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে—যদি তিনজন পুরুষ বাকি থাকিয়া থাকে তবে ইমামসহ সকলেরই জুমা শুদ্ধ হইয়া যাইবে (১২৮ পৃ:)

আর যদি তিনজনও বাকি না থাকে এবং তাহারা প্রথম রাকাতের সেজদার পূর্বেই চলিয়া যায় তবে ইমামের জুমাও ফাছেদ হইয়া যাইবে, পুনঃ নিয়াত বাঁধিয়া জোহর পড়িতে হইবে। আর যদি সেজদার পরে যায় তবে ইমাম জুমারূপেই স্বীয় নামায পূরা করিবে। (শামী, ২-৭৬১)

শত্রুর অক্রমণ সম্ভাবনাবস্থায় জমাতে নামায পড়ার নিয়ম

জমাত ব্যতিরেকে একাকী ছিফ-বিচ্ছিন্নরূপে নামায পড়াকে শরীয়ত মোটেই পছন্দ করে না, একস্থানে উপস্থিত সমস্ত মোসলমান এক জমাতে নামায পড়া আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন শত্রুর মোকাবেলায় একতা ও শৃঙ্খলা শত্রুপক্ষের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, কিন্তু এদিকে সকলে একত্রে নামাযরত হইলে শত্রুপক্ষের সুযোগ পাওয়ার আশঙ্কা ও ভয় আছে, তাই শরীয়ত এমন ক্ষেত্রে জমাত কয়েমের বিশেষ বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনেও সুদীর্ঘ বয়ান বিদ্যমান রহিয়াছে। (৫ পা: ১২ ক: দ্রষ্টব্য)

এতদৃষ্টে উপলব্ধি করা যায় যে, ইসলাম ধর্ম কিরূপ পূর্ণাঙ্গ, স্বয়ং-সম্পূর্ণ, ব্যাপক ও জীবন্ত ধর্ম—যাহার মধ্যে নিছক ব্যক্তিগত জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং গৃহকর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রেও বিধি-ব্যবস্থা পর্য্যন্ত পরিষ্কাররূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং আপদ-বিপদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি কাটাকাটির অবস্থায়ও জীবনকে কিরূপে দীন ও ধর্মের ভিতর দিয়া পরিচালিত করা যায় তাহার সহজ পথও প্রদর্শন করা হইয়াছে।

৫২৬। হাদীছ :—আবুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, নজদ এলাকার কোনও জেহাদে আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আমরা শত্রুপক্ষের নিকটবর্তী অবস্থায় নামাযের সময় উপস্থিত হইল, রসুলুল্লাহ (স:) ইমাম হইলেন এবং আমরা দুই দলে বিভক্ত হইলাম। এক দল শত্রুর প্রতি দৃষ্টি রাখার কাজে নিযুক্ত রহিল, আর একদল রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে নামায আরম্ভ করিল। এইরূপে এক রাকাত নামায হইলে পর নামাযরত দল শত্রুর প্রতি চলিয়া গেল এবং শত্রুর প্রতি নিযুক্ত দল রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে দ্বিতীয় রাকাতে

শরীক হইল। যেহেতু (ছত্র হিসাবে বা বস্তুতঃই ছই রাকাতওয়ালা নামায ছিল, তাই) দ্বিতীয় দলকে লইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) দ্বিতীয় রাকাত পড়ার পর রসুলুল্লাহ (দঃ) নামায পূর্ণ হইয়া গেল; তিনি সালাম ফিরিলেন। কিন্তু মোক্তাদীগণের প্রত্যেক দলেরই এক এক রাকাত নামায হইল এবং এক এক রাকাত বাকী রহিল; ঐ এক রাকাতকে (প্রথম দল লাহেকের স্থায়, দ্বিতীয় দল মসবুকের স্থায়) তাহারা নিজে নিজে পড়িল।

৫২৭। হাদীছ :- আবুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, শত্রু দল যদি এত অধিক হয় যে, তাহাদের মোকাবিলায় মোসলমান সৈন্যদল বিভক্ত করিলে আত্মরক্ষায় যথেষ্ট হইবে না, তবে প্রত্যেকে মাটিতে দাঁড়ানো বা বাহনে আরোহিত নিজ নিজ অবস্থায়ই একা একা নামায আদায় করিবে। (এমনকি কেবলামুখী হওয়া সম্ভব না হইলে যেই দিকে সম্ভব সেই দিকেই এবং রুকু সেজদা সম্ভব না হইলে শুধু মাথার ইশারায় রুকু সেজদার গাজ করিয়া নামায আদায় করিবে।
(ফতহুল-বারী, ২-৩৪৬)

৫২৮। হাদীছ :- ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা কোনও এক জেহাদের ঘটনায় আমরা নামায পড়িলাম। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইমাম হইলেন, আমরা সকলেই একত্রে তাহার পেছনে একত্রে দাঁড়াইলাম। যখন তিনি রুকুতে গেলেন তখন প্রথম কাতারের লোকগণ তাহার সঙ্গে রুকু করিল, সেজদার সময় সেজদা করিল, কিন্তু পেছনের কাতারের লোকগণ সেই রুকু-সেজদা না করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং প্রথম কাতারের লোকগণ সেজদা হইতে উঠিবার পর পেছনের কাতারের লোকগণ রুকু-সেজদা করিল। (এইরূপে সকলেরই এক রাকাত হইল,) দ্বিতীয় রাকাতের সময় (প্রথম কাতারের লোকগণ পেছনে এবং) পেছনের কাতারের লোকগণ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং পূর্বের ন্যায়ই দ্বিতীয় রাকাত পড়া হইল। (এইরূপে সকলেরই সমরূপে ছই রাকাত পূরা হইলে পর একত্রে সালাম করিল।) সকলেই এক জমাতে শরীক ছিল, কিন্তু একে অন্যকে পাহারাও দিতেছিল।

ব্যাখ্যা :- শত্রুর ভয় ও আশঙ্কাবস্থায় নামায এক জমাতে পড়ার বিভিন্ন নিয়ম বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। এই বিভিন্নতা এই জন্য যে, শত্রুপক্ষের অবস্থান বিভিন্ন রূপের ছিল এবং শত্রুপক্ষের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতেই জমাতের নিয়ম ধার্য করা হইত। যেমন ৫২৬নং হাদীছের ঘটনায় শত্রুপক্ষ মোসলমানদের সম্মুখদিকে তথা কেবলার দিকে ছিল না, বরং অশ্রুদিকে ছিল, তাহাদের মোকাবিলায় দাঁড়াইয়া থাকার জন্য যে দল নিযুক্ত হইল তাহারা ঐ অবস্থায় নামায আরম্ভ করিতে পারিল না, কারণ তাহারা কেবলার দিকে নয়। ৫২৮নং হাদীছের ঘটনায় শত্রুপক্ষ কেবলার দিকে ছিল, তাই সকলে একত্রেই নামায আরম্ভ করিল। রুকু সেজদার সময় আশঙ্কা; তাই পেছনের কাতার পাহারায় রহিল। এইভাবে যখন যেইরূপে জমাত করা সম্ভব হইয়াছে, তখন সেই নিয়মেই জমাতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ইহা অতি স্পষ্ট যে, এসব নিয়ম নামাযের সাধারণ নিয়ম হইতে একেবারেই স্বতন্ত্র ও পৃথক, কিন্তু যেহেতু এই স্বাতন্ত্র্য প্রবর্তনের জন্ত ইহার বিস্তারিত বিবরণ দান করতঃ কোরআন শরীফের প্রায় একটি রুকু নাজেলে হইয়াছে এবং বহু হাদীছে ইহা বর্ণিত ; তাই এই স্বাতন্ত্র্যকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করা হইয়াছে। এই নিয়ম প্রবর্তন করিয়া এক জমাতকে মথাসম্ভব যক্ষা করা হইয়াছে। কারণ, ইহা আল্লামার নিকট অতি পছন্দনীয় এবং মোসলেম সমাজের জন্ত আবশ্যকীয় বস্তু, তছপরি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবিলায় একতা প্রদর্শন বিশেষ ফলদায়ক।

যুদ্ধ চলাকালীন বা বিজয় সংগ্রাম অবস্থায় নামাযের নিয়ম

ইমাম আবুযাযী (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি বিজয়ের সূচনা ও সম্ভাবনা সন্নিগটে দেখা যায় এবং এমতাবস্থায় কোন মতেই রুকু-সেজদা করিয়া জমাতে নামায পড়া সম্ভব না হয় তবে প্রত্যেকেই নামায শুধু মাথার দ্বারা ইশারায় পড়িবে, তাহাও না হইলে নামায কাজা করিবে।

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (খলীফা ওমরের আমলে) আবু মুছা আশয়ারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অধীনে 'সুস্তর' শহরের দুর্গ আক্রমণ করা হইল ; আমি সেই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম।

ভোর বেলায় আক্রমণ চলিল, যুদ্ধের একরূপ তীব্রতা ছিল যে, আমরা কোন মতেই ফজরের নামায পড়িতে সক্ষম হইলাম না। অধিক বেলা হইলে আমরা ফজরের নামায পড়িবার সুযোগ পাইলাম এবং অধিনায়ক আবু মুছা (রাঃ) ছাহাবীর সহিত নামায পড়িলাম। শহরটি আমাদের জয় হইল। (জেহাদের সঙ্কটময় অবস্থায় যে নামায পড়িয়াছিলাম যদিও উহা কাজা নামায ছিল তবুও উহাতে এতই অমুরজি লাভ করিয়াছিলাম যে,) ঐ নামাযের বিনিময়ে সমগ্র জগতের রাজত্ব ও ধন-সম্পদ আমাকে সম্ভষ্ট করিতে পারিবে না।

৫২৯। হাদীছ :-জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খন্দকের জেহাদে একদা ওমর (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া জুধাবস্থায় কাকেরদিগকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ ! সূর্য্য অন্তমিত প্রায়, কিন্তু অস্ত্র আছরের নামায পড়িতে পারি নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমিও ত এখন পর্য্যন্ত নামায পড়িতে পারি নাই। এই বলিয়া হযরত (দঃ) একটি সমতল ভূমিতে গেলেন এবং অঙ্কু করিয়া সূর্য্যাস্তের পরেই আছরের নামায পড়িলেন তারপর ঐ ওয়াক্তের মগরেবের নামায পড়িলেন।

মুহআলাহ :-জেহাদের সময় শত্রুকে ধাওয়া করা বা শত্রু কতৃক তাড়িত হওয়ারকালে যদি নামাযের সন্ধীর্ণ সময় উপস্থিত হয় তবে আরোহিত অবস্থায় ধাবমান রূপেই মাথার ইশারায় নামায আদায় করিবে (১২৯ পৃঃ)। আর যদি পদব্রজে ছুটিতে থাকে তবে কোন কোন ইমামের মতে সেই দৌড়ের অবস্থায়ই মাথার ইশারায় সহিত নামায আদায় করিবে ; হানফী মজহাবের মত এই যে, এই অবস্থায় নামায কাজা করিবে।

মুহআলাহ :-ভোর বেলা শত্রুর শহর বা দুর্গের উপর আক্রমণ করার ইচ্ছা হইলে সুযোগ প্রাপ্তে ফজরের আউয়াল ওয়াক্তে অন্ধকারেই ফজরের নামায পড়িয়া নিবে। (১২৯ পৃঃ)

ঈদের দিন ও উহার নামায

ঈদের দিন আমোদ-প্রমোদ করা

৫৩০। হাদীছ :- আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোরবানী বা রোযার এক ঈদের দিন আবু বকর (রাঃ) আমার নিকট আমার গৃহে আসিলেন।

وعندي جاريتان من جواري الانصار تغنيان بما تقاولت انصار يوم
بعث قالت وليستا بمغنياتين وتد فغان ونضربان (১৩০ ও ৫০০)

ঐ সময় আমার নিকটে দুইটি মদীনাবাসী বালিকা সেই সব গল্প গাহিতে ছিল যেই সব গল্প মদীনাবাসীরা তাহাদের ইসলাম-পূর্ব ঐতিহাসিক বোয়াছ-যুদ্ধে উভয় পক্ষ নিজ নিজ গর্ব-রচনায় গাঁথিয়া ছিল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, বালিকাঘর কোন গায়িকা ছিল না। বালিকাঘর দক্ষ বা ভুগিও বাজাইতেছিল, লাফালাফিও করিতেছিল। নবী (দঃ) তখন বিছানায় অন্য দিকে মুখ ফিরিয়া চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া ছিলেন। আবু বকর (রাঃ) আমাকে এবং বালিকাঘরকে ধমকাইলেন এবং বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গৃহে শয়তানের বাণী? তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) চাদর হইতে মুখ বাহির করিয়া আবু বকরের প্রতি তাকাইয়া বলিলেন, তাহাদিগকে ছাড়, তাহাদিগকে ছাড়; প্রত্যেক জাতিরই খুশীর দিন আছে। আজিকার দিন আমাদের খুশীর দিন। অতঃপর হযরত (দঃ) এই দিক হইতে লক্ষ্য ফিরাইয়া নিলে আমি বালিকাঘরকে টিপুনি দিয়া চলিয়া যাইতে বলিলাম; তাহারা চলিয়া গেল।

আরও একটি ঘটনা—একদা ঈদের দিন কতিপয় হাবশী লোক মসজিদে ঢাল-খঞ্জর চালনার খেলা করিতেছিল। আমি নিজে বলিলাম কিংবা হযরত (দঃ) আমাকে বলিলেন, খঞ্জর-খেলা দেখিতে চাও? আমি আরজ করিলাম, হাঁ। হযরত (দঃ) আমাকে আড়াল করিয়া রাখিতেছিলেন। আমার গওদেশ হযরতের গওের সহিত লাগাইয়া আমি হাবশীদের অস্ত্র চালনা দেখিতেছিলাম। ওমর (রাঃ) তাহাদিগকে ধমকাইলেন। হযরত (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, তাহাদিগকে ছাড়; আর ঐ খেলোয়াড় হাবশীদেরকে বলিলেন, ভয় নাই—তোমাদের কাজ করিয়া চল।

আমি নিজেই অবসাদ অনুভব করিলে হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, মন ভরিয়াছে কি? আমি বলিলাম, হাঁ। হযরত (দঃ) বলিলেন, তবে চলিয়া যাও।

● ঈদের দিন আমোদ-প্রমোদের দিন; মোসলমানদের আমোদ-প্রমোদ কি আকারের হইবে তাহাই হাদীছের ঘটনাদ্বয়ে দেখান হইয়াছে; একটি কচি-কাঁচাদের, অপরটি বড়দের।

প্রথম ঘটনায় বালিকাদ্বয় সুরের সহিত গর্ব-গাঁথার পদ্ম বা কবিতা গাহিতেছিল; আবু বকর (রাঃ) ভাবিলেন, সুরের সহিত যাহাই গাওয়া হইবে তাহাই শয়তানের বাঁশি তথা শরীয়ত-নিষিদ্ধ, তাই তিনি বাধা দিলেন। বস্তুতঃ আরবীতে সুরকেই “গেনা” বলা হয় যাহার অর্থ সুরের সহিত আবৃত্তি করা; এই জুহাই সুন্দর সুরে কোরআন শরীফ তেলাওয়াতকেও আরবীতে “গেনা” বলা যায়। সুর বিভিন্ন প্রকারের, গানের সুর, তারানার সুর কাব্যের সুর, কোরআন তেলাওয়াতের সুর। এর মধ্যে গানের সুর হইল শয়তানের বাঁশি তথা শরীয়ত নিষিদ্ধ। উক্ত ঘটনায় বালিকাদ্বয়ের সুরে গান ছিল না, বরং যুদ্ধের তারানা বা পদ্ম ও কবিতা ছিল যাহার স্পষ্ট উল্লেখ হাদীছে রহিয়াছে। এবং বালিকাদ্বয় সুর-শিল্পীও ছিল না বলিয়া আরেশা (রাঃ) নিজেই স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন, তাই ঈদের আমোদ ক্ষেত্রে বালিকাদ্বয়ের কার্যের প্রতি হযরত (দঃ) সমর্থন জানাইয়াছেন। এইত হইল সুর ও গাওয়া সম্পর্কে।

উক্ত ঘটনার দ্বিতীয় জিনিষটি ছিল “تَدْفَانٌ” বালিকাদ্বয় দফ্ বাজাইতে ছিল। “দফ্” মাটি, কাঠ ইত্যাদির খোলের এদিকে চামড়া অপর দিক খোলা—যাহাকে বাংলায় ডুগি বা বাঁয়া বলে; বাঁ হাতে ধরিয়া ডান হাতের আঙ্গুল পিটাইয়া উহা বাজান হয়। আনন্দ উপলক্ষে অল্প বোন বাতের সঙ্গে মিলাইয়া নয়; শুধু দফ্ বা ডুগি বাজান শরীয়তে জায়েয রহিয়াছে।

চলতি যুগের এলমহীন জ্ঞানবাগীশরা বলিতে চান, রসুলুল্লাহ যুগ ও দেশ তথা অনুরূপ যুগ ও দেশে এই এক শ্রেণীর বাতগল্পই ছিল, তাই এই শ্রেণীর বাতগল্প শরীয়তের অনুমোদন লাভ করিয়াছে। অর্থাৎ বর্তমান আবিষ্কারের যুগের বাতগল্পসমূহ রসুলের যুগে থাকিলে এইগুলিও তাহার অনুমোদন লাভ করিত—ইহা হইল জ্ঞানবাগীশদের কেয়াছ। এই শ্রেণীর লোকদের জানা উচিত—টোল, সারিন্দা, বেহালা, দোতার, ছেতার এবং নানা রকমের বাঁশি তখনও প্রচলিত ছিল। নতুবা তৎকালীন আরবী অভিধানে এই সব নাম বিদ্যমান থাকিত না। হাদীছেও বিভিন্ন নামের বাতগল্পের উল্লেখ এবং নিষেধাজ্ঞা ও সতর্কবাণী রহিয়াছে। যথা—

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ

“রসুলুল্লাহ (দঃ) মদ, জুয়া, এবং টোল বা সারিন্দা জাতীয় বাতগল্প নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।” আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) উভয় ছাহাবী হইতে উক্ত বিষয়ের হাদীছ আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে।

টোল এবং সারিন্দা জাতীয় বাতগল্প উভয় অর্থেই আরবী ভাষায় “কুবা—কুব” শব্দ ব্যবহৃত হয় (মেরুকাৎ দ্রষ্টব্য)। আর এক হাদীছে আছে—

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي رَبِّي -عَزَّوَجَلَّ- بِمَنْعِ
الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيرِ

“নবী (দ:) বলিয়াছেন, আমার পরওয়ারদেগার আমাকে আদেশ করিয়াছেন—সকল প্রকার বাত্বস্ত্রের এবং সকল প্রকার বাঁশীর উচ্ছেদ করিতে।” (মেশকাত—৩১৮)

উক্ত হাদীছসমূহ দ্বারা ঢোল, সারিন্দা ও বাঁশী স্পষ্টরূপেই নিষিদ্ধ হইল।

এতদ্বিতর “معازف—মার্যা'যেফ” বহু বচন শব্দ দ্বারা সকল প্রকার বাত্বস্ত্রের উচ্ছেদের কথাই বলা হইয়াছে। যেরূপ দ্বিতীয় হাদীছে উল্লেখ আছে। আরও এক হাদীছে কেয়ামতের আলামত রূপে বিভিন্ন অপরাধ উল্লেখ বলা হইয়াছে—

(মেশকাত—৪৭০) **ظهور القينات والمعازف وشرب الخمر**

“গায়িকা এবং বিভিন্ন প্রকার বাত্বস্ত্রের আবির্ভাব হইবে, মত্ত পানের চর্চা হইবে।” ফেকাহশাজ্জে ত প্রত্যেক শ্রেণীর বাত্বস্ত্রের নাম উল্লেখ করতঃ নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে।

উক্ত ঘটনায় তৃতীয় একটি কার্য ছিল **تضربان** যাহার অনুবাদ করা হইয়াছে “লাফা-লাফি” করিতেছিল; এই শব্দের মধ্যে নাচ-নৃত্যের অর্থ মোটেই নাই। “নাচ বা নৃত্য” অর্থে আরবী ভাষায় অতি প্রসিদ্ধ বিশেষ শব্দ রহিয়াছে, **رقص**; এস্থলে **ترقصان** “তাহারা নাচ ও নৃত্য করিতেছিল” বলা হয় নাই। **ضرب** শব্দের অর্থ পদক্ষেপণ, অতএব **ترقصان** না বলিয়া **تضربان** বলার তাৎপর্য্য ইহাই যে, সেস্থলে নাচ-নৃত্য ছিল না; ছিল শুধু এলোমেলো পদক্ষেপণ তথা বালাশূলভ লাফালাফি।

যাহারা গান-বাত্ব, নাচ-নৃত্য করিতে এবং করাইতে অভিলাসী, তাহারা লাগামহীন স্বাধীনতার যুগে তাহা করিবেন, কিন্তু এই সব আবর্জনার মধ্যে হাদীছকে টানিয়া আনিয়া হাদীছকে অপবিত্র করতঃ ঈমান হইতে বঞ্চিত হইবেন কেন? বিষ খাইতে ইচ্ছা হয় খাইবেন, কিন্তু ডাক্তারের নামে বিষ খাইবেন কেন? ডাক্তারের প্রিসক্রিপ্‌শনে যে, বিষ ছিল না; বরং যাহার দ্বারা বিভ্রান্তি হইয়াছে উহা ছিল শুধু (Colour) রং—তাহা প্রতিপন্ন করতঃ যাহারা মোসলমান থাকিতে চান তাহাদের ঈমান রক্ষার উদ্দেশ্যেই বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হইল।

দ্বিতীয় ঘটনায় হাবশীরা অস্ত্র চালনার খেলা করিতেছিল, ওমর (রা:) উহাকে শুধু খেলাই গণ্য করিয়া মসজিদে উহার অনুষ্ঠানে বাধা দিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত খেলায় জেহাদের প্রশিক্ষণ ছিল, তাই উহা এবাদতও ছিল। মসজিদের মূল উদ্দেশ্য নামাযের ব্যাঘাত না ঘটাইয়া সব রকম এবাদতই তথায় করা যায়, তাই উহা হযরতের সমর্থন লাভ করিয়াছিল।

ইজুল-ফিৎরের দিন ঈদগাহে যাইবার পূর্বে কিছু খাওয়া উচিত

৫৩১। হাদীছ :—আনাছ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রশূল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইজুল-ফেৎরের দিন অন্ততঃ কয়েকটি খুরমা না খাইয়া সকালে বহির হইতেন না এবং তিনি বে-জোড় সংখ্যায় খুরমা খাইতেন।

মহাআলাহ :—ইমাম বোখারী (রা:) পরবর্তী পরিচ্ছেদে ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, কোরবানীর ঈদের দিনও নামাযের পূর্বে সকাল বেলা খাওয়া জায়েয আছে।

ঈদগাহের ময়দানে মিশরের ব্যবস্থা আবশ্যক নহে

৫৩২। হাদীছ :—আবু সাঈদ খুদরী (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছালাআলাহ আলাইহে অসাল্লাম কোরবানী বা রোযার ঈদের দিন ঈদগাহে যাইয়া সর্বপ্রথম নামায পড়াইতেন। নামাযান্তে সব লোক নিজ নিজ স্থানেই বসিয়া থাকিত। রসুলুল্লাহ (দ:) তাহাদের প্রতি দণ্ডায়মান হইয়া ওয়াজ-নছীহত ও শরীয়তের আদেশ-নিষেধ বয়ান করিতেন। তারপর কোথাও কোন সৈয়দুল প্রেরণের প্রয়োজন হইলে উহার ব্যবস্থা করিতেন বা কোন আদেশ জানাইবার দরকার হইলে জানাইতেন, তারপর বাড়ী চলিয়া যাইতেন। হয়রত রসুলুল্লাহ ছালাআলাহ আলাইহে অসাল্লামের পর এই ব্যবস্থাই—প্রচলিত থাকে। কোন এক ঈদের দিন আমি মারওয়ানের সঙ্গে ময়দানে গেলাম, মারওয়ান তখন মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন। আমরা ময়দানে আসিয়া দেখি, কাছীর-ইবনে ছলু নামক এক ব্যক্তি একটি মিশর তৈয়ার করিয়া উপস্থিত রাখিয়াছে এবং মারওয়ান নামায পড়িবার পূর্বেই উহার উপর আরোহণের জন্ত উত্তত হইতেছে। আমি তাহার কাপড় টানিয়া ধরিলাম, যেন সে ক্ষান্ত হয়, কিন্তু সে ক্ষান্ত না হইয়া ঐ মিশরের উপর আরোহণ করিল (এবং নামাযের পূর্বেই খোৎবা প্রদান করিল)। তখন আমি তাহাকে বলিলাম, তোমরা মুম্বত ওদীকা পরিবর্তন করিয়া দিয়াছ। সে উত্তর করিল, হে আবু সাঈদ! তোমরা যাহা শিক্ষা করিয়া রাখিয়াছ এখন তাহা চলিবে না। তখন আমি বাললাম, খোদার কসম—আমরা যাহা শিক্ষা করিয়াছি—তাহাই উত্তম, উহার তুলনায় যাহা আমরা শিক্ষা করি নাই। তারপর মারওয়ান বলিল, জনসাধারণ নামাযের পরে বসিয়া থাকিয়া আমাদের খোৎবা শোনে না, তাই নামাযের পূর্বেই খোৎবা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছি।

মহাআলাহ :—ঈদগাহে মিশর ব্যবহার জায়েয, তথায় মিশর তৈরী করা উত্তম।

ঈদের খোৎবা নামাযের পরে হইবে এবং ঈদের নামাযে
আজান বা একামত বলা হইবে না

ইবনে আব্বাস (রা:) ও জাবের (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন সময়ই কোন ঈদের নামাযের জন্ত আজান দেওয়া হইত না।

৫৩৩। হাদীছ :—জাবের (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালাআলাহ আলাইহে অসাল্লাম ঈদুল-ফংরের দিন ঈদগাহে যাইয়া প্রথমে নামায পড়িয়াছেন—খোৎবার পূর্বেই।

৫৩৪। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছালাআলাহ আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এবং আবু বকর (রা:), ওমর (রা:) ও ওসমান রাজ্জিয়াল্লাহ আনহুর সঙ্গে ঈদের নামায পড়িয়াছি। তাহারা প্রত্যেকেই ঈদের নামায খোৎবার পূর্বে পড়িতেন।

৫৩৫। হাদীছ :—আবুহুলাহ ইবনে ওমর (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দ:) এবং আবু বকর (রা:) ও ওমর (রা:) সকলেই ঈদের নামায খোৎবার পূর্বে পড়িতেন।

৫৩৬। হাদীছ :— ইবনে আব্বাস (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, ঈদুল-ফেৎরের দিন রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দুই রাকাত নামায পড়িলেন। ঐ দুই রাকাতের পূর্বে বা পরে অল্প কোন (সুন্নত, নফল) নামায পড়েন নাই। তারপর রসুলুল্লাহ (দ:) বেলাল (রা:)কে সঙ্গে লইয়া ঐ স্থানে আসিলেন যে স্থানে নারীগণ উপবিষ্টা ছিলেন। তিনি তাহাদিগকে ছদকা করার আহ্বান জানাইলেন, তখন নারীগণ নিজ নিজ কানের ও নাকের অলঙ্কারাদি ছদকা স্বরূপে রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট দিতে আরম্ভ করিল।

ঈদের দিন অস্ত্র বহন

ঈদের দিন ঈদগাহে বা পথে ঘাটে যেখান অধিক মানুষের সমাগম বা গমনাগমন হইবে এইরূপ স্থানে অস্ত্র-বহন নিষিদ্ধ; যাহাতে আঘাত লাগার ঘটনা না ঘটে। হাছান বছরী (র:) বলিয়াছেন, ঈদের দিন অস্ত্র-বহন নিষিদ্ধ, যদি মোসলমানদের উপর শত্রুর আক্রমণের অশঙ্কা না থাকে।

৫৩৭। হাদীছ :—সাদীদ ইবনে জোবায়ের (র:) বর্ণনা করিয়াছেন, হজ্জের সময় মিনার মধ্যে আমি আবুহুলাহ ইবনে ওমর (রা:) ছাহাবীর সঙ্গে ছিলাম; হঠাৎ এক ব্যক্তির হাতের বর্শার লোহ-ফলক তাঁহার পায়ে বিদ্ধ হইল। আমি উহা তাঁহার পা হইতে টানিয়া বাহির করিলাম। শাসনর্তকা হাজ্জাজ স.বাদ পাইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন এবং বলিলেন, কে এই কাজ করিল জানিতে পারিলে শাস্তি দিতাম। ইবনে ওমর (রা:) বলিলেন, আপনিই আমাকে আঘাত দিয়াছেন। হাজ্জাজ বলিলেন, তাহা কিরূপে? তিনি বলিলেন? এই দিনে অস্ত্র-বহন করা হইত না, আপনি তাহা করিয়াছেন; (আপনাকে দেওয়া অস্ত্রও করিয়াছে।) হরম শরীফে অস্ত্র লইয়া প্রবেশ করা হইত না, আপনি তাহাও করিয়াছেন।

জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন এবাদত করার ফজিলত

ইবনে আব্বাস (রা:) বলিয়াছেন, **واذكروا الله في أيام معلومات** “কতিপয় সুপরিচিত দিনে বিশেষভাবে আল্লাহ তায়ালার জিকর ও এবাদত কর” এই আয়াতে জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনই উদ্দেশ্য।

আবুহুলাহ ইবনে ওমর (রা:) এবং আবু হোরায়ারা (রা:) উক্ত আয়াতের উপর আমল করনার্থে জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন সময় সময় বাজারে বাইরা তকবীর বলিতে থাকিতেন; জনগণও তাঁহার সঙ্গে তকবীর বলিয়া যাইত।

৫৩৮। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন, জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের এবাদত হইতে অধিক ফজিলতওয়ালা অল্প কোন

দিনের কোন এবাদতই হইতে পারে না। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন—জেহাদও নয় কি? রসুলুল্লাহ (স:) বলিলেন, না—জেহাদও নয়। অবশ্য কেবলমাত্র ঐ ব্যক্তির জেহাদ যে স্বীয় জ্ঞান-মাল ও সর্বস্ব লইয়া জেহাদের ময়দানে উপস্থিত হইয়াছে এবং তথা হইতে তাহার কিছুই ফেরত আসে নাই।

ঈদগাহে এক পথে যাওয়া অন্য পথে প্রত্যাবর্তন করা

৫৩৯। হাদীছ :—জাবের (রা:) বর্ণনা করিয়াছে, রসুলুল্লাহ ছালালাহু আলাইহে অসাল্লাম ঈদের দিন এক পথে যাইতেন এবং অন্য পথে প্রত্যাবর্তন করিতেন।

মহুআলাহ :—ঈদের দিন যথাসাধ্য ভাল পোষাক পড়া উত্তম (১০৩ পৃ: ৫০৩ হা:)।

মহুআলাহ :—ঈদের নামায শীঘ্র পড়া উত্তম। আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা:) এশরাক নামাযের সময়কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, এইরূপ সময়ে আমরা (নবী ছালালাহু আলাইহে অসাল্লামের আমলে) ঈদের নামায হইতে অবসর হইয়া যাইতাম।

মহুআলাহ :—জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ ফজর-নামায হইতে ১০, ১১, ১২ এবং ১৩ তারিখ আছর তথা সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত তকবীর বলিতে হয়।

পবিত্র কোরআনে আছে, **وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ** “আল্লাহ জিকর বিশেষভাবে কর কতিপয় নির্দিষ্ট দিনে।” ইবনে আব্বাস (রা:) বলিয়াছেন, উক্ত তারিখ-গুলিই এই কতিপয় নির্দিষ্ট দিনের উদ্দেশ্য।

এই তকবীরের একটি পর্যায় হইল ওয়াজেব; উক্ত পাঁচ দিন প্রত্যেক ফরজ নামাযের সংলগ্নে তকবীর বলিবে। অগ্রগণ্য ফতওয়া অনুসারে ইহা ছমাতের মুছল্লী, একা মুছল্লী, নারী-পুরুষ; এমনকি মুসাফির—সকলের উপরই ওয়াজেব (শামী, ১—৭৮৭)। আর এক পর্যায় হইল মোস্তাহাব; চলায়-ফেরায়, হাটে-বাজারে, রাস্তা-ঘাটে, শয়নে, উঠনে, বসনে, সকল নামাযের পরে তকবীর বলা। ● খলীফা ওমর (রা:) হজ্জের সময় মিনার মধ্যে উক্ত দিনসমূহ স্বীয় তাবুতে থাকিয়া তকবীর বলিতেন; নিকটবর্তী মসজিদের লোকেরা সেই তকবীরের শব্দ শুনিয়া তকবীর বলিত এবং সেই সঙ্গে বাজারের লোকেরাও তকবীর বলিয়া উঠিত; এইভাবে একত্রে সকলের তকবীরে সারা মিনা এলাকা গুঞ্জিত হইত। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) উক্ত দিনসমূহে প্রত্যেক নামাযের পর এবং বিছানায় থাকিয়া, তাবুতে বসিয়া, উঠ-বসায়, চলা-ফেরায়—সর্বাবস্থায় পূর্ণদিনগুলিতেই তকবীর বলিতেন। ● উম্মুল-মোমেনীন (রা:) তকবীর বলিতেন; অগ্রাঙ্গ মহিলারাও তকবীর বলিতেন। তকবীর যে কোন আকারে বলিলেই হয় তবে উত্তম এই—

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

মহুআলাহ :—ঈদের নামাযেও ইমামের সম্মুখে ছোতরার ব্যবস্থা রাখা চাই।

মহআলাহ :—নারীদের এমনকি ঋতু অবস্থার নারীরও ঈদগাহে উপস্থিত হওয়া—এই মহআলার পূর্ণ বিবরণ ২২২ নম্বর হাদীছের ব্যাখ্যায় দেওয়া হইয়াছে।

মহআলাহ :—বালকদের ঈদগাহে উপস্থিত হওয়া জায়েয ; প্রমাণে ইমাম বোখারী (র:) ৮১ নং হাদীছটি উল্লেখ করিয়াছেন। বালকদের ঈদগাহে যাওয়া বরকত লাভের জন্ত এবং ইসলামের গৌরব প্রকাশের জন্ত ; সুতরাং যে সব বালক নামায পড়ার উপযুক্ত নহে তাহারও বাইতে পারিবে, অবশ্য তাহাদের সঙ্গে একরূপ লোক থাকা বিশেষ প্রয়োজন যে তাহাদিগকে খেলা-ধুলা, হট্টগোল ইত্যাদি হইতে বিরত রাখিবে। (কতছলবারী ২—৩৩৭)

মহআলাহ :—ঈদগাহে মিশর থাকার প্রয়োজন নাই, আর দূর হইতে ঈদের নামাযের স্থান-পরিভিত্তিক্রমে ঈদগাহে কোন নিশান বা পতাকা উড্ডীন করা জায়েয। (১৩৩ পৃ: ৮১ হা:)

মহআলাহ :—মাহার ঈদের জমাত ছুটিয়া যায় ; কোথাও যাইয়া জমাতে शामिल হওয়ার সুযোগ না থাকে এবং যাহাদের প্রতি ঈদের নামাযের ছকুম নাই, যেমন—মেয়েলোক বা যে এলাকায় শুধু ২:৪ জন মুসলমান আছে ; এইরূপ লোকদের জন্ত ঈদের দিন সূর্য্য মধ্যোকাশে আসিবার পূর্বে দুই রাকাত (হানফী মজহাব মতে চার রাকাত শামী ১—৮৭৩) নফল নামায সাধারণ নিয়মে অর্থাৎ ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তকবীর ব্যতিরেকে পড়িয়া নেওয়া ভাল। মহিলাদের জন্ত এই নামায ঈদের জমাত শেষ হইলে পর পড়িতে হইবে (শামী, ১—৭৭৭)। ● সাধারণভাবে ঈদের জমাতের ব্যবস্থা না থাকার এলাকায় কিছু সংখ্যক মুসলমান এতদ্বিত্ত হইলে তাহারা ঈদের জমাত করিতে পারে। আনাছ (রা:) ছাহাবীর একটি নিরালা-নিবাস ছিল বছরা শহর হইতে ছয় মাইল দূরে “যাবিয়া” নামক স্থানে, সেখানে নগণ্য বসতি ছিল ; ঈদের জমাতের সাধারণ ব্যবস্থা ছিল না। (আনাছ (রা:) ছাহাবীর সম্মান-সম্মতির সংখ্যা ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ ; ১৬৬ পৃষ্ঠায় একটি হাদীছ দ্রষ্টব্য।) তিনি তাহার ছেলেদেরকে এবং পরিবারবর্গকে নিয়া তথায় ঈদের জমাত করিয়াছেন (১৩৪ পৃ:)।

মহআলাহ :—ঈদের নামাযের পূর্বে বা পরে নফল নামায পড়িবে না (১৩৫ পৃ: ৫৬৬ হা:)। ঈদের নামাযের পূর্বে ঈদগাহ বা অন্তত কোথাও নফল নামায পড়িবে না, আর পরে ঈদগাহে পড়িবে না ; অন্তত পড়াতে কোন দোষ নাই (শামী ১—৭৭৮)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—বোখারী (র:) ঈদের বিবরণে কোরবাণী সম্পর্কীয় কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। কোরবাণী সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ অন্তত আছে, তথায়ই উহার অনুবাদ হইবে।

বেতের-নামাযের বিবরণ

৫৪০। হাদীছ :—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ছালামাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট তাহাজ্জুদ নামাযের নিয়ম জিজ্ঞাসা করিল। হযরত (দঃ) বলিলেন, দুই দুই রাকাত করিয়া তাহাজ্জুদ নামায পড়িতে থাকিবে। যখন ছোবহে-ছাদেক নিকটবর্তী হইবে তখন এক রাকাত পড়িয়া লইবে যদ্বারা তাহার নামায বেতের হইয়া যাইবে।

ইবনে ওমরের খাদেম 'নাফে' বর্ণনা করিয়াছেন, ইবনে ওমর (রাঃ) বেতের নামাযের দুই রাকাত এবং ঐ এক রাকাতের মধ্যে সালাম ফিরাইতেন, এমনকি কথাবার্তাও বলিতেন।

ইবনে ওমর শাগের্দ্ ও বিশিষ্ট তাবেরী কাসেম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা যত লোকের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি (অর্থাৎ ছাহাবীগণ) তাঁহাদের মধ্যে অনেক লোককে দেখিয়াছি, (এক সঙ্গে) তিন রাকাত বেতের পড়িয়া থাকেন। এবং বেতের নামাযের উভয় নিয়মই শুদ্ধ; আমি আশা করি উহার কোনটিই দুষণীয় নহে।

৫৪১। হাদীছ :—আরেশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাজ্জুদের নামায (বেতের সহ) এগার রাকাত পড়িতেন। এক একটি সেজদা এত দীর্ঘ করিতেন যত সময়ে আমরা কোরআন শরীফের পঞ্চাশটি আয়াত তেলাওয়াত করিতে পারি এবং ফজরের সূরত দুই রাকাত পড়িতেন, তারপর ডান পার্শ্বে শায়িত থাকিতেন; যে রাত্জেন খবর দিলে ফজরের নামাযের জন্ত চলিয়া বাইতেন।

বেতের নামায পড়িবার নিয়ম

আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছালামাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে বিশেষরূপে আদেশ করিয়াছেন, বেতের নামায নিজার পূর্বেই পড়িবার জন্ত।

৫৪২। হাদীছ :—আরেশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছালামাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় ইচ্ছামুযায়ী রাত্রির বিভিন্ন অংশে (—প্রথম ভাগে, মধ্য ভাগে ও শেষ ভাগে) বেতের নামায পড়িয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সর্বশেষ আমল ছিল শেষ রাত্রে বেতের পড়া।

৫৪৩। হাদীছ :—ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছালামাহু আলাইহে অসাল্লাম আদেশ করিয়াছেন, রাত্রির সমস্ত নামাযের শেষে বেতের পড়িবার জন্ত।

মছআলাহ :—বেতের নামাযের পর নফল নামায পড়া নাজায়েয নহে, অতএব কেহ এশার নামাযের সহিত বেতের পড়িয়া তাহাজ্জুদের জন্ত জাগ্রত হইলে তাহাজ্জুদ পড়িবে ইহাতে মোটেই কোন দোষ নাই। অবশ্য যাহারা তাহাজ্জুদ নামাযে পাকা-পোক্ত অভ্যস্ত তাঁহাদের জন্ত উক্তম হইল এশার সহিত বেতের নামায না পড়িয়া তাহাজ্জুদের শেষে বেতের নামায পড়া—উল্লিখিত হাদীছের তাৎপর্য ইহাই (ফতহুল-বারী, ২—৩৮৫)। এতদ্ভিন্ন বেতের নামাযের পর দুই রাকাত নফল বাহা নবী (দঃ) বসিয়া পড়িয়াছেন;

মোসলেম শরীফের হাদীছে উহার উল্লেখ আছে—বেতের নামাযের পর বসিয়া বা দাঁড়াইয়া সেই ছই রাকাত পড়ায়ও দোষ নাই; ঐ রাকাতদ্বয় বেতের নামাযের আবুযজিকরূপেই গণ্য।

মানবাহনের উপর থাকিয়া বেতের নামায পড়া

ভ্রমণ অবস্থায় সোয়ারী পশুর পিঠের উপর বসিয়া থাকিয়া রুকু-সেজদার সুযোগ অভাবে শুধু মাথার ইশারার রুকু-সেজদা করিয়া, এমনকি কেবলা দিক ছাড়া নিজের সুযোগের দিকেই মুখ করিয়া সুন্নত-নফল নামায পড়া যায়। রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ও ছাহাবীগণ তাহাজ্জুদ নামায পড়া অতি দৃঢ়তার সহিত পালন করিয়া থাকিতেন। আরব দেশ যে দেশে অধিক উত্তাপ ও গরমের কারণে শুধু রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করা হয় সেই ভ্রমণ অবস্থায়ও তাহাজ্জুদ নামায ছাড়িতেন না; সব ক্ষেত্রে ভ্রমণ স্থগিত করাও কঠিন হইত—এমতাবস্থায় তাহাজ্জুদ নামায পশুর পিঠে বসিয়া উহার গতিমুখী মাথার ইশারায় আদায় করিতেন; তবুও তাহাজ্জুদ নামায নাগা করিতেন না। সব সুন্নত নফল নামাযের ক্ষেত্রেই এই ব্যবস্থা জায়েয রহিয়াছে। মোটর বাস, রেল, প্লেন, লঞ্চ জাহাজ ইত্যাদিতেও সুযোগের অভাব ক্ষেত্রে ঐ ব্যবস্থায় সুন্নত-নফল নামায পড়া যায়। যোগরা তাহাজ্জুদ, চাশত, এশরাক, আওয়ারীন নামাযের অভ্যস্ত স্বীয় আমল ভঙ্গ না করিয়া উক্ত সুযোগ ব্যবহার করিতে পারেন।

বেতের নামায সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (র:) বিভিন্ন হাদীছ দৃষ্টে বলিয়াছেন, প্রাথমিক যুগে উহা সুন্নত ছিল, পরে নবী (দ:) কর্তৃক উহা ওয়াজেব ঘোষিত হইয়াছে। উহা আর রুকু-সেজদা ও কেবলামুখী ছাড়া আদায় হইবে না। সেই প্রয়োজনে উহা আদায়ের জন্য যানবাহন হইতে অবতরণ করিতে হইবে, যেরূপ ফরজ নামায আদায়ের জন্য করিতে হয়। বেতের নামায ওয়াজেব হওয়ার পূর্বে উহাও অগ্ন্যস্ত সুন্নত নফলের স্থায় পশুর পিঠের উপর আদায় করা হইত। অবশ্য অগ্ন্যস্ত ইমাম এবং অনেক ছাহাবীগণ বেতের নামাযকে সুন্নতই সাব্যস্ত রাখিয়াছেন।

৫৪৪। হাদীছ :-সায়ীদ ইবনে ইয়াছার (র:) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুন্ন সহিত মক্কার পথে ভ্রমণে ছিলেন। প্রভাত নিকটবর্তী হইলে আমি যানবাহন হইতে অবতরণ করতঃ বেতের নামায পূর্ণভাবে আদায় করিয়া ক্ষত তাঁহার সহিত শামিল হইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথায় ছিলে? আমি বলিলাম, প্রভাত নিকটবর্তী; তাই অবতরণ করিয়া বেতের নামায পড়িয়াছি। তিনি বলিলেন, তুমি কি রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অনুসরণ যথেষ্ট মনে বর না? আমি বলিলাম, নিশ্চয়ই। তিনি বলিলেন, নবী (দ:) উটের উপর বেতের নামায পড়িয়াছেন।

৫৪৫। হাদীছ :-আবুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) বর্ণনা করিয়াছে, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভ্রমণ অবস্থায় সোয়ারীর উপরে যেদিকে উহার গতি হইত সেই দিকেই মাথার

ইশারায় তাহাজ্জুদ নামায পড়িতেন, কিন্তু ফরজ নামায ঐরূপে পড়িতেন না বেতের নামায সোয়ারীর উপর পড়িতেন।

দোয়া-কুহুং পড়ার স্থান

৫৪৬। হাদীছ :-আ'ছেম (রাঃ) বলেন, আমি আনাছ (রাঃ)কে দোয়া-কুহুংয়ের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, দোয়া-কুহুং পড়া পূর্বকাল হইতেই প্রচলিত। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, রুকু পূর্বে কি পরে? তিনি বলিলেন, রুকু পূর্বে। আমি বলিলাম, অমুক ব্যক্তি বলিয়া থাকে, রুকু পরে। তিনি বলিলেন, সে ভুল বলিয়া থাকে; অবশু রসুলুল্লাহ (দঃ) এক মাসকাল রুকু পরে দোয়া-কুহুং পড়িয়াছিলেন, (কিন্তু উহা বেতের নামাযের কুহুং ছিল না বরং অন্য বিষয়ের কুহুং ছিল, যাহা কারণ বিশেষে পড়া হইয়াছিল—) রসুলুল্লাহ (দঃ) সত্তরজন কোরআনের মুদক্ষ ছাহাবীকে কোন এক এলাকায় শিক্ষাদান কার্যের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। 'রেয়েল' ও 'জাকওয়ান' গোত্রদ্বয়ের একদল কাকের বিশ্বাসবাতকতা করিয়া পথিমধ্যে তাঁহাদিগকে শহীদ করিয়া ফেলিয়াছিল। সেই বিশ্বাসঘাতকদের কার্যে রসুলুল্লাহ (দঃ) অত্যধিক চঃখিত হইয়া তাহাদের প্রতি বদদোয়া (ও অভিশাপ) করতঃ এক মাসকাল মগরেব ও ফজরের নামাযে ঐ কুহুং পড়িয়াছিলেন। (ইহাকে “কুহুতে-নাযেলাহ্” বলা হয়।)

মহুআলাহ :-কাকেরদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার সংগ্রাম অবস্থায় বা কাকেরদের আক্রমণ আশঙ্কায় বিশ্বা কাকের দল কর্তৃক মোসলমানদের প্রতি অত্যাচার বা ক্ষয়ক্ষতি সাধনের ঘটনা উপলক্ষে মোসলমানদের ঈমান, সংহতি অটুট থাকার এবং আল্লাহ তায়ালায় সাহায্য ও বিজয় লাভ ইত্যাদির দোয়া করা, আর কাকেরদের প্রতি নিচ্ছিন্নতা, পদস্থলন, ধ্বংস আল্লাহ তায়ালায় আজাব ও পাকড়াও ইত্যাদির বদদোয়া করা—এই দোয়া ও বদদোয়াকে কুহুতে নাযেলাহ্ বলা হয়। “নাযেলাহ্” অর্থ বিপদ; মোসলমানদের বিপদে ইহা পড়া হয়; কাহারও মতে মগরেব ও এশায়ও পড়া যাইবে। এই কুহুং শেষ রাকাতের রুকু পরে পড়া হয়। পক্ষান্তরে বেতের নামাযের কুহুং সর্বাবস্থায় এবং রুকু পূর্বে পড়া হইবে।

৫৪৭। হাদীছ :-আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন কোন দিন (ফজর বা এশার নামাযের) শেষ রাকাতের রুকু হইতে মাথা উঠাইয়া—হামিআল্লাহ্-লেমান হামিদাহ্, আল্লাহুমা রাক্বানা ওয়া লাকাল হাম্দ বলার পর মকায় আবদ্ধ ও অত্যাচারিত হর্বল মোসলমানদের জন্য বিশেষভাবে কয়েক জনের নাম উল্লেখ করিয়া দোয়া করিতেন এবং অত্যাচারী কাকেরদের প্রতি বদদোয়া করিতেন। সেই দোয়া বদদোয়ার অনুবাদ এই—

“হে আল্লাহ! (কাকেরদের কবল হইতে) আইয়্যাশ ইবনে আবু রবিয়াকে পরিত্রাণ দাও, সালামাহ ইবনে হেশামকে পরিত্রাণ দাও, ওলীদ ইবনুল ওলীদকে পরিত্রাণ দাও

এবং দুর্বল মোসলমানদিগকে পরিজ্ঞান দাও! হে আল্লাহ! (এই সব মোসলমানদের প্রতি অত্যাচারী কোরায়েশদের মূল) মোজার গোত্রের উপর বিনাশ ও ধ্বংসের তীব্রতা বাড়াইয়া দাও। আয় আল্লাহ! ইউসুফ আলাইহেচ্ছালামের যুগে যেক্রপ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সাত বৎসর হইয়াছিল ঐরূপ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মোজার গোত্রের উপর চাপাইয়া দাও।

এতদ্বিত্ত কোন কোন সময় স্বজ্ঞর নামাযে কাফেরদের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করিয়াও হযরত (দঃ) বদদোয়া করিতেন। যখন এই আয়াত নাযেল হইল—
 لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ “নিদিষ্টরূপে কাহারও প্রতি বদদোয়া করা আপনার জন্য শোভা পায় না” তখন হযরত (দঃ) উহা ত্যাগ করিলেন।

মহুআলাহ :—দোয়া করিতে নিদিষ্ট নাম উল্লেখ করায় দোষ নাই, কিন্তু বদদোয়ার নিদিষ্ট নামের উল্লেখ করিবে না।

এস্তেছকা নামাযের বিবরণ

“এস্তেছকা” অর্থ বৃষ্টির জন্য দোয়া করা। সুতরাং এস্তেছকার মূল বিষয় হইল দোয়া ; উহা বিশেষ কোন অনুষ্ঠান বা বিশেষ নামাযের উপরই সীমাবদ্ধ নহে। বিশেষ অনুষ্ঠান এবং বিশেষ নামায ব্যতিরেকে শুধু বৃষ্টির জন্য কান্নাকাটা এবং দোয়া করিয়াও উহা সম্পন্ন করা যায়। এই বিষয়টি বোখারী (রঃ) কতিপয় পরিচ্ছেদে বুঝাইয়াছেন। “জুমার খোৎবার মধ্যে এস্তেছকা সম্পন্ন হইতে পারে”, “মিসরের উপর দাড়াইয়া এস্তেছকা হইতে পারে”, “বিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়া জুমার নামাযেই এস্তেছকা হইতে পারে”; এই সব পরিচ্ছেদের জন্য ইমাম বোখারী (রঃ) ৫২১নং হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন।

অবশ্য বৃষ্টির অভাবের দরুন বিশেষ অনুষ্ঠান এবং বিশেষ নামাযের সহিত এস্তেছকা তথা বৃষ্টির জন্য দোয়া করাও স্বয়ং হযরত নবী (দঃ) হইতে এবং ছাহাবীগণ হইতে বর্ণিত রহিয়াছে। এস্তেছকার অনুষ্ঠানের দৃশ্য সম্পর্কে আবুহুলাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে একটি হাদীছ বর্ণিত আছে—নবী (দঃ) এস্তেছকার নামাযের জন্য বাহির হইলেন; অতি দাধারণ ও নগণ্যের বেশে, বিনয়ী নম্র হইয়া, আল্লার ছজুরে কান্নাকাটি ও রোদনে ভাঙ্গাফাস্ত হৃদয়ে। এই অবস্থায় হযরত (দঃ) ময়দানে পৌঁছিলেন। (ফতহুলবারী, ২—৪০০)

এস্তেছকার নামাযের জন্য কোন দিন বা সময় নির্দ্ধারিত নাই; তবে যেই যেই সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ বা নফল নামায নিষিদ্ধ ঐ সময়গুলি অবশ্যই এড়াইতে হইবে।

৫৪৮। হাদীছ :—আবুহুলাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি দেখিয়াছি, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অল্লাম এস্তেছকার জন্য লোকদেরকে নিয়া ঈদগাহে গেলেন। হযরত (দঃ) লোকদের সম্মুখে থাকিয়া কেবলামুখী হইয়া দাড়াইলেন। বৃষ্টির জন্য দোয়া

করিতে থাকিলেন; এই সময় গায়ের চাদর উন্টাইলেন এবং উহার দিক বদলাইলেন। অতঃপর জমাতে দুই রাকাত নামায পড়িলেন; উহাতে কেবল সশব্দে পড়িলেন।

● এস্তেছকার নামাযে আজান একামত হইবে না। আবু ইসহাক (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, আবুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রা:) (কুফার গভর্ণর ছিলেন, তিনি) একবার এস্তেছকার জন্য ময়দানে গেলেন; তাঁহার সঙ্গে ছাহাবী বরা ইবনে আযেব (রা:) এবং য়ায়েদ ইবনে আরকাম (রা:)ও ছিলেন। ইমামরূপে আবুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রা:) পায়ের উপর দাঁড়াইলেন—মিস্বর ব্যতীত। এবং বৃষ্টির জন্য দোয়া করিলেন। তারপর সশব্দে কেবালের সহিত দুই রাকাত নামায পড়িলেন। আজান একামত দেওয়া হয় নাই। (১৩৯ পৃ:)

● বৃষ্টির অভাবে যেকোন বৃষ্টি হওয়ার জন্য দোয়া করা যায় তাহাকে এস্তেছকা বলে; তদ্রূপ অতি বৃষ্টিতে ক্ষয়ক্ষতি আরম্ভ হইলে তখন বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার জন্য এবং প্রয়োজন এলাকায় বৃষ্টি হওয়া ও অধিক বৃষ্টির এলাকায় না হওয়ার জন্যও দোয়া করা যায়।

(১৩৮ পৃষ্ঠা ৫২১ হাদীছ)

৫৪৯। হাদীছ :- আনাছ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফা ওমরের আমলে অনাবৃষ্টির দরুন জনগণ হুতিক্কে পতিত হইলে তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চাচা আব্বাস (রা:) দ্বারা দোয়া করাইতেন। ওমর (রা:) আল্লার দরবারে এইরূপ বলিতেন— হে আল্লাহ! আমরা আমাদের নবীর অছিলায় আপনার নিকট বৃষ্টির জন্য দোয়া করিতাম আপনি আমাদের বৃষ্টির দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেন। এখন আমরা আমাদের নবীর চাচার অছিলায় আপনার নিকট বৃষ্টি চাহিতেছি; আপনি আমাদের বৃষ্টি দান করুন। অতঃপর (আব্বাস (রা:) দোয়া করিতেন এবং) সকলের জন্য পরিতৃপ্তির বৃষ্টি হইত।

ব্যাখ্যা :- নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অছিলায় দোয়ায় বৃষ্টি হওয়ার ঘটনা হযরতের নবুওয়তের পূর্বে হযরতের বাল্য বেলায়ও ঘটিয়াছিল।

একবার মক্কায় অনাবৃষ্টিতে লোকগণ বৃষ্টির জন্য একত্রিত হইল, আবু তালেব হযরত (দ:)কে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং বৃষ্টি হইল, হযরত (দ:) তখন বালক ছিলেন। হযরতের প্রশংসায় আবু তালেবের ইতিহাস প্রসিদ্ধ কবিতার মধ্যে উক্ত ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে—

৫৫০। হাদীছ :- আবুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, অনেক সময় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বৃষ্টির দোয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। হযরত (দ:) মিস্বরে দাঁড়াইয়া দোয়া করেন; আমি তখন আবু তালেবের ইতিহাস প্রসিদ্ধ কবিতার এই বয়েতটি স্মরণ করি—

و ابيض يستسقى الغمام بوجهه - ثمال اليتامى عصمة لئلا رامل

“তিনি এরূপ নূরানী যে, তাঁহার নূরানী চেহারার অছিলায় মেঘমালা হইতে বৃষ্টি লাভ হইয়া থাকে। তিনি এতিমদের আশ্রয়স্থল এবং অনাথ বিধবাদের রক্ষক।”

বয়েতটি স্মরণ করিয়া আমি হযরতের নূরানী চেহারার প্রতি তাকাইতে থাকি ; হযরত (দ:) দোয়া শেষ করিয়া মিসর হইতে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে এমন বৃষ্টি আরম্ভ হয় যে, সকল ছাদ হইতে প্রবল বেগে পানি বহিতে আরম্ভ হয়।

মহুআলাহ :— এস্তেছকা তথা বৃষ্টির জন্য দোয়া করায় মোস্তাদীগণও ইমামের সঙ্গে হাত উঠাইয়া দোয়া করিবে। (১৪০ পৃ: ৫২১ হাদীছ)

৫৫১। হাদীছ :—আনাছ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এস্তেছকার দোয়ার মধ্যে হাত এত অধিক উঠাইতেন যে, তাঁহার নূরানী বগল দেখা যাইত ; অথ কোনও দোয়ার মধ্যে হযরত (দ:) হাত এতদূর উঠাইতেন না।

৫৫২। হাদীছ :—আয়েশা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সেব দেখিলেই এই দোয়া পড়িতেন—**اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا** “হে আল্লাহ! আমাদের উপর সুফলদায়ক উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ কর।”

বৃষ্টি-বর্ষণ শরীরে বরণ করা

বৃষ্টির জন্য দোয়া করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইলে হযরত নবী (দ:) নিজ শরীরে সেই বৃষ্টি বরণ করিয়াছেন। যেরূপ ৫২১নং হাদীছের ঘটনায় দেখা যায়। দোয়ার পর বৃষ্টি আরম্ভ হইল ; মসজিদের ছাদ খেজুর পাতার ছিল, ছাদ হইতে বৃষ্টির পানি ঝরিতে ছিল ; নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দাড়ির উপর বৃষ্টির পানি ঝরিতে ছিল ; হযরত (দ:) উহা ইচ্ছাপূর্বক বরণ করিতেছিলেন, নতুবা উহা হইতে বাঁচিবার ব্যবস্থা করিতেন। (কতছলবারী, ১—৪ ৬)

মোসলেম শরীফে একটি হাদীছ বর্ণিত আছে—একদা রসুলুল্লাহ (দ:) গায়ের কাপড় গুটাইয়া শরীরে বৃষ্টি বরণ করিলেন এবং বলিলেন, এই পানি সবে মাত্র প্রভু-পরওয়ারদেগারের (বিশেষ কুদরতের) সংস্পর্শ হইতে আসিয়াছে।

অধিক বেগে বায়ু বহিবার সময় দোয়া

৫৫৩। হাদীছ :—আনাছ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, অধিক বেগে বায়ু প্রবাহিত হইলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চেহারায় ব্যাকুলতার লক্ষণ দেখা যাইত।

ব্যাখ্যা :—পূর্ববর্তী অনেক উল্লিখিত প্রবল বাড়-ঝঞ্ঝার আজাবে ধ্বংস হইয়াছে ; তাই বাড়-ঝঞ্ঝার পূর্বাভাস প্রবল বেগের বায়ু-বাতাস দেখিলে আল্লাহ তায়ালার আজাব স্মরণে হযরতের অন্তরে ব্যাকুলতা সৃষ্টি হইত ; তিনি এই দোয়াও পড়িতেন—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا أُمِرْتُ بِهِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُمِرْتُ بِهِ

“হে আল্লাহ! এই বাতাস তোমার তরফ হইতে উপকারের আদেশ লইয়া প্রবাহিত হইলে আমি সেই উপকার তোমার নিকট প্রার্থনা করি এবং অপকারের আদেশ লইয়া প্রবাহিত হইলে সেই অশকার হইতে আমি তোমার আশ্রয় চাই।”

বিশেষ জ্ঞপ্ত্য :—ভূকম্প ইত্যাদি দুর্ভোগের ঘটনা সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টির অভাবে দুভিক্ষে পতিত হইয়া যেক্রপ আল্লাহ তায়ালায় প্রতি ধাবিত হওয়া চাই যাহাকে এস্তেচ্কা বলা হয়। তদ্রূপ প্রতিটি দুর্ভোগ-দুর্ভোগের সময়ই আল্লাহ তায়ালায় প্রতি ধাবিত হওয়া চাই।

বৃষ্টি পাইয়া উহাকে আল্লাহ ভিন্ন অন্য বস্তুর প্রতি সম্পৃক্ত করা বস্তুতঃ আল্লাহ নাশোকরী

৫৫৪। হাদীছ :—যায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ঐতিহাসিক হোদায়-বিয়ার ময়দানে অবস্থান করা কালীন একদা রাত্রে বৃষ্টি হইল। ফজরের নামাযান্তে রসুলুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লাম সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা জান কি (এই বৃষ্টিপাতের ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালা কি বলিয়াছেন? সকলে উত্তর করিল, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলই তাহা ভাল জানেন।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ বলিয়াছেন, ভোর হইলে আমার বন্দাদের মধ্য হইতে এক শ্রেণীর লোক আমার প্রতি ঈমান রাখার উপযোগী উক্তি করিবে, কিন্তু আর একদল লোক আমার প্রতি অস্বীকারোক্তিজনক কথা বলিবে। যাহারা বলিবে—আল্লাহর রহমত ও মেহেরবানীর বদৌলতে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হইয়াছে, তাহারা আমার প্রতি ঈমানদার বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। আর যাহারা বলিবে—অমুক অমুক নক্ষত্রের দরুণ বর্ষিত হইয়াছে, তাহারা আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী ও নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী প্রতিপন্ন হইবে।

বিশেষ জ্ঞপ্ত্য :— আমাদের মধ্যে সচরাচর বলা হয়, অমাবস্তার দরুণ বৃষ্টি হইয়াছে বা পূর্ণিমার দরুণ বৃষ্টি হইয়াছে—এইরূপ উক্তিকে সঙ্কুচিত থাকা কর্তব্য।

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণকালীন নামায

৫৫৫। হাদীছ :— আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা একদা রসুলুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় সূর্যগ্রহণ আরম্ভ হইল। তৎক্ষণাৎ রসুলুল্লাহ (দঃ) মসজিদের প্রতি রওয়ানা হইলেন। তাড়াতাড়ির কারণে তিনি নিজের শরীরের চাদরখানা পর্যন্ত ঠিকভাবে গায়ে না দেওয়াতে উহা মাটির উপর হেঁচড়াইয়া যাইতেছিল। লোকগণও হযরতের প্রতি ক্রত ছুটিয়া আসিল। হযরত (দঃ) মসজিদে প্রবেশ করিয়া জমাতে ছই রাকাত নামায পড়িলেন, এদিকে সূর্যের গ্রহণও শেষ হইয়া গেল। নামাযান্তে তিনি বলিলেন, কাহারও মৃত্যুর প্রভাবে চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয় না; যখনই চন্দ্র বা সূর্যের এই অবস্থা দেখিতে পাও তৎক্ষণাৎ নামাযরত হও, যাবৎ এই বিপদাবস্থা দূরীভূত না হয় সেই পর্যন্ত দোয়া করিতে থাক।

৫৫৬। হাদীছ :—আবু মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, নিশ্চয় চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ কাহারও মৃত্যুর কারণে হয় না। বস্তুতঃ চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ আল্লাহ তায়ালায় বিশেষ কুদরতের নিশানরূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। তোমরা ঐরূপ অবস্থা দেখিলে তৎক্ষণাৎ নামাযের প্রতি ধাবিত হইও।

৫৫৭। হাদীছ :—আবু হুলাইহ ইবনে ওমর (রাঃ) নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিতেন—নিশ্চয় চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ কাহারও মৃত্যুর বা জন্মের প্রভাবে সংঘটিত হয় না। চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ আল্লাহ তায়ালায় বিশেষ কুদরতের নিশানসমূহেরই দুইটি নিশান। যখনই তোমরা ঐরূপ অবস্থা দেখ নামায পড়।

৫৫৮। হাদীছ :—মুগিরা ইবনে শো'বা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যেই দিন হযরত রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রিয় পুত্র হযরত ইব্রাহীম (আলাইহে ওয়া আলা আবীহেহ-ছালাম) এন্তেকাল করিলেন সেই দিন সূর্য্যগ্রহণ হইল। সকলে এরূপ বলাবলি করিতে লাগিল যে, রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পুত্রের মৃত্যুতেই ইহা হইয়াছে। তখন রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, চন্দ্র ও সূর্য্য আল্লাহ কুদরতের বিশেষ দুইটি নিশান। উহাদের গ্রহণ কাহারও জন্ম বা মৃত্যুর প্রভাবে কখনও সংঘটিত হয় না। যখন উহা দেখিতে পাও তৎক্ষণাৎ নামায পড়িতে ও দোয়া করিতে আরম্ভ কর। যাবৎ গ্রহণ অবস্থা দূরীভূত হইয়া পরিস্কার না হইয়া যায় নামায পড়িতে ও দোয়া করিতে থাক।

৫৫৯। হাদীছ :—আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—সূর্য্য এবং চন্দ্র আল্লাহ তায়ালায় অসীম কুদরতের দুইটি নিদর্শন। উহা কাহারও মৃত্যুর প্রভাবে গ্রহণযুক্ত হয় না, বরং আল্লাহ তায়ালা (এত বড় বৃহৎ ও তেজোময় আলোক দীপ্ত বস্তুদ্বয়কে এইরূপে কালিমাযুক্ত করিয়া) স্বীয় বন্দাদিগকে ভয় দেখাইয়া (ও সতর্ক করিয়া) থাকেন। (১৪৩ পৃঃ)

৫৬০। হাদীছ :—আবু মুছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা সূর্য্যগ্রহণ হইল, রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি যেন এরূপ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে, কেয়ামত বা মহাপ্রলয় এখনই সংঘটিত হইয়া যাইবে। তৎক্ষণাৎ তিনি মসজিদে আসিলেন এবং অধিক লম্বা কেরাত, রুকু, সেজদা দ্বারা নামায পড়িলেন ; এরূপ লম্বা আর কখনও করিতে দেখি নাই। তারপর বলিলেন, এই সব ঘটনা আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কুদরতের নিদর্শন স্বরূপ সংঘটিত করিয়া থাকেন। কাহারও মৃত্যু বা জন্মের প্রভাবে এই সব কখনও ঘটে না, এরূপ ঘটনার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বন্দাগণকে ভীতি প্রদর্শন ও সতর্ক করিয়া থাকেন। তাই যখন এরূপ কোন ঘটনা দেখ, তৎক্ষণাৎ ভয়-ভীতির সহিত আল্লাহ জিক্র, দোয়া ও এস্তেগফার—ক্ষমা প্রার্থনার প্রতি ধাবিত হও।

৫৬১। হাদীছ :—আবু হুলাইহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বমানায় একদা সূর্য্যগ্রহণ হইল। রসূলুল্লাহ (দঃ) নামায

আরম্ভ করিলেন, (আড়াই পায়া যুক্ত) ছুরা বাকরার ছায় লম্বা কেরাত পড়িলেন । তারপর অত্যধিক লম্বা রুকু করিলেন, তারপর রুকু হইতে উঠিয়া অনেক সময় পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিলেন । পুনরায় অতি লম্বা রুকু করিলেন ; প্রথম রুকু হইতে একটু ছোট, তারপর সেজদা করিলেন । দ্বিতীয় রাকাতও ঐরূপে পড়িলেন, এইরূপে ছই রাকাত নামায শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য গ্রহণও শেষ হইল । নামাযান্তে তিনি সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সূর্য্য ও চন্দ্র (এবং উহাদের নানা প্রকার পরিবর্তন) আল্লার কুদরতের নিদর্শন ; উহা কাহারও মৃত্যু বা জন্মের প্রভাবে গ্রহণযুক্ত হয় না । অতএব যখন ঐরূপ কিছু দেখ, তৎক্ষণাৎ আল্লার জেকরের প্রতি খাতি হইও । ছাহাবীগণ আরম্ভ করিলেন, এইস্থানে দাঁড়ানো অবস্থায় আমরা আপনাকে দেখিয়াছি—আপনি যেন হাত বাড়াইয়া কোন বস্তু ধরিতে উদ্যত হইতেছেন ; তারপর আবার দেখিলাম, আপনি পেছনে হাটিতেছেন । (এনবের কারণ কি লি ?) হযরত (দ:) ফরমাইলেন, (আল্লার কুদরতে) আমি বেহেশতকে অতি নিকটবর্তী স্থানে দেখিতে পাইয়া উহা হইতে একটি আঙ্গুরের ছড়া আনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, যদি উহা আনিতাম তবে তোমরা উহা ছুনিয়া শেষ হওয়া পর্য্যন্ত খাইতে পারিতে (কারণ, বেহেশতের সমুদয় বস্তু অক্ষুরন্ত) । দোষথকেও ঐরূপ নিকটবর্তী স্থানেই দেখিয়াছি ; উহার মত এত বড় ভয়ঙ্কর দৃশ্য আমি আর কখনও দেখি নাই এবং উহার অধিকাংশ বাসিন্দা নারী জাতি দেখিয়াছি । ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন নারী জাতির এই অবস্থা কি কারণে ? হযরত (দ:) বলিলেন, তাহাদের কুফরীর কারণে । ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার উদ্দেশ্য কি আল্লার সঙ্গে কুফরী করা ? রসুলুল্লাহ (দ:) বলিলেন, না—(এখানে কুফরীর অর্থ নেমক-হারামি ও না-শোকর গোজারীর স্বভাব । তাহারা তাহাদের স্বামীদের নাশোকরী করিয়া থাকে, এহনান তথা উপকারের নেমক-হারামি করিয়া থাকে । জীবনভর তাহাদের কাহারও প্রতি যে ব্যক্তি উপকার করিয়াছে তাহার একটি মাত্র ত্রুটি দেখিলেই বলিয়া ফেলে—সারা জীবনে আমরা কোন ভাল ব্যবহার পাই নাই ।

৫৬২। হাদীছ :-আয়েশা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় সূর্য্যগ্রহণ হইল । রসুলুল্লাহ (দ:) নামাযের জন্ত একত্রিত হওয়ার আহ্বানকারী দিকে দিকে পাঠাইয়াছিলেন । অতঃপর সকলকে লইয়া নামায আরম্ভ করিলেন । লম্বা কেরাত পড়িলেন, রুকুও লম্বা করিলেন, রুকু হইতে উঠিয়া অনেক সময় দাঁড়াইলেন এবং পুনরায় লম্বা কেরাত পড়িলেন—প্রথম কেরাত হইতে একটু ছোট । তারপর সেজদায় না যাইয়া পুনরায় রুকু করিলেন—প্রথম রুকু হইতে ছোট, তারপর অনেক লম্বা সেজদা করিলেন, এইরূপেই দ্বিতীয় রাকাত পড়িলেন ; এইভাবে চার রুকু ও চার সেজদায় ছই রাকাত নামায আদায় করিলেন । নামায পড়িতে পড়িতে সূর্য্যগ্রহণ শেষ হইয়া গেল ।

ঐ অন্ধকার যুগে লোকদের এই বিশ্বাস ছিল যে, কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যুর প্রভাবে চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণযুক্ত হইয়া থাকে । হযরত (দ:) সেই আকিদারই খণ্ডন করিয়াছেন ।

অতঃপর তিনি ভাষণ দান করিলেন—আল্লাহ প্রাণসংসা ও ছানা-ছিফত বয়ান পূর্বক বলিলেন, চন্দ্র ও সূর্য্য আল্লাহর অসীম কুদরতের নিদর্শন; উহা কাহারও জ্ঞান বা মৃত্যুর প্রভাবে কখনও গ্রহণযুক্ত হয় না। চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ (আল্লাহ তাঁহার বন্দাদিগকে সতর্ক করার জন্য) ঘটাইয়া থাকেন। যখন ঐরূপ অবস্থা দেখ, তখন আল্লাহর নিকট দোয়া ও প্রার্থনা আরম্ভ কর, তব্বীর বল এবং নামায পড় ও দান-খয়রাত কর—যাবৎ তোমাদের সম্মুখ হইতে সূর্য্যের এই অবস্থা দূরীভূত না হয়।

(পরকালের) বত কিছু সংবাদ আমাকে দেওয়া হইয়াছে; আমি আমার এই নামাযের মধ্যে ঐসবকে চাক্ষুষরূপে অবলোকন করিয়াছি। এমনকি আমি বেহেশত (দেখিয়া উহা) হইতে আঙ্গুর ছড়া হস্তগত করিতে উত্তত হইয়াছিলাম যখন তোমরা আমাকে সম্মুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়াছ। আমি দোষকে দোষিয়াছি—উহার অগ্নি-শিখাগুলি কিলবিল করিতে ছিল; তখন তোমরা আমাকে পেছনে হাটিতে দেখিয়াছ। সেই দোষের মধ্যে আমি আমার ইবনে লুহাই (মক্কাহিত আদিকালে এক কাকের)কে দেখিয়াছি; সে-ই ঐ ব্যক্তি যে সর্বপ্রথম দেব-দেবীর নামে কোন পশু ছাড়িয়া দেওয়ার প্রথা সৃষ্টি করিয়াছিল।

হে মোহাম্মদ (দঃ)-এর উন্নতগণ! আল্লাহ তায়ালা তাঁহার কোন বন্দা-বান্দীকে যেনার (ব্যভিচারে) লিপ্ত দেখিলে যেরূপ ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, অন্য আর কেহই কোন বস্তুকে ঐরূপ ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে না। হে মোহাম্মদ (দঃ)-এর উন্নতগণ! (মানবের সম্মুখে যেই কঠিন সময়, কঠিন পথ, কঠিন সমস্ত্যাবলী রহিয়াছে) যদি তোমরা জানিতে যেরূপ আমি জানি; শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তবে নিশ্চয় তোমরা হাসিতে কম, কাঁদিতে শেনী। (১৪২ ও ১৬১ পৃঃ)

ব্যাখ্যা :-অন্ধকার যুগে লোকদের বিশ্বাস ও মতবাদ এই ছিল যে, কোন মহা মানবের মৃত্যু বা জন্মলগ্নে চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ হইয়া থাকে। ঘটনাক্রমে রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ে সে সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল উহা হযরতের তৎকালীন একমাত্র পুত্র ইব্রাহীমের মৃত্যুর দিন সংঘটিত হইয়াছিল। সেমতে লোকদের উপর তাহাদেরই মতবাদ ও বিশ্বাস সূত্রে হযরতের একটা বিরূপ প্রভাব লাভের সুবর্ণ সুযোগ ছিল; লোকদের মুখে তাহা আসিয়াও ছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই মিথ্যা সুযোগকে পদদলিত করার উদ্দেশ্যে অধিক তৎপরতার সহিত উক্ত গহিত মতবাদকে বিশেষভাবে খণ্ডন করিয়া বার-বার ইহা প্রচার করিলেন যে, চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ কখনও কাহারও মৃত্যুর প্রভাবে বা কাহারও জন্মলগ্নে হয় না। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার মহা কুদরত ও সর্বশক্তির নমুনা দেখাইয়া মানবকে সতর্ক করিতে চাহেন। মানব যেন আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগরিত রাখিয়া জীবন-যাপন করে।

চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণে আরও একটি অনেক বড় নিদর্শন এই রহিয়াছে যে, সূর্য্য ও চন্দ্র অতি বড় বিরূপ বস্তু ও মহা উপকারী বটে, কিন্তু ইহা পূজনীয় হইতে পারে না; ইহা

মহান আল্লাহ তায়ালায় নগণ্য সৃষ্ট। ইহার আলো ও জ্যোতিই ইহার অস্তিত্বকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে—সেই আলোটুকুও উহার আয়ত্ব নহে, উহা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালায় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রনাধীনে; এইরূপ বস্তু পৃথকীয় কিরূপে হইতে পারে? পবিত্র কোরআনে আছে—

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝

“আল্লাহ তায়ালায় কুদরতের অসংখ্য নমুনাই অন্তর্ভুক্ত রাত্র এবং দিন; (অধিকন্তু দিবারাত্রের বিবর্তনের মূল বস্তুদ্বয়—) সূর্য এবং চন্দ্রও সেই কুদরতের নমুনাই অন্তর্ভুক্ত। তোমরা চন্দ্র-সূর্যের সেজদা বা পূজা করিও না, সেজদা ও পূজা কর ঐ আল্লাহ যিনি ঐ সবকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি তোমরা বস্তুতঃ আল্লাহই পূজারী হইয়া থাক (২৪ পারা, ১৯ রুকু; ইহা সেজদার আয়াত)। অর্থাৎ অনেকে বলিয়া থাকে চন্দ্র-সূর্যের পূজার মাধ্যমে আল্লাহই পূজা মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা পরিস্কার বলিয়া দিলেন, আল্লাহ পূজারী সাবাস্ত হইতে চাহিলে কোন সৃষ্ট বস্তুর পূজা কোন স্তরেই করিবে না। চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের দ্বারা চাক্ষুষ ও সমাকরূপে প্রতিপন্ন হয় যে—উহা আল্লাহ তায়ালায় সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রনাধীন বস্তু; এই উপলক্ষে আল্লাহ তায়ালায় এবাদতে লিপ্ত হওয়া উক্ত আয়াতের কতই না সামঞ্জস্যপূর্ণ।

চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ আরও একটি বিষয়ের নিশান ও নিদর্শন—তাহা হইল সারা বিশ্ব, বরং সৃষ্টিকর্তা ভিন্ন অস্ত্র সব কিছুর লয় তথা মহাপ্রলয়ের নিদর্শন। চন্দ্র ও সূর্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এক শ্রেণীর মানুষ উহার পূজারী হইয়া গিয়াছে। মহাপ্রলয় লগ্নে আল্লাহ তায়ালা উহার বৈশিষ্ট্য ছিনাইয়া নিয়া চাক্ষুষ দেখাইয়া দিবেন যে, চন্দ্র-সূর্য্য ও উহার বৈশিষ্ট্য সবারই স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রনকারী আল্লাহ তায়ালা; সেই সূত্রেই মহাপ্রলয়ের পূর্বক্ষেণে সারা সৌরজগতের উপর প্রভাব বিস্তারকারী সূর্যের জ্যোতি ও কিরণমালাকে আল্লাহ তায়ালা বিলুপ্ত করিয়া দিবেন; সূর্য্য একটি সাধারণ গোলাকার বস্তু হইয়া যাইবে। পবিত্র কোরআনে ৩০ পারায় উল্লেখ আছে—**إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ** (মহাপ্রলয়ের সময় তখন—) যখন সূর্যের কিরণ বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হইবে।” চন্দ্রের অবস্থাও তদ্রূপই।

পবিত্র কোরআন শরীফে ২৯ পারায় আছে—

يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ فَإِذَا بَرَقَ الْبَرْقُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ.....

“বিদ্রূপ করিয়া জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত কবে আসিবে? যখন অবস্থার ভয়াবহতার আসের দরুণ চক্ষু তাক লাগাইয়া যাইবে এবং চন্দ্র আলোহীন হইয়া যাইবে……তখন মানুষ বলিবে, আজ পালাইবার জায়গা আছে কি?”

সাধারণ চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ সেই মহা গ্রহণেরই নমুনা। এই জরুই ৫৬নং হাদীছে আছে যে, সূর্যগ্রহণ হইলে পর রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আতঙ্কিত হইলেন যে, কেয়ামত আসিয়া গেল নাকি ?

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের নামায সম্পর্কে নবী (দঃ) হইতে আদেশবোধক শব্দের উক্তি বর্ণিত রহিয়াছে। অধিকাংশ ইমাম এই নামাযকে ছুন্নতে-মোয়াক্কাদা বলিয়াছেন এবং কেহ ওয়াজেব বলিয়াছেন। (ফতহুলবারী, ২—৪২১)

সূর্য গ্রহণের নামাযে প্রতি রাকাতে একাধিক রুকু করা হযরত নবী (দঃ) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে ; কেহ সেইরূপ করিলে তাহাতে মোটেই কোন দোষ নাই। হানফী মজহাবে বলা হয় যে, হযরত (দঃ) কোন সাময়িক কারণে ঐ সময়ে উহা করিয়াছিলেন। যেকোন উক্ত নামাযে হযরত (দঃ) এক সময় নিজের স্থান হইতে পেছনে হটিয়া ছিলেন, এক সময় হাত বাড়াইয়া কিছু দূরিতে চাহিয়াছিলেন (৫৬১ হাদীছ দ্রষ্টব্য)।

উক্ত নামাযান্তে স্বয়ং হযরত (দঃ) লোকদিগকে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ অবস্থায় ফজর নামাযের স্থায় নামায পড়িতে বলিয়াছেন—তাহা হাদীছে বর্ণিত আছে। বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের রাডিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আমল বোখারী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি সূর্যগ্রহণের নামায ফজরের নামাযের স্থায়ী পড়িয়াছেন (১৪২ ও পৃঃ)। তাই হানফী মজহাবে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের নামায প্রচলিত নিয়ম তথা প্রতি রাকাতে এক রুকু দ্বারাই পড়িতে বলা হয়।

৫৬৩। হাদীছ :—আবু বকর তনয়া আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সূর্যগ্রহণের নামায পড়িলেন। (কেরাত পড়িতে) দীর্ঘ সময় দাঁড়াইলেন, তারপর দীর্ঘ রুকু করিলেন ; রুকু হইতে উঠিয়া দীর্ঘ সময় দাঁড়াইলেন (এবং পুনঃ কেরাত পড়িলেন।) তারপর পুনরায় সুদীর্ঘ রুকু করিলেন ; রুকু হইতে উঠিয়া সেজদায় গেলেন এবং দীর্ঘ সেজদা করিলেন। দ্বিতীয় সেজদা হইতে দাঁড়াইয়া গেলেন : এইবারও দীর্ঘ সময় দাঁড়াইলেইন এবং প্রথম রাকাতের স্থায় দীর্ঘ দুই রুকু ও দুই সেজদা করিয়া নামায শেষ করিলেন। নামায শেষে লোকদেরকে লক্ষ্য করিয়া ইহাও বলিলেন যে, বেহেশতকে আমার এত নিকটবর্তী দেখান হইয়াছে যে, পূর্ণ সাহস করিলে যোথ হয়, উহার একটি আঙ্গুর ছড়া আনিতে পারিতাম। দোষও অতি নিকটবর্তী দেখান হইয়াছে ; এমনকি আশঙ্কাজনিত হইয়া আমি (আল্লামার রহমত আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে) বলিয়াছি, হে পরওয়ারদেগার ! আমি লোকদের সঙ্গে বিজ্ঞান থাকা অবস্থায়ই.....(দোষ তাহাদেরকে ঘিরিয়া ধরিবে) ? আমি দোষের শাস্তিভোগে লিপ্ত একটি নারীকে দেখিয়াছি—একটি বিড়াল তাহাকে নখ দ্বারা আঁচড় দিতেছে। তাহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, সে ঐ বিড়ালটাকে বাধিয়া রাখিয়া আনাহারে মারিয়া ফেলিয়া ছিল ;

উহাকে খাও দেয় নাই, আবার ছাড়িয়াও দেয় নাই যে, সে নিজে খাও ভুটাইতে সক্ষম হয়। (১১৩ পৃঃ) এতদ্বিন্ন ১৬৮ নম্বরেও এই হাদীছখানা অনূদিত হইয়াছে। তথায় আরও কিছু তথ্য উল্লেখ রহিয়াছে।)

৫৬৪। হাদীছ :—আবুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় যখন সূর্য্যগ্রহণ হইল, তখন সর্বত্র এই ধ্বনি দেওয়া হইল—নামাযের জন্ম প্রস্তুত হও।

৫৬৫। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ইহুদি ভিখারিনী তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিল এবং—**أعازك الله من عذاب القبر** “আল্লাহ আপনাকে কবরের আজাব হইতে রক্ষা করুন।” এই দোয়া করিল। (ইতিপূর্বে আয়েশা (রাঃ) কবরের আজাবের কথা শুনে নাই, তাই) তিনি রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, মানুষদিগকে তাহাদের কবরে আজাব দেওয়া হইবে কি? রসুলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, (হাঁ—) আমি উহা হইতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি।

তারপর একদা রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকাল বেলা কোন কাজে যানবাহনে চড়িয়া যাইতেছিলেন, এমনতাহার সূর্য্যগ্রহণ আরম্ভ হইল। তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং বিবিগণের (চেতনা সৃষ্টি উদ্দেশ্যে তাহাদের) কক্ষসমূহের মধ্য দিয়া মসজিদে গমন করিলেন এবং নামায আরম্ভ করিলেন। লোকেরা তাঁহার পেছনে কাতার বাধিয়া নামাযে শরীক হইল। তিনি (পূর্ব বণিতরূপে হুই রাকাত) নামায শেষ করিয়া কবরের আজাব হইতে আল্লাহ তায়ালায় আশ্রয়প্রার্থী হওয়ার আদেশ করিলেন।

৫৬৬। হাদীছ :—আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আদেশ করিয়াছেন, সূর্য্যগ্রহণের সময় ক্রীতদাস মুক্ত করিতে।

চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণকালে করণীয় আমলসমূহ :

● নামাযের ব্যবস্থা করিবে—নিজেও নামায পড়িবে এবং লোকদিগকে একত্রিত করায় ব্যাপস্থা করিবে, এমনকি আহ্বানকারী পাঠাইয়া লোকদিগকে ডাকিয়া আনিবে, নিজের পরিবার-পরিজনকেও নামাযের জন্ম সচেতন করিবে। নামায জমাতে সহিত মসজিদে পড়িবে—ইহা উত্তম; সেরূপ ব্যবস্থা না হইলে নিজ গৃহেই পড়িবে। যথাসাধ্য এই নামাযের কেরাত এবং রুকু-সেজদা সুদীর্ঘ করিবে। প্রথম রাকাত দ্বিতীয় রাকাত অপেক্ষা অধিক দীর্ঘ করিবে। আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, সূর্য্যগ্রহণের নামায এত দীর্ঘ করিবে যে নামায শেষ হইতে গ্রহণ ছুটিয়া যায়। নামাযান্তে যদি দেখা যায় গ্রহণ ছুটে নাই তবে অবশিষ্ট সময় দোয়া করিয়া কাটাইবে (ফতহুলবারী ২—৪২১) সূর্য্য গ্রহণের নামায শেষে ইমাম চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণের তাৎপর্য বর্ণনা করিয়া ভাষণ দিবেন। সূর্য্য গ্রহণের নামাযে পুরুষদের জমাতে মহিলাদের শামিল হওয়া—এ সম্পর্কে পূর্ব মহম্মদালাহ এই যে, যদি

নিজ গৃহে পরিবারবর্গের জমাত হয় তবে শামিল হইতে পারে। মসজিদের জমাতে শামিল হওয়ার মহআলাহ উহাই যাহা “মহিলাদের জন্য মসজিদে যাওয়া” পরিচ্ছেদে এবং ১২ নং হাদীছের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে।

● বিভিন্ন দোয়ায় আত্মনিয়োগ করিবে। ● “আল্লাহ-আকবার” এবং বিভিন্ন রকমে আল্লার ভেঁকর করিবে। ● বিশেষভাবে কবরের আজাব হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় ভিক্ষা চাহিবে। ● গোনাহ মাকের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট কান্নাকাটা করিবে।

● চন্দ্র গ্রহণেও নামায পড়িবে (১৪৫ পৃঃ)। অবশ্য সূর্য্য গ্রহণের নামায জমাতে পড়া মোস্তাহাব; চন্দ্র গ্রহণের নামাযে জমাত মোস্তাহাব নহে (শামী, ১—৭৭৮)। সূর্য্য গ্রহণের নামায রশুলুল্লাহ (দঃ) জমাতে পড়িয়াছেন; চন্দ্র গ্রহণের কোন ঘটনা হযরতের আমলে বর্ণিত নাই, কিন্তু সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়ের গ্রহণের তাৎপর্য্য সমপর্য্যায়ের বর্ণনা করিয়া উভয়ের গ্রহণে নামায, জিক্র দোয়া, এস্তেগফার ও দান-খয়রাতের আহ্বান জানাইয়াছেন।

কোরআন শরীফে সেজদার আয়াতসমূহ

৫৬৭। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন—“ছুরা ছোয়াদ”—এর মধ্যে একটি সেজদার আয়াত আছে, উহার উপর সেজদা করা করজ ওয়াজেব না হইলেও আমি রশুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ঐ আয়াত তেলাওয়াত করিয়া সেজদা করিতে দেখিয়াছি।

৫৬৮। হাদীছ :—আবুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম “ছুরা-নাযম” তেলাওয়াত করিলেন; উহার একটি আয়াতের উপর তিনি সেজদা করিলেন এবং উপস্থিত সকল (এমনকি কাকেররা পর্য্যন্ত) সেজদা করিল; এক বৃদ্ধ (কাকের সে অতিশয় মোটা ছিল) সেজদা করিতে পারিল না, কিন্তু সেও এক মুঠি মাটি উঠাইয়া কপালে ছোঁয়াইল এবং বলিল, আমার জন্য ইহাই যথেষ্ট। এই লোকটি কাকের থাকাবস্থায়ই মোসলমানদের হাতে নিহত হয়।

৫৬৯। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছুরা নাযম তেলাওয়াত কালে সেজদা করিলেন। উপস্থিত মোছলমান, মোশরেক, খ্রিষ্ট ও সকল শ্রেণীর মানুষই তাঁহার সঙ্গে সেজদা করিয়াছিল।

ব্যাখ্যা :—ঐ ক্ষেত্রে বহু কাকের সেজদা করিয়াছে, এমনকি একরূপ গুজব রটিয়া গেল যে, মক্কাবাসীরা মোসলমান হইয়া গিয়াছে। কাকেরদের এই সেজদার মূলে কি হেতু ছিল সে বিষয়ে কোন কোন ভিত্তিহীন ঘটনার বর্ণনা আছে। কিন্তু প্রকৃত ঐ সকলে বিশেষ একটি ঐশ্বরিক প্রভাব সকলকে প্রভাবান্বিত করিয়া ফেলে, যদ্বরূপ সকলে সেজদা করিতে বাধ্য হয়। তাই অল্প এক হাদীছে আছে, ঐ সময় গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত পর্য্যন্ত (নিজ নিজ পদ্ধতিতে) সেজদা করিয়াছিল।

একরূপ ঘটনার দ্বারা আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও স্বেচ্ছাধীন কুদরতের বিকাশ হইয়া থাকে; আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—**وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هَدًى**—“আমি ইচ্ছা করিলে বাধ্যতামূলক সকলকে সংপথে পরিচালিত করিতে পারি।”

এই কুদরতের নমুনাই আল্লাহ তায়ালা সময় সময় দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু সর্বদার জন্ত ও ব্যাপকভাবে আল্লাহ তায়ালা এই ইচ্ছাকে প্রয়োগ করেন না, কারণ উহাতে দুনিয়ার-স্থিতি রহস্য তথা “পদ্বীক্ষা” অস্থিতি হইতে পারে না।

৫৭০। হাদীছঃ—যায়েদ ইবনে ছাবেং (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাক্ষাতে ছুরা নাজম তেলাওয়াত করিলেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (তখন অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে) সেজদা করেন নাই।

৫৭১। হাদীছঃ—আবু ছালামাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবু হোরাযরা (রাঃ)কে দেখিয়াছি, তিনি “ছুরা এন্শাক্কাত” তেলাওয়াত করিলেন এবং সেজদা করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এখানে সেজদা করিতে না দেখিলে সেজদা করিতাম না।

৫৭২। হাদীছঃ—আবুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, অনেক সময় আমাদের উপস্থিতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করিতেন এবং সেজদা করিতেন, আমরাও সেজদা করিতাম; যাহাতে এত ভীড় হইয়া যাইত যে, আমরা (একত্রে) প্রত্যেকে মাথা রাখিবার স্থান পাইতাম না।

৫৭৩। হাদীছঃ—আবু রাফে' (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা আমি আবু হোরাযরা রাজিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে নামায পড়িলাম, তিনি “ছুরা এন্শাক্কাত” পড়িলেন এবং নামাযের মধ্যেই উহার সেজদাও করিলেন। নামাযান্তে আমি তাঁহাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে নামাযের মধ্যে এইরূপে সেজদা করিয়াছি, তাই আমি আজীবন ইহা করিয়া যাইব।

বিশেষ জ্ঞপ্ত্যঃ—একটি পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (দঃ) বিভিন্ন প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করিতে চাহিয়াছেন যে, সেজদার আয়াত পড়িয়া বা শুনিয়া সেজদা করা ফরজ-ওয়াজেব নহে; মোস্তাহাব। অবশ্য এই ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন হাদীছ দেখা যায় না; বিভিন্ন হাদীছে শুধু এই বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) সেজদা করিতেন। হানফী মজহাবে সেজদার আয়াত যে পড়ে বা শুনে উভয়ের উপর সেজদা করা ওয়াজেব; অবশ্য তৎক্ষণাৎ না করিয়া পরে করিলেও চলে, একেবারেই না করিলে ওয়াজেবের তরকের কঠিন গোনাহ হইবে।

মুসাফিরের নামাযের বিবরণ

৫৭৪। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (মক্কা বিজয়কালে মক্কায়) উনিশ দিন অবস্থান করিয়াছেন এবং সেই অবস্থানে নামায কছর পড়িয়াছেন। সুতরাং আমরা ভ্রমণ অবস্থায় কোথাও উনিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করিলে কছরই পড়িব। অধিক অবস্থান করিলে পূর্ণ নামায পড়িব।

মহআলাহ :—হানফী মজহাব মতে মুছাফির ব্যক্তি (ঘটীর হিসাবে) পূর্ণ পনের দিন কোন স্থানে অবস্থানের নিয়্যত করিলে তখন হইতেই তাহাকে নামায পূর্ণ পড়িতে হইবে। এক ঘটা কম পনের দিন এক শহরে অত্যন্ত দিন অল্প এলাকায় কিম্বা নিয়্যত বতিরেকে ষত দিনই অবস্থান করিলে সে ক্ষেত্রে নামায কছরই করিতে হইবে। আলোচ্য হাদীছের ঘটনায় বিভিন্ন বর্ণনা সূত্রে এই অবস্থাই অবধারিত।

৫৭৫। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (বিদায় হজ্জ উপলক্ষে) আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে মদীনা হইতে মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হইলাম। আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত নামায ছুই ছুই রাকাত পড়িয়াছি। আনাছ (রাঃ) ইহাও বলিয়াছেন যে, আমরা মক্কা শরীফে দশ দিন অবস্থান করিয়াছিলাম।

৫৭৬। হাদীছ :—হারেস ইবনে ওয়াহুব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (বিদায় হজ্জে) মিনায় (চার দিন) অবস্থান কালে (কছর—চার রাকাত) নামায ছুই রাকাত পড়িতেন। ঐ সময় মোসলমানদের পূর্ণ নিরাপদ অবস্থা বিরাজমান ছিল।

ব্যাখ্যা :—ইসলামের প্রাথমিক যুগে মোসলমানদের জন্ম নিজদের এলাকা হইতে দূরে সাধারণতঃ নিরাপত্তার অভাব বিরাজমান ছিল ; সেই পরিপ্রেক্ষিতেই প্রথমতঃ কছরের বিধান প্রবর্তিত হয়, যেন ভয়-সঙ্কুল স্থানে অবস্থান সংক্ষিপ্ত করা হয় ; পবিত্র কোরআনে ইহারই উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু পরে কছরের বিধান ভয়ের অবস্থায় সীমিত থাকে নাই, বরং নির্দিষ্ট পরিমাণের প্রত্যেক ছফর ক্ষেত্রের জন্মই প্রবর্তিত হইয়াছে। আলোচ্য হাদীছে উহারই উল্লেখ হইয়াছে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এবং ছাহাবীগণের সুদীর্ঘ জীবনে নিরাপদ ও শান্ত অবস্থায় ছফরে কছর ভুরি ভুরি নজীর বিদ্যমান রহিয়াছে।

৫৭৭। হাদীছ :—আবদুল রহমান ইবনে যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফা ওসমান (রাঃ) হজ্জের সময় মিনার মধ্যে নামাযের জমাত পড়াইলেন ; তিনি নামায চার রাকাত পড়াইলেন (কছর করিলেন না) আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) ছাহাবীর নিকট এই বিষয় উল্লেখ করা হইলে তিনি অত্যন্ত বিস্ময় ও অনুতাপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সহিত (হজ্জের ছফরে) মিনায় নামায (চারি রাকাতের কছর) ছুই রাকাত পড়িয়াছি। খলীফা আবু বকরের সঙ্গেও তক্রুশই এবং

খলীফা ওমরের সঙ্গেও তজ্রপই; এমনকি খলীফা ওসমানের খেলাফতের প্রথম আমলেও তজ্রপই। সুতরাং চার রাকাত স্থলে আল্লার দরবারে কবুল হই রাকাতই আমার জন্ত উত্তম।

বাখ্যা :—খলীফা ওসমান (রাঃ) কর্তৃক খেলাফতের শেষ আমলে হজ্জের ছফরে কছর না করায় সমালোচনার ঝড় উঠিয়াছিল, তাহাতে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কছর পড়ার বিধান অলঙ্ঘনীয়। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ছফর অবস্থায় কছরকে ওয়াজেব বলিয়াছেন। স্বীয় কার্যের রহস্য উদ্ঘাটনে নিজেই বলিয়াছেন, আমি মক্কা শহরে বিবাহ করিয়াছি এবং আমি রশ্বলুলাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি, কেহ কোন এলাকায় বিবাহ করিলে তথায় সে তথাকার বাসিন্দারূপে নামায পড়িবে। মক্কায় বিবাহ করার পূর্বে খলীফা ওসমান (রাঃ) হজ্জের ছফরে মিনার মধ্যে কছরই পড়িতেন। বোখারী (রঃ) ১৪৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন, আয়েশা (রাঃ) ছফর অবস্থায় কছর করিতেন না, পূর্ণই পড়িতেন। খলীফা ওসমানের তায় তাঁহাকেও কৈফিয়ত দিতে হইয়াছে।

৫৭৮। হাবীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন মহিলা তিন দিন ভ্রমণের পথ ছফর করিতে পারিবে না যদি না তাহার সঙ্গে কোন মাহরম (বা নিজ স্বামী) থাকে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—মাহরম বা স্বামী ছাড়া তিন দিন বা উহার অধিক ভ্রমণের পথ ছফর করা মহিলাদের জন্ত হারাম। এই মহাআলাহ হইতেই নামায কছরের জন্ত তিন দিন বা উহার অধিক ভ্রমণের পথ ছফর করা নির্দ্বারিত করা হইয়াছে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে যে শ্রেণীর ভ্রমণ উদ্দেশ্য সেই ভ্রমণ অনুপাতে তিন দিনের ভ্রমণ-পথ ৪৮ মাইল নির্দ্বারিত করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) চার “বরীদ” পথ ভ্রমণে নামায কছর করিতেন এবং রমজানের রোজা ভঙ্গ করিতেন। (এক “বরীদ” ১২ মাইল, অতএব চার বরীদ ৪৮ মাইল।)

মহাআলাহ :—৪৮ মাইল ভ্রমণ উদ্দেশ্য করিয়া স্বীয় গ্রাম বা শহর অতিক্রম করিয়া গেলেই কছর করা আরম্ভ করিতে হইবে।

খলীফা আলী (রাঃ) একদা ছফর উদ্দেশ্যে তাঁহার রাজধানী শহর কুফা ত্যাগ করতঃ অনতিদূরে যাইয়াই (নামাযের ওয়াক্ত হইলে) নামায কছর করিলেন; অথচ শহরের বাড়ী-ঘর তখনও তাঁহার দৃষ্টিগোচরে ছিল। তজ্রপ প্রত্যাবর্তনকালে কুফা শহরের অনতিদূরে থাকাবস্থায় (নামাযের ওয়াক্ত সন্ধ্যা হইয়া আসিলে) নামায কছররূপে আদায় করিলেন। তাঁহাকে বলাও হইল—এই ত কুফা শহর। অর্থাৎ কুফা শহর যেখানে আপনার বাড়ী উহা ত নিকটবর্তীই। তিনি বলিলেন, আমাদের নামায পূরা পড়িতে হইবে না, যাবৎ না ছফর হইতে কুফা শহরে প্রবেশ করি।

পাঠকবর্গ! আলোচ্য হাদীছের মূল বিষয় তথা মাহরম বা স্বামী ছাড়া মহিলাদের ছফর তিন দিনের ভ্রমণ-পথ তথা ৪৮ মাইল হইলে তাহা হারাম। আর ছই দিনের পথ তথা ৩২ মাইল হইলে তাহাও নাজায়েয; এ সম্পর্কে স্পষ্ট হাদীছ (৬৩৩ নং) বিজ্ঞমান আছে; বরং এক দিনের পথ তথা ১৬ মাইল ছফর করাও মাহরম বা স্বামী ছাড়া মহিলাদের জ্ঞান মোটেই সমীচীন নহে। নিম্নে হাদীছে উহার স্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন নারীদের জন্য মাহরম বা স্বামী ছাড়া সব ছফরই নিষিদ্ধ বলিয়া ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে। হাদীছটি দ্বিতীয় খণ্ডে “নারীদের হজ্জ করা” পরিচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৫৮০। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমি নবী ছালাম্মাহু আলাইহে অসাল্লামকে দেখিয়াছি, যখন তাঁহার তাড়াতাড়ি পথ অতিক্রমের আবশ্যক হইত তখন তিনি (পশ্চিমধ্যে মাগরেবের নামাযের শেষ ওয়াক্তে অবতরণ করিয়া) তিন রাকাত মগরেবের নামায পড়িতেন এবং সামান্য অপেক্ষা করিয়া (এশার নামাযের প্রথম ওয়াক্তে) দুই রাকাত এশার নামায পড়িতেন। এশার নামাযের পর কোন সুন্নত-নফল পড়িতেন না, মধ্যরাত্রে তাহাজ্জুদ পড়িতেন।

৫৮১। হাদীছ :—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালামাছ আলাইহে অসালাম
ভ্রমণাবস্থায় সওয়ারীর উপর আরোহিত থাকিয়া, কেবলার দিক ছাড়াই (ভ্রমণ দিকে)
নফল নামায পড়িয়াছেন।

৫৮২। হাদীছ :--ইবনে ওমর (রাঃ) ভ্রমণবস্থায় সওয়ারীর উপর থাকিয়া ভ্রমণের দিকেই শুধু মাথার ইশারা দ্বারা নফল পড়িতেন এবং নবী ছালামাহ আল্লাইহে অসাল্লাম এরূপ করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিতেন।

৫৮৩। হাদীছ :—আমের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ ছালাম্লাহ্ আলাইহে
 অসাল্লামকে সওয়ারীর উপর অমণ দিকে শুধু ইশারা করিয়া নফল নামায পড়িতে দেখিয়াছি।
 কিন্তু তিনি ফরজ নামাযে এরূপ কখনও করিতেন না।

৫৮৪। হাদীছ ৪—ইবনে ছীরীন (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ছাহাবী আনাছ (রাঃ) সিরিয়া হইতে বছরায় প্রত্যাবর্তনকালে আমরা তাহাকে স্বাগত জানাইতে অগ্রসর হইয়াছিলাম। তাঁহাকে দেখিলাম, তিনি তাঁহার সোয়ারী গাধার পিঠে বসিয়া নামায পড়িতেছেন—কেবলার বাম দিক হইয়া। আমি তাঁহাকে বলিলাম, আপনি কেবলা ভিন্ন অন্য দিকে নামায পড়িতেছিলেন—দেখিলাম। তিনি বলিলেন, রসুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এরূপ করিতে না দেখিলে আমি এরূপ করিতাম না।

৫৮৫। হাদীছ ৫—তাবেয়ী হাফ্ছ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাহচর্যে রহিয়াছি; তাঁহাকে দেখি নাই, ছফর অবস্থায় সুন্নত-নফল (সর্বদা ও তৎপরতার সহিত) পড়িতে।

মহুআলাহঃ—ফরজের পূর্বে বা পরে যে সুন্নত-মোয়াক্কাদাহ নামায আছে উহার মধ্যে কছর নাই, কিন্তু ছফর অবস্থায় উহা সুন্নত-মোয়াক্কাদাহ থাকে না; সাধারণ নফল পরিগণিত হয়। সুতরাং উহার জন্ত মোটেই কোন তৎপরতার প্রয়োজন হয় না। তৎপরি নফল নামায সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, সোয়ারীতে আরোহিত যাত্রাভিমুখী অবস্থায় মাথার ইশারায় উহা পড়া যাইতে পারে। অতএব ফরজের সহিত সুন্নত পড়ায় লিপ্ত হইয়া নিজের বা সঙ্গীদের ব্যতিব্যস্ততার কারণ হওয়া কিম্বা কাহাকেও অধিক সময় সঙ্গীর্ণতার পতিত রাখা মোটেই সমীচীন নহে। অবশ্য ফজরের দুই রাকাত সুন্নত সম্পর্কে বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন যে, রসুল্লাহ (দঃ) ছফর অবস্থায়ও এই দুই রাকাত পড়িয়া থাকিতেন।

মহুআলাহঃ—ছফর অবস্থায়, কিন্তু ভ্রমণ নহে—অবস্থানকালে যে কোন সুন্নত-নফল পড়ায় দোষ নাই। হযরত নবী (দঃ) মক্কা বিজয়ের ছফরে মক্কায প্রবেশ করার পর আট রাকাত চাশতের নামায পড়িয়াছিলেন। তদ্রূপ ভ্রমণ অবস্থায়ও কাহারও কোন ব্যাঘাত না ঘটে সেরূপভাবে সুন্নত-নফল পড়া যায়। নবী (দঃ) ভ্রমণ অবস্থায় সোয়ারীর উপর চলিতে থাকিয়া নফল নামায পড়িয়া থাকিতেন।

৫৮৬। হাদীছ ৬—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভ্রমণবস্থায় জোহর ও আছরের নামায এবং মগরের ও এশার নামাযকে এক সঙ্গে পড়িতেন।

৫৮৭। হাদীছ ৭—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছফর অবস্থায় মগরের ও এশা এই দুই নামায একত্রে পড়িতেন।

৫৮৮। হাদীছ ৮—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যদি সূর্য্য মধ্যাকাশ অতিক্রম করার তথা জোহর নামাযের ওয়াক্ত আরম্ভের পূর্বেই যাত্রা করিতেন তবে তিনি জোহর নামায পড়িতে আছরের সময় পর্য্যন্ত বিলম্ব

করিতেন। তারপর অবতরণ করিয়া উভয় নামায় এক সঙ্গেই পড়িতেন। আর যাত্রার পূর্বে সূর্য্য মধ্যাকাশ অতিক্রম করিয়া গেলে যাত্রার পূর্বেই জোহরের নামায় পড়িয়া অতঃপর যাত্রা করিতেন।

ব্যাখ্যাঃ—ইমানগণ এই সব হাদীছের কার্য্যধারার ব্যাখ্যা দুই প্রকার করিয়াছেন। ইমাম শাফেরী (রঃ) বলেন, ইহার অর্থ বস্তুতঃ জোহরকে উহার ওয়াক্তের পরে অর্থাৎ আছরের ওয়াক্তে একত্র করা এবং মগরেবকে উহার ওয়াক্তের পরে অর্থাৎ এশার ওয়াক্তে একত্র করা। সফর অবস্থার বিশেষ সুযোগ দানার্থে এরূপ অনুমতি আছে।

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন, এরূপ করিলে কোরআনের বিধান লঙ্ঘন করা হইবে ; **ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا**

সেই জ্ঞাত উক্ত হাদীছের কার্য্যধারা এইরূপ যে—ভ্রমণ অবস্থায় পশ্চিমধ্যে জোহরের নামাযের ব্যবস্থা উহার ওয়াক্তের শেষভাগে করিবে, যেন জোহরের নামায শেষ ওয়াক্তে পড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে আছরের নামাযেও আছরের ওয়াক্তেই প্রথম ভাগে পড়িয়া লওয়া যায়। মগরেব ও এশার নামাযের স্থানও এইরূপ ব্যবস্থাই অবলম্বন করিবে। যেমন, এই পরিচ্ছেদের ৫৮০নং হাদীছ বাহা এই বিষয়ে আবুহুলাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত ; উক্ত হাদীছে এরূপ ব্যাখ্যাই স্পষ্ট উল্লেখ হইয়াছে। উক্ত হাদীছ বর্ণনাকারী আবুহুলাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবীর প্রত্যক্ষ আমলও এই ব্যাখ্যায়রূপই ছিল। নেছায়ী শরীফের হাদীছে উহার বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, মগরেবের নামায উহার ওয়াক্ত থাকিতে—এশার ওয়াক্ত আরম্ভের পূর্বেই পড়িয়াছেন এবং এশার নামায উহার ওয়াক্তে—মগরেবের ওয়াক্ত গেলে পরেই পড়িয়াছেন।

তত্পরি উল্লেখিত ব্যাখ্যা অনুসারে কোরআনের বিধান লঙ্ঘন হয় না, অথচ সুযোগ-সুবিধাও ঠিকমতেই লাভ হয় যে—বারংবার নামাযের ব্যবস্থায় ব্যাপৃত হইতে হইল না। সফর অবস্থায় সকলে একত্রিতরূপে জমাতের সহিত নামাযের ব্যবস্থা করা সহজ ব্যাপার নহে এবং বারংবার এরূপ করায় অনেক সময় ব্যয় বাহা ভ্রমণ অবস্থায় ক্ষতিকরও বটে।

৫৮৯। হাদীছঃ—এমান ইবনে হোসাইন (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার অর্শ রোগ ছিল, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট নামাযের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন—প্রথমতঃ নামাযে দাঁড়াইয়া পড়ারই চেষ্টা কর, সম্ভব না হইলে বসিয়া পড়, তাহাও সম্ভব না হইলে শোয়াবাস্থায় পড়।

৫৯০। হাদীছঃ—এমান ইবনে হোসাইন (রাঃ) অর্শ রোগে আক্রান্তছিলেন ; তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বসিয়া নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, দাঁড়াইয়া পড়া উত্তম ; বসিয়া পড়িলে দাঁড়াইয়া পড়ার অর্ক ছওয়াব হইবে, আর শুইয়া পড়িলে বসিয়া পড়ার অর্ক ছওয়াব হইবে।

ব্যাখ্যা :—দাঁড়াইবার পূর্ণ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নফল নামায বসিয়া পড়িলে শুদ্ধ হয়, অবশ্য উহাতে অর্ধেক ছওয়াব হয়, কিন্তু দাঁড়াইবার বা বসিবার সামর্থ্য থাকিলে শুইয়া নফল নামাযও শুদ্ধ হয় না। ফরজ নামায দাঁড়াইয়া পড়ার সামর্থ্য না থাকিলে বসিয়া (রুকু সেজদায় সামর্থ্য না হইলে মাথার ইশারায়) শুদ্ধ হইবে এবং পূর্ণ ছওয়াবই হইবে, বসিয়া পড়ার সামর্থ্য (অন্তের সাহায্যেও) না থাকিলে শুইয়া পড়িবে তাহাতেও পূর্ণ ছওয়াবই হইবে।

আর এক অবস্থা এই যে, দাঁড়াইয়া পড়ার সাধারণ সামর্থ্য নাই, হাঁ—এত অধিক কষ্ট করিলে দাঁড়াইয়া পড়িতে পারে যেরূপ কষ্ট করার জন্ত শরীয়ত মানুষকে বাধ্য করে নাই—সে ক্ষেত্রে বসিয়া ফরজ বা নফল নামায শুদ্ধ হইবে এবং ছওয়াবও পূর্ণ হইবে। অবশ্য ঐ অবস্থায় যদি অধিক কষ্ট স্বীকার করিয়া দাঁড়াইয়া নামায পড়ে তবে অধিক কষ্ট স্বীকার করার অধিক ছওয়াব যোগ হইয়া দ্বিগুণে পরিণত হইবে, কলে ঐ অবস্থায় বসিয়া নামায পড়ার পূর্ণ ছওয়াবই এই দ্বিগুণ ছওয়াবের অর্ধেকের পরিণত হইবে। তজ্জনপই যদি বসিয়া নামায পড়ার সাধারণ সামর্থ্য নাই, হাঁ—এত অধিক কষ্ট করিলে বসিয়া পড়িতে পারে যেরূপ কষ্ট করার জন্ত শরীয়ত মানুষকে বাধ্য করে নাই—সে ক্ষেত্রে শুইয়া নামায শুদ্ধ হইবে এবং পূর্ণ ছওয়াবই হইবে; কিন্তু অধিক কষ্ট সহ্য করিয়া বসিয়া পড়িলে দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হইবে। আলোচ্য হাদীছে এই অবস্থার নামাযই উদ্দেশ্য।

শুইয়া নামায পড়িলে প্রথমতঃ কেবলামুখী কাত হইয়া শোয়ার চেষ্টা করিবে; সেই সামর্থ্য না হইলে কেবলা দিকে পা (সামর্থ্য হইলে হাটু খাড়া রাখিয়া) এবং পূর্ব দিকে মাথা এইভাবে চিত হইয়া শুইবে (কতছল-বারী, ২—৪৭০)। কিন্তু রুকু-সেজদা ইশারায় মাথা দ্বারা করিতে হইবে, শুধু চোখের ইশারা করিলে তাহাতে নামায হইবে না।

● বিশিষ্ট তাবেয়ী আতা (রঃ) বলিয়াছেন, রোগ ইত্যাদি কোন কারণে কেবলামুখী হওয়ার সামর্থ্য বা সুযোগ মোটেই না থাকিলে যেই দিকমুখী আছে সেই দিকেই নামায পড়িবে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এইরূপ হয়।

● দাঁড়াইতে সামর্থ্য ব্যক্তি বসিয়া রুকু সেজদার সহিত নামায আদায় করিতেছে; নামাযের মধ্যে দাঁড়াইতে সামর্থ্যবান হইয়া গেল—তাহাকে অবশিষ্ট নামায দাঁড়াইয়া পূর্ণ করিতে হইবে, অত্থায় তাহার নামায হইবে না। রুকু-সেজদায় অসমর্থ্য ব্যক্তি বসিয়া ইশারায় নামায আদায় করিতেছে, রুকু পূর্বে যদি সে রুকু সেজদার সামর্থ্যবান হইয়া যায় তবে সে ঐ নামায ভঙ্গ না করিয়াই রুকু সেজদার সহিত উহা পূর্ণ করিবে। আর যদি ইশারায় রুকু আদায় করার পর সামর্থ্যবান হইয়া থাকে তবে সেই নামায ভঙ্গ করিয়া নূতন নিয়্যতে পূর্ণ নামায রুকু-সেজদার সহিত আদায় করিতে হইবে। বসার অসামর্থ্য ব্যক্তি শুইয়া নামায পড়িতেছে; এইরূপ ব্যক্তি যে কোন অবস্থায় বসিতে বা দাঁড়াইতে সামর্থ্য হইয়া গেলে তাহাকে নূতন নিয়্যতে পূর্ণ নামায আদায় করিতে হইবে।

তাহাজ্জুদ-নামাযের বিবরণ

তাহাজ্জুদ-নামায সুন্নত, কিন্তু অতি মঙ্গল ও কল্যাণময় নামায। তাহাজ্জুদ নামাযের নৈশিষ্ঠ্য অগণিত ও অপরিমিত। ইহা আল্লাহ তায়ালায় নিকট অত্যন্ত পছন্দীয় এবাদত। ইসলামের প্রথম যুগে এই নামায করজ ছিল এবং পরিমাণও নির্ধারিত ছিল—রাতের দুই তৃতীয়াংশ বা অর্ধ কিম্বা তৃতীয়াংশ; ইহার কম নহে। পবিত্র কোরআন ২৯ পারা ছুরা মোজাম্মেলে এই আদেশই হয়—

يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۖ نَفْخَ آوَانُكُمْ مِنْهُ قَلِيلًا ۖ
أَوْزُنْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۖ

“হে কমলীওয়ালা! নামাযে দাঁড়াইয়া রাতে যাপন কর—রাতের অর্ধ বা হইতে কিছু কম, কিম্বা অর্ধেকের বেশী এবং কোরআন সুস্পষ্ট ও ধীরভাবে পড়িও।”

এই পরিমাণকে পূর্ণ ও অকুণ্ণ রাখাও কম কঠিন নহে, বিশেষতঃ ঘড়ি-ঘণ্টাবিহীন যুগে। ইমরত নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসালামের ছাহাবীগণ সাক্ষ্যে মূলকভাবে রাতের অধিক অংশই তাহাজ্জুদে কাটাইয়া দিতেন। এইরূপ কষ্ট ও যত্নের সহিত দীর্ঘ এক বৎসরকাল তাহাজ্জুদে-নামাযের করজ কর্তব্য আদায় করিয়া যাওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা দয়া পরবশ হইয়া বান্দাদের কষ্ট লাঘবের জন্য তাহাজ্জুদ-নামায করজ হওয়া রহিত করিয়া দেন এবং উহার নির্ধারিত পরিমাণের বাধ্যবাধকতাও রহিত করিয়া দেন। উল্লেখিত ছুরারই শেষভাগে এই রহিতের বিধান আয়াত রহিয়াছে; যাহা এক বৎসর পর অবতীর্ণ হইয়াছিল।

তাহাজ্জুদ করজ হওয়া রহিতের পরও আল্লাহ তায়ালা তাঁহার অতি আদরের ও সন্তুষ্টির নামায তাহাজ্জুদের প্রতি বান্দাদিগকে আকৃষ্ট ও যত্নবান রাখিবার জন্য স্বীয় রসূলকে সম্বোধন করার মাধ্যমে আদেশবোধক শব্দের সহিত এই আয়াতটি নাসেল করেন—(১৫ পাঃ ২ কঃ)

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ۖ نَافِلَةً لَّكَ ۚ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۖ

“হার রাতের অংশবিশেষ আপনি তাহাজ্জুদ পড়ুন—যাহা (পাঁচ পয়াক্তের উপর) অতিরিক্ত (নামায); আপনার মঙ্গল ও লাভের জন্য। আশাযিত থাকুন, আপনার পরওয়ারদেগার আপনাকে “মাকামে-মাহমুদ” দানে গৌরবান্বিত করিবেন।”

আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির সেরা প্রিয়তম হাবীব সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলকে মর্যাদার সর্বোচ্চ চূড়ামণি “মাকামে মাহমুদ” লাভের আশা দান কেন্দ্রে তাহাজ্জুদের সাহায্য-গ্রহণ উল্লেখ করিয়াছেন।

বস্তুত: পরকালের উন্নতি ও আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভে তাহাজ্জুদের হ্রাস অধিক ফলদায়ক এবাদত আর নাই। তাহাজ্জুদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনার আল্লাহ তায়ালার বলিয়াছেন—

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً . إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا.....

“নিশ্চয় (তাহাজ্জুদের জন্ত) রাতে নিজা ত্যাগ করিয়া উঠা নফছ বা রিপুকে আল্লাহ পানে বশ করিতে শক্ত প্রতিক্রিয়াবান এবং ঐ সময় মুখের বাক্যও অতি মাজিত ও ক্রীয়াশীল হয়; (গভীর অন্তর হইতে বাহির হয়, মনের উপর রেখাপাত কর এবং দেহের ও চোখের উপরও ক্রিয়া করে)। দিনের বেলা বিভিন্ন লিপ্ততা থাকে; রাতে উহা থাকে না, তাই তখন আল্লাহর জিকর করত: সব কিছু হইতে কাটিয়া এক আল্লাহতে মগ্ন হও (ইহা তখন সহজ)।”

সব চেয়ে বড় কথা এই যে, তাহাজ্জুদের যে সময় তথা রাত্রে শেষ তৃতীয় ভাগ ঐ সময় আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নূর এবং রহমতের বিশেষ দৃষ্টি বন্দাদের অতি নিকটবর্তী হয় এবং স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার গোনাহ মাফ করিবার জন্ত, মনোবাঞ্ছা দানের জন্ত, দোয়া করার জন্ত বন্দাদিগকে ডাকিতে থাকে (৬০৬ নং হাদীছ)।

এবাদতের জন্ত নিশি-রাত্রে নিজাত্যাগীদের প্রশংসায় আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াত নাযেল করিয়াছেন। যথা—

تَسْتَجِبُ لِي جُنُودُهُمْ مِنَ الْمَفَاجِيعِ.....فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ...

“আমার বিশিষ্ট বন্দাগণ এইরূপ হন—মধুর নিজা ভঙ্গ করত: তাঁহাদের পার্শ্বদেশ শয্যা পরিত্যাগ করে। তখন তাঁহারা স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারের হজুরে অর্চনা-আরাধনায় নিমগ্ন হন আশা এবং ভয়ের মধ্যে। আর আমার দেওয়া ধন হইতে আমার জন্ত ব্যয় করেন। অতএব আমি তাঁহাদের জন্ত চোখ-জুড়ানো নেয়ামত কি কি এবং কি পরিমাণ রাখিয়া দিয়াছি (মানবীয় দৃষ্টি ও অনুমানের) অন্তরালে—তাহা কাহারও বোধগম্য নহে। (২১ পা: ১৫ রু:)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ - إِيَّاهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُكْسَنِينَ - كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ - وَبِأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝

“নিশ্চয় খোদাতীক লোকগণ পরকালে বাগ-বাগিচা ও বারগা-ফোয়ারার মধ্যে স্থান লাভ করিবেন; উপভোগ করিতে থাকিবেন অসংখ্য নেয়ামত যাহা তাঁহাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার তাঁহাদিগকে দিবেন। তাঁহারা জাগতিক জীবনে নেককার ছিলেন, রাত্রে কম অংশই তাঁহারা ঘুমাইতেন। এবং ভোর রাতে তাঁহারা তওবা-এস্তেগফার—ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন।” (২৬ পা: ১৮ রু)

৫৯২। হাদীছ :- আবুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালামাহু আলাইহে অসাল্লামের বমানায় যে কোন ব্যক্তি কোনও স্বপ্ন দেখিলে তাহা হয়রতের নিকট নয়ান করিত। আমার অন্তরে সর্বদাই এই আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, আমি যেন কোন স্বপ্ন

দেখি এবং উহা হযরতের নিকট বয়ান করিতে পারি। আমি যুবক ছিলাম, আমার কোন সংসার ছিল না; আমি মসজিদে ঘুমাইতাম। একদা আমি স্বপ্নে দেখিলাম—আমার হাতে যেন একটি রেশমী কাপড়ের টুকরা, আমি বেহেশতের যে কোন স্থানে যাইতে ইচ্ছা করি ঐ রেশমী কাপড়ের টুকরাটি আমাকে লইয়া উড়িয়া যায়। আমি আরও দেখিলাম, যেন, দুই জন ফেরেশতা আমাকে ধরিয়া দোষখের নিকট লইয়া গেলেন। আমি দেখিলাম—দোষখ অতি গভীর, চতুর্পার্শ্বে ঘেরাও করা কুপের স্থায় এবং উহার দুই দিকে দুইটি খুঁটিবিশেষ আছে। উহার মধ্যে কতিপয় মানুষ দেখিতে পাইলাম যাহাদিগকে আমি চিনি। তখন আমি বলিতে লাগিলাম—**اعوز بالله من النار** “আমি দোষখ হইতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি।” পরে তৃতীয় এক ফেরেশতার সাক্ষাৎ হইল, তিনি বলিলেন, আপনি ভীত হইবেন না।

আমি এই স্বপ্ন (আমার ভগ্নি হযরতের বি।) হাফছাহ রাজিয়াল্লাহু আনহার নিকট ব্যক্ত করিলাম। তিনি উহা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট বয়ান করিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, আবহুল্লাহ অতি ভাল লোক; যদি সে তাহাজ্জুদ-নামাযের অভ্যস্ত হয় (তবে আরও অধিক উত্তম গণ্য হইবে)। এই ঘটনার পর আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) খুব কম সময়ই ঘুমাইতেন; অধিকাংশ রাত্র তাহাজ্জুদ-নামাযেই কাটাইতেন।

তাহাজ্জুদের প্রতি লোকদিগকে আগ্রহান্বিত করা চাই

৫৯৩। হাদীছঃ—আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা অধিক রাত্রিকালে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় কন্যা ফাতেমা (রাঃ) ও জামাতা আলী রাজিয়াল্লাহু আনহার নিকট তশরীফ আনিলেন এবং তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা তাহাজ্জুদ পড় না? আলী (রাঃ) বলেন—আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ (দঃ)। আমার আত্মা আল্লাহ তায়ালার হাতে; তিনি যখন ইচ্ছা করিবেন তখন আমাদিগকে জাগাইয়া দিবেন। এই উত্তর শুনিয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আর কোন প্রতিউত্তর না করিয়া চলিয়া গেল এবং চলিয়া যাওয়ারাকালীন অনুতপ্ত হইয়া এই আয়াত পাঠ করিলেন—**وكان الانسان اكثر شيع جد لا** “মানুষ বড়ই তর্কবাজ।”

৫৯৪। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এ'তেকাক অবস্থায় একদা রাত্রে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মসজিদে নানায আরম্ভ করিলেন, কিছু সংখ্যক লোক তাহার নামাযে शामिल হইল। ভোর হইলে লোকগণ এই নামাযের আলোচনা করিল, ফলে দ্বিতীয় রাত্রেও রসূলুল্লাহ (দঃ) নানায পড়িলেন তখন অধিক লোক সমবেত হইল। আজও ভোর হইলে পর লোকদের মধ্যে আলোচনা হইল, ফলে তৃতীয় রাত্রে আরও অধিক লোকের সমাগম হইল এবং তাহারা হযরতের নামাযে शामिल হইয়া নামায

বিশেষ দৃষ্টব্য :—তাহাজ্জুদ নামায আল্লাহ তায়ালায় অতি পছন্দনীয় নামায; পূর্বে উহা ফরজই ছিল। মানুষের কষ্ট লাভবের জন্ত আল্লাহ তায়ালা ইহার ফরজ হওয়া রহিত করিয়াছিলেন। এখন সেই লোকদেরই এই অপূর্ব আশ্রয় এবং তৎপরতার পরিশ্রমিতে হয়ত আল্লাহ তায়ালা পুনঃ তাহার পছন্দনীয় তাহাজ্জুদকে ফরজ করিয়া দিতে পারেন, ফলে পরবর্তী লোকদের জন্ত অধিক কষ্টের কারণ হইবে। তাই রশ্বুল্লাহ (সঃ) উহার তৎপরতাকে অহী অবতীর্ণের সময়ে বাসন করিয়াছেন। হযরতের পরে ওহী চিরতরে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নূতনভাবে কিছু ফরজ হওয়ার অবকাশ থাকে না।

৫৯৫। হাদীছ :—মুগীরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছালামাহ্ আলাইহে
 অসাল্লাম নামায়ে অধিক দাঁড়াইয়া থাকায় তাঁহার পা-দ্বয় ফুলিয়া যাইত (আয়েশা
 রাদ্জিয়ালাহ্ তায়ালা আনহার বর্ণনায় আছে—পদদ্বয় ফাটিয়া যাইত। এই বিষয় তাঁহাকে
 কিছু বলা হইলে তিনি এই উত্তর দিতেন, আমি কি আল্লার শোকর-গোজার—কৃতজ্ঞতা
 পালনকারী বন্দা হইব না?

৫৯৬। হাদীছ :—আবুহুসাইফ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু
অলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আল্লার নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় নামায দাউদ আলাইহে-
চ্ছালামের নামায এবং সর্বাধিক পছন্দনীয় রোযা দাউদ আলাইহেচ্ছালামের রোযা।
দাউদ (আঃ) প্রথমে অর্ধ রাত্রি ঘুমাইতেন, অতঃপর এক তৃতীয়াংশ নামায পড়িতেন,
তারপর বাকি ষষ্ঠাংশ পুনরায় ঘুমাইতেন এবং একদিন রোযা রাখিতেন আর একদিন
আহার করিতেন। (ইহাতে তাঁহার দৈহিক শক্তি অটুট থাকিত;) তিনি জেহাদে দৃঢ়
থাকিতেন—পশ্চাদপদ হইতেন না।

৫৯৭। হাদীছ :—মসরুফ (র:) আয়েশা (রা:)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, নবী ছালাল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম কেমন আমলকে অধিক পছন্দ করিতেন? তিনি বলিলেন, যে আমল

৬০২। হাদীছ :- আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে
অসাল্লাম কোন মাসে একাধারে বেরোয়া দিন কাটাইতেন ; আমরা ধারণা করিলাম, এই

মাসে তিরি রোযা রাখিবেন না (কিন্তু শেষে রোযা রাখিতেন)। কোন মাসে একাধারে রোযা রাখিতে থাকিতেন; আমরা ধারণা করিতাম, এই মাসে বে-রোযা থাকিতেন না, (শেষে বে-রোযাও হইতেন।) এবং তাঁহাকে রাত্রিকালে (ভিন্ন ভিন্ন সময়ে) নিদ্রিতও দেখা যাইত, নামায পড়িতেও দেখা যাইত।

তাহাজ্জুদের পর নিজা যাওয়া

৬০৩। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা ককিয়াছেন, নবী (দঃ) আমার গৃহে থাকার প্রতি দিনই দেখিয়াছি, তিনি রাত্রে শেষ অংশে নিজা যাইতেন। (১৫২ পৃঃ)

ব্যাখ্যা :—তাহাজ্জুদের পর ফজরের নামাযের পূর্বে একটু সময় নিজা গেলে শরীরের অবসাদ দূর হয়; হয়রত (দঃ) অনেক সময় তাহা করিতেন। তবে ফজরের জমাতে কোন-রূপ ব্যাপাত না ঘটে সেই লক্ষ্য ও ব্যবস্থা অবশ্যই রাখিতে হইবে। কোন সময় হয়রত (দঃ) স্বীয় বিবির সহিত কথাবার্তাও এই সময়টুকু কাটাইতেন। (৬১৫নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)

রমযান মাসে হয়রত (দঃ) তাহাজ্জুদ পড়িয়া সেহেরী খাইতেন, তৎপর না ঘুমাইয়া অনতিবিলম্বেই ফজর নামায পড়িতেন—৩৫৪নং হাদীছে বর্ণনা রহিয়াছে।

তাহাজ্জুদ না পড়িলে শয়তানের কু-মন্ত্র ক্রিয়া করে

৬০৪। হাদীছ :—আবু হোরায়ারা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, নিদ্রিত ব্যক্তির ঘাড়ের উপর শয়তান এই মন্ত্র পড়িয়া তিনটি গিরা লাগায়—**عليك ليل طويل فارقد** এখনও রাত্রি অনেক বাকী আছে, তুমি নিদ্রায় থাক।

প্রত্যেকটি গিরা লাগাইবার সময় উক্ত মন্ত্র পড়িয়া থাকে। যদি ঐ ব্যক্তি রাত্রে জাগ্রত হইয়া আল্লাহ নাম উচ্চারণ করে তবে একটি গিরা খুলিয়া যায়। অতঃপর যদি সে অঙ্ক করে তবে আর একটি গিরা খুলিয়া যায়, তারপর যদি নামায পড়ে তবে অবশিষ্ট গিরাটিও খুলিয়া যায় এবং হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে, পুলকিত মনে ও আনন্দের সহিত তাহার ভোর হয়। নতুবা বলুযিত অবস্থায় তাহার ভোর হয়।

● যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা কোরআন পাক ইয়াদ ও হেফজের দৌলত দান করিয়াছেন তাহাদের বিশেষ কর্তব্য তাহাজ্জুদ পড়া এবং তাহাজ্জুদে কোরআন তেলাওয়াত করা। অকথ্য যদি তাহারা বিভিন্ন বড় গোনাহের কারণে শাস্তি প্রাপ্ত হয় তবে সেই সঙ্গে তাহাজ্জুদ না পড়ারও এক বিশেষ আজাব তাহাদের উপর হইবে যে—কবরের মধ্যে একটি পাথরের আঘাতে তাহাদের মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে থাকিবে। এই তথ্য সুদীর্ঘ হাদীছের অংশবিশেষ হাদীছটি কবরের আজাব পরিচ্ছেদে প্রস্তুত হইবে।

যে ব্যক্তি সারারাত্র নিজামগ্ন থাকে শয়তান তাহার কানে প্রস্তাব করে

৬০৫। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে এক ব্যক্তির আলোচনা হইল। একজন তাহার প্রতি অভিযোগ

করিল, সে সারারাত্ৰ নিজায় কাটাইয়াছে, নামাযের জ্ঞান জ্ঞাত হয় নাই। রসূলুল্লাহ (স:) বলিলেন, শয়তান তাহার কানে প্রস্রাব করিয়া দিয়াছে।

শেষ রাত্রে নামায পড়া ও দোয়া করা

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّذِينَ مَا يَهْتَمُّونَ وَبِالْأَسْكَارِهِمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝

অর্থ—আল্লাহ তায়ালা (বেহেশত লাভকারী মোস্তাকীপণের বিশেষ গুণ বর্ণনায়) বলিয়াছেন—“তাহারা রাত্রে অতি কম নিজা যাঁইয়া থাকিত এবং শেষ রাত্রে তাঁহারা গোনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ফরিয়াদ করিয়া থাকিত।” (২৬ পা: ১৮ কঃ)

৬০৬। হাদীছ :—আবু হোরায়ারা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক রাত্রেই যখন উহার শেষ তৃতীয়াংশ বাকী থাকিয়া যায় তখন আমাদের স্মৃতিকর্তা (আল্লাহ তায়ালা বন্দাদের অতি নিকটবর্তী হন, এমনকি জমিনের) সর্বাধিক নিকটস্থ আসমানে তাঁহার অবতরণ তথা বিশেষ তাজ্জালী হয় (যাহা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্ত কোন সময় হয় না।) স্বয়ং তিনি স্বীয় বন্দাদিগকে ডাকিতে থাকেন এবং ঘোষণায়ুক্ত এই আহ্বান জানাইতে থাকেন—

مَنْ يَدْعُونِي فَاسْتَجِبْ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرْ لَهُ -

“কে আমাকে ডাকিবে? আমি তাহার ডাকে সাড়া দিব। কে আমার নিকট প্রার্থী হইবে? আমি তাহাকে দান করিব। কে আমার নিকট ক্ষমা চাহিবে? আমি তাহাকে ক্ষমা করিব।”

ব্যাখ্যা :—প্রত্যেক ক্রিয়াপদের আকার, রূপ ও কৌশল প্রণালীর ধরণ ও রকম উহার কর্তাপদের উপযোগী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়াই অবধারিত। এখানে ক্রিয়াপদ হইল **يُنْزِلُ** অর্থ অবতরণ করা, কর্তাপদ হইল **رَبَّنَا** অর্থ পালনকর্তা আল্লাহ তায়ালা। আল্লাহ তায়ালা নিরাকার, নিরাধার, অতুলন; তাই তাঁহার সঙ্গে যে ক্রিয়াপদের সম্পর্ক হইবে সেই ক্রিয়াপদও অনুরূপই হইবে।

ইমাম মালেক (র:) এ বিষয়ে বলিয়াছেন—উঠা, বসা, অবতরণ করা ইত্যাদি ক্রিয়াপদ যখন আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে ব্যবহৃত হইবে, তখন লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, এসব ক্রিয়াপদের মূল অর্থ সুস্পষ্ট, কিন্তু নিরাকার নিরাধার অতুলন কর্তাপদের সংযোগ হিসাবে উহার ধরণ ও রকম অবোধ্য; এই বিষয়ে খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসাবাদ বা আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক অবৈধ।

তাই মোসলমানগণ যেরূপ নিরাকার নিরাধার অতুলন আল্লাহ তায়ালা প্রতি ঈমান রাখিয়া থাকে, তদ্রূপ এসব ক্রিয়াপদও যখন কোরআন বা হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত হইবে তখন এই সবার প্রতিও অনুরূপ ঈমান রাখা মোসলমান মাত্রেই অবশ্য কর্তব্য হইবে।

তাহাজ্জুদ নামাযের সময় শেষ রাত্রে

৬০৭। হাদীছ :—আয়েশা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালামাহ আল্লাইহে অসাল্লাম রাত্রে প্রথম দিকে ঘুমাইতেন এবং শেষের দিকে তাহাজ্জুদ পড়িতেন, তারপর বিছানায় আসিতেন। (কোন দিন এইরূপ হইত যে, ঐ সময় হযরত (দ:) স্ত্রী ব্যবহার করিতেন, অতএব) মোরাজ্জেন ফজরের আজান দেওয়ার সাথে সাথে হযরত (দ:) উঠিয়া যাইতেন এবং গোসলের প্রয়োজন থাকিলে গোসল করিতেন, নতুবা শুধু অজু করিয়াই নামাযের জ্ঞা যাইতেন।

বিশেষ জ্ঞপ্তি :—তাহাজ্জুদ ও বেতের নামায সমাপ্তের পর ফজরের জমাতে যাওয়া পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়টুকুতে নবী ছালামাহ আল্লাইহে অসাল্লামের কার্যক্রম তাঁহার শারীরিক অবস্থা, রাত্রে ঠাণ্ডা-গরম, নিদ্রা-অনিদ্রা এবং ছোট-বড় ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থার পরি-শ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ছিল। অধিকাংশ সময় হযরত (দ:) তাহাজ্জুদ ও বেতের নামায ছোবহে-ছাদেকের পূর্ব-মুহূর্তে সমাপ্ত করিতেন এবং ফজরের আজান হইলে পরই ফজরের জুই রাকাত ছন্নত পড়িতেন ; আয়েশা (রা:) বর্ণিত ৬৮১ ও ৬১৮ নং হাদীছে এবং আবুহুলাহ ইবনে ওমর (রা:) বর্ণিত ৬২৫নং হাদীছে ইহাই উল্লেখ হইয়াছে। অতঃপর সাধারণতঃ গৃহিণী জাগ্রত থাকিলে বসা বা ডান কাতে শায়িত অবস্থায় তাঁহার সহিত কথাবার্তায় সময় কাটাইতেন, নতুবা ডান কাতের উপর আরাম করিতেন। আয়েশা (রা:) বর্ণিত ৬১৫নং হাদীছে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। অনেক সময় এই অবকাশে হযরত (দ:) নিদ্রাও যাইতেন ; আয়েশা (রা:) বর্ণিত ৬০৩নং হাদীছে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। কদাচিত হযরত (দ:) এই সময় স্ত্রী-ব্যবহারও করিতেন ; আলোচ্য ৬০৭নং হাদীছে ইহার উল্লেখ হইয়াছে। সময়ে এরূপও হইয়াছে যে, হযরত (দ:) তাহাজ্জুদ ও বেতের নামায ছোবহে-সাদেক নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বেই সমাপ্ত করিয়াছেন এবং ফজরের ছন্নত পড়ার পূর্বেই গভীর নিদ্রারত হইয়াছেন, অতঃপর ফজরের আজান দেওয়ার পর মোরাজ্জেন হযরত (দ:)কে নিদ্রা হইতে উঠিয়া ফজরের জুই রাকাত ছন্নত পড়িয়া জমাতের জ্ঞা গিয়াছেন ; ইবনে আব্বাস (রা:) বর্ণিত ১০৯নং হাদীছে ইহার বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে। নিদ্রার পরে ফজরের নামাযের জ্ঞা কোন কোন সময় হযরত (দ:) পুনঃ নূতন অজু করা ব্যতিরেকে নিদ্রার পূর্বের অজু দ্বারাই ফজর নামায পড়িতেন। কারণ, নবীদের নিদ্রায় অজু ভঙ্গ হয় না : ১০৯ নং হাদীছে ইহার স্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে। কোন কোন সময় নিদ্রার পর ফজরের নামাযের জ্ঞা নূতন অজু করিতেন, আর গোসলের প্রয়োজন থাকিলে গোসল অবশ্যই করিতেন ; আলোচ্য ৬০৭নং হাদীছে ইহারই উল্লেখ আছে। রমজানের সময় হযরত (দ:) তাহাজ্জুদ ও বেতের হইতে অবসর হইয়া শেষ সময়ে সেহরী খাইতেন এবং সেহরী খাওয়ার অল্প পরেই ফজরের নামাযে যাইতেন ; আনাছ (রা:) বর্ণিত ৩৫৪ নং হাদীছে ইহার বর্ণনা রহিয়াছে।

মহআলাহ :- তাহাজ্জুদ নামাযের সময় সাধারণতঃ শেষ রাত্রেই বটে, কিন্তু শেষ রাত্রে জাগ্রত হওয়ার সামর্থ্য বা ভরসা না থাকিলে এশার নামাযের পরে বেতেরের পূর্বে কিছু নফল পড়িবে ; এই নফল পড়িলে তাহাজ্জুদের কজিলত হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইবে না।

মহআলাহ :- কোন দিন শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদ ছুটিয়া গেলে সূর্য্য উদয়ের পর জোহর নামাযের পূর্ব পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে তাহাজ্জুদের কাজা স্বরূপ স্বীয় অভ্যাসের পরিমাণে এবং অভ্যাস পরিমাণ কেব্রাতে নফলের নিয়াতে নামায পড়িয়া নিবে ; আশা করা যায় এই নামায তাহার অভ্যস্ত তাহাজ্জুদের সমতুল্য পরিগণিত হইবে। (এলাউন সুনান ৭—৭৮)

রসুলুল্লাহ (দঃ) রমজান শরীফেও তাহাজ্জুদ পড়িতেন

৬০৮। হাদীছ :- আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল—রসুলুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লাম রমজান শরীফের রাত্রে নামায কিরূপ পড়িতেন ? আয়েশা (রাঃ) উত্তর করিলেন, তিনি রমজান শরীফে এবং রমজান ছাড়া অন্ত্র সময়ে (শেষ রাত্রে) এগার রাকাতের বেশী পড়িতেন না। প্রথম ধাপে (দুই দুই রাকাত করিয়া) চার রাকাত পড়িতেন যাহা বর্ণনাতীত সুন্দর ও লম্বা হইত। তারপর আবাব (একপেই) চার রাকাত পড়িতেন, তারপর তিন রাকাত (বেতের) পড়িতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন—একদা আমি তাঁহার খেদমতে আরজ করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনি বেতের না পড়িয়া শুইয়া পড়েন ? হযরত (দঃ) বলিলেন, আমার চক্ষুদ্বয় নিদ্রামগ্ন হয়, কিন্তু কাল্ব (দিল) জাগ্রতই থাকে।

● ঐ সময় জমাতের সহিত নিয়মিতরূপে তারাবীহ পড়া হইত না। তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) রমজান শরীফেও বেতের নামায তাহাজ্জুদের সঙ্গেই পড়িতেন।

পাঠকবৃন্দ! লক্ষ্য রাখিবেন, বোখারী (রঃ) আলোচ্য হাদীছকেও তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে সাব্যস্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃই এই হাদীছ তারাবীহ সম্পর্কে সাব্যস্ত নহে। কারণ, ইহাতে রমজান ও রমজান ছাড়া—উভয়েরই উল্লেখ হইয়াছে। অর্থাৎ অত্র হাদীছে এইরূপ নামাযের বর্ণনা করা হইয়াছে যে নামায রমজান ছাড়াও পড়া হয়। অতএব এই হাদীছের উদ্দেশ্য তারাবীর নামায হইতে পারে না ; উহা রমজান ব্যতীত পড়া হয় না। হাঁ—তাহাজ্জুদ নামায উভয় সময়ে পড়া হয়, সুতরাং ইহাই এই হাদীছের উদ্দেশ্য এবং উহারই সংখ্যা আট রাকাত বলা হইয়াছে।

৬০৯। হাদীছ :- আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি কখনও রসুলুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লামকে তাহাজ্জুদের নামাযে বসিয়া কেব্রাত পড়িতে দেখি নাই। অবশ্য বার্মাকো পতিত হওয়ার পর হযরত (দঃ) বসিয়া কেব্রাত পড়া আরম্ভ করিতেন, কিন্তু যখন ত্রিশ-চল্লিশ আয়াত বাকি থাকিত তখন দাঁড়াইয়া যাইতেন এবং উহা পড়িয়া রুকু করিতেন।

প্রত্যেক অজুর পরে নামায পড়ার ফজিলত

৬১০। হাদীছ :—আবু হোরাযরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফজরের নামাযান্তে বেলাল (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বেলাল! বল ত, তোমার নিকট সর্বাধিক আশার যোগ্য আমল কি আছে? আমি বেহেশতে আমার আগে তোমার পদ চালনার শব্দ শুনিতে পাইয়াছি। বেলাল (রাঃ) আরজ করিলেন, ঐরূপ আমল আমার ধারণায় এই যে, আমি রাত্রে বা দিনে যে কোন সময় অজু করি তখনই ভাগ্যানুরূপ কিছু নামায পড়িয়া থাকি।

নফল এবাদতে প্রাবল্য ও কঠোরতা অবলম্বন করিবে না

৬১১। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিজ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া একটি রশি টাঙ্গানো দেখিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই রশি এখানে টাঙ্গানো কেন? সকলেই উত্তর করিল, যয়নব (রাঃ) ইহা টাঙ্গাইয়াছেন; তিনি নামায পড়িতে পড়িতে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়েন তখন উহার সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। এতদশ্রবণে নবী (দঃ) বলিলেন, এরূপ করার কোনই প্রয়োজন নাই; রশি খুলিয়া ফেল। প্রত্যেকের উচিত, যতক্ষণ মনের প্রফুল্লতা থাকে, ততক্ষণ (নফল) নামায পড়িতে থাকা। যখন ক্লান্তি বোধ হয় তখন বিশ্রাম লইবে। (এখানে ৩৯ নং হাদীছও উল্লেখ আছে।)

তাহাজ্জুদ পড়ার অন্ত্যাস ত্যাগ করা চাই না

৬১২। হাদীছ :—আবহল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রহুল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে বলিলেন, হে আবহল্লাহ! অযুক ব্যক্তির হায কখনও হইও না; সে তাহাজ্জুদ পড়িয়া থাকিত, কিন্তু এখন ছাড়িয়া দিয়াছে।

রাত্রিবেলা নিজা ভঙ্গ হইলে বা নিজা না আসিলে নামায পড়া

৬১৩। হাদীছ :—ওবাদাহ ইবনে ছামেঃ (রাঃ) নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রাত্রে নিজা ভঙ্গ হইলে এই দোয়া পড়িবে—

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ

(ঐ ব্যক্তির সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া সে মায়ের গর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হওয়ার দিনের হায পাক-সাক হইয়া যাইবে। ফতহুল বারী, ৩—৩১)। আর ঐ সময় যে কোন দোয়া

* এই হাদীছে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয় যে, ফজরের দুই রাকাত স্মৃত পড়িয়া ডান কাতের উপর শোয়া ইহা নির্দ্বন্দ্বিত স্মৃত তারিকা নহে। কারণ, ইহা রসুল্লাহ ছালাল্লাহ আলাইহে অসালামের নিদিষ্ট অভ্যাস ছিল না। ৬০৭ নং হাদীছের বিশেষ দ্রষ্টব্যেও এ ক্ষেত্রে হয়তের বিভিন্ন রকম কার্যক্রম প্রমাণ করা হইয়াছে। সুতরাং শুধুমাত্র শোয়া কার্যকে নিয়মিতরূপে অবলম্বন করা স্মৃত তারিকা গণ্য হইবে না। বিশেষতঃ মসজিদে এরূপ শোয়া মোটেই স্মৃত তারিকা নহে। রসুল্লাহ (দঃ) মসজিদে এরূপ গুইয়াছেন এরূপ একটি ঘটনাও প্রমাণিত নাই।

অগ্রসর হইতে চায় তখন তাহার অবশ্য কর্তব্য এই—প্রথমে ছই রাকাত নফল নামায পড়িবে, অতঃপর এই দোয়া পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ
اَلْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَالَمُ الْغِيُوْبِ
اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَمَا قَبْلَهُ
اَمْرِيْ وَمَا جِلَّهُ وَاَجَلُهُ فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ
اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَمَا قَبْلَهُ اَمْرِيْ وَمَا جِلَّهُ
فَاَصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاَصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاَقْدِرْ لِيْ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْفِنِيْ بِـ ۵ ۰

ছই স্থানে “হুই الامর” উচ্চারণের সময় স্বীয় উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিবে।

দোয়াটির অর্থ—হে আল্লাহ! তুমি যাহা ভাল বলিয়া জান উহাই আমি তোমার নিষ্কট প্রার্থনা করি এবং তোমার কুদরত ও শক্তির সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তোমার মেহেরবানীর কিছু অংশ ভিক্ষা চাই। নিশ্চয় তুমি সর্বশক্তিমান, আমার কোন শক্তি নাই, ভাল-মন্দ একমাত্র তুমিই জান, তুমিই সব গোপন অদৃশ্য বিষয়বস্তু ভালরূপে জান, আমি কিছুই জানি না।

হে আল্লাহ! তুমি যদি জান যে, এই কাজটি আমার জন্ত দ্বীনের দিক দিয়া, দুনিয়ার দিক দিয়া ও শেষ ফলের দিক দিয়া এবং ইহকাল ও পরকাল উভয় কালের জন্তই ভাল হইবে তবে এই কার্যটি সমাধা হওয়া আমার জন্ত ধার্য্য করিয়া দাও এবং ইহাকে আমার জন্ত সহজ করিয়া দাও এবং ইহার মধ্যে আমাকে বরকত—মঙ্গল দান কর। আর যদি তুমি জান যে, এই কাজটি আমার জন্ত দ্বীন-দুনিয়া, শেষ ফল এবং ইহকালের ও পরকালের দিক দিয়া ভাল নয় তবে এই কাজকে আমার হইতে দূরে রাখ, আমাকেও ইহা হইতে দূরে রাখ এবং যে স্থানের যাহা আমার জন্ত ভাল হয় উহাকেই আমার জন্ত নির্দ্বারিত কর, অতঃপর উহার উপরই আমাকে সন্তুষ্ট রাখ।

ফজরের সূনতের প্রতি বিশেষ তৎপরতা

৬১৭। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফজর অঙ্গ নামাযের মধ্যে ফজরের ছই রাকাত সূনতের প্রতি সর্বাধিক তৎপর ছিলেন।

ফজরের সূনতে কেবাত কিরূপ?

৬১৮। হাদীছ:— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রাতে (তাহাজ্জুদ ও বেতের) তের রাকাত নামায পড়িতেন, তারপর ফজরের আজান শুনিলে দুই রাকাত সংক্ষিপ্ত নামায পড়িতেন। (উহাতে ছুরা কুলইয়া এবং কুলহু আল্লাহ পড়িতেন। মোসলেম শরীফ)

৩১৯। হাদীছ :—আনাছ ইবনে সীরীন (র:) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ফজরের ফরজের পূর্বে সূন্নত নামাযের রাকাতদ্বয়ে দীর্ঘ কেরাত পড়িলে কিরূপে মনে করেন? তিনি বলিলেন, নবী (স:) রাত্রে (তাহাজ্জুদ নামায) দুই দুই রাকাত করিয়া পড়িতেন, (সর্বশেষ দুই রাকাতের সঙ্গে) এক রাকাত (মিলাইয়া) বেতের নানায় পড়িতেন এবং ফজরের ফরজের পূর্বে দুই রাকাত সূন্নত একরূপ সংক্ষিপ্ত পড়িতেন যেন তাহার কানে একামতের শব্দ পৌঁছিয়াছে। (১৩৫ পৃ:)

৬১০। হাদীছ :- আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছালালাহ আলাইহে অসাল্লাম ফজরের দুই রাকাত ছন্নত সংক্ষিপ্ত কেরাতে পড়িতেন, এমনকি আমি ধারণা করিতাম যে, বোধ হয় এখন পর্য্যন্ত আলহামদু ছুরাও শেষ করেন নাই।

চাঁশতের নাগায়

৬২১। হাদীছ :-আয়েশা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন কোন সময় কোন একটা আমল নবী ছালাত্নাহ আলাইহে অসাল্লাম ভালবাসিতেন, কিন্তু নিজে বিশেষ তৎপরতার সহিত উহা করিতেন না, এই ভয়ে যে লোকেরা উহার প্রতি তৎপরতা অবলম্বন করিবে, ফলে হয়ত আল্লাহ তায়ালায় তরফ হইতে উহাকে ফরজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। আমি নবী (স:)কে চাশতের নামায পড়িতে দেখি নাই, কিন্তু আমি উহা অবশুই পড়ি এবং পড়িব।

ব্যাখ্যা :—এই হাদীছে স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে, আয়েশা (রাঃ) চাশতের নামাযকে উত্তম আমলই গণ্য করিতেন। অবশ্য এই নামাযের জন্ত মসজিদে একত্রিত হওয়ার ব্যবস্থা করার কোন প্রমাণ নাই, তাই চাশতের নামায এক্রূপ ব্যবস্থার সহিত গহিত নীতি বলিয়া সাব্যস্ত ; এই হিসাবেই ২৩৮ পৃষ্ঠায় “ওমরার বয়ান” পরিচ্ছেদে এক হাদীছে আয়েশা (রাঃ) এই নামাযকে বেদআ’ত বলিয়াছেন।

৬২২। হাদীছ :—মোয়াররেক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি অবহুলাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি চাশভের নামায পড়িয়া থাকেন কি ? তিনি বলিলেন, না। জিজ্ঞাসা করিলাম, ওমর (রাঃ) পড়িয়া থাকেন কি ? বলিলেন, না। জিজ্ঞাসা করিলাম, আবু বকর (রাঃ) ? বলিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলাম, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ? বলিলেন, তাঁহার পড়াও আমরা খেয়ালে পড়ে না।

ব্যাখ্যা :—বোধারী (রা:) স্বীয় বর্ণনায় ইঙ্গিত দিয়াছেন যে, আবছল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) ছাহাবীর উদ্দেশ্য মূল চাশতের নামায় অস্বীকার করা নয়, বরং উহার জ্ঞাত অধিক তৎপরতা, এমনকি ভ্রমণ অবস্থায় সঙ্গীদেবকে বিচলিত রাখিয়াও চাশতের নামায়ে লিপ্ত হওয়া—উহার জ্ঞাত এইরূপ তৎপরতাকে তিনি অস্বীকার করিয়াছেন।

৬২৩। হাদীছ :— আবু হোরায়রা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পরম প্রিয় নবী (দ:) আমাকে তিনটি পরামর্শ দিয়াছেন। আমি আজীবন উহা পালন করিয়া যাইব—
(১) প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখা। (২) চাশতের নামায় পড়া (৩) নিদ্রা যাওয়ার পূর্বেই বেতের পড়া ☞

৬২৪। হাদীছ :—আনাছ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, এক আনছারী ছাহাবী অধিক মোটা ছিলেন, তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন, আমি সব সময় আপনার সহিত জামাতে নামায় পড়িতে সক্ষম হইনা, (তাই কোন সময় গৃহে নামায় পড়িতে হয়, আপনি আমার গৃহে এক জায়গায় নামায় পড়িয়া আসিলে আমি উহাকেই আপনার নামায়ের স্থান বানাইতাম।) সে মতে ঐ ছাহাবী হযরতের জ্ঞাত থানা তৈয়ার করিয়া হযরত (দ:)কে স্বীয় গৃহে দাওয়াত করিয়া আনিল এবং একটি বিছানার এক অংশ দ্বীত করিয়া রাখিল, হযরত (দ:) আসিয়া উহার উপর দুই রাকাত নামায় পড়িলেন। এক ব্যক্তি আনাছ (রা:)কে জিজ্ঞাসা করিল হযরত (দ:) কি চাশতের নামায় পড়িতেন? আনাছ (রা:) বলিলেন, এই দিন ছাড়া অন্য কোন দিন তাহা আমি দেখি নাই।

অন্যত্র স্মৃত নামায়

৬২৫। হাদীছ :—ইবনে ওমর (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি লক্ষ্য রাখিয়াছি, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (বিভিন্ন নামায়ের সঙ্গে) দশ রাকাত (স্মৃত) নামায় পড়িতেন—জোহরের পূর্বে দুই রাকাত, পরে দুই রাকাত মাগরেবের পরে দুই রাকাত, এশার পরে দুই রাকাত—এই চার রাকাত গৃহে আসিয়া পড়িতেন এবং কজরের পূর্বে (ঘরের ভিতরে) দুই রাকাত নামায় পড়িতেন। এই সময়টি এমন সময় ছিল যে, তখন কোন লোক হযরতের নিকট ঘরের ভিতর যাইত না, কিন্তু আমার ভগ্নি, হযরতের বিবি হাফছাহ (রা:) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, ছোবহে-ছাদেকের সময় মোরাজ্জেন আজান দিবার পরক্ষণেই হযরত (দ:) এই দুই রাকাত নামায় পড়িতেন (ইহা কজরের স্মৃত)।

☞ আবু হোরায়রা (রা:) হাদীছ কণ্ঠস্থ করিতে অধিক রাত্র জাগিতেন; তাহাজ্জদের জ্ঞাত শেষ রাত্রে জাগ্রত হওয়া তাহার পক্ষে আশঙ্কাজনক ছিল; অতএব বেতের ও রাত্রে নফল পড়ায় এই পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল।

৬২৬। হাদীছ :—আয়েশা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সর্বদা জোহরের পূর্বে চার রাকাত ও ফজরের পূর্বে দুই রাকাত নামায পড়িতেন।

ব্যাখ্যা :—বিভিন্ন হাদীছ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, রসূলুল্লাহ (দ:) জোহরের পূর্বে চার রাকাত স্মরণ পড়িতেন, হয়ত কোন সময় দুই রাকাতও পড়িয়াছেন।

৬২৭। হাদীছ :—আবুত্বালাহ সুযানী (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মগরেবের পূর্বে (নফল) নামায পড়, এইরূপ তিনবার বলিলেন, তৃতীয়বার ইহাও বলিলেন যে, যাহার ইচ্ছা হয় পড়িতে পার। ইহা এই জ্ঞাত উল্লেখ করিলেন, যেন মগরেবের পূর্বের নামাযকে (অত্যাগত নামাযের স্মরণের জায় নিয়মিত) স্মরণ গণ্য না করা হয়×

৬২৮। হাদীছ :—আনাছ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, মগরেবের সময় মোয়াজ্জেন আজান দেওয়ামাত্র ছাহাবাদের কিছু লোক তাড়াতাড়ি মসজিদের খামমুহের বরাবর দাঁড়াইয়া রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গৃহ হইতে আসিবার পূর্বে দুই রাকাত নামায পড়িতেন। এই ওয়াক্তে আজান ও একামতের মধ্যে সময় অতি সামান্য থাকিত। (৮৭ পৃঃ)

মহুআলাহ :—নফল নামায রাতে এবং দিনে দুই দুই রাকাতরূপে পড়া উত্তম (১৫৫ পৃঃ)। হানফী মজহাবের ফেকাহ-কেতাবে দিনের বেলা নফল চার রাকাতরূপে উত্তম বলা হইয়াছে।

মহুআলাহ :—নফল নামায জমাতের সহিত শুদ্ধ হয়। (১৫৮ পৃঃ ৫২৪, ২৫৪ ও ২৭৬ হাঃ)

মহুআলাহ :—নিজ নিজ গৃহে নফল নামায পড়া চাই। আবাসিক গৃহকে নামায হইতে বঞ্চিত রাখা চাই না। (১৫৮ পৃঃ ২৮০ হাদীছ)

মক্কা ও মদীনার হরমের মসজিদে নামাযের ফজিলত

৬২৯। হাদীছ :—আবু হোরায়া (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, (অধিক ফজিলত ও ছওয়াবের আশায় কোন বিশেষ মসজিদের প্রতি ছফর করিয়া যাইবে না। (কারণ, সব মসজিদই আল্লার ঘর সবারই সমান ফজিলত।) কিন্তু তিনটি মসজিদ এমন আছে যাহার (ফজিলত বিশ্বের সমস্ত মসজিদ হইতে অধিক :

× মগরেবের ওয়াক্তে ফরজ নামায পড়িবার পূর্বে দুই রাকাত নফল নামায পড়ার বিষয়টি হযরত (দ:) নিজেই বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ মগরেবের ফরজ নামায উহার ওয়াক্তের প্রথম ভাগেই পড়িয়া নেওয়া আবশ্যিক, বিলম্ব করা মকরুহ। অথচ সকলেই যদি এই নফলে লিপ্ত হয় তবে ফরজ পড়িতে বিলম্ব ঘটবেই। তাই হযরত (দ:) এই নফল পড়ার অমুমতিদান এরূপ সতর্কতা ও সংকোচবোধ অবলম্বন করিয়াছিলেন; এবং নবী (দ:) নিজে ইহা পড়িয়াছেন বলিয়া প্রমাণ নাই। এতদদৃষ্টে ইমাম আবু হানীফা (র:) সাধারণ লোকদের অসাধনতা লক্ষ্য করিয়া মগরেবের ফরজের পূর্বে নফলে লিপ্ত হওয়া মকরুহ বলিয়াছেন।

তাই সুযোগ পাইলে উহার) প্রতি ছফর করিবে। (১) মক্কা শরীফের মসজিদুল-হারাম। (২) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদ। (৩) বায়তুল মোকাদ্দাসের মসজিদে-আক্কা।

ব্যাখ্যা:—মসজিদুল-হারামে অর্থাৎ কা'বা শরীফকে কেন্দ্র করিয়া যেই মসজিদ তৈরী আছে উহাতে নামাযের ছওয়াব এক লক্ষ গুণ বেশী। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে এক হাজার গুণ এবং বাইতুল-মোকাদ্দাস মসজিদে পাঁচ শত গুণ। (ফত: ৩-৫২)

৬৩০। **হাদীছ:**— আবু হোরায়রা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার এই মসজিদে একটিমাত্র নামায (মসজিদুল-হারাম ব্যতীত) অল্প মসজিদের এক হাজার নামায হইতে উত্তম। মসজিদুল-হারাম অবশ্য আরও বেশী ফজিলত রাখে।

৬৩১। **হাদীছ:**—ইবনে ওমর (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম প্রতি শনিবার হাঁটিয়া বা সওয়ার হইয়া কোবার মসজিদে আসিতেন এবং দুই রাকাত নামায পড়িতেন।

৬৩২। **হাদীছ:**—

عن عبد الله بن زيد أن رسول الله (ص)

قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে য়াসেদ (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমার গৃহ মসজিদস্থিত আমার মিন্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি বেহেশতের বাগানের একটি খণ্ড। (আবু হোরায়রা (রা:) হইতেও এই হাদীছ বর্ণিত আছে)।

ব্যাখ্যা:—উল্লিখিত স্থান বা জায়গাটি বেহেশতের বাগানের অংশ বা খণ্ড হওয়ার তাৎপর্যে দুইটি বিষয় রহিয়াছে। একটি এই যে, এই স্থান ও জায়গাটি বেহেশত হইতে ইহজগতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। অপরটি এই যে, পরজগত প্রতিষ্ঠিত হইলে এই স্থান ও জায়গাটি বেহেশতের বাগানে স্থাপিত হইবে।

এই হাদীছের মধ্যে কোনপ্রকার হের-ফের না করিয়া সরলভাবে উহার বিষয়বস্তুকে গ্রহণ করাই উত্তম। কারণ আল্লাহ তায়ালার কুদরত অসীম এবং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মর্যাদা অতি মহান।

বেহেশত হইতে হযরত আদম (আ:)—এর জন্ম পাথর (—কা'বা শরীফে স্থাপিত হজ্বের আসওয়াদ এবং হযরত ইস্রাহীম (আ:)—এর জন্ম (অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে) পোষাক আসিতে পারিলে হযরত মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্ম বেহেশতের বাগানের একটি টুকরা আসিতে পারিবে না কেন? মদীনা শরীফে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে এই অংশটুকু এখনও চিহ্নিতরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

৬৩৩। **হাদীছ:**—আবু সাঈদ খুদরী (রা:) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে অতি সুন্দর চারটি বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন— (১) কোন মহিলা দুইদিন ভ্রমণ পরিমাণ

(তথা ৩২ মাইল) পথ ছফর করিতে পারিবে না সঙ্গে স্বামী বা কোন মহরম না থাকিলে (২) রোযার ঈদ এবং কোরবাণীর ঈদের দিনে রোযা রাখা যাইবে না। (৩) ফজর নামাযের পর সূর্যোদয় পর্য্যন্ত (নফল) নামায পড়া যাইবে না। (৪) (অধিক ছওয়াব ও বৈশিষ্ট্যের আশায়) কোন মসজিদের প্রতি ছফর করা যাইবে না। তিনটি মসজিদ ব্যতীত—মসজিদুল-হারাম, মসজিদুল-আক্কা এবং আমার (তথা মদীনায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের) মসজিদ : (প্রথম বিষয়টির জন্য ৭৮নং হাদীছের বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

নামাযের বিবিধ আহকাম

নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষিদ্ধ

৬৩৪। হাদীছ :—আবুহুলাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নামায ফজর হওয়ার প্রথমাবস্থায় আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে নামায অবস্থায় সালাম করিতাম এবং তিনি উত্তরও দিতেন। আমরা আবিসিনিয়া হইতে (মদীনায়) আসিয়া পূর্বের স্থায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে নামাযের মধ্যে সালাম করিলাম; তিনি উত্তর দিলেন না, বরং নামাযান্তে তিনি বলিলেন, নামাযের মধ্যে (আল্লার প্রতি) মগ্নতা অবলম্বন করা আবশ্যিক।

৬৩৫। হাদীছ :—যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমলে প্রথম দিকে নামাযের মধ্যে কথা বলিতাম; পরস্পর দরকারী কথা জানাইতাম। যখন এই আয়াত নাযেল হইল—

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

“হে মোমেনগণ! তোমরা সমস্ত নামাযের প্রতি, বিশেষরূপে আছরের নামাযের প্রতি যত্নবান হও এবং নামাযের মধ্যে (কথাবার্তা ইত্যাদি বন্ধ করিয়া) আল্লার প্রতি ধ্যানমগ্ন হও।” তখন আমরা কথাবার্তা ত্যাগ করিতে আদিষ্ট হইলাম।

৬৩৬। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, নামাযের মধ্যে কোন ঘটনায় ইমামকে সতর্ক করা আবশ্যিক হইলে মহিলাগণ হাতের উপর হাত মারিয়া শব্দ করিবে এবং পুরুষ “সোবহানাল্লাহ” বলিবে।

নামাযের অবস্থায় মায়ের ডাক শুনিলে কি করিবে?

৬৩৭। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (পূর্বকালের একটি ঘটনা) বর্ণনা করিয়াছেন। জোরায়েজ নামক এক ব্যক্তি সর্বদা লোকালয় হইতে দূরে এবাদতখানার মধ্যে থাকিয়া এবাদতে মশগুল থাকিত।

একদা সে নামায পড়িতেছিল, তাহার মাতা তাহাকে ডাকিল, হে জোরায়েজ! সে মনে মনে ভাবিল, হে খোদা! একদিকে তোমার নামায, অন্য দিকে মাতার ডাক, এখন কি করিব? এই ভাবিয়া সে উত্তর দিল না, তাহার মাতা পুনরায় ডাকিল, হে জোরায়েজ! এবারও সে ঐ ভাবিয়াই উত্তর দিল না। তৃতীয়বার আবার তাহার মাতা ডাকিল, হে জোরায়েজ! এবারও সে উত্তর দিল না। এবার তাহার মাতা বিরক্ত হইয়া বদ-দোয়া করিল, হে আল্লাহ! জোরায়েজ (যখন আমার ডাকে সাড়া দিয়া আমার চেহারা দেখিল না, সে) যেন যত্নের পূর্বে বদকার নারীর চেহারা চোখে দেখে। (মাতার বদ-দোয়া আল্লাহর নিকট কবুল হইল।)

তারপর ঘটনা এই ঘটিল যে, জোরায়েজের এবাদতখানার নিকটবর্তী এক রাখালিনী নারী বকরি চরাইত এবং সেখানেই অবস্থান করিত। তাহার স্বামী ছিল না, এমতাবস্থায় তাহার একটি সন্তান জন্মিল। সকলেই তাহাকে ধরিল যে, বল্‌কোন্ ব্যক্তির কু-কর্মে এই সন্তান জন্মিয়াছে? (খোদার কুদরত—) রাখালিনী (মিথ্যারোপ করত:) বলিল, জোরায়েজের; সে তাহার এবাদতখানা হইতে নামিয়া আসিত। (জোরায়েজ বস্তুত: খাটী বুজুর্গ ছিলেন, কেবল একটি ক্রটির দরুণ মাতার বদ-দোয়ার কারণে এই অপবাদের সম্মুখীন হইলেন। মাতার বদ-দোয়া পূরা হইয়া গেল, এখন আল্লাহ তায়ালা জোরায়েজের ইজ্জত রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন।) সকলে যখন জোরায়েজকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করিল, (এমনকি তাহার বাসস্থানের উপর আক্রমণ চালাইল) তখন জোরায়েজ বলিলেন, কোথায় সেই নারী যে এই কথা বলিয়াছে? তখন সন্তান সহ ঐ রাখালিনীকে উপস্থিত করা হইল, জোরায়েজ ঐ সন্ত প্রসূত কচি শিশুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বালক! তোমার পিতা কে? শিশুটি বলিয়া উঠিল, অমুক রাখাল।

নামায অবস্থায় সেজদার স্থান পরিষ্কার করা

৬৩৮। হাদীছ:—মোয়া'য়ক্বীব (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি সেজদায় যাইতে সেজদার স্থানকে সুসমতল করিত; নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, প্রয়োজন হইলে একবার করিতে পার। (বার বার করিও না)।

বিশেষ প্রয়োজনে নামায অবস্থায় সামান্য কোন কাজ করা

৬৩৯। হাদীছ:—আবু হোরায়রা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বয়ান করিলেন, গত রাতে তাহাজ্জদের নামাযের সময় একটি শয়তান (তথা অতি দুষ্ট জিন) আমার নামায নষ্ট করার জন্য ছুটিয়া আসিল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমাকে সাহায্য করিলেন, আমি উহাকে কাবু করিয়া ফেলিলাম এবং শক্তভাবে ধরিয়া খুব দৃঢ় করিলাম। ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে, উহাকে মসজিদের খুঁটির সহিত বাঁধিয়া রাখি,

যেন ভোর বেলা তোমরা উহাকে দেখিতে পার। কিন্তু তখন আমার ভাই সোলায়মান (আঃ)এর এই দোয়াটি স্মরণ হইল— رَبِّ هَبْ لِي مَلِكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي

“হে পরওয়ারদেগার। তুমি আমাকে এমন রাজ্য দান কর যাহা আমি ভিন্ন অল্প আর কেহ পাইতে না পারে।”* ফলে দ্বীন-ইসলামের জন্ত সর্বত্র আমার অভিযানে যেন কোন শক্তি বাধা সৃষ্টি করিতে সক্ষম না হয়।

(উপরোক্ত দোয়া অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা সোলায়মান (আঃ)কে মানুষ, ছিন ইত্যাদি সমস্ত বস্তুর উপর আধিপত্য দান করিয়াছিলেন। রসুলুল্লাহ (সঃ) আলোচ্য ঘটনায় ভাবিলেন যে, এই শয়তানকে বাঁধিয়া রাখিলে ছিনের উপর আধিপত্য চালান হয়, অথচ ইহা সোলায়মান আলাইহেছালামের জন্ত বিশেষ বস্তু ছিল,) তাই আমি শয়তানকে বাঁধিয়া রাখিলাম না; ছাড়িয়া দিলাম। আল্লাহ তায়ালা উহাকে লাঞ্ছিত অবস্থায় ভাড়াইয়া দিলেন।

নামাযের সময় যানবাহন—পশু ভাগিয়া যাওয়ার আশঙ্কা হইলে ?

৬৪০। হাদীছ :—আযরাক ইবনে কয়েস (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা আহওয়্য এলাকায় গিয়াছিলাম; খারেজী দলের বিরুদ্ধে জেহাদ করিবার জন্ত। আমি একটি নহর বা খালের নিকটে ছিলাম; এক ব্যক্তি ওখার আশিয়া (আছরের) নামায পড়া আরম্ভ করিলেন। (নামায অবস্থায়) তাঁহার যানবাহনের রজ্জু তাঁহার হাতেই ছিল। পশুটির টানাটানিতে ঐ ব্যক্তি স্থানচ্যুতও হইয়া যাইতেন। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, ঐ লোকটি ছাহাবী আবু বরযাহ আসলামী (রাঃ)। (পশুর লাগাম তাঁহার হাতে রাখিয়াছেন দেখিয়া) এক খারেজী ব্যক্তি (যাহারা প্রকাশে অতি ভক্ত মোসলমান দেখায়, আর বস্তৃত: হয় মোনাফেক বা ভ্রষ্ট মতাবলম্বী—যে) ঐ ছাহাবীর প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিল, আল্লাহ এই বৃক্ষের সর্বনাশ করুন। (আমি খারেজী ব্যক্তিকে বলিলাম, চুপ থাক; আল্লাহ তোমার সর্বনাশ করুন; তুমি জান ঐ ব্যক্তি কে? তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী আবু বরযাহ (রাঃ)। আমার বিশ্বাস—আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দ্বীন-ছুনিয়ায় অপমান করিবেন; তুমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একজন ছাহাবীকে মন্দ বলিয়াছ। ফতুল্লবারী, ৩—৩৬)

বৃক্ষ ছাহাবী নামাযান্তে ঐ কটাক্ষের উত্তরে বলিলেন, আমি তোমাদের কথা শুনিয়াছি। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে সাত-আটটি জেহাদে উপস্থিত রহিয়াছি। (এই অধিক সাহচর্যের মধ্যে) আমি হযরতের সহজ ও অনায়াসসাধ্য নীতি দেখিয়াছি এবং

* হযরত সোলায়মান (আঃ) এই দোয়া স্বীয় ভোগ-বিলাস বা স্বার্থের জন্ত করিয়াছিলেন না, বরং ঘটনায় পূর্ণ বিবরণে জানা যায় যে, আল্লাহর দ্বীনের জন্ত জেহাদের ব্যাপারে সেনাবাহিনীর লোকদের গড়িমসি দৃষ্টে বিরক্ত হইয়া তাহাদের মুখাপেক্ষা হইতে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে এই দোয়া করিয়াছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার দোয়া কবুলও করিয়াছিলেন।

লক্ষ্য করিয়াছি। যানবাহন পণ্ডটির টানাটানিতে নড়চড় হওয়া আমার পক্ষে উত্তম—ইহা অপেক্ষা যে, আমি উহাকে ছাড়িয়া দিতাম; সে তাহার ইচ্ছামতে ঘাস-ক্ষেত্রে চলিয়া যাইত, ফলে আমি কষ্টে পড়িতাম। (আমার বাড়ী অনেক দূরে;) আমার ঘোড়া ছাড়িয়া দিলে রাতে আমার বাড়ী পৌছাই সম্ভব হইবে না।

মছআলাহ :—এরূপ ঘটনায় যদি নামাযের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্তও বন্ধদেশ পূর্ণরূপে কেবলাদিক হইতে ফিরিয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ নামায ভঙ্গ হইয়া যাইবে। তজ্জপ যদি অনেক পরিমাণ হাটা-চলা করে তবুও নামায ভঙ্গ হইয়া যাইবে। (ফতহুলবারী, ৩—৬৬)

মছআলাহ :—কাতাদাহ (র:) বলিয়াছেন, নামায অবস্থায় যদি চোর কাহারও কাপড় লইয়া পালাইতে উত্তত হয় তবে নামাযের নিয়ত ছাড়িয়া চোরকে ধাওয়া করিবে। (১৬১ পৃ:)

তজ্জপ যানবাহন ভাগিয়া যাওয়ার বা চার-ছয় আনা মূল্যের নিজস্ব কিম্বা অস্থির কোন বস্তুর ক্ষতির আশঙ্কা-ক্ষেত্রে উহা রক্ষার্থে নামাযের নিয়ত করা যায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—অত্র পরিচ্ছেদে এবং পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়ের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ বিধান ও মছআলার এতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে—যে, নামায বহির্ভূত কোন কাজ নামাযের মধ্যে করা হইলে যদি সেই কাজ সামান্য হয় তবে নামায ভঙ্গ হইবে না, আর যদি সেই কাজ বেশী হয় তবে নামায ভঙ্গ হইবে। “সামান্য” ও “বেশী” তাৎপর্য এই—যে পরিমাণ বা যে শ্রেণীর কার্যরত ব্যক্তিকে সাধারণ দর্শক নামাযরত নয় বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া থাকে উহাকে “বেশী” কার্য গণ্য করা হইবে এবং উহাতে নামায ভঙ্গ হইবে।

অনেকে বিষয়টি আরও সরল-সহজ করার জন্ত এই ব্যাখ্যা করেন যে, যে কার্য সম্পাদনে সাধারণতঃ উভয় হাত ব্যবহারের প্রয়োজন হয় উহাই “বেশী” এবং শুধু এক হাতে যাহা সম্পন্ন হইতে পারে উহা “সামান্য” পরিগণিত। অবশ্য এই তাৎপর্যের সঙ্গে প্রথম তাৎপর্যটিও লক্ষণীয় থাকিবে।

নামাযের মধ্যে সালামের উত্তর দেওয়া চাই না

৬৪১। হাদীছ :—জাবের (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রশূলুল্লাহ ছালাম্লাহ আলাইহে অসালাম আমাকে কোন একটি কাজে পাঠাইলেন। আমি সেই কাজ সমাধা করিয়া ফিরিয়া আসিলাম এবং রশূলুল্লাহ (দ:)কে সালাম করিলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। আমি মনে মনে চিন্তিত হইলাম; ভাবিলাম, বোধ হয় আমার বিলম্ব হওয়ায় হয়রত (দ:) আমার উপর রাগান্বিত হইয়াছেন। পুনরায় সালাম করিলাম; এবারও তিনি উত্তর দিলেন না। আমার অন্তরে অধিক চিন্তার উদয় হইল। তৃতীয়বার সালাম করিলাম; এবার সালামের উত্তর দিলেন এবং বলিলেন—প্রথম দুইবার উত্তর দিতে পারি নাই, কারণ আমি নামাযে ছিলাম।

নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রাখা

৬৪২। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামায অবস্থায় কোমরের উপর হাত রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন।

নামাযের মধ্যে নামায ভিন্ন কোন বিষয়ের ধ্যান করা

জাগতিক অর্থাৎ দ্বীন সম্পর্কীয় কোন বিষয় নহে এইরূপ কোন বিষয়ের খেয়াল ও ধ্যান নামাযের মধ্যে টানিয়া আনা কিম্বা আসিয়া গেলে উহাতে মগ্ন হওয়া অত্যন্ত দোষনীয়। উহাতে নামায ফাছেদ ও বিনষ্ট হয় না বটে, কিন্তু এরূপ নামাযের বিশুদ্ধতা শুধু আইন ও বিধানগত ব্যাপার; উহাতে নামাযের রুহ বা আত্মা ক্ষুণ্ণ হয়। এরূপ নামায পরিত্যাগের বস্তু অবশ্যই নহে, কিন্তু ঐ দোষ সংশোধনের চেষ্টা একান্তই কর্তব্য। আর দ্বীনের কোন বিষয়, যথা—শরীয়তের কোন মহআলাহ, কোরআন-হাদীছের কোন তথ্য বা দ্বীনের কোন কর্তব্যের—যেমন, জেহাদের কোন বিশেষ পরিকল্পনা—এই সর এবাদতই বটে, কিন্তু নামায বহির্ভূত এবাদত। এই শ্রেণীর কোন বিষয়েরও খেয়াল বা ধ্যান নামাযে থাকিয়া নিজের টানিয়া না আনা এবং আসিয়া গেলে কোন প্রয়োজন ব্যতিরেকে নামাযের অবস্থার সময় উহাতে ব্যয় না করাই উত্তম। আর যদি প্রয়োজন বোধ হয়, যেমন—মহআলাহ বা তথ্য কিম্বা পরিকল্পনাটি এইরূপ যে ঐ সময় উহাকে পূর্ণরূপে ধরিয়া ও মনে গাঁথিয়া না লইলে হৃদয়গট হইতে মুছিয়া যাইবে এবং পরে আর উহা মনে না-ও আসিতে পারে, অথচ দ্বীনের কিম্বা দ্বীনের জেহাদের জন্ত উহা উত্তম বস্তু। এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়ের খেয়াল ও ধ্যানের জন্ত নামায রত অবস্থার সময় ব্যয় করা উত্তমের পরিপন্থী নহে, এমনকি “খুত-খুজু” তথা নামাযে আল্লাহমুহক্কিত ও আল্লাহতে মগ্নতার বিপরীতও হইবে না। (মাওলানা আশরাফ আলী খানভী (রাঃ)এর বক্তব্য—আশ্রাফুশ-সাওয়ানেহ ১—১৩৬ পৃষ্ঠা।)

ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি নামাযের মধ্যে জেহাদে সৈন্ত প্রেরণের পরিকল্পনা করি। (খলীফা ওমরের কার্যক্রম ঐ শ্রেণীরই যাহা উত্তম ও খুত খুজুর পরিপন্থী নহে।)

অবশ্য এইরূপ খেয়াল ও ধ্যানের কারণে যদি নামাযের কোন ওয়াজেব ছুটিয়া বা বিলম্বিত হইয়া যায় তবে সেজদা-ছুছ দিতে হইবে এবং কোন ফরজ ছুটিয়া গেলে নামায পুনঃ পড়িতে হইবে। ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর এরূপ ঘটনায় একবার মগরেবের নামাযে প্রথম রাকাতের কেরাত ছুটিয়া গিয়াছিল, সেই নামায তিনি পুনরায় পড়িয়াছিলেন। (ফতহুলবারী, ৩—৬৯)

৬৪৩। হাদীছ :—ওকবা ইবনে হারেছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে আছরের নামায পড়িতেছিলাম। নামাযের সালাম ফেরা মাত্রই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং গৃহে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর পুনরায় মসজিদে আসিলেন। তাঁহার তাড়াহুড়ার দরুন মাসুদের মধ্যে চাকল্যের ভাব সৃষ্টি হইল। তাহা তিনি অনুভব করিতে পারিয়া বলিলেন—নামাযের মধ্যে আমার স্মরণ হইল যে,

আমার ঘরে একটু স্বর্ণের টুকরা আছে; উহা সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার গৃহে থাকা আমি পছন্দ করি না, তাই আমি তাড়াতাড়ি যাইয়া উহা গরীবদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করিয়া আসিলাম।

৬৪৪। হাদীছ :— সায়ীদ মাকবুরী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, লোকেরা অভিযোগ করিয়া থাকে যে, আবু হোরায়রা হাদীছ অনেক বর্ণনা করেন। তাই আমি (এরূপ অভিযোগকারী) এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, গত রাত্রে এশার নামাযে রসুলুল্লাহ (দঃ) কি ছুরা পড়িয়াছেন? তিনি বলিলেন, আমি তাহা বলিতে পারি না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি হযরতের সহিত এশার জমাতে উপস্থিত ছিলেন না? তিনি বলিলেন, হাঁ—উপস্থিত ছিলাম। আমি বলিলাম, আমি তাহা বলিতে পারি; নবী (দঃ) সেই নামাযে অমুক অমুক ছুরা পড়িয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা :—আবু হোরায়রা (রাঃ) প্রমাণ করিয়া দিলেন যে, সকলে রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতিটি বিষয় সংরক্ষণে যত্নবান হয় না, তাই অনেক হাদীছ বর্ণনা করিতে অক্ষম। পক্ষান্তরে আমি হযরতের প্রতিটি বিষয় সংরক্ষণে সর্বদা যত্নবান থাকি।

আলোচ্য হাদীছে প্রমাণিত হইল, মোস্তাদীগণ নামাযের মধ্যে ইমামের কেরাতের প্রতি ধ্যান জমাইতে পারে। আল্লাহ তায়ালার মহত্বের ধ্যানে নিমগ্ন থাকায় অভ্যস্ত হইতে না পারিলে উক্ত মগতাই উত্তম।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● নামাযের মধ্যে কোন প্রয়োজনে হাতের সাহায্য গ্রহণ করা যায়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিতেন, নামাযী ব্যক্তি নামাযের মধ্যে প্রয়োজনে তাহার যে কোন অঙ্গের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে। আবু ইসহাক (রঃ) নামায অবস্থায় বিশেষ প্রয়োজনে স্বীয় টুপি মাথা হইতে নামাইয়া রাখিয়াছেন এবং উঠাইয়া দিয়াছেন। আলী (রাঃ) নামাযে দাঁড়ান অবস্থায় এক হাতের কজ্জি অপর হাতের কজ্জির উপর রাখিতেন; অবশ্য প্রয়োজন বোধে হাত দ্বারা শরীর চুলকাইতেন এবং কাপড় সংযত করার প্রয়োজন হইলে তাহাও করিতেন (১৫২ পৃঃ)। হাদীছে আছে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাহাজ্জুদ নামাযে হযরতের একতেন্দা করিয়া তাহার বামদিকে দাঁড়াইলে হযরত (দঃ) হাত দ্বারা তাহাকে ধরিয়া ডান দিকে নিয়াছিলেন।

নামাযে কোন প্রয়োজনে হাত ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ সম্পর্কে একটি বিশেষ শর্ত ইমাম বোখারী (রঃ) সংযোগ করিয়াছেন যে, উক্ত প্রয়োজন অবশ্যই নামাযের খাতিরে হওয়া চাই। অথবা কোন উদ্দেশ্যে হওয়া চাই না; যেমন কাপড়, মাথার চুল ইত্যাদিকে এলোমেলা হওয়া হইতে বা ধুলা-বালি হইতে রক্ষা করার জন্ত টানিয়া রাখিতে নিষেধ করা হইয়াছে : (৪৬২ নং হাদীছ) অথবা বাহ্যিক রূপেও হওয়া চাই না। নামাযের

উদ্দেশ্যে হওয়া যেমন—নাথায় অধিক গরম অনুভবে অস্থিরতার দরুণ নামাযে একাগ্রতা নষ্ট হওয়ার টুপি নামানো বা চুলকানির অধিক প্রয়োজনে অশাস্তি ও গাভ্রদাহ সৃষ্টি হওয়ার নামাযে মনোযোগ রক্ষার জন্য চুলকানো, কিংবা ছতর খুলিয়া বাওয়ার আশঙ্কায় কাপড় সংযত করা ইত্যাদি। অনর্থক বা বদভ্যাসের দাস হইয়া হাত পা চালনা করা নামাযের মধ্যে অত্যন্ত অশোভনীয়। এতদ্বিন্ন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ৬৩৮ নং হাদীছে বর্ণিত নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি আদেশের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। আর একটি বিশেষ কথা—প্রয়োজন ক্ষেত্রে হাত ইত্যাদি অঙ্গের সাহায্য গ্রহণ করিতে উপরে উল্লিখিত সামান্য কাজ ও বেশী কাজের তাৎপর্য্য স্মরণ রাখিবে। প্রয়োজন ক্ষেত্রেও যদি বেশী কাজ অনুষ্ঠিত হয় তবে নামায ভঙ্গ হইবে; সেই নামায পুনঃ পড়িতে হইবে।

● নামাযের মধ্যে প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে ছোবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ইত্যাদি আল্লার কোন জিকির উচ্চারণে নামায নষ্ট হয় না। (১৬০ পৃঃ)

● কোন উপস্থিত লোককে সম্বোধনরূপে নয়—কাহাকেও সম্বোধন ছাড়া শুধু দোয়ারূপে সালাম উচ্চারণ করিলে নামায নষ্ট হইবে না (১৬০ পৃঃ ৪৭৬ হাদীছ)। অবশ্য উপস্থিতকে সম্বোধন উদ্দেশ্যে সালাম করা বা তজ্রা সালামের উত্তর প্রদান নিষিদ্ধ; করিলে নামায ভঙ্গ হইয়া যাইবে। ● নামাযের মধ্যে বিশেষ কারণ বশতঃ সম্মুখের বা পেছনের দিকে স্থানচ্যুত হইলে নামায নষ্ট হইবে না (১৬০ পৃঃ); তবে সামান্য ও বেশীর তাৎপর্য্য লক্ষ্য রাখিবে। ● নানাযের মধ্যে প্রয়োজন হইলে থুথু ফেলা জায়েয আছে। কিন্তু নামাযের স্থান ও কেবলা দিক চ্যুত হইয়া নয়, বরং ১৭২ নং হাদীছে বর্ণিত বিধান মতে।

মহুআলাহ :- নামাযের মধ্যে মুখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়া—যদি উ...হু আ...হু শব্দের সহিত বিপদগ্রস্ত হওয়ার ভাবনা-চিন্তায় বা কোন হুঃখ দরদ ইত্যাদির কারণে হয় তবে নামায ভঙ্গ হইয়া যাইবে। অবশ্য যদি বেহেশত-দোষখ স্মরণে বা আল্লাহ তায়ালায় ভয়ের প্রতিক্রিয়ার ঐক্লপ হয় তবে নামায নষ্ট হইবে না (শামী, ১—৫৭৯)। সূর্য্য গ্রহণের নামায অবস্থায় হযরত (দঃ) বেহেশত-দোষখ দেখিয়া ছিলেন বলিয়া ৫৬১ নং হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে; এক হাদীছে বর্ণিত আছে, সেই নামাযের সেজদার মধ্যে হযরত (দঃ) কাঁদিয়াছিলেন এবং উ...হু, উ...হু শব্দের সহিত মুখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ছিলেন (ফতহুল-বারী, ৩—৩৬)।

ফরজ নামাযে প্রথম বৈঠক ছুটিয়া গেলে সেজদা-ছুত দিবে

৬৪৫। হাদীছ :- আবহল্লাহ ইবনে বোহায়না (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা কোন এক (চার রাকাতওয়ালা) নামাযের দুই রাকাত পড়িয়া, না বসিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। নামায যখন শেষ হইয়া আসিল—সকলে

সালাম ফিরিবাব অপেক্ষা করিতেছিল এমন সময় হযরত (দঃ) বসা অবস্থাই সালাম ফিরিবাব পূর্বে দুইটি সেজদা করিলেন। প্রত্যেকটি সেজদা তকবীরের সহিত করিলেন; মোক্তাদীগণও সেজদা করিল। ভূলে প্রথম বৈঠক ছুটিয়া গিয়াছিল। উহারই পরিবর্তে এই সেজদা ছিল।

ভুলবশতঃ যদি পাঁচ রাকাত পড়িয়া ফেলেন

৬৬৬। হাদীছ :—আবুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রশুলুল্লাহ ছালাম্মাহু আলাইহে অসালাম জোহরের নামায পাঁচ রাকাত পড়িয়া ফেলিলেন। তাঁহার নিকট আরজ করা হইলে, নামাযের রাকাত কি বাড়িয়া গিয়াছে? তিনি বলিলেন, ইহার কি অর্থ? তখন আরজ করা হইল যে, আপনি নামায পাঁচ রাকাত পড়িয়াছেন, এতদ্-অবশ্যে হযরত (দঃ) সালাম ফিরিবাব পর দুইটি সেজদা করিলেন। তারপর আবার সালাম (করিয়া নামায সমাপ্ত) করিলেন। নামাযান্তে বলিলেন, নামায সম্পর্কে নূতন কোন কিছু হইলে নিশ্চয় তোমাদিগকে উহা বলিয়া দিতাম। কিন্তু আমি মারুযই—আমাদও ভুল হয় যেক্রপ তোমাদের ভুল হইয়া থাকে। অতএব কোন সময় আমি ভুলিয়া গেলে আমাকে স্মরণ করাইয়া দিও। আর তোমাদের মধ্যে কেহ নামাযের রাকাত সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হইলে তাহার কর্তব্য হইবে চিন্তা করিয়া সঠিক দিক নির্দ্ধারিত করা সে উহার ভিত্তিতেই নামায পূর্ণ করিবে, অতঃপর সালাম করিয়া দুইটি সেজদা করিবে।

ভুলক্রমে শুধু দুই রাকাত পড়িয়াই যদি সালাম করে

৬৪৭। হাদীছ :— আবু হোরাযরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা নবী ছালাম্মাহু আলাইহে অসালাম আছরের নামায দুই রাকাত পড়িয়াই সালাম ফিরিলেন তৎপর মসজিদের সম্মুখভাবে একটি কাঠ পতিত করা ছিল এই স্থানে যাইয়া উহার উপর হাত ভর করিয়া বসিলেন। উপস্থিতবৃন্দের মধ্যে আবু বকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ)ও ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ভয়ে কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। তাড়াহুড়ায় অভ্যস্ত ব্যক্তিগণ এই বলিয়া মসজিদ হইতে চলিয়া গেল যে, নামাযের রাকাত কম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উপস্থিতবৃন্দের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল—যাহাকে “জুল-ইয়াদাইন” বলা হইত; সে রশুলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি ভুল করিয়াছেন না—নামাযই কম করিয়া দেওয়া হইয়াছে? রশুল (দঃ) বলিলেন, কোনটাই হয় নাই। সে আরজ করিল, নিশ্চয়—

† চতুর্থ রাকাতের পর আভাহিয়াত পড়িয়া অতঃপর দাঁড়াইয়া পঞ্চম রাকাত পড়িয়া থাকিলে সেজদা-ছুহ দ্বারা নামায শুদ্ধ হইবে। এমতাবস্থায় বর্ষ রাকাতও পড়িয়া নেওয়া উত্তম। কিন্তু চতুর্থ রাকাতের পর না বসিয়া পঞ্চম রাকাত পড়িলে পূর্ণ নামাযই কাছেদ হইয়া যাইবে।

‡ ইহা নামাযের মধ্যে কথা বলা জায়েয সময়ের ঘটনা। নতুবা ইমাম কথা বলার পর সেজদা-ছুহ দেওয়ার অবকাশ থাকে না। এই হাদীছ ৫৮ পৃষ্ঠায়ও আছে; অনুবাদে সমষ্টির লক্ষ্য করা হইয়াছে।

হুজুর আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন। নবী (দ:) এ বিষয়ে অস্বাভাবিক লোককে সজ্ঞাসা করিলে সকলেই আরজ করিল, এই ব্যক্তি ঠিকই বলিতেছে। তখন নবী (দ:) বাকি ছই রাকাত নামায পড়িলেন ও সালাম ফিরিয়া ছই সেজদা করিলেন। +

৬৪৮। হাদীছ :—আবু হোরায়ায়া (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (দ:) ফরমা-ইয়াছেন—তোমাদের মধ্যে কেহ যখন নামাযে খাড়া হয় তখন শয়তান আসিয়া নানা প্রকার বাধা সৃষ্টি করে, এমনকি কত রাকাত পড়িয়াছে তাহা সে ভুলিয়া যায়। কেহ অবস্থার সম্মুখীন হইলে, শেষ বৈঠকে ছইটি সেজদা করিবে।*

মহম্মদ আল্লাহ :—নামাযরত ব্যক্তিকে যদি কোন কথা বলা হয় এবং সে লক্ষ্য করিয়া শুনিয়া শুধু হাতের বা মাথার ইশারায় কোন বিষয় বুঝাইয়াও দেয় তবুও উহাতে সেজদা-ছুছ দিতে হইবে না। (১০৪ পৃষ্ঠা)

+ ভুলবশতঃ অসম্পূর্ণ অবস্থায় নামায শেষ করিয়া যদি কথাবার্তা বলিয়া ফেলে বা নামায ভঙ্গকারী অন্য কোন কার্য করে তাকে হানফী মজহাব মতে নামায পুনরায় পড়িতে হইবে; সেজদা-ছুছ দিলে চলিবে না। উল্লিখিত হাদীছের ঘটনাকে মনোযোগ বলা হইয়া থাকে; নামাযের মধ্যে যখন কথাবার্তা বলা জায়েয ছিল উক্ত ঘটনা সেই কালের।

সেজদা-ছুছ সালামের পরে হইবে, কিন্তু এ সালাম নামায সমাপ্তির সালাম নহে। নামায সমাপ্তির ছই সালাম সেজদা-ছুছ পরেই হইবে, যেইরূপ পূর্বের হাদীছে উল্লেখ আছে।

* রাকাতের সংখ্যা যে ভুলিয়া গিয়াছে সে সম্পর্কে কি করিবে সেই মহম্মদ আল্লাহ সুদীর্ঘ।

অষ্টম অধ্যায়

জানাবার বয়ান

“জানাবা” অর্থ শব, যতদেহ বা যত ব্যক্তি। এই অধ্যায়ে মানুষের মুমূর্ষুকাল হইতে পুনর্জন্মকাল পর্যন্ত সম্বন্ধীয় তথ্যাদি ও মহম্মালাহ-মহায়েল বর্ণিত হইবে।

আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত একটি হাদীছের মর্ম এই—যে ব্যক্তির ইহজীবনের শেষ বাক্য কলেমা-শাহাদৎ হইবে সে বেহেশতে যাইবে। অথ এক হাদীছের মর্ম অল্পরূপই—কলেমা-শাহাদৎ বেহেশতের চাবি। (কতছলবারী)

এই সমস্ত হাদীছের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ দৃষ্টিতে ভুল ধারণা বা প্রশ্নের উদয় হইয়া থাকে যে, তবে শরীয়তের অন্ত্যস্ত আদেশ ও বিধি-বিধান পালনের প্রয়োজনীয়তা কি থাকিতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর দানেই ইমাম বোখারী (র:) একজন বিশিষ্ট তাবেরীর উক্তি উদ্ধৃত করিতেছেন—

ওয়াহাব ইবনে মোনাস্বেহ (র:)কে উক্ত প্রশ্নই করা হইলে তিনি সংক্ষেপে ইহার উত্তর দান করিলেন—চাবি মাত্রই উহার কয়েকটি দাঁত থাকে; কোন দরওয়াজার তালা খুলিতে হইলে দস্তযুক্ত চাবি আনিতে হইবে, দস্তহীন চাবি দ্বারা তালা খোলা যাইবে না।

অর্থাৎ কলেমা-শাহাদৎ বেহেশতের চাবি এবং সম্পূর্ণ শরীয়ত ঐ চাবির দস্ত। বেহেশতের তালা খুলিতে হইলে তথা বেহেশতে যাইতে হইলে শরীয়তের বিধানাবলী সহ কলেমা-শাহাদৎ লইয়া যাইতে হইবে, নতুবা বেহেশতের দরওয়াজা খুলিবে না।

৬৪৯। হাদীছ:—
 عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَتَانِي أُنْثَى مِنْ رَبِّي فَبَشَّرَنِي أَنَّهَا مِنْ مَّاتٍ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا
 دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ

অর্থ:—আবু জর (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছালাম্মাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, একদা আমার নিকট আল্লাহ তারালার তরফ হইতে এক বিশেষ দূত আসিয়া এই শুভ সংবাদের ঘোষণা শুনাইলেন—যে ব্যক্তি যত্না পর্যন্ত শেরেকী গোনাহ হইতে পাক-পবিত্র থাকিবে (অর্থাৎ রিক্ত হইমানের সহিত যাহার যত্না হইবে) সে ব্যক্তি বেহেশত লাভ করিবে।

এই হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যদিও সে যেনা করিয়া থাকে বা চুরি করিয়া থাকে? রসূলুল্লাহ (দ:) তত্ত্বতরে বলিলেন, যদিও সে যেনা করিয়া থাকে বা চুরি করিয়া থাকে (তবুও সে বেহেশতে যাইতে পারিবে)।

ব্যাখ্যা :—এই হাদীছের একমাত্র তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য হইল—শেরেক বর্জন তথা তোহীদ ও ঈমানের মহত্ব ও গুণাগুণ প্রকাশ করা যে, ইহা দ্বারা মানুষ বেহেশত লাভ করিতে পারে। যদি গোনাহের দ্বারা কোন বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি না হয় তবে কোন প্রকার আত্মাব ভোগ না করিয়া প্রথম হইতেই সে বেহেশবাসী হইবে, নচেৎ গোনাহ পরিমাণ আত্মাব ভোগ করিয়া বেহেশত লাভ করিতে পারিবে। পক্ষান্তরে শেরেক বর্জন পূর্বক ঈমান অবলম্বন না করিয়া হাজার নেক আমল, যেমন—কোটি কোটি টাকা দান-খয়রাত করিলেও তাহার পরিভ্রাণ পাইবার উপায় নাই, অনন্তকাল সে আত্মাব ভোগ করিবে—চিরকাল সে দোষখেই থাকিবে।

৬৫১। হাদীছ :— **عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم**
مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ.

অর্থ :—আবহুলাহ ইবনে মসউদ (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন শেরেকী গোনাহের সহিত যাহার মৃত্যু হইবে সে দোষখী হইবে।

জানাযার সঙ্গে যাওয়া

৬৫১। হাদীছ :—বরা ইবনে আযেব (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদের বিশেষরূপে সাতটি কাজের আদেশ করিয়াছেন এবং সাতটি বস্তু নিষেধ করিয়াছেন। আদেশকৃত সাতটি কাজ এই—(১) জানাযার সঙ্গে যাওয়া, (২) রোগীকে দেখিতে যাওয়া এবং তাহার খোঁজ-খবর নেওয়া, (৩) কাহারও (ঠেকা উদ্ধারের বা সাদর) আহ্বানে সাড়া দেওয়া, (৪) মজলুম-নির্যাতিত ব্যক্তির সাহায্য করা, (৫) শপথকারীর শপথ রক্ষা করা, (৬) সালামের উত্তর দেওয়া, (৭) হাঁচিদাতার আলহামদু লিল্লাহ শ্রবণে **اللَّهُ يَرْحَمُكَ** (ইয়ারহামু-কাল্লাহ) “আল্লাহ তোমার উপর (আরও) রহমত নাযেল করুন” এই বলিয়া তাকে দোয়া করা। * যেই সাতটি বস্তু (ব্যবহার) নিষিদ্ধ করিয়াছেন, উহা এই—(১) রোপ্য (বা স্বর্ণ) নিমিত্ত অঙ্গুরী, (২) সাধারণ রেশমী বস্ত্র, (৩) মিহি রেশমী বস্ত্র, (৪) তসর, (৫) মোটা রেশমী বস্ত্র, (৬) লাল রেশমী কাপড়ের গদি বা আসন।

• এক হাদীছে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (স:) মৃত ওসমান ইবনে মফউ'ন (রা:)কে ক্রন্দনরত অবস্থায় চুম্বন করিয়াছেন; মৃতের মুখের উপর তাঁহার অঙ্গুষ্ঠাঘাত হইতে দেখা গিয়াছে। (তিরমিযী)

• হাঁচি আসা স্বাস্থ্যের পক্ষে সুফলদায়ক, তাই ইহা আল্লার একটি বড় নেয়ামত, এই নেয়ামতের উপর আলহামদু-লিল্লাহ বলিয়া যে ব্যক্তি আল্লার প্রশংসা করিল সে স্বীয় পালনকর্তার শোকরগুজারী ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। যে ব্যক্তি নেয়ামত ভোগের সঙ্গে সঙ্গে নেয়ামতদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে অধিক নেয়ামত পাইবার উপযোগী। আল্লাহ তায়ালা কোরআন পাকে বলিয়াছেন— **لَنِّ شُكْرُكُمْ لَا يَزِيدُكُمْ** “তোমরা যদি আমার নেয়ামতের প্রকৃত শোকরগুজারী কর তবে তোমাদের হস্ত নেয়ামত আরও বৃদ্ধি করিয়া দিব।” তাই তাহার জন্ত এই দোয়া করা হয়।

৬৫২। হাদীছ :—আবু হোরায়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোসলমানদের পরস্পর পাঁচটি হক আছে—(১) সালামের উত্তর দেওয়া, (২) রোগী দেখা ও তাহার হাল-পুরছাী তথ্য তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করা, (৩) শব যাত্রায় যোগদান করা, (৪) (দাওয়াত বা ঠেকা উদ্ধার) আহ্বানে সাড়া দেওয়া, (৫) হাঁটুদাতার “আলহামদু-লিল্লাহ” অর্থাৎ **يُرحمك الله** “ইয়ারহামু-কালাহ” বলা।

মৃতকে কাফন পরাইবার পূর্বে ও পরে দেখা যার

কোন কোন আলেম বলেন, মৃত ব্যক্তিকে গোসলদাতা ও তাহার সহকর্মীগণ ব্যতীত কাহারও দেখা চাই না। বোখারী (রাঃ) এই পরিচ্ছেদে উহা খণ্ডন করিতেছেন। (ফতহুলবারী)

৬৫৩। হাদীছ :—উম্মুল আ'লা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কা হইতে যে সব মোসলমান নিঃসম্বলরূপে হিজরত করিয়া মদীনা উপস্থিত হইতেন, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাদের জন্য মদীনাবাসী মোসলমানদের ঘরে ঘরে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। (মদীনাবাসীগণ এ বিষয়ে এত আগ্রহান্বিত ছিলেন যে, পরস্পর প্রতিযোগিতার দরুণ ব্যালটের ব্যবস্থা করা হইত।) উম্মুল আ'লা (রাঃ) বলেন—একদা ব্যালটের দ্বারা আমাদের জন্য ওসমান ইবনে মজউ'ন রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নাম উঠিল। আমরা তাঁহাকে সাদরে ও সযত্নে আমাদের গৃহে স্থান করিয়া দিলাম। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি অস্তিম রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহাকে গোসল দেওয়ার ও কাফন পরানর পর রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহার নিকটবর্তী আসিলেন।*

উম্মুল আ'লা (রাঃ) বলেন—তখন আমি মৃত ওসমান ইবনে মজউ'ন (রাঃ)-এর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, হে আবুছ-ছায়েব (ওসমান)! আমি আপনার জন্য সাক্ষ্য দিতেছি এবং শপথ করিয়া বলিতেছি, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সম্মানিত (অর্থাৎ বেহেশতবাসী) করিয়াছেন। এতদ্বশব্দে নবী (দঃ) আমাকে বলিলেন, তুমি কিভাবে নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিয়াছ, সে বেহেশতবাসী হইবে? আমি আরজ করিলাম, আপনার জন্য আমার মাতা-পিতা উৎসর্গ, ইয়া রসূলুল্লাহ (দঃ)! এই ব্যক্তি বেহেশতবাসী না হইলে আর কে বেহেশতবাসী হইবে? তৎক্ষণে হযরত (দঃ) বলিলেন, (এই সম্পর্কে) নিশ্চিতরূপের সঠিক অবগতি এই ব্যক্তিরই লাভ হইয়াছে এবং আমি আশা করি, সে খুব ভালই পাইয়াছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (দঃ) শপথ করিয়া বলিলেন, আমি আল্লাহ রসূল, তথাপি আমি (অধিকাররূপে এবং অকাট্য ও অখণ্ডনীয়ভাবে) বলিতে পারি না যে, আমার প্রতি আল্লাহ কিরূপ করিবেন।

উম্মুল আ'লা (রাঃ) বলেন, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই কথা শুনিয়া আমি পূর্ণ করিলাম, কাহারও ভাল হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিতরূপে আর কখনও কোন উক্তি করিব না।

* এক হাদীছে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) মৃত ওসমান ইবনে মজউ'ন (রাঃ)কে ক্রন্দনরত অবস্থায় চুশন করিয়াছেন; মৃতের মুখের উপর তাহার অশ্রুপাত হইতে দেখা গিয়াছে। (তিরমিজি)

ব্যাখ্যা :—সর্বক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তায়ালা ; তিনি **مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ** “কর্মফল প্রদানের একচ্ছত্র মালিক।” **لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ** “সেদিন সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র তাঁহারই সর্বশক্তিমান হস্তে স্তম্ভ থাকিবে, এমনকি ইহকালের আয় বাহ্যিক ক্ষমতাইকুও কাহারও হাতে থাকিবে না।” তাই সেই কর্মফলের দিনের তথা পরকালের বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত ও দৃঢ়রূপে কোন কিছু বলিবার অধিকারী কেহই নহে।

হযরত রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মান-মর্যাদা ব্যক্ত করা নিশ্চয়োজন ; তিনি নিষ্পাপ, তত্পরি আল্লার ঘোষণা যে, মানুষ হিসাবে যদি আপনার কোনও ত্রুটি হয় আপনি পূর্বাভেদেই সে সব হইতে ক্ষমাপ্রাপ্ত ইত্যাদি ইত্যাদি বর্ণনাতীত শান ও মান-মর্যাদা অকট্য প্রমাণে প্রমাণিত আছে। কিন্তু জলীল ও জব্বার, সর্বাধিকারের অধিকারী সর্বক্ষমতায় ক্ষমতাবান আল্লাহ তায়ালা অধিকার ও ক্ষমতা দৃষ্টে সব কিছুই বিলীন ও বিলুপ্ত হইয়া যায়, তত্পরি কাহারও কোন সক্রিয় অধিকারও নাই। এসব অল্পভূতি পরি-প্রেক্ষিতে নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উপরোল্লিখিত তথ্যটি প্রকাশ করিয়াছেন।

বোখারী শরীফে ৯৫৭ পৃষ্ঠায় হাদীছ বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা ছাহাবীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, কোন ব্যক্তি আমল-এবাদতের দ্বারা পবিত্রাণ পাইতে পারিবে না। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, আপনিও পারিবেন না, ইয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) ? তত্পরে হযরত (দঃ) বলিলেন, আমিও পরিভ্রাণ পাইতে পারিব না যাবৎ আল্লার রহমত আমাকে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া না লইবে।

আল্লাহ তায়ালা হযরত (দঃ)কে এরূপ বলিতে শিক্ষাদান করিয়াছেন, যথা—

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ۔

(কাকেরদের নানা প্রকার কুউক্তি প্রতিবাদে) আপনি বলিয়া দিন, আমি অতীতের রসূলগণ হইতে পৃথক ধরণের নহি, (তাঁহারা মানুষ ছিলেন, কোন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না, আমিও তত্রূপই। এমনকি) আল্লাহ তায়ালা পক্ষ হইতে আমার প্রতি বা তোমাদের প্রতি কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে তাহাও আমি (নিশ্চিত ও দাবীরূপে কিছুই) বলিতে পারি না। (সব কিছু তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করে এবং তাঁহারই বাণীর উপর নির্ভর করিয়া হযরত শুধু আশা রাখা যাইতে পারে, তদতিরিক্ত কাহারও কিছুই অধিকার নাই)। (২৬ পাঃ ১ কঃ)

৬৫৪। হাদীছ :—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা আবদুল্লাহ (রাঃ) ওহাদের জেহাদে শহীদ হইলেন। তাঁহার মৃতদেহ চাদরে আবৃত করিয়া রাখা হইল, আমি উহার নিকটবর্তী আসিয়া চেহারার উপর হইতে কাপড় সরাইলাম এবং কাঁদিতে লাগিলাম। সকলেই আমাকে নিষেধ করিতেছিল, কিন্তু নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম

নিষেধ করিলেন না। আমার ফুফু ফাতেমাও আসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমরা ক্রন্দন কর বা না কর, সে আল্লাহ তায়ালায় নিকট অতি উচ্চ মৰ্ত্ববা পাইয়াছে, এমনকি রণক্ষেত্রে শহীদ অবস্থায় পতিত থাকাকালীন ফেরেশতাগণ তাহাকে স্বীয় ডানা দ্বারা ছায়া দিতেছিলেন—যাবৎ তোমরা তথা হইতে তাহাকে উঠাইয়া না আনিয়াছ।

আত্মীয়-স্বজন ও মোসলমান ভাইদিগকে মৃত্যু সংবাদ দেওয়া

কোন কোন হাদীছে আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) মৃত্যু সংবাদ দান নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

এখন ইমাম বোখারী (রঃ) এই মহাআলাটির বিশ্লেষণের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন। অন্ধকার তথা কুফুরী যুগে এই রীতি ছিল যে, বড়-মানুষী প্রকাশার্থে দোল-শোহরত দ্বারা মৃত্যু-সংবাদ প্রচার করা হইত। রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ রীতির প্রতিই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়াছেন। নতুবা জানাযায় শরীক হইবার জন্ত বা দোয়া-এস্তেগফার ইত্যাদির আশায় মৃতের আত্মীয়-স্বজন ও মোসলমান ভাইদের সংবাদ দান করাতে কোন দোষ নাই। স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এরূপ উদ্দেশ্যে মৃত্যু-সংবাদ দান করিয়াছেন।

৬৫৫। হাদীছ :—আবু হোরায়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যে দিন আবিসিনিয়ার অধিপতি নাজাশীর মৃত্যু হইল ঠিক সেদিনই রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ (অশীর দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া) সকলকে জানাইলেন এবং তাঁহার জন্ত এস্তেগফার-কমা প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলেন। অতঃপর হযরত (দঃ) (জানাযা বা ঈদের নামায পড়ার) ময়দানে গেলেন এবং সকলকে লইয়া চার তকবীরের সহিত জানাযা পড়িলেন।

ব্যাখ্যা :— আবিসিনিয়ার প্রত্যেক অধিপতিই “নাজাশী” উপাধিতে পরিচিত হইত; আলোচ্য ঘটনার অধিপতির নাম ছিল “আছহামাহ”। তিনি ইসলাম কবুল করিয়াছিলেন, তিনি বড়ই সৌভাগ্যশালী ছিলেন; তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ আল্লাহ তায়ালা মদীনা শরীফে রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জ্ঞাত করেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) সমস্ত ছাহাবীগণকে জ্ঞাত করেন এবং তাঁহার প্রতি এমন একটি বাক্য ব্যবহার করেন যাহা চিরকাল তাঁহার সৌভাগ্যের প্রতীক হইয়া থাকিবে। রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন—

تَوَفَّنِي الْيَوْمَ رَجُلٌ مَّالِحٌ مِنَ الْعَبْشِ فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ -

“অচ্ছ আবিসিনিয়া নিবাসী একজন নেক বান্দা ইহকাল ত্যাগ করিয়াছে, (যাহায নাম আছহামাহ) তোমরা সমবেতভাবে তোমাদের সেই ভ্রাতার জানাযার নামায আদায় করা।*

* মূল বাক্যটি বোখারী শরীফ ১৬৭ পৃঃ হইতে উদ্ধৃত। এই হাদীছটি ৫৪৭ পৃষ্ঠায়ও বর্ণিত হইয়াছে; অনুবাদে মধ্যে উহার বিবরণের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

আল্লামার রসুলের মুখে কাহারও নেক বন্দা বলিয়া আখ্যায়িত হওয়া পরম সৌভাগ্যজনক ও একটি মূল্যবান সম্মানসূচক উপাধি। ওছপরি সুদূর মদীনা হইতে রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছাহাবীগণকে লইয়া তাঁহার জানাযার নামায পড়িলেন। ইহাও অতি বড় সৌভাগ্যের বিষয়। এমনকি আবু হানিকা (রাঃ) ও ইমাম মালেক (রাঃ) বলিয়াছেন, এইরূপে দূরপ্রাপ্ত হইতে জানাযার নামায তাঁহার জন্ম এক অসাধারণ বিশেষত্ব স্বরূপ ছিল। কারণ এরূপ ঘটনা একমাত্র তাঁহার ক্ষেত্রেই প্রসিদ্ধ। অথচ রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময় এবং খোলাফায়ে-রাশেদীনের সময় অনেক মোসলমান ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ মদীনার বাহিরে মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু রসুলুল্লাহ (দঃ) বা খোলাফাগণ সচরাচর কাহারও উদ্দেশ্যে দূরপ্রাপ্ত হইতে জানাযার নামায পড়েন নাই। কদাচিৎ এরূপ আরও দুই একটি ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে কিনা, তাহা সন্দেহযুক্ত। আরও একটি লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), ওমর (রাঃ) এবং আরও ছাহাবী মদীনায় প্রাণত্যাগ করাকালীন অন্ত্যস্ত ছাহাবীগণ ও মোসলমানগণ দূর দূর প্রান্তে অবস্থানরত ছিলেন, কিন্তু কোথাও হইতে কেহ ঐ মহান ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে গায়েবানা-জানাযার নামায পড়িয়াছেন বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। এমতাবস্থায় শুধুমাত্র একটি দুইটি ঘটনার দ্বারা কোন বিষয় শরীয়তের সাধারণ বিধান বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না এবং প্রথারূপে ইহাকে অবলম্বন করা ত মোটেই সমীচীন নহে।

অবশ্য জানাযার নামাযের মূল বিষয়বস্তু হইল মৃত ব্যক্তির জন্ম দোয়া ও এস্তেগকার করা, যাহা যে কোন স্থান হইতে করা যাইতে পারে এবং করিলে তাহা ইনশা-আল্লাহ তায়ালা বিফলে যাইবে না, তাই এই বিষয় লইয়া বিবাদ সৃষ্টি করা পরিতাপের বিষয়।

জানাযার সংকারে যোগদান করার জন্ম সংবাদ দেওয়া

৬৫৬। হাদীছ :— ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ব্যক্তিকে তাহার অন্তিম শয্যাবস্থায় দেখা-ভুনা করিতেন। ঐ ব্যক্তি একদা রাত্রিকালে প্রাণত্যাগ করিল। সেই রাত্রেই সকলে তাহার দাফনকার্য্য সমাধা করিয়া ফেলিল। সকাল বেলা রসুলুল্লাহ (দঃ)কে এই বিষয় জ্ঞাত করান হইলে তিনি অমৃতপ্ত হইয়া বলিলেন, তোমরা আমাকে সংবাদ দিলে না কেন? তাহার। আরজ করিল—অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রি ছিল; তাই আপনাকে কষ্ট দেওয়া ভাল মনে করি নাই। অতঃপর রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ ব্যক্তির কবরের নিকটবর্তী আসিয়া দোয়া করিলেন বা পূর্ণাঙ্গ জানাযার নামায পড়িলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমরা হযরতের পেছনে কাতার বাঁধিলাম; আমিও উহাতে শামিল ছিলাম।

ব্যাখ্যা :—ঐ ব্যক্তির নাম ছিল তাল্হা (রাঃ)। তিনি মদীনাবাসী ছিলেন, তাঁহার রোগশয্যায় একদা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে পরিদর্শন করিয়া অন্ত্যস্ত সকলের নিকট

বলিয়া গেলেন, তাল্‌হার অবস্থা ভাল নয়, তাহার মৃত্যু অতি নিকটবর্তী মনে হইতেছে। তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সংবাদ জ্ঞাত করিও। কিন্তু যখন রাত্রি হইল তখন তাল্‌হা (রাঃ) তাহার আপন লোকদিগকে বলিলেন, যদি আমি রাতে প্রাণ ত্যাগ করি তবে রাতেই আমার দাফনকার্য্য সমাধা করিয়া ফেলিও, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ডাকিও না। কারাগ, ইহুদীগণ তাহার পরম শত্রু; অন্ধকার রাতে তিনি আমার জন্ম কোনও বিগদের সম্মুখীন হইতে পারেন। সেই রাতেই তাহার মৃত্যু ঘটিল এবং দাফনকার্য্য সমাধা করা হইল। সকাল বেলা রসুলুল্লাহ (সঃ)কে সম্পূর্ণ খবর অবগত করান হইলে তিনি সকলকে লইয়া তাহার কবরের নিকট আসিলেন এবং সমবেতভাবে হাত উঠাইয়া তাহার জন্ম দোয়া করিলেন, দোয়াটি সংক্ষিপ্ত ছিল বটে, কিন্তু বড়ই তাৎপর্য্যপূর্ণ। হযরত (সঃ) বলিলেন—

اللَّهُمَّ اِنِّى طَلَعْتُ يَمْحَكَ اِلَيْكَ وَتَفَضَّلْتَ اِلَيْهِ

“হে খোদা! তাল্‌হার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ এরূপভাবে হউক যেন সেও সন্তুষ্টচিত্তে হাসিয়া উঠে তুমিও তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হও। (ফতুল্লাবাবী)

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— আলোচ্য হাদীছের ঘটনার নবী (সঃ) কবরের নিকটবর্তী আসিয়া শুধু দোয়া করিয়াছিলেন, না—পূর্ণাঙ্গ জানাযার নামায পড়িয়াছিলেন সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইমাম বোখারী (রঃ) স্থিরভাবে এই মতই পোষণ করিয়াছেন যে, উক্ত ঘটনার নবী (সঃ) পূর্ণাঙ্গ জানাযার নামাযই পড়িয়াছিলেন। সেমতে বোখারী (রঃ) এই হাদীছের উপর কতিপয় মছআলাহও বর্ণনা করিয়াছেন।

শিশু সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্য্য ধারণ ও ছওয়াবের

আশা রাখার কজিলত

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ - أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ مَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ.....

অর্থ—আপনি সুসংবাদ দান করুন ঐ সমস্ত ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিবর্গকে যাহারা আপদ-বিপদ, দুঃখ-কষ্ট ও শোক-অশান্তির অবস্থায় (ধৈর্য্য ধারণ করতঃ মনে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া) এরূপ বলে যে—আমরা (ও আমাদের সর্বস্ব) আল্লাহর। এবং আমাদের সকলেই আল্লাহর নিকট যাইতে হইবে। তাহাদের জন্ম রহিয়াছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং বিশেষ রহমত এবং তাহারাই প্রকৃত প্রস্তানে হেদায়েতপ্রাপ্ত। (২ পাঃ ৩ রঃ)

من انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
مَا مِنْ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَفَّى لَهٗ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِكْمَةَ إِلَّا أَدْخَلَهُ
اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ -

অর্থ—আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছালামাহ আল্লাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে কোন মোসলমানের তিনটি শিশু সন্তান মারা যাইবে।* এই শিশুদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া আল্লাহ তায়ালা এই ব্যক্তিকে (এ শিশুর মাতা ও পিতাকে) বেহেশত দান করিবেন।

৬৫৮। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছালামাহ আল্লাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে কোন মোসলমানের তিনটি শিশু সন্তান মারা যাইবে সে দোষে যাইবে না; অবশ্য সকলের ছায় তাহাদেরও দোষের উপর প্রতিষ্ঠিত পোল-ছেরাত পার হইয়া যাইতে হইবে। কারণ, ইহা একটি অনিবার্য ও অবধারিত বিষয় বাহা ব্যতিরেকে কোন উপায়ান্তর নাই। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা মানবকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে—

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا -

“তোমাদের প্রত্যেকেরই দোষ অতিক্রম করিতেই হইবে, ইহা আল্লাহ কতৃক নির্ধারিত ও অকাট্যরূপে অবধারিত।” (১৬ পাঃ ৮ রূঃ) এখানে ৮২নং হাদীছও উল্লেখ আছে।

মৃতকে গোসল দেওয়ার নিয়ম

৬৫৯। হাদীছ :—উম্মে-আ'তিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছালামাহ আল্লাইহে অসাল্লামের কোন এক কন্যার মৃত্যু হইল; আমরা তাঁহাকে গোসল দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে ছিলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) আসিয়া আমাদিগকে আদেশ করিলেন—(১) কুলপাতাযুক্ত পানি দ্বারা গোসল দিবে। (২) তিনবার, পাঁচবার বা সাতবার করিয়া গোসল দিবে; আবশ্যক হইলে আরও অধিকবার গোসল দিবে, কিন্তু বে-জোড় হওয়া ছাই। (৩) শেষবার কপূর মিশ্রিত পানি ঢালিবে। (৪) ডান দিকের অঙ্গ এবং অঙ্গুর অঙ্গসমূহ হইতে গোসল দেওয়া আরম্ভ করিবে। গোসল সমাপনান্তে আমাকে সংবাদ দিবে।

গোসল সমাপনে আমরা রসুলুল্লাহ (দঃ)কে খবর দিলাম। তিনি তাঁহার একখানা লুঙ্গি আমাদের নিকট দিলেন এবং বলিলেন, সর্বপ্রথম তাহাকে এই কাপড়টিতে আবৃত কর; যেন এই কাপড়টি তাহার শরীর স্পর্শ করিয়া থাকে। (বরকতের জন্ত এই ব্যবস্থা করিলেন।)

উম্মে-আ'তিয়া (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা নবী কন্যাকে গোসল দেওয়াকালীন প্রথমে তাঁহার কেশগুচ্ছ বা কবরী ও গোঁপা খুলিয়া ফেলিলাম এবং চুল আঁচড়াইয়া গোসলান্তে উহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া (পেছনের) দিকে রাখিয়া দিলাম।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—নবী-কন্ডার গোসলদানে অত্যন্ত অংশ গ্রহণকারীণী উম্মে-আ'তিয়া (রাঃ) যত নবী-কন্ডার চুল সম্পর্কে তিনটি কথা বলিয়াছেন—আমরা নবী-কন্ডার চুল আঁচড়াইয়া-ছিলাম (১৬৭ পৃঃ), দুই পার্শ্বের চুলে দুইটি, মধ্য মাথার চুলে একটি—তিনটি বেণী করিয়া দিয়াছিলাম (১৬৮ পৃঃ), বেণীত্রয় পেছনের দিকে তথা পিঠের নীচে রাখিয়া দিয়াছিলাম (১৬৯ পৃঃ)

মোসলমানদের শব দেহের প্রতি সম্মানে বিদায় দানের ভূমিকা প্রদর্শনই শরীয়তের নীতি। রোগশয্যায় সাধারণতঃ অযত্নের দরুণ মহিলাদের এবং পুরুষেরও বাবরি চুল জটলা ধরিয়া যায়। গোসলদানে পরিচ্ছন্নতার জন্ত সেই জটলা ছিন্ন করিতে হইবে; সেই জন্ত আবশ্যক হইলে চিরুণীও ব্যবহার করা জায়েয আছে, কিন্তু চুল ছিন্ন না হয় তাহা লক্ষ্য রাখিবে। চুল এলোমেলো ও অসুন্দররূপে থাকিতে দিবে না, সুবিশুদ্ধতার সহিত চুল রাখিবে; উহার জন্ত প্রয়োজন মনে করিতে মোলায়েমভাবে বেণী করিয়া দিবে। হানফী মজহাবের ফেকার কিতাবেও বেণীর উল্লেখ আছে—ফতওয়া শামী, ১—৮০৮ দ্রষ্টব্য। বেণীর সংখ্যা ও রাখার স্থান সম্পর্কে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহাও জায়েয, তবে সব দেহকে যথাসম্ভব নাড়াচাড়া উলট-পালট কম করার ব্যবস্থাই সর্বক্ষেত্রে অগ্রগণ্য; সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া হানফী ফেকার কেতাবে মহিলা যুতের চুলকে দুই খণ্ডে বা দুইটি বেণী আকারে দুই পার্শ্ব দিয়া বক্ষের উপর রাখিয়া দেওয়া উল্লেখ রহিয়াছে।

সাদা কাপড়ে কাফন দেওয়া

৬৬০। **হাদীছ :**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (সঃ)কে তিনটি কাপড়ে কাফন দেওয়া হইয়াছে; উহা সূতী, সাদা এবং ইয়ামান দেশের তৈরী ছিল।

ব্যাখ্যা :—রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্ত ব্যবহৃত কাফনই আল্লাহ তায়ালায় নিকটও পছন্দনীয়। এতদ্বিধ কোন কোন হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ আছে—হযরত রসুলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন, তোমরা সাদা পোষাক ব্যবহার কর; ইহা পাক-পবিত্রতার দিক দিয়া উত্তম। (কারণ, রঙ্গিন কাপড়ে কোন কিছু লাগিলে তাহা সহজে নজরে পরে না) এবং সাদা কাপড়েই মৃতদিগকে কাফন দান কর। (তিরমিজি শরীফ)

মহুআলাহ :—মহিলাদিগকে পাঁচ কাপড়ে কাফন দেওয়া সুন্নত। চতুর্থটি হইল সিরবন্দ এবং পঞ্চমটি হইল সিনাবন্দ। সিনাবন্দ বগল হইতে কোমর ও রান বা জাহুদয় সহ দীর্ঘ হইবে; (কাফন পড়াইবার সময়) উহা গিরহানের নীচে থাকিবে; (ফলে পেচাইবার সময় গিরহানের উপরে থাকিবে।) ১৬৮ পৃঃ

মহুআলাহ :—যুতের মাথায় এবং দাঁড়িতে স্নগন্ধ দিবে, আর শরীরের যে সব স্থান সজ্জদার সময় ব্যবহৃত হয় ঐ স্থানসমূহে কপূর দিবে (১৬৯ পৃঃ)।

এহরাম অবস্থায় যুত ব্যক্তির কাফন

৬৬১। **হাদীছ :**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে হজ্জ করাকালীন এহরাম অবস্থায় আরাফার ময়দানে খীয়

সওয়ারী হইতে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। নবী (দঃ) বলিলেন, তাহাকে ফুলপাতা-যুক্ত পানি দ্বারা গোসল দাও এবং তাহার (এহরামের) চাদরদ্বয় দ্বারা কাফন দাও; তাহাকে স্মৃগন্ধি লাগাইও না, তাহার মাথা আবৃত করিও না, (যে রূপ জীবিত ব্যক্তি এহরামাবস্থায় স্মৃগন্ধি ব্যবহার করে না, মাথা আবৃত করে না।) কারণ, এই ব্যক্তি কেয়ামতের দিন কবর হইতে (হাজীদেব্র স্মরণ এহরাম অবস্থায়) তল্‌বিয়া (লাকাইক) পড়িতে পড়িতে উঠিবে।

ব্যাখ্যা :—হানফী ও মালেকী মজহাব মতে এহরাম অবস্থায় মৃত ব্যক্তির কাফন ইত্যাদি সাধারণ মৃতের স্মরণই দিতে হইবে, কোন প্রকার ব্যবধান ও তারতম্য করার বিধান নাই। কারণ, কোরআন ও হাদীছ দৃষ্টে ইহা অবধারিত যে, মৃত্যুর দ্বারা প্রত্যেক আমলেরই সমাপ্তি ঘটিয়া যায়। যেমন, কোন ব্যক্তি নামাযেরত অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলে তাহার নামায পরিত্যক্ত হইয়া গেল; তাহাকে কেবলামুখী ইত্যাদি অবস্থায় রাখা আবশ্যক হইবে না। তজ্জগ মোহরেম ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিলে তাহার এহরাম পরিত্যক্ত হইয়া গেল, তাই তাহাকে এহরামকালীন অবস্থায় রাখা আবশ্যক হইবে না।

উল্লিখিত যুক্তিবিদগণ আলোচ্য হাদীছের তাৎপর্য সম্পর্কে এই উক্তি করেন যে, এই হাদীছে বর্ণিত বিষয়সমূহ একমাত্র ঐ ব্যক্তিরই বিশেষ ছিল, সর্বক্ষেত্রে উহা প্রযোজ্য নয়। কারণ, এই হাদীছের বিষয়বলী বর্ণনাকালে রসূলুল্লাহ (দঃ) যে ধরণের বাক্য ও শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, উহা (আরবী ভাষার বিধান মতে) একমাত্র ব্যক্তিবিশেষের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাই ইহা শরীয়তের সাধারণ বিধান ও নিয়মরূপে বিবেচিত হইবে না।

সাধারণ তৈরী জামা কাফনে দিবে না, দিলে গোনাহ হইবে না।

৬৬২। হাদীছ :—আরেশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছালামাহ আল্লাইহে অসাল্লামকে তিনখানা সাদা কাপড়ে কাফন দেওয়া হইয়াছে; উহার মধ্যে তৈরী জামা বা পাগড়ী ছিল না।

৬৬৩। হাদীছ :—ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, (মোনাফেক দলের প্রধান) আবুছল্লাহ ইবনে উবায়ী যখন মারা গেল তখন তাহার ছেলে (যিনি অতি খাঁটি মোসলমান ও বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন, স্বীয় পিতৃ-মহব্বতে আকৃষ্ট হইয়া তাহার নাজাতের অঙ্গিলার ব্যবস্থা স্বরূপ) নবী ছালামাহ আল্লাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া এই আবেদন জানাইলেন যে, ইয়া রসূলুল্লাহ (দঃ)! আপনি স্বীয় জামাখানা আমার পিতার কাফনের জন্য দিবেন এবং আপনি তাহার জানাযার নামায পড়াইবেন এবং তাহার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিবেন। নবী (দঃ) তাহার আবেদন রক্ষা করতঃ স্বীয় জামা দিয়া দিলেন (বা দিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন) এবং বলিলেন, সময় হইলে আমাকে সংবাদ দিও, আমি জানাযার নামায পড়াইয়া দিব। যখন জানাযা তৈয়ার হইল এবং নবী (দঃ) জানাযার

নামাযের জন্ত অগ্রসর হইলেন, তখন ওমর (রাঃ) তাঁহাকে পিছন হইতে বিরত রাখার চেষ্টা করিলেন—এবং আরজ করিলেন, আপকি কি জানেন না যে, (সে আপনার বিরুদ্ধে অমুক অমুক দিন এই এই বিবোধগার ও খড়্গ করিয়াছিল এবং সে ছিল সমস্ত মোনাফেকদের প্রধান।) আল্লাহ তায়ালা মোনাফেকদের উপর জানাযার নামায পড়িতে তথা দোয়া-এস্তেগফার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। নবী (দঃ) কোন বাধা-বিপত্তি না গুনিয়া বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে এই বিষয়ে স্পষ্টতঃ নিষেধ করেন নাই, বরং বাহতঃ অবকাশ সূচক অর্থের বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—

اَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ

“মোনাফেকদের জন্ত আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা না করুন আল্লাহ তায়ালা কক্ষিন-কালেও তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না।” (১০ পাঃ ১৬ কঃ)

এই বলিয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ জানাযার নামায পড়িলেন। তৎপরেই স্পষ্টতঃ নিষেধাজ্ঞাসূচক আয়াত নাযেল হইল—

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَابَ اَبَدًا وَلَا تُقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهٖ

“মোনাফেকদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে আপনি কখনও তাহার উপর জানাযার নামায পড়িবেন না এবং তাহার কবরের নিকটবর্তী দাঁড়াইবেন না।” (১০ পাঃ ১৭ কঃ)

ব্যাখ্যা :— আবুল্লাহ ইবনে উবায়ী রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এবং মোসলমানদের ঘোর শত্রু ছিল ; এই শত্রুতার সে যে সমস্ত কুকীতি ও জঘন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছে তাহার সমালোচনায় বহু হাদীছ এবং কোরআনের বহু আয়াত নাযেল হইয়াছে। আনহার ও মোহাজিরদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধাইবার জন্ত একবার সে যে সমস্ত চক্রান্ত করিয়াছিল তাহার সমালোচনায় “ছুরা মোনাফেকুন” নামক একটি ছুরা নাযেল হয়। সে সর্বদাই কুচক্রান্ত ছুরতিসন্ধি আঁটিতে থাকিত ; এমনকি সেই ছুরাচার শয়তান রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক মান-মর্যাদার উপর আক্রমণ করা হইতে বিরত থাকে নাই ; আরেশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার উপর মানহানীকর ভিত্তিহীন মিথ্যা অপবাদ রটাইবার ষড়যন্ত্রকারীও একমাত্র সেই ছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং ছাহাবীগণ তাহার এসব কুকীতি অক্ষরে অক্ষরে অবগত ছিলেন। তাহার এক পুত্র ছিল, তাহার নামও ছিল আবুল্লাহ, তিনি খাঁটি মোসলমান ছিলেন, তিনি স্বীয় পিতার কার্যকলাপের প্রতি অত্যন্ত অনুতপ্ত, ফুক ও বিরক্ত ছিলেন, এমনকি অনেক সময় প্রতিশোধ গ্রহণে উত্তত হইতেন, কিন্তু পিতা-পুত্র সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে নিষেধ করিতেন।

যেহেতু সে মোনাকেক অর্থাৎ প্রকাশে মোসলেন দলভুক্তরূপে পরিচিত ছিল, তাহার মৃত্যু হইলে পর মোসলমানদের হায তাহার দাফন-কাফন ও জানাযার নামাযের ব্যবস্থা করা হইল। তাহার পুত্র আবহুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু স্বাভাবিক পিতৃ-মহকতে আকৃষ্ট হইয়া নাজাতের শেষ অছিল। ও চেষ্টা স্বরূপ রশুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে তাহার স্বীয় জামা অদানের ও জানাযার নামায পড়াইবার আবেদন করিলেন। দয়ার এবং স্নেহ মমতার মূর্তপ্রতীক রশুলুল্লাহ (দঃ) এই ক্ষেত্রে অসীম ও তুলনাবিহীন দয়া প্রকাশ করিলেন। তিনি ঐ মোনাকেক সরদারের সমস্ত অপকর্ম হজম করিয়া লইলেন এবং তাহার পুত্রের আবেদনে তাহার জানাযার নামায পড়াইতেও সম্মত হইলেন। কারণ, তখনও আলোচ্য হাদীছের দ্বিতীয় আয়াতটি নাযেল হয় নাই। প্রথম আয়াতটি নাযেল হইয়াছিল এবং উহাতে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ ছিল না। অবশ্য উহার মূল উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মোনাকেকদের জন্য জানাযার নামায তথা এস্তেগফার করা বাহুল্য বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং বাহুল্য কাজ না করাই চাই; তাই ওমর (রাঃ) আবহুল্লাহ ইবনে উবায়ীর প্রতি দ্বীনী ও ইসলামী আক্রোশে ক্ষুব্ধ হইয়া রশুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে নামায হইতে বিরত রাখার চেষ্টা করিলেন এবং এই আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করিলেন।

কিন্তু যেহেতু এই আয়াতে স্পষ্টতঃ নিষেধাজ্ঞার কোন শব্দই ছিল না বরং আয়াতের বাহ্যিক মর্ম শুধু এতটুকু ছিল যে, মোনাকেকদের জন্য কমা প্রার্থনা বিফল হইবে। তাই রশুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কান্দ না হইয়া নামায পড়ার প্রতি অগ্রসর হইলেন এবং তাহার দয়ার সাগরে বান ডাকিয়া উঠিল—তিনি ইহাও বলিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—“সত্তর বার কমা প্রার্থনা করিলেও তিনি ইহাদের কমা করিবেন না।” অতএব আবশ্যক হইলে আমি সত্তর বারেরও অধিক কমা প্রার্থনা করিব, যদি কোনরূপ সাফল্যের আশা দেখা যায়। এই বলিয়া তিনি নামায পড়িলেন, তৎপর দ্বিতীয় আয়াতটি নাযেল হইল এবং মোনাকেকদের উদ্দেশ্যে জানাযার নামায, দোয়া-এস্তেগফার স্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ হইল।

৬৬৪। হাদীছঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোনাকেক সরদার আবহুল্লাহ ইবনে উবায়ীর মৃতদেহ তাহার গর্তে নামাইবার পরক্ষণে রশুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তথায় পৌঁছিলেন এবং তাহাকে গর্ত হইতে উঠাইবার আদেশ করিলেন। তাহাকে উঠান হইল; হযরত (দঃ) তাহাকে স্বীয় হাঁটুদ্বয়ের উপর রাখিয়া তাহার উপর খুতনী দিলেন। হযরত (দঃ) স্বীয় জামাও তাহাকে কাফনে পরাইয়াছিলেন। রশুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরিধানে একত্রে দুইটি জামা ছিল; আবহুল্লাহ ইবনে উবায়ীর ছেলে বলিয়াছিলেন, ইয়া রশুলুল্লাহ! আপনার চর্ম স্পর্শিত জামাখানা আমার পিতাকে (কাফনে) পরাইবার জন্য দিবেন।

বদর যুদ্ধে হযরতের চাচা আব্বাস (রাঃ) বন্দী হইয়াছিলেন। তাঁহার গায়ে কাপড় ছিল না ; আবহুলাহ ইবনে উবায়ী স্বীয় জামা তাঁহার গায়ে পরাইয়াছিল, (অন্ত কাহারও জামা আব্বাসের গায়ে পরিমাপে ছিল না।) তাহার সেই উপকার পরিশোধেই হযরত (দঃ) স্বীয় জামা তাহার কাফনে দিয়াছিলেন, যেন তাহার উপকারের বোঝা হযরতের উপর থাকিয়া না যায়।

ব্যাখ্যা :—রসুলুল্লাহ (দঃ) মোনাক্কে সরদার আবহুলাহ ইবনে উবায়ী সম্পর্কে যে সব সহানুভূতি-সুলভ ব্যবহার করিয়াছেন, উহার কারণ এক ত হযরতের স্বাভাবিক অসাধারণ অমায়িকতা ও উদারতা, আর দ্বিতীয়তঃ আবহুলাহ ইবনে উবায়ীর ছেলে একনিষ্ঠ মোসলমান আবহুলাহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মনস্তি সাধন।

প্রয়োজনে এক কাপড়েই কাফন দিবে

৬৬৫। হাদীছ :—আবহুর রহমান ইবনে আ'উফ (রাঃ) ধনাঢ্য ছাহাবী ছিলেন, একদা তিনি রোযাদার ছিলেন। ইফতার সমাপনান্তে তাঁহার সম্মুখে খাবার উপস্থিত করা হইলে, তিনি আশ্বেপ করিয়া বলিলেন, মোছায়া'ব ইবনে ও'মায়ের (রাঃ) যিনি আমার চেয়ে বড় মত'বার ছিলেন, যখন তিনি শহীদ হইলেন তখন তাঁহার একটি মাত্র ছোট চাদর ছিল, যদ্বারা তাঁহার পূর্ণ শরীর আবৃত হইত না ; পা ঢাকিলে মাথা খুলিয়া যাইত, মাথা ঢাকিলে পা খুলিয়া যাইত, সেই চাদরেই তাঁহার কাফন-দাফনও সেইরূপেই হইয়াছে।

তিনি আরও বলিলেন, এসব উচ্চ শ্রেণীর ছাহাবীগণ এক্রূপ দরিদ্রাবস্থায় জীবন-যাপন করিতেছিলেন, তৎপর এখন আমাদের জ্ঞাত কত বড় লম্বা-চোড়া সুখ শান্তির সুযোগ-সুবিধা দান করা হইয়াছে এবং ছনিয়ার ধন-দৌলত, দ্রব্য-সামগ্রী অনেক কিছু দেওয়া হইয়াছে। এতদ্দৃষ্টে আমার ভয় ও আশঙ্কা হয় যে, আমাদের সুখ-ভোগের জাগতিক জীবনেই পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইতেছে না-কি ? এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন, এমনকি রোযা থাকা সত্ত্বেও ইফতারের পরে আর ঐ খাচ্চ এহণ করিলেন না।

৬৬৬। হাদীছ :—খাবাব (রাঃ) একদা বলিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে স্বীয় ঘর-বাড়ী, ধন-জন সর্বস্ব ত্যাগ করতঃ হিজরত করিয়াছি শুধু আল্লার সন্তুষ্টি লাভের জন্ত। আশা করি আমাদের সেই আমলের ছওয়াব আল্লাহ তায়ালা নিকট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের মধ্যে কোন কোন ভাই জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও সেই ছওয়াবের কোন অংশই ইহজীবনে ভোগ করিয়া যান নাই, অর্থাৎ দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়াই এই জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন ; মোছায়া'ব ইবনে ও'মায়ের (রাঃ) তাঁহাদের অন্ততম। আর কোন কোন ব্যক্তির জন্ত ঐ আমলের প্রতিফল যেন পাকিয়া গিয়াছে এবং সে ইহজীবনেই উহার কিছু কিছু ভোগ করিতেছে ; অর্থাৎ ধন-দৌলতের সুখ-সন্তোষের জীবন লাভ করিয়াছে।

অতঃপর খাবাব (রাঃ) মোছায়া'ব ইবনে ও'মায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অবস্থা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, তিনি যখন ওহাদের জেহাদে শহীদ হইলেন তখন তাঁহার কাফনের

জন্ম একটি মাত্র ছোট চাদর ছিল, যদ্বারা মাথা আবৃত করিলে পা খুলিয়া যায় এবং পা আবৃত করিলে মাথা খুলিয়া যায়। এতদ্দ্ব্যে রসুলুল্লাহ ছালাম্লাহ আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে এই আদেশ করিলেন যে, চাদর দ্বারা মাথা আবৃত করিয়া দাঁও এবং পায়ের উপর এজ্জের (এক প্রকার খাস) বিছাইয়া ঢাকিয়া দাঁও।

মুছআলাহ :—দুইটি কাপড়ের সংস্থান হইলে দুই কাপড়ই কাফন দিবে।

জীবিতকালে স্বীয় কাফন তৈরার করিয়া রাখা

৬৩৭। হাদীছ :—ছাহল (রা:) হইতে বর্ণিত আছে—একদা একজন নারী নবী ছালাম্লাহ আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে একটি চাদর লইয়া আসিল এবং আরজ করিল, এই চাদরটি আমি নিজ হস্তে বুনন করিয়া আপনাকে হাদিয়া দিবার জন্য লইয়া আসিয়াছি। নবী (স:) চাদরটি গ্রহণ করিলেন; তখন তাঁহার কাপড়ের আবশ্যকও ছিল। অতঃপর তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া আমাদের সম্মুখে তশরীফ আনিলেন, তাঁহার পরিধানে ঐ চাদরটি ছিল। এক ব্যক্তি চাদরটি দেখিয়া উহা পছন্দ করিল এবং বলিল, হুজুর! চাদরটি খুবই সুন্দর, ইহা আমাকে দান করুন। নবী (স:) বলিলেন, আচ্ছা—তোমাকে দিয়া দিব। অতঃপর তিনি মজলিশ শেষে গৃহে যাইয়া চাদরটি ভাঁজ করিয়া তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। উপস্থিত সকলে ঐ ব্যক্তিকে বলিল, তুমি ভাল কাজ কর নাই; কেননা নবী ছালাম্লাহ আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় প্রয়োজন ও আবশ্যকাবস্থায় ইহা ব্যবহার করিয়াছিলেন তবুও তুমি তাঁহার নিকট উহা চাহিয়াছ; (অথচ তুমি নিজেও ইহা জান যে, তিনি কখনও কোন প্রার্থীকে বিমুখ করেন না। তখন) সে তাহার মনোগত মূল উদ্দেশ্য খুলিয়া বলিল যে, চাদরটি পরিধান করার জন্য আমি প্রার্থী হই নাই, বরং এই জন্য ইহার প্রার্থী হইয়াছি যেন রসুলুল্লাহ ছালাম্লাহ আলাইহে অসাল্লামের ব্যবহৃত বস্ত্রে আমার কাফন তৈরী হয়।

হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন, তাহার উক্ত উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। তাহার মৃত্যু হইলে ঐ চাদর দ্বারাই তাহার কাফন দেওয়া হয়।

নারীদের জন্য শবযাত্রায় যোগ দেওয়া

৬৩৮। হাদীছ :—উম্মে-আ'তিয়া (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, বিশেষ জোর তাকিদের সহিত না হইলেও (যখন রসুলুল্লাহ ছালাম্লাহ আলাইহে অসাল্লামের সময়) আমাদিগকে (নারীগণকে) শবযাত্রার সঙ্গে যাইতে নিষেধ করা হইত।

নারীদের জন্য শোক প্রকাশের নিয়ম

৬৩৯। হাদীছ :—মোহাম্মদ ইবনে সীরীন (র:) হইতে বর্ণিত আছে, উম্মে-আ'তিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার একটি ছেলের মৃত্যু হইল, ঘটনার তিন দিন পর তিনি জরদ

রঙ্গের এক প্রকার সুগন্ধি আনাইয়া ব্যবহার করিলেন এবং বলিলেন, আমাদের (নারীদের) জন্ত একমাত্র স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারও মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোকাবেশ অবলম্বন নিষিদ্ধ।

৬৭০। হাদীছ :—যখনব বিনতে উম্মে-ছালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালামাহ আল্লাইহে অসাল্লামের বিবি উম্মে-হাবিবা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার পিতা আবু সুফিয়ানের মৃত্যু সংবাদ পৌছিল। সংবাদ পাওয়ার তৃতীয় দিন তিনি জরদ রঙ্গের সুগন্ধি আনিয়া হাতে ও মুখে মাখিলেন এবং বলিলেন, এখন সুগন্ধি ব্যবহারের আবশ্যক আমার ছিল না, কিন্তু আমি রসুলুল্লাহ ছালামাহ আল্লাইহে অসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, যে নারী আল্লার উপর ও কেরামতের উপর ঈমান রাখে, তাহার কর্তব্য যে, স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারও মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোকাবেশ অবলম্বন করিয়া না থাকে। অবশ্য স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করিবে।

হাদীছ বর্ণনাকারীণী বলেন, অতঃপর একদা আমি নবী ছালামাহ আল্লাইহে অসাল্লামের অন্য এক বিবি—যখনব বিনতে আ'হ'শ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট উপস্থিত হইলাম; তখন তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যু-সংবাদ আসিয়াছিল। তিনিও ঐরূপ করিলেন এবং নবী ছালামাহ আল্লাইহে অসাল্লাম হইতে ঐরূপ হাদীছ বর্ণনা করিলেন।

কবর যেয়ারত করা

আবু দাউদ ও নাসায়ী শরীফের একটি হাদীছে বর্ণিত আছে—রসুলুল্লাহ ছালামাহ আল্লাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, পূর্বে আমি (বিশেষ কারণ বশতঃ) কবর যেয়ারত করা হইতে বিরত থাকিতে আদেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন কবর যেয়ারত করার আদেশ করিতেছি। কারণ, ইহা মানুষকে আখেরাত তথা পরকালের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

অন্য এক হাদীছে আছে—ইহা মানুষকে হুনিয়ার প্রতি মগ্নতা হইতে বিরত রাখে। মোসলেম শরীফের হাদীছে আছে—নবী ছালামাহ আল্লাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা কবর যেয়ারত করিও; কারণ ইহা মানুষকে মৃত্যু স্মরণ করাইয়া দেয়।

অবশ্য নারীদের জন্ত এ বিষয়ে সতর্কতা ও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যিক। কারণ, তিরমিজি শরীফের হাদীছে আছে—রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, কবর যেয়ারতে যাওয়াতকারিণী নারীদের প্রতি আল্লার লা'নত ও অভিশাপ রহিয়াছে।

কাজেই নারীদের কবর যেয়ারতে আদৌ তৎপর হওয়া চাই না। যদি কোন আপন-জনের কবর যেয়ারতের প্রতি বিশেষ আবেগ জন্মে, তবে প্রথমতঃ—কদাচিৎ এবং অতি অল্প সময়ের জন্ত যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ—পূর্ণমাত্রায় ধৈর্য ও ছবরের সহিত যাওয়া চাই। তৃতীয়তঃ—পর্দা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা চাই। নতুবা উল্লিখিত হাদীছ অনুসারে আল্লাহ তায়ালা অভিশাপে অভিশপ্ত হইতে হইবে।

৬৭১। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছালামাহ আল্লাইহে অসাল্লাম কোথাও যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে দেখিলেন—একজন মহিলা একটি কবরের

নিকট বসিয়া কাদিতেছে। রশূল্লাহ (দঃ) তাহাকে বলিলেন, খোদাকে ভয় কর এবং ধৈর্যধারণ কর। মহিলাটি (রশূল্লাহ (দঃ) কে চিনিতে না, তাই সে) উত্তর করিল, আপনি আমাকে কিছু বলিবেন না; কারণ, আপনি ত আমার দুঃখপ্রাপ্ত হন নাই এবং উহা অনুভব করিতে পারিবেন না। অতঃপর কোন এক ব্যক্তি মহিলাকে বলিল, তুমি যাহার সঙ্গে প্রতিউত্তর করিয়াছ তিনি নবী (দঃ)। (এতদশ্রবণে সে ভীষণ চিন্তিতা, ভীতা ও লজ্জিতা হইল।) অতঃপর সে নবী ছালাল্লাহ্ আলাইহে অসাল্লামের গৃহে আসিল। সেখানে অন্তান্ত রাজা-বাদশাদের ছায় দারওয়ান ও পাহারাদার ছিল না। সে হযরতের খেদমতে আরম্ভ করিল, (আমি ধৈর্যধারণ করিলাম, আমি ধৈর্যধারণ করিলাম;) ঐ সময় আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই। তখন নবী (দঃ) বলিলেন, (আচ্ছা যাও, আমাকে চিনিতে না পারিয়া প্রতিউত্তর করাতে অসম্ভব নহি; কিন্তু প্রকৃত ধৈর্যধারণ যাহাকে বলে উহার সময় চলিয়া গিয়াছে।) দুঃখপ্রাপ্তির প্রথমাবস্থায় ধৈর্যধারণ করিতে পারিলে উহাকেই প্রকৃত ধৈর্যধারণ বলা যাইতে পারে। (কারণ, পরবর্তীকালে স্বাভাবিক ভাবেই শোকাবেগ স্তিমিত হইয়া আপনা হইতেই ধৈর্য আসিয়া যায়)।

ব্যাখ্যা :—নবী (দঃ) উক্ত মহিলাকে কবরের নিকটে উপস্থিত হওয়া তথা কবর ঘেয়ারত করার নিষেধ করিয়াছিলেন না; সে কাদিতেছিল, তাই ধৈর্যধারণের আদেশ করিয়াছিলেন।

কাহারও মৃত্যুতে ক্রন্দন করা

ক্রন্দন দুই প্রকারের হইয়া থাকে। প্রথম প্রকার এই যে, দুঃখিত প্রাণের বেদনা ও যাতনায় চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু প্রবাহিত হয়, কিন্তু (মুখে শব্দ হয় না, হইলেও শুধু ক্রন্দনেরই শব্দ তা-ও উচ্চৈঃস্বরে নয় এবং) কোনরূপ বিলাপ খেদোক্তি বা মৃতের নানা-প্রকার গুণ-গানকে ক্রন্দনস্বরে মিশ্রিত করা হয় না। দ্বিতীয় প্রকার হইল উহার বিপরীত, অর্থাৎ বিলাপ ও খেদোক্তি করতঃ ক্রন্দন করা, মৃতের গুণ-গানকে ক্রন্দনস্বরে মিশ্রিত করতঃ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করা।

প্রথম প্রকারের ক্রন্দনে কোন দোষ নাই, বরং উহা হৃদয়ের নম্রতা ও দয়ালু হওয়ার পরিচায়ক; যাহা আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করিয়া থাকেন। আলোচ্য পরিচ্ছেদের প্রথম ও দ্বিতীয় (৬৭২, ৬৭৩ নং) হাদীছদ্বয়ে উল্লিখিত ক্রন্দনের উদ্দেশ্য এই শ্রেণীর ক্রন্দনই।

দ্বিতীয় প্রকারের ক্রন্দন নাজায়েয ও হারাম, এমনকি যদি মৃত ব্যক্তির দ্বারা এই প্রথা তাহার পরিবারের মধ্যে প্রচলিত হইয়া থাকে, অথবা সে নিজের জ্ঞাত ঐ ক্রন্দনের কথা বলিয়া গিয়া থাকে, কিম্বা তাহার জীবিতকালে তাহার পরিবারবর্গের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, তবুও সে উহা নিষেধ করিয়া যায় নাই; তবে এরূপ ক্রন্দনের দরূপ ঐ মৃত ব্যক্তিও বিশেষভাবে শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে এবং আজাব ভোগ করিবে। আলোচ্য পরিচ্ছেদের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম (৬৭৪, ৬৭৫, ৬৭৬ নং) হাদীছত্রয়ের তাৎপর্য ইহাই।

তত্পরি এই বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য বোখারী (র:) আরও তিনটি দলীলের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

(১) আল্লাহ পাক বলিয়াছেন (২৮ পা: ১৯ ক:) قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“হে মোমেনগণ! তোমাদের নিজকে এবং পরিবারবর্গকে দোযখ হইতে রক্ষা কর।”

এই আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দোযখে যাওয়ার কারণসমূহ তথা কুর্কম ও কুপ্রথা হইতে নিজে বিরত থাকা যেক্রপ করজ ও অবশ্য কর্তব্য, তক্রপ স্বীয় পরিবারবর্গকেও বিরত রাখার চেষ্টা করা করজ। সাধ্যানুযায়ী এই চেষ্টা না করিলে উক্ত করজ ভরককারী পরিগণিত হইয়া শাস্তির উপযুক্ত হইবে।

(২) নবী (দ:) বলিয়াছেন—كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কর্তৃত্বের অধিকারী হয়; স্মরণ রাখিও—প্রত্যেক কর্তাকেই স্বীয় অধীনস্থদের কার্যকলাপের জন্য দায়ী হইতে হইবে। গৃহস্বামী পরিবারবর্গের উপর কর্তৃত্বের অধিকারী, তাই পরিবারবর্গের কার্যকলাপের জন্য তাহার দায়ী হইতে হইবে।”

(৩) হযরত রশূল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন, কেয়ামত পর্য্যন্ত সারা বিশ্বে যত না-হক খুন ও অত্যাচার হত্যা অনুষ্ঠিত হইবে, আদম (আ:) এর পুত্র কাবীল প্রত্যেকটি হত্যার জন্য গোনাহের ভাগী হইবে। কারণ, তাহার দ্বারাই সর্বপ্রথম অত্যাচার নরহত্যা প্রথার সূত্রপাত হইয়াছিল।

উল্লিখিত দলীলত্রয়ের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গের মধ্যে হারাম তরীকার ক্রন্দনের প্রথা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যদি সে স্বীয় পরিবারবর্গকে উহা হইতে বিরত করিয়া না যাইয়া থাকে বা তাহার দ্বারা কিম্বা তাহারই সম্মতিক্রমে ঐ প্রথা পরিবারবর্গের মধ্যে প্রচলিত হইয়া থাকে তবে মৃত ব্যক্তি ঐ হারাম কার্যের গোনাহের ভাগী সাব্যস্ত হইয়া শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে।

৬৭২। হাদীছ :—উসামা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কন্যা (যয়নব রা:) তাঁহার নিকট এই মর্মে সংবাদ পাঠাইলেন যে, আমার একটি ছেলে অস্তিম অবস্থায় পতিত হইয়াছে; আমার অনুরোধ—আপনি একটু তশরীফ আনিবেন। নবী (দ:) তত্পরে সালাম এবং এই বলিয়া পাঠাইলেন যে, সব কিছু একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই দান করিয়া থাকেন, উহা হইতে যতটুকু উঠাইয়া নেন তাহা তাঁহারই প্রদত্ত বস্তু উঠাইয়া নেন। তত্পরি জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি সবই (নির্ধারিত) সময় অনুসারে সংঘটিত হইয়া থাকে, এ বিষয়ে (ম ক্ষুব্ধ বা শোক-বিহ্বল না হইয়া) ধৈর্যধারণ কর এবং আল্লাহ তায়ালায় নিকট এই দুঃখ-বেদনার ছওয়াবের প্রতীক্ষা কর। নবী-কন্যা স্বীয় পিতাকে পুনরায় সংবাদ দিয়া পাঠাইলেন যে, আপনাকে খোদার কসম দিয়া বলিতেছি, আপনি নিশ্চয় আসিবেন। এবার রশূল্লাহ (দ:) কয়েক জন ছাহাবীকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় কন্যার গৃহে

উপস্থিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ শিশুটিকে রসুলুল্লাহ ছালামুল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল, তখন তাহার আত্মা ধড়ফড় করিতেছিল যেন এখনই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবে। এতদৃষ্টে রসুলুল্লাহ ছালামুল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের চক্ষুদ্বয় হইতে দয়দর করিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল। তখন হযরতের সঙ্গী সায়া'দ (রাঃ) বলিয়া উঠিলেন, ইহা কি ? ইয়া রসুলুল্লাহ ! রসুলুল্লাহ (দঃ) তত্বত্তরে বলিলেন, ইহা দয়া। আল্লাহ তায়ালা মানুষের অন্তরে “দয়া” প্রদান করিয়াছেন, (যাহারা খোদাপ্রদত্ত ঐ দয়াকে স্বীয় চরিত্রে ও কর্মক্ষেত্রে বিকশিত করিয়া থাকে সেই) দয়ালু ব্যক্তিগণের প্রতিই আল্লাহ তায়ালাও দয়াবান হইয়া থাকেন।

৬৭৩। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা এক নবী-নন্দিনীর দাকন কার্যে উপস্থিত ছিলাম। রসুলুল্লাহ ছালামুল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম কবরের কিনারায় বসিয়া ছিলেন, তাহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু বহিতেছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে অশ্রু রাতে জ্রী-সঙ্গম করে নাই। আবু তালহা (রাঃ) বলিলেন, আমি আছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকেই কবরে নামিতে বলিলেন। তিনি শব রাখিতে কবরে নামিলেন।

৬৭৪। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছালামুল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, পরিবারবর্গের ক্রন্দনের দরুন মৃত ব্যক্তি আজাব ভোগ করিয়া থাকে।

৬৭৫। হাদীছ :—ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছালামুল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মৃত ব্যক্তি স্বীয় পরিবারবর্গের কোন কোন ক্রন্দনের দরুন আজাব ভোগ করে।

৬৭৬। হাদীছ :—মুগিরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালামুল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, স্মরণ রাখিও, আমার প্রতি মিথ্যারোপ অশ্রু কাহারও প্রতি মিথ্যারোপের স্থায় নহে ; যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার প্রতি মিথ্যারোপ করিবে অনিবার্যরূপে তাহার ঠিকানা দোযখ হইবে।

মুগিরা (রাঃ) বলেন, (উক্ত হাদীছ জানা ও শুনা সত্ত্বেও বলিতেছি—) আমি নবী ছালামুল্লাহ আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যাহার মৃত্যুতে বিলাপ করিয়া ক্রন্দন করা হইবে তাহাকে ঐ ক্রন্দনের দরুন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে আলাচিত্ত ক্রন্দনের দুই প্রকারের দ্বিতীয় প্রকার ক্রন্দনের বিষয়ে যদি মৃত ব্যক্তি কোন প্রকার দোষী হয় অর্থাৎ তাহার দ্বারা ঐ প্রথা তাহার পরিবারবর্গে প্রচলিত হইয়াছিল বা সে তাহার জন্ত এইরূপ ক্রন্দনের কথা বলিয়া গিয়াছিল কিম্বা তাহাদের পরিবারে এই প্রচলন ছিল তবুও সে উহা নিষেধ করে নাই ইত্যাদি ; তবে সে বস্তুতঃ গোনাহের ভাগী হইয়া শাস্তিপ্ৰাপ্ত হইবে। আর যদি সে এ বিষয়ে দোষ-ত্রুটি হইতে মুক্ত হয়, তবে সে গোনাহের ভাগী হইয়া শাস্তি ভোগ করিবে

৬৭৯। হাদীছ :—সায়্যাদ ইবনে আবি ওয়াক্বাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায় হজ্জকালীন মক্কা শরীফে থাকাবস্থায় আমি ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইলাম। রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাকে দেখিবার জগ্ন আসিয়া থাকিতেন। একদা আমি আরজ করিলাম, আমার রোগ

হুশ ফিরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছালাম্মাহু আলাইহে অসাল্লাম যেক্রপ ব্যক্তির সহিত সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করিয়াছেন আমিও তাহার সহিত সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করি। (শোকাভিভূত হইয়া) যে ব্যক্তি চীৎকার করিয়া কাদে, মাথা মুড়িয়া ফেলে, জামা-কাপড় ফাড়িয়া ফেলে, রসুলুল্লাহ ছালাম্মাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহার প্রতি স্বীয় সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করিয়াছেন।

কাহারও মৃত্যুতে শোকাভিভূত হওয়া

৬৮১। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালাম্মাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ), জাফর (রাঃ) ও আবুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)-এর শাহাদাৎ সংবাদ পাইলেন তখন তিনি শোকাভিভূত হইয়া পড়িলেন; আমি (আয়েশা) দরওয়াজার ফাঁক দিয়া তাঁহাকে দেখিতেছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট জানাইল যে, জাফর রাজিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারের মহিলাগণ কাদিতেছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তাহাদিগকে ক্ষান্ত হইতে বল। দ্বিতীয়বার আসিয়া ঐ ব্যক্তি অভিযোগ করিল, তাহারা আমার নিষেধ মানিল না। রসুলুল্লাহ (দঃ) এবারও বলিয়া দিলেন, তাহাদিগকে ক্ষান্ত হইতে বল। তৃতীয়বার ঐ ব্যক্তি পুনরায় ঐ অভিযোগই করিল যে, তাহারা আমার কথায় আমল দেয় নাই। (যেহেতু তাহারা কোনরূপ সীমা অতিক্রম করে নাই, অথচ সচ শোকাবিষ্টা ছিল—যখন ক্রন্দন আসা অতি স্বাভাবিক, তাই ঐ ব্যক্তির এরূপ পীড়াপীড়িতে বিরক্ত হইয়া) রসুলুল্লাহ (দঃ) (বিরক্তি স্বরূপ) বলিলেন—(যদি তোমার ক্ষমতা থাকে তবে) তাহাদের মুখ মাটি-চাপা দিয়া বন্ধ করিয়া আস।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ)কে শোকাবস্থায় বার বার বিরক্ত করায় আমার ক্রোধ আসিয়া গেল। আমি তাহার প্রতি ভৎসনা করিয়া বলিলাম, আল্লাহ রসুল যাহা বলেন তাহা পূর্ণ করার ক্ষমতা হয় না, অথচ তাঁহাকে বিরক্তি হইতে অব্যাহতিও দিতেছে না।

৬৮২। হাদীছ :— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন এক ঘটনায় সত্তরজন কোরআন বিশারদ ছাহাবী একদল বিশ্বাসঘাতক দস্যুর হাতে শহীদ হইলেন। হযরত রসুলুল্লাহ ছালাম্মাহু আলাইহে অসাল্লাম দীর্ঘ এক মাস পর্য্যন্ত ঐ দস্যুদের প্রতি অভিশাপ করতঃ নামাযের মধ্যে দোয়া-কুহুত পড়িলেন এবং এত শোকবিজ্রল হইয়া পড়িলেন যে, অল্প কোন সময় তাঁহাকে এরূপ দেখি নাই।

শোকাবস্থায় শোকপ্রকাশ হইতে না দেওয়া

মোহাম্মদ ইবনে কাযা'ব (রঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা প্রতি খারাব ধারণা পোষণ এবং মুখে খারাব কথা বল—ইহা শোক নহে, বরং ইহা ত অধৈর্য্য; যাহা গোনাহ। (বস্তুতঃ “শোক” হইল—শুধু মনের বেদনা ও ব্যথা।)

৬৮৩। হাদীছ :—আনাছ (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, আবু তাল্হা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর একটি ছেলে অসুস্থ ছিল। আবু তাল্হা (রা:) বাড়ী হইতে বাহিরে কোথাও গিয়াছিলেন—এমতবস্থায় ছেলেটি প্রাণ ত্যাগ করিল। আবু তাল্হার (রা:) স্ত্রী ভাবিলেন, স্বামী রোগা অবস্থায় বাহিরে গিয়াছিলেন, ক্লান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিবেন, সেই মুহূর্তে ছেলের মৃত্যুর কথা জ্ঞাত হইলে কোনক্রমেই খানা-পানি গ্রহণ করিবেন না; বৈশাল হইয়া পড়িবেন। তাই তিনি) মৃত ছেলেটির গোসল দান ও কাফন পরান সম্পন্ন করিয়া উহাকে ঘরের এক কোণে রাখিয়া দিলেন। আবু তাল্হা (রা:) বাড়ী আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, ছেলেটির অবস্থা কিরূপ? তাঁহার স্ত্রী উত্তর করিলেন—সে এখন সুস্থির ও শান্ত আছে; আশা করি সে এখন আরামেই আছে। আবু তাল্হা (রা:) স্ত্রীর উত্তরকে বাহ্যিক অর্থে সন্তোষ করিয়া পূর্ণ শান্তির সহিত রাত্রি যাপন করিলেন, এমনকি রাত্রে স্ত্রী-সঙ্গমও করিলেন। ভোরবেলা গোসল করিয়া যখন ঘর হইতে বাহির হওয়ার ইচ্ছা করিলেন তখন তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে ছেলের মৃত্যু সংবাদ স্পষ্টরূপে জানাইলেন। আবু তাল্হা (রা:) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়িলেন এবং ছেলে ও স্ত্রীর সম্পূর্ণ ঘটনা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিলেন। রসূলুল্লাহ (স:) (তাঁহার স্ত্রীর বুদ্ধি ও সীমাহীন ধৈর্য্য দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইয়া দোয়া করিলেন এবং) বলিলেন—আশা করি আল্লাহ হোমাদের এই রাত্রি যাপনে বিশেষ বরকত দান করিবেন। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দোয়া ও সুসংবাদ অকরে অকরে পূর্ণ হইল; সেই উপলক্ষেই ছাহাবী আবুছল্লাহ ইবনে আবু তাল্হা জন্ম-গ্রহণ করিলেন। একজন মদীনাবাসী ছাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন, আমি দেখিয়াছি—এ স্ত্রীর পক্ষে আবু তাল্হা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ৯টি সন্তান হইয়াছিল; তাঁহারা প্রত্যেকেই বিশিষ্ট কোরআন বিশারদরূপে খ্যাতি লাভ করেন।

শোকপ্রাপ্তির প্রথম ভাগে ছবর ও ধৈর্য্যের ফজিলত

শোক ও দুঃখ-কষ্টে ছবর ও ধৈর্য্যধারণের ফজিলত স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝
 وَلِلّٰهِ عَلَيْهِمْ مَّلَآئِكٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۝ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝

“যাহারা শোক ও দুঃখ-কষ্টে পৌঁছিলে এই ভাবিয়া ধৈর্য্যধারণ করে যে, আমরা সকলেই আল্লাহর অধীন এবং আমাদের সকলেরই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে—এ সকল লোকদের প্রতি তাহাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে অসংখ্য ধন্যবাদ (Thanks) এবং বিশেষ রহমত ও করুণা, আর (এই স্বীকৃতি যে,) তাহারাই হেদায়েত ও সংপথের উপর।”

এই আয়াতে ছবর ও ধৈর্যধারণকারীদের জন্য তিনটি সুসংবাদ রহিয়াছে—(১) আল্লার তরফ হইতে ধন্যবাদ (Thanks)। (২) আল্লার বিশেষ রহমত ও করুণা। (৩) হেদায়েত ও সংপথের উপর হওয়ার স্বীকৃতি। ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, প্রথম দুইটি ত উত্তম সুসংবাদ আছেই তৃতীয়টি তথা আল্লাহ তায়ালা কতৃক স্বীকৃতি সংপথের পথিক হওয়ার—ইহাও আর একটি উত্তম সুসংবাদ।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ . وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ.....

“দীন-ছনিয়ার উন্নতি সহজ সুগত হওয়ার জন্য সাহায্য গ্রহণ কর ছবর—ধৈর্য ও নামাযের দ্বারা; নিশ্চয় ছবর ও নামায কঠিন কাজ, কিন্তু যাহারা আল্লার সম্মুখে হাজির হওয়ার কথা শ্রবণ রাখিয়া আল্লাহ তায়ালায় ভর্য অস্তরে জাগরিত রাখে তাহাদের জন্য উহা কঠিন থাকে না” (১ পাঃ ৫ রঃ)। এই আয়াতের মর্ম এই যে, ছবর ও ধৈর্য এত বড় রত্ন যে, ইহার দ্বারা দীন-ছনিয়ার উন্নতি সহজ ও সুগত হয়।

এইভাবে কোরআন-হাদীছে ছবর ও ধৈর্যের যত ফজিলত ও উপকার বর্ণিত হইয়াছে— সবই একমাত্র ঐ ছবর ও ধৈর্যের যাহা শোকের প্রথম আঘাতেই অবলম্বন করা হয়। বস্তুতঃ ছবর ও ধৈর্য একমাত্র উহাই; কারণ সময়ের অতিক্রমে স্বভাবতঃই শোক স্তিমিত হইয়া আসে, এমনকি বিলুপ্ত হইয়া যায়; তখন আর ছবর ও ধৈর্য অবলম্বনের কোন অর্থ থাকে না। অতএব একমাত্র শোকের প্রথম আঘাত হইতে ছবর ও ধৈর্যধারণ করিলেই ফজিলত ও উপকার লাভ হইতে পারে। আনাছ (রাঃ) কতৃক বর্ণিত ৬৭১নং হাদীছে হযরত নবী (দঃ) ^{أَوَّلَى} ^{الْمَصْرُ} ^{عِنْدَ} ^{الْمَدَامَةِ} ^{الْأَوَّلَى} “ছবর হয় শোকের প্রথম আঘাতে” বলিয়া উক্ত তথ্যই প্রকাশ করিয়াছেন।

শোকবাক্য গুথে উচ্চারণ করা

৬৮৪। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে আবু সাইফ কাইনের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। ঐ ব্যক্তির গৃহেই রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শিশু পুত্র ইব্রাহীম (রাঃ) প্রতিপালিত হইতেছিলেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় পুত্র ইব্রাহীমকে কোলে লইয়া চুম্বন করিলেন এবং বিশেষরূপে আদর করিলেন। দ্বিতীয়বার পুনরায় একদিন ঐরূপে উপস্থিত হইলেন, ঐদিন ইব্রাহীম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু বহিতে লাগিল। আবছর রহমান ইবনে আউফ ছাহাবী বলিয়া উঠিলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনিও…………(কাদেন)? রসূলুল্লাহ (দঃ) উত্তরে

বলিলেন, হে ইবনে আ'উফ! ইহা দয়ার নিদর্শন। রসুল্লাহ (দ:) পুনরায় অশ্রুবর্ষণপূর্বক বলিলেন, নয়নে অশ্রু, প্রাণে বেদনা; কিন্তু মুখে আল্লার অসন্তুষ্টির কোনও শব্দ উচ্চারিত হইবে না। হে ইব্রাহীম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মান্বিত।

রোগীর নিকট বসিয়া কাঁদা

৬৮৫। হাদীছ :—আবুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, সায়া'দ ইবনে ওবাদাহ (রা:) অস্তিমশয়্যায় পতিত হইলেন। একদা নবী ছালাম্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তিনজন ছাত্রকে লইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। নিকটে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে কি? তাহারা বলিল, না—ইয়া রসুল্লাহ (দ:)।

অতঃপর নবী ছালাম্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সায়া'দকে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। হৃদয়তক্কে কাঁদিতে দেখিয়া উপস্থিত সকলেই কাঁদিয়া উঠিল। তখন রসুল্লাহ ছালাম্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইলেন—স্মরণ রাখিও, নয়নের অশ্রু ও প্রাণের বেদনার দরুণ আল্লাহ তায়ালা শাস্তি দিবেন না, কিন্তু মুখের দরুণ শাস্তি দিবেন (যদি ক্রন্দনে বা খেদ প্রকাশের শরীয়ত বিরোধীরূপে উহাকে পরিচালনা করা হয়।) অথবা রহমত নাযেল করিবেন (যদি উহার দ্বারা ভাল কথা বাহির হয়, যেমন—“ইম্মা লিল্লাহে ওয়া ইম্মা ইলাইহে রাজ্জেউন” বলা।)

হৃদয়ত (দ:) আরও বলিলেন—স্মরণ রাখিও, (শরীয়ত বিরোধীরূপে) ক্রন্দনকারী শুধু নিজেই শাস্তি পাইবে না, কোন কোন ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তিও (ঐরূপ) ক্রন্দনে শাস্তি ভোগ করিবে।

৬৮৬। হাদীছ :—উম্মে আ'তিয়া (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা (কতিপয় মহিলা) নবী ছালাম্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বায়আ'ত তথা অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়াকালে তিনি বিশেষ-রূপে এই অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে, আমরা কাহারও মৃত্যুতে বিলাপের ক্রন্দন করিব না।

জানাযা আসিতে দেখিলে দাঁড়াইয়া যাইবে

৬৮৭। হাদীছ :—আমের ইবনে রবিয়া (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছালাম্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যখন কোন ব্যক্তি জানাযা আসিতে দেখে তখন যদি সে উহার সঙ্গে যাইতে না পারে তবে তাহার কর্তব্য হইবে দাঁড়াইয়া থাকা, যাবৎ উহা অতিক্রম করিয়া না যায় বা নামাইয়া রাখা না হয়।

৬৮৮। হাদীছ :—আবু সাযীদ খুদরী (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছালাম্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যখন জানাযা দেখে তখন দাঁড়াইয়া যাও এবং যে ব্যক্তি উহার সঙ্গে চলিবে, উহা নামাইয়া না রাখা পর্য্যন্ত সে বসিবে না।

৬৮৯। হাদীছ :—জাবের (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা একটি জানাযা আমাদের নিকট দিয়া যাইতেছিল। উহা দেখিয়া নবী ছালাম্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উঠিয়া দাঁড়া-

ইলেন। আমরা আরজ করিলাম—ইহা ইহুদীর জানাযা, ইয়া রসূলুল্লাহ (দ:) ! তিনি বলিলেন, যখন কোন জানাযা দেখিবে তখন দাঁড়াইয়া যাইবে।

৬৯০। হাদীছ :—আবদুর রহমান ইবনে লারলা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, সাহল ইবনে হোনাইফ (রা:) ও কায়স ইবনে সায়াদ (রা:) একদা একস্থানে বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া একটি জানাযা যাইতেছিল, উহা দেখিয়া তাহারা দাঁড়াইলেন। তাঁহাদিগকে বলা হইল, ইহা একজন (অমোসলেম জিন্নির জানাযা। তাহারা উভয়েই বর্ণনা করিলেন, একদা রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট দিয়া একটি জানাযা যাইতেছিল, উহা দেখিয়া তিনি দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহাকে বলা হইল—ইহা একজন ইহুদীর জানাযা; তৎপরে নবী (দ:) বলিলেন, প্রাণী নয় কি ?

ব্যাখ্যা :—কোন অমোসলমানের জানাযা দেখিয়া দাঁড়াইবার হেতু কি তাহার প্রতিই হয়রত রসূলুল্লাহ (দ:) ইস্তিত করিয়াছেন যে, ইহুদী হইলেও সে একটি প্রাণী ছিল এবং প্রাণী মাত্রের মৃত্যুই একটি ভয়-ভীতির বিষয়। অতএব উহা দেখিয়া অটলভাবে ধীরস্থির হইয়া থাকা পাবাণ হৃদয়ের পরিচায়ক যাহা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। বরং যে কোন প্রাণীর মৃত্যু দেখিয়া স্বীয় মৃত্যুকে স্মরণ করতঃ শিহরিয়া উঠা উচিত। যেমন মোসলেম শরীফের হাদীছে স্পষ্টতঃ উল্লেখ আছে—**ان الموت ذرع** মৃত্যু একটি ভয়জনক এবং শিহরিয়া উঠার বস্তু।

● মোসলেম শরীফে আলী (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, জানাযা দেখিয়া দাঁড়াইবার আদেশ মনচুখ—রহিত হইয়া গিয়াছে। পরবর্তী কালে নবী (দ:) বসিয়া থাকিতেন দাঁড়াইতেন না। সেমতে অধিকাংশ ইমামগণের মত মোসলমানের জানাযা দেখিয়াও দাঁড়াইবে না।

জানাযার সহযাত্রীরা বাহকদের স্বক হইতে জানাযা নামাইবার

পূর্বে বসিবে না; কেহ বসিলে দাঁড়াইতে বলিবে

৬৯১। হাদীছ :—সায়ীদ মাক্বুরীর পিতা কাইসান (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা একটি জানাযার সহযাত্রী ছিলাম। আবু হোরাযরা (রা:) এবং (মদীনার শাসনকর্তা) মারওয়ান একত্রে হাত ধরিয়া ঐ সঙ্গে চলিতেছিলেন। তাহারা উভয়ে জানাযা রাখিবার পূর্বে বসিয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ আবু সায়ীদ (রা:) (শাসনকর্তা) মারওয়ানের হাত ধরিয়া বলিলেন, উঠুন—দাঁড়াইয়া পড়ুন এবং আবু হোরাযরা রাজিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, কসম খোদার—তিনি জানেন, নবী (দ:) আমাদিগকে এইরূপ বসা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। আবু হোরাযরা (রা:)ও বলিলেন, আবু সায়ীদ (রা:) সত্যই বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা :—অধিকাংশ আলেমের মতে জানাযা নামাইয়া রাখার পূর্ব পর্য্যন্ত সহযাত্রীদের দাঁড়াইয়া থাকা মোস্তাহাব; বসিয়া পড়া মকরুহ। কোন কোন আলেম ওয়াজেদও বলিয়াছেন। এই সবই মৃত সোমেন ব্যক্তির সম্মানার্থে। মোমেন মোসলমান মৃত্যুর পরও সম্মান পাইবার অধিকারী। (ফতহুল বারী, ৩—১৩৯)

জানাযা লইয়া যথাসম্ভব দ্রুত চলিবে

৬৯২। হাদীছ :— عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنَّ تِلْكَ مَالِكَةٌ تَخْضِرُ ثَقَدٍ مَوْنَهَا وَإِنْ تِلْكَ سَوَى ذَلِكَ
فَنَشْرُ تَضَعُونَهَا عَنْ رِقَابِكُمْ -

অর্থ—আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—জানাযা লইয়া দ্রুত চলিবে। কারণ, মৃত ব্যক্তি যদি নেক্কার হয় তবে তাহার জগৎ নেয়ামত সামগ্রী প্রস্তুত রহিয়াছে; যথাসম্ভব তাহাকে উহার জগৎ নির্দিষ্ট স্থানে পৌছাইয়া দেওয়া চাই। আর যদি সে বদকার হয় তবে ইহা একটি অতি ভয়ঙ্কর বস্তু; যথাসম্ভব উহাকে স্বীয় স্বন্ধ হইতে অপসারিত করিয়া দিতে সচেষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মহুআলাহ :—শুধু পুরুষই শব বহন করিবে; নারীরা করিবে না। (১৭৫ পৃঃ)

মহুআলাহ :—জানাযা লইয়া চলার সময় উহার সঙ্গীগণ জানাযার পিছনে চলিবে ইহাই অধিক উত্তম। অবশ্য (দ্রুত চলার কর্তব্যে ব্যাঘাত ঘটিলে) কিছু সংখ্যক লোক সম্মুখেও চলিলে উহাতে দোষ হইবে না। (শামী; ১—৮৩৪)

আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, হে জানাযার সঙ্গীগণ। তোমরা জানাযার বিদায়-সম্মান প্রদর্শনকারী। (প্রয়োজনে) তোমরা উহার সামনে পিছে, ডানে-বামে চলিতে পার।

অন্য এক জন ছাহাবী বলিয়াছেন, জানাযার সঙ্গীগণ জানাযার কাছাকাছি চলিবে; একরূপ দূরে দূরে চলিবে না যে, উহার সঙ্গী বলিয়া মনে না হয়। (১৭৫ পৃঃ)

আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, জানাযাকে তোমার সম্মুখে রাখ, তোমার দৃষ্টি উহার প্রতি নিবদ্ধ কর; উহা তোমার জগৎ উপবেশ ও আত্মরাতের স্মারক এবং তোমাকে শিক্ষা দানকারী।

মৃত ব্যক্তি কি বলিয়া থাকে?

৬৯৩। হাদীছ :— أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا وَفِّعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا
الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ - فَإِنْ كَانَتْ مَالِكَةً قَالَتْ قَدْ مَوْنِي وَإِنْ كَانَتْ فَيْرَ
مَالِكَةٍ قَالَتْ لَا أَهْلَهَا يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ مَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا
الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنْسَانُ لَمَعِنَ -

অর্থ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালাম্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিতেন, যখন মৃতদেহ শবাধারে রাখিয়া অশ্মাশ্ম পুরুষগণ উহাকে কাঁধের উপর বহন করিয়া চলিতে থাকে, তখন মৃত ব্যক্তি যদি নেক্কার হয় তবে বলিতে থাকে—আমাকে দ্রুত সম্মুখে অগ্রসর কর। আর যদি সে বদকার হয় তবে সে স্বীয় আত্মীয়বর্গকে লক্ষ্য করিয়া বিকট চীৎকারের সহিত বলিতে থাকে, ইহারা এই নরাধমকে কোথায় লইয়া যাইতেছে?

তাহার এই চীৎকার মানুষ ভিন্ন অপরাপর সকল প্রাণীই শুনিতে পায়, মানুষ ঐ চীৎকার শুনিলে স্থির থাকিতে সক্ষম হইত না, অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া যাইত।

জানাযার নামায সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়

● সাধারণ নামাযে মোক্তাদীগণ যেরূপ সুবিন্যস্ত ও সোজা কাতার বাঁধে জানাযার নামাযেও তদ্রূপ কাতার বাঁধিবে; এলোমেলোভাবে দাঁড়াইবে না। উপস্থিত লোকদের দ্বারা তিনটি বা তদুর্ধ্ব বেজোড় সংখ্যায় কাতার বাঁধিবে। নবী ছালাম্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছে বর্ণিত আছে, তিন কাতার লোক যাহার জানাযার নামায পড়ে, সেই নামাযীদের দোয়া তাহার জন্য অবশ্যই কবুল হয় এবং তাহার মাগফেরাত হইয়া যায় (ফতহুলবারী ৩—১৪৫)।

● নাবালেগ ছেলেরাও জানাযার নামাযের জমাতে शामिल হইয়া নামায পড়িবে (১৭৭ পৃঃ)। ছেলেরা সকলের সঙ্গেই কাতারে দাঁড়াইতে পারে (১৭৬ পৃঃ)।

● জানাযার নামাযে রুকু-সেজদা নাই, কিন্তু ইহা নামাযই বটে; (নামাযের বিশেষ বিশেষ সাধারণ বিধান ইহাতেও প্রযোজ্য। যথা—কথা বলা নিষিদ্ধ, তকবীর বলিয়া আরম্ভ করিতে হইবে এবং সালাম ফিরিয়া সমাপ্ত করিতে হইবে। অজু ব্যতীত শুদ্ধ হইবে না, সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় পড়া যাইবে না, তকবীরের সময় হাত উঠাইতে হইবে (প্রথম তকবীরে ত অবশ্যই উঠাইবে; অপর তিন তকবীরে ইচ্ছাধীন)।

● পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের ইমামকেই জানাযার নামাযে ইমামতী করা উত্তম। জানাযার নামায এবং ঈদের নামায ঐ নামায যাহার জমাতে ছুটিয়া গেলে উহা আদায় ফরার কোন ব্যবস্থা থাকে না। সুতরাং যদি আশঙ্কা হয় যে, অজুতে লিপ্ত হইলে জানাযার বা ঈদের নামাযের জমাতে শেষ হইয়া যাইবে এমনতাবস্থায় গানি থাকা সত্ত্বেও দ্রুততার জন্য তায়াম্মুম করিয়া জমাতে শরীক হইবে। অবশ্য সম্পূর্ণ জমাতে ছুটিবার আশঙ্কায় তাহা করা জায়েয; অজু করিয়া কিছু অংশও পাওয়ার আশা থাকিলে অজু করিয়া शामिल হইবে। (শামী ১—২২৩)

● জানাযার নামাযের জমাতে কিছু অংশ হইয়া যাওয়ার পর কেহ शामिल হইতে চাহিলে ইমামের তকবীরের অপেক্ষা করিবে; ইমাম যে কোন তকবীর বলার সঙ্গে এই ব্যক্তি তকবীর বলিয়া আরম্ভ করিবে এবং ইমামের ইহা কোন তকবীর তাহা জ্ঞাত থাকিলে সে অনুপাতেই

দোয়া-দরুদ পড়িবে। আর তাহা জ্ঞাত না থাকিলে তাহার তকবীরকে প্রথম গণ্য করিয়া ছানা তারপর দরুদ তারপর দোয়া পড়িবে। ইমামের সালামান্তে সে তাহার বাকী তকবীর আদায় করিবে। আর যদি ইমামের চার তকবীর শেষ করার পর সালামের পূর্বকণ্ঠে উপস্থিত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তকবীর বলিয়া শামিল হইবে এবং ইমামের সালামান্তে তিন তকবীর বলিয়া সালাম করিবে (শামী—৮৩০, ৮৩১)। ইমামের সালামান্তে যে তকবীর আদায় করিবে উহাতে দোয়া-দরুদ পড়িবে যদি শবদেহ উঠাইয়া নেওয়ার আশঙ্কা না হয়; সেই আশঙ্কা হইলে শুধু তকবীর পূর্ণ করিবে (শামী, ১—৮১৪)।

ইবনুল-মোসাইয়েব (র:) বলিয়াছেন, রাত্রে-দিনে ছকরে ও বাড়ীতে সর্বাবস্থায়ই জানাযার নামাযের চার তকবীর। ● জানাযার নামায ঈদগাহে জায়েয আছে এবং মসজিদেও জায়েয (১৭৭ পৃ: ৬৫৫ হাদীছ)। অবশ্য হানফী মজহাব মতে কোন রকম ওজর ব্যতিরেকে মসজিদে জানাযার নামায মকরুহ—অনেকে মকরুহ তানযীহ বলিয়াছেন। বৃষ্টিকে ওজর বলা হইয়াছে এবং জানাযার জন্ত ভিন্ন জায়গা না থাকা বা সহজ সাধ্য না হওয়াকেও ওজর সাব্যস্ত করা হইয়াছে। চলাচলের সড়ক বা রাস্তা জানাযার নামাযের জায়গা গণ্য হইবে না—যেহেতু উহা পাক-পবিত্র হওয়ার নিশ্চয়তা নাই, বরং নাপাক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী; এমতাবস্থায় উহাতে জানাযার নামায শুদ্ধও নহে। শবদেহ মসজিদের বাহিরে রাখিয়া মসজিদে জানাযার নামায পড়া হইলে হানফী মজহাব মতেও অনেকে মকরুহ নয় বলিয়াছেন।

(শামী ১—৮২৭×৮২৯)

● হোমায়দ (র:) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা ছাহাবী আনাছ (রা:) আমাদিগকে নিয়া জানাযার নামায পড়িলেন; তিনি ভুলবশত: তিন তকবীর বলিয়াই সালাম করিয়া ফেলিলেন। তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে উহা জ্ঞাত করা হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি কেবলামুখী অবস্থায়ই চতুর্থ তকবীর বলিলেন, তারপর পুনঃ সালাম করিলেন। (১৭৬ পৃ:) ● শবদেহ দাফন হওয়ার পর কবরের নিকটবর্তী জানাযার নামায আদায় করা যায়; যদি নামায ছাড়া দাফন করা হইয়া থাকে। আর যদি জানাযার নামায হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মৃতের অলী তথা গাজিয়ান শামিল ছিল না তবে গাজিয়ান ইচ্ছা করিলে কবরের নিকট পুনঃ জানাযার নামায পড়িতে পারে। নবী (দ:) প্রত্যেক মোসলমানের সর্বশ্রেষ্ঠ গাজিয়ান, তাই তিনি ক্ষেত্র বিশেষে ঐরূপ করিয়াছেন যেমন ৬৫৬নং হাদীছে এবং ৩০০নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

কবরের নিকটবর্তী নিয়মিত জানাযার নামায আদায় করার জন্ত শর্ত এই যে, শবদেহ ফাটিয়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই এরূপ অবস্থায় হইতে হইবে। দেহ পটিয়া-গলিয়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে নিয়মিত জানাযার নামায হইতে পারে না।

দাফনকার্যে যোগদানের ছওয়াব

এই বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা ৪৩নং হাদীছে হইয়াছে। ● য়ায়েদ ইবনে ছাবেং (রা:) বলিয়াছেন, জানাযার নামাযে শামিল হইলে তোমার কর্তব্য আদায় হইয়া যায়।

ব্যাখ্যা :—মোসলমান মৃতের জানাযার নামায এবং তাহার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা ফরজে-কেফায়াহ—কিছু লোক আদায় করিলে সকলের ফরজ আদায় করিলে সকলের ফরজ আদায় হইয়া যায়। কিন্তু জানাযা আসিলে উপস্থিত লোকদের উপর মৃত মোসলমান ভাইয়ের প্রাপ্য হক তাহার জানাযার নামাযে शामिल হওয়া। নামাযে शामिल হইলে সেই বিশেষ হক আদায় হইয়া যায়। দাফনের জন্য জানাযার সঙ্গে যাওয়াও একটি হক বটে যাহার বয়ান ৬৫১ ও ৩৫২নং হাদীছে হইয়াছে, কিন্তু এই হক নামাযে शामिल হওয়া অপেক্ষা হালকা। অবশ্য উহাতেও অনেক ছওয়াব রহিয়াছে যাহার বয়ান আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত ৪৩নং হাদীছে রহিয়াছে।

● হোমায়দ ইবনে হেলাল (রাঃ) বলিয়াছেন, জানাযার সঙ্গ ত্যাগ করার জন্য অমুমতি গ্রহণের প্রয়োজন নাই। অবশ্য শুধু নামায আদায় করিয়া চলিয়া গেলে সঙ্গে যাইয়া দাফন সম্পন্ন করা অপেক্ষা অর্ধ ছওয়াব হইবে।

জানাযার নামাযে ইমামের দাঁড়াইবার স্থান

৬৯৪। হাদীছ :—সামুরা ইবনে জুনুব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পেছনে একটি মহিলার জানাযার নামায পড়িয়াছি। সমস্ত প্রসব সংক্রান্ত মহিলাটির মৃত্যু হইয়াছিল। নবী (দঃ) মহিলাটির মধ্য বরাবরে দাঁড়াইয়াছিলেন।

মহুআলাহ :—হানফী মজহাব মতে নারী-পুরুষ উভয়ের জানাযার নামাযে ইমাম মৃতের বক্ষ্য বরাবর দাঁড়াইবেন।

জানাযার নামাযে আলহামদু ছুরা পড়া

৬৯৫। হাদীছ :—তালহা ইবনে আবুহুলাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আবুহুলাহ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহুর পেছনে জানাযার নামায পড়িলাম। তিনি উহাতে ছুরা-ফাতেহা পাঠ করিলেন এবং বলিলেন, তোমাদের জন্য উচিত, ইহা স্মরণতই বটে।

ব্যাখ্যা :—জানাযার নামাযে প্রথম তকবীর বলিয়াই “ছানা” তথা আল্লাহ তায়ালা প্রশংসার দোয়া পড়া স্মরণত। ছুরা ফাতেহার মধ্যে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক শিক্ষা দেওয়া প্রশংসার বর্ণনা রহিয়াছে, তাই উহাও অতি উত্তম “ছানা”। অতএব উহা পাঠে ছানা পড়ার স্মরণত অবশ্যই আদায় হইবে।

মহুআলাহ :—জানাযার নামাযের প্রথম তকবীরের পর “ছানা” পড়িতে হয়। ছানা অর্থ আল্লাহ তায়ালা প্রশংসা। ছুরা ফাতেহার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা সুদীর্ঘ প্রশংসা রহিয়াছে, অতএব প্রথম তকবীরের পর ছানারূপে ছুরা ফাতেহা পাঠ করিলে দোষ নাই।

● হাসান বহরী (রাঃ) বলিয়াছেন, শিশুর জানাযার নামাযেও ছুরা ফাতেহা (বা ছানা) পড়িবে এবং (তৃতীয় তকবীরের পর) এই দোয়া পড়িবে—

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا ذُرِّيًّا وَسَلَفًا وَاجْرَأْ.

কবরকে সম্মুখে রাখিয়া বা কবরের উপর নামায পড়া, কিম্বা কোন কবরকে কেন্দ্র করিয়া উহার প্রতি তা'মীজ ও শ্রদ্ধা উদ্দেশ্যে উহাকে নামায স্থান করিয়া নেওয়া বা উহার উপর মসজিদ তৈয়ার করা

এই মছআলার বিষয়ে বোখারী (র:) নামায অধ্যায়ে ৬১ এবং ৬২ পৃষ্ঠায় দুইটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে ২৭৭, ২৭৮ ও ২৭৯ নম্বরে তিনটি হাদীছ অনুলিখিত হইয়াছে। বক্ষমান অধ্যায়েও ইমাম বোখারী (র:) ১৭৭ এবং ১৭৯ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ে দুইটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদের সমষ্টিকে এস্থলে একটি পরিচ্ছেদরূপে দেওয়া হইল। নিম্নে বর্ণিত হাদীছ ছাড়াও এই বিষয়ে এস্থানে উপরোল্লিখিত তিনটি হাদীছও লক্ষণীয়।

৬৯৬। হাদীছ :-আয়েশা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যত্নাশয্যায় বলিয়াছেন, ইহুদ-নাছারাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা লা'নৎ ও অভিশাপ ; তাহারা তাহাদের নবীগণের কবরকে সেজদার স্থান বানাইয়াছিল। আয়েশা (রা:) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কবরকে সেজদার স্থান বানাইবার আশঙ্কা না থাকিলে উহা উন্মুক্ত রাখা হইত। আশঙ্কা হয়, উহাকে সেজদার স্থান করা হইবে। (লোকেরা উহাকে সেজদা করিবে, তাই উহাকে আবদ্ধ রাখা হয়।) (১৭৭ পৃ:)

পবিত্র ও বরকতের স্থানে সমাহিত হওয়ার চেষ্টা করা

৬৯৭। হাদীছ :-আবু হোরাযরা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, (রসুলুল্লাহ (দ:) বর্ণনা করিয়াছেন,) মুসা আলাইহেছালামের প্রতি গউতের ফেরেশতা আযরাঈল (আ:) প্রেরিত হইলে মুসা (আ:) তাঁহাকে এমনি এক চপেটাঘাত করিলেন যাহাতে তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গেল। আযরাঈল (আ:) আল্লাহ তায়ালা নিকট ফিরিয়া আসিয়া আরজ করিলেন, আপনি আমাকে এমন এক বন্দার প্রতি পাঠাইয়াছিলেন যিনি যত্নাবরণ করিকে ইচ্ছুক নহেন। আল্লাহ তাঁহার চক্ষু ভাল করিয়া দিয়া পুনরায় যাইবার আদেশ করিলেন এবং মুসা (আ:)কে এই কথা বলিতে আদেশ করিলেন যে, আপনি একটি বলদের পৃষ্ঠে হাত রাখুন, আপনার হাতের নীচে যতগুলি লোম ঢাকা পড়িবে ঠিক তত বৎসরের বয়স আপনাকে প্রদান করা হইবে।

আযরাঈল ফেরেশতা তাহাই করিলেন। মুসা (আ:) আল্লাহ তায়ালা নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রব্ব! তত বৎসর বয়সের পর কি হইবে? আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, যত্নাবরণ করিতে হইবে। তখন মুসা (আ:) আরজ করিলেন, অবশেষে যত্ন যখন অনিবার্য হইবে তাহা হইলে এখনই যত্ন সংঘটিত হউক। মুসা (আ:) তখন আল্লাহ তায়ালা নিকট এই দরখাস্ত করিলেন যে, আমাকে বাইতুল-মোকাদ্দাসের অতি নিকটবর্তী করিয়া দিন।

হযরত (দ:) বলিয়াছেন, (আল্লাহ তায়ালা মুসা (আ:)-এর উক্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াছেন ; তাঁহার সমাধি বাইতুল-মোকাদ্দাসের নিকটেই।) আমি তথায় থাকিলে তোমাদিগকে তাঁহার সমাধিস্থলটি দেখাইতে পারিতাম ; রাস্তার এক পাশে লাল বর্ণ একটি টিলার নিকটে অবস্থিত।

ব্যাখ্যা :—নবীগণের মর্তবা অতিশয় উচ্চ ও অতি উর্দে, এমনকি বড় বড় ফেরেশতা-গণও তাঁহাদের খাদেম স্বরূপ। বিশেষতঃ হযরত মুসা (আঃ) জালালী তবীয়তের অতি বিশিষ্ট নবী ও রসূল ছিলেন। বিশেষ কোন কারণেই তিনি আযরাঈল ফেরেশতার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। আযরাঈল ফেরেশতা তাঁহার ঐ ব্যবহারে ধারণা করিয়াছিলেন যে, তিনি মৃত্যু বরণ করিতে ইচ্ছুক নহেন, প্রকৃত কথা তাহা নহে। সুতরাং এই বিষয়টিকে প্রকাশিত করিবার জন্তই আল্লাহ তায়ালা পুনরায় আযরাঈলকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন এবং এত অসংখ্য বৎসর বয়সের সুযোগ দান করা সত্ত্বেও মুসা (আঃ) উহাকে তুচ্ছ মনে করতঃ নিজেই উহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন এবং যেচ্ছায় তখনই মৃত্যুবরণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

মুসা (আঃ) আযরাঈলের সহিত কেন ঐরূপ করিয়াছিলেন, সে কৈফিয়ত আল্লাহ তায়ালাই যখন তলব করেন নাই তখন সে বিষয়ে গবেষণায় প্রযুক্ত হওয়া অনধিকার চর্চা বই নহে।

শহীদের জন্ত জানাযার নামায

৬৯৮। হাদীছ :—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (কাফনের কাপড়ের অভাবে) ওহোদ জেহাদের শহীদগণের দুই দুইজনকে এক কবরে চাদরের নীচে দাফন করিয়াছিলেন। দুইজনের মধ্যে যাহার কোরআন শরীফ অধিক কণ্ঠস্থ ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইত তাঁহাকে প্রথমে কবরে রাখিতেন। এইরূপে সকলের দাফন সমাপ্ত করিয়া রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, আমি কয়ামতের দিন তাহাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিব। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁহাদিগকে রক্তাক্ত শরীরেই দাফন করার আদেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে গোছল দেওয়া হয় নাই এবং তাঁহাদের উপর জানাযার নামাযও পড়া হয় নাই।* জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা ও চাচাকে এক সঙ্গে একটি চাদরের নীচে দাফন করা হইয়াছিল, উভয়েই ওহোদের জেহাদে শহীদ হইয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা :—জাবের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পিতার সঙ্গে এক কবরে যিনি দাফন হইয়াছিলেন তিনি বস্তুতঃ তাঁহার পিতৃব্য ছিলেন না, বরং তাঁহার পিতার বিশেষ বন্ধু ও ভগ্নিপতি ছিলেন। এখানে জাবের (রাঃ) মুরবিব হিসাবে তাঁহাকে চাচা বলিয়াছেন, তাহার নাম আমর ইবনুল জামুহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

মছআলাহ :—প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন কবর না করিয়া প্রশস্ত এক কবরে একাধিক শবদেহ রাখা যায়, তখন কোরআনের এলুম যাহার বেশী তাঁহাকে প্রথমে রাখা হইবে।

* হানবী মজহাব মতে শহীদের উপর জানাযার নামায অবশ্যই পড়িতে হইবে ; এ সম্পর্কে হাদীছে স্পষ্ট প্রমাণ বিস্তারিত আছে। আলোচ্য হাদীছের উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেকের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন জানাযার নামায পড়া হইয়াছিল না। রণাঙ্গণে মৃতের সংখ্যা বেশী থাকায় দশ দশজনের নামায এক সঙ্গে পড়া হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ আছে।

৬৯৯। হাদীছ :—ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালাল্লাহ্ আলাইহে অসাল্লাম (ইহকাল ত্যাগের নিকটবর্তী সময়ে) একদা ওহোদের শহীদানগণের সমাধিস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং জানাযার নামাযের ছায় তাঁহাদের কবরের নিকটবর্তী নামায পড়িলেন (শহীদের মৃতদেহ অবিকৃতই থাকে।)† অতঃপর মসজিদে আসিয়া মিন্বরে উপবিষ্ট হইলেন এবং ছাহাবীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমি তোমাদের পক্ষ হইতে (আখেরাতের পানে) তোমাদের অগ্রদূত স্বরূপ যাইতেছি; আমি তোমাদের পক্ষ সাক্ষ্য দানকারী হইব। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, (কেয়ামতের ভীষণ ময়দানে আমার উন্মত্তকে সাহায্যের জন্য আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে হাওজে-কাওছার বিশ্বরূপে দান করিয়াছেন সেই) হাওজে-কাওছারকে বর্তমান অবস্থাতে এখান হইতেই আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি। তিনি আরও বলিলেন, (স্বপাযাগে এবং নবীর স্বপ্ন অহী) আল্লাহ তরফ হইতে বিশ্বকোষের চাবিগুচ্ছ আমার হাতে দেওদা হইয়াছে। (অর্থাৎ আনতিকালের মধ্যেই বিশ্বের আধিপত্য এই উন্মত্তের করতলগত হইবে; তাই পুনঃ শপথ করিয়া বলিতেছি,) আমি তোমাদের সম্পর্কে এই আশঙ্কা করি না যে, তোমরা (অর্থাৎ মোসলেম সমাজ) ইসলাম ত্যাগ করতঃ মোশয়েক—পৌত্তলিক হইয়া যাইবে। পরন্তু এই আশঙ্কা আমার ভিতরে অতি প্রবল যে, (ছনিয়ার ধন-সম্পদ তোমাদের উপর বিস্তৃত হইল) তোমরা ছনিয়ার ধন-সম্পদের মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগী হইয়া উহাতে মত্ত ও লিপ্ত হইতে থাকিবে, (এবং ধন-সম্পদে মত্ত হইয়া আখেরাতকে ভুলিয়া যাইবে, উহাতেই তোমাদের ধ্বংস সাধিত হইবে।)

মছআলাহ :—শহীদ মৃতকে গোসল দিবে না; রক্তাক্ত দেহে এবং রক্তাক্ত কাপড়ের দাবান করিবে। তাঁহার সম্মানার্থে কিছু নুতন কাপড়ও কাফনে দিবে।

কারণ বশতঃ মৃতদেহকে কবর হইতে বাহির করা

৭০০। হাদীছ :—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন ওহোদের জেহাদের প্রস্তুতি হইল, আমার পিতা (জেহাদ আরম্ভের পূর্বেই) রাত্রে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার মনে হইতেছে, আমি এই জেহাদের সর্বপ্রথম শহীদানদের মধ্যে একজন হইব। তিনি আরও বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহ্ আলাইহে অসাল্লামের পরে তোমার চেয়ে অধিক প্রিয়পাত্র আমার নিকট আর কেহ নাই। অতএব, আমার উপর যে সকল ঋণ আছে সেগুলি তুমি পরিশোধ করিবে+ এবং আমি তোমাকে অছিয়ত করিয়া যাইতেছি, তুমি তোমার ভগ্নিদের প্রতি ভাল দৃষ্টি রাখিবে এবং তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে।

† কাহারও মতে হয়ত (দঃ) নিজ গৃহ হইতে বাহির হইয়া মসজিদেই ওহোদের শহীদানগণের জন্য শুধু বিশেষ দোয়া করিয়াছিলেন, অতঃপর মিন্বরে আরোহণ করিয়াছিলেন।

+ জাবের (রাঃ) স্বীয় পিতার আদেশ ও অছিয়ত পূর্ণরূপে পালন করিয়াছিলেন এবং এই ব্যাপারে রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহ্ আলাইহে অসাল্লামের একটি মোজ্জযাও প্রকাশ পাইয়াছিল।

পরদিন জেহাদ আরম্ভ হইলে সত্য সত্যই আমার পিতা প্রথম শহীদদের মধ্যে একজন হইলেন এবং তখনকার উপস্থিত ব্যবস্থানুযায়ী তাঁহাকে অস্ত্র একজন শহীদের সঙ্গে এক কবরে দাফন করা হইল।

(জাবের (রাঃ) বলেন—আমি ইহাতে সন্তুষ্ট ছিলাম না যে, আমার পিতা এক কবরের মধ্যে অস্ত্রের সঙ্গে থাকুন; তাই ঘটনার ঠিক ছয় মাস পর কবর খুঁড়িয়া আমি আমার পিতাকে বাহির করিয়া লইলাম। দীর্ঘ ছয় মাস পর তাঁহার সব বাহির করিয়া দেখিতে পাইলাম, তাঁহার দেহ দাফন করার দিন যে রূপ ছিল তখনও ঠিক তজ্জপই আছে, কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটে নাই; শুধুমাত্র এক কানের লতির মধ্যে সামান্য একটু দাগের স্থায় দেখা যায়। অতঃপর আমি তাঁহাকে ভিন্ন একটি কবরে পুনরায় দাফন করিয়া দিলাম।

ব্যাখ্যা :— আল্লাহ রাস্তায় জেহাদে যাহারা শাহাদৎ বরণ করেন তাঁহারা সাধারণ মৃতের স্থায় নহেন, এই বিষয়টি পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا - بَلْ أَحْيَاءٌ.....

অর্থ—যাহারা আল্লাহ রাস্তায় শাহাদৎ বরণ করিয়াছেন, তোমরা কখনও তাঁহাদিগকে মৃত মনে করিও না, বরং তাঁহারা জীবিত, আল্লাহ তায়ালায় নিকট তাঁহারা বিশেষরূপে নেয়ামত ও সামগ্রী উপভোগ করিতেছেন।

আল্লাহ রাস্তায় শহীদগণ যে মৃত নহেন, তাহার একটি সাধারণ প্রতিক্রিয়া এই যে, শহীদের দেহ মাটিতে নষ্ট হয় না। যেমন কোনও জীবিত ব্যক্তি মাটির উপর শুইয়া থাকিলে তাহার দেহকে মাটি গ্রাস করিবে না। উক্ত প্রতিক্রিয়ার একটি প্রত্যক্ষ নমুনা ছহীহ বোখারী শরীফে বর্ণিত আলোচ্য ঘটনার দ্বারা প্রতীয়মান হইল।

জাবের (রাঃ) ছাহাবীর পিতা আবুল্লাহ (রাঃ) এবং তাঁহার বন্ধু সম্পর্কে ইমাম মালেক (রঃ) “মোয়াস্তা” নামক কেতাবে ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই শহীদদ্বয়কে দাফন করার দীর্ঘ ছয়চল্লিশ বৎসর পর পার্বত্য বস্তার স্রোত হইতে রক্তের জল (দ্বিতীয় বার) তাঁহাদিগকে করার হইতে স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছিল; তখনও তাঁহাদিগকে এইরূপ পাওয়া গিয়াছিল যেন এইমাত্র দাফন করা হইয়াছে।

ঐ বন্ধু সম্পর্কে ঐ কেতাবে আশ্চর্যজনক এই ঘটনাও উল্লেখ আছে—“৪৬ বৎসর পরেও দেখা গেল, তিনি যেই আঘাতে শহীদ হইয়াছিলেন ঐ আঘাত স্থানের উপর তাঁহার একখানা হাত স্থাপিত রহিয়াছে। লোকেরা ঐ হাতখানাকে সোজা করিয়া দিল, কিন্তু পুনরায় উহা আঘাত-স্থানের উপর চলিয়া গেল।

নাবালেগ বালক ইসলাম গ্রহণ করিলে তাহা শুদ্ধ

● নাবালেগ বালক ইসলামকে বুঝিয়া গ্রহণ করিলে তাহার ইসলাম শুদ্ধ হইবে; সর্বক্ষেত্রে সে মোসলমান গণ্য হইবে। এমতাবস্থায়ই তাহার মৃত হইলে তাহার নিয়মিত

কাফন-দাফন এবং জানাযার নামায পড়া হইবে। এজন্যই যেখানে অমোসলেমদের ইসলাম বুঝাইয়া গ্রহণের আহ্বান জানান হয় সেখানে বুঝমান নাবালেগ বালককেও ইসলামের আহ্বান জানাইতে হইবে।

মাতা-পিতার একজন মোসলমান হইয়াছেন, অপর জন অমোসলেম—তাহাদের নাবালেগ সন্তানরা আইনগত অধিকারে মোসলমান জনের প্রাপ্য সেই নাবালেগ মারা গেলে তাহার প্রতি মোসলমান মৃতের ব্যবস্থা গ্রহণ করাই ইসলামের বিধান।

ইমাম ইবনে শেহাব যুহরী (রঃ) বলিয়াছেন, মোসলমান মাতার অবৈধ গর্ভজাত সন্তানও মোসলমান পরিগণিত; সেই সন্তানও জানাযার নামায এবং নিয়মিত কাফন-দাফনের অধিকারী হইবে। তজ্জপ অমোসলেম মাতার গর্ভজাত সন্তান মোসলমান গণ্য হইবে যদি পিতা মোসলমান হয় (১৮১ পৃঃ)। কারণ, ইসলাম সর্বক্ষেত্রে উপরস্থ থাকিবে। এমনকি ইমাম যুহরী ও ইমাম মালেকের মতে কোন মোসলমান পুরুষ অমোসলমান নারীর সহিত জেনা করার সন্তানের জন্ম হইলে সেই সন্তানও মোসলমান পরিগণিত হইবে (ফতহুল-বারী, ৩—১৭২)।

মোসলমান পরিগণিত শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হইলে যদি আত্মার সহিত ভূমিষ্ট হওয়ার কোনও নিদর্শন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে তবে তাহার জানাযার নামায এবং নিয়মিত কাফন-দাফন অবশ্যই করিতে হইবে। আত্মার সহিত ভূমিষ্ট হওয়ার কোনও নিদর্শন অনুভূত না হইয়া থাকিলে তাহার জানাযার নামায পড়া হইবে না (এবং নিয়মিত কাফনের প্রয়োজন নাই; একটি কাপড়ে জড়াইয়া দাফন করা হইবে, চাপামাটি দেওয়া যাইবে না।) (১৮১ পৃঃ)।

৭০১। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, অপ্রাপ্ত বয়স্ক এক ইহুদী বালক নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমত করিত। সে অস্তিমশয়্যায় পতিত হইলে নবী (দঃ) তাহাকে দেখিতে আসিলেন এবং তাহার শিয়রে বসিয়া তাহাকে বলিলেন; তুমি মোসলমান হইয়া যাও। সে তাহার পিতার প্রতি তাকাইল, তাহার পিতাও তাহাকে এই পরামর্শই দিল যে হযরতের আদেশ গ্রহণ কর। সে ইসলাম কবুল করিল। নবী (দঃ) বলিলেন, **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَنَا مِنَ النَّارِ** “আল্লাহ তায়ালা শোকর ও প্রশংসা তিনি তাহাকে দোষহ হইতে রক্ষা করিলেন” এই বলিয়া হযরত (দঃ) তথা হইতে চলিয়া আসিলেন।

মুম্বু অবস্থায় কাফের কলেমা পড়িলে গ্রাহ হইবে

৭০২। হাদীছ :—মোছাইয়েব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন আবু তালেবের মৃত্যু ঘনাইয়া আসিল তখন রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। পূর্বে হইতেই আবু জহল ও আবু হুলাইব ইবনে আবী-উমাইয়া কাফের সরদারদ্বয়ও তাহার নিকটে বসিয়া ছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) আবু তালেবকে বলিলেন, চাচাজান। আপনি

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ কলেমার স্বীকারোক্তি করুন, তবেই আমি উহা লইয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট আপনার জন্ত দাঁড়াইতে পারিব এবং সাফ্য দিতে সক্ষম হইব। তখন আবু ছহল ও আবুল্লাহ ইবনে আবী উমাইয়া বলিল, হে আবু তালেব! তুমি কি জীবনের শেষ মুহূর্তে স্বীয় পিতা আবহল মোত্তালেবের ধর্ম পরিত্যাগ করিবে? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে পুনঃ পুনঃ স্বীন ইসলামের প্রতি আহ্বান করিতে লাগিলেন এবং কাকেরদয় বার বার তাহাকে ঐ কথা বলিতে লাগিল। এমনকি আবু তালেবের শেষ বাক্য এই যে, সে আবহল মোত্তালেবের ধর্মের উপরেই আছে এবং اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ কলেমা বলিতে অস্বীকার করিল। আবু তালেবের এই অবস্থায় রসুলুল্লাহ (স:) ভীষণ অনুতপ্ত হইলেন এবং বলিলেন, খোদার কসম—যাবৎ আল্লাহ তায়াল। আমাকে নিষেধ না করিবেন আমি পিতৃব্যের জন্ত কমা প্রার্থনা করিয়া যাইব। এই উপলক্ষেই আয়াত নাযেল হইল—

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ.....

অর্থ—নবী এবং মোমেনদের জন্ত অমুমতি নাই, তাহারা কাকের-মোশরেকের জন্ত কমা প্রার্থনা করে যদিও সে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয়—তাহার জাহান্নামী হওয়া সুস্পষ্ট হইয়া যাওয়ার (তথা কাকের অবস্থায় মৃত্যু হওয়ার) পর (১১ পাঃ ৩ রূঃ)।

মহুআলাহ :-কোন ব্যক্তি সারা জীবন কাকের-মোশরেক থাকিয়া মৃত্যুকালে ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ পূর্বক কলেমার (বা উহার মর্মের) স্বীকৃতি জানাইলে সে মোসলমানরূপে জানাযার নামায এবং নিয়মিত কাকন-দাকনের অধিকারী হইবে।

● ঈমান ও ইসলামহীন অবস্থায় মৃত্যু হইলে তাহার জন্ত জানাযার নামায পড়া পড়া নিষিদ্ধ; ঐরূপ ব্যক্তির জন্ত কোন ভাস দোয়া করাও নিষিদ্ধ। এই নিষেধাজ্ঞা পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট বিবৃতি। আয়াতটি উপরে বর্ণিত হইয়াছে।

কবরের উপর ডালা ইত্যাদি গাড়িয়া দেওয়া

বোরাযদা আসলামী (রা:) মৃত্যুকালে অছিয়ত করিয়াছিলেন, তাহার কবরে যেন দুইটি ডালা পুতিয়া দেওয়া হয়। এই বিষয়টি ১৯৫ নং হাদীছেও প্রমাণিত আছে।

আত্মহত্যাকারীর অবস্থা কি হইবে?

৭০৩। হাদীছ :-ছাবেত ইবনে জাহ্বাক (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সেচ্ছায় কোন মিথ্যা বিষয়ের উপর বিশ্বাসী হওয়ার শপথ করিবে (তাহার এত বড় গোনাহ হইবে যেমন সে প্রকৃতই বিশ্বাসী হইয়া

* যেমন—কেহ বলিল, আমি অমুক কাজ করি নাই, যদি করিয়া থাকি তবে আমি ইহুদী বা নাহরানী বা হিন্দু বা কাকের অঞ্চ সে উহা কব্বিলাছে এবং ইচ্ছাকৃত মিথ্যা শপথ করিতেছে।

৭০৭। হাদীছ :—আবুল আসওয়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি মদীনা শরীফে আসিলাম, তখন সেখানে এক প্রকার মহামারী দেখা দিয়াছিল। আমি ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট বসিয়াছিলাম, আমাদের নিকট-পথে একটি জানাযা যাইতেছিল, ওমর (রাঃ) বলিলেন, নির্কারিত হইয়া গিয়াছে। অতঃপর দ্বিতীয় আর একটি জানাযা যাইতে লাগিল, এই মৃতের প্রতিও প্রশংসা করা হইল; ওমর (রাঃ) বলিলেন, নির্কারিত হইয়া গিয়াছে। অতঃপর তৃতীয় আর একটি জানাযা যাইতে লাগিল, এই মৃতের প্রতি খারাব মন্তব্য করা হইল; ওমর (রাঃ) এবারও বলিলেন, নির্কারিত হইয়া গিয়াছে। (হাদীছ বর্ণনাকারী বলেন) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আমীরুল-মোমেনীন! কি নির্কারিত হইয়াছে। তিনি বলিলেন, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এরূপ ক্ষেত্রে যাহা বলিয়াছেন আমিও তাহাই বলিলাম। নবী (দঃ) বলিয়াছেন—

أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَنَا أَرْبَعَةً بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ - فَقُلْنَا وَثَلَاثَةً قَالَ وَثَلَاثَةً فَقُلْنَا وَإِثْنَانِ قَالَ وَإِثْنَانِ ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ -

অর্থ—যে কোন মোসলমান মৃত ব্যক্তির পক্ষে চারজন লোক তাহার সৎ বা নেক হওয়ার সাক্ষ্য দান করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বেহেশত দান করিবেন। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি তিন জন সাক্ষী হয়? নবী (দঃ) বলিলেন, তিন জন হইলেও তজ্রপই হইবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি দুই জন সাক্ষী হয়? নবী (দঃ) বলিলেন, দুইজন হইলেও তজ্রপই হইবে। অতঃপর আমরা একজন সাক্ষীর বিষয় জিজ্ঞাসা করি নাই।

ব্যাখ্যা :—আলোচ্য হাদীছে উল্লিখিত সাক্ষ্যের তাৎপর্য এই যে, সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত আক্রোশ বা স্বার্থ বিবজ্জিত সাধারণ সৎ লোকগণ, এমনকি এরূপ দুই চার জনও মৃত ব্যক্তির স্বভাব চরিত্র ও গুণাগুণের ভিত্তিতে ভাল সাক্ষ্য দিলে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী তাহার জন্ত বেহেশতের ফয়ছালা করিবেন। তাহার দোষ-ত্রুটি থাকিলে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রহমতে উহা ক্ষমা করিয়া দিবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির স্বভাব-চরিত্র ও আচার ব্যবহারে সর্বসাধারণ সৎ লোকদের ক্ষতি হয় বা মনে কষ্ট হয় যদ্বরূপ তাহার নাম আসিলেই লোক মুখে তাহার কুৎসা বণিত হয় সে বস্তুতঃই অসৎ সাব্যস্ত; সে আল্লাহর প্রিয় হইতে পারে না।

আলোচ্য হাদীছসমূহে একটি বিশেষ শিক্ষা ও উপদেশ রহিয়াছে যে, সৎচরিত্র, সৎস্বভাব, সদ্যবহার ও পরোপকারীতার মূল্য ইসলামে অনেক বেশী। মানবের উচিৎ জীবিতকালে উহার প্রতি বিশেষরূপে যত্নবান হওয়া, যেন তাহার মৃত্যুর পর মানুষের মুখে স্বতঃস্ফূর্ত তাহার সুকীতি ও নেকনামী ফুটিয়া উঠে। এই সুখ্যাতি ও নেকনামীর সাক্ষ্য মানুষের জন্য নাজাতের অছিলাসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি অছিল।

কবরের আজাব

বাহ্যিক ও স্থূল যুক্তিবাদী লোকদের স্বভাব এই যে, তাহারা সাধারণ দৃষ্টি ও স্থূল যুক্তির গণ্ডির বাহিরের বিষয়বস্তুর প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ করে। তাহাদের এই স্বভাব জাগতিক বিষয়াবলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলে সহনীয় হইত। কিন্তু তাহাদের আশ্চর্যজনক সীমার ধার ধারে না বলিয়া তাহারা ইহজগৎ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন অন্য অ-জড় জগতের নিয়মাবলীকেও ঐ একই স্থূল যুক্তি এবং বাহ্যিক দৃশ্য বস্তুর মাপকাঠিতে পরিমাপ করিতে চায়; ইহা অন্যায্য ও নিবুদ্ধিতার পরিচায়ক।

কবরের আজাব বা সুখ-শান্তি ইত্যাদি বিষয়সমূহকেও যুক্তির পুঞ্জারীগণ পূর্ণরূপে তাহাদের স্বীয় যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে বুঝিবার ও উপলব্ধি করিবার দাবী জানাইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের বুঝা উচিত যে, কবর তথা আলমে-বরযথ (বরযখী-জগৎ) ইহজগৎ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন অন্য একটি অ-জড় জগৎ—যাহা আখেরাতের প্রথম মঞ্জিল। আখেরাতের উপর ঈমান রাখার অর্থ শুধু “আখেরাত” শব্দটিকে অস্বাভাবন করা নয়, বরং আল্লাহ ও রসুলের বাণী তথা কোরআন ও হাদীছ দ্বারা আখেরাতের যে সব হাল-অবস্থা ও বিষয়াবলী প্রমাণিত হইয়াছে ঐ সবকে পূর্ণরূপে মানিয়া লওয়াই আখেরাতের উপর ঈমান আনার প্রকৃত অর্থ। কোরআন ও হাদীছ অবশ্য অবশ্যই খাঁচী যুক্তি ও বিজ্ঞানের বরখেলাফ নহে, কিন্তু ইহা ভালরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোরআন ও হাদীছের মধ্যে এমন বহু বিষয়াবলী বিদ্যমান রহিয়াছে, যে-সবকে আমাদের মানবীয় বুদ্ধি ও যুক্তি আয়ত্তে আনিতে ও জয় করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। কারণ, আমরা ইহজগতের প্রাণী, তাই অনিবার্যতঃ আমাদের যুক্তি ও বিজ্ঞান কেবলমাত্র ইহজগতের বিষয়াবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। পক্ষান্তরে কোরআন ও হাদীছ ইহজগৎ ও পরজগৎ উভয় জগতের বিষয়াবলীর আলোচনা করে। পরজগৎ তথা আখেরাত আমাদের যুক্তি ও বিজ্ঞানের উর্দে ও অজ্ঞেয়। সেই জগৎ সম্পর্কে হাল্কা যুক্তি ও বিজ্ঞানের নিষ্ফল হাতুড়ানি নিছক অবাস্তব।

আখেরাতের বিষয়াবলীর সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহ ও রসুলের বাণী তথা কোরআন ও হাদীছের সহিত। তাই বোধারী (ঃ) “কবরের আজাব”কে প্রমাণিত করার জন্য প্রথমতঃ কোরআনের কতিপয় আয়াত, তারপর কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন।

এখানে ভূমিকা স্বরূপ তিনটি বিষয় বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ—কবর বলিতে ইসলামী পরিভাষায় “আলমে-বরযথ” বুঝায়, কেবলমাত্র মৃতদেহকে পুঁতিয়া রাখার গর্তই বুঝায় না। “আলমে-বরযথ” ইহজগৎ হইতেও অসংখ্য গুণ প্রশস্ততর একটি আলম বা জগৎ; ইহজগৎ বা হাশরের মধ্যবর্তী সময়ে মানব ইহাতে অবস্থান করিয়া থাকে। মানবের মৃত্যুর অর্থ এই যে, সে ইহজগৎ ত্যাগ করিয়া আলমে-বরযথে চলিয়া গিয়াছে। ইহজগতে থাকাকালীন সে যেকোন জীবিত এবং তাহার সুখ-দুঃখ সম্পর্কে তাহার

উপর সৃষ্টিকর্তার সমুদয় আদেশাবলী (ফেরেশতাগণ মারফত) কার্য্যকরী হইয়া থাকে ; তদ্রূপ আলমে-বরযথবাসীগণও তথাকার জীবনে জীবিত। তথায় তাহাদের সুখ-দুঃখ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার আদেশাবলী (ফেরেশতাগণ মারফত) কার্য্যকরী হইতে থাকে।*

দ্বিতীয়তঃ—মানুষ তিনটি বস্তুর সমষ্টি, (১) জিহ্মে-ওনুছরী বা ভৌতিক-দেহ যাহা চারি পদার্থে গঠিত, (২) জিহ্মে-মিছালী বা মধ্যবর্তী দেহ, (৩) রুহ বা আত্মা। রুহ বা আত্মা পদার্থীয় দেহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন কুদরতী বস্তু। পদার্থীয় দেহের সহিত উহার সম্পর্কের জন্য জিহ্মে-মিছালী রহিয়াছে, যেক্ষণ মানব দেহের হাড়ি অতিশয় শক্ত এবং মাংস অতি কোমল ; উভয়ের সংযোগ ও সম্পর্ক রক্ষার জন্য মধ্যস্থলে মাংসপেশী অবস্থিত। জিহ্মে-মিছালী মানব দেহের সমগরিমাণ ও সমাকৃতি-বিশিষ্ট, কিন্তু উহা জাগতিক পদার্থীয় নহে বলিয়া সাধারণ দৃষ্টিতে গোচরীভূত হয় না। মানবের মৃত্যু হইলে তাহার পদার্থীয় দেহ হইতে রুহ ও জিহ্মে-মিছালীর প্রধান সম্পর্ক তথা দেহকে সক্রিয় ও সজীব রাখার সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায় এবং আত্মা ও জিহ্মে-মিছালী আলমে-বরযথে স্থানান্তরিত হয়। পদার্থীয় দেহটি পঁচিয়া-গলিয়া বা ভস্ম হইয়া বা কোনও জন্তুর পেটে হজম হইয়া মল আকারে বাহির হইয়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া, অণু-পরমাণু ও কণায় পরিণত হইয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু লক্ষ রাখিবেন যে, উহার মৌলিক অস্তিত্ব কখনও কোন অবস্থাতেই নিঃশেষ হইয়া যায় না।

তৃতীয়তঃ—মানুষ ইহজগতে থাকাকালীন সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা বা আরাম ইত্যাদি হাল-অবস্থা তাহার পদার্থীয় দেহের উপর প্রবর্তিত ও পরিচালিত হয়, আর ইহার সহিত

* এখানে এরূপ প্রশ্নের অবতারণা মোটেই কোন জটিলতার সৃষ্টি করিবে না যে, আলমে-বরযথ নামক জগৎটি কোথায় অবস্থিত এবং উহার ভৌগলিক বিবরণ কি?

ইসলামের মূল—কোরআন-হাদীছের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীর সম্মুখে এরূপ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। কারণ, বেহেশত-দোযথ যাহা এই ইহজগৎ হইতে কোটি কোটি গুণ বড়, কোরআন-হাদীছের স্পষ্টতর প্রমাণাদি দৃষ্টে পূর্ব হইতেই স্পষ্ট। আমাদের বিজ্ঞান ও দর্শনের হাতড়ানি সেই বেহেশত-দোযথের ভৌগলিক সমস্তার কি সমাধান করিতে পারিয়াছে? এসব ত ইহজগৎ হইতে পৃথক পরজগতের কথা ; কিন্তু কোরআন-হাদীছে বর্ণিত ইয়াজুজ-মাজুজ বাহাদের সংখ্যা সমুদয় মানব জাতির সংখ্যা হইতে প্রায় হাজার গুণ উর্দ্ধে তাহাদের বাসস্থান এবং কোরআন শরীফে বর্ণিত জুল-কারনাদিন বাদশাহ কর্তৃক তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করার লৌহ ও তাম্র নিমিত প্রাচীর ইত্যাদি সবই ইহজাগতিক স্থান ও বস্তু ; কিন্তু ভৌগলিক-জ্ঞান ঐ সবকে জয় করিতে সক্ষম হইয়াছে কি?

আর কোরআন-হাদীছে অবিশ্বাসীরা বলুন—১৬০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ভূগোল-তত্ত্বের বিশেষজ্ঞগণ আমেরিকার স্রায় বিশাল ভূখণ্ডের খোঁজ রাখিত কি? ইতিপূর্বে (Antartica) আন্টার্কটিকার স্রায় বিশাল ভূখণ্ডের বিষয় তাহারা কি জানিত? চন্দ্রে বিশাল জগতের খোঁজ করা হইতেছে, পূর্বে এই চিন্তা ছিল কি? এতদৃষ্টে প্রমাণিত হয়, যেই মানবের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন এত ক্ষুদ্র ; সেই মানব সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার বাণী কোরআন ও তাহার প্রেরিত প্রতিনিধি রসুলের হাদীছে বর্ণিত স্থান, বস্তু ও বিষয়সমূহকে কোন যুক্তি বলেই অস্বীকার করিতে পারে না।

সম্পর্কের দরুন রূহ এবং জিহ্মে-মিছালীও শাস্তি প্রাপ্ত বা ব্যথিত হইয়া থাকে। মৃত্যুর পর আলমে-বরযখের অবস্থা ইহার বিপরীত—অর্থাৎ সুখ-দুঃখ এমনকি উঠা-বসা ইত্যাদি হাল-অবস্থা বস্তুতঃ রূহ ও জিহ্মে-মিছালীর উপরই প্রবর্তিত ও পরিচালিত হয়। অবশ্য পদার্থীয় দেহের অণু-পরমাণু ও কণারশি যেখানে যতটুকু যে অবস্থায়ই থাকে ঐগুলির সঙ্গে আত্মার ও জিহ্মে-মিছালীর প্রধানতম সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার পরও এমন একটি সূক্ষ্মতম সম্পর্ক বজায় থাকে যদ্বারা রূহ ও জিহ্মে-মিছালীর সুখ-দুঃখের অনুভূতিসমূহ পদার্থীয় দেহের অংশরাশি পর্যন্তও সংক্রমিত ও অনুভূত হইয়া থাকে। †

† আলমে-বরযখের সমুদয় অবস্থা সরাসরিভাবে শুধু রূহ ও জিহ্মে-মিছালীর উপরে প্রবর্তিত হওয়া—ইহা ছুফিয়া তথা তাছাওফবাদীদেরও সিদ্ধান্ত (কয়জুলবারী ২—৪২২)।

মামুভের এই ভৌতিক দেহ ছাড়াও তাহার অপর একটি দেহ আছে—এই তথ্য মোসলেম দার্শনিক সাধক মনীষীদেরই আবিষ্কার; এই শ্রেণীর আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম তথ্য আবিষ্কারের যোগ্যতা অন্য কাহারও হইতে পারে না। কারণ, আধ্যাত্মিক শ্রেণীর সূক্ষ্ম তথ্য বেরূপ চর্ম-চোখের আওতা বহির্ভূত তরুণ সৃষ্টিকর্তার সহিত আত্মার গভীর যোগ-সূত্র ব্যতীরেকে উহা জ্ঞান-চোখের পক্ষেও অদৃশ্যই থাকিয়া যায়। দার্শনিক সাধক মহামনীষী মাওলানা রুমী (র:) আল্লাহ ভায়ালায় দরবারে এই জিনিষটিই ভিক্ষা চাহিতেন—

قطره دانش که بخشیدی ز پیش × ممتل گردان بدریا هائے خویش

“এতু হে। যে জ্ঞানবিন্দু তুমি আমাকে সৃষ্টিগতভাবে বা বাহ্যিক শিক্ষা চর্চায় দান করিয়াছ উহাকে তুমি তোমার অকুল সমুদ্রের সহিত যোগ করিয়া দাও।”

সৃষ্টিকর্তা প্রভু-পরওয়ারদেগারের সহিত যোগসূত্র-ক্ষেত্রের প্রবেশ-পথ হইল একনাত্র ইসলাম; সেই পথ অবলম্বনে বিরামহীন সাধনা-ভজনা ও আল্লাহ-ধ্যানের অতল-ধ্যানের অতল সমুদ্রে লুপ্ত থাকার মাধ্যমে লাভ হয় সৃষ্টিকর্তার সহিত যোগসূত্র। এইরূপ যোগসূত্র সৃষ্টিকারী অসংখ্য মহামনীষীর আবির্ভাব মোসলেমদের মধ্যে হইয়াছিল। যেমন—ইবনে আরবী, শারাগী, জিলানী, জোনায়েদ, শিবলী, রুমী, গাজালী (রহমতুল্লাহে আলাইহিম)। তাঁহারা উক্ত যোগসূত্র লাভে বিরূপ ধন্য হইতে পারিয়াছিলেন উহার প্রমাণ তাঁহাদের গ্রন্থরাজী জ্ঞানসিদ্ধিসমূহের মধ্যেই প্রস্ফুটিত; শুধু মুখের দাবী নহে। ঐ শ্রেণীর মনীষীবৃন্দই উক্ত যোগসূত্রে আহরিত জ্ঞান ও আলোর সাহায্যে “তাছাওফ বা ছুফিবাদ” আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং অসংখ্য আধ্যাত্মিক তথ্যাবলীর খোঁজ দিয়া-ছিলেন। দার্শনিক মহাসাধক বিশিষ্ট মনীষী শাহ ওলীউল্লাহ (র:) ঐ শ্রেণীর বহু তথ্যাবলীর উদঘাটনে “হুজাতুল্লাহিল-বালেগাহ” নামক এক অসাধারণ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন; যাহা ইংরাজী সহ বহু ভাষায় অনূদিত হইয়া বিশ্বে আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে।

মোসলমান মনীষীগণের আবিষ্কৃত ছুফীবাদের গ্রন্থাবলী বিশেষতঃ শাহ ওলীউল্লাহ (র:)এর গ্রন্থ “হুজাতুল্লাহিল-বালেগাহ” ইংরাজী অনুবাদ হইল। এওস্তিন জ্ঞান আহরণ-প্রিয় শেভাজ জাতির অনেক লোক আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ হইয়া ছুফীবাদের গ্রন্থাবলী (Study) অধ্যয়ন করিল এবং উক্ত গ্রন্থাবলীর একটি নগণ্য অংশ আহরণ করিল। (অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

আলমে-বরখথে ঐ অবস্থায়ই কাল অতিক্রম হইবে। অতঃপর মানবের পুনর্জীবিত হওয়ার ক্ষমতা নির্ধারিত সময়টি উপস্থিত হইলে আল্লাহ তায়ালার জুকুমে ইস্রাফীল (আঃ) ফেরেশতা দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দিবেন। তখন প্রত্যেকটি মানব-দেহের সমুদয় কণারানি মুহূর্তের মধ্যে একত্রিত হইবে এবং আল্লাহ তায়ালার কুদরতী বৃষ্টিপাতের দ্বারা প্রত্যেক দেহের সঙ্গে উহার রূহ ও জিহনে মিছালীর পূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ইহজগতের ছায় মানুষের মধ্যে যে তিনটি বস্তুর কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেই বস্তুত্রয় একত্রিতরূপে পুনর্জীবিত হইয়া পূর্ণ জীবন্ত অবস্থায় মানুষ হাশর-ময়দানের দিকে ধাবিত হইবে।

ছকীবাদীর এস্থাবলীর মূল বিষয় হইল—আত্মাকে মাজিত ও উন্নত করার এবং আল্লাহ পানে উহাকে ক্রতগামী করার উপায় ও পন্থা উদ্ভাবন করা। এতদ্বিত্ত সৃষ্টিকর্তার সহিত যোগসূত্রলব্ধ জানে আবিষ্কৃত আধ্যাত্মিক শ্রেণীর সূক্ষ্ম তথ্যাবলী উক্ত এস্থাবলীতে আছে। ইংরেজরা প্রথম বিষয় তথা মূল বিষয়টি বাদ দিয়া শুধু দ্বিতীয় তথা নগণ্য বিষয়টিকে আহরণ করে। উহা হইতেই কিছু দিন ধাবৎ পাশ্চাত্য দেশে “থিওসফী” নামক নূতন এক আধ্যাত্মবিজ্ঞানের খুবই প্রচলন হইয়াছে। সেই পাশ্চাত্যবিজ্ঞানীগণের আলোচনায়ও আমাদের উল্লেখিত “জিহমে-মিছালী” তথ্যটি স্থান লাভ করিয়াছে। নিম্নে “মোস্তফা চরিত”, ২—১০০ হইতে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হইল।

থিওসফীর মতে মানুষের এই জড়দেহই (Physicani body) একমাত্র দেহ নয়, সূক্ষ্ম দেহ ছাড়া তাহার জ্যোতির্দেহ (Astral body) রহিয়াছে।……এই অ-জড় দেহকে “Etheric double” (ইথারিক ডবল) বলা হয়। সূক্ষ্ম দেহের সঙ্গে ইথারিক দেহ মিশিয়া থাকে। সূক্ষ্ম দেহ জড় জগতের উপাদান দ্বারা গঠিত (—যেমন, মাটি, পানি, আগুন ও বাতাস)। আর ইথারিক দেহ গঠিত হয় জ্যোতি বা ইথার দ্বারা। সাট, কোট যেমন আমাদের দেহের পোশাক, দেহগুলি তেমনই আমাদের আত্মার পোশাক। আমরা যেমন প্রয়োজন হইলে মোটা পোশাক ছাড়িয়া পাতলা পোশাক পরি; আত্মাও তেমন জড়দেহ ছাড়িয়া শুধু ইথারিক দেহ ধারণ করিতে পারে।

মানুষের আত্মিক শক্তি প্রবল হইলে সে সহজেই দেহগুলিকে বশ করিয়া লইতে পারে। জড়দেহের অক্ষমতা বজায় রাখিয়াও অপর দেহকে উহা হইতে ভিন্ন করিয়া উহা বহনে সে বিচরণ করিতে সক্ষম হয়। এমনকি সে এই সূক্ষ্ম দেহকে অপরের দৃষ্টি গোচরও করিতে পারে। এই জগতই একই মানুষ একই সময়ে একাধিক স্থানে দেখা যাইতে পারে। এই তথ্য থিওসফীর ভাষাতেই শুধু—

If any person be observed who is much more developed, say one who is accustomed to function in the astral world and to use the astral body for that purpose, it will be seen that when the physical body goes to sleep and the astral body sleeps out of it, we have the man himself before us in full consciousness; the astral body is clearly outlined and definitely organised, bearing likeness of the man and the man is able to use it as a vehicle a vehicle for more convenient than the physical.

(Man and His Bodies, by Annie Besant, P. 49)

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রথম ও তৃতীয় বিষয়রূপে যাহা বলা হইয়াছে উহা মৃত্যুর পরের সাধারণ অবস্থা। কদাচিৎ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা জগদ্বাসীকে সত্যক বা উৎসাহিত করার জন্ত কবর নামীয় গর্তের মধ্যে এই পদার্থীয় দেহের উপরও শাস্তি বা আজাবের কোন দৃশ্য প্রকাশিত করেন—উহা খর্কে-আদং বা অদৃশ্য কুদরতের নিদর্শন মাত্র।

কবরের আজাব এবং কোরআন-হাদীছে বর্ণিত উহার অবস্থাসমূহ দৃষ্টে যে সমস্ত প্রশ্নাবলীর উদয় হয়, উল্লিখিত বিষয়ত্রয়ের প্রতি লক্ষ রাখিলে সে ধরণের বহু প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যাইবে। যথা—যে সমস্ত মৃতদেহ সমাহিত না হয়; যেমন ময়না তদন্তের জন্ত বা মেডিকেল ছাত্রদের প্রাকৃতিসের জন্ত রক্ষিত মৃতদেহ এবং যে সমস্ত মৃতদেহের অস্থি-মাংস পর্য্যন্ত হঠাৎ বিলীন হইয়া যায়; যেমন ধম, গোলা-বারুদ ইত্যাদিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত বা হিংস্র জীব-জন্তুর ভক্ষিত ইত্যাদি অবস্থায় মৃত ব্যক্তিকে ছওয়াল-জওয়াব ইত্যাদি কিরূপে করা হয়?

উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর সহজ, যে—মৃত্যুর পর ছওয়াল-জওয়াব ইত্যাদির স্থান কবর বলিতে সমাধিস্থল গর্ত উদ্দেশ্য নহে, বরং কবরের অর্থ আলমে-বরযখ বা বরযখী-জগৎ। এবং বরযখী-জগতের সমুদয় বিষয়াবলীর সরাসরি সম্পর্কে রূহ—আত্মা ও জিহমে-মিছালীর সঙ্গে। রূহ ও জিহমে-মিছালী যে কোন প্রকার মৃত্যুর দরুণ পদার্থীয় দেহ হইতে ছিন্ন

অর্থাৎ—জ্যোতির্দেহ লইয়া আধ্যাত্মিক জগতে কার্য্যক্রম যদি কোন ব্যক্তিকে পাওয়া যায়, তবে দেখা যাইবে, তাহার স্থূল দেহ যখন ঘুমায় এবং জ্যোতির্দেহ লইয়া সে যখন বাহির হইয়া পড়ে, তখন আসল মানুষটাই সজ্ঞানে আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। জ্যোতির্দেহটি সেই মানুষেরই ছব্ব প্রতিকৃতি হইয়া পরিকারভাবে ফুটিয়া উঠে। মানুষটি তখন সেই দেহকেই তাহার বাহন স্বরূপ ব্যবহার করে। এই বাহন স্থূল দেহের বাহন অপেক্ষা শতগুণে সুবিধাজনক।

বলা বাহুল্য, এই বিচ্ছিন্ন স্থূল দেহেরও তাহাতে কোন অসুবিধা হয় না, স্থূল দেহের সহিত তাহার যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ থাকে। এই জ্যোতির্দেহ লইয়া মানুষ যে কোন দূরবর্তী স্থানে অপর কাহারও সম্মুখেও উদয় হইতে পারে।

A person who has complete mastery over the astral body can, of course, leave the physical at any time and go to a friend at a distance. If the person thus Visited be clairvoyant, i. e. has developed astral sight, he will see his friend's astral body: if not, such a visitor might slightly densify his vehicle by drawing into it from the surrounding atmosphere particles of matter and thus materialise sufficiently to make himself visitable to physical sight. [Ibid : P. 55]

অর্থাৎ—কোন ব্যক্তি যদি তাহার জ্যোতির্দেহের উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা রাখে তবে সে যে কোন সময়ে তাহার জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া দূরবর্তী কোন বন্ধুর সম্মুখে দেখা দিতে পারে। বন্ধুটির জ্যোতির্দৃষ্টি যদি খুব প্রখর থাকে তবে সে তাহাকে অনায়াসে দেখিতে পাইবে, যদি তাহা না হয়, তবে আগন্তুক তখন তাহার চতুষ্পার্শ্ব জড়প্রকৃতি হইতে কিছু কিছু জড় উপাদান আকর্ষণ করিয়া এমন-ভাবে ঘনীভূত হইয়া পড়ায় যে, তখন তাহার বন্ধু তাহাকে চর্ম চোখেই চিনিতে পারে।

হইয়া ইহজগৎ ত্যাগ করতঃ বরযথী-জগতে চলিয়া যায়। রূহ ও জিহ্মে-মিছালী ভক্তিত বা ভস্ম হয় না এবং পদার্থীয় দেহ হইতে ছিন্ন হওয়ার পর কোন প্রকারেই ইহজগতে রক্ষিত বা আবদ্ধও হয় না, বরং অক্ষত ও অক্ষুণ্ণ অবস্থায় বরযথী জগতে পৌছিয়া সমুদয় বিষয়াবলীর সম্মুখীন হয়।

কবর তথা বরযথী-জগতের অবস্থা ও বিষয়াবলীর সরাসরি সম্পর্ক পদার্থীয় দেহের সঙ্গে নহে। তাই উহা ভস্ম, ভক্তিত ইত্যাদি হওয়ার কোন সমস্তারই সৃষ্টি হয় না। এসব অবস্থা ও বিষয়ের সম্পর্ক পদার্থীয় দেহের সঙ্গে যতটুকু থাকে ততটুকুর জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পদার্থীয় দেহ বিকৃত ও পরিবর্তিত হয় বটে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই উহা বিলুপ্ত ও অস্তিত্বহীন হয় না, পুনরুত্থান কালে উহার বিচ্ছিন্ন অংশসমূহের একত্রিকরণ হইবে মাত্র।*

এতদ্বিম মৃত ব্যক্তিকে কবরে ফেরেশতাগণ কতৃক উঠানো, বসানো এবং মৃত ব্যক্তির চীৎকার ইত্যাদি হাল-অবস্থার বর্ণনাসমূহও সাধারণ দৃষ্টিতে এক জটিল সমস্তা পরিগণিত। এই সমস্তার সমাধানও এই যে, এসব হাল-অবস্থার স্থান ইহজগতের সমাধিস্থল গর্ত নহে, বরং বরযথী-জগৎ এবং ঐ সকলের সম্পর্ক গোচরীভূত পদার্থীয় দেহের সঙ্গে নহে, বরং অদৃশ্য আত্মা ও জিহ্মে মিছালীর সঙ্গে এবং জিহ্মে-মিছালী মানব সমপরিমাণ ও সমাকৃতি বিশিষ্ট।

এই পরিচ্ছদে বোখারী (রঃ) কোরআনের ৩টি আয়াত এবং কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন যদ্বারা কবরের আজাব অথবা শাস্তি প্রমাণিত হয়। আয়াত ৩টি এই—

(১) وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ

أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ - الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ.....

অর্থ:—বড়ই ভয়ঙ্কর অবস্থা হইবে যখন পাপীগণ মৃত্যু যাতনার ভীষণ চাপে পতিত হইবে এবং সে অবস্থায় ফেরেশতাগণ তাহাদের চেহারা ও গর্দানের উপর প্রহার করতঃ তাহাদিগকে এই বলিয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিবেন যে তোমরা রেহাই পাইবে না;

* মানবীয় জড়দেহ বড়ই ক্ষুণ্ণের অণু-কণা হইয়া বত দূর-দূরান্তের ব্যবধানেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হউক না কেন—এক এক দেহের সমুদয় অণু-কণাকে মুহূর্ত অপেক্ষা ক্রত একত্রিত করা আল্লাহ তায়ালায় কুদরতের সম্মুখে সহজ হইতেও সহজতর। আমাদিগকে চোখে আগুল দিয়া দেখাইবার স্থায় বুঝানোর উদ্দেশ্যে পুনরুত্থান পর্ব অনুষ্ঠানের বহু পূর্বেই ঐ কুদরতের নমুনা আল্লাহ তায়ালা অনুষ্ঠিত করিয়াছেন এবং স্বীয় রহুল মারফত উহার যুক্তিগত বিবরণ বিশ্ব মানবের জন্য প্রচারও করিয়া দিয়াছেন। এক্ষেত্রে সেই বাস্তব ঘটনাটি পুনঃ পুনঃ উপলব্ধি করা বিশেষ ফলদায়ক। পূর্ণ ঘটনার হাদীছটি সপ্তম খণ্ডে “আল্লামার ভয় অন্তরে জাগরুক রাখা” পরিচ্ছেদে ২৪৪৯ নম্বরে অনূদিত আছে।

এখনই তোমাদের আত্মা বাহির করিয়া লওয়া হইবে এবং আজ হইতেই তোমাদিগকে অসহনীয় শাস্তি ও আজাব দান আরম্ভ করা হইবে; যেহেতু তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করিতে এবং আল্লাহর আদেশাবলী হইতে ঘাড় মোড়াইয়া থাকিতে। (৭ পা: ১০ রু:)

এখানে স্পষ্টতঃই উল্লেখ রহিয়াছে যে পাপীদেরকে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শাস্তি ও আজাব দেওয়া হইবে; অথচ আখেরাত তথা দোযখের আজাব হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের পরে হইবে যাহার অনুষ্ঠান দীর্ঘকাল পরে হইবে।

(২) سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ

অর্থ:—মোনাকৈদিগকে অচিরেই দুইবার আজাব প্রদান করিব; তৎপর তাহাদিগকে এক মত বড় ভীষণ আজাবে পতিত করা হইবে। (১১ পা: ১২ রু:)

ব্যাখ্যা:—প্রথম আজাব হইল, মোনাকৈদিগকে ইহজগতে আপমান-অপদস্থ করা। আল্লাহ তায়ালা কিছুদিন পর্য্যন্ত মোনাকৈদের অবস্থা গোপন রাখিয়াছিলেন, প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তাহাদের দৌরাত্ম্য সীমা অতিক্রম করিলে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সমস্ত দূরভিসন্ধিমূলক অপকর্মসমূহকে অহীর মারফৎ প্রকাশ করতঃ তাহাদিগকে হুনিয়াতেই লাঞ্ছিত এবং অনেককে বাহ্যিক শাস্তির সম্মুখীন করিলেন; ইহা প্রথমবারের আজাব। দ্বিতীয়বারের আজাব হইল, মৃত্যুর সংলগ্ন কবর তথা আলমে-বরযখের মধ্যে শাস্তি; এই দুইবারের আজাবকে নিকটবর্তী আজাব বলা হইয়াছে। তৎপর দোযখের আজাব হইবে, উহাকেই ভীষণ আজাব বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ উহা সর্বাধিক ভীষণ ও অসীম হইবে।

(৩) وَحَاقَ بِالْفِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ - النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا -

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ -

অর্থ:—ফেরাউন ও তাহার সান্নোপাঙ্গরা (মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই) কঠিন আজাবে বেষ্টিত হইয়া গেল। প্রতিদিন সকাল-বিকাল তাহাদিগকে দোযখের নিকটবর্তী করা হইয়া থাকে, (যদ্বারা তাহারা কঠিন আজাব ভোগ করিয়া থাকে, তাহাদের উপর এই শাস্তি কেয়ামত পর্য্যন্ত হইতে থাকিবে) এবং যেদিন কেয়ামত তথা হাশরের হিসাব-নিকাশ অনুষ্ঠিত হইবে সেদিন ফেরেশতাদিগকে আল্লাহ তায়ালা আদেশ করিবেন—ফেরাউন ও তাহার সান্নোপাঙ্গদেরকে ভীষণ আজাব (তথা দোযখের) মধ্যে নিক্ষেপ কর। (২৪ পা:, ৪ রু:)

লক্ষ্য করুন! উল্লিখিত প্রত্যেকটি আয়াতেই মৃত্যুর পর এবং হিসাব-নিকাশের দ্বারা দোযখে শাস্তিপ্ৰাপ্ত হইবার পূর্বে একটি আজাব বা শাস্তির উল্লেখ রহিয়াছে; উহাই আলমে-বরযখ তথা কবরের আজাব।

৭০৮। হাদীছ:— عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ * إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وَضَعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى مَذَّةَ أَصْحَابِهِ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَعَ نَعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيَقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ فَمَا أَلْمُؤْسُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبَدَ لَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا - وَإِنَّهُ يَفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ - وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَأَدْرَيْتَ وَلَا تَلَيْمْتَ وَيُضْرَبُ بِطَارِقٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ -

অর্থ:—আনাছ (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছালাম্লাহ আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, × যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় এবং শব বাহকগণ দাফন কার্য সমাপ্ত করিয়া তাহার নিকট হইতে ফিরিবার পথে রওয়ানা হয় মাত্র, এমনকি তখনও তাহারা এতটুকু সন্নিগটে যে, তথা হইতে তাহাদের পাছকার শব্দ কর্ণগোচর হয়; এমতাবস্থায় মৃত ব্যক্তির নিকট ছইজন ফেরেশতা+ উপস্থিত হইয়া তাহাকে উঠাইয়া বসান এবং প্রশ্ন করেন—

* বোখারী (রা:) হাদীছখানা সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করিয়াছেন, অনুবাদে বিস্তারিত বিবরণ মোসলেম শরীফ ও বিভিন্ন কিতাব হইতে বঙ্কিত করিয়া বন্ধনীর মধ্যে এবং ফুটনোটে দেওয়া হইয়াছে।

× একদা হযরত রসূলুল্লাহ ছালাম্লাহ আলাইহে অসাল্লাম মদীনাস্থিত নাজ্জার গোত্রের একটি খেজুর বাগানে প্রবেশ করিলেন, (তথায় কতগুলি কবর ছিল।) তিনি সেখানে বিকট শব্দ শ্রবণে স্তম্ভিত হইয়া উঠিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন এসব কবর কাহাদের? ছাহাবীগণ আরজ করিলেন ইসলাম-পূর্ব অন্ধকার যুগে কতিপয় কাকের লোক যত্নমুখে পতিত হইয়াছিল এসব তাহাদের কবর। তখন রসূলুল্লাহ (দ:) বলিলেন, তোমরা কবরের আজাব এবং দজ্জালের ফেৎনা হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা কর। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, উহা (অর্থাৎ কবরের আজাব) কি? ইয়া রসূলুল্লাহ (দ:)। ছাহাবীগণের এই প্রশ্নের উত্তরেই রসূলুল্লাহ (দ:) এই বিস্তারিত বিবরণের হাদীছখানা বর্ণনা করিলেন। (আবু দাউদ শরীফ)

+ ফেরেশতাবর্মের বিকট কাল মূর্তি, চক্ষুদ্বয় নীল বর্ণ এবং তাঁহাদের বড় বড় দাঁত অতি ভয়ঙ্কর; তাঁহাদের সঙ্গে বিরাট ভারী গুর্জ থাকিবে এবং তাঁহাদের গর্জন বজ্রপাতের তায় অতি বিকট, তাঁহাদের একজনকে মোন্কার দ্বিতীয় জনকে নাকীর বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহা ব্যক্তিগত নাম নহে, জৈগত আখ্যা।

• হাদীছে বর্ণিত আছে—প্রত্যেক মানুষের জন্য আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে একটি স্থান তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন এবং দোষখের মধ্যেও একটি স্থান তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন। কোরামতের দিন মোসলমানদের দোষবহু স্থানগুলি কাকেরদিগকে দেওয়া হইবে এবং উহার বদলে কাকেরদের বেহেশতস্থিত স্থানগুলি মোসলমানদের অধিকারে দিয়া দেওয়া হইবে। (অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

করিতেছে। অতঃপর তাহাকে তাহার বেহেশতের স্থানটিও দেখান হইবে। তখন তাহার আনন্দের সীমা থাকিবে না, সে আনন্দে বলিয়া উঠিবে, আমাকে ছাড়িয়া দিন আমার পরিবারবর্গকে এসব বিষয়ের সুসংবাদ দিয়া আসি। তখন তাহাকে বলা হইবে, একথা বলিবেন না।

অতঃপর আসমান হইতে তাহার পক্ষে একটি ঘোষণা জারী করা হইবে যে, আমার বন্দা ঠিক ঠিকই উত্তর দান করিয়াছে, তাই তাহার জন্ত বর্তমান বাসস্থানের মধ্যে বেহেশত হইতে বিছানা আনিয়া দাও এবং বেহেশতের দিকে দরওয়াজা খুলিয়া দাও এবং তাহাকে বেহেশতের পোষাক পরিধান করাইয়া দাও। তখন তাহার বাসস্থানে বেহেশতের সুবাস ও সুগন্ধি আসিতে থাকিবে] এবং তাহার বাসস্থানকে দৃষ্টির দূরত্ব পরিমাণ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইবে [এবং পুণিমা রাত্রের স্থায় আলোকিত করিয়া দেওয়া হইবে এবং সবুজ বাগ-বাগিচা দ্বারা পুণিমা করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাকে বলা হইবে, আপনি নূতন দুলার স্থায় আরামের নিজা উপভোগ করিতে থাকুন—হাশর-ময়দানের অন্তর্ধান পর্য্যন্ত। সে উপরোক্ত আরাম আয়েশের মধ্যেই (আলমে-বরযখে) জীবন কাটাইতে থাকিবে।]

মোনাকেক-কাফেরকেও প্রশ্ন করা হইবে। [ফেরেণতাদয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, (১) তোমার সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা ও বিধানদাতা কে? —তুমি কাহার এবাদৎ-বন্দেগী করিয়াছ? সে বলিবে, (হায় হায়।) আমি কিছুই জানি না। (২) তোমার দীন ও ধর্ম কি? সে বলিবে, (হায় হায়।) আমি কিছু জানি না।] (৩) রমুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিষয় প্রশ্ন করা হইবে যে, তাঁহার প্রতি তোমার কি আকিদা ও উক্তি ছিল? সে বলিবে (হায় হায়।) আমি কিছুই জানি না, তবে অশান্ত লোকদিগকে তাঁহার বিষয়ে কোন উক্তি করিতে শুনিয়া আমিও সেই উক্তি করিতাম। তখন তাহাকে ভৎসনা করিয়া বলা হইবে—কোরআন নিম্ন বৃণ্ড নাই, পড়ও নাই, কিম্বা জ্ঞানী ব্যক্তিদের অনুসরণও কর নাই।

অতঃপর তাহাকে লোহার গুর্জ দ্বারা ভীষণ আঘাত করা হইবে (ঐ গুর্জ দ্বারা পাহাড়কে আঘাত করা হইলে, পাহাড় বালুস্তুপে পরিণত হইয়া যাইত আঘাতের চোটে সে এত বড় বিকট চীৎকার করিয়া উঠিবে যাহা তাহার আশে-পাশের সকলে (বরং ছনিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকলেই) শুনিতে পাওয়ার যোগ্য; অবশ্য মানুষ ও জিন জাতি তাহা শ্রবণ করে না। [এবং তাহার উপর সর্বদার জন্ত একটি জীবকে নিয়োজিত রাখা হইবে, উহার হাতে একটি জলন্ত অঙ্গারের চাবুক থাকিবে, তদ্বারা সে

উক্ত ঘটনার ইঙ্গিতেই কোরআন শরীফে কয়ামতের দিনকে “ইয়াওমুত-তাগাবুন” তথা হার-জিতের দিন বলা হইয়াছে। মোসলমান ও কাফেরদের মধ্যে ঐ দিন যে ভাগভাগি ও বিনিময় অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহাতে মোসলমানদের জিত হইবে যে, দোষখের স্থানের পরিবর্তে বেহেশত লাভ করিবে এবং কাফেরদের হার হইবে যে, বেহেশতের স্থানের পরিবর্তে দোষখের স্থান পাইবে।

তাহাকে অধিরাম আঘাত করিতে থাকিবে। জীবটি বধির হইবে তাই তাহার চীৎকার শ্রবণে কোন প্রকার করুণা প্রদর্শনের সম্ভাবনাই থাকিবে না। এবং বেহেশতের দিকে একটি খিড়কী খুলিয়া তাহাকে দেখান হইবে এবং বলা হইবে, তুমি যদি খাঁটি মোমেন হইতে তবে তুমি এই বেহেশত স্বীয় বাসস্থানরূপে লাভ করিতে, কিন্তু তুমি কাফের হওয়ায় আল্লাহ তায়ালা বেহেশতের পরিবর্তে তোমার স্থান ঐ দোষে নিদিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এই বলিয়া দোষের দিকে জানালা খুলিয়া তাহাকে দোষ দেখান হইবে। তখন তাহার হায়-আফছুছ—অনুতাপ আক্ষেপ ও নিজের প্রতি দিকারের সীমা থাকিবে না। তাহার বাসস্থানকে অত্যধিক সংকীর্ণ করা হইবে, যাহার চাপে তাহার পাঁজর এক দিক হইতে অপর দিকে চলিয়া যাইবে। আসমান হইতে আদেশ জারী করা হইবে যে—তাহার জন্য দোষের বিছানা আনিয়া দাও, তাহাকে দোষের পোষাক পরাইয়া দাও এবং দোষের প্রতি তাহার বাসস্থানের দরওয়াজা খুলিয়া দাও, যদ্বারা তাহার প্রতি দোষের ভীষণ তাপ আসিতে থাকিবে।

৭০৯। হাদীছ :—বরা ইবনে আজ্জব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যখন মোমেন ব্যক্তিকে কবরে বসান হয় এবং তথায় ফেরেশতা উপস্থিত হয়, তখন সে (প্রশ্নের উত্তরে) সঠিকরূপে বলিতে পারে যে, একমাত্র আল্লাহই আমার মা'বুদ এবং মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) আমার রসূল। এই বিষয়টিই এই আয়াতের তাৎপর্য—
يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

অর্থাৎ—খাঁটি মোমেন ব্যক্তি যেহেতু স্বীয় জীবনের প্রতি স্তরে স্তরে এই সত্যটিকে প্রতিফলিত করিয়াছে যে, অ'ল্লাহই একমাত্র মা'বুদ অতঃ কেহই মা'বুদ নয় এবং হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার রসূল; ইহার বদৌলতে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ইহজীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঐ সত্যের উপর দৃঢ় থাকিবার তৌফিক দান করেন অর্থাৎ কলেমা-শাহাদতের উপর তাহার মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুর পর-জীবনেও তাহাকে উহার উপর দৃঢ় থাকিবার তৌফিক দান করিয়া থাকেন অর্থাৎ কবরের মধ্যে প্রস্রাবলীর উত্তরে সে ঐ কলেমা শাহাদতের উক্তিকে ঠিক ঠিকরূপে প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়।

ব্যাখ্যা :—পরকালের জীবনে এত্বকের উপর প্রকৃত, খাঁটি ও বাস্তব বিষয় আপনা-আপনিই ফুটিয়া উঠিতে থাকিবে। সেখানে কোন প্রকার কৃত্রিমতা বানাউটি জালিয়াতি চলিবে না বা কোন বাস্তব বিষয় লুকাইত থাকিবে না। অতএব যে ব্যক্তি ইহকালীন জীবনের প্রতি স্তরে স্তরে এই সত্যকে প্রতিফলিত করিয়াছে যে, একমাত্র আল্লাহই মা'বুদ অতঃ কোন মা'বুদ নাই, মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আল্লাহ তায়ালা র রসূল; সেই ব্যক্তি পরকালীন জীবনে পৌঁছিবার পথে এবং পর-জীবনে পৌঁছিয়া সর্বক্ষেত্রে ঐ সত্যই তাহার মুখে আপনা-আপনি ফুটিয়া উঠিবে তাহার কোন বেগ পাইতে হইবে না।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঐ সত্যকে ইহ-জীবনে নিজের উপর প্রতিকলিত করে নাই সে যতই পটু, যতই বিজ্ঞ ও চতুর হউক না কেন মৃত্যুর পর কখনও ঐ সত্য তাহার মুখে প্রকাশ পাইবে না।

৭১০। হাদীছ ৪:—আবুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, বদরের যুদ্ধে নিহত কাফের সর্দারদের মৃত দেহগুলি নিকটবর্তী একটি গর্তে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যুদ্ধ-ময়দান ত্যাগ করিয়া আসার পূর্বে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ গর্তের কিনারায় দাঁড়াইয়া মরা লাশগুলির প্রতি ঊকি দিয়া বলিতে লাগিলেন, তোমাদের প্রভু-পরও-য়ারদেগারের যে সতর্কবাণী ছিল (যে, সত্য ধর্ম ইসলামকে গ্রহণ না করিলে ইহ-জীবনে তোমাদের ধ্বংস হইতে হইবে এবং পর-জীবনে আজাব ও শাস্তির সীমা থাকিবে না) তাহা কি তোমরা বাস্তবে ঠিক ঠিক পাইয়াছ? আমরা ত আমাদের পরওয়ারদেগারের ওয়াদাকে (যে, তিনি সত্যের জয় প্রতিষ্ঠিত করিবেন) বাস্তব ঠিক ঠিক পাইয়াছি। ঐ সময় ওমর (রা:) আরজ করিলেন—ইয়া রসূলুল্লাহ (দ:)! আপনি মৃত ব্যক্তিদের সম্বোধন করিতেছেন? যাহাদের কোন শ্রবণশক্তিই নাই। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তহত্তরে বলিলেন, তাহারা তোমাদের ত্রায়ই শ্রবণ করে, কিন্তু তাহাদের উত্তর দিবার শক্তি নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:— এই হাদীছখানা উল্লেখ করার সঙ্গে ইমাম বোখারী (র:) উহার ব্যাখ্যা আয়েশা (রা:) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, আয়েশা (রা:) বলিয়াছেন, উল্লিখিত ঘটনার নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মূল উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আমি তাহাদিগকে পূর্বে অর্থাৎ তাহাদের জীবিতাবস্থায় যে সমস্ত সতর্কবাণী শুনাইয়া থাকিতাম ঐ সময় তাহারা সে সবার প্রতি কর্ণপাত করিত না, সে সবকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা মনে করিত, কিন্তু এখন তাহারা ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছে যে, আমার সে সব সতর্কবাণী অফরে অফরে সত্য ছিল। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (দ:) যে বলিয়াছেন ঐ মরা লাশগুলি শ্রবণ করিয়া থাকে, উহার অর্থ বস্তুত: শ্রবণ করা নয়, বরং উপলব্ধি করা।

আয়েশা (রা:) বলেন, মৃত ব্যক্তি ইহ-জগতের কথাবার্তা শুনিবার শক্তি রাখেনা বলিয়া কোরআন শরীফেই প্রমাণ রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—**اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتٰى** “আপনি মৃতদিগকে কোন কথা শুনাইতে পারিবেন না।”*

• মৃত ব্যক্তি ইহজগতের কথাবার্তা শ্রবণ করিয়া থাকে কিনা, সে বিষয়ে পূর্ব হইতেই মতভেদ চলিয়া আসিয়াছে। ছাহাবীগণেরও মতভেদ ছিল। তাই এ বিষয়ে সঠিকরূপে কিছু বলা অসাধ্য; ইহা কোন আবশ্যকীয় বিষয়ও নহে। বোখারী (র:) ২৮৮ পৃষ্ঠায় একটি পরিচ্ছেদ দিয়াছেন যে, মৃত ব্যক্তি শ্রবণ করিয়া থাকে; প্রমাণে ৭০৮নং হাদীছটি উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে শব্বাহকদের পাতৃকা চালনার শব্দ শুনিবার উল্লেখ আছে;

৭১১। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ইহুদী বৃদ্ধা আমার নিকট উপস্থিত হইল এবং আজাবে-কবরের বিষয় উল্লেখ করিয়া আমার জন্য দোয়া করিল যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে কবরের আজাব হইতে রক্ষা করুন। এতদশ্রবণে আয়েশা (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছালামাহ্ আলাইহে অসাল্লামের নিকট কবরের আজাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে হযরত (দঃ) বলিলেন, আজাবে-কবর বাস্তব বিষয়, উহা অনুষ্ঠিত হওয়ার মধ্যে কোন সন্দেহ নাই। আয়েশা (রাঃ) বলেন, এদিন হইতে আমি রসুলুল্লাহ ছালামাহ্ আলাইহে অসাল্লামকে প্রত্যেক নামাযান্তেই কবরের আজাব হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতে গুনিয়াছি।

৭১২। হাদীছ :—আস্মা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছালামাহ্ আলাইহে অসাল্লাম প্রকাণ্ড সভায় ওয়াজ করিতেছিলেন। কবরের মধ্যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার বিষয়ও তিনি বর্ণনা করিলেন; উপস্থিত মোসলমানগণ (অভিভূত হইয়া) চীৎকার করিয়া উঠিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, হে লোক সকল! সতর্ক থাকিও, তোমরা নিশ্চয় দজ্জালের দ্বারা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার জ্ঞায় কবরের মধ্যেও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইবে।

৭১৩। হাদীছ :—আবু আইউব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছালামাহ্ আলাইহে অসাল্লাম বিকাল বেলা ভ্রমণে বাহির হইলেন। পশ্চিমধ্যে এক প্রকার শব গুনিয়া বলিলেন, এক ইহুদীকে কবরে শাস্তি দেওয়া হইতেছে। (ইহা উহারই শব্দ)

কবরের আজাব হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৭১৪। হাদীছ :—সায়ীদ ইবনে আ'হ (রাঃ)-এর পোত্ৰী বলিয়াছেন, আমি নবী ছালামাহ্ আলাইহে অসাল্লামকে কবরের আজাব হইতে আল্লাহ তায়ালায় আশ্রয় চাহিতে গুনিয়াছি।

৭১৫। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছালামাহ্ আলাইহে অসাল্লাম এই দোয়া করিয়া থাকিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ

অর্থ :—হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি কবরের আজাব হইতে এবং জীবিতাবস্থায় বা মৃত্যুকালে পথভ্রষ্টতা হইতে এবং অসৎ দজ্জালের দ্বারা পথভ্রষ্ট হওয়া হইতে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—কবরের আজাব হইতে মুক্তির জন্য আল্লাহ তায়ালায় আশ্রয় চাওয়ার সঙ্গে নিজকে সংযত রাখায়ও সচেতন হইতে হইবে; বিশেষতঃ ঐসব গোনাহ হইতে সতর্ক থাকিবে যে সব গোনাহ কবরে আজাবের কারণ বলিয়া হাদীছে উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন—প্রস্রাব হইতে পবিত্রতায় পূর্ণ সতর্ক না থাকা বা চোগলখোরী করা। এই গোনাহদ্বয় বিশেষভাবে কবরে আজাবের কারণ বলিয়া হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে (১৮৯নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)।

মৃত ব্যক্তিকে সকাল-বিকাল তাহার স্থান দেখান হয়

৭১৬। হাদীছ :—ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছালামুল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—প্রত্যেক ব্যক্তিকেই মৃত্যুর পর তাহার বাসস্থান প্রতি সকাল-বিকাল দেখান হইয়া থাকে। যদি সে বেহেশতের উপযুক্ত হয়, তবে বেহেশতের বাসস্থান, আর যদি দোষখের যোগ্য হয় তবে দোষখের বাসস্থান। এবং তাহাকে বলা হইয়া থাকে—হিসাব-নিকাশের দিন অমুষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে ইহাই তোমার বাসস্থান হইবে।

মোসলমানের সন্তান নাবালেগ অবস্থায় মৃত্যু হইলে ?

এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে, এই সন্তানগণ বেহেশতী হইবে। বোখারী (রাঃ) ৮২ নং হাদীছ দ্বারা এই মতকেই প্রমাণিত করিয়াছেন। কারণ, যাহাদের অছিলায় মাতা-পিতাগণ উক্ত হাদীছের বর্ণনা মতে বেহেশত লাভ করিবেন, স্বয়ং তাহারা বেহেশত লাভ করিবে ইহাতে আর সন্দেহ কি ?

০ আবু হোরায়া (রাঃ) নবী (দঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তির ভিনটি নাবালেগ সন্তান মারা যাইবে তাহারা তাহার জন্য দোষখের প্রতিবন্ধক হইবে এবং সে বেহেশত লাভ করিবে।

৭১৭। হাদীছ :—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছালামুল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের শিশুপুত্র ইব্রাহীম আলাইহেছালামের মৃত্যু হইলে রসূলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছিলেন, তাহার জন্য বেহেশতে একজন দাই নিযুক্ত করা হইবে।

কাকেরদের নাবালেগ সন্তানের মৃত্যু হইলে ?*

৭১৮। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছালামুল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের নিকট মোশরেকদের ঔরষজাত নাবালেগ সন্তানদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি ফরমাইয়াছিলেন—আল্লাহ তাহাদের সৃষ্টি করাকালীন অবগত ছিলেন, তাহারা (বাঁচিয়া থাকিলে) কি প্রকারের আমল করিত। (তাহাদের বিচার উহার ভিত্তিতে হইবে, অতএব আল্লাহই জানেন, তাহাদের পরিণাম কি হইবে।)

৭১৯। হাদীছ :—আবু হোরায়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালামুল্লাহ আলাইহে অসাল্লামকে মোশরেকদের নাবালেগ মৃত সন্তানদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা ভালভাবেই জানেন, (বাঁচিয়া থাকিলে) তাহারা কি প্রকার আমল করিত। (অর্থাৎ সেই অনুপাতেই তাহাদের পরিণাম নির্ধারিত হইবে।)

* আলোচ্য বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) এবং বহু আলেমগণের মত এই যে, এ বিষয়ে কোনও দিক নির্দিষ্ট না করিয়া ইহার শেষ ফরজালা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন—এই বিশ্বাস অবলম্বন করতঃ সমস্ত আলোচনা হইতে বিরত থাকিবে।

৭২০। হাদীছ :— عن ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم
 كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَابْوَاهُ يَهُودًا نِهٍ اَوْ يَنْصَرَانِهٍ اَوْ يَمَجَّسَانِهٍ
 كَمَثَلِ الْبَيْهَمَةِ تُنْتَجِجُ الْبَيْهَمَةُ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ .

অর্থ—মাবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—প্রত্যেকটি মানুষ সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহর তরফ হইতে এমন একটি শক্তিপ্রাপ্ত হইয়া এই জগতে পদার্পণ করিয়া থাকে যে, যদি সে কোন আকর্ষণ বা বাধার বেষ্টনে পতিত না হয়, তবে ঐ শক্তিটি তাহাকে হক ও সত্যের দিকে ধাবিত করিবে। কিন্তু কাহারও ইহুদী মাতা-পিতার পরিবেশ তাহাকে ইহুদী বানায়, কাহারও নাছরানী মাতা-পিতার পরিবেশ তাহাকে নাছরানী বানায় এবং কাহারও অগ্নিপূজক মাতা-পিতার পরিবেশ তাহাকে অগ্নিপূজকে পার্শ্বগত করিয়া থাকে। যেমন, পশুপালের বাচ্চা সাধারণতঃ অকৃত কানযুক্তই প্রসবিত হইয়া থাকে; উহার কান কাটা বা ছিদ্র করা থাকে না, কিন্তু পরে উহার মোশরেক মালিক উহার কান কাটিয়া বা ছিদ্র করিয়া (উহাকে মনগড়া মাবুদ তথা দেব-দেবীর নামে ছাড়িয়া) থাকে।

ব্যাখ্যা :—সেকালে আরব দেশে উট, গরু, ছাগল ইত্যাদির বাচ্চাকে কান কাটিয়া বা ছিদ্র করিয়া দেব-দেবীর নামে ছাড়িবার প্রথা প্রচলিত ছিল, তাই উহার দৃষ্টান্ত উল্লেখ হইয়াছে।

আলোচ্য হাদীছের মূল তাৎপর্য এই যে, মানবকে সত্য ও হকের প্রতি ধাবিত করার সমস্ত রকম সম্ভাব্য ব্যবস্থাপনাই আল্লাহ তায়ালা করিয়াছেন; ঘাড়ের ধরিয়া বলপূর্বক বাধ্যতামূলকভাবে হকের উপর পরিচালিত করেন নাই বটে। কারণ, তাহা হইলে সৃষ্টিজগতের মূল রহস্য “পরীক্ষা” প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না; ইহা ছাড়া অন্য সব ব্যবস্থাই অবলম্বিত হইয়াছে। নবী-রসূল পাঠান হইয়াছে, কেতাব নাজিল করা হইয়াছে; তদুপরি সৃষ্টিগতভাবে মানবের পক্ষ ইল্লিয়কে যেরূপ এক একটি কাজের শক্তি দান করা হইয়াছে কোনও বাধার সৃষ্টি না হইলে আপনা-আপনিই প্রতিটি ইল্লিয়ার দ্বারা উহার কাজ সম্পন্ন হইতে থাকিবে। যথা, চক্ষু দ্বারা দেখা যায়, কান দ্বারা শুনা যায় ইত্যাদি। তদ্রূপ আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিগত ভাবেই মানবকে এমন একটি শক্তি দান করতঃ পরীক্ষাকে অরূপী জগতে পাঠাইয়াছেন যে, কোনও প্রভাব বা বাধার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হইলে ঐ শক্তিটি মানবকে সত্য ও হকের প্রতি লইয়া চলিবে। কিন্তু মানব ছনিয়াতে আদিবার পর নানাপ্রকার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, নানারূপ বেড়াবালের বেষ্টনীতে আবদ্ধ হইয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়, ফলে তাহার ঐ শক্তিটি নিস্তেজ হইতে থাকে এবং ক্রমে বিলুপ্ত প্রায় হইয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি বিশেষ আকর্ষণ ও বাধার উল্লেখ করা হইয়াছে—মাতা-পিতা তথা

পরিবেশ, সোসাইটি (Society) ও সংসর্গ। এসব বেড়াজালকে ভেদ করার জন্তু আল্লাহ তায়ালা অল্প একটি শক্তি দান করিয়াছেন উহা হইতেছে আকলে-ছলীম বা সূহ্মা বিবেক।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা একটি অতি মূল্যবান উপদেশ লাভ হয় যে, যাহারা স্বীয় সন্তান-সন্ততিকৈ সং বানাইবার আকাঙ্ক্ষা রাখেন তাহাদের প্রথম কর্তব্য হইবে, সন্তানকে খারাপ সোসাইটি, অসং সংসর্গ ও অব্যক্তি পরিবেশ হইতে বাঁচাইয়া রাখা, যেন আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিটি নষ্ট না হয়। দ্বিতীয় কর্তব্য হইবে, সন্তানকে ভাল পরিবেশে ভাল সোসাইটিতে, সং সংসর্গে প্রতিপালিত করা, যেন ঐ শক্তিটির আরও অধিক উন্নতি লাভ হইতে পারে।

বড়ই পরিতাপের বিষয়, আমরা ছেলে-মেয়েদের বাহ্যিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্তু পরিচ্ছন্ন আবহাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া থাকি, কিন্তু তাহার আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা ত দূরের কথা বরং তাহাদের সহিত ডাকাত ও শত্রুর ছায় ব্যবহার করিয়া থাকি। ধীন ও ইসলামের পক্ষে নিষ তুল্য পরিবেশে নিজেরাই তাহাদেরে দিয়া দেই।

৭২১। হাদীছ :-সামুরা ইবনে জুনুব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কব্বরের নামাযান্তে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিতেন, তোমাদের মধ্যে কেহ কোন খাব দেখিয়াছে কি? কেহ কিছু দেখিয়া থাকিলে সে উহা বর্ণনা করিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উহার তা'বীর বা ব্যাখ্যা দিতেন।

একদা নবী (সঃ) সেই অনুসারে সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহ কোন স্বপ্ন দেখিয়াছে কি? সকলেই আরজ করিল, আজ আমরা কিছুই দেখি নাই। নবী (সঃ) বলিলেন, আমি দেখিয়াছি। অতঃপর তিনি উহা বর্ণনা, করিলেন যে, দুই ব্যক্তি আমাকে এক পাক-পবিত্র স্থানে লইয়া গেলেন। তথায় বাইয়া দেখিলাম, একটি লোক বসিয়া আছে, অপর একজন লোক তাহার নিকট দাঁড়াইয়া আছে; দাঁড়ান ব্যক্তির হস্তে একখানা বক্র মাথা বিশিষ্ট লোহার শিক (যে রূপ শিকের দ্বারা তন্দুর হইতে রুটি উঠান হয়)। সে তাহার ঐ লোহার বক্র অংশ ঐ বসা ব্যক্তির মুখের ভিতর ঢুকাইয়া দিয়া তাহার মুখের চিবুক ফাড়িয়া গর্দান পর্যন্ত লইয়া যায়। তদ্রূপ নাকের এক ছিদ্রে ঐ লোহার বক্র মাথা প্রবেশ করাইয়া উহাকে ফাড়িয়া গর্দান পর্যন্ত লইয়া যায় এবং চোখের ভিতর প্রবেশ করাইয়া উহাকে ফাড়িয়া গর্দান পর্যন্ত লইয়া যায়। এইভাবে এক পার্শ্বের চিবুক, নাক ও চোখ ফাড়িবার পর অপর পার্শ্বও ঐরূপে ফাড়ে। এক পার্শ্ব ফাড়িয়া অপর পার্শ্ব ফাড়িতে ফাড়িতে প্রথম পার্শ্ব পূর্বের ছায় অক্ষত হইয়া যায়; এবং উহাকে পুনরায় ফাড়া হয়। পুনঃ পুনঃ উভয় পার্শ্বকে এইভাবে ফাড়িতেছে। (মানুষটিকে কিছু সময় বসাইয়া ঐরূপ শাস্তি দেয়, আবার কিছু সময় উর্দ্ধমুখী শোয়াইয়া ঐরূপ শাস্তি দেয়।) আমি আমার সঙ্গীভ্রমকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি ব্যাপার? তাহারা বলিলেন, আগে চলুন। আমরা চলিতে চলিতে একস্থানে আসিয়া দেখিলাম, একজন লোক চিত হইয়া শুইয়া আছে, অপর একজন লোক

বিরাট ভারী একটি পাথর হাতে লইয়া আছে এবং ঐ পাথরের আঘাতে তাহার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতেছে। পাথরটি এত জোরে মারা হয় যে, উহার আঘাতে মাথা চূর্ণ হইয়া পাথরটি ছিটকাইয়া দূরে সরিয়া পড়ে; ঐ পাথরটিতে লইয়া তাহার নিকট ফিরিয়া আসিতে আসিতে তাহার মাথা পূর্বের স্থায় অক্ষত অবস্থাপ্রাপ্ত হয়, পুনরায় তাহাকে ঐরূপে আঘাত করা হয়, এইরূপে পুনঃ পুনঃ তাহাকে আঘাত করা হইতেছে। আমি সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ব্যক্তি কে? তাহারা বলিলেন, আগে চলুন। আমরা চলিতে চলিতে এক-স্থানে আসিয়া দেখিতে পাইলাম, তন্মূলের স্থায় একটি অগ্নিকুণ্ড; উহার মুখটি সঙ্গীর্ণ এবং অভ্যন্তর ভাগ অতিশয় প্রশস্ত। উহার ভিতরে দাউ দাউ করিয়া আগুন জলিতেছে এবং উহাতে ভয়ঙ্কর চীংকার ও আর্তনাদ শোনা যাইতেছে; আমরা উকি মারিয়া দেখিলাম, উহার ভিতরে কতগুলি উলঙ্গ নর-নারী রহিয়াছে। যখন অগ্নি-শিখাগুলি লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠে তখন উহার সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও উপরের দিকে চলিয়া আসে, মনে হয় যেন তাহারা উহার মধ্য হইতে বাহিরে আসিয়া পড়িবে, কিন্তু অগ্নিশিখা স্তিমিত হইলে আবার তাহারা উহার তলদেশে পড়িয়া যায়। আমি আমার সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহারা কোন্ লোক? তাহারা বলিলেন, আগে চলুন। এবার আমরা একটি নদীর নিকট পৌঁছিলাম। ঐ নদীটিতে পানি ছিল না, বরং রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল; ঐ নদীর মধ্যস্থলে একটি লোক অবিরাম সাঁতার কাটিতেছে এবং অপর একটি লোক সেই নদীর কিনারায় দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহার সম্মুখে বহু পাথর-খণ্ড স্তম্ভীকৃত। এমতাবস্থায় মধ্যস্থলীর লোকটি সাঁতার কাটিয়া কিনারার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, যখন সে কিনারার নিকটবর্তী হইয়া নদী হইতে উঠিয়া আসিবার প্রয়াসী হয় তখন ঐ দাঁড়ান ব্যক্তি পাথর দ্বারা তাহার মুখের উপর ভীষণ জোরে আঘাত করে বাহার ফলে সে তাহার পূর্বের স্থান—নদীর মধ্যস্থলে চলিয়া যায়। যতবার ঐ ব্যক্তি সেই রক্তের নদী হইতে বাহির হইয়া আসার চেষ্টা করে ততবার ঐ দাঁড়ান ব্যক্তি তাহাকে ঐরূপে আঘাত করিয়া প্রত্যাবৃত্ত করিয়া থাকে। আমি সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি ব্যাপার? তাহারা বলিলেন, সম্মুখে চলুন। এবার আমরা একটি সুন্দর সবুজ বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, উহার মধ্যে একটি বিরাট বৃক্ষ। বৃক্ষটির গোড়ায় একজন সুদীর্ঘ কায়ার বৃক্ষলোক অনেকগুলি ছেলে-মেয়েকে লইয়া বসিয়া আছে এবং ঐ বৃক্ষটির কিছু দূরেই অপর এক ব্যক্তি অতি ভয়ঙ্কর আকৃতির; সে তাহার সম্মুখস্থ বিরাট অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতেছে। আমার সঙ্গীদ্বয় আমাকে লইয়া ঐ বৃক্ষটিতে আরোহণ করিলেন। উর্দ্ধপানে একটি শহরে উপস্থিত হইলাম—বাহার অট্টালিকাসমূহ এবং রাস্তা ঘাট ইত্যাদি স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইট দ্বারা নিমিত; সেই শহরে এমন একদল লোক দেখিতে পাইলাম যাহাদের শরীরের অর্দ্ধাংশ অতি সুন্দর ও সুশ্রী, কিন্তু বাকী অর্দ্ধাংশ অতি জঘন্য কুংসিত ও বিকীর্ণ। আমার সঙ্গীদ্বয় তাহাদিগকে আদেশ করিলেন, তোমরা ঐ সম্মুখস্থ প্রবাহমান

খালে অবতরণ করিয়া ডুব দাও। তাহারা তাহা করিল এবং আমাদের নিকট প্রত্যাভর্তন করিল ; তখন তাহাদিগকে দেখিলাম, তাহারা পূর্ণাঙ্গে অতিশয় সুন্দর স্ত্রী হইয়া গিয়াছে (৬৭৪ পৃ:)।

অতঃপর আমরা বৃক্ষটির আরও উর্দ্ধে আরোহণ করিলাম ; তখন সঙ্গীদ্বয় আমাকে লইয়া এমন সুন্দর সুরমা একটি কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করিলেন যে, তার চেয়ে অধিক সুন্দর কক্ষ আমি কখনও দেখি নাই ; উহার ভিতরে অনেক বৃদ্ধ, যুবক, নর-নারী ও ছেলে-মেয়ে রহিয়াছে। অতঃপর তাহারা আমাকে ঐ কক্ষ হইতে বাহির করিয়া বৃক্ষটির আরও উপরে আরোহণ করিলেন এবং দ্বিতীয় একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এই কক্ষটি প্রথমটি হইতেও অধিক সুন্দর ও মনোরম, উহার মধ্যে কতিপয় বৃদ্ধ ও যুবক রহিয়াছে।

আমি আমার সঙ্গীদ্বয়কে বলিলাম, সারারাত্র আপনারা আমাকে ভ্রমণ করাইলেন, এখন আমাকে এসব ঘটনা খুলিয়া বলুন যাহা আমি দেখিয়াছি। তাহারা বলিলেন, হাঁ—সর্বপ্রথম সে ব্যক্তি মিথ্যাশ্রী। সে এমন এক একটি মিথ্যা গড়াইয়া বলিত যাহা তাহার মুখ হইতে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িত। আপনি যাহা দেখিয়াছেন উহা তাহারই শাস্তি। হিসাব-নিকাশের দিন পর্য্যন্ত তাহাকে ঐরূপ শাস্তি দেওয়া হইতে থাকিবে। আপনি পাথর দ্বারা যাহার মাথা চূর্ণ করিতে দেখিয়াছেন সে ঐ ব্যক্তি, যাহাকে আল্লাহ তায়ালা কোরআনের এলুম দান করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সর্বদা সমস্ত রাত্রি শুইয়া কাটাইয়াছে, উহা তেলাওয়াত করে নাই এবং দিনের বেলায়ও উহার আমল করে নাই, তাহাকেও এই আজাব কেয়ামতের দিন পর্য্যন্ত দেওয়া হইতে থাকিবে। আর যাহাদিগকে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে দেখিয়াছেন তাহারা জেনাকার—ব্যভিচারী নর-নারী। আর যাহাকে রক্তের নদীর মধ্যে দেখিয়াছেন, সে সুদখোর দলের একজন। স্বর্ণ-রৌপ্য নিমিত্ত শহরে যে একদল লোক দেখিয়াছেন যাহাদের অর্দ্ধ শরীর স্ত্রী, তাহারা ঐ সমস্ত লোক যাহাদের আমল বা কার্যকলাপ ভাল-মন্দ ও নেক-বদে মিশ্রিত। পরে আল্লাহ তায়ালা কুপা ও রহমতের শ্রোতে তাহাদের সমুদয় গোনাহ ভাসিয়া গিয়া তাহারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়াছে। বৃক্ষের গোড়ায় যে সুদীর্ঘ কায়ার বৃদ্ধ লোকটি দেখিয়াছেন, তিনি ইব্রাহীম আলাইহেছলাম এবং তাহার আশে-পাশের ছেলে-মেয়েগুলি মানুষের ঐসব ছেলে-মেয়ে, যাহারা নাবালেগ অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। আর বৃক্ষের নিকটবর্তী যিনি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতেছিলেন তিনি হইলেন “মালেক” নামক কেরেশতা যিনি দোষখের (এন্তেজামকারীদের) সরদার।

আর বৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়া পর পর যে কক্ষদ্বয় দেখিয়াছেন—প্রথম কক্ষটি সর্বসাধারণ মোসলমানদের বেহেশত এবং দ্বিতীয় কক্ষটি শহীদদের বেহেশত। আর আমি জিব্রাইল এবং আমার সঙ্গী মিকাইল। এখন আপনি উপরের দিকে তাকাইয়া দেখুন। আমি উপর দিকে তাকাইলাম ; আমার উপরের দিকে বহু উপরে একটি বালাখানা সাদা শুভ্র মেঘ পুঞ্জের ছায় দেখিতে পাইলাম। সঙ্গীদ্বয় বলিলেন, উহা আপনার দ্রষ্টা বিশেষরূপে প্রস্তুত বেহেশতের বাসস্থান। তখন আমি বলিলাম, আপনারা আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি আমার

বাসস্থানে প্রবেশ করি। তাঁহারা বলিলেন, এখনও আপনার পাখিব জীবন অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে, উহা পূর্ণ হইলেই আপনি নিজ বাসস্থানে চলিয়া আসিবেন।

ব্যাখ্যা :—নবীগণের স্বপ্ন অতী, উহা অকাট্য সত্য ও বাস্তব বিষয়। অতএব এই হাদীছ দ্বারা কবর তথা আসমে-বরযখের আজাব স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইল। কারণ, আলোচ্য ঘটনায় বর্ণিত সমস্ত আজাবই হিসাব-নিকাশের দিন পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে বলিয়া হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

সোমবার দিন মৃত্যু হওয়া

৭২২। **হাদীছ :—**আয়েশা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আমার পিতা আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর (অস্তিমশয্যাবস্থায় তাঁহার) নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে তোমরা কয়টি বস্ত্রে কাফন দিয়াছিলে? আমি বলিলাম, তিনটি সাদা সূতি বস্ত্রে কাফন দিয়াছিলাম, যাহার মধ্যে (সাধারণ রকমের) জামা ও পাগড়ী ছিল না। তৎপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন্ দিন ওফাত পাইয়াছিলেন? আয়েশা (রা:) উত্তর করিলেন, সোমবার দিন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ কোন্ দিন? আয়েশা (রা:) বলিলেন, আজ সোমবার। তখন তিনি বলিলেন, সন্মুখের রাত্র পর্য্যন্ত আমিও আশা করি—(ইহলোক ত্যাগ করিব।) এই বলিয়া তিনি পরিধেয় কাপড়টির প্রতি তাকাইলেন, উহাতে জাফরানের দাগ ছিল। তিনি বলিলেন, এই কাপড়টি ধৌত কর এবং ইহার সঙ্গে আরও দুইটি কাপড় মিলাইয়া আমার কাফন দিয়া দিও। আয়েশা (রা:) বলিলেন এই বস্ত্রটি পুরাতন। তিনি বলিলেন, নূতন কাপড় জীবিতদেরই উপযোগী, কাফনের কাপড় নষ্ট হইয়া যাইবে।

কিন্তু আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ঐদিন প্রাণ ত্যাগ করিলেন না; মঙ্গলবার বিকালে প্রাণ ত্যাগ করিলেন, ভোর হইবার পূর্বে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

৭২৩। **হাদীছ :—**আয়েশা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসুলুল্লাহ (দ:)! আমার মাতা হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, কোন কথা বলিবার সুযোগ পান নাই। আমার ধারণা হয়, তিনি অস্তিমকালে কথা বলিতে পারিলে কিছু ছদকা করার অছিয়ত করিতেন। এখন আমি তাঁহার পক্ষে ছদকা করিলে তিনি কি উহার ছওয়াব পাইবেন? নবী (দ:) বলিলেন, হাঁ।

হযরত রসুলুল্লাহ ছালাম্লাহ, আলাইহে অসাল্লামের রওজা শরীফ এবং

আব, বকর রাজিয়াল্লাহ, তায়ালা আনহ, ও

ওমর রাজিয়াল্লাহ, তায়ালা আনহর

কবরের বিবরণ

৭২৪। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছালাম্লাহ আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার অন্তিম শয্যায় আয়েশা রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহার গৃহে থাকিবার দিনের অপেক্ষায় এই বলিতে থাকিতেন, অচ্চ আমি কোন্ জীর গৃহে আছি? আগামী কল্য কোন্ জীর গৃহে থাকিব? এইরূপ বলিয়া তিনি আয়েশা (রাঃ) গৃহে থাকিবার দিনের অপেক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন। হযরতের বিবিগণ তাঁহার মনোভাব উপলব্ধি করিতে পারিয়া সন্তুষ্টচিত্তে অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন যে, আপনি রোগ-শয্যায় সর্বদা আয়েশার গৃহেই থাকুন। আমরা এখানে আসিয়া আপনার খেদমত করিব। অতঃপর রসুলুল্লাহ ছালাম্লাহ আলাইহে অসাল্লাম আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

আয়েশা রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহা বলেন, বিবিগণের জন্ম রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক পালাক্রমে নির্ধারিত দিনসমূহের মধ্যে আমার জন্ম নিরূপিত দিনে, আমার কক্ষে এবং আমার বক্ষ ও গলগণ্ডের উপর হেলান দেওয়া অবস্থায় রসুলুল্লাহ ছালাম্লাহ আলাইহে অসাল্লাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন এবং আমার কক্ষে তাঁহাকে সমাহিত করা হইয়াছে।

ব্যাখ্যা :—রসুলুল্লাহ (দঃ) আয়েশা রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহার কক্ষে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। হাদীছে প্রমাণিত আছে, পরগাম্বরকে ঐ স্থানেই সমাহিত করা অবশ্য কর্তব্য যে স্থানে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (শামায়েল-তিরমিযী)। সুতরাং ছাহাবীগণ রহুলে করিম (দঃ)কে সেই তৈরী কক্ষেই সমাহিত করিয়াছিলেন এবং উহা সাধারণতঃ আবদ্ধ অবস্থায়ই থাকিত। আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ৬১৬ নম্বর হাদীছে আছে—ইহুদ নাছারারা পরগাম্বরগণের কবরকে সেজদা করায় তাহাদের প্রতি রসুলুল্লাহ ছালাম্লাহ আলাইহে অসাল্লাম লা'ন ও অভিশাপ করিয়াছেন। উক্ত হাদীছ বর্ণনা পূর্বক আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমাদের নবী ছালাম্লাহ আলাইহে অসাল্লামের কবরকেও সেজদার স্থান করিয়া নেওয়া হইতে পারে, এই আশঙ্কায় উহাকে পূর্ণরূপে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যেন কেহ ঐ স্থানে নামায পড়িতে বা সেজদা করিতে না পারে; নতুবা উহা উন্মুক্তই রাখা হইত।

হিজরী ৮৬ হইতে ৯৬ সাল—মোতাবেক ইংরাজী ৭০৫ হইতে ৭১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ওলীদ ইবনে আবদুল মালেক মোসলমানদের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার আমলে মসজিদে-নববীর সম্প্রসারণের প্রয়োজন দেখা দিল। যেহেতু পূর্ব হইতেই উক্ত মসজিদ হযরতের বিবিগণের আবাস গৃহ-সংলগ্ন ছিল, তাই মসজিদ সম্প্রসারণ কালে অধিপতি ওলীদ ঐ সকল

গৃহ বিবিগণের ওয়ারিসান হইতে ক্রয় করেন এবং তৎকালীন মদীনার গভর্ণর ওমর ইবনে আবদুল আজীজের তত্ত্বাবধানে ঐ সকল গৃহ ভাঙ্গিয়া মসজিদকে প্রশস্ত করেন। সেই সময় হযরতের রওজাশুল—বিবি আয়েশার কক্ষের পুরাতন দেওয়াল সমূহও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয় এবং নূতনভাবে দেওয়াল নির্মাণ করিয়া হযরতের রওজা শরীফকে ঘেরাও করিয়া দেওয়া হয়। কালক্রমে ১২৭১ হিজরীতে তুরস্কের তদানীন্তন সুলতান আবদুল মজিদ খান মরহুম মসজিদে-নববীর পুনঃ নির্মাণ করেন এবং প্রয়োজনে উহাকে অধিক প্রশস্ত করা হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে রওজা শরীফ মসজিদের ভিতরে, কিন্তু এক কোণে আসিয়া পড়ে।

আম্মার লাখ লাখ শোকর যে, মোসলমানগণ কখনও ইহুদ-নাছারাদের দ্বায় হযরত রসুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাম্মামের রওজা শরীফকে সেজদাশুল বা তজ্রপ কোনও অনৈসলামিক কার্য্যশুলরূপে ব্যবহার করে নাই। এমনকি কোন সময়েই যেন উহার সুযোগ না হয় তদ্বদ্দেশে রওজা শরীফকে অবরুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে—যাহার উল্লেখ আয়েশা (রাঃ) করিয়াছেন।

বর্তমান রওজা শরীফের চতুর্দিকে যে দেওয়াল রহিয়াছে, উহার ভিতরের সঠিক অবস্থা দেখা যায় না, কিন্তু ঐ দেওয়াল হইতে প্রায় ১৫/২০ হাত ব্যবধানে চতুর্দিকে লৌহ-জালীর দ্বারা উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত ঘেরাও করতঃ পূর্ণ আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিশেষতঃ মসজিদের যে অংশে দাঁড়াইলে রওজা শরীফ মুছল্লিগণের সম্মুখে হয়, সেইদিকে ঐ লৌহ বেঠনী কবর শরীফের দেওয়াল হইতে প্রায় ২৫/৩০ হাত দূরে অবস্থিত। তদুপরি সেই লৌহ বেঠনীর পর একটি স্থান রসুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাম্মামের তাহাজ্জুদ নামাযের স্থান বলিয়া প্রকাশ; সেই ২৫/৩০ হাত পরিমিত স্থানকেও রেলিং দ্বারা ঘেরাও করিয়া রাখা হইয়াছে। অনাবশ্যকে তথায় দাঁড়াইয়াও নামায পড়িতে দেওয়া হয় না।

মক্কা-মদীনা তথা হেজ্জায়ের অবিপত্তি সউদী গভর্ণমেন্টকে আম্মাহ তায়ালা জ্বাযায়ে-খায়ের দান করুন: এই গভর্ণমেন্ট হযরত রসুল্লাহ ছালামাহ আলাইহে অসাম্মামের রওজা শরীফ সম্পর্কিত সম্ভাব্য সকল প্রকার শেরেক বেদ্আ'তকে কঠোর হস্তে দমন করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। রওজা শরীফের চতুর্পার্শ্বে বহু পুলিশ সর্বদা মোতায়েন থাকেন; ঐ পুলিশগণ প্রত্যেকেই শরীয়তের মহআল-মাছায়েল সম্পর্কে সুবিজ্ঞ ও সুদক্ষ দীনদার। তাহারা দিবারাত্র সর্বদাই এই বিষয়ে সতর্কতা বজায় রাখিয়া থাকেন। আমি যখন রওজা শরীফের সংলগ্ন “রওজাতুম-মিন্ রিয়াজিল্ জান্নাহ” নামক স্থানে বসিয়া এই বিষয়টি লিখিতে-ছিলাম তখনকার একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা—এক বৃদ্ধ ব্যক্তি আমার পাশে বসিয়া রওজা শরীফের দিকে মুখ করিয়া মোনাজাত করিতেছিল। তৎক্ষণাৎ একজন পুলিশ তাহাকে ঐকার্থ্যে বাধা দিলেন এবং স্বহস্তে ধরিয়া তাহাকে ঘুরাইয়া কেবলামুখী করিয়া বসাইলেন, আর বলিলেন—“এই দিকে কেবলা এই দিকে মোনাজাত কর।”

৭২৬। হাদীছ :- ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (র:) বর্ণনা করিয়াছেন, ওলীদ ইবনে আবুহুল মালেকের আধিপত্যকালে যখন (মসজিদে-নববীর পুনঃ নির্মাণের সময়) রওজা শরীফের চতুর্পাশের দেওয়ালেরও পুনঃ নির্মাণ কার্য্য হইতেছিল, তখন (দেওয়ালের গর্ত খুঁড়িবার সময় জমিন ধ্বসিয়া) শব দেহের একটি পা খুলিয়া গেল; ইহাতে সকলেই আতঙ্কিত ও বিহ্বল হইয়া পড়িল। (এমনকি তদানীন্তন মদীনার গভর্ণর ওমর ইবনে আবুহুল আজ্জাজ স্বয়ং কার্য্যস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন।) সকলেই ভাবিতে লাগিলেন যে, ইহা হযরত রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পা মোবারক নাকি? এ বিষয়ে সঠিকভাবে অবগত ইহবার জ্ঞান তাঁহার। কাহাকেও পাইলেন

না। অতঃপর ওরওয়া (রাঃ) আদিয়া তাহাদিগকে নিশ্চিতরূপে বলিলেন, কখনও নয় ; আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, ইহা কস্মিনকালেও রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পা মোবারক নহে, বরং ইহা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পা।

ব্যাখ্যা :- শরীয়তের খাছ হুকুম অনুসারে নবী (দঃ)কে আয়েশা (রাঃ)-এর কক্ষে সমাহিত করায় ঐ কক্ষ কবরস্থানে পরিণত হইলে পর হযরতের উত্তর পাশে খালি জায়গায় হযরতের কোমর মোবারক বরাবর মাথা রাখিয়া আবু বকর (রাঃ)কে দাফন করা হয়। আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উত্তর পাশে হযরতের পা মোবারক বরাবর মাথা রাখিয়া ওমর (রাঃ)কে দাফন করা হইয়াছে। সেখানে কেবলা দক্ষিণ দিকে, তাই তাহাদের সকলেরই পা পূর্বদিকে অবস্থিত। সুতরাং পূর্বদিকের দেওয়ালস্থলেই উক্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং যেহেতু সে দিকে খলীফা ওমরের পা-ই সর্বাধিক অগ্রগামী ছিল ; তাই ওরওয়া (রাঃ)-এর বখান নিশ্চিতরূপেই সঠিক ছিল।

আয়েশা (রাঃ) স্বীয় ভাগিনা আবুহুলাই ইবনে ঘোবায়েরকে অহ্মিত করিয়া গিয়াছিলেন যে, আমাকে আমার সঙ্গীনী হযরতের অস্ত্রাশ্র বিবিগণের নিকটবর্তী মদীনার সাধারণ কবরস্থান জামাতুল-বাকীর মধ্যেই দাফন করিও ; রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটবর্তী দাফন করিও না। কারণ, ইহা আমি ভাল মনে করি না যে, এই বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া আমি অস্ত্রাশ্র বিবিগণের তুলনায় উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বলিয়া পরিগণিত হই।

● খলীফা ওমর (রাঃ) অন্তিম শয্যায় স্বীয় পুত্র আবুহুলাই ইবনে ওমরকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি উম্মুল-মোমেনীন আয়েশার খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ কর যে, খাত্তাবের পুত্র ওমর আপনার খেদমতে সালাম পাঠাইয়াছে ; খবরদার—আমার নামের সঙ্গে তখন “আমীরুল-মোমেনীন” বলিও না। অতঃপর তাহাকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিবে যে, আমি আমার মুরব্বিয়—রসুলুল্লাহ (দঃ) ও আবু বকর (রাঃ)-এর সঙ্গে দাফন হইতে আরজ রাখি। এই খবর পৌঁছিলে আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, এই সৌভাগ্যটি আমি নিজের জন্ত আশা করিয়াছিলাম।† এখন আমার নিজের আশার উপর ওমরের আরজকেই প্রাধান্য দিব। আবুহুলাই ইবনে ওমর (রাঃ) ফিরিয়া আসিলে ওমর (রাঃ) অতিশয় ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি খবর লইয়া আদিয়াছ ? আবুহুলাই (রাঃ) বলিলেন—হে আমীরুল-মোমেনীন, আপনার জন্ত তিনি অনুমতি দিয়াছেন। ওমর (রাঃ) বলিলেন, এই বিষয়টিই আমার বিশেষ চিন্তার কারণ ছিল।

অতঃপর বলিলেন, আমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পর আমাকে কাকন পরাইয়া কাঁধে করিয়া আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট লইয়া যাইবে এবং পুনঃ আরজ

† ইহা তাহার পূর্বকার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল। পরবর্তীকালে তিনি নিজেও ইহার বিপরীত অহ্মিত করিয়াছেন ; যেদ্রুপ একটু পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

করিবে—খাতাবের পুত্র ওমর আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে, (আপনার কক্ষে রসুলুলাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লামের নিকটবর্তী দাফন হইবার জ্ঞা)। যদি তিনি অনুমতি দান করেন তবে আমাকে ঐ স্থানে দাফন করিও, নতুবা আমাকে সর্বসাধারণ মোসলমানদের কবরস্থানেই দাফন করিও। (সময় উপস্থিত হইলে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আকাআ পূর্ণ হইল।)

মৃত ব্যক্তির প্রতি খারাব উক্তি করা চাই না

৭২৭। হাদীছ :—

عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم

لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا.

অর্থ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালামাহ আলাইহে অসাল্লাম করমাইয়াছেন—মৃত ব্যক্তিদেরে গালি-গালাজ করিও না। তাহারা স্বীয় আমলের প্রতিফল ভোগের স্থানে পৌঁছিয়া গিয়াছে। (যাহা হইবার সেখানে হইবেই; তাহারা হুনিয়া ত্যাগ করিয়া গিয়াছে এখন আর তাহাদেরে কিছু বলা নিশ্চয়োজন।)

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— সাধারণতঃ মৃত ব্যক্তির প্রতি খারাপ উক্তি ও তাহার কুৎসা না করা সম্পর্কে হাদীছ ও পরিচ্ছেদ বর্ণনার পর ইমাম বোখারী (রঃ) আর একটি পরিচ্ছেদে প্রমাণ করিয়াছেন যে, যাহারা দ্বীন-ইসলামের শত্রু, যাহারা দ্বীন-ইসলামকে ঘায়েল করিয়াছে এবং উহার কতি করিয়াছে, যাহারা রসুলুলাহ ছালামাহ আলাইহে অসাল্লামের প্রতি তথা তাঁহার (Mission) মিশনের প্রতি শত্রুতা করিয়াছে—এই শ্রেণীর লোকদিগকে মানব চোখে চিহ্নিত করা প্রয়োজন এবং তাহাদের হইতে লোক সমাজকে সতর্ক করা ও দূরে রাখার জ্ঞা তাহাদের কুৎসা করা এবং তাহাদের সত্যের পরও তাহাদের কুৎসা জারী রাখা বিশেষ কর্তব্য। এই সম্পর্কে বোখারী (রঃ) একটি হাদীছও উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীছটির বিস্তারিত অনুবাদ পঞ্চম খণ্ডে হযরতের জীবনী অধ্যায়ে “নবুওতের তৃতীয় বৎসর” বিবরণে ইনশা-আল্লাহ তায়াল্লা আসিবে। হাদীছটির মর্ম এই যে—হযরত রসুলুলাহ (দঃ) তাঁহার মিশনের কার্য ব্যাপকভাবে এবং প্রকাশ্যে আরম্ভ করার পটভূমিকায় আল্লাহ তায়ালার আদেশ মতে একদা কা'বা শরীফের সম্মুখস্থ সুপরিচিত ছাকা পর্বতের উপর দাঁড়াইয়া নিজের গোত্রীয়দেরকে ডাকিলেন। ঐ সময় গোত্রীয় প্রধান এবং নিকটতম আত্মীয়দিগকেও বিশেষভাবে ডাকিলেন। সকলে সমবেত হইলে রসুলুলাহ (দঃ) তাহাদিগকে তাঁহার মিশনের সম্ভাব্য শত্রুতার ভয়াবহ পরিণতি হইতে সতর্ক করতঃ এক আল্লার বন্দেগীর প্রতি আহ্বান জানাইলেন। হযরতেরই চাচা আবু লাহাব সেই আহ্বানে ক্ষুব্ধ হইয়া এই বাক্যে হযরতের প্রতি বিবোধগার করিল—**تَبَا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ هَذَا دَعْوَتُنَا**—“সারাদিন তোমার ধ্বংস সাধিত হউক; এই কথার জ্ঞা তুমি আমাদের ডাকিয়াছিলে।”

আবু লাহাব সেই মুহূর্ত হইতে হযরতের মিশনের শক্তিতে লাগিয়া গেল; তাহার স্ত্রীও এই কাজে তাহার কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া, বরং অগ্রগামী হইয়া চলিল। আল্লাহ তায়ালা আবু লাহাবেরই উচ্চারিত শব্দের মাধ্যমে তাহাদের উভয়ের ইহ-পরকাল ধ্বংস ও উৎসন্নের সংবাদ প্রচার করতঃ তাহাদের কুৎসার “তাক্বাত ইয়াদা” দূর্য্য পবিত্র কোরআনের অংশরূপে অবতীর্ণ করিলেন।

আবু লাহাব ও তাহার স্ত্রী মরিয়্য গিয়াছে, তাহাদের কুৎসা ও অভিশাপের এই দূর্য্য কেয়ামত পর্য্যন্ত বিশ্বব্যাপী আবৃত হইতে থাকিবে।

আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসুলের ও তাহার মিশনের সমস্ত দ্রুশমনকেই এইরূপে ধ্বংস ও উৎসন্ন করুন—আমীন।

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا وَشَفِيعِنَا وَمَلَانَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَهْلِبَائِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ عَدَدَ مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى ۝

২৭ মোহাররাম, ১৩৭৭ হিজরী,

২৩ আগষ্ট, ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ,

শুক্রবার,

পবিত্র মদীনা মোনাওয়ারাহ্—

হযরত রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের

রওজ। শরীফের সংলগ্ন—বেহেশতের বাগান।

